সূচি

জাদু বাস্তবতা ও মার্কেসের গল্প

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লেখকরা আর ছোটগল্প লেখেন না। ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ যেন ক্ষীয়মাণ। এককালের নবীন লেখকরা প্রথমে ছোটগল্প লিখে হাত পাকাতেন, তারপর কিছুটা আত্মবিশ্বাস অর্জন করলে শুরু করতেন উপন্যাস। এখন অনেকে শুরুতেই সরাসরি উপন্যাসে চলে আসেন। তার অন্যতম কারণ, সাহিত্য পত্রিকাগুলির বিলুপ্তি। এক সময় লেখকরা পরিচিত হতেন এই সব পত্রিকার মাধ্যমে। এখন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সরাসরি চলে যায় প্রকাশকের কাছে। সালমন রুশদি, বিক্রম শেঠ কিংবা অমিতাভ ঘোষ কখনো ছোটগল্পের দিকে মনোযোগই দেননি।

বাংলাতেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী প্রধান লেখকরা অনেক ছোটগল্প রচনা করেছেন। বস্তুত, বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাস অঙ্গুলিমেয় কিন্তু হীরক দ্যুতির মতন বিস্ময়কর ছোটগল্প অজস্র। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন লেখকদের একটি দুটি উপন্যাসের কথাই আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু তাঁদের অনেক ছোটগল্পই অবিস্মরণীয়। সত্যিই বাংলায় এক সময় ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ ছিল, অনায়াসেই বলা যায়। অনেক বিশ্বমানের ছোটগল্প রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। কিন্তু আফশোসের কথা এই, এখনো অনেক উচ্চাঙ্গের ছোটগল্প লেখা হয় বটে, কিন্তু প্রকাশক ও পাঠকমহলে ছোটগল্পের তেমন সমাদর বা চাহিদা নেই।

এখনকার পৃথিবীতে জীবিত লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস্ অবশ্য বেশ কিছু ছোটগল্প লিখেছেন। মোট সংখ্যা উনচল্লিশ। গল্পগুলি আকর্ষণীয় একটি বিশেষ কারণে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'নিঃসঙ্গতার এক শতাব্দীর'র লেখক হিসেবেই মার্কেস্ সর্বশেষ পরিচিত এবং তাঁর নাম শুনলেই মনে পড়ে ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌মের কথা। কিন্তু সেই বিশিষ্ট শিল্প আঙ্গিক মার্কেসের অনেক গল্পেই অনুপস্থিত। এই ছোটগল্পগুলির রচয়িতা যেন অন্য এক মার্কেস্। বড়জোর তাঁর কয়েকটি গল্পকে বলা যায় ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম আঙ্গিকের আঁতুড় ঘর। অন্যান্য গল্পগুলিতে টানা বর্ণনা রীতিই অনুসৃত হয়েছে।

ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম ব্যাপারটা কী? গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এই অভিধা চিত্রশিল্প সম্পর্কে প্রথম প্রযোজ্য হয়েছিল। তারপর এটা সাহিত্যের আঙ্গিক হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হয়। আর্জেন্টিনার প্রসিদ্ধ লেখক হর্হে লুইস বর্হেস, জার্মানির গুন্টার গ্রাস কিংবা ইংল্যান্ডের জন ফাউল্‌সের রচনাতেও এই উপাদান পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে নাইজেরিয়ার বেন ওকোরি আর কিউবার আলেহো কারপেনতিয়েরের অবশ্যই। তবে মার্কেস্ই এর প্রধান প্রবক্তা হিসেবে গণ্য। রূপকথা, উপকথায় ফ্যানটাসি, যার অনেকখানিই অবিশ্বাস্য, তার সঙ্গে আধুনিক জীবনের অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ঘটনার খুঁটিনাটি মিলিয়ে নেওয়াকেই ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম বলা যেতে পারে সংক্ষেপে। মার্কেস্ এই আঙ্গিকটি কী করে আয়ত্ত করলেন, তা বুঝতে গেলে তাঁর জীবনীর কিছু কিছু ঘটনা জানা দরকার।

বাচ্চা বয়েসে মার্কেস্ থাকতেন কলম্বিয়ার আরাকাটাকা নামে একটা ছোট শহরে দাদু ও দিদিমার কাছে। দাদু অবসরপ্রাপ্ত জবরদস্ত এক কর্নেল। মস্ত বড় বাড়ি, পুরোনো ও রহস্যময়, কেউ কেউ বলে ভূত আছে। দিদিমা ছাড়াও অনেক মাসি-পিসি মিলিয়ে বাড়ি ভর্তি অনেক বুড়ি মহিলায়, সবাই কুসংস্কারগ্রস্ত ও ভূত-প্রেত-অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসী, তাঁরা অনবরত সেইসব গল্প বলতেন। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গল্প বলিয়ে ছিলেন মার্কেসের দিদিমাই। তাঁর মুখ চোখের ভঙ্গি এমন হতো গল্প বলার সময়, যেন তিনি ঐ সব অলৌকিক ঘটনা একেবারে দেখতে পাচ্ছেন চোখের সামনে। এই সব গল্পই বালক মার্কেসের মনে দাগ কেটে যায়। পরবর্তীকালে ঐ সব চরিত্রও তাঁর গল্প-উপন্যাসে এসে পড়েছে। এরকম

তো অনেক লেখকের রচনাতেই তাঁদের বাল্য বয়েসের দেখা চরিত্র ও ঘটনার প্রতিফলন হয়। মার্কেজের জীবনে এর বিশেষত্ব কী?

আইন পাশ করে উকিল হবার বদলে মার্কেজ যখন সাংবাদিকতা ও গল্প-উপন্যাসে হাত পাকাচ্ছিলেন, তখনো তিনি নিজস্ব আঙ্গিকটি খুঁজে পাননি। তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে ফ্রান্‌ত্‌স কাফ্‌কার 'মেটামরফসিস' নামে গল্পটি এবং উইলিয়াম ফকনারের রচনা। কাফ্‌কা ও ফকনারের রচনারীতির কোনো মিল নেই। কাফ্‌কার গল্পটি পড়ে মার্কেস্‌ উপলব্ধি করেন যে একেবারে প্রথার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত বিষয়কেও বাস্তব সম্মত করে লেখা যায়। আর ফকনারের রচনায় অপ্রাকৃতের কোনো স্থান নেই, তিনি তাঁর চেনাশুনো পরিবেশ ও মানুষগুলি নিয়েই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লিখেছেন।

মার্কেস্‌ এই দুই বিপরীত আঙ্গিককেই মেলাতে চেয়েছেন, সেটাই তো ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম। কিন্তু এই আঙ্গিকও তাঁর কাছে সহজে আসেনি। নিজের লেখায় সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। ফকনার যেমন একটি কাল্পনিক অঞ্চল তৈরি করে তার মধ্যে তাঁর বাল্যকালের পরিচিত চরিত্রগুলি ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন। মার্কেসও সেই রকম মাকুন্দো নামের একটি অঞ্চল তৈরি করতে চাইছিলেন। তারপর সেই অলৌকিক ঘটনাটি তাঁর নিজের জীবনেই ঘটে।

১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে দারিদ্র্য ও অস্থির ভুবনের মধ্যে একদিন মার্কেস্‌ তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে আলকাপুলশোর দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মাঝপথে তাঁর এক বিস্ময়কর উপলব্ধি হলো। বিদ্যুৎ চমকের মতন তিনি যেন তাঁর নতুন উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদের প্রতিটি লাইন দেখতে পেলেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো তাঁর দিদিমার মুখ। তাঁর উপলব্ধি হলো যে কল্পিত নগরীতে দিদিমার মুখে শোনা গল্পগুলি শুধু ব্যবহার করলে তা কৃত্রিম হতে বাধ্য। দিদিমা যখন গল্প বলতেন, তখন তাঁর যে মুখের ভাব, লেখককে সেটাই ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ লেখককেও ঐ সব অলৌকিক ও ভূত-প্রেতের গল্প সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেই লিখতে হবে! বেড়াতে যাওয়া হলো না। গাড়ি ঘুরিয়ে মার্কেস্‌ ফিরে এলেন বাড়িতে। নিজের ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে। সংসার কী করে চলবে, না চলবে তার তোয়াক্কা না করে লিখতে বসলেন। প্রায় এক বছর পর সমাপ্ত হলো তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস 'নিঃসঙ্গতার এক শতাব্দী'।

ছোটগল্পগুলি লেখাব মাঝে মাঝে মার্কেস্‌ বেশ কিছু চলচ্চিত্র ও টি ভি ফিল্‌মের চিত্রনাট্যও লিখেছেন। তখন তিনি ইন্‌গমার বার্গমানের চলচ্চিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে বার্গমানের ছবিতে ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম প্রত্যক্ষভাবে ফুটে আছে। 'দা সেভেন্‌থ সিল,' 'ওয়াইল্‌ড স্ট্রবেরিজ' কিংবা 'ফ্যাজি অ্যান্ড আলেকজান্ডার' ছবিগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে মার্কেসের কিছু কিছু ছোটগল্পে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের প্রভাব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। এক সময় তিনিও হেমিংওয়ের মতন প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টার্সে কাটিয়েছেন কিছুদিন। তাঁর 'বিমানে এক ঘুমন্ত রূপসী' গল্পটি একেবারে হেমিংওয়ের ঘরানার গল্প। মার্কেস্‌ও বোধহয় এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, খোঁজাখুঁজি করছেন নিজস্ব স্টাইল। 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না' গল্পটি তিনি এগারোবার লিখেছেন ও ছিঁড়েছেন।

বাংলায় এই গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন অমিতাভ রায়। দিল্লি প্রবাসী এই লেখক অনেকদিন ধরেই মার্কেস্‌ অনুবাদে প্রবৃত্ত রয়েছেন। আগেও তাঁর অনুবাদে মার্কেসের বাংলা গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এবারে গল্পসমগ্র। তাঁব অনুবাদ সাবলীল এবং সরস-পাঠ্য। সমস্ত বিশ্বে প্রধান আলোচিত এই লেখকের সবকটি গল্প এক সঙ্গে প্রকাশ করে প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন। প্রকাশককেও ধন্যবাদ।

কলকাতা

সুপ্ত সুন্দরী ও বিমান

সুন্দরী এবং স্মার্ট। কোমল ত্বকের রং রুটির মতো। কাঁচা আলামন্দ্ বাদামের মতো সবুজ চোখের মণি। কাঁধের ওপর এলিয়ে পড়েছে দীঘল-কাজল-অবিন্যস্ত অলকদাম। তাকে ঘিরে ইন্দোনেশিয়া বা আন্দিজ পর্বতমালা এলাকার মধ্যযুগের পরিবেশের মতো একটা বিশেষ পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে। মার্জিত রুচির পোশাক। লিঙ্কস্-এর চামড়ার লোমশ জ্যাকেট। র-সিল্কের জামাটায় হালকা ফুলের নকশা ছাপা আর সাদা-মাটা লিনেনের ট্রাউজার্স। জুতোয় বোগেনভিলা ফুলের রঙের চিকন ডোরা দাগ। 'আমার দেখা সেরা সুন্দরী।' প্যারিসের 'শার্ল দ্য গল' এয়ারপোর্টে নিউ ইয়র্কের প্লেন ধরার জন্য চেক-ইন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আমার পাশ দিয়ে সে শান্ত-ঋজু-দীর্ঘ পদক্ষেপে চলে যাচ্ছিল। আর আমি এইসব ভাবছিলাম। তার উপস্থিতি এমন এক অতি-প্রাকৃত অনুভূতি যা ক্ষণেকের জন্য অস্তিত্ব অনুভবের সুযোগ দিয়ে এয়ারপোর্টের টার্মিনালের জনারণ্যে মিলিয়ে গেল।

তখন সকাল ন'টা। সারা রাত ধরে বরফ পড়েছে। অন্যান্য দিনের তুলনায় রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা বেশি বলে মনে হচ্ছে। কারণ, বরফের জন্য ধীরগতিতে গাড়ি চলছে। এমনকী হাই-ওয়েতেও ধীর গতি। ট্রাকগুলো হাই-ওয়ের ওপর একটার ঘাড়ে আরেকটা চেপে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে এয়ারপোর্টের টার্মিনালের ভেতরে তখনও বসন্তকাল।

এক ওলন্দাজ বৃদ্ধা ঘণ্টাখানেক ধরে তাঁর এগারোটা সুটকেশের ওজন নিয়ে তর্কাতর্কি করছিলেন। তাঁর পিছনে আমি বিরক্ত হতে শুরু করার মুহূর্তে কেমন যেন একটা আবেশে আচ্ছন্ন করে দিল তার ক্ষণেকের উপস্থিতি। সুতরাং তর্কটা কীভাবে মিটল, আমার জানাই হল না। কাউন্টারে বসে থাকা টিকিট-ক্লার্ক মেয়েটার মিষ্টি ধমকে সংবিত ফিরল। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমতা আমতা করে মেয়েটাকে প্রশ্ন করলাম,—সে প্রথম দর্শনের প্রেমে বিশ্বাস করে কিনা। মেয়েটি বলল,—'নিশ্চয়ই।' অন্য কোনও রকম প্রেম? 'অসম্ভব।' একই সাথে কম্পিউটারের পর্দায় চোখ রেখে সে আমায় সিট পছন্দ করতে বলল। ধূমপানবর্জিত এলাকা অথবা সিগারেট খাওয়া যায়,—কোন ধরনের সিট আমার পছন্দ সেটাই তাব জিজ্ঞাস্য। 'এটা কোনও ব্যাপারই নয়',—আলতো করে কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই বেশ দৃঢ়ভাবে নিবেদন করলাম,—'শুধু ওই এগারোটা স্যুটকেশের পাশে নয়।'

পেশাদাবি হাসিতে তর্কের আসল বিষয়টার স্বীকৃতি প্রকাশ করলেও পর্দা থেকে কিন্তু তার চোখ সরল না।

'একটা নম্বর বেছে নিন',—সে আমায় বলল। 'তিন, চার আর সাত খালি আছে।'

'চার।'

তার মুখে জয়ের হাসির ঝিলিক দেখা গেল।

'গত পনেরো বছর ধরে এখানে কাজ কবছি',—সে বলে চলল। 'আপনিই প্রথম যিনি সাত নম্বর বাছলেন না।'

বোর্ডিং পাস-এ চার নম্বর লিখে সব কাগজপত্র সে ফেবত দিয়ে দিল। এই প্রথম সে আমার দিকে আঙুর রঙে রাঙানো চোখে তাকাল। পুনরায় সুন্দরীর দেখা না পাওয়া পর্যন্ত এটাই ছিল আমার একমাত্র সান্ত্বনা। ঠিক তখনই সে বলল,—'এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং সব প্লেনই দেরিতে ছাড়বে।'

'কতক্ষণ?'

'ভগবান জানেন',—এক গাল হাসি ঝরিয়ে সে বলল। 'আজ সকালে রেডিও ঘোষণা করেছে যে এটা বছরের তীব্রতম তুষার ঝড়।'

মেয়েটা ভুল বলেছিল। এটা শতাব্দীর ভয়ংকরতম তুষার ঝড়। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ে তখন পুরোপুরি বসন্ত। ফুলদানিতে সাজানো গোলাপগুলো সম্পূর্ণ সতেজ। অ্যামপ্লিফায়ারে ভেসে আসা যন্ত্রসংগীতের মূর্ছনা এতই মধুর আর আবেশাচ্ছন্ন লাগছে যে মনে হচ্ছে সংগীত-স্রষ্টারা ঠিক এমনটিই চেয়েছিলেন। হঠাৎই আমার মনে হল সুন্দরীর জন্য এটাই তো যথার্থ জায়গা। প্রতীক্ষালয়ের অন্যান্য প্রান্তে অত্যন্ত দৃঢ়তা নিয়ে তার খোঁজ শুরু করলাম। কিন্তু বেশিরভাগই নিত্যদিনের সেই সব মানুষ যারা ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ে আর যাদের বউয়েরা ভাবে অন্য কারও কথা। কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বরফে ঢাকা প্লেনগুলো। বিস্তীর্ণ এলাকাকে মনে হচ্ছে তুষার তৈরির কারখানা। 'রঁজি'-র দিগন্ত ছোঁয়া মাঠগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে—এক শঙ্কিত-সন্ত্রস্ত সিংহের দাপটে চতুর্দিক বিপর্যস্ত। দুপুর হওয়ার আগেই প্রতীক্ষালয়ের বসার জায়গা ফুরিয়ে গেল। আর গরম এত বেড়ে গেল যে খোলা হাওয়ার খোঁজে আমায় পালিয়ে যেতে হল।

বাইরে এসেই চোখে পড়ল এক সাংঘাতিক দৃশ্য। সবরকমের মানুষের ভিড়। প্রতীক্ষালয়গুলো ভর্তি। দম বন্ধ করা করিডরগুলোয় পর্যন্ত মানুষ ঠাঁই নিয়েছে। এমনকী সিঁড়িগুলোতেও মানুষ তাদের পোষা জীব-জন্তু, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ভিড় জমিয়েছে। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ-সংযোগ ব্যাহত। ঝড়ে থমকে যাওয়া এক মহাকাশযানের মতো মনে হচ্ছে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তৈরি প্রাসাদটাকে। আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না এমন সাদামাটা সুবিশাল জনতার মধ্যে সে থাকতে পারে। তবে কল্পনাই আমাকে অপেক্ষা করার বাড়তি সাহস জুগিয়ে উদ্দীপ্ত করে রাখছিল।

দুপুরের আগেই টের পেলাম এক জলমগ্ন জাহাজের যাত্রীতে পরিণত হয়েছি আমরা। সাতটা রেস্তোরাঁ, এক রাশ ক্যাফেটারিয়া, ফাস্টফুডের দোকানগুলোয় মানুষের সীমাহীন লাইন ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই সেগুলোর ঝাঁপ ফেলে দিতে বাধ্য করল। আসলে খাবারদাবার সবই ফুরিয়ে গেছে। বাচ্চাগুলো, যাদের মনে হচ্ছিল সারা পৃথিবীর শিশুদের সমাবেশ, সব একসঙ্গে কান্না জুড়ে দিল। আটকে যাওয়া সমস্ত যাত্রী হঠাৎ যেন এক যূথবদ্ধ জনতায় পরিণত। এ সময় এটাই তো স্বাভাবিক। খাদ্যান্বেষণে বেরিয়ে বাচ্চাদের একটা দোকানে দু' কাপ ভ্যানিলা আইসক্রিম পেলাম। খদ্দেবরা চলে যাওয়ায় দোকানেব কর্মচারীরা টেবিলের ওপর চেয়ারগুলো তুলে দিচ্ছিল। আমি তখন আস্তে আস্তে আইসক্রিম খাচ্ছিলাম। আইসক্রিম শেষ হবার মুখে এক হাতে আইসক্রিমের কাপ আরেক হাতে চামচ নিয়ে দোকানের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে আবার মনে পড়ল সুন্দরীর কথা।

নিউ ইয়র্কের প্লেনটা সকাল এগারোটার বদলে অবশেষে ছাড়ল পরের দিন ভোর চারটেয় প্লেনেব ভেতরে গিয়ে দেখি প্রথম শ্রেণীর অন্য যাত্রীরা নিজের জায়গায় বসে গেছে। বিমান সহায়কদেব একজন আমায় নির্ধারিত আসনে বসিয়ে দিল। আমার তো দম বন্ধ হয়ে যাবাব মতো অবস্থা। পাশের সিটটা, মানে জানালার ধারেরটা, সুন্দরী দক্ষ যাত্রীর নিপুণতায গুছিয়ে নিচ্ছে। আমাব মনে হল,—এ কথাটা লিখলে, কেউ কোনওদিন বিশ্বাস করবে না। আমতা আমতা করে কোনওবকমে সুন্দবীকে শুভেচ্ছা জানালাম। এবং সে তা শুনতে পেল না।

এমনভাবে সাজিয়েগুছিয়ে সে বসছে যেন এখানে বহুদিন বসবাস করতে হবে। আদর্শ বাড়ির মতো প্রতিটি জিনিস নাগালের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করে, অর্থাৎ নির্ধারিত জায়গায় ঠিক ঠিক জিনিসটা রেখে সে শেষ করল আসন গোছানো। এর মধ্যে প্লেনে আমাদেব স্বাগত জানাবার জন্য শ্যাম্পেন উপস্থিত। তাব জন্য একটা গেলাস তুলে নিয়ে ভাবলাম,—একটু অপেক্ষা কবাই ভালো। কারণ, সুন্দরী প্রথমে দুর্বোধ্য ফরাসিতে এবং পরে অন্তত কিছুটা সডগড ইংবেজিতে এক গেলাস জল চেয়ে বিমান সহায়ককে জানিয়ে দিল যে কোনও অবস্থাতেই পুরো বিমানযাত্রায় যেন তাব ঘুম না ভাঙানো হয়। তার ঝাঁঝালো নির্দেশকে প্রাচ্যদেশীয় ঘণ্টার শোক-ধ্বনির মতো মনে হল।

জল আসার পব সুন্দরী একটা প্রসাধন-বাক্স কোলেব ওপব [illegible]। বাক্সটাব কোণাগুলোয় ঠাকুমার

আমলের ট্যাঙ্কের মতো তামার তাপ্পি লাগানো। বাক্সটা খুলে সুন্দরী দুটো সোনালি রঙের ট্যাবলেট বের করল। বাক্সটার মধ্যে রয়েছে অন্যান্য রঙেরও ট্যাবলেট। সুন্দরী নিয়ম মেনে, সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে, সুষ্ঠুভাবে এমন ভঙ্গিতে একের পর এক সব কাজ করে গেল যে মনে হয় জন্মের পর থেকে তাকে পরিকল্পনাহীন কোনও ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি। অবশেষে জানালার ধাতব পর্দাটা টেনে নামিয়ে সিটের হেলান দেওয়ার গদিটাকে যতটা সম্ভব পেছনে হেলিয়ে দিয়ে, কম্বলে নিজেকে জড়িয়ে সুন্দরী আমার দিকে পেছন ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। তবে সে জুতো খোলেনি, আর চোখে ঠুলি পরে নিয়েছে। একদমে, একবারও না থেমে, এতগুলো কাজ সে পর পর করে গেল। নিউ ইয়র্ক যেতে সময় লাগে আট ঘণ্টা। তবে আমাদের আরও বারো মিনিট বাড়তি লাগল। এই শাশ্বত সময়ে একবারের জন্যেও তার দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল না, অথবা তার বসার ভঙ্গিতে এতটুকুও পরিবর্তন ঘটল না।

এ এক দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ সফর। প্রকৃতিতে সুন্দরী মেয়েদের চেয়ে আর কিছু সুন্দর নেই, এটাই আমার বরাবরের বিশ্বাস। গল্পের বই থেকে উঠে আসা চরিত্রটা, যে এখন আমার পাশে অঘোবে ঘুমোচ্ছে, তার থেকে এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে সরিয়ে রাখা আমার পক্ষে যেন একেবারে অসম্ভব। প্লেন চলতে শুরু করার পর আগেকার সহায়কের বদলে উপস্থিত নতুন একজন কার্তেজীয় সহায়ক। নতুন সহায়ক সাবান-ক্রিম-টুথপেস্টের প্যাকেট আর গান শোনার ইয়ার ফোন দেবার জন্য সুন্দরীর ঘুম ভাঙাতে উদ্যত হল। আমি তাকে সুন্দরীর দেওয়া নির্দেশটা জানালাম। কিন্তু সে সুন্দরীর ওষ্ঠাধরের স্পন্দন থেকে উচ্চারিত উত্তর শুনতে আগ্রহী। এবং সে শুনল,—সুন্দরীর খাবারও দরকাব নেই। সহায়ক সব কিছু ভালো করে শুনে নিয়ে শান্ত স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল যে, সুন্দরীটি নিজের গলায় 'বিরক্ত কোরো না' লিখে লম্বা ছোট্ট একটা কার্ড ঝুলিয়ে রাখলেই ভালো কবত।

একা একাই খেলাম। সে জেগে থাকলে তাকে যা যা বলতাম, তা পুবোপুরি মনে মনে আউড়ে গেলাম। তার ঘুম এতই গভীর এবং সুস্থির যে একসময় আমার মনে হল সম্ভবত ঘুমের ওষুধের বদলে সে খেয়েছে মৃত্যুর ওষুধ। প্রতিবার পান করার সময় তার সঙ্গে মনে মনে সুরা-শুভেচ্ছা বিনিময় করতে করতে বলছিলাম,—'সুন্দরী, তোমাব স্বাস্থ্য কামনা করি।'

খাওয়াদাওয়ার পর আলোটা কমিয়ে দেওয়া হল। শুরু হল একটা সিনেমা। কিন্তু দেখবে কে? অন্ধকারের জগতে আমরা দু'জন তখন একাকী। শতাব্দীর সবচেয়ে সাংঘাতিক ঝড় থেমে গেছে। রাতেব আঁধাবে তারা ভরা আকাশে, সুবিশাল আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হল প্লেনটা যেন একেবারেই গতিহীন। কয়েকঘণ্টা ধরে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। জলেব ওপর ছড়িযে পড়া মেঘের ছায়ার মতো তার কপালেব ওপর ভেসে বেড়ানো স্বপ্নেব ছবি দেখেই কেবল প্রাণের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল। গলার চিকন সোনালি হারটা তার সোনালি চামড়ার মধ্যে প্রায় মিলিয়েই গেছে। তার নিখুঁত কান দুটো বিঁধানো হয়নি। গোলাপি নখগুলো সুস্বাস্থ্যের পবিচায়ক। আর বাঁ হাতে একটা সাধাবণ আংটি। বছর বিশেকের বেশি তার বয়স মনে হচ্ছে না ধরে নিয়ে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে ওটা বিয়েব আংটি নয়,—কোনও সাময়িক বাগ্‌দানেব চিহ্ন মাত্র। শ্যাম্পেনের ফেনার চরম নেশায় ভাসতে ভাসতে আমি জেরার্দো দিয়েগোব সেই বিখ্যাত এবং বিশ্বাসযোগ্য সনেটটা স্তোত্রেব মতো আউড়ে যাচ্ছিলাম।

'তুমি নিদ্রাচ্ছন্ন জানতে পাবায,
নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায়,
ক্ষমা করার বিশ্বস্ত ধারাবাহিকতায,
বিশুদ্ধ সূত্রে,
আমার শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দু'টি দিলাম সঁপে তোমায়।'

তারপব আমার সিটটাকে তার সিটের সমান কবে হেলিয়ে দিলাম। মনে হচ্ছে, ফুলশয্যাব বিছানায়

যতটা নিবিড়ভাবে আমরা শুতে পারতাম তার চেয়েও কাছাকাছি, পাশাপাশি আমরা এখন শুয়ে আছি। তার শ্বাসপ্রশ্বাস আর গলার ওঠানামা একই সুরে ছন্দোবদ্ধ। ত্বক থেকে ভেসে আসা সুবাস যেন তার সৌন্দর্যেরই সুগন্ধ। অসহনীয় অবস্থা। গত বসন্তে ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার লেখা একটা উপন্যাস পড়েছিলাম। প্রাচীন জাপানের কিয়োতো শহরের বড়লোকদের নিয়ে উপন্যাস। একই বিছানায় শহরের সুন্দরী মেয়েদের নগ্ন ও মাতাল অবস্থার উন্মাদনা দেখার জন্য রাতের পর রাত বড়লোকেরা প্রচুর খরচ করত। ওরা মেয়েগুলোর সঙ্গে বিছানায় যেত বিরক্তি নিয়ে। তবে ওরা মেয়েদের ছুঁত না, নেশা কাটাত না, ঘুম ভাঙাত না, এমনকী তাদের বিরক্তও করা হত না। আসলে তাদের ওই রকমভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেই বড়লোকেরা আনন্দের উপকরণ খুঁজে পেত। সেই রাতে সুন্দরীকে ওইভাবে ঘুমোতে দেখতে দেখতে প্রাচীন জাপানি ধনীদের বিচিত্র আনন্দ তো অনুভব করলামই, উপরন্তু সেই আনন্দ নিজেও পুরোপুরি উপভোগ করলাম।

'কে ভেবেছিল আমি এক প্রাচীন জাপানি পুরুষে পরিণত হব'—বিড়বিড় করতে করতে বললাম। আসলে এ সবই শ্যাম্পেনের প্রতিক্রিয়া।

মনে হয়, শ্যাম্পেনের দাপটে এবং সিনেমার নিঃশব্দ বিস্ফোরণের ফলে আমি ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে নিয়েছি। ঘুম ভাঙার পর মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছিল। বাথরুমে গেলাম। দু'টো সিটের পেছনে সেই এগারোটা স্যুটকেশের মালকিন বৃদ্ধা বিচিত্র ভঙ্গিতে যুদ্ধক্ষেত্রের বেওয়ারিশ মৃতদেহের মতো বসেছিলেন। রঙিন পুঁতির মালার সঙ্গে আটকানো তাঁর চশমাটা পড়ে রয়েছে মেঝেতে। একটু মানসিক তৃপ্তি পাবার জন্য চশমাটা তুললাম না।

শ্যাম্পেনের উদ্দাম নেশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নিজেকে দেখলাম আয়নায়। একেবারে শ্রদ্ধার অযোগ্য একটা চেহারা নজরে এল। ভালোবাসার বিপর্যয় যে এত ভয়াবহ হতে পারে ভেবেই শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। প্লেনটা কোনও হুঁশিয়ারি বার্তা না দিয়েই হঠাৎ করে নিচে নেমে এল। তারপরই আবার সোজা হয়ে ছুটে চলল পূর্ণ গতিতে। জ্বলে উঠল 'নিজের জায়গায় ফিরে আসুন' লেখা আলোকিত সংকেতটা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের সিটের দিকে এই আশায় পা চালালাম যে ঈশ্বর সৃষ্ট প্লেনের টালমাটাল অবস্থা সুন্দরীর ঘুম ভাঙিয়ে দিতে পারে। আতঙ্ক দূর করার জন্য সে হয়তো আমার দু' বাহুতে আশ্রয় চাইতে পারে। তাড়াহুড়োয় ওলন্দাজ ভদ্রমহিলার চশমাটা মাড়িয়ে দিয়ে প্রায় ভেঙেই ফেলছিলাম! ভাঙলে হয়তো আনন্দ পেতাম। আমার আগেই চার নম্বর সিটটা বেছে না নেওয়ার জন্য হঠাৎ একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মানসিকতা আমার মধ্যে জেগে উঠল। চশমাটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে সন্তর্পণে ফেলে দিলাম তাঁর কোলে।

সুন্দরীর নিদ্রা নিরবচ্ছিন্ন। প্লেনটা স্থির হলে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তার ঘুম ভাঙানোর প্রবল ইচ্ছেটা দমন করতে হল। সফরের শেষ ঘণ্টাটা তাকে জেগে থাকা অবস্থায় দেখতে চাইছিলাম। এমনকী সে খেপে গিয়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করলেও এই বাসনাটার বাস্তবায়নে আমি রাজি ছিলাম। কারণ তা হলে আমার স্বাধীনতা, হয়তো বা আমার যৌবনকেও পুনরুদ্ধার করতে পারতাম। গভীর আক্ষেপের সঙ্গে মনে মনে বললাম,—'চুলোয় যাক, কেন যে মরতে ষাঁড় হয়ে জন্মালাম না।'

প্লেন থেকে অবতরণের সংকেত বার্তা লেখা আলোগুলো জ্বলে উঠতেই সে ঘুম থেকে উঠে পড়ল। তাকে এত সুন্দর আর তরতাজা লাগছে যে মনে হল সে এতক্ষণ গোলাপের বাগানে ঘুমোচ্ছিল। তখন আমি বুঝলাম পাশাপাশি বসা যাত্রীরা ঘুম ভাঙার পর কেন পুরোনো দম্পতিদের মতো 'সুপ্রভাত' বলে শুভেচ্ছা বিনিময় করে না। এবং সে-ও করল না। চোখের ঠুলিটা খুলে ফেলল। ঝকঝকে চোখদুটো মেলে তাকাল। সোজা করল হেলানো সিটটাকে। কম্বলটা গুছিয়ে সরিয়ে রাখল। চুলের গোছটা নিজের ভারেই এক পাশে এলিয়ে পড়েছিল। একবার মাথাটা ঝাঁকিয়েই সেটা ঠিক করে ফেলল। প্রসাধন বাক্সটা খুলে রাখল কোলের ওপর। চট করে শুরু করল প্রয়োজনীয় প্রসাধন। এই কাজটায় সে অনেকখানি সময় নিল। প্লেনের দরজা না খোলা পর্যন্ত চলল প্রসাধন পর্ব। মনে হচ্ছে পাশে বসে থাকা মানুষটা তার নজরেই আসেনি। লিঙ্কস্-এর লোমশ চামড়ার জ্যাকেটটা গায়ে চড়াল। আমাকে ডিঙিয়ে চলে

যাবার সময় লাতিন আমেরিকান স্প্যানিশ ভাষায় চলতি টানে 'ক্ষমা করবেন' উচ্চারণ করল। 'শুভ বিদায়' বা 'ধন্যবাদ' বলল না। আমাদের যৌথ সফরটা সুখকর করে তোলার জন্য আমি যা যা করেছি, নিদেনপক্ষে সেই কারণেও একটা ধন্যবাদ না জানিয়েই নিউ ইয়র্কের রৌদ্রস্নাত আমাজন জঙ্গলে মিলিয়ে গেল সুন্দরী।

মূল শিরোনাম : El avión de la bella durmiente

ত্রামোন্তানা

মর্মান্তিক মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে তাকে একবার মাত্র দেখেছিলাম বার্সেলোনার জনপ্রিয় বোক্কাসিও ক্লাবে। তখন রাত দু'টো। সুইডিশ্ যুবকদের একটি দল তাকে কাদাকেস-এ নিয়ে যাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ওদের ইচ্ছে ছেলেটি সেখানকার অনুষ্ঠানে অংশ নিক। সুইডিশ্ যুবকরা সংখ্যায় এগারোজন। তবে ওদের আলাদা করে চেনা সম্ভব নয়। সকলেই সুদর্শন, প্রত্যেকেরই সরু কোমর আর সবারই লম্বা লম্বা সোনালি চুল। যে ছেলেটিকে ধরে ওরা টানাটানি করছিল তার বয়স বড় জোর বছর কুড়ি। মাথায় নীলচে কালো কোঁকড়ানো চুল, সবুজ আভার হলদে জলপাইয়ের মতো গায়ের রং এবং ত্বক মসৃণ। ক্যারিবিয়ান এলাকার মায়েরা ছোট থেকেই বাচ্চাদের ছায়ায় হাঁটতে শেখানোর জন্যে তাদের এমন গাত্রবর্ণ। আর তাদের চোখজোড়া আরবদের মতো। সুইডিশ্ মেয়েদের তো বটেই, এমনকী সুইডিশ্ ছেলেদেরও অনেককে পাগল করে দেওয়ার জন্যে ওই চোখই যথেষ্ট। ওরা ছেলেটিকে পানশালার কাউন্টারের ওপর বসিয়ে দেওয়ায় তাকে হরবোলা পুতুলের মতো দেখাচ্ছিল। হাততালি দিতে দিতে ওরা জনপ্রিয় গান গাইছিল যাতে গান শুনে মুগ্ধ হয়ে সে রাজি হয়ে যায়। আর আতঙ্কগ্রস্ত ছেলেটি বোঝানোব চেষ্টা কবছিল কেন সে ওদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক নয়। এমন সময় কে একজন সেখানে অনাহূতভাবে ঢুকে পড়ে চিৎকার করে বলতে শুরু করল কেন ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। একজন সুইডিশ্ যুবক তেড়ে গেল নবাগতের দিকে। তেড়ে এলেও যুবকটি কিন্তু হাসছিল ; বরং বলা ভালো হাসিতে ফেটে পড়ছিল। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে যুবকটি,—'ও আমাদের। ময়লা ফেলার ড্রাম থেকে ওকে আমরা তুলে এনেছি।'

এইসব ঘটে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমি সেখানে পৌঁছোই। দেভিদ্ অয়িস্ত্রাখের শেষ কনসার্তটি শোনার জন্যে তার আগে আমরা 'পলৌউ দে লা মুসিকা'-তে ছিলাম। এখানে এসে দেখি সুইডিশ্‌রা ছেলেটির কথা কানেই তুলছে না। ছেলেটির আপত্তির কারণ যথেষ্ট সঙ্গত। সে আদতে কাদাকেসের বাসিন্দা। ওখানকার একটা শৌখিন পানশালা 'আন্তিলিয়ান' গান গাইবার জন্যে ছেলেটির সঙ্গে চুক্তি করে। ভালোই গাইছিল সে। কিন্তু গতবারের গরমকালে ত্রামোন্তানা অর্থাৎ উত্তরের ভয়ংকর ঝোড়ো বাতাস শুরু হওয়ার পরেই সে ভয়ে গুটিয়ে যায়। ত্রামোন্তানার দাপটে পানশালাটি উড়ে গেল। পরের দিনই সে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করে ত্রামোন্তানা শুরু হোক বা না হোক, আর ফিরে যাবে না কাদাকেসে। ক্যারিবিয়ানদের স্থির বিশ্বাসের মর্ম কি স্ক্যান্ডিনেভিয়ার যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব? গ্রীষ্মের দাপটে উত্তেজিত এবং কড়া কাতালান মদের ঘোরে আচ্ছন্ন মানুষের মনে জন্ম নেয় যাবতীয় আদিম ইচ্ছা।

অন্যেরা বোঝেনি তার কথা। আমি কিন্তু বুঝতে পারি। কোস্তা ব্রাভার তীর ধরে গড়ে ওঠা গ্রামগুলির মধ্যে সবচেযে সুন্দর কাদাকেস। সেখানকার বক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাও খুব ভালো। সংকীর্ণ হাইওয়েটির জন্যেই এটা সম্ভবপর হয়েছে। গভীর খাদের পাশ দিয়ে হাইওয়েটি এমনভাবে এঁকে বেঁকে উঠে গিয়েছে যে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। নেহাত যদি চালাতেই হয় তো তাকে ধীর স্থির মানুষ হতে হবে। কাদাকেসের পুরোনো বাড়িগুলির ছাদ খুবই নিচু আর সেগুলোর রং সাদা। ভূমধ্যসাগরেব তীরের সব জেলেপাড়াতেই সাবেককালে এমন রীতিতেই বাড়ি তৈরি হত। নতুন বাড়ি তৈরির সময় বিখ্যাত স্থপতিরাও গৃহনির্মাণের এই মৌলিক ও প্রাচীন বৈশিষ্ট্যকে যথার্থ মর্যাদা দেন।

গরমকালে আফ্রিকার মরুপ্রান্তর থেকে তাপ ছড়াতে শুরু করলে এক নারকীয় আড্ডাখানায় পরিণত হয় কাদাকেস। তিনমাস ধরে ইউরোপের সমস্ত প্রান্ত থেকে আসতে থাকা পর্যটকের ঢল নামে এখানে।

হাবভাব দেখে মনে হয় তারা যেন স্বর্গ জয় করতে এসেছে। তারপরেই শুরু হয়ে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। এমনকী সেই বিদেশিদেরও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হয় যারা আগে এসে তুলনামূলকভাবে কম দামে বাড়ি কিনে নিতে পেরেছে। রেষারেষি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোয় কাদাকেসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দুই ঋতু বসন্ত ও শরৎকালে। তবে এই সময়েও ত্রামোন্তানার আশঙ্কা থেকে নিস্তার নেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশ্বাস ত্রামোন্তানা হল সেই পরুষ-প্রবল বাতাস যার উৎস স্থলভূমি এবং যা সঙ্গে করে নিয়ে আসে পাগলামির বীজ। যে সব লেখকেরা এর মর্মোদ্ধারে সমর্থ হয়েছেন তাঁদেরও এইরকম ধারণা।

বছর পনেরো আগেকার কথা। ত্রামোন্তানার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় তখনও কাদাকেস সম্পর্কে আমার গভীর আস্থা। কোনও এক রবিবারে দিবানিদ্রার অবসরে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন একটা ঘটনার পূর্বাভাস পেলাম। মনে হল কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ঝোড়ো বাতাস এসে পৌঁছোনোর আগেই আমার পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। অবসন্ন বোধ করছিলাম। কেমন যেন বিমর্ষ লাগছিল। আমাদের দুই সন্তান যাদের বয়স তখনও দশ বছর পেরোয়নি, মনে হচ্ছিল দু'চোখ ভরা বিরূপতা নিয়ে সারা বাড়ি জুড়ে যেন তারা আমায় অনুসরণ করে চলেছে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই যন্ত্রপাতির বাক্স আর সমুদ্রে ব্যবহারোপযোগী দড়িদড়া নিয়ে দারোয়ান এসে উপস্থিত। দরজা-জানালার নিরাপত্তার যথাযথ বন্দোবস্ত করাব জন্যেই তার আগমন। আমার মনমরা অবস্থা দেখে সে একটুও অবাক না হয়ে বলল,—'ত্রামোন্তানা আসছে। ঘণ্টাখানেকেব মধ্যেই এসে পড়বে।'

এই মানুষটি এক সময় নাবিক ছিল। এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তার পোশাক নাবিকদের মতো,—বেশি ঝুলের বর্ষাতি জ্যাকেট, টুপি এবং মুখে একটি পাইপ। সাত সাগবের নুন লেগে পোড খাওয়া তার গায়ের চামড়া। অবসর সময়ে মানুষটি সেই প্রৌঢ় সৈনিকদের সঙ্গে চত্বরে বসে বোলিং-পিনস্ জুয়ো খেলে যারা একসময়ে অনেক যুদ্ধ করেছে এবং হেরেছে। সমুদ্রতীরের সরাইখানাগুলোব কোনওটায় বসে সে পর্যটকদের সঙ্গে মদ গেলে। বিশেষত সেই মদ যা খেলে ক্ষিধে বাড়ে। ফৌজি ভঙ্গির কাতালান ভাষায় কথা বলে সে সবাইকে তার বক্তব্য বোঝাতে সক্ষম। তার একটাই গর্ব,—সে পৃথিবীর সব বন্দর চেনে। তবে স্থলভাগ তার অচেনা। বন্দরবিহীন কোনও শহরই সে চেনে না। 'এমনকী প্যারিস, ফ্রান্সও নয়, তা সে যত বিখ্যাত জায়গাই হোক না কেন',—এটাই তার কথা বলার ধবন। পাল তুলে চলে না এমন কোনও যানবাহনে তার এতটুকু ভরসা নেই।

গত কয়েক বছরে হঠাৎ যেন ভীষণভাবে তাব বয়স অনেক বেড়ে গেছে। রাস্তার দিকে যাওয়া বন্ধ। বরাবরের মতো নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে দিনের বেশিরভাগ সময়ই সে দারোয়ানের ঘরে বসে কাটিয়ে দেয়। নিজেব খাবার নিজেই রেঁধে নেওয়ার জন্যে তার উপকরণ মাত্র একটা সাদামাটা স্টোভ। তবে ওইটুকুই তাব পক্ষে যথেষ্ট যা দিয়ে চমৎকার সব সুখাদ্য রেঁধে সে আমাদের খাওয়ায়।

বাড়ির প্রতিটি তলায় প্রত্যেক ভাড়াটের খোঁজখবর নেওয়া তার বোজ সকালেব প্রথম কাজ। এমন অমায়িক, স্বতঃস্ফূর্ত, উদার এবং অকৃত্রিম হৃদয়ের অধিকারী মানুষ আর একটাও দেখিনি। এটা কাতালোনিয়ান বৈশিষ্ট্য। এমনিতেই সে খুবই কম কথার মানুষ। নেহাত দরকার হলে সরাসরি বলে ঠিক সেইটুকুই, যা তার বক্তব্য। হাতে কাজ না থাকলে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা বসে পূর্বাভাস সংক্রান্ত ছক কষে। তবে সাধারণত সেগুলি আর ডাকে পাঠানো হয় না।

সেদিন দুর্যোগের পূর্বাভাস পেয়ে দরজা-জানালার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কবতে সে ত্রামোন্তানা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। তার ভাষ্য অনুসারে ত্রামোন্তানা এক ঘৃণ্য নারী ; অথচ ত্রামোন্তানা ছাড়া তার জীবন অর্থহীন। আমি তো রীতিমতো বিস্মিত। একজন নাবিক কেন স্থল বাতাসকে এত গুরুত্ব দেবে?

তার মতে,—'এবার হবে আগেরগুলোর মতো।' তার কথা শুনে আমাদের ধারণা হল, —দিন বা মাস মিলিয়ে বছরের হিসেব না করে সে সময়ের গণনা কবে কতবার ত্রামোন্তানা এল তার ভিত্তিতে।

'গত বছর দ্বিতীয়বার ত্রামোন্তানা শুরু হওয়ার দিনতিনেক বাদে আমাব কোলাইটিস হল',—এমন

কথা একবার সে আমায় বলেছিল। হয়তো সে বলতে চেয়েছিল প্রতিবারের ত্রামোন্তানার হানায় মানুষের বয়স এক ধাক্কায় বেড়ে যায় বেশ কয়েক বছর। ধারণাটা তার মনে এতই দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে যে আমাদেরও ত্রামোন্তানা সম্পর্কে কৌতূহল বেড়ে গেল। প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছে হল ত্রামোন্তানাকে। কেমন সেই অতিথি যার এমন সর্বনাশা মোহিনী শক্তি।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। দারোয়ান চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা শিসের আওয়াজ কানে এল। ধ্বনিটা ক্রমে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে ক্রমশ তীব্র হতে থাকল। শেষে ভূমিকম্পের গর্জনের মতো শোনাল। তারপর শুরু হল ঝোড়ো বাতাস। প্রথমে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে দমকা বাতাস। বিরতির ব্যবধান ক্রমশ কমে আসছে। অবশেষে শুরু হল বিরতিবিহীন বাতাসের দাপট। এমন তীব্রভাবে, নিষ্ঠুরের মতো বয়ে যাওয়া বাতাসের গতি দেখে মনে হচ্ছে সবটাই অপ্রাকৃত। ক্যারিবিয়ান এলাকার বাড়িগুলো সমুদ্রমুখী। পক্ষান্তরে আমাদের বাড়িগুলোর সদর পাহাড়ের দিকে। হয়তো এটাই প্রাচীন কাতালোনিয়ানদের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। সমুদ্রকে ভালোবাসলেও সমুদ্র দর্শনের তেমন কোনও গরজ নেই। তাই ঝোড়ো বাতাস সরাসরি আঘাত করল আমাদের। জানালাগুলোকে শক্ত করে বন্ধ করে রাখার জন্যে যে সব দড়িদড়াগুলো বাঁধা হয়েছিল, সেগুলো ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম।

চারপাশের পরিবেশ তখনও ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আর তা দেখে আমি তো রীতিমতো বিহ্বল। আমার মনে হল, এমন সোনালি সূর্য আর অপরাজেয় আকাশ আগে কখনও দেখা যায়নি, ভবিষ্যতেও দেখা যাবে না। একবার ভাবলাম বাচ্চাদের নিয়ে সমুদ্র দেখে আসি। ওরা তো মেক্সিকোর ভূমিকম্প আর ক্যারিবিয়ান সাগরের ঝড়ের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে, এরকম এক-আধটা ঝড়ে আর ভয়ের কী আছে।

দারোয়ানের ঘরের পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে যাওয়ার সময়ে নজরে এল সে স্থির হয়ে এক দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে ঝড়ের দিকে। তার হাতে ধরা রয়েছে এক প্লেট বিন আর সসেজ। সে আমাদের খেয়াল করেনি।

বাড়ির আড়ালে থাকার জন্যে এতক্ষণ কিছুই বোঝা যায়নি। বাড়ির কোনাটা পার হয়ে খোলা জায়গায় গিয়ে পড়তেই মনে হল বাতাসের টানে যেন আমরা উড়ে যাব। তাড়াতাড়ি একটা ল্যাম্পপোস্টকে জড়িয়ে ধরলাম আমরা। ওইভাবেই সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম যতক্ষণ না দারোয়ান কয়েকজন প্রতিবেশীকে সঙ্গে করে এনে আমাদের উদ্ধার করল। ওই মহাবিপর্যয়ের মধ্যেও নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ সমুদ্র দেখে আমরা তো হতবাক। অবশেষে আমরা বুঝতে পারলাম ঈশ্বর অন্য কিছু ইচ্ছা না করা পর্যন্ত বাড়ির ভিতরেই থাকাটা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

দু' দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর আমাদের ধারণা হল ওই বাতাস কোনও প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়, আমাদের প্রতি কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ। কেবল আমাদের উপরই যেন সব ক্ষোভ। দারোয়ান দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার আমাদের দেখে যায়, খোঁজখবর নেয়। আমাদের মানসিক অবস্থা নিয়ে সে যথেষ্ট চিন্তিত। আমাদের কাছে আসার সময় তার হাতে থাকে কিছু মরশুমি ফল আর বাচ্চাদের জন্যে ক্যান্ডি। খরগোশের মাংস আর শামুক দিয়ে পরিপাটি মধ্যাহ্নভোজ হল মঙ্গলবার। এটা কাতালোনিয়ান বন্ধনপ্রণালীর অন্যতম সেরা অবদান। রান্নাঘরের একটা ছোট্ট টিনের পাত্রে করে সে এটা রেঁধেছে। আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় এ এক মহাভোজ।

বুধবার কোনও কিছু ঘটেনি। তবে ঝোড়ো বাতাস তখনও উদ্দাম। ওই দিনটি আমার জীবনের দীর্ঘতম দিন। এ যেন সকাল হবার আগেকার অন্ধকার। মাঝরাতের পর সকলে একসঙ্গে জেগে গেলাম। চারদিকের নিঃসীম নীরবতায় আমরা অভিভূত। শুধু মৃত্যুর সঙ্গেই এই নিস্তব্ধতার তুলনা করা যেতে পারে। পাহাড়ের দিকের গাছগুলোর একটা পাতাও নড়ছে না। তখনও দারোয়ানের ঘরে আলো জ্বলেনি। আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। প্রাণভরে উপভোগ করলাম ভোর হওয়ার আগেকার আকাশ, উজ্জ্বল তারাদের এবং ঢেউয়ের চূড়ায় ফসফরাসের আলো চমকানো সমুদ্রকে। ঘড়িতে তখনও পাঁচটা বাজেনি। শেষ পর্যন্ত পরিত্রাণ পাওয়া গেছে এই আনন্দে পর্যটকদের অনেকে পাথর ছড়ানো বালুকাবেলায় ভিড় জমিয়েছে। কয়েকদিন শাস্তিভোগের পর পালতোলা নৌকোগুলোর পাল-মাস্তুল-দড়িদড়া ঠিকঠাক করা

হচ্ছে।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় দারোয়ানের ঘরে আলো না জ্বলার বিষয়টাকে গুরুত্ব দিইনি। ফিরে আসার সময় সমুদ্রের মতো বাতাসেও ছড়িয়ে পড়ছে ফসফরাসের ঝিকিমিকি। কিন্তু দারোয়ানের ঘরটা অন্ধকার। ব্যাপারটা ভালো ঠেকল না। দরজায় বার দুই টোকা দিলাম। কোনও উত্তর নেই। এবার দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। আমার বিশ্বাস, ছেলেরাই প্রথমে তাকে দেখতে পায়। ওদের ভয়ার্ত চিৎকার কানে এল। নাবিকের পোশাক পরিহিত বৃদ্ধ দারোয়ানটি যার জ্যাকেটের কলারে বিশিষ্ট নাবিকের তকমা আঁটা, ঘরের মাঝখানে বরগা থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। ত্রামোন্তানার দমকা হাওয়ায় তখনও তার শরীরটা দুলছে।

আমাদের ছুটির তখনও অর্ধেক বাকি। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই আর কখনও ফিরে না আসার প্রতিজ্ঞা করে আমরা চলে এলাম কাদাকেস ছেড়ে। যদিও আমরা নিশ্চিতভাবে জানতাম যে ফিরে আসার টান বরাবরের জন্যেই থেকে যাবে আমাদের মনে। পর্যটকেরা তখন আবার বেরিয়ে পড়েছে। প্রাক্তন সৈন্যদের চত্বরে গান বাজছে। তবে অভিজ্ঞ প্রৌঢ়দের আর বোলিং-পিনস্ খেলায় উৎসাহ নেই। মার্তিনিস্ পানশালার ধুলোমাখা জানালা দিয়ে এক ঝলক নজর করতেই চোখে পড়ল বেশ কয়েকজন ভাগ্যবান বন্ধুকে, যারা বেঁচে গেছে এবং সেই উজ্জ্বল ত্রামোন্তানার বসন্তে নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে। এসব বহুদিন আগেকার কথা।

এইজন্যেই বোক্কাসিও ক্লাবে সকাল হওয়ার আগেকার সেই বিষণ্ণ সময়ে আমিই একমাত্র বুঝতে পেরেছিলাম কী সেই আতঙ্ক যার জন্যে কাদাকেসে ফিরে যেতে ছেলেটির এত আপত্তি। সে নিশ্চিতভাবে জানত,—তাহলে সে মরবে। কিন্তু সুইডিশ্দের নিরস্ত করার কোনও উপায় নেই। তারা ছেলেটিকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। ওদের ইউরোপীয় মানসিকতা থেকে ওরা ধরে নিয়েছে যে গায়ের জোরে আফ্রিকার কুসংস্কার থেকে ছেলেটিকে মুক্ত করবে। তবে ওদের সঙ্গীসাথিদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বাহবা দিচ্ছে আবার কেউ বিদ্রূপ করছে। এমন অবস্থার মধ্যেই ওরা ছেলেটিকে ভ্যানে চড়িয়ে দিল। আপত্তি জানিয়ে সে ক্রমাগত পা ছুঁড়ছে। কাদাকেসের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার জন্যে একদল মাতাল ভর্তি সেই ভ্যানটা রওনা দিল।

পরের দিন সকালে টেলিফোনের ঘণ্টাধ্বনিতে ঘুম ভাঙল। রাতের পানভোজন থেকে ফিরে এসে জানালার পর্দা টেনে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। কটা বাজে জানি না। তবে গরমকালের ঝকঝকে আলোয় শোবার ঘরটা ঝলমল করছে। ফোনে ভেসে এল অপরিচিত কিন্তু উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর। 'কাল রাতে যে ছেলেটাকে ওরা কাদাকেসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, মনে পড়ছে?'

আর কিছুই শোনার দরকার নেই। শুধু ওই কথাটি ছাড়া যা ঘটেছে আমার দুর্ভাবনা এবং কল্পনার চেয়েও তা অনেক বেশি মর্মান্তিক। কাদাকেসের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার একটু আগে বুদ্ধিভ্রংশ সুইডিশ্ যুবকদের মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগে ভীত-সন্ত্রস্ত ছেলেটি অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার চেষ্টায় চলন্ত গাড়ির থেকে লাফিয়ে পড়েছে গভীর খাদের মধ্যে।

মূল শিরোনাম Tramontana

সেন্ট

মার্গারিতো দুয়ার্তোব সঙ্গে আবার দেখা হল বাইশ বছর পর। রোমের বনেদি বাসিন্দাদের মতো নম্র-বিনীত আচরণ এবং খটোমটো কাস্তালিয়ান উচ্চারণের জন্যে ত্রাসতেভেরের এক সরু গলি থেকে বেবিয়ে আসা মানুষটাকে প্রথমে চিনতে বেশ অসুবিধে হয়েছিল। আন্দিজ পর্বতমালা এলাকার প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদেব মতো কালো আলখাল্লা পরিহিত বিষণ্ণ স্বভাবের যে মার্গারিতো দুয়ার্তোর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, তাব সঙ্গে হালকা হয়ে আসা সাদা চুল, বিচিত্র পোশাক এবং অদ্ভুত হাবভাবের এই মানুষটার কোনও মিল নেই। খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার পরে ধীবে ধীরে মনের তলায় চাপা পড়ে থাকা তার পুরোনো চেহারাটা পুনরুদ্ধার করা গেল। চাপা স্বভাব, দুর্জ্ঞেয় এবং খনি-শ্রমিকের মতো যে কোনও কাজে লেগে থাকার ক্ষমতা মেশানো তার যে ছবিটা মনে ছিল, সবটাই মিলে গেল। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে যে প্রশ্নটা বারেবারেই মনের মধ্যে ঘুবে বেড়াচ্ছিল, আমাদের এতদিনেব পরিচিত পানশালায় দ্বিতীযবার কফি পরিবেশনেব কথা বলার আগে, শেষ পর্যন্ত সাহস করেই তা জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

'তোমার সেন্ট কন্যার কী হল?'

'কেন, ও তো এখানেই',—বলে সে আমার দিকে আগ্রহভবে তাকাল।

তাব উত্তরের অসীম মানবিক গুরুত্ব সম্বন্ধে টেনর গায়ক রাফায়েল রিবেরো সিলভা আর আমি অবহিত। তার জীবনবৃত্তান্ত গভীরভাবে জানাব জন্যে অনেক সমযই মনে হয লেখকের সন্ধানরত একটি চরিত্রের নাম মার্গারিতো দুয়ার্তো। আবার এমন একটি চরিত্রের প্রতীক্ষায় আমরা ঔপন্যাসিকেরাও সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পাবি। তার কাহিনির শেষ অংশটুকু প্রায় অকল্পনীয় এবং বোধগম্য না হওয়ার জন্যেই সম্ভবত তাকে আমি বরাবরের জন্যে হাবিয়ে যেতে দিয়েছি।

উজ্জ্বল এক বসন্তে মার্গারিতো দুয়ার্তো রোম শহরে এসে পৌঁছোয়। পোপ দ্বাদশ পায়াস্ তখন হেঁচকি তোলাব অসুখে আক্রান্ত। ছোট-বড় সব চিকিৎসক এমনকি ওঝাবাও তাঁকে সারিয়ে তুলতে ব্যর্থ। কলোম্বিয়ার আন্দিজ পর্বতমালার কোলের ছোট্ট গ্রাম তোলিমা থেকে সেই প্রথম মার্গারিতোর বাইবে বেরিয়ে আসা। শোওয়ার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যেত যে শহরের হাওয়া তার গায়ে লাগেনি।

এক সকালে আমাদের রাষ্ট্রদূতের কাছে পালিশ করা পাইন কাঠের একটি বড় বাক্স নিয়ে সে উপস্থিত। চেহারা এবং মাপ দেখে মনে হচ্ছিল সেটা চেলো জাতীয় কোনও বাদ্যযন্ত্র রাখার বাক্স। তার রোমে আসার অদ্ভুত উদ্দেশ্যের কথা শুনে রাষ্ট্রদূত নিজের দেশেব টেনব গায়ক রাফায়েল রিবেরো সিলভাকে ফোন করলেন। তাঁর অনুরোধ,—আমাদেব অতিথিশালায় মার্গারিতোর জন্যে যেন একটা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবেই তার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়।

মার্গারিতো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হয়নি। তবে সাহিত্যে আন্তরিক আগ্রহ থাকার জন্যে এবং যে কোনও মুদ্রিত কাগজ গভীর মনোযোগ নিয়ে পড়ে ফেলার ইচ্ছে থাকায় সে যথেষ্ট শিক্ষা অর্জন করতে পেবেছিল। আঠারো বছর বয়সে পৌবসভার কেরানির কাজ করার সময় সে একটি সুন্দরী মেযেকে বিয়ে করে। কিছুদিন বাদে প্রথম মেয়ের জন্মের সময তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মায়ের থেকে অনেক বেশি রূপসী মেয়েটি মাত্র সাত বছর বয়সেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

বাঁধ নির্মাণেব জন্যে মার্গারিতোদের এলাকার সমাধিক্ষেত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায রোমে আসার মাস ছয়েক আগে মার্গারিতো দুয়ার্তোর প্রকৃত কাহিনির সূচনা। অন্যান্যদের মতো মার্গারিতো দুয়ার্তোও তার প্রয়াত আত্মীয়-পরিজনদের দেহ পুরোনো সমাধি থেকে তুলে নতুন

সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যেতে এসেছিল। তার স্ত্রীর শবদেহ ধুলোয় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়,—পাশের সমাধিতে শায়িত তার মেয়ের নশ্বর দেহ এগারো বছর পরেও সম্পূর্ণ অবিকৃত। তাছাড়া সমাধিস্থ করার সময় যে গোলাপের স্তবকগুলো কফিনের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছিল, ডালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব তাজা ফুলের এক ঝলক সুবাস ছড়িয়ে পড়ল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল মৃতদেহটি একেবারে ওজনবিহীন।

খবর ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামে। অলৌকিক ঘটনার টানে শত শত কৌতূহলী দর্শক গ্রামে হাজির। দেহটি যে একেবারে অবিকৃত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। অবিকৃত মৃতদেহ নিঃসন্দেহে পবিত্রতার নিশ্চিত লক্ষণ। স্থানীয় পাদ্রিকেও মানতে হল যে এরকম অলৌকিক ঘটনা নিশ্চয়ই ভ্যাটিকানের পর্যবেক্ষণ ও অভিমত দাবি করতে পারে। শুধুমাত্র তার বা গ্রামের তরফে নয় সারা দেশের হয়ে এই অলৌকিক ঘটনার স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে মার্গারিতোকে রোমে পাঠানোর জন্যে চাঁদা তোলা শুরু হল।

‘পারিওলি’-র শান্ত পরিবেশের অতিথিশালায় বসে এই কাহিনি শোনাতে শোনাতে মার্গারিতো দুয়ার্তো তালা খুলে বাক্সটির ডালা তুলে ধরল। এভাবেই টেনর গায়ক রাফায়েল রিবেরো সিলভা এবং আমার অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। পৃথিবীর অনেক জাদুঘরে যেমন বিশুষ্ক মমি দেখা যায় মেয়েটিকে কিন্তু মোটেও সেরকম মনে হচ্ছিল না। বরং মনে হল সে যেন বিয়ের পোশাক পরে মাটির তলায় ঘুমিয়ে আছে এবং আরও অনেকদিন এভাবেই ঘুমিয়ে থাকতে চায়। তার উষ্ণ ও মোলায়েম ত্বক এবং দু'নয়নের স্বচ্ছ চাহনি এক অসহনীয় অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল। যেন মৃত্যুর ওপার থেকে তারা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। সমাধি দেওয়ার সময় সুন্দর দেখালেও রেশমি কাপড় আর নকল কমলালেবুর ফুল দিয়ে তৈরি মাথার মুকুটটি সময়ের ধ্বংসলীলা ঠেকাতে তেমন সফল হয়নি। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা হল,—মেয়েটির দেহ পাইন কাঠের বাক্স থেকে বের করে আনার পরও বাক্সটির ওজনের কোনও পরিবর্তন হল না।

রোমে পৌঁছোনোর পরদিন থেকেই কাজে নেমে পড়ল মার্গারিতো দুয়ার্তো। নেহাতই দয়াপরবশ হয়ে দেশের বৈদেশিক বিভাগ প্রথম দিকে তাকে সাহায্য করেছিল। তবে তাতে কোনও লাভ হয়নি। কাজেই বাধ্য হয়ে ভ্যাটিকানে প্রবেশের অজস্র বাধা অতিক্রম করতে তাকে নানারকমের কৌশল করতে হল। অবশ্য নিজের সমস্ত প্রচেষ্টা সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষায় সে সদাসতর্ক। আমরা শুধু জানতাম যে তার কোনও উদ্যোগই সফল হয়নি। লড়াইটা চালানোর সময় অনেক ধর্মীয় সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে সে যোগাযোগ করেছিল। সকলেই মন দিয়ে তার কথা শুনলেও কেউই বিস্ময় প্রকাশ করেনি। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও কেউ কিন্তু তা কার্যকরী করেনি।

আসলে, এই বিষয়ে কিছু করার জন্যে ওই সময়টা মোটেও আদর্শ ছিল না। ভ্যাটিকানের সঙ্গে যুক্ত সকলেই পোপ সেরে না ওঠা পর্যন্ত কোনও বিষয়েই নজর দিতে রাজি নয়। কোনওমতেই জব্দ করা যাচ্ছে না হেঁচকির আক্রমণকে। উন্নত চিকিৎসাশাস্ত্র অনুমোদিত উচ্চমানের ওষুধ বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পাঠানো নানারকমের টোটকা কিংবা দাওয়াই, কোনও কিছুই কাজে আসছে না।

চিকিৎসায় কোনও ফল না হওয়ায় পোপ দ্বাদশ পায়াস্ জুলাই মাসে ‘কাস্তেল গানদোলফো’-তে গরমের ছুটি কাটানোর জন্যে রওনা দিলেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর পুণ্যার্থীদের সাপ্তাহিক দর্শন দেওয়ার জন্যে পোপ যেদিন প্রথম বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন মার্গারিতো সেদিন তার সেন্ট কন্যাকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিল। পোপের এত কাছাকাছি সে পৌঁছোতে পেরেছিল যে সযত্নে পালিশ করা পোপের আঙুলের নখগুলিও মার্গারিতো দেখতে পাচ্ছিল। পোপের পোশাক-আশাক-শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়া ল্যাভেন্ডারের সুগন্ধও তার নাকে আসছিল। মার্গারিতোর আশানুসারে পোপ কিন্তু সেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা পর্যটকদের সমাবেশের মধ্যে দিয়ে হেঁটে না গিয়ে ছ'টি ভাষায় ভাষণ দিয়ে, সকলকে আশীর্বাদ জানিয়ে সমাপ্ত করলেন তাঁর সাপ্তাহিক দর্শন।

সাপ্তাহিক দর্শন বাতিল হওয়ার ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকায় অনেক দেরি হয়ে যায়। তখন

মার্গারিতো ঠিক করে যা কিছু করার নিজেকেই করতে হবে। সে ভ্যাটিকানের স্বরাষ্ট্র সচিবকে উদ্দেশ্য করে যাট পৃষ্ঠার একটি চিঠি লিখে যথাস্থানে জমা দিয়ে এল। এবং কোনও উত্তর পেল না। তবে মার্গারিতোর অনুমান এই হাতে লেখা চিঠির জন্যেই ভ্যাটিকানের কোনও এক আধিকারিকের সঙ্গে তাকে দেখা করতে বলা হয়েছিল। নেহাত নিয়মরক্ষার জন্যে আধিকারিকটি বাক্সে শায়িত মেয়েটির মৃতদেহের দিকে এক দায়সারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দায়িত্ব সাবলেন। অন্যেরা যাতায়াতের পথে ভাবলেশহীন চোখে মরদেহটি দেখতে থাকল। এদের মধ্যে একজন মার্গারিতোকে জানিয়ে দিল যে গত বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শ' আষ্টেক অবিকৃত শবদেহকে সেন্ট হিসেবে ঘোষণা করার আবেদন এসেছে। তবুও মার্গারিতো মরদেহটির ভারশূন্যতা পরীক্ষা করার জন্যে অনুরোধ করল। আধিকারিকটি পরীক্ষা করলেও কোনও মন্তব্য করতে রাজি হলেন না।

তিনি বললেন,—'এটা নিশ্চয়ই যৌথ বিবেচনার বিষয়।'

গ্রীষ্মের কর্মহীন ববিবারের দুপুরবেলা আব অন্যান্য দিনের অবসর সময়টুকু ঘবে বসে বই পড়ে কাটিয়ে দেয় মার্গারিতো। অবশ্যই সেই সব বই যা তার লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। প্রতি মাসেব শেষে সে হিসেব নিয়ে বসে। তার গ্রামের যেসব লোকেরা চাঁদা দিয়েছিল তাদের জানানোর জন্যে মুক্তোর মতো ঝকঝকে হস্তাক্ষরে অভিজ্ঞ কেরানির কায়দায় খরচাপাতির হিসেব লেখে মার্গারিতো। বছরখানেকেব মধ্যেই বোম শহরের গোলকধাঁধা সে এমনভাবে জেনে গেল যেন এই শহরেই তাঁর জন্ম-কম্ম। আন্দিজ পর্বতমালা এলাকার স্প্যানিশের মতো সীমিত শব্দের সহজ ইতালিয়ান ভাষাতেও সে যথেষ্ট দক্ষ। এবং সেন্টেব মাহাত্ম্য প্রদান প্রক্রিয়া সম্পর্কেও সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। অবশ্য শোকের পোশাক ছেড়ে ফেলতে তার অনেক বেশি সময় লেগেছিল। ওয়েস্টকোট এবং বিচাবকের টুপি পরিহিত লোকেদেব তখনকার বোমে সন্দেহজনক গুপ্ত সংস্থার সদস্য বলে মনে করা হত। সেন্টেব দেহসমেত বাক্সটা নিয়ে খুব সকালবেলায় বেরিয়ে বিষাদ-ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে মাঝে মধ্যে বেশ রাত করে সে যখন বাড়ি ফেবে তখন আগামী দিনের নতুন আশায় নিজেকে অনুপ্রাণিত কবার জন্যে তার চোখে কিন্তু ঝিলিক মারে এক চিলতে আলোর ফুলকি।

'সেন্টরা বাঁচে নিজেদের সময়ে',—সে বলে যায়।

আমাব সেই প্রথম রোম সফর। পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র কেন্দ্রেব ছাত্র হিসেবে এক অভাবনীয় তীব্র যন্ত্রণাময় জীবন কাটাচ্ছি। 'ভিল্লা বোর্গেসে'-ব থেকে কয়েক পা দূরে আমাদেব বাসস্থানটি আসলে এক আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট। অ্যাপার্টমেন্টটির দুটি ঘর বিদেশি ছাত্রদের ভাডা দেওয়া হত আর অন্য দুটি ঘরে থাকতেন বাড়ির মালিক, আমরা যাঁকে মারিয়া বেল্লা বলে ডাকতাম। জীবনের হেমন্তকাল পেবিয়ে এসেও প্রাণপ্রাচুর্যে পবিপূর্ণ সুন্দরী এই মহিলা শ্রদ্ধার সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-বিধি,—'প্রত্যেক মানুষই নিজের ঘরে নিরঙ্কুশ প্রভু',—মেনে চলেন। আসলে তাঁর বোন আমাদের আন্তোনিয়েত্তো মাসি ছিলেন সত্যিকারের ডানাকাটা পরী। বাড়ির যাবতীয় দৈনন্দিন কাজ তাঁব হেপাজতে। বালতি, ঝাঁটা, ঘরমোছার ন্যাতা নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে-বেড়িয়ে মার্বেলের মেঝে ঘষে মেজে আয়নাব মতো ঝকঝকে রাখেন তিনি। তিতির পাখি কীভাবে খেতে হয় তা তিনিই আমাদের শিখিয়েছিলেন। যুদ্ধেব সময় আয়ত্ত করা পাখি শিকারের বদ অভ্যাস ছাড়তে পারেননি তাঁর স্বামী বার্তোলিনো। মারিয়া বেল্লার বাড়িতে থাকার জন্যে অর্থসংস্থান যখন মার্গারিতোর পক্ষে আর সম্ভবপর হচ্ছিল না তখন এই আন্তোনিয়েত্তা মাসিই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

নিয়ম-শৃঙ্খলার শাসনমুক্ত আমাদের ছাত্রাবাসটি মার্গাবিতোর পক্ষে আদর্শ। প্রতি মুহূর্তে এখানে নতুন কিছু ঘটে, এমনকি ভোরবেলায় যখন ভিল্লা বোর্গেসের চিড়িয়াখানা থেকে সিংহের ভয়ানক গর্জন আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, তখনও। টেনর গায়ক বিবেরোর গান বোমবাসীদেব পছন্দ বলে সকালবেলায় তার সংগীতসাধনায় কারওবই কোনও আপত্তি নেই। সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অবিশ্যি শুরু হত না তার গলা সাধার কার্যক্রম। ওষুধিযুক্ত বরফের মতো ঠান্ডা জলে স্নান করে, শয়তানের মতো ঘন চাপ দাড়ি ও ভুরু ছেঁটে, স্কটিশ নকশাব ড্রেসিং গাউন পরে, গলায় চিনা সিল্কেব

স্কার্ফ জড়িয়ে এবং গায়ে সুগন্ধি ছড়িয়ে দেওয়ার পরেই রিবেরো নিজেকে রেওয়াজের জন্যে প্রস্তুত বলে মনে করত। আর তখনই সে সম্পূর্ণভাবে সংগীতের মধ্যে সমর্পণ করত নিজেকে। শীতের আকাশে তখনও ভোরের তারারা জ্বলজ্বল করছে। ঘরের জানালা খুলে দিয়ে প্রেমের গান গেয়ে গলা গরম করে রিবেরো। আস্তে আস্তে খুলতে থাকত তাব গলা। রিবেরো সিলভার বুকের ভিতর থেকে 'ডো' ধ্বনি বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন সঙ্গত হিসেবে শোনা যাবে ভিল্লা বোর্গেসের সিংহের পৃথিবী কাঁপানো গর্জন,—এমনই ছিল আমাদের প্রত্যেকদিনের প্রত্যাশা।

যারপরনাই বিস্মিত হয়ে আন্তোনিয়েত্তো মাসি রিবেরোকে বলেছিলেন,—তুমি বাছা নিশ্চয়ই সেন্ট মার্কের অবতার। একমাত্র তিনিই সিংহের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারতেন।

কিন্তু এক সকালবেলায় সিংহ নয় অন্য কারও কাছ থেকে উত্তর এল। ওথেলোর দ্বৈত প্রেমসংগীত,— 'গভীর রাতে থেমে গেছে শব্দ...',—দিয়ে রেওয়াজ শুরু করেছিল টেনর গায়ক। হঠাৎ উঠোনের অন্য দিক থেকে সোপ্রানোর মনোরম কণ্ঠে উত্তর ভেসে এল। একবারের জন্যেও না থেমে টেনর গায়ক রিবেরো তার গান চালিয়ে গেল। ফলে আশপাশেব বাসিন্দারা যারা প্রেমের এই অপ্রতিরোধ্য স্রোত তাদের বাড়িকে পবিত্র করবে বলে সব জানালা খুলে দিয়েছিল, যেন তাদেরই শান্তির ঝরনাধারা উপহার দেওয়ার জন্যে গানটি দ্বৈতকণ্ঠেই পরিবেশিত হল। টেনর গায়ক রিবেরো সিলভা যখন জানতে পাবল যে তার অদৃশ্য দেস্‌দেমোনা মহান গায়িকা মারিয়া কানিলিয়া ছাড়া অন্য কেউ নয়, তখন তো তার অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা।

আমার ধারণা এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়েই মার্গারিতো দুয়ার্তো অ্যাপার্টমেন্টের জীবনযাপন প্রক্রিয়ার মূলধারায় জড়িয়ে পড়ে। কারণ, এরপর থেকেই সে রান্নাঘরের বদলে সকলের সঙ্গে যৌথ টেবিলে বসে আগের মতো খাওয়াদাওয়া শুরু করে। আন্তোনিয়েত্তো মাসি তাকে রান্নাঘরে বসিয়ে তিতির পাখির চমৎকাব স্ট্যু খাওয়াতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় নৈশভোজের পর আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে ইতালিয়ান ধ্বনির সঙ্গে পরিচিত করে তোলাব জন্যে মারিয়া বেল্লা নিয়ম করে সেই দিনের খবরের কাগজ পড়ে শোনাতেন। এরকম খবরের কাগজ পড়ার সময় একদিন মারিয়া বেল্লা বললেন যে পালেরমো শহরের কাপুচিন সমাধিক্ষেত্র থেকে একাধিক বিশপসহ কিছু নারী-পুরুষ-শিশুর অবিকৃত মৃতদেহ তুলে এনে একটি সংগ্রহশালা কবা হয়েছে। খবরটা শুনে মার্গারিতো এমন বিচলিত হয়ে পড়ে যে পালেরমো না যাওয়া পর্যন্ত তাব মনে এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তি ছিল না। প্রায় অন্ধকার সংগ্রহশালায রক্ষিত মমিগুলো নিজের চোখে দেখাব পর অবিশ্যি তার মনে আবার বল ফিরে আসে।

'ওরা কেউই আমার মেয়ের মতো নয়',—সে বলল। 'দেখলেই বোঝা যায় ওরা সকলেই মৃত।'

মধ্যাহ্নভোজনের পরে রোম শহর সাধারণত ঘুমিয়ে পড়ে। আকাশের মাঝখানে তখন মধ্যদিনেব স্থির সূর্য। বেলা দুটো নাগাদ নিঃঝুম নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কেবল ভেসে আসে রোম শহরের একেবাবে নিজস্ব, জলের কলতান। কিন্তু সন্ধ্যা সাতটা বাজতে না বাজতেই সব জানালা খুলে যায়। শীতল বাতাসকে অভ্যর্থনার জন্যে আমুদে লোকেরা কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই শুধু জীবনকে উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায। তাদের চাবপাশে ছড়িয়ে থাকে মোটর সাইকেলের বিকট আওয়াজ, তরমুজ বিক্রেতাদের চিৎকার আর ফুলে ছাওয়া ছাদ থেকে ভেসে আসা প্রেমসংগীতেব মূর্ছনা।

টেনর গায়ক রিবেরো সিলভা আর আমি দুপুবে ঘুমোতাম না। স্কুটার নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়তাম। চালক টেনর গায়ক আর পিছনে আমি। প্রখর গ্রীষ্মে প্রজাপতির মতো ভেসে বেড়ানো বারবনিতারা ভিল্লা বোর্গেসের শতাব্দী প্রাচীন ফুলের কারুকাজ করা দালানের ছায়ায় পর্যটকের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। আমরা তাদের জন্যে আইসক্রিম আর চকোলেট নিয়ে যেতাম। অধিকাংশই সুন্দরী, দরিদ্র এবং সাধারণ ইতালিয়ানদের মতোই আন্তবিক। নীল অরগ্যান্ডি, গোলাপি পপলিন আব সবুজ লিনেনের পোশাক পরে মাথায় পোকায় কাটা ছাতা দিয়ে তারা রোদেব ঝাঁজ থেকে নিজেদের বাঁচাত। তাদের সঙ্গ সত্যি সত্যিই আনন্দদায়ক। অনেক সময়েই শুধু আমাদের সঙ্গে কফি খেতে খেতে আড্ডা মারার জন্যে বা ভাড়া কবা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে পার্কের সরু সরু গলিপথ ধরে বেড়ানোর নির্মল আনন্দ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে

তারা ব্যাবসার নিয়ম এড়িয়ে শাঁসালো খদ্দেরদের পর্যন্ত ফিরিয়ে দিত। রাজ্যহীন রাজা এবং তাদের দুঃখী প্রেমিকার মতো যারা দুপুরবেলা ওই পথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত তাদের জন্যে সমবেদনা জানানোও আমাদের অন্যতম কাজ। ওদের হয়ে কখনও কখনও উচ্ছৃঙ্খল আমেরিকান খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলার সময় দোভাষীর কাজও করেছি।

ওদের সঙ্গে আলাপ করানোর জন্যে নয়, ভিল্লা বোর্গেসে মার্গারিতো দুয়ার্তোকে নিয়ে যাওয়ার কারণ সিংহ দেখানো। চারদিকে গভীর পরিখা দিয়ে ঘেরা একটি ছোট দ্বীপে স্বাধীনভাবে বিচরণ করত সিংহটি। সেদিন পরিখার অপর পারে দর্শকদের উপস্থিতি টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহটা এমন উদ্বিগ্নভাবে গর্জন শুরু করল যে সিংহটির পরিচারকও অবাক হয়ে গেল। চারদিক থেকে দর্শকের দল ভিড় করে ঘিরে দাঁড়াল। টেনর গায়ক বুকের অন্তঃস্থল থেকে ভোরের রেওয়াজের 'ডো' ধ্বনি বের করে সিংহকে নিজের পরিচয় স্মরণ করাতে চাইল। কিন্তু সিংহটি কিছুই গ্রাহ্য করল না। মনে হচ্ছিল সে আমাদের সকলের উদ্দেশ্যেই গর্জন করছে। কিন্তু সিংহের পরিচারক সঠিকভাবেই বুঝতে পারে যে মার্গারিতোর জন্যেই এমন গর্জন। মার্গারিতো যেদিকে যায় সিংহ গর্জন করতে করতে সেদিকেই ছোটে। মার্গারিতো লুকিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় গর্জন। সিয়েন্না বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্রুপদী সাহিত্যে ডক্টরেট করে আসা পরিচারকের ধারণা মার্গারিতো নিশ্চয়ই সেদিন অন্য কোনও সিংহের কাছাকাছি গিয়েছিল এবং ভিল্লা বোর্গেসের সিংহটি মার্গারিতোর গায়ে সেই সিংহের গন্ধ পেয়েই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। অবাস্তব ও অযৌক্তিক এই ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই তার মাথায় আসেনি।

'যাই হোক',—বলে সে ব্যাপারটাকে হালকা করার চেষ্টা করে। 'তবে এটা কোনও আক্রমণাত্মক হুংকার নয়, সহানুভূতির প্রকাশ।'

এই অলৌকিক ঘটনাটি নয়, রিবেরো সিলভার মনে কিন্তু দাগ কেটেছিল পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময়কার দুয়ার্তোর উত্তেজিত চেহারা। খাবার টেবিলে রিবেরো সিলভাই কথাটা প্রথম পাড়ল। এবং আমরা সবাই, কেউ পরিহাস করে আবার কেউ সহানুভূতির সঙ্গে স্বীকার করলাম যে দুয়ার্তোর একাকিত্বের সমস্যা সমাধানের জন্যে আমাদের সাহায্য করা উচিত। দুয়ার্তোর সম্পর্কে আমাদের আন্তরিক উৎকণ্ঠার পরিচয় পেয়ে মারিয়া বেল্লার মধ্যে যেন বাইবেলে বর্ণিত স্নেহময়ী মাতৃত্ব ফুটে উঠল। কাল্পনিক আংটি পরা হাত নিজের বুকে ছুঁইয়ে তিনি বললেন,—'ওয়েস্টকোট পরা পুরুষ আমার পছন্দ হলে আমি নিজেই দয়াপরবশ হয়ে এ কাজ করতাম।'

ঠিক করা হল দুপুর দুটো নাগাদ ভিল্লা বোর্গেসে যাবে টেনর গায়ক রিবেরো সিলভা। স্কুটারের পিছনে চড়িয়ে সে একজন বারবনিতাকে নিয়ে এল যাকে দেখে মনে হচ্ছিল দুয়ার্তোকে ঘণ্টাখানেক আনন্দ দেওয়ার পক্ষে সে-ই সবচেয়ে উপযুক্ত। জামাকাপড় খুলিয়ে, সুগন্ধি সাবান দিয়ে রিবেরো তাকে স্নান করাল। ভালো করে গা মুছিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে দিল ওডিকোলন। যে সময় ধরে এসব করা হল তার জন্যে এবং আরও এক ঘণ্টার পারিশ্রমিক হিসেব করে বিশদ নির্দেশ দিয়ে মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দুয়ার্তোর ঘরে।

পা টিপে টিপে আলো-আঁধারির মধ্যে নগ্ন সুন্দরী দিবানিদ্রার স্বপ্নের মতো বাড়ির পিছন দিকের একটা ঘরের দরজায় বার দুই টোকা দিল। খালি গায়ে এবং খালি পায়ে দরজা খুলে দিল মার্গারিতো দুয়ার্তো।

'নমস্কার স্যার, শুভ সন্ধ্যা',—কিশোরীর মতো সলাজ ভঙ্গিতে কথা শুরু করে সে বলল। 'টেনর আমায় পাঠিয়েছে।'

অত্যন্ত মার্জিতভাবে বিস্ময় কাটিয়ে উঠে মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে এল মার্গারিতো। ঘরে ঢুকেই মেয়েটি টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। সসম্মানে মেয়েটিকে অভিবাদন জানানোর জন্যে মার্গারিতো তখন তাড়াতাড়ি জামা আর জুতো পরে নিতে ব্যস্ত।

মেয়েটির পাশে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে মার্গারিতো কথাবার্তা শুরু করে। যারপরনাই বিস্মিত হয়ে মেয়েটি তাড়াতাড়ি কথা শেষ করতে অনুরোধ জানায়। কারণ হাতে সময় মাত্র এক ঘণ্টা। অবিশ্যি

এই ইঙ্গিতে সাড়া দেয়নি মার্গারিতো। মার্গারিতোর মতো ভদ্র আচরণকারী কাউকে পৃথিবীতে দেখেনি বলে পরে মেয়েটি আমাদের জানিয়েছিল। আসলে মার্গারিতোর চাহিদাই ছিল অতি সামান্য,—নিখরচায় কিছু না করে মেয়েটির সঙ্গে নির্ভেজাল সময় কাটানো। কীভাবে সময় কাটাবে বুঝতে না পেরে মেয়েটি ঘরে কী কী আছে তা খুঁটিয়ে দেখছিল। ফায়ার প্লেসের কাছে একটা কাঠের বাক্স দেখে সে জিজ্ঞেস করল,—'ওটা কি স্যাক্সোফোন?' মার্গারিতো কোনও উত্তর না দিয়ে জানালার খড়খড়ি অর্ধেক খুলে দিল যাতে ঘরে যথেষ্ট আলো আসতে পারে। তারপর কাঠের বাক্সটা বিছানার ওপর রেখে খুলে দিল ডালাটা। মেয়েটি কিছু বলার চেষ্টা করলেও হতবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। পরে মেয়েটি আমাদের জানায় সে নাকি তখন জমে একেবারে বরফ হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে দিক ভুল করে সে বারান্দায় আন্তোনিয়েত্তোর সামনে গিয়ে পড়ল। আন্তোনিয়েত্তো তখন একটা বাল্‌ব পালটানোর জন্যে আমার ঘরের দিকে আসছিলেন। দু'জনেই প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল। মেয়েটি তো এত ভয় পেয়েছিল যে সন্ধে হয়ে যাওয়ার পরেও সাহস করে সে টেনর গায়কের ঘর থেকে বেরোতে পারছিল না।

আসল ব্যাপারটা কী হয়েছিল আন্তোনিয়েত্তো মাসি তা আঁচ করতে পারেননি। আমার ঘরে তিনি অত্যন্ত ভয়ার্ত অবস্থায় এসেছিলেন। হাত কাঁপছে। ভালো করে বাল্‌বটাও লাগাতে পারছিলেন না। কী হয়েছে জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন,—'এ বাড়িতে রাতের বেলায় ভূতের উৎপাত আছে বলে জানতাম। কিন্তু এখন দেখছি তা দিন-দুপুরেও শুরু হয়েছে।' খুব জোর দিয়ে তিনি জানালেন যে যুদ্ধের সময় এই বাড়ির বাসিন্দা এক জার্মান অফিসার তার প্রেমিকার গলা কেটে দিয়েছিল। এখন যে ঘরে টেনর গায়ক থাকে সেই ঘরেই ঘটনাটা ঘটেছিল বলে তিনি জানালেন। নানারকম ফাইফরমাশ তামিল করতে করতে অনেক সময়েই নাকি তিনি এক অশরীরী সুন্দরীকে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছেন।

'এইমাত্র অবিকল সেইরকম একটা মেয়েকে নগ্ন অবস্থায় বারান্দায় দেখলাম',—তিনি রীতিমতো দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে জানালেন।

শহর আবার ফিরে এল হেমন্তকালের ধরাবাঁধা নিত্যনৈমিত্তিকতায়। হেমন্তের প্রথম বাতাস বইতে শুরু হতে না হতেই ফুলে ছাওয়া ছাদের অনুষ্ঠান বন্ধ। টেনর গায়ক আর আমি ফিরে গেলাম ত্রাসতেভেরের পুরোনো রেস্তোরাঁয় যেখানে কাউন্ট কার্লো কালকানির গানের ছাত্ররা এবং আমাদের চলচ্চিত্র কেন্দ্রের সহপাঠীরা একসঙ্গে নৈশভোজ সারতাম। এদের মধ্যে সবচেয়ে নাছোড়বান্দা ছিল লাকিস্ নামের একটি দয়ালু ও বুদ্ধিমান গ্রিক ছেলে যার একমাত্র ত্রুটি,—সামাজিক অন্যায় সম্বন্ধে অনর্গল কথা বলে যাওয়ার প্রবণতা, যা শুনে সবার ঘুম পেয়ে যেত। ভাগ্যিস, বেশিরভাগ সময় টেনর এবং সোপ্রানো গায়কেরা বিভিন্ন অপেরার অংশবিশেষ খোলা গলায় গেয়ে তাকে কাবু করে দিত এবং মাঝরাত পেরিয়ে গেলেও কেউ বিরক্ত বোধ করত না। বরং, বেশি রাতের আমোদপ্রিয় কিছু লোক আমাদের রেস্তোরাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই সমবেত সংগীতে গলা মেলাত। আশপাশের বাড়ির বাসিন্দারা জানালা খুলে বাহবা জানাত।

এইরকম এক রাতে যখন পুরোদমে গান চলছে মার্গারিতো পা টিপে টিপে নিঃশব্দে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল যাতে সংগীতচর্চায় কোনও বিঘ্ন না ঘটে। বাড়ি ফেরার সময় না হওয়ায় পাইন কাঠের বাক্সটা সঙ্গেই রয়েছে। আমরা জানতাম তার সেন্ট কন্যাকে সে লেত্রানো শহরের সান্ গিওভান্নি গির্জার পাদ্রিকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। কারণ, ভ্যাটিকানের পবিত্র সংসদের উপর সেই পাদ্রির প্রভাব সুবিদিত। তেরছা চোখে দেখলাম সে বাক্সটাকে আলাদা একটা টেবিলের তলায় রেখে আমাদের গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে রইল। মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোরাঁ খালি হতে শুরু করে। তখন রোজকার মতো কয়েকটি টেবিল জড়ো করে অনেকে সমবেত সংগীত শুরু করতে চায়, কেউ আলোচনা করতে চায় চলচ্চিত্র সম্পর্কে, কেউ আবার গান এবং চলচ্চিত্র দুয়ের প্রতিই সমভাবাপন্ন—এইরকম সব গোষ্ঠীতে আমরা বিভক্ত হয়ে পড়লাম। রেস্তোরাঁয় মার্গারিতো দুয়ার্তো শান্ত স্বভাবের জনৈক কলোম্বিয়াবাসী বলে পরিচিত। ওর সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত না। কাঠের বাক্সটা দেখে লাকিসের কৌতূহল হয়েছিল বলে সে জানতে চায় মার্গারিতো চেলো বাজায় কিনা। এমন অবিমৃষ্যকারিতা

সামলানো শেষ পর্যন্ত মুশকিল হতে পারে ভেবে সন্ত্রস্ত হয়ে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। টেনর গায়কও আমার মতোই অস্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু সে ভেবে পাচ্ছিল না ব্যাপারটা কীভাবে মেটানো যায়। আমাদের অবাক করে দিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মার্গারিতো দুয়ার্তো উত্তর দিল,—'এটা চেলো নয়।'

টেবিলের ওপর বাক্সটা রেখে তালা খুলে ডালাটি তুলে ধরল দুয়ার্তো। মুহূর্তের মধ্যে পুরো রেস্তোরাঁয় যেন একটা শিহরন ছড়িয়ে পড়ল। এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্যে রেস্তোরাঁর বাদবাকি সমস্ত খদ্দের, ওয়েটার এমনকি অ্যাপ্রনে রক্তের ছোপ লাগা রান্নাঘরের কর্মচারীরা পর্যন্ত এসে জড়ো হল। তাদের মধ্যে অনেকে বুকে কাল্পনিক ক্রশ আঁকল। রান্নাঘরের এক মহিলা কর্মচারী তো ভাবাবিষ্ট অবস্থায় নতজানু হয়ে দু'হাত জড়ো করে নীরবে প্রার্থনা শুরু করে দিল।

প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাওয়ার পর আমরা রীতিমতো চড়া সুরে বর্তমান যুগে পবিত্রতার অভাব সম্পর্কে উত্তেজিত আলোচনা শুরু করে দিলাম। লাকিস্ যথারীতি সবচেয়ে বৈপ্লবিক মতামত ব্যক্ত করল। এবং শেষ পর্যন্ত সে পরিষ্কারভাবে জানাল যে সে 'সেন্ট' সংক্রান্ত বিষয়ে একটা সমালোচনামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চায়।

তারপরে অবিশ্যি সে নিজেই বলল,—'এরকম একটা বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করাব সুযোগ আমাদের মহান শিক্ষক সেজারে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবেন না।'

চলচ্চিত্রের ইতিহাসেব এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সেজারে জাভাত্তানির কথা লাকিস্ আমাদের বলেছিল। কাহিনি গড়ে তোলা এবং চিত্রনাট্য লেখার বিষয়ে তিনি আমাদের পড়াতেন। তিনিই একমাত্র শিক্ষক যিনি ক্লাসের বাইরেও আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখতেন। ছাযাছবি তৈরি করার কলাকৌশল কষ্ট করে শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করতেন যাতে আমরা একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনকে দেখতে শিখি। সত্যি সত্যিই তিনি ছিলেন ছায়াছবির কাহিনি গডে তোলার এক যন্ত্র। অনায়াসে এবং দ্রুতগতিতে তাঁর মাথা থেকে এত অসংখ্য কাহিনির উপাদান বেরিয়ে আসত অথবা তাঁর চিন্তা যেভাবে উচ্চারিত হত যে আমি ভাবতাম এই গল্পগুলো শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার আগে সেগুলোকে ধরে রাখার জন্যে জাভাত্তানিকে কাবও সাহায্য করা উচিত। যখন কোনও কাহিনি তাঁব মনে চূড়ান্ত চেহারা নিয়ে তৈরি হয়ে যেত তখনই তিনি খুব হতাশ হয়ে বলতেন,—'দুঃখের বিষয়, এবার এটাকে নিযে ছবি বানাতে হবে।' তাঁর ধাবণা চলচ্চিত্র তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে কাহিনিসূত্রের আসল মজাটাই নাকি হারিয়ে যায়। বিষয়বস্তু অনুযায়ী তাঁর মাথায় যখন যে চিন্তা ঘুরপাক খেত তা তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটা কার্ডে লিখে কার্ডটাকে দেওয়ালে আটকে দিতেন। এবকম কার্ড এত লেখা হয়েছিল যে তাঁর বাড়ির একটা ঘর ভবে গিয়েছিল।

মার্গারিতো দুয়ার্তোকে নিয়ে পরের শনিবার আমরা জাভাত্তানির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। জীবনের প্রতি তাঁর এত গভীব আস্থা যে টেলিফোনে বিষয়টা শুনেই তাঁর প্রচণ্ড কৌতূহল হয়েছিল এবং আমাদের স্বাগত জানানোর জন্যে 'ভিয়া দি সান্ত-আঞ্জেলা মেরিচি'-র বাড়ির সদরে এসে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে তিনি স্বভাবসুলভ স্বাগতম জানাতেও ভুলে গেলেন। মার্গারিতাকে নিয়ে সরাসরি চলে গেলেন একটা টেবিলের সামনে এবং কাঠের বাক্সেব ডালাটা নিজেই খুলে ফেললেন। এবারে আমরা যা একেবারেই প্রত্যাশা করিনি তাই ঘটল। আমাদের ধারণা ছিল মেয়েটিকে দেখে তিনি উন্মত্ত হয়ে যাবেন। তার মধ্যে একটা মানসিক অসাড়তা লক্ষ্য করলাম।

ভয় মেশানো চাপা গলায় তিনি বললেন,—'ভয়ংকর!'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে থাকলেন সেন্টের দিকে। তারপর নিজেই বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে নিঃশব্দে মার্গারিতোকে ধরে ধরে দরজার দিকে নিয়ে গেলেন ঠিক যেমন করে শিশুকে হাঁটতে শেখানো হয়। মার্গারিতোর পিঠে সস্নেহে চাপড় দিয়ে তাকে বিদায় জানিযে বললেন,—'তোমায় অনেক অনেক ধন্যবাদ, বাছা। এই লড়াইয়ে ভগবান যেন তোমার সঙ্গে থাকেন।' দরজা বন্ধ করে আমাদের কাছে ফিরে আসার পর তিনি তাঁর অভিমত জানালেন। 'এ বিষয়টা নিয়ে কোনও ফিল্ম হয় না, এটা কেউ বিশ্বাস

করবে না।'

চলচ্চিত্র সংক্রান্ত সেদিনকার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা কবতে করতেই ফিরে এলাম আমাদের আস্তানায়। জাভাত্তানি যখন একবার রায় দিয়ে দিয়েছেন তখন এ বিষয়ে আর কিছুই ভাবার নেই। তবুও মারিয়া বেল্লা মারফত খবর এল সেই রাতেই যেন আমরা জাভাত্তানির সঙ্গে দেখা করি। আর আমাদের সঙ্গে যেন মার্গারিতো না থাকে।

সেদিন খুবই ভালো ছিল তাঁর মেজাজ। দু-তিনজন সহপাঠীকে সঙ্গে নিয়ে লাকিস্‌ও উপস্থিত। কিন্তু দরজা খোলার সময় তা জাভাত্তানির চোখে পড়েনি। আচমকাই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন,—'পেয়ে গেছি।' তারপরেই বললেন,—'মার্গারিতো মেয়েটিকে বাঁচিয়ে তুলেছে দেখানো গেলে ছবিটা সাড়া ফেলে দেবে।'

প্রশ্ন না করে আমি থাকতে পারলাম না,—'বাস্তবে না ছবিতে?'

বিরক্তি প্রকাশ না করে তিনি বললেন,—'বোকার মতো কথা বলছ কেন?' তবে ঠিক সেই সময় তাঁর চোখে এক বিচিত্র ধারণার ঝিলিক খেলে গেল। 'যদি মার্গারিতো মেয়েটিকে বাস্তব জীবনে পুনর্জীবিত করে তুলতে না পারে,'—একটু থেমে গভীরভাবে চিন্তা কবে বললেন,—'তাহলেও তাকে চেষ্টা করতে হবে।'

মুহূর্তের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেই আবার চিন্তার জাল বুনতে বুনতে উন্মাদের মতো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে হাত নেড়ে সরবে চিত্রনাট্য আবৃত্তি করতে করতে ঘরে পায়চারি করতে শুরু করলেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। আমাদের চোখের সামনে যেন হাজার হাজার আঁধাবমানিক পাখি সারা বাড়ি জুড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তিনি বলছিলেন,—'কুড়িজন পোপ তার আবেদন নাকচ করে দেওয়ার পরে এক বাতে জবাজীর্ণ মার্গারিতো বাক্সটা খুলে মৃত মেয়েটিব মুখে হাত বোলাতে থাকবে। তাবপর,—'বাবাব ভালোবাসার দোহাই, ওঠো মা, জেগে ওঠো,—বলে পৃথিবীর সকল পিতার স্নেহ উজাড় কবে দিয়ে তাকে ডাকতে থাকবে।' আমাদের দিকে তাকিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে তিনি সব শেষে বললেন,—'এবং মেয়েটি জেগে উঠল।

আমাদের প্রতিক্রিয়ার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন জাভাত্তানি। আমরা কিন্তু তখন সম্পূর্ণ হতভম্ব। কারও মুখে কথা সরছে না। একমাত্র ব্যতিক্রম,—লাকিস্‌। আঙুল তুলে স্কুলের ছাত্রদেব মতো সে জানাতে চাইল যে তার কিছু বলার আছে। 'এমন ঘটনা বিশ্বাস কবার ক্ষেত্রে আমার আপত্তি রয়েছে।' তারপর আমাদের চোখে বিস্ময় দেখে সরাসরি জাভাত্তানিকেই বলল লাকিস্‌,—'আমায় ক্ষমা কববেন। আমার পক্ষে এটা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।'

এবার জাভাত্তানির বিস্মিত হওয়ার পালা। 'কেন নয়?'

'তা আমি কী করে জানব',—লাকিসেব কথায় আকুতির ছোঁয়া। 'কিন্তু এমনটা হতেই পাবে না।'

'আমাব অবাক লাগছে',—শিক্ষকের অতি উচ্চকণ্ঠের এই উক্তি যেন সারা পাড়ায় ধ্বনিত হল। 'স্তালিনবাদীদের নিয়ে এখানেই সমস্যা। তারা বাস্তবকে মেনে নিতে পারে না। এতেই আমাব প্রচণ্ড রাগ হয়।'

মার্গারিতোর ভাষ্য অনুসারে, পোপকে একবার দেখানোর সুযোগ পাওয়ার আশায় পরের পনেরো বছর ধরে সে নিয়মিত সেন্টকে নিয়ে 'কাস্তেল গানদোলফো'-তে যেত। একবার পোপ যখন লাতিন আমেরিকা থেকে আসা শ' দুয়েক পুণ্যার্থীকে দর্শন দিচ্ছিলেন, তখন অনেক ধাক্কাধাক্কি-ঠেলাঠেলি সহ্য করে মার্গাবিতো দয়ালু দ্বাদশ জনকে তার কাহিনি শোনাতে সক্ষম হলেও মেয়েকে দেখিয়ে উঠতে পারেনি। পোপের প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাব কড়াকড়ি হওয়ার কাবণে অন্য পুণ্যার্থীদের জিনিসপত্রের সঙ্গে তার মেয়েকেও সেদিন খানে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ওই ভিড়ের মধ্যেই মার্গারিতোর কথা যতদূর সম্ভব মন দিয়ে শুনে পোপ দ্বাদশ জন তার গালে সস্নেহে আদর করে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন,—'খুবই ভালো করেছ, বৎস। ঈশ্ববেব আশীর্বাদে তোমার পরিশ্রম যেন সফল হয়।'

সদাহাস্য পোপ আলবিনো লুচিয়ানোর আমলে, যা ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী, মার্গারিতোর মনে হয়েছিল

যে এবার তার স্বপ্ন বাস্তব রূপ নেবে। এই পোপের একজন আত্মীয় মার্গারিতোর কাহিনি শুনে মোহিত হয়ে পড়েন। তিনি এ ব্যাপারে পোপের সঙ্গে কথা বলার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। অবিশ্যি কেউই এটাকে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু দিন দুয়েক বাদে আমরা সবাই যখন একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে বসেছি, তখন একটা জরুরি বার্তা এল। টেলিফোনে জানানো হল,—আগামী বৃহস্পতিবারের আগেই মার্গারিতোকে ভ্যাটিকানে পোপের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের জন্যে ডাকা হবে। সুতরাং সে যেন রোমের বাইরে না যায়।

খবরটা রসিকতা ছিল কিনা তা পরে অনেক অনুসন্ধান করেও মার্গারিতো জানতে পারেনি। সে কিন্তু সংবাদটিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিল এবং সাক্ষাতের জন্যে নিজেকে তৈরিও রেখেছিল। বেশ কয়েকদিন সে বাড়ির বাইরে যায়নি। বাথরুমে যেতে হলেও হাঁক পেড়ে তার গন্তব্য জানিয়ে যেত। তখনও যথেষ্ট আকর্ষণীয়া প্রবীণ বেল্লা মারিয়া সশব্দে হেসে গলা তুলে বলতেন,—'আমরা জানি মার্গারিতো, যদি পোপের ডাক আসে...।'

পরের সপ্তাহে, টেলিফোনে জানানো নির্ধারিত সাক্ষাৎকারের দিন দুয়েক আগে ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দেওয়া খবরের কাগজের শিরোনাম পড়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায় মার্গারিতোর যাবতীয় আশা-ভরসা : পোপের জীবনাবসান। মুহূর্তের দুরাশায় সে ভেবেছিল হয়তো ওটা খবরের কাগজের কোনও পুরোনো সংস্করণ। হয়তো ভুল করে তার ঘরে দিয়ে গেছে। কারণ এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে এক মাসের মধ্যে পরপর দু'জন পোপের মৃত্যু হতে পারে। তবে নির্মম সত্য হল,—সদাহাস্য আলবিনো লুচিয়ানো, যিনি মাত্র তেত্রিশ দিন আগে পোপ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, সকালবেলায় ঘুমের মধ্যেই মারা গেছেন।

মার্গারিতো দুয়ার্তোর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দীর্ঘ বাইশ বছর বাদে আমি রোমে ফিরলাম। হঠাৎ করে দেখা না হয়ে গেলে তার সম্বন্ধে হয়তো আবার নতুন করে ভাবার সুযোগ হত না। সময়ের ধ্বংসলীলায় আমি এতই মুহ্যমান ছিলাম যে অন্য কারও কথা মনেও ছিল না। নির্বোধের মতো টিপটিপ করে অনর্গল বৃষ্টি পড়ার ফলে প্যাচপ্যাচে গরম ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। বিগতকালের হীরকোজ্জ্বল দ্যুতি যেন কর্দমাক্ত ছাইরঙে রূপান্তরিত হচ্ছিল আর আমার নিজস্ব যেসব জায়গা এতকাল ধরে স্মৃতিকে সজীব রেখেছিল সেগুলো সব অন্যরকম, অপরিচিত হয়ে যাচ্ছিল। যে বাড়িটায় আমাদের আস্তানা ছিল তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবে মারিয়া বেল্লার খবর কেউ জানে না। যে ছ'টি টেলিফোন নম্বর রিবেরো সিলভা আমায় বিভিন্ন সময় পাঠিয়েছিল তার কোনওটিতেই ফোন করে জবাব পাওয়া গেল না। চলচ্চিত্র জগতের নবীনদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনের সময় আমাদের শিক্ষকের কথা বললাম। মুহূর্তের মধ্যে নেমে এল চূড়ান্ত নীরবতা। যতক্ষণ না একজন সাহস করে বলল,—'জাভাত্তানি? তাঁর নাম তো কখনও শুনিনি',—ততক্ষণ সবাই চুপ করে রইল।

এটাই বাস্তব। তিনি আজ আর আলোচিত নন। টিপটিপ বৃষ্টিতে ভিল্লা বোর্গেসের গাছগুলোকে এলোমেলো দেখাচ্ছিল। আগাছায় ঢাকা পড়েছে রাজকুমারীদের ঘোড়ায় চড়ার রাস্তাটি। সেই রাস্তায় আজ আর কোনও ফুলের সাজসজ্জা নেই। অতীতের সুন্দরীদের স্থান দখল করেছে মাদ্রিদের পুরুষালি চেহারার অ্যাথেলিট মেয়েরা। আমার পরিচিত প্রায় লুপ্ত প্রাণীদের মধ্যে এখনও বেঁচে আছে শুধু সেই বৃদ্ধ-জীর্ণ সিংহটি যার চোখভর্তি পিচুটি, নাকভরা সর্দি এবং যার বর্তমান আশ্রয়স্থল কর্দমাক্ত জলে ভরা এক ছোট্ট দ্বীপ। 'প্লাজা দে এসপানিয়া'-র চত্বরের প্লাস্টিকের মতো চকচকে রেস্তোরাঁয় এখন আর কেউ গান করে না, আক্রান্ত হয় না প্রেমজ্বরে। যে রোমের জন্যে মনে এত আকুতি ছিল, সেই রোম যেন এর মধ্যেই সিজার শাসিত প্রাচীন রোমের অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে। এমন সময়ে হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসা এক কণ্ঠস্বর যেন আমাকে ত্রাসতেভেরের সঙ্কীর্ণ রাস্তার মধ্যিখানে নিশ্চল করে দিল· 'এই যে, কবি না!'

এই সেই মার্গারিতো। এখন সে বৃদ্ধ, ক্লান্ত। ইতোমধ্যে পাঁচজন পোপ মারা গেছেন এবং শাশ্বত রোমে ভাঙনের ছাপ পড়েছে। কিন্তু মার্গারিতোর প্রতীক্ষা থমকে যায়নি। 'আমি এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছি যে আর কিছুকালের অপেক্ষায় আমার কিছু যাবে আসবে না।' রাস্তার মাঝখানে বৃষ্টির জমা

জলে যেখানে দিনের আলো ম্লান হয়ে আসতে শুরু করেছে সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে সে পা টেনে টেনে চলতে চলতে বলছিল ; তার পায়ে ফৌজি বুটজুতো আর মাথায় পুরোনো আমলের একটা রোমান টুপি। সেই মুহূর্তে আমার মনে আর একটুও সন্দেহ রইল না—যদিও এই সন্দেহ আগে একবারেই হয়নি তা বলব না—প্রকৃত সেন্ট হল মার্গারিতো। নিজের অজান্তে জীবনের বাইশ বছর ধরে আত্মজার অবিকৃত মৃতদেহকে সামনে রেখে তার মতো করে একটা ন্যায্য লড়াই সে চালিয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে এ যেন তার নিজেরই সেন্ট হিসেবে স্বীকৃতির লড়াই।

মূল শিরোনাম : La santa

বিষদিগ্ধ সতেরোজন ইংরেজ

নেপল্‌স বন্দরে পৌঁছোনো মাত্রই শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো খেয়াল করলেন এখানকার গন্ধ একেবারে রিওহাচা বন্দরের মতো। ঝরঝরে পুরোনো জাহাজে গাদাগাদি করে বুয়েনোস আয়ারেস থেকে যুদ্ধের পরে প্রথম দেশে ফিরে আসা ইতালির নাগরিকদের কাউকেই অবিশ্যি তিনি নিজের এই অনুভূতিটার কথা বলেননি। জানালেও ক্ষতি ছিল না। কারণ, এই অনুভূতির তাৎপর্য বোঝা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এ কথা ঠিক যে বাহাত্তর বছর বয়সে আঠারো দিন ধরে এমন বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার পর এই গন্ধের দৌলতে নিজেকে যেন কিছুটা কম নিঃসঙ্গ বোধ করছেন। এর ফলে, বাড়ি এবং পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্নতা বোধ এবং অবশ্যই ভয়, যেন অনেক কমে গেছে।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তীরেব আলো দেখা গেল। অন্য দিনের তুলনায় অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে নতুন জামাকাপড পবে যাত্রীরা সব তৈবি। যাত্রা শেষের অনিশ্চয়তার কারণে অনেকের কাছেই এই শেষ রবিবারটাই যেন একমাত্র সত্য,—অন্তত সেরকমই মনে হচ্ছে। মাস্‌-এর প্রার্থনার সময় সামান্য সংখ্যক যাত্রী উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো। অন্য দিনের মতো পুরোপুরি শোকের পোশাক নয়, তাঁর পরনে মোটা কাপড়ের বাদামি ও ছাই রঙের পোশাক, কোমরে সেন্ট ফ্রান্সিস গোষ্ঠীর চওড়া পট্টি আব পায়ে এক জোড়া খসখসে চামড়ার চটি। চটিজোড়া এতই নতুন যে তাঁকে দেখে মোটেও তীর্থযাত্রী বলে মনে হচ্ছে না। আসলে এই লম্বা আলখাল্লাটা পরার জন্যে বহুদিন আগে থেকেই তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁর প্রত্যয় রোমে গিয়ে পরম পবিত্র পোপের সাক্ষাৎ পেলে বাদবাকি জীবন এই পোশাকটাই পবে থাকবেন। ইতোমধ্যেই রোমে পৌঁছে যাওয়ার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন তিনি। ক্যারিবিয়ান ঝড়ের দাপট সহ্য কবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারার জন্যে প্রার্থনা শেষ হওয়ার পরে পবিত্র আত্মাদের উদ্দেশ্যে একটা মোমবাতি জ্বেলে দিলেন তিনি। নিজের ন'টি ছেলের জন্যে এবং চোদ্দোজন নাতি-নাতনি যারা এই মুহূর্তে রিওহাচাব ঝোড়ো হাওযাব বাত্রে নিশ্চয়ই তাঁকে নিযে স্বপ্ন দেখছে, তাদের প্রত্যেকের জন্যে আলাদা করে প্রার্থনা কবলেন শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেবো।

প্রাতরাশেব পব বাইরে এসে দেখলেন পালটিয়ে গেছে ডেকের চেহারা। নিচের হলটা এতদিন অ্যান্টিলিয়েসের চমৎকার বাজার থেকে কেনা ইতালিয়ান পর্যটকদেব জন্যে নানাবকম মনোহারি জিনিসে ভর্তি ছিল। এখন সেখানে স্তূপ করে রাখা আছে যাত্রীদের মালপত্র আর ক্যান্টিনেব কাউন্টাবে লোহাব খাঁচায় বয়েছে একটি পেরনামবুকো-ব বাঁদব। অগস্টের প্রথম সপ্তাহের উজ্জ্বল সকাল। যুদ্ধোত্তব গ্রীষ্মের এক আদর্শ রবিবার যখন প্রতিটি দিনই যেন নতুন কিছুর উন্মোচন। অসুস্থ রোগীব মতো ভারী নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে জাহাজটি জলের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। দিগন্তবেখায় সবে দেখা যাচ্ছে আঁজুর ডিউকদের অভিশপ্ত দুর্গগুলি। যাত্রীরা জাহাজের ডেকের রেলিঙে ঝুঁকে চারদিকে ভালো কবে না তাকিয়েই বিভিন্ন চেনা-পরিচিত জায়গা আঙুল উঁচিয়ে দেখাতে দেখাতে দক্ষিণ ইতালিব স্থানীয় ভাষায় আনন্দে চিৎকার করছে। জাহাজের অনেক যাত্রীর সঙ্গেই শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরোর বন্ধুত্ব হয়েছে। বাবা-মায়েরা নিচের তলায় যখন নাচের আসরে ব্যস্ত তখন তিনি বাচ্চাদের দেখাশোনা করেছেন। এমনকী জাহাজের ফার্স্ট অফিসাবের জ্যাকেটেব বোতাম পর্যন্ত সেলাই করে দিয়েছেন। হঠাৎ করে সকলেই যেন অন্য রকমের হয়ে গিয়ে তাঁব প্রতি উদাসীন আচরণ শুরু করল। যে সামাজিক মেলামেশা এবং মানবিক উত্তাপের আঁচে উষ্ণমণ্ডলীয় দেশের আবহাওয়ার মাদকতার প্রতি আকর্ষণ তিনি কাটিয়ে উঠতে পেবেছিলেন তা হারিয়ে গেল। বন্দর দর্শনেই হারিয়ে গেল গভীর সমুদ্রের প্রতি

চিরন্তন ভালোবাসা। ইতালিয়ানদের অস্থিরমতি আচরণের সঙ্গে অপরিচিত শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো ভাবলেন অন্য কারও নয়, ত্রুটিটা তাঁর নিজের। কারণ একমাত্র তিনিই ফিরে যাবেন। তাঁর মনে হল যে কোনও সফরের এটাই সারসত্য। সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাওয়া অনেক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখাব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নিজেকে বিদেশি বলে মনে হল। জীবনে এই প্রথম নিজেকে বিদেশি ভাবতে তিনি আহত বোধ করলেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সুন্দরী মেয়ে আচমকা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠায় শিউরে উঠলেন তিনি।

'মা গো',—জলের দিকে আঙুল তুলে মেয়েটি বলল। 'ওদিকে দেখুন, একটা মানুষ ডুবে গেছে।'

শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো দেখলেন উপর চিৎ হয়ে একজন মাঝবয়সি মানুষ সমুদ্রে ভাসছে। লোকটির মাথায় টাক আর তার মুখে মিশে রয়েছে দুর্লভ স্বাভাবিক মাধুর্য। ভোরের আকাশের রঙে রাঙানো উদার আমুদে চোখ। পরনে ব্রোকেডের তৈরি আনুষ্ঠানিক জ্যাকেট আর পায়ে চামড়ার দামি জুতো। ডান হাতে শক্ত করে ধরা রয়েছে রঙিন কাগজে জড়ানো একটা চৌকো প্যাকেট। গাঢ় নীল হয়ে যাওয়া আঙুলগুলি ডুবে যাওয়ার সময় আঁকড়ে ধরার জন্যে শুধু এই প্যাকেটটার ফিতে ছাড়া আর কিছুই পায়নি।

'নিশ্চয়ই বিয়ের পার্টি চলার সময় লোকটি জলে পড়ে গেছে',—জাহাজের জনৈক কর্মচারী বলল। 'এমন ঘটনা গরমকালে এই এলাকায় প্রায়ই ঘটে।'

জাহাজটা খাঁড়ির মধ্যে ঢোকার সময় সব যাত্রীদের চোখ প্রথমে এই দৃশ্যটার উপরই পড়ছে সার। তারপরেই যেন দৃষ্টি পিছলিয়ে চলে যাচ্ছে পিছনে ছড়িয়ে থাকা দূরের দৃশ্যাবলির দিকে যা অনেক আনন্দের। শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছেন না সেই হতভাগ্য লোকটিকে যার জ্যাকেটের প্রান্ত এখনও জাহাজের পিছনে ভাসতে দেখা যাচ্ছে।

খাঁড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভাঙাচোরা গাদাবোট এসে জাহাজটাকে কাছি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলল যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাওয়া অসংখ্য সামরিক নৌকোর দঙ্গলে। মরচে পড়া ওই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দিয়ে জাহাজটি কোনওরকমে পথ করে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল ক্রমশ তৈলাক্ত হতে শুরু করল। ফলে রিওহাচার দুপুর দুটোর থেকেও যেন অনেক বেশি তাপমাত্রা বেড়ে গেল। সংকীর্ণ জলপথের অন্য পারে অচিরেই দেখা দিল দুপুর এগারোটার রোদে উজ্জ্বল শহর। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে প্রাসাদ আর গোলাবাড়ি। সমুদ্রের তলদেশ থেকে একটা দম বন্ধ করা পচা গন্ধ ভেসে আসছে। শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরোর মনে হল এটা তাঁদের বাড়ির উঠোনে জমে থাকা পচা কাঁকড়ার গন্ধের মতো।

এরই মাঝে জেটিতে সমবেত দর্শকদের মধ্যে নিজেদের আত্মীয়-পরিজনকে চিনতে পেরে যাত্রীরা আনন্দে হাত নাড়তে শুরু করে দিয়েছে। জেটিতে জড়ো হয়ে থাকা মহিলাদের বেশিরভাগই বিগত যৌবনা। শোকের পোশাকের ভিতরে লুকোনো রয়েছে তাদের শারীরিক সৌন্দর্য। তাদের সঙ্গে রয়েছে পৃথিবীর সুন্দরতম শিশুদের একটা দল আর তাদের সাদামাটা ধাঁচের স্বামীরা, যারা আজও অমরত্ব দাবি করতে পারে। স্ত্রী-র পত্রিকা পড়া শেষ হলেই তারা সেই পত্রিকাটি পড়ার কথা ভাবে এবং দারুণ গরমে হাঁসফাঁস করতে থাকলেও তাদের পরতে হয় নিয়মতান্ত্রিক পোশাক।

জেটিতে মেলার মতো হট্টগোলের পরিবেশে ছেঁড়া ওভারকোট পরা ভীষণ করুণ চেহারার এক বৃদ্ধ পকেট থেকে বের করল বেশ কয়েক ডজন মুরগির ছানা। মুহূর্তের মধ্যে এলোমেলোভাবে কিচিরমিচির করতে করতে মুরগির ছানাগুলো জেটির উপর ছড়িয়ে পড়ল। লোকের পায়ে চাপা না পড়ে, হয়তো জাদুর প্রভাবেই, জীবন্ত অবস্থাতেই সেগুলো ছুটে বেড়াচ্ছে। বৃদ্ধ জাদুকরটি জেটির মেঝেতে টুপি মেলে রাখলেও কোনও লাভ নেই। জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা কিছুই ছুঁড়ে দিল না।

আজব জাদুর খেলায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো ভাবলেন খেলাটা তাঁরই সম্মানে দেখানো হচ্ছে। জাদুকরকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে তাই নিজেই এগিয়ে গেলেন। এর মধ্যেই যে জাহাজ

থেকে জেটিতে নামার ফুটব্রিজ পাতা হয়ে গেছে তা তিনি খেয়াল করেননি। বিশাল জনতার স্রোত হিংস্র জলদস্যুর মতো হুঙ্কার ছেড়ে তখন যেন জাহাজ আক্রমণ করতে উদ্যত। পুনর্মিলনের হর্ষধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়স্বজনকে নিতে আসা লোকজনের গা থেকে বেরিয়ে আসছে গরমকালের পচা পেঁয়াজের তীব্র গন্ধ। রীতিমতো বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো। ওদিকে মালপত্র নিয়ে চলেছে কুলিদের মারামারি। এইসবের মধ্যে পড়ে গিয়ে তাঁর মনে হচ্ছে জেটিতে ঘুরে বেড়ানো মুরগির ছানাদের মতো জঘন্য অবস্থায় যেন তাঁকে পড়তে না হয়। কাঠের তৈরি কোনা কাটা রংচঙে ট্রাঙ্কটার ওপর বিহ্বল হয়ে বসে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে শুরু করলেন। অবিশ্বাসীদের দেশে যেসব প্রলোভন বা বিপদ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে তাদের শায়েস্তা করার জন্যেই এই বিশেষ প্রার্থনা। হইচই শেষ হওয়ার পরেও বিধ্বস্ত লাউঞ্জে তিনি একাই বসে রইলেন। ওদিকেই আসছিলেন জাহাজের ফার্স্ট অফিসার।

প্রথমেই তিনি বলে ফেললেন,—'এই সময়ে এখানে কারও থাকার অনুমতি নেই।' পরক্ষণেই কিঞ্চিৎ বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে সহানুভূতির স্বরে বললেন,—'আপনাকে কি কোনও সাহায্য করতে পারি?'

'দূতাবাস থেকে কেউ না আসা পর্যন্ত আমায় অপেক্ষা করতে হবে।'

ঘটনাটা সত্যিই তাই। রওনা হওয়ার দু' দিন আগে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরোর বড় ছেলে নেপল্সের উপ-রাষ্ট্রদূতকে টেলিগ্রাম মারফত অনুরোধ জানায় তিনি নিজে যেন জাহাজঘাটায় এসে যাবতীয় সরকারি নিয়মকানুন সম্পন্ন করিয়ে তার মাকে রোমের উদ্দেশে রওনা করিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। জাহাজের নাম এবং পৌঁছোনোর সময় ছাড়াও সে জানিয়েছিল যে তার মা সেন্ট ফ্রান্সিস গোষ্ঠীর নিজস্ব আলখাল্লা ধরনের পোশাক পরতে অভ্যস্ত। ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করার ব্যাপারে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরোর কট্টর মনোভাব বুঝতে পেরে জাহাজের ফার্স্ট অফিসার তাঁকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার অনুমতি দিলেন। এটা জাহাজের কর্মচারীদের জলখাবার খাওয়ার সময়। টেবিলের ওপর সবকটা চেয়ার তুলে দিয়ে বালতি বালতি জল দিয়ে ডেক ধোয়ার কাজ চলছে। জলের হাত থেকে বাঁচার জন্যে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরোকে বেশ কয়েকবার ট্রাঙ্ক সরাতে হয়েছে, জায়গাও পালটাতে হয়েছে। একবারের জন্যেও প্রার্থনা না থামিয়ে এ সব কাজ তিনি নিঃশব্দে সেরেছেন। সরতে সরতে শেষ পর্যন্ত হলঘর ছেড়ে সূর্যের প্রখর আলোয় উজ্জ্বল লাইফবোটের মধ্যে গিয়ে বসে পড়লেন। দুপুর দুটো নাগাদ ওখানেই আবার দেখা হয়ে গেল জাহাজের ফার্স্ট অফিসারের সঙ্গে। ভয়ে, দুঃখে দিশেহারা হয়ে তখন তিনি ঘোমটা দেওয়া আলখাল্লার ভেতরে ঘেমে নেয়ে প্রাণপণে মালা জপে যাচ্ছেন।

'আপনার প্রার্থনায় কোনও ফল হবে না',—অফিসার বললেন। আগেকার বন্ধুত্বপূর্ণ সহানুভূতির স্বর এখন অনুপস্থিত। 'এমনকি ঈশ্বরও অগস্ট মাসে ছুটি নেন।'

সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে তিনি আরও বলে চললেন যে বছরের এই সময়টায়, বিশেষ করে রবিবারে ইতালির অর্ধেক মানুষ জড়ো হয় সমুদ্রের ধারে। উপ-রাষ্ট্রদূতের কাজের বিশেষত্বর কথা বিবেচনা করলে মনে হয় তাঁর ছুটি নেওয়ার উপায় নেই। তবে হলফ করে বলা যায় সোমবারের আগে তাঁর দপ্তর খুলবে না। সুতরাং শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরোর এখন কোনও হোটেলে চলে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেখানে কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে উপ-রাষ্ট্রদূতের দপ্তরে যোগাযোগ করাই সমীচীন। উপ-রাষ্ট্রদূতের দপ্তরের ফোন নম্বরটা টেলিফোন ডায়রেক্টরিতেই পাওয়া যাবে। অগত্যা শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরোর সামনে জাহাজের ফার্স্ট অফিসারের পরামর্শ মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। ইমিগ্রেশন, কাস্টমস্, বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মকানুনের ঝামেলা চুকিয়ে তাঁকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে দায়িত্ব পালন করলেন জাহাজের ফার্স্ট অফিসার। বিদায় নেওয়ার আগে তিনি ট্যাক্সি-চালককে বলে দিলেন যাতে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরোকে কোনও ভালো হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরিত্যক্ত রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে শব বহনকারী শকটের মতো টাল খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে ভাঙাচোরা ট্যাক্সিটি। শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো একবার ভাবলেন এই ভুতুড়ে শহরটার রাস্তার

মাঝখানে ঝুলছে এক অতিপ্রাকৃত মৃতদেহ আর সেখানে শুধু তাঁরা দুজনই জীবন্ত মানুষ। তবে পরমুহূর্তেই মনে হল, যে মানুষ এত আবেগ দিয়ে যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে পারে সে নিশ্চয়ই অসহায় এক মহিলা, যিনি সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সমস্ত ধকল সয়ে পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছুটে এসেছেন, তাঁর কোনও ক্ষতি করতে পারে না।

রাস্তার গোলকধাঁধা শেষ হওয়ার পর আবার সমুদ্রের দেখা মিলল। রোদে পোড়া নির্জন সমুদ্রের ধারে উজ্জ্বল রঙের অনেকগুলো হোটেলের পাশ দিয়ে ট্যাক্সিটি লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলেছে। এগুলির কোনওটির সামনেই ট্যাক্সিটি না থেমে সোজা এগিয়ে চলল বড় বড় তালগাছে ঘেরা, সবুজ বেঞ্চি পাতা পার্কের ভিতরে একটি অনুজ্জ্বল হোটেলের দিকে। ছায়াঢাকা ফুটপাথে ট্রাঙ্কটি নামিয়ে রেখে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেবোকে কোনওরকম অনিশ্চয়তা প্রকাশের সুযোগ না দিয়েই ট্যাক্সি-চালক জানাল যে এটিই নেপল্‌সের সবচেয়ে ভালো হোটেল।

সুদর্শন ও সহৃদয় এক কুলি তাঁকে হোটেল দেখানোর জন্যে ভিতরে নিয়ে গেল। সিঁড়ির গর্তে লোহার জাল দেওয়া খাঁচার মতো দেখতে নেহাতই কাজ চালানোর উপযোগী একটি লিফটে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরোকে তুলে দিয়ে রীতিমতো ভয় পাইয়ে দেওয়া উদাত্ত গলায় পুচ্চিনির গাওয়া গান গাইতে লাগল কুলিটি। মেরামত করা পুরোনো ন'তলা বাড়ি। প্রতিটি তলায় একেকটি আলাদা হোটেল। অতীব মন্থর গতিতে বিকট আওয়াজ করে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি ভেদ করে লিফট্ উপরে উঠছে। চমকে উঠছে আশপাশের লোকজন। ঘরের মধ্যে লম্বা ইজের পরে ঢেকুর তুলতে তুলতে তারা তখন আত্মসমীক্ষা করতে ব্যস্ত। চারতলায় ঝাঁকুনি দিয়ে লিফট্ থামার সঙ্গে সঙ্গেই কুলির গান থেমে গেল। কোলাপ্‌সিবল গেট খুলে বীরোচিত কায়দায় কুর্নিশ জানিয়ে হোটেলের দিকে ইঙ্গিত করে সে জানাল এটিই শ্রীমতী প্রুদেনসিযা লিনেরোর আস্তানা।

পিতলের টবে রাখা রয়েছে ঘর সাজানোর গাছ। রঙিন কাচ বসানো কাঠের কাউন্টারের পেছনে অলস ভঙ্গিতে বসে আছে একটি অল্পবয়সি ছেলে। দেখামাত্রই ছেলেটিকে ভালো লেগে গেল। ছেলেটির মাথায় দেবদূতের মতো একরাশ কোঁকড়ানো চুল। অবিকল শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরোর কনিষ্ঠ নাতিটিব মতো। ব্রোঞ্জের ফলকে লেখা হোটেলের নাম, কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধ, ঝুলন্ত ফার্ন গাছ, শান্ত পরিবেশ, দেওয়ালে সাজানো সোনালি কাগজের ফুল,—সবকিছুই তাঁব ভালো লাগছে। লিফট্ থেকে বেবিয়ে একটু হেঁটে যা দেখলেন তাতে অবিশ্যি এক মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেল তাঁর যাবতীয় আগ্রহ। আরাম কেদারায় ঘুমোচ্ছে একদল ইংবেজ পর্যটক। প্রত্যেকের পরনে খাটো প্যান্ট আর তাদের সামনে সার দিয়ে সাজানো রয়েছে বালুকাবেলায় বেড়াবার চপ্পল। সতেরোজন ইংরেজের বসার ভঙ্গিতে এমনই এক সাযুজ্য সৃষ্টি হয়েছে যেন মনে হচ্ছে আয়না বসানো বারান্দায় একজনেরই বহুবার প্রতিফলিত হওয়া একটা ছবি। তাদের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করেই তাঁর মনে হল,—এরা সবাই একই রকমেব বৈশিষ্ট্যবিহীন শরীরের সমষ্টি। কসাইখানার হুকে ঝোলানো শুয়োবেব মাংসের মতো তাদের লম্বা পায়ের গোলাপি রঙের হাঁটুর দৃশ্যটি তাঁর মনে গেঁথে গেল। ভয পেয়ে কাউন্টারেব দিকে তিনি আর এগোলেন না। লিফটে ফিরে এলেন তিনি।

'অন্য তলায় চল',—তিনি বললেন।

কুলিটি জানাল,—'একমাত্র এই হোটেলটাতেই খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত আছে।'

'তাতে কোনও ক্ষতি নেই',—তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে কুলিটি লিফটের কোলাপ্‌সিবল গেটটা বন্ধ করেই পুচ্চিনির গানের বাকিটুকু গাইতে শুরু করল। ছ' তলা পর্যন্ত গান চলল। এই হোটেলটার সবকিছুই তাঁর কাছে মন্থর ঠেকছে। হোটেলের অল্পবয়সি কর্ত্রীটি পরিষ্কার ঝরঝরে স্প্যানিশে কথা বলে। লবির সামনের আরাম কেদারায় দিবানিদ্রায় মগ্ন কাউকে দেখা গেল না। রান্নাবান্নার কোনও পাট এই হোটেলে না থাকলেও কাছের একটা রেস্তোরাঁ থেকে সস্তায় খাবার আনিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। হোটেলকর্ত্রীর কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ রুক্ষ ও কর্কশ হলেও তার সৌজন্যতাপূর্ণ আচরণে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরোর যথেষ্ট আস্থা

তৈরি হল। সবচেয়ে বড় কথা, লবিতে শুয়ে থাকা ইংরেজদের গোলাপি হাঁটু এখানে দেখতে হবে না ভেবেই তাঁর বড় স্বস্তি হল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে এখানেই থাকবেন।

দুপুর তিনটের সময় জানালার খড়খড়ি নামিয়ে দেওয়ায় হালকা আঁধার মেশানো আলোয় হোটেলের ঘরে ছড়িয়ে পড়ল নির্জন কুঞ্জের সজীব শান্তির ছায়া। খানিকটা কেঁদে নিয়ে নিজেকে হালকা করার পক্ষে এটা একেবারে আদর্শ জায়গা। একা হওয়া মাত্রই দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে প্রুদেনসিয়া চলে গেলেন স্নানঘরে। সকাল থেকে এই প্রথম পেচ্ছাপ করার সুযোগ পেলেন। সরু, তিরতিরে ধারায় শরীর থেকে দূষিত জল বেরিয়ে যাওয়ার পর নিজেকে খুব হালকা মনে হল। মনে হচ্ছে সমুদ্র সফরে হারিয়ে যাওয়া আত্মপরিচয়ের কিছুটা আবার উদ্ধার করা গেল। পা থেকে চপ্পলটা খুলে ফেলে আলখাল্লার দড়িটা আলগা করে বাঁ দিকে পাশ ফিরে বিয়ের খাটের মতো বিশাল বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন। একার পক্ষে খাটটি বেশ বড়, বেশিরভাগ জায়গাই খালি পড়ে রয়েছে। বিছানায় শোবার পর বহুদিনের রুদ্ধ অশ্রু যেন তাঁর চোখ থেকে মুক্তি পেল।

তিনি এই প্রথম রিওহাচার বাইরে বের হয়েছেন। তাছাড়াও এটি তাঁর জীবনের এক অতীব বিরল ঘটনাও বটে। ছেলেমেয়েরা বিয়ে-থা করে নিজেদের ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত। স্বামীর প্রায় নিষ্প্রাণ শরীরটা নিয়ে একা একা দিন কাটাতে হয় তাঁকে। দুটি স্থানীয় (রেড) ইন্ডিয়ান মেয়ে যাদের জুতো পরার সামর্থ্য নেই, তাঁকে ঘর-গেরস্থালির কাজে সাহায্য করে। জীবনের অর্ধেক সময় ধরে যাঁকে একমাত্র পুরুষ হিসেবে ভালোবেসেছিলেন চোখের সামনে তিরিশ বছর ধরে তাঁকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে দেখার পর জীবন সম্পর্কেই প্রুদেনসিয়ার আগ্রহ কমে যায়। যে খাটে তাঁর স্বামীর শেষ শয্যা পাতা হয়েছিল সেখানেই তাঁরা যৌবনে প্রেম করতেন।

গত অক্টোবরে শয্যাশায়ী লোকটির কাছে একদিন সবকিছু যেন হঠাৎই পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি চোখ খুলে তাঁর নিজের লোকজনেদের চিনতে পারলেন। সবাইকে বাড়িতে আসতে বলে একজন ফোটোগ্রাফারকে ডেকে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। পাড়ার পার্কের কাছ থেকে একজন বুড়ো মতন ফোটোগ্রাফারকে ডেকে আনা হল। সাজসরঞ্জাম নিয়ে ফোটোগ্রাফাব হাজির। বিশাল হাপর লাগানো ক্যামেরা, মাথা ঢাকবার কালো কাপড় আর ঘরের ভেতর ছবি তোলার জন্যে ম্যাগনেশিয়াম ফ্ল্যাশবাল্‌ব। অসুস্থ মানুষটি নিজেই নির্দেশ দিলেন কার কার ছবি তোলা হবে। 'আমায় সারা জীবন ধরে সুখ ও ভালোবাসা দেবার জন্য প্রুদেনসিয়ার একটা আলাদা ছবি।' তারপর বললেন,—'এবার আমার দুই ছেলের ছবি। তারা আদর্শ গৃহস্বামী, স্নেহশীল এবং বিচক্ষণ।' এইভাবে ফিল্‌ম ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ছবি তোলা চলল। বাড়ি থেকে ফোটোগ্রাফার আবার নতুন ফিল্‌ম নিয়ে এল। বিকেল চারটে নাগাদ ম্যাগনেশিয়াম ফ্ল্যাশবাল্‌বের ধোঁয়ার দাপটে সকলের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, চেনা-পরিচিত সকলেই তখন নিজের নিজের ফোটোর কপি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। ঠিক সেইসময় অসুস্থ মানুষটি তাদের সকলকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বিছানায় মিলিয়ে যেতে শুরু করলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হতে থাকা এক জাহাজের সিঁড়ির হাতল ধরে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সবাই ভেবেছিল স্বামীর মৃত্যুর পরে প্রুদেনসিয়ার দুশ্চিন্তা কমবে। বাস্তবে বরং উলটোটাই হল। তিনি দুঃখে এতই কাতর হয়ে পড়লেন যে শেষপর্যন্ত ছেলেমেয়েদের এসে জিজ্ঞেস করতে হল কী করলে তার মনের যাতনা জুড়োবে। প্রুদেনসিয়া জানিয়েছিলেন যে রোমে গিয়ে পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেই তিনি শান্তি পেতে পারেন।

'সেন্ট ফ্রান্সিস গোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মাচরণ করতে করতে একা একাই আমি রোমে যেতে চাই',—শপথ নেওয়ার ভঙ্গিতে তিনি জানিয়েছিলেন নিজের অভিমত।

নীরব সেবাশুশ্রূষার সেই সময়ে একমাত্র কান্নাতেই তিনি শান্তি পেতেন, যেমন এখনও পান। তাঁর কেবিনের দু'জন সহযাত্রিণী, যারা সেন্ট ক্লেয়ার গোষ্ঠীর ব্রহ্মচারিণী, মার্সাই বন্দরে নেমে যাওয়ার পর স্নানঘরের দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে তিনি কেঁদেছিলেন। রিওহাচা ছাড়ার পর নেপল্‌সের হোটেলের এই ঘরটিকে প্রাণভরে কাঁদবার পক্ষে প্রকৃষ্ট জায়গা বলে মনে হল। তাড়াতাড়ি না করলে

রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁকে না খেয়ে থাকতে হবে,—হোটেলকর্ত্রী সাতটা নাগাদ তাঁর ঘরের দরজায় কড়া নেড়ে খবরটা না জানালে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো বোধ হয় পরের দিন পর্যন্ত একটানা কেঁদেই যেতেন এবং তাঁর রোম যাবার ট্রেনটাও ছেড়ে যেত।

হোটেলের জনৈক কর্মচারী তাঁকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেল। সমুদ্র থেকে ভেসে আসছে স্নিগ্ধ বাতাস। সন্ধে সাতটার মলিন সূর্যের আলোয় কিছু স্নানার্থীকে সমুদ্রের ধারে দেখা যাচ্ছে। রবিবাবের দিবানিদ্রা থেকে সদ্য জেগে ওঠা সর্পিল-সংকীর্ণ গলিপথ পেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা এসে পৌঁছোলেন এক ছায়াঘন লতায় ঘেরা বাগিচায়। লাল চেকের টেবিল ক্লথে ঢাকা টেবিল। ফুলদানির বদলে আচারের বোতলে সাজানো রয়েছে কাগজের ফুল। নৈশভোজের জন্যে রেস্তোরাঁর কর্মচারী ছাড়া এত তাড়াতাড়ি আর কে আসবে? অবিশ্যি একজন দুঃস্থ পাদ্রিও রয়েছে। দূরে এক কোণে বসে সে পেঁযাজ দিয়ে পাঁউরুটি খাচ্ছে। রেস্তোরাঁয় পা দিয়ে তিনি টের পেলেন সবার দৃষ্টি এসে পড়েছে তাঁর ফিকে বাদামি ও ছাই রঙের আলখাল্লার ওপর। মাথা ঠান্ডা রাখলেন তিনি। কারণ তিনি জানেন উপহাস সহ্য কবাও প্রায়শ্চিত্তের অন্যতম অঙ্গ। তবে পরিবেশনকারিণীর সোনালি চুল, সুন্দর মুখ, গানের সুরে কথা বলার ভঙ্গি তাঁর মন ভরিয়ে দিল। শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরোর মনে হল যুদ্ধোত্তর ইতালির পরিস্থিতি নিশ্চযই খুব খারাপ। তা না হলে এই মেয়েটিকে কেন রেস্তোরাঁয় পরিবেশনকারিণীব কাজ করতে হবে। ফুলে ভরা এক কোণে বসে তাঁর বেশ ভালোই লাগছে। গতকালের উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তায় মরে যাওয়া ক্ষিধেটা জলপাই পাতা দেওয়া স্ট্যু-র চমৎকার গন্ধে আবার চাগাড় দিয়ে উঠল। এবং বিস্ময়কব ব্যাপার হল,—অনেকদিন পরে এই প্রথম তাঁর কাঁদতে ইচ্ছে হল না।

তবুও তিনি তৃপ্তি নিয়ে খেতে পারলেন না। সোনালি চুলের পরিবেশনকারিণীটি যথেষ্ট ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের প্রয়োজন বোঝাতে পারেননি। বাকি কারণ, রেস্তোরাঁয় যে মাংস পাওয়া যাচ্ছে তা ছোট ছোট তিতির পাখির মাংস। রিওহাচার বাড়িতে তিনি তিতির পাখি পুষতেন। এক কোনায় বসে পাদ্রিটি খাচ্ছে। শেষপর্যন্ত প্রুদেনসিয়াব দোভাষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সে বুঝিয়ে দিল ইউরোপে যুদ্ধকালীন বিধিনিষেধ এখনও বহাল রয়েছে। সুতরাং ঈশ্বরের আশীর্বাদে পাহাড়ের ছোট ছোট পাখির মাংস খাওয়াব সুযোগ পাওয়া গেছে বলে তিনি যেন নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে করেন। প্রুদেনসিয়া কিন্তু এই মাংস খেতে বাজি নন।

'আমার পক্ষে এই মাংস খাওয়া আর নিজের সন্তানের মাংস খাওয়া একই ব্যাপার',—তিনি মন্তব্য করলেন।

সুতরাং ন্যুড্‌ল স্যুপ, এক প্লেট স্কোয়াশ সেদ্ধ, কয়েক চিলতে বাসি শুয়োবেব মাংস আব মার্বেল পাথরের মতো শক্ত এক টুকবো রুটি খেয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। তাঁর খাওয়ার সময় পাদ্রিটি একটা চেয়ার টেনে এনে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেবোর টেবিলেব পাশে বসে নিজের জন্যে পরিবেশনকারিণীকে এক কাপ কফি দেওয়ার অনুবোধ জানাল। আদতে যুগোশ্লাভিয়ার মানুষ হলেও ধর্মপ্রচারেব অভিজ্ঞতা বলিভিয়ায়। খটোমটো স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলার সময় তার শারীরিক অভিব্যক্তিও ফুটে ওঠে। পাদ্রিটিকে দেখে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেবোব মনে হল বিশেষ কোনও প্রশ্রয়ের অযোগ্য অতি সাধারণ লোক। তার হাতের নখগুলি ভাঙা এবং নোংরা ; নিঃশ্বাস থেকে ভেসে আসছে বাসি পেঁয়াজের গন্ধ ; পাদ্রির পক্ষে এইসব অশোভন হলেও মনে হচ্ছে এগুলি তার চরিত্রের অঙ্গ। এত কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও লোকটি ঈশ্ববেব সেবক বলে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেবো সন্তুষ্ট। দেশ থেকে এত দূরে এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় হল যার সঙ্গে কথা বলা যায় ভেবে তিনি আরও প্রীত।

স্থান-কাল ভুলে গিয়ে তাঁরা হালকা মেজাজে কিন্তু অনুচ্চ কণ্ঠে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগলেন। আশপাশের টেবিল থেকে আস্তাবলের মতো বিকট আওয়াজ ভেসে আসছে। শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো ইতোমধ্যেই ইতালি এবং এখানকার মানুষ সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন। তাদেরকে তাঁর পছন্দ হয়নি। বাড়াবাড়ি করার দিকে প্রবল ঝোঁক অথবা প্রচুর পবিমাণে পাখির মাংস

খাওয়ার জন্যে নয়,—জলে ডুবে যাওয়া মৃতদেহ সৎকার করতে যাদের অনীহা তাদেরকে পছন্দ করা সম্ভব নয়।

কফি ছাড়াও এক পাত্র গ্রাপ্পা মদ প্রুদেনসিয়ার খরচে খেতে খেতে তাঁর ভুল শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করছিল পাদ্রিটি। সে তাঁকে অবহিত করছিল যে যুদ্ধের সময় ইতালিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে ওঠে। নেপল্‌সের খাঁড়িতে প্রতিদিন ভোরবেলায় ভেসে ওঠা মৃতদেহ উদ্ধার ও শনাক্তকরণ এবং রোমের পুণ্যভূমিতে সমাধিস্থ করার মানবিক কাজ এই সংস্থাটি নিয়ম মেনে করত। এ ব্যাপারে সংস্থাটি এখনও সক্রিয়।

বহু শতাব্দী আগেই ইতালির মানুষ জীবনের সারসত্য বুঝে ফেলেছে। জীবন একটাই। তাই যতদূর সম্ভব ভালোভাবে জীবন কাটানো দরকার। এই জ্ঞান তাদের একদিকে যেমন হিসেবি ও বাচাল করেছে অন্যদিকে করেছে নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্ত,—একটানা বলে নিয়ে পাদ্রি কথা শেষ করে।

প্রুদেনসিয়া অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন,—'তার মানে আপনি বলতে চান ওরা জাহাজও থামাবে না?'

'বন্দর কর্তৃপক্ষকে রেডিও বার্তা পাঠানো হয়',—পাদ্রি জবাব দেয়। 'এতক্ষণে নিশ্চয়ই তারা খবর পেয়ে সমুদ্র থেকে মৃতদেহটা উদ্ধার করে ঈশ্বরের নামে তাকে সমাধি দিয়ে দিয়েছে।'

এই আলোচনায় দু'জনেরই মেজাজ পালটিয়ে গেল। খাওয়া শেষ হওয়ার পরই তিনি খেয়াল করলেন সব কটা টেবিলেই লোক ভর্তি। সব থেকে কাছের টেবিলটায় কয়েকজন পর্যটক প্রায় খালি গায়ে বসে নিঃশব্দে খাচ্ছে। তাদের মধ্যে যাদের প্রেমের খিদেটা একটু বেশি তারা খাবার খাওয়ার বদলে একে অপরকে চুমু খেয়ে চলেছে। স্থানীয় লোকেরা কাউন্টারের কাছে পেছনের দিকের একটা টেবিলে বসে জলের মতো দেখতে একরকমের মদ খেতে খেতে পাশা খেলছে। শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো হৃদয়ঙ্গম করলেন এই অবাঞ্ছিত শহরে একমাত্র তিনিই এসেছেন এক বিশেষ কারণে।

'আপনার কি মনে হয় পোপের সাক্ষাৎ পাওয়া খুব কঠিন কাজ?'—প্রুদেনসিয়া জিজ্ঞাসা করলেন।

জবাবে পাদ্রি বলল যে গরমকালে কোনও কাজই সহজ নয়। কাস্তেল গানদোলফোতে উনি ছুটি কাটাতে যান। আর প্রতি বুধবার বিকেলে সারা পৃথিবীর তীর্থযাত্রীদের দর্শন দেন। দর্শনের প্রবেশমূল্য খুবই সস্তা,—মাত্র কুড়ি লিরা।

'আর স্বীকারোক্তির জন্যে?'—প্রুদেনসিয়া প্রশ্ন করলেন।

তাঁর অজ্ঞতায় একটু অবাক হয়ে পাদ্রি বলল,—'রাজা-মহারাজা ছাড়া অন্য কারও স্বীকারোক্তি পোপ শোনেন না।'

'আমি বুঝি না আমার মতো দূর দেশ থেকে আসা দরিদ্র মহিলাকে কেন এই অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করা হবে',—প্রুদেনসিয়া মন্তব্য করেন।

তাঁকে আশ্বস্ত করে পাদ্রি বলল,—'অবিশ্যি সব রাজারাই যে এই অনুগ্রহ লাভ করেন এমন নয়। অপেক্ষা করতে করতে অনেকে মারাও যান। বলুন না, এমন কী সাংঘাতিক পাপ করেছেন যা পোপের কাছে স্বীকারোক্তি করার জন্যে এত দূর থেকে একা একা চলে এলেন।' শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো ক্ষণেকের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়লেন আর পাদ্রিটি এই প্রথম তাঁর মুখে হাসি দেখতে পেল।

'মাতা মেরির জয় হোক! যদি পোপের দর্শন পাওয়া যায়',—বলে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'এ আমার সারা জীবনের স্বপ্ন।'

আসল ব্যাপার হল তিনি এখন ভীত এবং দুঃখিত। রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরোতে চাইছেন তিনি। আর শুধু রেস্তোরাঁই নয়, এতটুকু দেরি না করে ইতালি ত্যাগ করাও তাঁর একমাত্র অভিপ্রায়। পাদ্রি ভাবল দুঃস্থ মহিলাটির কাছ থেকে যা পাওয়ার ছিল পাওয়া হয়ে গেছে। অতএব তাঁকে বিদায় জানিয়ে সে অন্য টেবিলের দিকে গুটি গুটি রওনা দিল যাতে দাতব্য দেখিয়ে কেউ আরেক কাপ কফির ব্যবস্থা করে দেয়।

রেস্তোরাঁ থেকে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো যখন বেরোলেন ততক্ষণে শহরের দৃশ্য পালটে গেছে। রাত্রি ন'টায় সূর্যের আলো দেখে তিনি তো অবাক। রীতিমতো শোরগোল তুলে রাস্তার দখল নিয়ে

নিয়েছে স্বাস্থ্যান্বেষীদের দল। রাস্তার ভিড় দেখে তিনি রীতিমতো বিচলিত। পাগলের মতো হর্ন বাজিয়ে ছুটতে থাকা স্কুটারগুলো জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। পেছনের সিটে সুন্দরী মেয়েদের বসিয়ে লোকেরা খালি গায়ে স্কুটার চালাচ্ছে। সুন্দরীরা এক হাতে তাদের সঙ্গীদের কোমর জড়িয়ে ধরে রয়েছে। তরমুজে সাজানো টেবিল আর হুকে ঝোলানো শুয়োরের মাংসের যে দোকানগুলো রাস্তা জুড়ে ব্যাবসা করছে স্কুটারগুলো তাদের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছে।

চারদিকে উৎসবের পরিবেশ হলেও শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরোর পক্ষে পরিস্থিতিটি মোটেও সুখকর নয়। বরং সাংঘাতিক যন্ত্রণাদায়ক। হোটেলের রাস্তাটাও গুলিয়ে ফেলেছেন তিনি। হঠাৎ নজরে এল চারপাশে বেশ সন্দেহজনক একইরকমেব সব বাড়ি আর সেইসব বাড়িব রকে বসে রয়েছে অসুখী মুখের মেয়েরা। ঘাবড়ে গেলেন শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেবো। প্রথমে ইতালিয়ান পবে ইংরেজিতে কিছু বলতে বলতে একটা লোক তাঁকে অনুসরণ করল যার চমৎকাব পোশাক, হাতে সোনার ভারী আংটি আর গলার টাই-এ গাঁথা বয়েছে হিরে বসানো টাইপিন। কোনও উত্তর না পেয়ে লোকটি পকেট থেকে একতাড়া ছবির কার্ড বের করে তাঁকে দেখাল। শুধু একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো বুঝতে পারলেন যে প্রকৃত নরকের মধ্যে দিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে তিনি প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গিয়ে দেখেন আবার সমুদ্রের ধারেই পৌঁছে গেছেন। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে গোধূলির আলো। বিওহাচা বন্দরেব মতো পচা মাছেব গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বলে নেপল্‌স শহরটাকে এখন পবিচিত বলে মনে হচ্ছে। নির্জন সমুদ্র সৈকতেব ধারে নানা রঙেব হোটেল আর শব বহনকারী শকটেব মতো ট্যাক্সিগুলোকে দেখে তার মনে হল হোটেলটা খুব বেশি দূবে নয়। হিবের মতো প্রথম তারাটা আকাশে জ্বলজ্বল কবছে। খাঁড়ির শেষ প্রান্তেব জেটিতে নোঙব করা একমাত্র জাহাজটিব আলোকিত ডেক দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে এই জাহাজের যাত্রী হয়েই তিনি এই শহরে এসেছিলেন। তাঁর কাছে যে জাহাজটার আব কোনও তাৎপর্য নেই তাও হৃদয়ঙ্গম হল। বাঁ দিকেব বাস্তাটা ধরে বেশি দূব এগোতে পাবলেন না। একদল কৌতূহলী পথচারীকে বন্দুকধাবী পুলিশেব দল সামনে এগোতে দিচ্ছে না। হোটেলেব সামনে এক সারি অ্যাম্বুলেন্স দরজা খুলে অপেক্ষা কবছে।

বাস্তাব লোকেদের কাঁধে ভর দিয়ে উঁচু হযে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো আবাব সেই ইংবেজ পর্যটকদের দেখতে পেলেন। বাড়ির ভেতব থেকে নিয়ে এসে তাদেব একে একে স্ট্রেচাবে শোযানো হচ্ছে। সবাই স্থির হয়ে শুযে রয়েছে। সৌম্য, গম্ভীর লোকগুলোর পবনে নৈশভোজের আনুষ্ঠানিক পোশাক। ফ্লানেলের ট্রাউজার্স, কোনাকুনি ডোরা কাটা টাই, গাঢ় রঙের জ্যাকেটেব বুক পকেটে এমব্রয়ডাবি করে ছাপানো রয়েছে ট্রিনিটি কলেজের লোগো। দেখে মনে হচ্ছে তারা প্রত্যেকে অন্যজনেব অবিকল প্রতিরূপ। প্রতিবেশীরা বারান্দা থেকেই ঘটনাব ওপব নজর বাখছে। কৌতূহলী লোকেরা রাস্তা জুড়ে স্টেডিয়ামের দর্শকদের মতো সমস্বরে মৃতদেহের সংখ্যা গুনতে ব্যস্ত। মোট সতেরোটি মৃতদেহ। এক একটা অ্যাম্বুলেন্সে দু'টি কবে মৃতদেহ তোলাব পর অ্যাম্বুলেন্সগুলো যুদ্ধের সাইরেনেব মতো বিকট শব্দ করতে কবতে চলে গেল।

এতসব ভয়ানক অভিজ্ঞতায় স্তম্ভিত হযে শ্রীমতী প্রুদেনসিযা লিনেবো যেন একটা ঘোরের মধ্যে লিফটে চড়লেন। লিফটে অন্য হোটেলেব বাসিন্দাদের ঠাসাঠাসি ভিড়। দুর্বোধ্য ভাষায় তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে ব্যস্ত। চারতলা ছাড়া অন্য সব তলায় তাদের গন্তব্য। চারতলায় সব আলো জ্বলছে। তবে কাউন্টার অথবা লবির আরাম কেদাবায যেখানে তিনি সতেরোজন ঘুমন্ত ইংরেজের গোলাপি হাঁটু দেখেছিলেন সেখানে কেউ নেই। পাঁচতলার হোটেলকর্ত্রী এতই উত্তেজিত যে কথার রাশ টেনে ধরতে না পেরে দুর্ঘটনাটার বিষয়ে মন্তব্য করে ফেললেন।

'ওরা সবাই মরে গেছে',—পরিশুদ্ধ স্প্যানিশ ভাষায় শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেবোকে জানালেন হোটেলকর্ত্রী। 'রাতের খাবারে ওরা সবাই ঝিনুকের স্যুপ খাওযায় এমন বিষক্রিয়া। চিন্তা করুন, অগস্ট মাসে কেউ ঝিনুক খায়!'

শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরোকে ঘরের চাবিটা দিয়ে দেওয়ার পরে হোটেলকর্ত্রী অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ইতালির স্থানীয় উচ্চারণে বলতে শুরু করলেন,—'ভাগ্যিস আমাদের এখানে খাওয়ার বন্দোবস্ত নেই। তাই আমাদের এখানে যারা রাত কাটায তারা পরের দিন সকালেও অক্ষত থাকে।' গলা থেকে বেরিয়ে আসা কান্নার দমক কোনওমতে সামলে নিয়ে শ্রীমতী প্রুদেনসিয়া লিনেরো শোবার ঘরের দরজায় ছিটকিনি দিয়ে দিলেন। ছোট লেখার টেবিল আর আরাম কেদারাটা দরজার গায়ে সাঁটিয়ে দিলেন। তারপর এই বিভীষিকাময় দেশে যেখানে অজস্র অপ্রিয় ঘটনা একই সঙ্গে ঘটে তাদের প্রতিহত করার জন্যে ট্রাঙ্কটা দিয়ে গড়ে তুললেন এক অপ্রতিরোধ্য দেওয়াল। এবার বৈধব্যের পোশাক পরে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে বিষক্রিয়ায় মৃত সতেরোজন ইংরেজ পর্যটকের আত্মার শান্তি কামনা করে সতেরোবার মালা জপলেন।

মূল শিরোনাম Diecisiete ingleses envenenados

স্বপ্ন ফিরি করি

হাভানার রিভিয়েরা হোটেলের লাউঞ্জে বসে সকাল ন'টা নাগাদ প্রাতরাশ সারছিলাম। ঝলমলে রৌদ্রস্নাত বালুকাবেলায় একটা বিশাল জোরালো ঢেউ সমুদ্র থেকে এসে আছড়ে পড়ল। কয়েকটা গাড়িকে উড়িয়ে নিয়ে গেল ঝোড়ো হাওয়া। কোনওটা সমুদ্রের পাশের চওড়া রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল কোনওটা আবার দাঁড় করানো ছিল রাস্তার ধারে। ঢেউয়ের ধাক্কায় একটা গাড়ি তো হোটেলের এক পাশের দেওয়ালে প্রায় গেঁথেই গেল। ফলে কুড়িতলা হোটেলটায় ছড়িয়ে পড়ল সাংঘাতিক আতঙ্ক। যেন কোনও ডিনামাইটের বিস্ফোরণে বাড়িটার সমস্ত কাচের জানালা ভেঙেচুরে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। প্রতীক্ষালয়ের ভেতরে অপেক্ষারত পর্যটকদের অনেকেই আসবাবপত্রের সঙ্গে উপরে নিক্ষিপ্ত হল। তাদের মধ্যে অনেকে আবার শিলাবৃষ্টির মতো ছড়িয়ে পড়া কাচের টুকরোয় গুরুতব আহত হল। ঢেউটা নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী এবং ধাক্কাটাও খুবই জোরালো। সমুদ্রের বাঁধানো পাড় আর হোটেলের মধ্যেকার দু' লেনের চওড়া রাস্তা পেরিয়ে এসেও হোটেলের ঘষা কাচের শক্তপোক্ত জানালা গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো শক্তি ছোটখাটো ঢেউয়ের থাকার কথা নয়।

দমকলবাহিনীর কর্মীদেব সহায়তায় কিউবান স্বেচ্ছাসেবকেরা ঘণ্টা ছয়েকেরও কম সময়ে সব ভগ্নাবশেষ সরিয়ে দিল। সমুদ্রে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়ে একটা দরজা লাগিয়ে দেওয়ায় সবকিছু আবার ফিরে এল আগের অবস্থায়। দেওয়ালে গেঁথে যাওয়া গাড়িটি ক্রেন দিয়ে বের করে আনাব পরে দেখা গেল চালকের আসনে নিরাপত্তা বেল্ট দিয়ে বাঁধা বয়েছে একজন মহিলার দেহ। ঢেউয়ের ঝাপটটা এতই জোরালো ছিল যে তার দেহের কোনও হাড়গোড়ই আর আস্ত নেই। বিধ্বস্ত মুখ, পা থেকে ছিটকে যাওয়া জুতো, ছিন্নভিন্ন পোশাক এবং হাতের আঙুলে সাপের নকশার সোনার আংটি। সাপেব চোখের জায়গায় আংটিটায় বসানো ছিল একটা পান্না। পুলিশ তাকে নবনিযুক্ত পর্তুগালের রাষ্ট্রদূতের ছেলেমেয়েদের গভর্নেস্ বলে শনাক্ত করল। মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আগে রাষ্ট্রদূতের পরিবারেব সঙ্গে মহিলা হাভানায় এসেছিলেন। সেদিনই সকালবেলায় তিনি নতুন গাড়ি চালিয়ে বাজার করতে বেরিয়েছিলেন। স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রে খবরটা পড়েছিলাম। সেখানে তার নাম ছিল না। কিন্তু সাপেব নকশার সোনার আংটিটির বিবরণ সংক্রান্ত তথ্যটি আমায় ধন্দে ফেলে দেয়। আংটিটা কোন আঙুলে পরা ছিল তা অবিশ্যি খববের কাগজ থেকে জানা যায়নি।

এই খবরটা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমার আশঙ্কা দুর্ঘটনায় মৃত মহিলাটি বোধ হয় সেই অবিস্মরণীয় মহিলা যাঁর প্রকৃত নাম আমার জানা নেই। তবে তিনি ঠিক এইরকমই একটা আংটি, যা সেকালেও ছিল খুবই সাধারণ, পরতেন ডান হাতের তর্জনীতে। চৌত্রিশ বছর আগে ভিয়েনাব এক পানশালায় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। সেখানে সেদ্ধ আলুর সঙ্গে সসেজ্ খাচ্ছিলেন তিনি, আর সঙ্গে ছিল বিয়ার। ওই পানশালাটা ছিল লাতিন আমেরিকার ছাত্রছাত্রীদের আড্ডার জায়গা। আমি সেদিনই রোম থেকে ভিয়েনায় পৌঁছোই। সেপ্রানো গায়িকার মতো অপূর্ব লম্বা গলা, ওভারকোটের কলারটা এলিয়ে থাকা শেয়ালের লেজের মতো আব হাতের আঙুলে সাপের চেহারার মিশরীয় আংটি,— আমার মনে গভীর ছাপ ফেলে। তাঁর অনাবশ্যক ও জোরালো অথচ খটোমটো উচ্চারণ এবং অত্যন্ত নিম্ন মানের অনর্গল স্প্যানিশ শুনে পানশালায় উপস্থিত লোকজনেদের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই অস্ট্রিয়ান বলে মনে হয়েছিল। তবে ধারণাটা ঠিক নয়। তাঁর জন্ম কলোম্বিয়ায় এবং প্রায় শৈশবেই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি সঙ্গীত শিক্ষার জন্যে অস্ট্রিয়ায় চলে আসেন। আমাদের সাক্ষাতের সময় তাঁর বয়স ছিল তিরিশের কোঠায়। সুন্দরী না হওয়ার জন্যে এবং বিভিন্ন অসুবিধের মধ্যে জীবন কাটার ফলে

অসময়ে তিনি আরও বুড়িয়ে গিয়েছিলেন। অথচ তিনি মানুষ হিসেবে চমৎকার এবং ভয়াবহও বটে।

ভিয়েনা তখনও এক প্রাচীন রাজকীয় শহর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের পৃথিবীতে দুটি পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাতের মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে শহরটা কালোবাজারি এবং আন্তর্জাতিক গুপ্তচরবৃত্তির স্বর্গরাজ্য। অবশ্য পলাতক এই স্বদেশবাসীর জন্যে ভিয়েনার থেকে উপযুক্ত জায়গা আর কিছু হতে পারে বলে আমার মনে হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের জন্যে নির্ধারিত কাউন্টারের এক কোনায় বসে তিনি একমনে খেয়ে যাচ্ছিলেন। নিশ্চয়ই সেটা কোনও এক বিশেষ আনুগত্যবোধের পরিচায়ক। কারণ, অন্য কাউন্টার থেকে খাবার কেনার সামর্থ্য তাঁর ছিল। এমনকি যারা তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাচ্ছিল তাদের খাবারের দাম চুকিয়ে দিতেও তিনি সক্ষম। তাঁর আসল নাম তিনি কখনও আমাদের বলেননি। আমরা সকলেই তাঁকে একটা খটোমটো জার্মান নামে ডাকতাম। লাতিন আমেরিকার ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে ফ্রাউ ফ্রিডা বলেই ডাকত। পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে একটা অভদ্র প্রশ্ন করেছিলাম। প্রশ্নটা ছিল,—জন্মভূমি, প্রবল ঝোড়ো হাওয়া এবং খাড়াই পাহাড় ঘেরা কিন্দিও ছেড়ে এই সুদূর ভিয়েনায় এসে তিনি কীভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন,—'আমি স্বপ্ন ফিরি করি।'

বাস্তবে সেটাই ছিল তাঁর একমাত্র পেশা। প্রাচীন কালদাস্ শহরের এক ধনী ব্যবসায়ীর এগারোটি সন্তানের মধ্যে তিনি তৃতীয়। কথা বলতে শেখাব পর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতো তিনিও সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশের আগে যখন মনের অবচেতন সতেজ থাকে, স্বপ্ন বর্ণনা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। সাত বছর বয়সে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তাঁর এক ভাই নদীর বাণেব ঘূর্ণি স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। তাঁব মা ছেলেদের অত্যন্ত পছন্দেব ঝরনায় স্নান করা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু ফ্রাউ ফ্রিডা ততদিনে নিজস্ব পদ্ধতিতে ভবিষ্যদ্বাণী শিখে গেছেন।

'স্বপ্নের অর্থ কি?' তিনি প্রশ্ন করেছিলেন,—'এমন নয় যে জলে ডুবে যাবার অজুহাতে মিষ্টি খাওয়া নিষিদ্ধ।'

মেয়ের দেখা স্বপ্নের এমন বিশ্লেষণ করে একটা পাঁচ বছরের বাচ্চাছেলের, যার প্রতি রবিবাব লজেন্স না হলে চলে না, ওপর বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়া নেহাতই অন্যায় অত্যাচার। কিন্তু মেয়ের এই ক্ষমতা সম্পর্কে মায়েব পূর্ণ আস্থা ছিল। সেই জন্যে মেয়ে যে বিষয়ে সাবধান হতে বলেছিল তা কঠোরভাবে পালন করা হয়। কিন্তু বিধি বাম। মায়ের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে লুকিয়ে লজেন্স খাওয়ার সময় তা গলায় আটকে গিয়ে ছেলেটি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মাবা যায়। এবং তাকে কোনওভাবেই বাঁচানো যায়নি।

ভিয়েনার প্রবল শীতে নিদারুণ আর্থিক সংকটে পড়াব আগে ফ্রাউ ফ্রিডা কখনও ভাবেননি যে এই ক্ষমতা ভাঙিয়ে তাঁকে রোজগার করতে হবে। মরিয়া হয়ে কাজ খোঁজার সময় প্রথম যে বাড়িটি তাঁর থাকার পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে হযেছিল সেখানেই তিনি হাজিব হলেন। কী কাজ করতে পারেন প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি সত্যি কথাটাই বললেন। 'আমি স্বপ্ন দেখি।' সংক্ষিপ্ত উত্তরে খুশি হয়ে গৃহকর্ত্রী তাঁকে নিযুক্ত করেন। হাতখরচ চালানোর মতো সামান্য বেতন, দিনে তিনবার ভোজন আর থাকার জন্যে একটি সুন্দর ঘর। রোজ সকালে প্রাতরাশের আসরে সকলে তাঁর কাছে নিকট ভবিষ্যতের কথা জানতে চাইত। নিজের সঞ্চয়ের উপব নির্ভরশীল পরিবারেব কর্তা অতি সজ্জন ব্যক্তি। রোমান্টিক চেম্বাব সংগীতের ভক্ত বাড়ির গিন্নি সবসময়ই হাসি-খুশিতে উচ্ছল। তাঁদের দুই মেয়ে, বয়স এগারো এবং নয়। ফ্রাউ ফ্রিডার মতো একজনকে পেয়ে সবাই খুব খুশি। শুধু একটাই শর্ত তাঁকে মেনে চলতে হত,— স্বপ্নের মাধ্যমে সংসারের সকলের রোজকার বিধিলিপিব ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে।

অনেক দিন যাবৎ এই কাজ তিনি নিষ্ঠাব সঙ্গে পালন করে গেছেন, বিশেষত যুদ্ধের সময় যখন বাস্তবের বিভীষিকা দুঃস্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পরিবারের সদস্যেরা প্রতিদিন কী কী করবে বা কীভাবে করবে তা ঠিক করে দেওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁবই ছিল। এইভাবে এমন একটা সময় এল যখন বাডির সকলেই তাঁর কথাতে ওঠাবসা করত। বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী হয়ে উঠলেন তিনি। অত্যন্ত সাদামাটা কাজের জন্যেও তাঁর অনুমতি নেওয়া হত। আমি ভিয়েনায় থাকার সময় মারা গেলেন

গৃহকর্তা। উদারতা দেখিয়ে তাঁর আয়ের একটা অংশ তিনি উইল করে ফ্রিডাকে দিয়ে যান। শুধু একটি শর্ত,—পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যদের জন্যে আমৃত্যু ফ্রাউ ফ্রিডাকে স্বপ্ন দেখে যেতে হবে।

তখন ভিয়েনায় আমার ছাত্রজীবন নানারকমের সমস্যায় দীর্ণ। একমাসের উপর এমন অবস্থা চলছে। যে অর্থের আশায় দিন গুনছি তা কিছুতেই এসে পৌঁছোচ্ছে না। এমন অর্থকষ্টের দিনে পানশালায় ফ্রাউ ফ্রিডার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব এবং তাঁর উদার আচরণ উৎসবের আবহাওয়া সৃষ্টি করত। একদিন রাতে বিয়ার খেয়ে তৃপ্ত হবার পর পরম আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি চুপিচুপি একটি অত্যন্ত জরুরি নির্দেশ দিলেন আমাকে।

'শুধু তোমাকে বলার জন্যেই আজ এখানে এসেছি। কাল রাতে স্বপ্নে তোমায় দেখেছি। এই মুহূর্তে ভিয়েনা ছেড়ে চলে যাও; আগামী বছর পাঁচেকের মধ্যে এখানে ফিরে এসো না।'

তাঁর আত্মবিশ্বাসকে পুরোপুরি যথার্থ মনে হওয়ায় সেই রাতেই শেষ ট্রেন ধরে আমি রোমে চলে যাই। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এই আত্মবিশ্বাস আমার মনে এমন এক প্রভাব সৃষ্টি করে যে সেদিন থেকে নিজেকে এক অদেখা বিপদের হাত থেকে বেঁচে ফিরে আসা ভাগ্যবান বলে মনে করতাম। তারপর থেকে আর ভিয়েনায় ফিরে যাইনি।

হাভানার দুর্ঘটনার আগে আচমকা একদিন ঘটনাচক্রে ফ্রাউ ফ্রিডার সঙ্গে আমার বার্সেলোনায় দেখা হয়েছিল। যদিও এই সাক্ষাৎকারটি আমার কাছে এখনও রহস্যজনক। গৃহযুদ্ধের পরে পাবলো নেরুদা সেদিনই প্রথম স্পেনের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন। যথেষ্ট সময় নিয়ে অলস ভঙ্গিতে তিনি ভালপারাইসোর দিকে রওনা দিয়েছিলেন। যাওয়ার পথে থামলেন বার্সেলোনায়। পুরো একটা সকাল তিনি আমাদের সঙ্গে পুরোনো বইয়ের দোকানে কাটালেন। অনেক খোঁজার পর একটা বিবর্ণ, ছেঁড়াখোঁড়া বই কিনলেন যার দাম তাঁর রেঙ্গুনের রাষ্ট্রদূতের দপ্তরের চাকরির দু' মাসের বেতনের দ্বিগুণের থেকেও বেশি। অসুস্থ হাতির মতো লোকজনের মধ্যে তিনি ঘুরে বেড়ালেন এবং যা কিছু চোখে পড়ছিল তার কলাকৌশল সম্পর্কে শিশুসুলভ কৌতূহল দেখাচ্ছিলেন। তাঁর ধারণা সমস্ত পৃথিবী সুতোয় বাঁধা এক অতিকায় খেলনা।

রেনেসাঁ যুগের পোপদের সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে অর্থাৎ একাধারে পেটুক এবং বিদগ্ধ, নেরুদার মতো অন্য কাউকে সেই মতের এত কাছাকাছি যেতে দেখিনি। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাবার টেবিলে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করার পর তাঁর স্ত্রী মাতিলদে নেরুদার গলায় বাচ্চাদের মতো একটা বিব্ পরিয়ে দিলেন। বিব্‌টা এত বড় যে মনে হচ্ছিল যে খাবার টেবিলের বদল চুলকাটার সেলুনে সেটাকে বেশি ভালো মানায়। তবে একমাত্র এইভাবেই অর্থাৎ বড় বিব্ ব্যবহার করেই নেরুদার সস্ দিয়ে বুক ভিজিয়ে ফেলার প্রবণতা সামলানো যেত। দৃষ্টান্ত হিসেবে সেদিনকার কারভাইয়াসের ঘটনাটার কথা বলা যায়। দক্ষ শল্য চিকিৎসকের মতো দক্ষ হাতে তিনটি আস্ত বাগদা চিংড়ি কেটে-ছেঁটে গলাধঃকরণ করতে করতে আশপাশের প্রত্যেকের থালায় নজর রাখছিলেন তিনি এবং মজা করে অন্যদের থালা থেকে এটা ওটা তুলে নিচ্ছিলেন যাতে সকলের খাওয়ার উৎসাহ বাড়ে। গালিসিয়ার শামুক, কান্তাব্রিয়ার গেঁড়ি-গুগলি, আলিকান্তের বাগদা চিংড়ি এবং কোস্তা ব্রাভার সমুদ্রশশা (*এক ধরনের তারামাছ*) খেতে খেতে তিনি ফরাসিদের মতো কেবল রান্নার গল্পই করে যাচ্ছিলেন। বিশেষত নিজের দেশের অর্থাৎ চিলের প্রাচীন আমলের চিংড়ি, কাঁকড়া, গেঁড়ি প্রভৃতির রন্ধনশৈলীর গল্প তাঁর ভীষণ প্রিয়। হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে চিংড়ির দাঁড়ার মতো নিজের মাথাটা আমার দিকে ঘুরিয়ে খুব শান্তস্বরে মন্তব্য করলেন,—'পিছন থেকে অনেকক্ষণ ধরে কেউ আমার দিকে তাকিয়ে আছে।'

তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি ধারণাটা সঠিক। পরনে গাঢ় বেগুনি রঙের ওভারকোট, মাথায় পুরোনো ধরনের ফেল্ট টুপি চড়িয়ে নেরুদার থেকে তিনটে টেবিল দূরে বসে স্থির দৃষ্টিতে তিনি যেন গ্রাস করে চলেছেন পাবলো নেরুদাকে। বয়সের ছাপ এবং পৃথুলা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে চিনতে এতটুকুও অসুবিধা হয়নি। আমার মনে একটুও সন্দেহ ছিল না যে তিনিই সেই মহিলা যাঁর তর্জনীতে রয়েছে সাপের নকশার আংটি।

নেরুদা পরিবার যে জাহাজে চড়ে নেপল্‌স থেকে রওনা দিয়েছিলেন সেই জাহাজে তিনি থাকলেও তাঁদের মধ্যে আগে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। আমাদের টেবিলে আসার অনুরোধ জানানোয় তিনি আসন পরিবর্তন করলেন। স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু বলার জন্যে তাঁকে আমি অনুরোধ করলাম। কবি এবার বিস্মিত। এসব বিষয়ে তিনি কখনও গুরুত্ব দেননি কারণ তাঁর বরাবরেব বিশ্বাস যে স্বপ্নের কোনও দৈবশক্তি নেই।

তিনি বললেন,—'একমাত্র কবিতাই পারে ভবিষ্যদ্বাণী করতে।'

মধ্যাহ্নভোজের পরে বাধ্যতামূলকভাবে হাঁটার সময় ইচ্ছে করে একটু পিছিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য ফ্রাউ ফ্রিডার সঙ্গে স্মৃতিচারণ। তিনি জানালেন যে অস্ট্রিয়ার সম্পত্তি বিক্রি করে তিনি পর্তুগালের ওপোর্তো শহরে অবসর জীবনযাপন করছেন। তাঁর বর্ণনা অনুসারে পাহাড়ের উপর অবস্থিত দুর্গের মতো বাড়িটি থেকে নাকি দুই আমেরিকা মহাদেশের তটরেখা পর্যন্ত সমুদ্র দেখা যায়। সরাসরি উল্লেখ না করলেও তাঁর কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বপ্ন দেখার ক্ষমতার জন্যেই তিনি ভিয়েনার সেই অখ্যাত মনিবের সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। তবে তাঁর কথায় এবার আর চমৎকৃত হইনি। কারণ আমাব মনে হচ্ছিল স্বপ্ন তাঁর রুজি-রোজগারেব কৌশল ছাড়া অন্য কিছু নয়। এবং তাঁকে কথাটা বলেও ফেলি।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে তিনি বললেন,—'তুমি দেখছি আগের মতোই ঠোঁটকাটা রয়ে গেছ।' আমি আর কথা বাড়ালাম না। দলেব অন্যান্যরাও ততক্ষণে হাঁটা থামিয়েছে। 'রামব্লাস্‌ দে লস্‌ পাহারোস্‌'-এর টিয়াপাখিদের সঙ্গে চিলের অশালীন ভাষায় নেরুদার কখন কথা বলা শেষ হবে তার অপেক্ষায় সবাই সময় গুনছে। ফ্রাউ ফ্রিডা প্রসঙ্গ পালটিয়ে কথা শুরু করার পর আবার কথোপকথন শুরু হল।

'ভালো কথা, এখন কিন্তু ভিয়েনায় ফিরে যেতে পার',—কথাটা শুনেই আমি বুঝতে পারলাম আমাদের পরিচয়ের পর পার হয়ে গেছে তেরোটা বছর।

উত্তরে আমি বলি,—'আপনার স্বপ্ন মিথ্যে প্রমাণিত হলেও আমি আর ভিয়েনায় ফিরছি না।'

বেলা তিনটে নাগাদ আমি বিদায় নিলাম। এটা নেরুদার পবিত্র দিবানিদ্রার সময়। আমাদের বাড়িতেই তাঁর বিশ্রামের আয়োজন হয়েছিল। গুরুগম্ভীর সেই আয়োজন দেখে আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল জাপানি চা পর্বের কথা। ঘরের তাপমাত্রা যথাযথ রাখার জন্যে এবং কোনও বিশেষ দিক দিয়ে সূর্যের আলো আসার ব্যবস্থা যথাযথ রাখতে হলে কোন জানালাটা খুলে রাখা দরকার অথবা কোনটা বন্ধ করতে হবে ঠিকঠাক করার পর নিশ্ছিদ্র নীরবতা নিশ্চিন্ত করার পরে সম্পূর্ণ হল তাঁর দিবানিদ্রার বন্দোবস্ত। বিছানায় গা এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন নেরুদা এবং অপ্রত্যাশিতভাবে মিনিট দশেক বাদে শিশুদের মতো জেগে গেলেন। বালিশের ছাপ গালে লাগিয়ে বসাব ঘরে আসার পর তাঁকে বেশ সজীব লাগছিল।

'স্বপ্ন দেখা সেই মহিলাকে স্বপ্নে দেখলাম',—তিনি জানালেন।

স্বপ্নটা কী ছিল মাতিলদে জানতে চাইলেন। 'আমি স্বপ্নে দেখলাম সেই মহিলাটি স্বপ্নে আমাকে দেখছেন,'—নেরুদা বললেন। আমি মন্তব্য করলাম,—'এ তো বোর্হেসের গল্পের মতো শোনাচ্ছে।'

কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে নেরুদা প্রশ্ন করলেন,—'এই গল্পটা কি এর মধ্যেই লেখা হয়ে গেছে?'

'এখনও যদি না হয়ে থাকে, তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে',—আমি জবাব দিই। 'এবং তা হবে বোর্হেসের আরেকটি গোলকধাঁধা।'

কিছুক্ষণ বাদে সন্ধে ছ'টা নাগাদ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে ফিরে গেলেন নেরুদা। ওখানে একটা আলাদা টেবিলে বসে সবুজ কালি দিয়ে ফল্গুধারাব মতো কবিতা লিখতে শুরু করলেন। বইয়ের উৎসর্গপত্রের জন্যে এই কলমটা দিয়েই তিনি আঁকতেন ফুল-পাখি-মাছ। জাহাজ ছাড়ার প্রথম ঘণ্টা পড়াব পরে আমরা ফ্রাউ ফ্রিডাকে খুঁজতে লাগলাম। খুঁজে না পেয়ে তাঁকে বিদায় না জানিয়েই জাহাজ থেকে নেমে আসার সময় ট্যুরিস্ট ডেকে তাঁর দেখা পেলাম।

তিনিও সবেমাত্র দিবানিদ্রা সেরে উঠেছেন।

'স্বপ্নে কবিকে দেখলাম',—ফ্রাউ ফ্রিডা জানালেন। 'স্বপ্নে দেখলাম কবি স্বপ্নে আমাকে দেখছেন।' আমার চোখে মুখে বিস্ময়ের আভাস দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে ফ্রাউ ফ্রিডা প্রশ্ন করলেন,—'কী ব্যাপার?' কখনও কখনও অনেক স্বপ্নের মধ্যে এমন একটি স্বপ্ন আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে যায় যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনও সম্পর্কই নেই।

ফ্রাউ ফ্রিডাকে দেখতে আমি দুর্ঘটনাস্থলে যাইনি। কারও কাছে জানতেও চাইনি তাঁর সম্পর্কে। কিন্তু যখন জানতে পারলাম হোটেল রিভিয়েরার দুর্ঘটনায় যিনি মারা গেছেন তাঁর হাতের আঙুলে সাপের নকশার আংটি ছিল, তখন আমার মনে আর কোনও সংশয় রইল না। কয়েক মাস বাদে কোনও এক কূটনৈতিক নৈশভোজের আসরে পর্তুগালের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তাঁকে ওই মহিলার কথা জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারলাম না। যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে রাষ্ট্রদূত তাঁর সুখ্যাতি করলেন।

'ভাবা যায় না, তিনি সত্যিই কী অসাধারণ ছিলেন!' রাষ্ট্রদূত মন্তব্য কবলেন। 'এমন একজন মহিলাকে নিয়ে আপনার গল্প লেখার ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক।' একই ভঙ্গিতে তিনি ফ্রাউ ফ্রিডা সম্বন্ধে আরও অনেক চমকপ্রদ তথ্য জানালেন। তবু উপসংহার টানতে কোনও সুবিধা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বাধা না দিয়ে পারলাম না।

'উনি ঠিক কী কাজ করতেন বলুন তো?'

'কিচ্ছু না',—কিঞ্চিৎ নিরাশ হয়ে রাষ্ট্রদূত উত্তব দিলেন। 'স্বপ্ন দেখতেন।'

মূল শিরোনাম · Me alquilo para soñar

অগস্টের অপচ্ছায়া

দুপুরের একটু আগে আমরা আরেসো পৌঁছে গেলাম। দুর্গটা খুঁজে বের করতেই দু'ঘণ্টা লেগে গেল। দুর্গটা কিনেছেন ভেনেজুয়েলার কথাশিল্পী মিগুয়েল ওতেরো সিলভা। তুস্‌কানির গ্রামাঞ্চলের এক প্রত্যন্ত প্রান্তে শান্ত মনোরম পরিবেশে রেনেসাঁ আমলের এই দুর্গটার অবস্থান। অগস্টের গোড়ার দিকের গুমোট গরমে এক জমজমাট রবিবার। রাস্তায় পর্যটকদের ভিড়। সামান্য কিছু চেনা-জানা লোক খুঁজে পাওয়াও সহজ কাজ নয়। বেশ কয়েকবারের ব্যর্থ চেষ্টার পর গাড়িতে ফিরে এলাম। শহর ছেড়ে একটা রাস্তা ধরলাম। দু'পাশে সাইপ্রাস গাছের সারি। কিন্তু কোথাও কোনও দিকচিহ্ন নেই। জনৈকা বৃদ্ধা হাঁসের যত্নআত্তি করছিলেন। তিনিই দুর্গটার অবস্থান নির্দিষ্টভাবে বলতে পারলেন। বিদায় জানাবার আগে তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমাদের ওই দুর্গে রাত কাটাবার কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা। শুধু মধ্যাহ্নভোজই আমাদের উদ্দেশ্য বলে তাঁকে জানালাম। আসলে সেটাই ছিল আমাদের প্রাথমিক অভিপ্রায়। বৃদ্ধা বললেন, 'সেই ভালো। ওটা তো প্রেতপুরী।'

গিন্নি আব আমি বৃদ্ধাব সরল বিশ্বাসে হেসে উঠলাম। কারণ, দিনদুপুরে আমরা কেউই অশরীরী কোনও কিছুতে বিশ্বাস কবি না। কিন্তু আমাদের দু ছেলে, যাদের একজনেব বয়স সাত, আরেকজনেব ন' বছর, দারুণ মজা পেয়ে গেল। বক্তমাংসেব শরীরে কোনও প্রেতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে এই ভাবনায় ওরা মজে গেল।

মিগুয়েল ওতেরো সিলভা অনবদ্য অতিথিপবায়ণ। যেমন দারুণ পান-রসিক তেমনি ভালো লেখক। মধ্যাহ্নভোজের আসরে এমন সব খাদ্য সাজিয়ে আমাদেব জন্য অপেক্ষা কবছিলেন, যেগুলোকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। আমবা দেরিতে পৌঁছেছি। খাবার টেবিলে বসাব আগে দুর্গেব ভেতরটা দেখাব সময হল না। তবে বাইরের দিক থেকে দুর্গটাব চেহারা ভয় পাওযাব মতো নয। ফুলে ছাওযা খোলা উঠোনে বসে খাবার খেতে খেতে গোটা শহবটার দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠল। মন থেকে যে কোনও অস্বস্তি উবে যাওযার জন্য এমন দৃশ্য যথেষ্ট। এই পাহাড়ের মধ্যে ভিড় করে থাকা বাড়িগুলোয যেখানে নব্বই হাজার লোকের জায়গাই হয না সেখানে কত অমর প্রতিভার জন্ম হয়েছে বিশ্বাস করা কঠিন। মিগুয়েল ওতেবো সিলভা তাঁর ক্যারিবিয়ান কাযদার ঠাট্টা ছুঁড়ে দিযে বললেন,—তাঁদের মধ্যে কেউই আরেসোব সবচেয়ে নামী নয।

তিনি বললেন,—'তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন,—লুদোভিকো।' শুধুই নাম। পবিবারেব কোনও পদবি নেই। লুদোভিকো শিল্পকলা আব যুদ্ধের মহান পৃষ্ঠপোষক। তাঁব যন্ত্রণা দিয়ে গড়া এই দুর্গ। খাবার পুরো সময়টুকু ধবে লুদোভিকোর কথা শোনালেন মিগুয়েল। লুদোভিকোর বিপুল ক্ষমতা, বিপন্ন প্রেম, ভযংকব মৃত্যুর কথাই মিগুয়েল শোনালেন। তিনি আমাদের শোনালেন কেমন কবে হৃদযের ক্ষণিক উন্মাদনায় লুদোভিকো তাঁব প্রেমিকাকে সেই বিছানার ওপর ছুরি মেরেছিলেন যেখানে তাব একটু আগেই তাঁরা শরীর নিয়ে প্রেমোন্মত্ত ছিলেন। পোষা হিংস্র ও লড়িয়ে কুকুরটাকে নিজের ওপব লেলিযে দিযে লুদোভিকো কীভাবে টুকরো টুকবো হয়ে গিয়েছিলেন,—সে কাহিনিও শোনা হল। বেশ গুরুত্ব দিয়ে মিগুয়েল আমাদের আশ্বস্ত করলেন যে মাঝরাতেব পব বাড়িটার অন্ধকার ধবে লুদোভিকোর প্রেত হেঁটে-চলে বেড়িয়ে নিজের প্রেমের প্রায়শ্চিত্তের শান্তি খুঁজে বেড়ায়।

দুর্গটা সত্যিই বিশাল আর আলো-আঁধারিতে বিষাদময়। কিন্তু ভরা পেটে দিনের আলোয, খোশ মেজাজে লুদোভিকোব এই কাহিনিটিকে মিগুয়েলের আতিথ্য আপ্যায়নের অনেক আকর্ষণীয উপাদানেরই একটা বলে মনে হল। খাবার পর একটু ঝিমিযে নিযে কোনও আসন্ন বিপদেব আশঙ্কা

ছাড়াই ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বিরাশিটা ঘর। মালিক পরম্পরায় সেগুলোর কিছুটা পবিবর্তন হয়েছে। দোতলাটা সম্পূর্ণ সংস্কার করিয়েছেন মিগুয়েল। আধুনিক কায়দার শোয়ার ঘর। মার্বেল পাথরের মেঝে। বিশ্রাম, বসা ও শোয়ার জন্য এক-একটা আলাদা ঘর। ব্যায়ামের সাজসরঞ্জামও আছে। এর ওপর আছে চমৎকার ফুলে সাজানো খোলামেলা একটা আঙিনা যেখানে বসে আমরা মধ্যাহ্নভোজ সেরেছি।

তিনতলাটাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। শতাব্দীর পর শতাব্দী। ছিরিছাঁদহীন ঘরের পর ঘরে বহুযুগের পুরোনো আসবাবপত্র নিয়তির ভরসায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। একদম ওপরতলায় একটা ঘর যেমন ছিল ঠিক তেমনিভাবেই সংরক্ষিত রয়েছে। লুদোভিকোর শোয়ার ঘরটা পরিদর্শনের কথা সময় ভুলে গেছে।

এ এক অলীক মুহূর্ত। বিছানাটা পড়ে আছে। সোনালি সুতোয় বোনা পর্দা। চাদরের বিস্ময়কর কারুকাজ আত্মনিবেদিত প্রেমিকের শুকনো রক্তে এখনও জমাট হয়ে আছে। ফায়ার প্লেসের ছাইগুলো জমে বরফ হয়ে গেছে। শেষ জ্বালানি কাঠটাও পাথরে রূপান্তরিত। অস্ত্রাগারে অস্ত্রের ঝলকানি। সোনার ফ্রেমে বাঁধানো ফ্লোরেনটিনেব কোনও এক মহান শিল্পীর আঁকা এক বিষণ্ণ নাইটের তেলরঙা ছবিটা দেওয়ালে ঝুলছে। ছবিটা এখনও সমকালকে পেরিয়ে আসতে পারেনি। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল,— শোয়ার ঘরের সর্বত্র তাজা স্ট্রবেরির অলৌকিক গন্ধ।

তুস্কানিব গ্রীষ্মের দিনগুলো দীর্ঘ আর অলস। বাত প্রায় ন'টা পর্যন্ত দিগন্ত দেখা যায়। পাঁচটা বাজার পর দুর্গের মধ্যে হাঁটা শেষ হল। তারপর সান্‌ফ্রান্সেস্কো গির্জার দেওয়ালে পিয়েবো দেইয়া ফ্রান্সেস্কোর আঁকা ছবি দেখার জন্য মিগুয়েল জোরাজুরি কবতে লাগল। তারও পরে আঙিনার মধ্যে একটা গাছের তলায় বসে কফি খেতে খেতে কেটে গেল আরও কিছুটা সময়। অবশেষে স্যুটকেস নিতে ফিবে এসে দেখি, আমাদের জন্য খাবার সাজানো রয়েছে। সান্ধ্যভোজে আমরা বসে গেলাম।

খাওযাদাওয়া সাববার সময় রক্তিম সন্ধ্যাকাশে শুধু একটি তারা ভাসছিল। ছেলেরা রান্নাঘব থেকে মশাল জ্বালিয়ে ওপরতলায় অন্ধকার খুঁজতে চলল। টেবিলে বসে আমরা সিঁড়িতে বুনো ঘোড়াব পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। শোকার্ত দরজার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিবর্ণ ঘরের মধ্যে থেকে সহর্ষ চিৎকারে লুদোভিকোকে ডাকা হচ্ছে। রাতে এখানে ঘুমোনোর কুচিন্তা যাদেব মাথায় খেলেছে এটা তাদেবই চিৎকার। কিন্তু ওদের বাবণ করার মতো সামাজিক সাহসিকতা আমবা দেখাতে পারলাম না।

যা ভেবেছিলাম তাব উলটো হল। ঘুমটা ভালোই হল। দোতলার একটা শোয়ার ঘরে আমি আব আমার স্ত্রী, ছেলেরা পাশের ঘরে। দুটো ঘরকেই আধুনিকীকবণ করা হয়েছে। কোনও ঘরেই বিষণ্ণ ব্যাপারটা নেই। ঘুমের জন্য প্রতীক্ষা করতে করতে ঘড়ির কাঁটার বারোটা নিদ্রাহীন আঘাত শুনতে লাগলাম। হাঁস পালন করা সেই বৃদ্ধার ভয়ংকর সাবধানবাণী আমার মনে পড়ল। কিন্তু আমরা এত ক্লান্ত যে চট করে এক গভীর এবং ছেদহীন ঘুমে ঢলে পডলাম। সকাল সাতটার পর ঘুম থেকে উঠে দেখি জানালায় লতিয়ে ওঠা আঙুরলতায় সূর্য ঝলমল করছে। পাশ থেকে আমার স্ত্রী নিরীহভাবে শান্ত স্বরে মন্তব্য করলেন,—'কী বোকামি।' আমি নিজেব মনে বললাম,—'এই যুগে, এই জগতে,—এখনও অশরীরীতে বিশ্বাস!'

ঠিক তখনই তাজা স্ট্রবেরির গন্ধে চমকে উঠলাম। শেষ কাঠের টুকরোটা পাথর হয়ে গেছে। এক বিষণ্ণ নাইটের সোনার ফ্রেমে বাঁধানো ছবি তিন শতাব্দী পেরিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। গতরাতে যেখানে ঘুমিযে পড়েছিলাম, দোতলার শোয়ার ঘবে, আমরা সেখানে নেই। আমবা পড়ে আছি লুদোভিকোর শোয়ার ঘরেব শামিয়ানার নিচে। জানালায় ধুলো ভরা পর্দা, আব আমরা লুদোভিকোব অভিশপ্ত বিছানায, এখনও গরম বক্তে ভেজা চাদরের ওপর পড়ে রয়েছি।

মূল শিবোনাম Esoantos de agosto

মাননীয় রাষ্ট্রপতি, আপনার যাত্রা শুভ হোক

নির্জন পার্কের হলুদ পাতায় ছেয়ে থাকা কাঠের বেঞ্চিতে বসে রাজহাঁসগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি মৃত্যুচিন্তায় মগ্ন। রুপোয় মোড়ানো ছড়ির হাতলের ওপর ভর দিয়ে জোড়া করে রাখা রয়েছে তাঁর হাত দুটো। প্রথমবার জেনেভায় এসে তিনি দেখেছিলেন এই সরোবরটির জল শান্ত, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। গাংচিলের দল পোষা পাখির মতো তাঁর হাত থেকে খাবার খেয়ে যেত। সন্ধে ছ'টা বাজতে না বাজতেই হাতে রেশমী ছাতা নিয়ে, বড় কুঁচি দেওয়া অরগ্যান্ডি কাপড়ের স্কার্টে খসখস শব্দ ছড়িয়ে ছায়ামূর্তির মতো ঘুরে বেড়াত সেই সব মেয়েরা যাদের ভাড়া করা যায়। তাদের মধ্যে মাত্র একজনের এখন দেখা পাওয়া গেল। জনমানবহীন সরোবরের বাঁধানো ঘাটে সে ফুল বিক্রি করে। তাঁর জীবনেব মতো সব কিছুকেই যে সময় এমনভাবে শেষ করে দিতে পারে, তা বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর।

আরও অনেক বিশিষ্ট লোকের মতো তিনিও আত্মগোপন করে আছেন এই শহরে। তাঁর পরনে সাদা ডোরা কাটা গাঢ নীল বঙের স্যুট আর ব্রোকেডের কাজ করা জ্যাকেট। মাথায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের টুপির মতো শক্ত টুপি। বন্দুকধারী সৈনিকের মতো উদ্ধত তাঁর গোঁফ আর মাথায় রোমান্টিক কায়দায় ঢেউ খেলানো এক রাশ নীলচে কালো চুল। বীণা বাজিয়ের মতো তাঁর হাত। বাঁ হাতের অনামিকায় বিপত্নীকের অঙ্গুরীয়। চোখ জোড়া খুশিতে উজ্জ্বল। শুধু ত্বকের ওপর জমে থাকা ক্লান্তির ছাপ থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে তাঁর স্বাস্থ্যের হাল। এত কিছু সত্ত্বেও তিয়াত্তর বছর বয়সে তাঁব শরীরের কাঠামো রীতিমতো নজরকাড়া। যদিও সেদিন সকালেই তিনি অনুভব করছিলেন যে গর্ব করার মতো তাঁর কিছুই নেই। গৌরব আর প্রতিপত্তির দিনচিব বিদায় নিয়েছে। এখন শুধু মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা।

দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে এবার তিনি জেনেভায় এলেন। কী একটা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, সেটা যদি এখানকার ডাক্তাররা ধরে দিতে পারেন,—এমন একটা আশা নিয়েই এবারের আসা। মার্তিনিকের ডাক্তাররা বিষয়টা ধরতে পারেননি। ঠিক ছিল দু'সপ্তাহের বেশি থাকবেন না, কিন্তু প্রায় ছ'সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর এবং যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া সত্ত্বেও কেউ কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত কী হবে তাও কেউ বলতে পারলেন না। ব্যথার কারণ খুঁজতে লিভাব-কিডনি থেকে শুরু করে প্যাংক্রিয়াস-প্রস্টেট পর্যন্ত কিছুই বাদ না দিয়ে সব কিছুরই পরীক্ষা করা হল। অবশেষে এল সেই কঠিন দিনটি,—বৃহস্পতিবার। সেদিন সকাল ন'টায় স্নায়ুরোগের জনৈক বিশেষজ্ঞ তাঁকে সময় দিয়েছেন। আগে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের তুলনায় এঁব নামযশ কম।

ডাক্তারের চেম্বারটি সন্ন্যাসীদের আস্তানার মতো অনাড়ম্বর। ছোটখাটো চেহারাব গম্ভীর প্রকৃতির ডাক্তারের ডান হাতের বুড়ো আঙুলে প্লাস্টার জড়ানো। ঘরের আলো নেভানোর পর বোঝা গেল এক্স-রে পর্দায় একটা শিরদাঁড়ার ছবি জ্বলজ্বল করছে। ডাক্তার দেখিয়ে দেওয়ার পর তিনি বুঝতে পাবলেন ওটা তাঁরই কোমরের নিচের মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধির ছবি।

ডাক্তার বললেন,—'আপনার ব্যথাটা এইখানে।' কথাটা তাঁর পক্ষে সহজবোধ্য নয়। দ্রুত চলমান, স্থান পরিবর্তনকারী এই ব্যথাটা কোথায়, কখন যে চাগার দিয়ে ওঠে তা আন্দাজ করা তাঁর পক্ষেও মুশকিল। কখনও মনে হয় ডান দিকের পাঁজরে, কখনও বা তলপেটে। কখনও আবার কুঁচকিতে আচমকা ছোরা বেঁধার মতো তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন। একমনে তাঁর কথা শোনার পর ডাক্তাব মন্তব্য করলেন,—'সেই জন্যেই তো এতদিন ধরে ব্যাপাবটা ধরা পড়েনি।'

'এখন কিন্তু আমরা জানি ব্যথাটার কেন্দ্রবিন্দু ঠিক কোথায়' -কপালের এক পাশে তর্জনী ঠেকিয়ে

ডাক্তার আরও বললেন,—'মাননীয় রাষ্ট্রপতি, সব ব্যথার সূত্রপাত আসলে এইখানে।' নিদান দেওয়ার ভঙ্গিটি এতই নাটকীয় যে রাষ্ট্রপতি রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তবে ডাক্তারের শেষ মন্তব্য তাঁকে যথেষ্ট আশ্বস্ত করল। অনিবার্য এবং কিছুটা বিপজ্জনক একটা অস্ত্রোপচার এক্ষুনি করা দরকার। বিষয়টা কতখানি বিপজ্জনক জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তার অস্পষ্ট জবাব দিলেন,—'সঠিকভাবে বলা মুশকিল।' তারপরে একটু থেমে, বিশদ আকারে তিনি বোঝালেন যে অস্ত্রোপচার না করালে মারাত্মক কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। আবার অস্ত্রোপচারের ফলে বিভিন্ন মাত্রার পক্ষাঘাতের সম্ভাবনাও আছে বলে ডাক্তার মন্তব্য করলেন,—'তবে এটাও ঠিক যে দুটো বিশ্বযুদ্ধর পর চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেক উন্নতি হয়েছে। সুতরাং ধরেই নেওয়া যায় যে এইসব আশঙ্কা অমূলক।' সবশেষে ডাক্তার বললেন,—'চিন্তার কিছু নেই। আপনার কাজকর্ম সেরে নিন। তারপর যোগাযোগ করবেন। তবে ভুলে যাবেন না, যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভালো।'

এমন একটা দুঃসংবাদ আত্মস্থ করা মোটেও সহজ ব্যাপার নয়, বিশেষত বাইরের আবহাওয়ার হাল মোটেও সুবিধার নয়। খুব সকালে হোটেল থেকে বেরোনোর সময় জানালা দিয়ে ঝলমলে রোদ দেখা যাচ্ছিল বলে তিনি ওভারকোট ছাড়াই বেরিয়েছিলেন। 'চেমিন দু বিউ-সোলেইল'-এর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আস্তে ধীরে প্রেমিক-প্রেমিকাদের গোপন আস্তানা 'জার্দিন আঙ্গলাইস্' পর্যন্ত তিনি হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন। মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে করতে ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় কাটিয়ে দিলেন সেখানে। তখনই খেয়াল হল,—হেমন্তকাল এসে গেছে। সরোবরের জল ঝঞ্ঝামুখর সমুদ্রের মতো উত্তাল। গাংচিলদের সন্ত্রস্ত করে তোলার মতো এলোপাথারি হাওয়ায় গাছের অবশিষ্ট পাতাগুলোও ঝরে পড়ছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি উঠে দাঁড়ালেন। ফুলের পসরা সাজিয়ে বসা মেয়েটির কাছ থেকে একটিও ফুল না কিনে সরকারি বাগানের গাছ থেকে একটা গাঁদা ফুল তুলে নিয়ে জ্যাকেটে লাগিয়ে নিলেন। ফুল পসারিনী ব্যাপারটা দেখে বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করে,—'এইসব ফুল ভগবান কাউকে দান করেননি। এগুলো শহরের সম্পত্তি।'

সে কথায় কান না দিয়ে ছড়ির মাঝখানটা ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে মাননীয় রাষ্ট্রপতি লম্বা লম্বা পা ফেলে একটু বেপরোয়া ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলেন। 'ম-ব্লাঁ'সেতুর ওপর থেকে সুইজারল্যান্ডের সহযোগী দেশগুলোর পতাকা সাত তাড়াতাড়ি নামিয়ে নেওয়ার বিষয়টা তাঁর নজরে এল। আচমকা ঝোড়ো হাওয়ায় পতাকাগুলো পতপত করে পাগলামি শুরু করেছিল। ফোয়ারার চূড়ায় জমা হওয়া সুন্দর ফেনাপুঞ্জ আজ অনুপস্থিত। সরোবর লাগোয়া যে কাফেটেরিয়ার তিনি নিয়মিত খরিদ্দার, সেটাকেও আজ আর চেনা যাচ্ছে না। কাফেটেরিয়ার সামনেকার সবুজ ক্যানভাসের ছাউনিটাও গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। গরমকালের ফুল দিয়ে সাজানো বাহারি ছাদটাও বন্ধ। এই মধ্যাহ্নেও কাফেটেরিয়ার ভেতরে জ্বলছে জোরালো বৈদ্যুতিক বাতি। মনের মধ্যে দুর্ভাবনা জাগিয়ে তোলা সুরে কোনও তারযন্ত্রে বেজে চলেছে মোৎসার্টের সুরমূর্ছনা।

খরিদ্দারদের জন্যে কাউন্টারে সাজিয়ে রাখা স্তূপীকৃত খবরের কাগজ থেকে মাননীয় রাষ্ট্রপতি একটি তুলে নিলেন। টুপি ও ছড়ি রাখলেন নির্দিষ্ট জায়গায়। সংবাদপত্র পরবেন বলে সোনার ফ্রেমের চশমাটি পরে একটু দূরের একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসবার সময় তাঁর খেয়াল হল,—হেমন্তকাল এসে গেছে। আন্তর্জাতিক পাতা দিয়ে পড়া শুরু হল। কারণ, এই পৃষ্ঠাতেই থাকে দুই আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের যাবতীয় খবরাখবর। তারপর পিছনের পাতা থেকে সামনের দিকে এগোতে শুরু করলেন। ততক্ষণে পরিবেশনকারিণী তাঁর প্রতিদিনের পানীয় 'এভিয়ান ওয়াটার' নিয়ে উপস্থিত। ডাক্তারের নির্দেশে তিরিশ বছরেরও বেশি আগে তিনি কফির সঙ্গে সম্পর্ক মিটিয়েছেন। তবে এখন তাঁর মনে হল,— 'মৃত্যু আসন্ন কথাটা আগে জানতে পারলে কবেই কফি খাওয়া শুরু করা যেত।' বিশুদ্ধ ফরাসি ভাষায় তিনি উচ্চারণ করলেন,—'আমাকে কফিও দেবেন। ইতালিয়ান কফি। এমন কড়া হওয়া চাই যেন তা খেয়ে মড়া মানুষও বেঁচে ওঠে।' কথাটার যে অন্য একটা মানেও হতে পারে, তা কিন্তু তাঁর খেয়াল নেই।

ধীরে সুস্থে, আস্তে আস্তে খেয়ে ফেললেন চিনি ছাড়া কফি। তারপর পেয়ালাটা পিরিচের ওপর উপুড় করে রেখে তিনি যেন দেখতে চাইলেন তলানি হওয়া কফিদানাগুলো তাঁর কী ভবিষ্যৎ এঁকে দেয়। ফিরে পাওয়া কফির স্বাদ এক মুহূর্তে তাঁর মন থেকে মুছে দিল সমস্ত বিষণ্ণতা। কফির যাদুতেই যেন আন্দাজ করতে পারলেন কেউ এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। অন্যমনস্কতার ভান করে খবরের কাগজের পাতা উলটোতে উলটোতে তিনি চশমার ওপর দিয়ে লোকটার দিকে তাকালেন। শুকনো চেহারার একটা মানুষ। দাড়ি কামায়নি। মাথায় খেলোয়াড়ের টুপি। আর গায়ে ভেড়ার চামড়ার লাইনিং দেওয়া একটা জ্যাকেট। চোখাচোখি এড়াতে লোকটি চোখ সরিয়ে নিয়েছে।

পরিচিত মুখ। হাসপাতালের লবিতে বেশ কয়েকবার তাঁর পাশ দিয়ে যেতে দেখেছেন। 'প্রোমেনাদে দু লাক্'-এ একবার লোকটিকে মোটর সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখেছেন। তিনি তখন রাজহাঁসগুলোর দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিলেন। কিন্তু কখনও মনে হয়নি যে সে তাঁর পরিচয় জানে। তবুও লোকটিকে ওখান থেকে চলে যেতে না দেখে মাননীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাসিতের চরিত্র অনুযায়ী নানারকম নির্যাতনের সম্ভাবনায় ভীত বোধ করছিলেন।

'ব্রাহমস্'-এর মনোহারী সেলো বাজনার সুরে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খববের কাগজ পড়া শেষ কবলেন। ততক্ষণে ব্যথাটা আবার তীব্রভাবে চাগিয়ে উঠেছে। ব্যথা উপশমের অন্যতম উপাদান সুরমূর্ছনাও কার্যকরী হল না। ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে চেন বাঁধা সোনার ঘড়িটা বেব করে সময় দেখার পর দুপুরবেলার জন্যে বরাদ্দ করা ওষুধের দু'টো বড়ি গলায় চালান করে দিয়ে এভিয়ান ওয়াটারের তলানিটুকুতে চুমুক দিলেন। পিরিচের ওপর পড়ে থাকা কফিদানাগুলো তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী আন্দাজ দিচ্ছে তা বোঝাব চেষ্টায় চশমা খোলাব আগে তিনি একবার ওদিকে তাকালেন। শুকনো কফিদানার নকশায় নজর রাখতেই তাঁর শরীরে যেন এক অজানা শৈত্য প্রবাহ বহে গেল। এমন আশঙ্কাব মূল কারণ পিরিচের ওপর ফুটে ওঠা অনিশ্চয়তার সংকেত।

বিল মিটিযে, সামান্য কিছু বকশিশ দিয়ে আস্তে ধীবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দেওয়ালে টাঙানো ছড়ি আব টুপিটা তুলে নেওযার পর তাঁব দিকে তাকিয়ে থাকা লোকটিকে কোনওরকম পাত্তা না দিয়েই তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝড়ে বিধ্বস্ত ফুলের সারির পাশ দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন। মিথ্যে ভয়ের ঘোরটা মনে হয় কেটে গেছে। পেছনের দিক থেকে আসা একজোড়া পায়েব শব্দ হঠাৎই তাঁকে থামিয়ে দিল। বাগানের কোনায় ঘুববার মুখে একটুখানি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়তেই পিছু নেওয়া লোকটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে আর কি! নেহাত লোকটি নিজেকে সামলে নিয়েছিল। লোকটিব চোখের বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তখন তাঁর থেকে মাত্র দু'আঙুল দূরে। আব সেই অবস্থাতেই সে ফিসফিস করে বলে ফেলল,—'মাননীয় বাষ্ট্রপতি'।

মুখেব হাসি এবং কণ্ঠস্বরেব মাধুর্য বজায় বেখেই তিনি বললেন,—'যারা তোমায় এই কাজে লাগিয়েছে, তাদের বলে দিতে পারো আমাব শরীব-স্বাস্থ্য বেশ ভালোই আছে।'

'সে কথা আমার থেকে ভালো আর কে জানে?'—লোকটি বলল। 'আমি তো হাসপাতালেই কাজ করি।' তাব কথা বলার ভঙ্গি, কথার মাত্রা, এমনকী নিরীহ ভাবটিও একেবারে যোলো আনা বিশুদ্ধ ক্যারিবিয়ান।

'তুমি তাহলে ডাক্তার?'

'হলে তো ভালোই হত',—লোকটি জবাব দেয়। 'আমি হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স চালাই।'

রাষ্ট্রপতি দুঃখ প্রকাশ কবে বললেন,—'তবে তো তোমার কাজটা বেশ কঠিন।'

'আপনার কাজের মতো কঠিন নয় নিশ্চযই।'

ছড়ির ওপর ভর করে হাত দুটোকে বাখার পর তার দিকে সরাসরি তাকিয়ে রাষ্ট্রপতি প্রশ্ন করলেন,—'তোমাব দেশ?'

'আমি ক্যারিবিয়ান।'

'সে তো আমি বুঝতে পারছি'—রাষ্ট্রপতি বেশ জোর দিয়ে বলবার পর আবাব প্রশ্ন করলেন।

'জায়গাটার নাম কী?'

'আপনি আর আমি একই এলাকার লোক',—বলেই সে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়। 'আমার নাম হোমেরো রে।'

'বাঃ, বেশ চমৎকার নাম',—মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রপতি হোমেরোব হাতটা চেপে ধরলেন। হোমেরো আশ্বস্ত হল।

'আরও ভালো শোনাত, যদি বলা যায়',—রাষ্ট্রপতি বললেন। 'হোমেরো রে দে লা কাসা অর্থাৎ তাঁব প্রাসাদের রাজা আমি হোমার।'

তাঁরা যখন রাস্তার একেবারে মাঝখানে, ঠিক তখনই কনকনে ঠাণ্ডা শীতের বাতাস ছুরির ফলার মতো আক্রমণ হানল। দু'জনের কেউই এমন অবস্থার জন্যে প্রস্তুত নয়। হাওযাটা যেন বাষ্ট্রপতির হাডেব মধ্যেই সেঁধিয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন,—গায়ে ওভারকোট নেই। তিনি আরও বুঝলেন,—এই পবিস্থিতিতে সামনের দুটো চত্বর পেরিয়ে তাঁব পছন্দের সস্তা বেস্তোরাঁয় পৌছোনো অসম্ভব। হোমেরোকে প্রশ্ন করলেন,—'খেয়েছ?'

'দুপুরে আমি খাই না। একেবারে বাড়ি ফিবে রাত্রে খাই',—হোমেবো জবাব দেয।

'আজকের জন্যে নিযমটা না হয একটু পালটাক',—মন কেড়ে নেওয়া ব্যক্তিত্বেব প্রকাশ ঘটিয়ে রাষ্ট্রপতি বললেন। 'আমার সঙ্গে আজ তোমার মধ্যাহ্নভোজ।'

সদ্য পরিচয় হওয়া মানুষটিব হাত ধরে তিনি আস্তে আস্তে বেস্তোরাঁব দিকে এগোলেন। সোনালি অক্ষরে ক্যানভাসের ছাউনির ওপর লেখা বয়েছে দোকানের নাম,--লে বোযেউফ কৌরোন্নে। রেস্তোরাঁটা একেবারেই ছোট্ট। ভিতরে এক চিলতে বসাব জাযগা। কোনও টেবিলই খালি নেই। চারপাশটা রীতিমতো গরম। রাষ্ট্রপতিকে কেউ চিনতে পারল না দেখে হোমেবো বে বিস্মিত। বাষ্ট্রপতিব বসার একটা বন্দোবস্ত করার জন্যে সে রেস্তোরাঁর মালিকের সঙ্গে কথা বলতে গেল। রেস্তোরাঁব মালিক জানতে চাইল,—'ইনি কি বর্তমান রাষ্ট্রপতি?'

'না',—হোমেবোর উত্তব। 'উনি এখন পদচ্যুত।'

বেস্তোরাঁর মালিকের মুখে এবাব সমঝদাবেব হাসি। 'ওঁদেব জন্যে সবসময়ই আলাদা বাবস্থা থাকে।' নিজেদেব মতো করে কথাবার্তা বলার জন্যে রেস্তোরাঁর শেষ প্রান্তের একটা আলাদা টেবিলে তাঁদেব বসানো হল। রাষ্ট্রপতি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন,—'নির্বাসিতবাও যে সম্মানীয হতে পারে, তা অনেকেরই খেয়াল থাকে না।'

কাঠকয়লাব আগুনে ঝলসানো গোরুর পাঁজব এই রেস্তোরাঁব বিশেষত্ব। বাষ্ট্রপতি এবং তাঁব অতিথি নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে অন্য টেবিলেব দিকে চোখ বোলালেন। ঝলসানো মাংসের বড় বড় টুকবোগুলোর ওপর তাঁদেব নজব গেল। রাষ্ট্রপতি বিড়বিড় কবে বললেন,—'অসাধারণ। কিন্তু আমার জন্যে নিষিদ্ধ।' হোমেরোব দিকে এক ঝলক তির্যক দৃষ্টি হেনে তিনি আবারও মন্তব্য করলেন,—'আসলে আমাব জন্যে তো সবকিছুই নিষিদ্ধ।'

'আপনাব তো কফিও বারণ, কিন্তু খেলেন।'

'তুমি দেখে ফেলেছ নাকি?' বাষ্ট্রপতির বিস্ময় মেশানো প্রশ্ন। তারপরই পরিস্থিতিটা সামলে নেওযাব জন্যে বললেন,—'তা নয় ; আজকের দিনটা তো একটু অন্যরকম, তাই অন্যথা করলাম।'

শুধু কফিই নয, আরও অনেক ব্যতিক্রম হল। কাঠকয়লার আগুনে ঝলসানো গোরুব পাঁজরের সঙ্গে অলিভ অয়েল ছেটানো টাটকা সবজির স্যালাড আনতে বলা হল। আর তাব সঙ্গে বেড ওযাইন।

টেবিলে খাবার এসে পৌছোনোর আগে হোমেবো জ্যাকেটেব পকেট থেকে বের কবল একটা পেটমোটা ওয়ালেট। নোট বা খুচরো নয়, বেবিয়ে এল কতগুলো বিবর্ণ কাগজ। তার মধ্যে থেকে খুঁজে পেতে একটা বিবর্ণ ছবি সে দেখাল রাষ্ট্রপতিকে। নিজেকে চিনতে পারলেন রাষ্ট্রপতি। পরনে ফুলশার্ট, কালো চুল, গোঁফ। ছবিতে একদল যুবক রয়েছে তাঁকে ঘিরে। ছবিতে যাতে তাদের দেখা যায় সেই জন্যে তারা পাযেব আঙুলে ভর দিয়ে মাথাটা উঁচিয়ে ধবতে সচেষ্ট। রাষ্ট্রপতি এক নজবেই চিনতে

পারলেন সেই নির্বাচনী প্রচারের প্রতীকগুলি। সেই অপ্রীতিকর দিনটি কত তারিখ ছিল তাও মনে পড়ে গেল। 'দেখলে কষ্ট হয়। একটা কথা আমি সবসময়ই বলি, একমাত্র ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষটা কতটা বুড়িয়ে গেছে',—অস্পষ্ট স্বরে কোনওরকমে কথাটা বলেই তিনি ছবিটা এমনভাবে ফিরিয়ে দিলেন যেন এ প্রসঙ্গে তাঁর শেষ কথা বলা হয়ে গেছে। অবিশ্যি তারপরেই আবার বললেন,—'বেশ মনে পড়ে, সে কত হাজার বছর আগেকার কথা। সান ক্রিস্তোবাল দে লা কাসাসের মোরগের লড়াই।'

'আমিও তো ওই শহরেরই',—খবরটা জানিয়ে হোমেরো ছবিতে অন্যদের মধ্যে নিজেকে দেখিয়ে দিয়ে বলে,—'এই যে আমি।' রাষ্ট্রপতি তাকে চিনতে পেরে বললেন,—'তখন তো তুমি ছেলেমানুষ।'

'প্রায় সেরকমই',—হোমেরো বলেই চলে। 'বিশ্ববিদ্যালয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে দক্ষিণের সমস্ত প্রচার অভিযানেই আপনার সঙ্গে আমি ছিলাম।'

রাষ্ট্রপতি বুঝলেন যে হোমেরোর মনে অভিযোগ জমে রয়েছে। 'আমি আসলে খেয়াল করতে পারিনি',—তিনি মন্তব্য করলেন।

'না না, তা নয়। আপনি আর তেমন কী করেছেন! এতজনের মধ্যে থেকে একজনকে কি আর আলাদা করে মনে রাখা যায়!'

'তারপর কী হল?' প্রশ্ন করেন রাষ্ট্রপতি।

'সে সব ব্যাপার আপনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। আরও আশ্চর্য বিষয় হল',—হোমেরো বলেই চলে,—'সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকে আমরা দুজনেই এখানে। এখন আমরা দুজনে মিলে আধখানা গোরু খেয়ে ফেলতে পারি। এমন সুযোগ আর ক'জন পেয়েছে?'

ঠিক তখনি টেবিলে খাবার পরিবেশিত হল। খাওয়ানোর আগে বাচ্চাদের গলায় যেমনভাবে বিব্ বেঁধে দেওয়া হয় সেইভাবে ন্যাপকিনটি জামার মধ্যে গুঁজে নিলেন রাষ্ট্রপতি। তাঁর অতিথি যে অবাক বিস্ময়ে বিষয়টার ওপর নজর রাখছে সেটাও খেয়াল রাখতে ভুললেন না তিনি।

'এভাবে বেঁধে না নিলে প্রতিবারেই একটা করে টাইয়ের বারোটা বাজবে',—ন্যাপকিনের ব্যাপারটাকে তিনি ব্যাখ্যা করার উদ্যোগ নিলেন।

খাওয়া শুরুর আগে মাংসটা একবার চেখে নিতেই তাঁর চোখে মুখে তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ল। আবার তিনি কথা শুরু করলেন,—'একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কেন যে সরাসরি আমার সঙ্গে আলাপ করার বদলে তুমি আমায় অনুসরণ করে যাচ্ছিলে।'

বিশিষ্ট রোগিদের জন্যে সংরক্ষিত দরজা দিয়ে হাসপাতালে ঢোকার সময়ই তাঁকে সে চিনতে পেরেছিল বলে হোমেরো জানায়। ভরপুর গরমের সেই দিনে তাঁর পরনে ছিল আন্তিলেসের থ্রি-পিস স্যুট। পায়ে সাদা-কালো জুতো। একটি ডেইজি ফুল গোঁজা ছিল কোটের কলারে। হাওয়ায় এলোমেলোভাবে উড়ছিল তাঁর মাথার সুন্দর লম্বা চুল। হোমেরো জানতে পারে যে কোনও সহায়ক ছাড়াই তিনি জেনেভায় এসেছেন। ছাত্রাবস্থায় এখানেই আইন পড়েছিলেন বলে শহরটা হয়তো তাঁর চেনা। তাঁর পরিচয় গোপন রাখার জন্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শান্তভাবে সবরকমের সাবধানতা নিয়েছিল; হয়তো এমনটা হয়েছিল তাঁরই অনুরোধে। সেদিন রাতেই হোমেরো আর তার স্ত্রী ঠিক করে ফেলে যে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তারা যোগাযোগ করবে। তবে তার পরেও একটা অনুকূল পরিস্থিতির জন্যে পাঁচ সপ্তাহ ধরে হোমেরো তাঁকে অনুসরণ করেছে। হয়তো আদৌ তার পক্ষে আলাপ করা সম্ভব হত না যদি না রাষ্ট্রপতি স্বয়ং সরাসরি ঘুরে দাঁড়াতেন। 'মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম বলে আমি মোটেও অখুশি নই, তবে সত্যি বলতে কী, একলা থাকতে আমার কোনও কষ্ট হয় না।'

'এটা ঠিক নয়।'

রাষ্ট্রপতি জানতে চাইলেন,—'কেন?' তারপরেই মন্তব্য করলেন,—'সকলে যে আমায় ভুলে গেছে সেটাই সবচেয়ে বড় লাভ।'

'আপনি জানেন না কীভাবে আপনাকে মনে রেখেছি।' হোমেরোর কথায় আবেগ গোপন থাকল না। 'এখনও তরতাজা যুবকের মতো স্বাস্থ্যবান চেহারায় আপনাকে দেখতে পাওয়া যে কী আনন্দের

তা আপনার জানা নেই।'

'তবু',—তাঁর কথায় কোনও নাটকীয়তা নেই,—'তবুও সমস্ত লক্ষণই বলে দিচ্ছে যে শিয়রে মৃত্যু উপস্থিত।'

'আপনি সেরে উঠবেন',—হোমেরো জানান দেয়। 'সে সম্ভাবনাই বেশি।'

রাষ্ট্রপতি রীতিমতো চমকে উঠলেও রসিকতা করতে ছাড়লেন না। 'তা না হয় বোঝা গেল। তবে এত সুন্দর এই সুইজারল্যান্ডে চিকিৎসা সংক্রান্ত গোপনীয়তা কি আজকাল বজায় থাকছে না?'

'পৃথিবীর কোনও অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের কাছেই হাসপাতালের খবর গোপন থাকে না।' হোমেরোর সুস্পষ্ট উত্তর।

'কিন্তু আমিই তো জেনেছি মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে। জানিয়েছেন সেই মানুষটি, একমাত্র যাঁর পক্ষে আমার অবস্থা জানা সম্ভব।'

'সে যাই হোক, উদ্দেশ্য সফল না করে কীভাবে মারা যাবেন আপনি? সে হতেই পারে না',—হোমেরো জোর দিয়ে বলে। 'আপনার আসনে আবার প্রতিষ্ঠিত হবেন, সেটা আমাদের দায়িত্ব।'

রাষ্ট্রপতি এবার বিস্ময়ের ভান করলেন। 'সাবধান করে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ।' ধীরেসুস্থে, আস্তে আস্তে, তারিয়ে তারিয়ে খেলেন এবং একই সঙ্গে হোমেরোর চোখের দিকে সরাসরি তাকালেন। অল্পবয়সি মানুষটির মনে হল বয়স্ক ভদ্রলোক কী চিন্তা করছেন তা সে বুঝতে পেরেছে। অনেকক্ষণ ধরে তাঁরা কথা বললেন ; স্মৃতিচারণও হল। শেষে একটু দুষ্টুমির ছোঁয়া মিশিয়ে হাসতে হাসতে রাষ্ট্রপতি বললেন,—'মৃতদেহের কী অবস্থা হবে তা নিয়ে আমি ভাবতে চাইছিলাম না। কিন্তু এখন দেখছি সেটাকে গোপন রাখার জন্যে রহস্য উপন্যাসের মতো সাবধান হতে হবে।'

'তাতে অবিশ্যি কোনও লাভই হবে না',—ঠাট্টার ছলে হোমেরো উত্তর দেয়। 'হাসপাতালে কোনও রহস্যেরই মেয়াদ এক ঘণ্টার বেশি নয়।'

কফি খাওয়ার পর শেষ হল মধ্যাহ্নভোজ। রাষ্ট্রপতি আবার অভ্যেসবশত কাপের তলানিতে চোখ বুলোলেন এবং তাঁর মনের ভিতরে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। এবারও একই উত্তর। তাঁর মুখে অবিশ্যি কিছুই ফুটে ওঠেনি। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে নগদে বিল মেটালেন। সঙ্গে কিছু বকশিশ। বকশিশের অঙ্কটা দেখে পরিবেশনকারীর গলা থেকে কোনও মন্তব্য নয়, শুধু একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল।

'তোমার সঙ্গে আলাপ করে বেশ ভালো লাগল',—হোমেরোকে বিদায় জানাবার সময় রাষ্ট্রপতি বললেন। 'এখনও অপারেশনের দিনক্ষণ স্থির হয়নি। তবে সবকিছু ঠিকমতো উতরে গেলে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে।'

'তার আগে নয় কেন?' হোমেরো জানতে চায়। 'আমার বউ কয়েকটা বাড়িতে রান্নার কাজ করে। চিংড়িমাছের পোলাও রান্নায় ওর খুব নামডাক। আমাদের বহুদিনের ইচ্ছে আপনাকে বাড়িতে নৈশভোজে নেমন্তন্ন করব।'

'আমার আবার চিংড়িমাছ-কাঁকড়া জাতীয় খাবারদাবার খাওয়া বারণ। তবে তোমাদের ওখানে যাব। আর প্রাণ ভরেই খাব। বলো, কবে যাব?'

'আমার তো বৃহস্পতিবার ছুটি',—হোমেরো জানায়।

'বেশ তো ; এ তো দারুণ প্রস্তাব',—রাষ্ট্রপতি নিশ্চিন্ত করেন। 'আগামী বৃহস্পতিবারই যাচ্ছি তোমাদের ওখানে। ধরো, এই সন্ধে সাতটা নাগাদ।'

হোমেরো বলল,—'আমি গিয়ে নিয়ে আসব। হোতেলেরিয়ে দামেস্, ১৪ নম্বর রুয়ে দে ল'ইন্দাস্ত্রিয়ে। স্টেশনের পিছন দিকে। তাই তো?'

'বাঃ! তুমি দেখছি আমার জুতোর মাপও মুখস্থ করে রেখেছ',—রাষ্ট্রপতি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে আরও শান্ত ও সৌম্য দেখাচ্ছিল।

'জানি, সেটাও জানি',—হোমেরো যেন মজা পেয়েছে। 'একচল্লিশ নম্বর।'

তবে হোমেরোর আসল উদ্দেশ্য কিন্তু তেমন নিঃস্বার্থ নয়। কথাটা অবিশ্যি ও রাষ্ট্রপতিকে বলেনি। অথচ, পরে বহুকাল ধরে যাকে পেয়েছে অথবা যে শুনতে চেয়েছে, তাকেই ও বলে গেছে। অন্যান্য অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের মতো হোমেরোও সৎকার সংস্থা আর জীবন বিমা কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রেখেছিল যাতে মৃতদেহ সৎকার থেকে শুরু করে যাবতীয় আনুষঙ্গিক কাজের দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তায়। বিশেষত বিদেশি রোগীদের দিকে ওদের নজর বেশি ; কারণ তাদের সামর্থ্য সীমিত। এতে হোমেরোর যে বিরাট কিছু লাভ হবে তা নয়। অন্যান্যদেরও ভাগ দিতে হবে, অন্তত যারা দুরারোগ্য রোগীদের গোপন তথ্যের সন্ধান দেয়। এই মতলবের পিছনে হোমেরোর অজুহাত খুবই পরিষ্কার,-- প্রথমত সে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত ; ভবিষ্যৎ অন্ধকার ; আর সর্বোপরি তাকে বিচ্ছিরি রকমের কম বেতনে স্ত্রী ও দুটি সন্তানের ভরণপোষণ করতে হয়।

হোমেরোব স্ত্রী লাজারা ডেভিসের বাস্তববুদ্ধি অনেক প্রখর। সান হুয়ান পুয়ের্তোরিকোর মুলাটা মেয়ে লাজারা ডেভিস এমনিতে ছোটখাটো, রোগাপাতলা হলে কী হবে, বেশ শক্তপোক্ত। চায়ের পাতলা লিকারের মতো তার গায়ের রং। শেয়ালের মতো ধূর্ত চোখের চাউনি স্বভাবের সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হাসপাতালের দাতব্য বিভাগে। জেনেভায় সে এসেছিল স্বদেশের এক ধনী ব্যবসাযীব পরিচারিকা হিসেবে। ব্যবসায়ীটি লাজারা ডেভিসকে জেনেভায় ফেলে রেখে চলে যায়। সহায়সম্বলহীন অবস্থায় ভেসে বেড়াতে বেড়াতেই হঠাৎ করে হাসপাতালের পরিচারিকার চাকরি পেয়ে যায় লাজারা ডেভিস। তখনই হোমেরোব সঙ্গে বিয়েটা সেরে ফেলে। ইয়োরুবান রাজকন্যা হওয়া সত্ত্বেও হোমেরোর সঙ্গে লাজারার বিয়েটা হয়েছিল ক্যাথলিক প্রথায়। একটা বহুতল বাড়ির ন'তলায় দু'কামরার একটা ফ্ল্যাটে তাদের বসবাস। বহুতল হলেও বাড়িটায় লিফ্ট নেই। প্রায় পুরো বাড়িটাই আফ্রিকা থেকে আসা উদ্বাস্তুদের আশ্রয়স্থল। লাজারা এবং হোমেরোর মেয়ে বারবারার বয়স ন' বছর আর ছেলে লাজারোর সাত। প্রতিবন্ধী হয়ে ওঠার সমস্ত লক্ষণ ছেলেটির শরীরে এর মধ্যেই ফুটে উঠেছে।

লাজারা বুদ্ধিমতী হলে কী হবে, যথেষ্ট বদমেজাজি। অথচ হৃদয়টি কোমল। খাঁটি বৃষরাশিতে জন্ম বলে তার ধারণা। মানুষের জীবনে গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়ে নিজের গণনাব যথার্থতা সম্পর্কে লাজারার দৃঢ় আস্থা। তার স্বপ্ন ছিল ক্রোড়পতিদের ভাগ্য গণনা করে জীবনযাপন করবে। তবে সেই স্বপ্ন সফল হযনি। পারিবারিক প্রয়োজনে মাঝে মধ্যেই তাকে অনেক খরচ করতে হয়। ধনী গৃহিণীদেব ফরমায়েশ অনুযায়ী রান্না করেই তার উপার্জন। কারণ, অতিথিদের কাছ থেকে নিজেদের রান্নার জন্যে প্রশংসা আদায় করা ধনী মহিলাদের ভীষণ পছন্দ।

হোমেরো এতই নিরীহ প্রকৃতির যে মাঝে মাঝে তাকে সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। বেচারির উপার্জনও সামান্য আর কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই। তবুও লাজাবা হোমেরোকে বাদ দিয়ে কিছুই ভাবতে পারে না। কারণ, হোমেরো খুবই সরল মনের মানুষ আর তাব বেশ কয়েকজন সঙ্গীসাথি বেশ ক্ষমতাসম্পন্ন।

মোটামুটি তাদের ভালোই কেটে গেলেও অবস্থা কিন্তু ক্রমশ সঙ্গিন হয়ে উঠছে। ছেলেমেয়েরা বড হয়ে উঠছে। বাষ্ট্রপতি যখন এদেশে এলেন, সেই সময়েই পাঁচ বছর ধরে গড়ে তোলা সঞ্চয়ে তাদের হাত পড়েছে। আত্মগোপনকাবী রোগী হিসেবে রাষ্ট্রপতিকে হাসপাতালে দেখার পর হোমেরোদের সামনে যেন আশার আলো জ্বলে উঠল।

তবে ঠিক কী চাইবে বা কোন অধিকারে চাইবে সে বিষয়ে কিন্তু তারা তেমনভাবে সাজিযেগুছিয়ে ভেবে উঠতে পারেনি। প্রথমে ভেবেছিল রাষ্ট্রপতির অন্ত্যেষ্টির ব্যাপারটা নিজেরাই সামলে নেবে। মৃতদেহে সুগন্ধি লেপন থেকে শুরু করে স্বদেশে কফিনবন্দি দেহ পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সবকিছু। আস্তে আস্তে তারা বুঝতে পারে রাষ্ট্রপতির মৃত্যু যত তাড়াতাড়ি হবে বলে মনে হচ্ছিল, তা ঠিক নয়।

নেমন্তন্নর দিনে সন্দেহটা আরও বদ্ধমূল হল

আসলে হোমেরো কখনও বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিগেড বা অন্য কোনও গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেয়নি। নির্বাচনী প্রচারেব সময় যখন ফোটো তোলা হত তখন শুধু সে নিয়ম করে ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ত যাতে

ছবিতে তাকে দেখা যায়। বাড়ির বাক্সে কাগজের স্তূপ ঘাঁটার সময় এরকম একটা পুরোনো ছবি আচমকা তাদের হাতে চলে এসেছে। তবে তার আগ্রহে কোনও ঘাটতি নেই। আর এটাও সত্যি যে সে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। কারণ, সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নামা ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষের মধ্যে সেও একজন। তবে দেশত্যাগের বহুদিন পরেও সে জেনেভাতেই রয়ে গেছে। মনোবল কম বলেই সে জেনেভা ছেড়ে যায়নি। অতএব দু'একটা মিথ্যা কথা বলে যদি রাষ্ট্রপতির নজর কাড়া যায় তো ক্ষতি কী! লা গ্রোত্তেসের মতো একটা নিরানন্দ অঞ্চল যেখানে এশিয়া মহাদেশ থেকে আসা শরণার্থীরা আর দেহপসারিণীরা থাকে, সেখানে দেশান্তরিত অমন একজন বিশিষ্ট মানুষকে দেখে তারা দুজনেই রীতিমতো বিস্মিত। তার ওপর তিনি একলাই রয়েছেন একটা চতুর্থ শ্রেণীর হোটেলে আর খাওয়াদাওয়া সারছেন সস্তার রেস্তোরাঁয়। অথচ ব্যর্থ রাজনীতিকদের জন্যে যোগ্য বাসস্থানের অভাব নেই জেনেভায়। দিনের পর দিন এইভাবে তাঁর বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া হোমেরো সন্তর্পণে খেয়াল করে গেছে। রাষ্ট্রপতিকে সে চোখে চোখে রেখেছে এবং যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে খুব কাছ থেকে তাঁকে অনুসরণ করেছে। এমনকী শহরের ভাঙাচোরা পুরোনো দেওয়ালে ফুটে থাকা জুঁইফুলের পাশ দিয়ে তিনি যখন নৈশ ভ্রমণ সারেন তখনও হোমেরো পিছু ছাড়ে না। কালভিনের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি যখন চিন্তামগ্ন, তখনও তাঁর দিকে সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে হোমেরো। গ্রীষ্মের স্বচ্ছ আকাশে ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসা গোধূলির সৌন্দর্য তন্নিষ্ঠভাবে দেখার জন্যে তিনি যখন বুর্গ-দে-ফুরের চূড়ায় উঠছেন, তখন জুঁইফুলের তীব্র সুগন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা সত্ত্বেও সে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে পায়ে পায়ে তাঁকে অনুসরণ করে গেছে। একদিন রাতে হোমেরো দেখল রুবিনস্তেইন কনসার্ত শোনার জন্যে ছাত্রদের সঙ্গে একই সারিতে দাঁড়িয়ে তিনি গায়ে মাখছেন বছরের প্রথম বৃষ্টি। গায়ে ওভারকোট নেই, হাতে নেই ছাতা। বাড়িতে ফিরে হোমেরো স্ত্রীকে বলল,—'জানি না, কীভাবে নিউমোনিয়া থেকে রেহাই পেলেন তিনি।' ঋতু পরিবর্তনের আগের শনিবার তাঁকে নকল মিঙ্কের কলার লাগানো একটা কোট কিনতে দেখা গেল। পলাতক আমিরেরা যেখানে কেনাকাটা করে, সেই 'রুয়ে দু রোনে'-র তেমন কোনও ঝাঁ চকচকে দোকান থেকে নয়, আসন্ন হেমন্তকালের জন্যে এই কোটটি কেনার জন্যে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সস্তার পুরোনো জিনিসের বাজার।

'আমাদের তাহলে কী হবে',—হোমেরোর মুখ থেকে সব শুনে আর্তনাদ করে উঠল লাজারা। 'আসলে হাড়কেপ্পন। দাতব্য প্রতিষ্ঠান মারফৎ অন্ত্যেষ্টির কথা মাথায় রেখে উনি বোধ হয় ভাবছেন দেউলিয়াদের জন্যে নির্ধারিত কোনও একটা কবরে ওঁর জায়গা হয়ে যাবে। ওনার কাছ থেকে কিচ্ছুটি পাওয়ার আশা করা উচিত নয়।'

'হয়তো উনি খুবই গরিব',—হোমেরো বলে। 'অনেকদিন ধরেই তো উনি একেবারে বেকার।'

'আ-হা-হা! মীন রাশির দোসর আরেক মীন রাশি। অথবা তুমি একটা আকাট মূর্খ।' লাজারা বিরক্তি প্রকাশ করে। 'সকলেই জানে দেশের সব সোনা নিয়ে উনি পালিয়ে এসেছেন। আর মার্তিনিকে থেকে নির্বাসিতদের মধ্যে উনিই সবচেয়ে ধনী।' স্ত্রীর থেকে হোমেরোর বয়স দশ বছর বেশি। খবরের কাগজের যে সব প্রবন্ধ ছোটবেলা থেকে হোমেরোর ওপর প্রভাব ফেলেছিল সেগুলো থেকে সে জানে রাজমিস্ত্রির কাজে সাহায্য করে রাষ্ট্রপতি জেনেভায় পড়াশোনার খরচ চালাতেন। আর বিরোধীদের নিন্দামন্দ শুনতে শুনতে লাজারার বড় হয়ে ওঠা। অল্প বয়স থেকেই বিরুদ্ধ মতের বিভিন্ন পরিবারে পরিচারিকার কাজ করে আসার সুবাদে সেই সব ধারণা আরও সম্পৃক্ত হয়েছে। তাই বাড়ি ফিরে খুশিতে ডগমগ হয়ে দামি রেস্তোরাঁয় রাষ্ট্রপতির মধ্যাহ্নভোজ খাওয়ানোর কাহিনি যেদিন হোমেরো শোনাল লাজারা বিশ্বাস করেনি। রাষ্ট্রপতির কাছে অনেক কিছু চেয়ে নেওয়ার স্বপ্ন তাদের চোখে। ভেবেছিল, বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্যে আর্থিক সাহায্যের কথা বলবে অথবা হোমেরোর চাকরিতে উন্নতির জন্যে অনুরোধ জানাবে। অথচ হোমেরো কিছুই চায়নি শুনে লাজারা তো রীতিমতো স্তম্ভিত। তার ধারণা রাষ্ট্রপতি নিজের মৃতদেহ শকুনি দিয়ে খাওয়াবেন। যথাযথভাবে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার জন্যে কোনওরকম খরচাপাতি করার ইচ্ছেই তাঁর নেই। আবার স্বদেশে সসম্মান প্রতিষ্ঠাও তাঁর কাম্য নয়। এসব শুনে

লাজারার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল। সবশেষে হোমেরো বৃহস্পতিবার রাতে রাষ্ট্রপতির বাগদা চিংড়ির পোলাও খাওয়ার নেমন্তন্ন করার সংবাদটি পেশ করার পর তো লাজারার মূর্চ্ছা যাওয়ার জোগাড়। 'হ্যাঁ, এটাই আমাদের দরকার',—লাজারা চিৎকার করে ওঠে। 'টিনে জমানো চিংড়ি খেয়ে এখানেই মরবে। আর বাচ্চাদের জন্যে গড়ে তোলা সঞ্চয় খরচ করে আমরাই ওকে কবর দেব।'

অবশেষে দাম্পত্যজনিত আনুগত্যের কারণে হোমেরোর হঠকারিতা মেনে নিল লাজারা। এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে খাবার পরিবেশন করার জন্যে ধার করে আনা হল তিনটে রুপোর বাসন আর একটা স্যালাড রাখার কাচের পাত্র। অন্য একজনের কাছ থেকে কফি বানাবার জন্যে ইলেকট্রিক কেটলি এবং তৃতীয় এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে এমব্রয়ডারি করা টেবিলক্লথ ও কফি খাওয়ার কাপ ধার করা হল। পুরোনো পর্দা খুলে টাঙানো হল নতুন পর্দা। সাধারণত ওগুলো উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্যে তোলা থাকে। ঘরেব মেঝে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে কেটে গেল একটা পুরো দিন। ধুলো ঝাড়ল, বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র টানাটানি করে তাদের জায়গা বদল করল। সম্মানিত অতিথিটিকে মুগ্ধ করার জন্যে যা যা দরকার তাই করা হল। তাঁকে যেন বোঝাতে হবে যে দরিদ্র হলেও তারা আসলে সম্ভ্রান্ত। অর্থাৎ লাজারা যা করতে চেয়েছিল বাস্তবে হল ঠিক তার বিপরীত।

বৃহস্পতিবার রাতে সিঁড়ি বেয়ে ন'তলা উঠতে রাষ্ট্রপতির প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। পরনে পুরোনো জিনিসের বাজার থেকে কেনা একটা নতুন কোট, মাথায় সাবেকি কেতায় বানানো তরমুজের আকারের ঢাউস। আর লাজারার জন্যে একটা গোলাপ হাতে নিয়ে হোমেরোদের দরজায় তিনি উপস্থিত। রাষ্ট্রপতির পুরুষোচিত চেহারা এবং যুবরাজের মতো আচরণে লাজারা তো রীতিমতো অভিভূত। তার মধ্যেই লাজারা মিলিয়ে নিয়েছে নিজের আশঙ্কা,—মানুষটি কপট এবং লোভী। হয়তো কিছুটা শিষ্টাচারবিহীন। বাড়িঘরকে চিংড়ির গন্ধমুক্ত রাখার জন্যে লাজারা জানালা খুলেই রান্না করেছিল। কিন্তু ঘরে ঢুকেই রাষ্ট্রপতি একটা গভীর নিঃশ্বাস টেনে, চোখ বন্ধ করে, দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে আবেগ মেশানো সুরে উচ্চারণ করলেন,—'আঃ! একেবারে আমাদের সমুদ্রের গন্ধ।' লাজারার ধারণার থেকে মানুষটি অনেক বেশি কৃপণ না হলে মাত্র একটা গোলাপ হাতে করে কেউ আসে? নিশ্চয়ই সরকারি বাগান থেকে চুরি করে এনেছে। দেওয়ালের কাগজগুলোর দিকে তাচ্ছিল্যভরা চাউনিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে মনে হল মানুষটি যথেষ্ট উদ্ধত। অথচ ওইসব পুরোনো খবরের কাগজের টুকরোগুলোতে ছাপা ছিল রাষ্ট্রপতির নানাবিধ কীর্তিকাহিনির খবরাখবব। তখনকার নির্বাচনী প্রচারের প্রতীক ও পতাকাও ছাপা ছিল। দেওয়ালে কাগজগুলো আটকাবার সময় হোমেরো তো আনন্দে ডগমগ। আর এখন এই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিটিকে মনে হল নিষ্ঠুর। বারবারা বা লাজারোকে সম্ভাষণ পর্যন্ত করলেন না। অথচ তাঁর জন্যে উপহারও রাখা ছিল। তার উপর আবার খেতে বসে বললেন দুটি জিনিস তাঁর একেবারে অসহ্য। প্রথমত কুকুর আর ছেলেপুলে। কথাটা শোনামাত্রই ঘেন্নায় লাজারার গা ঘিনঘিন করে উঠল। শুধুমাত্র ক্যারিবিয়ান আতিথেয়তার সুবাদে পরিস্থিতিটাকে সামাল দেয় সে। লাজারার পরনে বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যে তুলে রাখা আফ্রিকান গাউন। গলায় 'সান্তেরিয়া' দানার মালা আর হাতে ব্রেসলেট। এতটুকু আতিশয্য না দেখিয়ে বা একটিও অবান্তর কথা না বলে সে অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত। বিরক্তি প্রকাশ পায় বা ত্রুটি ধরা পরে এমন কিছুই লাজারা করেনি। লাজারার আপ্যায়ন নিখুঁত বললে বোধ হয় কম বলা হবে।

চিংড়ির পোলাও মোটেও সবচেয়ে উপাদেয় খাবার নয়। তবুও যতটা সম্ভব যত্ন নিয়ে রান্না করা হয়েছে। রান্নাটা যথেষ্ট সুস্বাদুই হয়েছে। রাষ্ট্রপতিও দু'বাব চেয়ে নিলেন। প্রশংসাও করলেন। তৃপ্তিব সঙ্গেই খেলেন পাকা কলার ভাজা টুকরোগুলো। আযোকাদো স্যালাডও খেলেন। তৃপ্তি করে খাওয়ার সময় তিনি অবিশ্যি স্মৃতির সরণি বেয়ে দেশের কথায় ফিরে যাননি। লাজারা কেবল চুপ করে তাঁদের কথাবার্তা শুনছিল। অবশেষে মিষ্টি পরিবেশন করার সময় কোনও কারণ ছাড়াই হোমেরো ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত আলোচনার কানাগলিতে হাজির হল।

'আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর আছেন',—রাষ্ট্রপতি বললেন। তবে মানুষের জীবনে তাঁব কোনও হাত

নেই।'

'আমার অবিশ্যি গ্রহনক্ষত্রে অগাধ বিশ্বাস',—বলেই লাজারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাষ্ট্রপতির প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ করল। জিজ্ঞেস করল,—'আপনার জন্মতারিখটা কি জানতে পারি?'

'এগারোই মার্চ।'

যেন বিরাট একটা জয় হয়েছে এমন উল্লাস দেখিয়ে লাজারা চঞ্চল হয়ে বলে উঠল,—'জানতাম।' তারপর গলায় খুশির ভাব ফুটিয়ে প্রশ্ন করল,—'এক টেবিলে দুই মীনরাশির জাতককে দেখতে অস্বস্তি হচ্ছে না আপনার?'

তাঁরা কিন্তু তখনও ঈশ্বর সংক্রান্ত আলোচনা করেই চলেছেন। কফি বানাতে উঠে গেল লাজারা। এক ফাঁকে টেবিলও পরিষ্কার করল। সে মনে মনে চাইছে যে সন্ধেটা যেন ভালোভাবে উতরে যায়। কফি নিয়ে খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে আসার সময় রাষ্ট্রপতির একটা মন্তব্য কানে আসায় স্তম্ভিত হয়ে গেল লাজারা। রাষ্ট্রপতি বলছেন,—'বিশ্বাস করো, আমাকে যদি দেশের রাষ্ট্রপতি করা হয় তাহলে আমাদের গরিব দেশের পক্ষে ভয়ংকর খারাপ কাজ হবে।'

হোমেরো দেখল ধার করে জোগাড় করা চিনামাটির কাপ আর রুপোর কফি-পাত্র নিয়ে দরজায় লাজারা উপস্থিত। দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুনি যেন মূর্ছা যাবে। রাষ্ট্রপতিও ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন। তিনি বিনীতভাবে বললেন,—'আমার দিকে অমন করে তাকাবেন না। আমি সত্যিকথাটাই বলেছি। নিজের বোকামির জন্যে আজ আমায় এত বড় মূল্য দিতে হচ্ছে।'

লাজারা কফি পরিবেশন করে টেবিলের আলোটা নিভিয়ে দিল। অত উজ্জ্বল আলো কথা বলার উপযোগী নয়। ঘরের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ ছায়াঘন পরিবেশ তৈরি হওয়ায় লাজারা এই প্রথম অতিথি সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করল। অতিথিটি বুদ্ধিমান। তবে তাঁর বিষাদ ঢাকা পড়েনি। লাজারার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল, যখন রাষ্ট্রপতি কফি খাওয়া শেষ করে পেয়ালাটা উপুড় করে রেখে দিলেন পিরিচের ওপর, যাতে কফির গুঁড়ো সেখানে জমতে পারে।

রাষ্ট্রপতি বললেন যে নির্বাসনের জন্যে তিনি মার্তিনিকে দ্বীপটিই বেছে নিয়েছিলেন ; কারণ সেখানকার কবি আইমে সেজাইরে তাঁর বন্ধু। সেজাইরের লেখা 'কাহির দু'য়ান রেতুর অ পাইজ নাতাল' শিরোনামের কাব্যগ্রন্থটি তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে। এই বন্ধুটিই তাঁকে নতুন করে জীবন শুরু করতে সাহায্য করেছিলেন। স্ত্রীর সম্পত্তির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়ে তিনি 'ফোর্ত-দে-ফ্রান্স'-এর পাহাড়ে কাঠের তৈরি একটি দামি বাড়ি কিনেছিলেন। বাড়িটার জানালায় পর্দা ছিল। আর ছিল প্রাচীন জাতের ফুল গাছে ভরা একটা বারান্দা, যেখান থেকে সরাসরি সমুদ্র দেখা যায়। চিনির কল থেকে ভেসে আসা গুড় আর মদের গন্ধ মাতোয়ারা হাওয়ায় শরীর জুড়োতে জুড়োতে আর ঝিঁঝিঁপোকার ডাক শুনতে শুনতে পরম আরামে ঘুমোনো যেত তৃপ্তির ঘুম। রাষ্ট্রপতির থেকে চোদ্দো বছরের বড় ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্মের পর থেকেই ভদ্রমহিলা পঙ্গু। লাতিন ভাষায় আরেকবার চিরায়ত সাহিত্য পড়া শুরু করেছিলেন বলেই তিনি ভাগ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি পেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস এতই দৃঢ় যে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন বারবার চিরায়ত লাতিন সাহিত্য পড়াই তাঁর একমাত্র কাজ। নির্বাচনে তাঁর দল হেরে যাওয়ার পর দলের নেতৃত্ব বহুদিন পর্যন্ত তাঁর কাছে নতুন নতুন আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব পাঠাত। কিন্তু সেই প্রলোভন জয় করেছেন তিনি। বললেন,—'যখন বুঝতে পারলাম ওদের প্রস্তাবগুলো একেবারেই অসার, আজ যেটাকে ভীষণ জরুরি বলে মনে করছে, সপ্তাহখানেক পরেই সেটাকে বাতিল করে অন্য কিছু নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করছে, আর মাস দুয়েক পরেই দেখা যাবে পুরোনো পরিকল্পনার কিছুই আর মনে নেই, এমনকী যে চিঠি লিখেছিল সেও ভুলে গেছে সবকিছু, তখন ঠিক করলাম, আর কোনও চিঠিই খুলব না। খুলিওনি।'

আবছা আলোয় তিনি তাকালেন লাজারার দিকে। সে তখন একটা সিগারেট ধরিয়েছে। লাজারার হাত থেকে রাষ্ট্রপতি জ্বলন্ত সিগারেটটা নিয়ে নিলেন। লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়াটা গলায় চালান করে দিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠে লাজারা আরেকটা সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাইয়ের

বাক্স আর সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে তুলে নিল। ঠিক তখনই তিনি জ্বলন্ত সিগারেটটা ফিরিয়ে দিলেন।

'চোখের সামনে অমন আয়েস করে কাউকে সিগারেট খেতে দেখলে লোভ দমন করা কষ্টকর',—তিনি বললেন। এবার গলার মধ্যে জমিয়ে রাখা ধোঁয়াটাকে বের করে দিলেন। তাঁর কাশি আসছে। 'অনেককাল আগেই ছেড়ে দিয়েছি সিগারেটের নেশা',—তিনি বললেন। 'কোনও কোনও সময় অভ্যেসের কাছে আমি একেবারে হেরে যাই। যেমন এই এখন।'

কাশির দাপট তাঁর পুরো শরীরটাকে হঠাৎ করে আরও বার দুয়েক ঝাঁকিয়ে দিল। ব্যথাটা শুরু হল। ছোট পকেটঘড়িটি দেখলেন রাষ্ট্রপতি। সন্ধের সময় যে সব ওষুধ খাওয়ার কথা, সেগুলো খেয়ে নিলেন। এবার উঁকি দিয়ে কাপের তলার তলানিটা দেখলেন। কিছুই পালটায়নি। তবে এবার আর তিনি কেঁপে উঠলেন না।

'আমার সমর্থকদের মধ্যে কেউ কেউ পরে রাষ্ট্রপতি হয়েছিল',—বললেন তিনি।

হোমেরো ধরিয়ে দেয়,—'সায়াগো।'

'শুধু সায়াগো কেন, অন্যেরাও',—তিনি বললেন। 'আমাদের সকলেই জোর করে সমর্থন আদায় করেছে। আমাদের তা প্রাপ্য নয়। সেই দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যতা আমাদের নেই। কেবল ক্ষমতার লোভ। বেশিরভাগেরই প্রত্যাশা তার থেকে কম। শুধু একটা চাকরি।'

লাজারা রীতিমতো ক্রুদ্ধ। তার জিজ্ঞাস্য,—'আপনি জানেন, ওবা কী বলে আপনার সম্পর্কে?'

হোমেরো আতঙ্কিত হয়ে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেয়। 'না, না, ওরা মিথ্যেকথা বলে।'

'মিথ্যে, আবার মিথ্যে নয়ও।' রাষ্ট্রপতির কণ্ঠস্বর স্বর্গীয় প্রশান্তিতে ভরপুর। 'রাষ্ট্রপতি যখন বিষয় হয়, তখন সবচেয়ে কলঙ্কিত কাহিনিও সত্যি বা মিথ্যে দুই-ই হতে পারে।'

নির্বাসনের পুরো মেয়াদটাই তিনি কাটিয়েছেন মার্তিনিকে দ্বীপে। সরকারি কাগজপত্রে যেটুকু সামান্য খবর পৌঁছোত, সেইটুকুই ছিল বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর একমাত্র যোগসূত্র। সরকারি বিদ্যালয়ে স্প্যানিশ ও লাতিন পড়িয়ে চলত তাঁর ভবণপোষণ। আর আইমে সেজাইরে বিভিন্ন সময়ে তাঁকে যে সব অনুবাদের কাজ দিতেন তা দিয়েই তাঁর পেট চলত। অগস্ট মাসে যখন গরম অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন তিনি দোলখাটিয়ায় দুপুর পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন। কানে আসত শোয়ার ঘরের পাখার ভোঁ ভোঁ শব্দ।

দিনের বেলার চড়া গরমে তাঁর স্ত্রী পোষা পাখিদের খাওয়ানোর জন্যে বেরোতেন। তাঁর মাথায় থাকত একটা সাধারণ শনের টুপি। টুপিটার চওড়া ধার নকল ফল আর অরগ্যান্ডির ফুল দিয়ে সাজানো। পাখিগুলো ঘরের বাইরে খোলা জায়গাতে স্বাধীনভাবেই থাকত। দুপুরের তাপ কমে যাওয়ার পর ঠান্ডা বাতাসে বসে থাকাটা কিন্তু আরামদায়ক। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত সমুদ্রের দিকে নির্নিমেষভাবে তাকিয়ে বসে থাকতেন রাষ্ট্রপতি। আর তাঁর স্ত্রী, যাঁর মাথায় ছেঁড়া টুপি, হাতেব প্রতিটি আঙুলে ঝকমকে পাথরের আংটি, তিনি দোলচেয়ারে বসে একদৃষ্টিতে দেখতেন জাহাজের আসা-যাওয়া। এই পৃথিবীরই সব জাহাজ।

'ওই জাহাজটা পুয়েন্তো সান্তোর',—তিনি বলতেন। 'কী পরিমাণে কলা বোঝাই করেছে! নড়তেই পারছে না',—তিনি বলে যেতেন। তিনি ভাবতেই পারতেন না তাঁর দেশের নয় এমন কোনও জাহাজ সেই পথ দিয়ে যেতে পারে। স্ত্রীর এইসব কথাবার্তা না শোনার ভান করতেন রাষ্ট্রপতি। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বামী যা ভুলতে পেরেছিলেন তার থেকে অনেক বেশি তিনি ভুলে যেতে পেরেছিলেন। ভদ্রমহিলার স্মৃতিভ্রংশ হয়। এভাবে তাঁরা সমুদ্রেব ধাবে বসে থাকতেন। তারপর গোধূলির কোলাহল থেমে গেলে মশার উৎপাতে তাঁরা ফিরে যেতেন ঘবে।

এমন এক অগস্টের দিনে বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চমকে উঠলেন রাষ্ট্রপতি।

'কী আশ্চর্য',—তিনি বললেন। 'আমি নাকি এস্তোরিলেই মবে গেছি।' তাঁর স্ত্রী ঝিমুচ্ছিলেন। খবরটা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। কাগজের পঞ্চম পাতার এক কোনে লাইন ছয়েকের একটা খবর। অথচ এই সংবাদপত্রেই তাঁর অনুবাদকর্ম মাঝে মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই খবরের কাগজেব ম্যানেজাব মাঝে

মাঝে এসে তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছেন। আর সেই কাগজেই কিনা এখন লেখা হচ্ছে তিনি মারা গেছেন এস্তোরিল দি লিসবোঁয়াতে, যেখানে ইয়োরোপে যাদের পতন হয়েছিল সেইসব মানুষদের আশ্রয় ও বসবাস এবং যেখানে তিন কখনও যাননি। সম্ভবত সেটাই পৃথিবীর একমাত্র জায়গা যেখানে তিনি মারা যেতে চাননি।

শেষ পর্যন্ত যেটুকু স্মৃতি অবশিষ্ট ছিল, বিশেষত তাঁর একমাত্র সন্তানের স্মৃতির যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে, এর বছরখানেক বাদে তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। পিতাকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে এই ছেলেও অংশ নিয়েছিল। পরে অবিশ্যি নিজের দলের লোকের হাতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে সে মারা যায়।

রাষ্ট্রপতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'এই তো আমাদের অবস্থা। কোনও কিছুই রক্ষা করতে পারবে না আমাদের',—তিনি বললেন। 'পৃথিবীর আবর্জনা থেকে জন্ম নিয়েছে একটা মহাদেশ। সেখানে মুহূর্তের জন্যেও ভালোবাসা ছিল না। নারীহরণ, ধর্ষণ, অত্যাচার, যাবতীয় নিন্দনীয় কাজ, প্রতারণা আর শত্রুর সঙ্গে শত্রুর সংযোগে জন্ম নেয় সেখানকার সন্তান।' তিনি খেয়াল করলেন লাজারার আফ্রিকান চোখ দুটি কঠিন দৃষ্টিতে তাঁকে দেখে চলেছে। সুনিপুণ বাগ্মিতার গুণে অপরকে প্রভাবিত করার তাঁর বহুকালের পুরোনো ক্ষমতা দিয়ে তিনি লাজারাকে জয় করবার চেষ্টা করলেন। বললেন,—'বর্ণসংকরের অর্থ হল চোখের জলের সঙ্গে ছলকে পড়া রক্তের মিলন। এমন বিষক্রিয়া থেকে কী পাওয়া যেতে পারে?'

মৃত্যুর মতো নীরবতা যেন সেখানে উপস্থিত। সকলেই স্তব্ধ। লাজারাই যেন স্তব্ধ করে রেখেছে সকলকে। অনেকক্ষণ। মধ্যরাত্রির খানিকটা আগে লাজারা সংবিৎ ফিরে পেল। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে চুম্বন দিয়ে সে রাষ্ট্রপতিকে বিদায় জানাল। হোমেরো তাঁকে হোটেলে এগিয়ে দিতে চাইল ; রাষ্ট্রপতি রাজি হলেন না। যদিও সে ট্যাক্সি ধরে দেবে বলে বাধা না মেনে সঙ্গে গেল।

বাড়ি ফিরে এসে হোমেরো দেখে, স্ত্রী রাগে ফেটে পড়ছে। 'পৃথিবীতে ওই একটাই রাষ্ট্রপতি যাকে গদি থেকে হঠিয়ে দিয়ে ঠিক কাজ করা হয়েছে। কুত্তির বাচ্চা।'

হোমেরো তাকে শান্ত করার যতই চেষ্টা করুক না কেন, বাকি রাতটা না ঘুমিয়ে সাংঘাতিকভাবে কাটল। লাজারা স্বীকার করল যে এ পর্যন্ত সে যত মানুষ দেখেছে তার মধ্যে এই মানুষটি সবচেয়ে সুদর্শন। এমনই সম্মোহিনী শক্তি যে তোমাকে শেষ করে দেবে। ষাঁড়ের মতো পৌরুষ। 'এই এখন তাঁর যা অবস্থা, বুড়ো এবং নিঃশেষ, এখনও বিছানায় মানুষটি বাঘের শক্তি ধরবে',—লাজারা জানায়। কিন্তু তার মনে হচ্ছে তাঁর এইসব ঈশ্বরপ্রদত্ত গুণাবলী তিনি ভণ্ডামি করে নষ্ট করেছেন। তার অসহ্য লাগছিল যখন তিনি অহংকার করে বলছিলেন যে দেশের সবচেয়ে অযোগ্য রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি। অসহ্য লাগছিল তাঁর সাধুত্বের ভান, যখন লাজারা নিশ্চিতভাবে জানে যে মার্তিনিকের অর্ধেক আখের খেতের মালিক ছিলেন তিনি। আর ক্ষমতার প্রতি তাঁর অনীহা? সব ভণ্ডামি। অথচ এ তো স্পষ্ট যে রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্যে সর্বস্ব দিতে তিনি প্রস্তুত। আর একবার হতে পারলে দীর্ঘকালের জন্যে তিনি পদ আঁকড়ে থাকবেন, যাতে তাঁর শত্রুদের মাটির তলায় পাঠানো যায়।

'আর যে সব কথা বলে গেলেন',—বলে লাজারা শেষ করল,—'তা শুধু এই জন্যে যাতে পায়ের কাছে বসে আমরা তাঁর বন্দনা করি।'

'তাতে তাঁর কী লাভ?' হোমেরো প্রশ্ন করে।

'কিছুই নয়',—লাজারা জবাব দেয়। 'মানুষকে সম্মোহিত করাটা একটা নেশা। কাটানো মুশকিল।'

লাজারা এমন রেগে রয়েছে যে হোমেরোর পক্ষে তাকে বিছানায় সহ্য করা কষ্টকর। বাকি রাতটা বসবার ঘরের সোফায় একটা কম্বল জড়িয়ে শুয়ে থাকল হোমেরো। মাঝরাতে লাজারাও জেগে গেল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত পোশাকবিহীন ; এইভাবেই সে ঘুমোতে অভ্যস্ত, অথবা বাড়িতে যখন একা থাকে। আপনমনে বেচারি গজগজ করতে থাকে, অবশ্যই সেই একই বিষয়ে। ইচ্ছে করছে, এক ধাক্কায় মুছে ফেলে সেই ঘৃণ্য নৈশভোজের সমস্ত স্মৃতি। সকাল হতে না হতেই ফিরিয়ে দিল ধার করে আনা যাবতীয় জিনিসপত্র। নতুন পর্দাগুলো খুলে ফেলে টাঙিয়ে দিল পুরোনো পর্দা। বাড়িঘরের চেহারায় ফিরে এল আগেকার দারিদ্র মেশানো সুরুচির ছাপ। একটানে খুলে ফেলে চিরকালের মতো আবর্জনার ঝুড়িতে

ছুঁড়ে ফেলে দিল দেওয়ালে আটকানো সংবাদপত্রের সেইসব টুকরোগুলো যেগুলোতে ছাপানো রয়েছে সেই জঘন্য নির্বাচনী প্রচারের খবর-ছবি-প্রতীক-পতাকা ; আর তখন সে চিৎকার করে উঠল,—'গোল্লায় যাক সব।'

সেই নৈশভোজের সপ্তাহখানেক বাদে হাসপাতাল থেকে বেরোনোর সময় হোমেরোর চোখে পড়ল রাষ্ট্রপতি তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হোমেরোকে সঙ্গে করে তিনি হোটেলে নিয়ে গেলেন। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে চারতলার ওপর চিলেকোঠায় পৌঁছোনো গেল। ঘুলঘুলির মতো এক টুকরো জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘোলাটে আকাশ। ঘরের ভেতর টাঙানো দড়িতে শুকোচ্ছে কাপড়চোপড়। ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে একটা বিশাল খাট। আর রয়েছে একটা কাঠের চেয়ার, বিবর্ণ আয়না লাগানো সাদামাটা একটা আলমারি এবং হাত-মুখ ধোয়ার বেসিন। রাষ্ট্রপতি লক্ষ করলেন হোমেরোর প্রতিক্রিয়া।

'ছাত্রাবস্থায় এই খুপরিতেই থাকতাম।' ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে তিনি বললেন,—'ফোর্ত-দে-ফ্রান্স থেকে আগেই এটা ভাড়া করা ছিল।'

এবার ভেলভেটের একটা থলি তিনি বিছানার ওপর উপুড় করে দিতেই ছড়িয়ে পড়ল বেশ কিছু গয়নাগাটি। তাঁর সম্পদের সামান্য অবশিষ্ট। নানারকমেব দামি মণিমুক্তো বসানো কয়েকটা সোনার ব্রেসলেট, একটা তিন লহরির মুক্তোর নেকলেস, দামি পাথর বসানো দুটো সোনার নেকলেস, সাধুসন্তের ছবি লাগানো লকেটসহ তিনটে সোনার হার এবং তিন জোড়া সোনার দুল। সেগুলোর মধ্যে এক জোড়ায় পান্না, আরেক জোড়ায় হিরে এবং বাকি জোড়ায় চুনি বসানো। ধর্মকর্মের জিনিসপত্র রাখার দুটো বাক্স এবং একটা লকেট। নানারকমের মহার্ঘ মণিখচিত এগারোটা আংটি। রানিদের উপযুক্ত একটা হিরের টায়রা। একটা বাক্স থেকে বেরোল তিন জোড়া রুপোর আর দু'জোড়া সোনার কাফলিঙ্ক। সেই সঙ্গে মানানসই টাইপিন। আর সাদা সোনার পাতে মোড়া একটা সোনার ঘড়ি। তারপর একটা জুতোর বাক্স থেকে বের করলেন ছটা পদক। পদকগুলোর মধ্যে দুটো সোনার, একটা রুপোর আর বাকি তিনটে একটু সস্তা। 'এই হল আমার শেষ সম্বল।'

এইসব গয়নাগাটি বিক্রি করে চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে হবে তাঁকে। এ ছাড়া তাঁর সামনে আর অন্য কোনও পথ নেই। হোমেরোকে তিনি অনুরোধ করলেন সে যেন বুঝেশুনে এগুলি ঠিকঠাক দামে বিক্রি করে দেয়। হোমেরো অবিশ্যি তখন ভাবছে আসল রসিদ ছাড়া এগুলো কী করে বিক্রি করবে। রাষ্ট্রপতি জানালেন যে পিতামহীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর স্ত্রী এইসব গয়নাগাটি পেয়েছিলেন। সেটা ছিল উপনিবেশের যুগ। কলোম্বিয়ার সোনার খনির একাংশের মালিকানা ছিল তাঁর স্ত্রীর পিতামহীর। তিনি আবার কোনও এক উত্তরাধিকার সূত্রে ওটি পেয়েছিলেন। তবে ঘড়িটা, কাফলিঙ্ক এবং টাইপিনগুলো তাঁর নিজের। পদকগুলোও অবিশ্যি উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া নয়। 'কারও কাছে কি এইসব জিনিসের রসিদ থাকে?'

হোমেরো কিন্তু রাজি নয়। 'তাহলে',—রাষ্ট্রপতির গলায় অসন্তোষের সুর স্পষ্ট। 'আমি নিজেই তবে চেষ্টা করে দেখি।'

সুবিবেচনার পরিচয় দিয়ে কোনওরকম উত্তেজনা ছাড়াই একে একে অলংকারগুলি তিনি গুছিয়ে তুলতে লাগলেন। বললেন,—'তুমি কিন্তু কিছু মনে কোরো না। হোমেরো, তুমি আমার প্রিয়পাত্র। তোমায় বলি, গরিব হয়ে যাওয়া রাষ্ট্রপতির মতো দরিদ্র আব কেউ নয়। এমনকি এখন বেঁচে থাকতেও ঘৃণা হয়।' এবার তিনি হোমেরোর হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছেন। হোমেরো তার অস্ত্র নামিয়ে নিয়েছে।

লাজারা সেদিন অনেক রাত করে বাড়ি ফিবল। বিছানাব ওপর ঝকঝক করতে থাকা গহনাগুলি দরজা থেকেই তার নজরে এসেছে। তার মনে হল বিছানার ওপর একটা কাঁকড়াবিছে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'এতটুকু বুদ্ধি নেই তোমার? এগুলো এখানে এনেছ কেন?' লাজারার কণ্ঠস্বরে রীতিমতো ভয়ের আভাস।

হোমেবোর ব্যাখ্যা শুনে সে আরও ভয় পায়। বিছানায় বসে জহুরির চোখে একটি একটি করে সে

প্রতিটি গহনা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তারপরে এক সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলল,—'এ যে বিরাট সম্পত্তি।' এবার সে তাকায় হোমেরোর দিকে। কিন্তু উভয়সংকট থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পায় না।

'দুত্তোরি',—মন্তব্য করে লাজারা বলে,—'লোকটা সব সত্যি বলছেন কিনা কী করে বুঝব?'

'কেন নয়',—জবাবে হোমেরো প্রশ্ন করে। 'এই তো দেখে এলাম নিজের জামাকাপড় উনি নিজেই কাচেন। আমাদের মতোই ঘরের মধ্যে দড়ি টাঙিয়ে শুকোতে দিয়েছেন।'

'কারণ ওঁর দৃষ্টিটা নিচের দিকে',—লাজারার স্পষ্ট কথা।

'অথবা উনি খুবই গবিব',—হোমেরো সাফাই গায়।

লাজারা গয়নাগুলো আবার পরীক্ষা করে দেখল। রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে সে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে। এবং পরের দিন সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরার পর বেছে বেছে সেই গয়নাগুলো দিয়ে নিজেকে সাজাল, যেগুলো দেখে বেশি দামি মনে হয়। সবকটা আঙুলে, এমনকি বুড়ো আঙুলেও গলিয়ে দিল আংটি। দু'হাতে পরে নিল সবগুলো ব্রেসলেট। এবার শুরু হল বিক্রয় অভিযান। 'দেখা যাক, লাজারা ডেভিসের কাছে কে রসিদ চায়।'

ঠিক দোকানটিই বেছে নিয়েছে লাজারা। তেমন দামি নয়, তবে জাঁকজমকে ত্রুটি নেই। সে জানে এইসব দোকানে গয়নাগাটি কেনাবেচার সময় কেউ বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করে না। দোকানের ভেতর সে ঢুকল ভয়ে ভয়ে কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে।

সান্ধ্য পোশাক পরিহিত রোগাটে চেহারার একজন ফ্যাকাশে মতো কর্মচারী নাটকীয় ভঙ্গিতে নিচু হয়ে লাজারাকে অভিবাদন করল। তার হাতে চুমু খেয়ে কর্মচারীটি জিজ্ঞাসা করল কীভাবে লাজারাকে সে সাহায্য করতে পারে। আলোয় ঝলমলে দোকানটার চারদিকই আয়না দিয়ে মোড়ানো। তাই দোকানের ভিতরটা দিনের চেয়েও উজ্জ্বল। মনে হচ্ছে পুরো দোকানটাই হিরে দিয়ে গড়া। লাজারা কর্মচারীটির দিকে না তাকিয়ে তাকে অনুসরণ করে চলে গেল দোকানের পিছন দিকে। পাছে ফাঁকিটা ধরা পড়ে যায় ভেবে লাজারা যথেষ্ট ভীত।

'লুই পঞ্চদশ'-এর আমলের প্রচলিত নকশার তিনটি টেবিল সাজানো আছে দোকানের কাউন্টার হিসেবে। সেখানেই লাজারাকে বসতে বলা হল। কর্মচারীটি টেবিলের ওপরে পেতে দিল পরিষ্কাব কাপড়। তারপরে লাজারার মুখোমুখি বসে সে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

'কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি',—কর্মচারীটি বিনীতভাবে নিবেদন করে।

আংটি, ব্রেসলেট, দুল অর্থাৎ যে সমস্ত গয়না গায়ে পরা ছিল সেগুলো খুলে ফেলে টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিয়ে লাজারা জানতে চাইল,—'এগুলোর আসল দাম কত?' জহুরি একটা কাচ বাঁ চোখের সামনে রেখে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের নীরবতা নিয়ে অলংকারগুলি খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে দেখাব পর পরীক্ষা করতে করতেই সে প্রশ্ন কবে,—'আপনি কে.থেকে আসছেন?' এমন কোনও প্রশ্নের জন্যে লাজারা আদৌ প্রস্তুত নয়।

'অ্যাঁ! অনেক দূর থেকে।'

'সে আমি বুঝতে পেরেছি',—মন্তব্য কবেই জহুরি আবার নীরব হয়ে যায়। ওদিকে লাজারাব সোনালি চোখদুটি সাংঘাতিক কঠিন দৃষ্টিতে তাকে খুঁটিয়ে দেখছে। জহুরি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে হিরের টায়রাটা দেখে নিয়ে অন্য গয়নাগুলির থেকে সেটাকে আলাদা করে রাখায় লাজারার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

'আপনার যে কন্যা রাশি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই',—লাজারা মন্তব্য করে। হাতের কাজ গুটিয়ে না রেখে জহুরি পালটা প্রশ্ন করে,—'কী ক . বুঝলেন?'

'আপনার ধরন দেখে',—লাজারার পরিষ্কার জবাব।

কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জহুরি কোনও মন্তব্য করল না। তারপর একেবারে সূচনাপর্বের মতো শিষ্টাচার বজায় রেখে অত্যন্ত সন্তর্পণে লাজারাকে জিজ্ঞেস করল,—'এগুলো কোথাকার?'

'আমার দিদিমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া'—লাজারার সতর্ক উত্তর। তার কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় টানটান। 'গত বছর পারামাইবোয় সাতানব্বই বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন।'

কথাটা শোনার পর লাজারার চোখে চোখ রেখে জহুরি মন্তব্য করল,—'আমি খুবই দুঃখিত।'

টায়রাটা আঙুলের ডগায় তুলে ধরে জহুরি জানাল,—'এটার শুধু সোনাটুকুর দাম পাওয়া যাবে।' উজ্জ্বল আলোয় টায়রাটা চকচক করছে। 'মনে হচ্ছে এটা খুবই প্রাচীন মিশরীয় গয়না। হিরেগুলোর অবস্থা ভালো হলে এটা মহা মূল্যবান জিনিস হত। তবে এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অন্যান্য গয়নার সমস্ত পাথরগুলোই ঝুটো। আসলগুলো নিশ্চয়ই ভালো ছিল।'

জহুরি গয়নাগুলো গুছোতে গুছোতে বলে যায়,—'আসলে পুরুষানুক্রমে এগুলো এতবার হাত বদল হয়েছে যে আসল পাথরগুলো হারিয়ে গেছে আর তার বদলে সস্তা কাচ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

লাজারা কেমন যেন বিবমিষা বোধ করে। মনের ভিতর গজিয়ে ওঠা আতঙ্ককে সে কোনওরকমে চাপা দেয়। জহুরি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—'অনেক সময়ই এরকম হয়।'

'আমি জানি',—আশ্বস্ত হয়ে নিয়ে লাজারা বলল। 'সেই জন্যেই তো এগুলোর হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই।'

নিজের কঠিন অবস্থার কথা অনুভব করার পর আবার নিজের আসল চেহারায় ফিরে যায় লাজারা। একটুও দেরি না করে হাতব্যাগ থেকে কাফলিঙ্ক, পকেটঘড়ি, টাইপিন, রুপো ও সোনার পদক এবং রাষ্ট্রপতির অন্যান্য ব্যক্তিগত ছোটখাটো গয়নাগুলোও বের করে টেবিলের ওপর রাখল।

'এগুলোও',—জহুরি প্রশ্ন করে।

লাজারা জবাব দেয়,—'হ্যাঁ, সব।'

দাম হিসেবে লাজারা সুইস ফ্রাঁ-র যে নোটগুলো পেল সেগুলো এতই নতুন যে মনে হচ্ছে কালিটা এখনও টাটকা, আঙুলে না লেগে যায়। বিলগুলোও গুনে নিল না। একই রকম সম্ভ্রম ও ভদ্রতার সঙ্গে জহুরি লাজারাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। কাচের দরজাটা খুলে ধরে লাজারাকে একটু দাঁড় করিয়ে সে বলল,—'আমার কিন্তু কুম্ভ রাশি।'

সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়ার আগেই লাজারা আর হোমেরো সদ্য জোগাড় করা নোটগুলো নিয়ে হোটেলে গেল। হিসেবনিকেশ করে দেখা গেল এখনও কিছু কম পড়ছে। রাষ্ট্রপতি এবার বিয়ের আংটি, চেন লাগানো পকেটঘড়ি, কাফলিঙ্ক, টাইপিন এককথায় তাঁর গায়ে দামি যা কিছু ছিল সব খুলে বিছানার উপর রাখতে লাগলেন।

লাজারা আংটিটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলল,—'এটা নয়। এমন স্মৃতিচিহ্ন বেচা যায় না।'

প্রস্তাবটা মেনে নিলেন রাষ্ট্রপতি। সেটা আবার আঙুলে পরে নিলেন। চেন লাগানো পকেটঘড়িটাও লাজারা ফিরিয়ে দিয়ে বলল,—'এটাও নয়।'

এবার রাষ্ট্রপতি আপত্তি করলেন। কিন্তু লাজারা তাঁকে দিয়ে বলল,—'সুইজারল্যান্ডে পুরোনো ঘড়ি কে কিনবে?'

'কেন আমরাই তো বেচেছি',—হোমেরো বলার চেষ্টা করে।

লাজারা হোমেরোকে সংশোধন করে দিয়ে জানাল,—'হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই। তবে ঘড়ি নয় আমরা বেচেছিলাম ঘড়ির সোনাটুকু।'

'এটাও সোনার',—রাষ্ট্রপতি বললেন।

'সোনার। অহলে আর কী!' লাজারা জোরের সঙ্গে বলল। 'অপারেশন না করালেও আপনার চলতে পারে, কিন্তু কখন ক'টা বাজল তা না জানলে চলবে না।'

তাঁর সোনার ফ্রেমের চশমাটাও লাজারা নিল না। অথচ আরেক জোড়া কচ্ছপের খোলের চশমা তাঁর রয়েছে। জিনিসগুলো হাতে তুলে লাজারা আন্দাজ করার চেষ্টা করল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বলল,—'এতেই হয়ে যাবে।'

বেরিয়ে আসার আগে ঘরের দড়িতে টাঙানো ভেজা জামাকাপড়গুলো রাষ্ট্রপতির অনুমতি না নিয়েই গুছিয়ে নিল লাজারা। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওগুলোকে ইস্ত্রি করে শুকিয়ে নেওয়া যাবে। মোটর সাইকেলে চেপে ওরা এবার বাড়ির পথে। হোমেরো চালাচ্ছে আর লাজারা দু'হাতে হোমেরোর কোমর

জড়িয়ে বসে আছে পিছনের সিটে। রক্তিম বেগুনি গোধূলিতে কেবলমাত্র রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। গাছের শেষ পাতাটাও হাওয়ায় উড়ে গেছে। ন্যাড়া গাছগুলোকে দেখাচ্ছে জীবাশ্মের মতো। রাস্তায় সংগীতের সুরলহরি ছড়িয়ে দিতে দিতে একটা ট্রাক চলে গেল। আসলে ট্রাকের ভিতবে রেডিওতে পুরোদমে বাজছে জর্জেস বাসেনস্-এর একটা পরিচিত গান,--হে আমার প্রিয়তমা, শক্ত করে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলাম/ওখান দিয়ে সময় যাবে বলে/হায়, অ্যাটিলার মতো বর্বর সময়!/তাব ঘোড়া যায় সেখান দিয়ে/প্রেম যেখানে যায় শুকিয়ে।

ওরা দুজনেই নির্বাক। গানের কথা-সুরে পুরোপুরি অভিভূত। তাদের স্মৃতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে শাপলা ফুলের গন্ধ। খানিকক্ষণ বাদে লাজারার মনে হল দীর্ঘ নিদ্রার থেকে সে জেগে উঠেছে।

'যেতে দাও।'

হোমেরো প্রশ্ন করে,—'কী?'

'বেচারা বুড়ো মানুষ',—লাজারা উত্তর দেয়। 'কী জঘন্য জীবন বেচারির।'

পরের শুক্রবার সাতই অক্টোবর একটানা সাত ঘণ্টা ধরে রাষ্ট্রপতির অপারেশন হল। তখনকার মতো মনে হল আগেকার মতোই ব্যাপারটা অন্ধকারে থেকে গেল। সত্যি কথা বলতে, তাঁর বেঁচে থাকাব খববটা জানতে পারাই একমাত্র সান্ত্বনা। অন্য রোগীদের যেখানে রাখা হয়, দশ দিন বাদে সেখানে আনা হল তাঁকে। তাঁর সঙ্গে দেখা করাব অনুমতি পেল হোমেরো আব লাজাবা। তিনি আর আগের মানুষটি নেই। সাজসজ্জাবিহীন শীর্ণ দেহ। এলোমেলো কযেকটা পাতলা চুল বালিশের ছোঁয়াতেই খসে পড়ছে। আগেকার অস্তিত্বের মধ্যে বযেছে শুধু তাঁর হাতদুটির কোমল মাধুর্য। অস্থি বিশেষজ্ঞর পবামর্শ অনুসারে দুটো লাঠিতে ভর দিযে তিনি যখন হাঁটার চেষ্টা করছিলেন তখন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতাবণা হল। হাসপাতালেই থেকে গেল লাজারা। আয়ার খরচ বাঁচানোব জন্যে তাঁর বিছানাব পাশেই বাত কাটায় লাজারা। সেই ঘরের অন্য রোগীদের মধ্যে একজন মৃত্যুভয়ে সারা রাত ধরে কাঁদে। সেই শেষ না হওয়া বাত্রিগুলো রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে লাজাবাব বাদবাকি আপত্তিও কাটিযে দিল।

জেনেভায় আসার পর চার মাস পূর্ণ হওয়াব পরে তিনি মুক্তি পেলেন হাসপাতাল থেকে। বাষ্ট্রপতির যেটুকু সঙ্গতি ছিল তাই দিয়ে যত্নশীল তত্ত্বাবধায়কের মতো হোমেরো শোধ কবল হাসপাতালের বিল। নিজের অ্যাম্বুলেন্সে চড়িযে তাঁকে নিযে এল নিজেদের বাড়িতে। হোমেবোব সহকর্মীবা রাষ্ট্রপতিকে ন'তলায় তুলে দিতে সাহায্য কবল। ছেলেমেয়েদের ঘবে তাঁব থাকার বন্দোবস্ত হল। অথচ এদের দিকে আগে কখনও তাকিয়েও দেখেননি তিনি। ধীরে ধীরে তিনি বাস্তবে ফিরে এলেন। আগের মতো সুস্থ হযে উঠতে নিয়মিত যে সমস্ত ব্যায়াম কবা দরকার বলে তিনি শুনেছিলেন, রীতিমতো সামবিক নিয়মনিষ্ঠা মেনে সেগুলোর অনুশীলন কবে যেতে লাগলেন। তারপব, শুধু ছড়ির সাহায্য নিযেই হাঁটতে শুরু কবলেন। কিন্তু আগেকার সবচেয়ে ভালো পোশাকটি পরাব পরেও কী চেহারায, কী আদবকাযদায় তাঁকে আগেব মতো দেখাচ্ছে না। শীত আসছে এই ভয়ে তিনি ঠিক করলেন দশই ডিসেম্বব মার্সেলেস থেকে যে জাহাজটি ছাড়বে তাতে চড়েই বাড়ি ফিরে যাবেন। পূর্বাভাস এবারের শীত ভয়ংকর তীব্র হবে এবং সত্যি সত্যিই শতাব্দীর সবচেযে দুঃসহ শীত পড়েছিল। চিকিৎসকেরা কিন্তু তাঁদের তত্ত্বাবধানে তাঁকে আরও কিছুদিন থাকার পবামর্শ দিয়েছিলেন।

শেষ মুহূর্তে দেখা গেল টিকিটের দাম মেটানো যাচ্ছে না। স্বামীকে না জানিয়ে লাজারা বাচ্চাদের সঞ্চয় থেকে আবও একবার কিছু তুলে নেওয়াব চেষ্টা করল। দেখা গেল সেখানেও যা থাকার কথা তাব থেকে কম বয়েছে। তখন সত্যটা প্রকাশ কবল হোমেবো। লাজারাকে না জানিয়ে সেখান থেকেই হোমেবো হাসপাতালের বিল শোধ করেছিল।

হাল ছেড়ে দিয়ে লাজাবা বলল,—'ঠিক আছে, ওঁকে না হয় আমাদেব বড় ছেলে বলে মেনে নিচ্ছি।'

এগারোই ডিসেম্বর শুরু হল প্রচণ্ড তুষার-ঝড়। তাবই মধ্যে লাজারা আর হোমেরো মার্সেলেসেব ট্রেনে রাষ্ট্রপতিকে তুলে দিল। বাড়ি ফেরার আগে পর্যন্ত তারা জানতে পাবেনি ছেলেমেয়েদেব ঘরেব

টেবিলে একটি চিঠি লিখে রেখে বিদায় জানিয়েছেন তিনি। বারবারাব জন্যে রেখে গেছেন তাঁর বিয়ের আংটিটি। লাজারার জন্যে তাঁর প্রয়াত স্ত্রীর বিয়ের ব্যান্ড, যেটা বিক্রি করার কথা কখনও ভাবেননি, আর চেন লাগানো পকেটঘড়িটা রেখে গেছেন।

দিনটা রবিবার। ভেরাক্রুজ থেকে গোপন সংবাদ পেয়ে কয়েকজন ক্যারিবিয়ান প্রবাসী ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে পৌঁছে গেছে কর্নাভিন স্টেশনে। দাগি দুর্বৃত্তদের গায়ে মানায় এমন একটা ওভারকোট পরে তিনি হাঁপাচ্ছেন। গলায় জড়ানো রয়েছে একটা রং-বেরঙের স্কার্ফ। ওটা লাজারার। কশাঘাতের মতো তীক্ষ্ণ ও তীব্র হাওয়া গায়ে বিঁধছে। ট্রেনের অন্তিম কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে সেই প্রবল বাতাসে তিনি টুপি নাড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছেন। ট্রেন চলতে শুরু করার পর হোমেরোর খেয়াল হল রাষ্ট্রপতির ছড়িটা রয়েছে তার হাতে। দৌড়োতে দৌড়োতে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে এসে ছড়িটা সজোরে ট্রেনের দিকে ছুঁড়ে দিল যাতে রাষ্ট্রপতি ওটা ধরে নিতে পারেন। ছড়িটা অবিশ্যি তলিয়ে গেল ট্রেনের চাকার নিচে। সে এক ভয়ংকর মুহূর্ত। কাঁপা কাঁপা হাতটা এগিয়ে দিয়ে তিনি ছড়িটা ধরার চেষ্টা করছেন কিন্তু তাঁর হাত পৌঁছোচ্ছে না। বাতাসের টানে তিনি প্রায় দরজার বাইরে বেরিয়ে পড়েছেন। ট্রেনের কন্ডাকটর সেই বরফ আচ্ছাদিত বৃদ্ধের স্কার্ফ ধরে ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রপতিকে বাঁচিয়ে দিল। লাজারার দেখা এটাই শেষ দৃশ্য। তারপরই মারাত্মক রকমের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে লাজারা ছুটতে লাগল স্বামীর দিকে। সে হাসতে চেষ্টা করছে। আসলে কাঁদছে। 'হে ভগবান',—লাজারা চিৎকার করে ওঠে। 'কে মারবে এমন মানুষকে।'

নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে রাষ্ট্রপতি ফিরে এসেছেন নিজের বাড়িতে। ধন্যবাদ জ্ঞাপনকারী দীর্ঘ টেলিগ্রামটার বয়ান সেই রকমই ছিল। তারপর এক বছর তাঁর আর কোনও খোঁজখবর নেই। অবশেষে লাজারা আর হোমেরোর কাছে পৌঁছোল ছ'পৃষ্ঠার একটা হাতে লেখা চিঠি। চিঠিতে তাঁকে একেবারে অপরিচিত মনে হচ্ছে। চিঠিতে তিনি লিখেছেন ব্যথাটা আবার ফিরে এসেছে। আগের মতোই তীব্র এবং নিয়মিত। তবে ওটাকে আর গ্রাহ্য করবেন না বলে স্থির করেছেন। জীবন তাঁকে যেমন অবস্থায় রেখেছে, তা-ই মেনে নেবেন। এভাবেই তিনি বেঁচে থাকবেন বলে মনস্থ করেছেন। কবি আইমে সেজাইরে তাঁকে মাদার অফ্ পার্ল খচিত একটি ছড়ি দিয়েছেন। তবে তিনি ঠিক করেছেন যে ছড়িটা তুলে রাখবেন। মাস দুয়েক হল তিনি মাংস খাওয়া শুরু করেছেন। এবং সবরকমের চিংড়িমাছ। দিনে উনিশ-কুড়ি কাপ কড়া কফি খাচ্ছেন। তবে কাপের তলানিতে ভাগ্যলিপি পড়ার চেষ্টা করেন না। কারণ, কোনও ভবিষ্যদ্বাণীই মেলেনি। নিজের পঁচাত্তর বছর পূর্তির দিনে কয়েক গেলাস 'মার্তিনিক রাম'ও খেলেন রাষ্ট্রপতি। তাঁর সহ্য হয়েছে। তিনি আবার ধূমপানও শুরু কবেছেন। খুব একটা যে সুস্থ আছেন তা নয়, তবে অসুস্থও নন।

যাই হোক, হোমেরো ও লাজারাকে চিঠি লেখার আসল উদ্দেশ্য হল,—তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা তাদের জানাতে চাইছেন। জাতির পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধারে এক নতুন আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিতে চান। সেই কারণেই তাঁর দেশে প্রত্যাগমন। এর ফলে আর দশ জনের মতো বার্ধক্যের শেষ শয্যায় শুয়ে তাঁর মৃত্যু না হলেও ক্ষতি নেই। শেষ বয়সে দেশকে নেতৃত্ব দেবার সুযোগ পেয়েছেন,—শুধু এইটুকু গৌরব জুটেছে,—সে কথা মনে করেই তিনি খুশি। চিঠির শেষে জানিয়েছেন যে জেনেভায় যাওয়ায় তাঁর ভালোই হয়েছিল।

মূল শিরোনাম Buen viaje senór presidente

মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত পেশাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিটি একেবারে ঘড়ি ধরে পূর্বনির্ধারিত সময়ে উপস্থিত। অথচ মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ তখনও স্নানের পোশাক পালটিয়ে উঠতে পারেননি এবং কোঁচকাবার জন্যে মাথার চুল ক্লিপ দিয়ে আঁটা। তাড়াহুড়োয় যেটুকু সময় পেয়েছেন তাতে শুধু কানেব পাশে কোনওরকমে একটা গোলাপ গুঁজে নিতে পেরেছেন। নিজেকে বিশ্রী দেখাচ্ছে বলে মনে হওয়ায় তিনি এইটুকু করে নিলেন যাতে একটু আকর্ষণীয় দেখায় তাঁকে। দরজা খুলে দেখলেন লোকটাকে মোটেও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত পেশাদারি প্রতিষ্ঠানের ছাপমাবা কর্মচারীর মতো দেখতে নয়। তাব পরনে চেক কাটা জ্যাকেট আর গলায় নানান রঙের পাখির ছবি ছাপানো টাই। একেবারেই নিরীহ চেহারার একটি যুবক। নিজের চেহারার কথা মনে করে মারিয়া দোস্ প্রাজেরেসের আরও আফশোস হল।

যুবকটির গায়ে ওভারকোট নেই ; বার্সেলোনার বসন্তকে কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না। এলোমেলো হাওয়ার তীব্র ঝাপটায় এখানকার এলোপাথারি বৃষ্টি সম্পর্কেও আগে থেকে কিছু বলা অসম্ভব। এবং সেই কারণেই শীতের থেকে অনেক বেশি অস্বস্তিকর এই আবহাওয়া। একসময়ে মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ কতজনকেই সময়-অসময় বিবেচনা না করে আপ্যায়ন করলেও এখন কিন্তু তাঁর ভীষণ লজ্জা করতে লাগল। আগে কখনও তাঁর এমনটা হয়নি। এখন তাঁর বয়স ঠিক ছিয়াত্তর বছর এবং তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস যে আগামী বড়দিনের আগেই তিনি মারা যাবেন। তবুও তিনি দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলেন। ভেবেছিলেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দায়িত্ব নিতে আসা যুবকটিকে অপেক্ষা করতে বলবেন যাতে ঠিকঠাক পোশাক পরে তৈবি হযে নেওয়া যায়। কিন্তু তখনই তাঁর মনে হল দরজার বাইরেকার অন্ধকার জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থাকলে ছেলেটা শীতে জমে যাবে। তাকে ভিতরে ডেকে নিলেন।

'মাপ করবেন, আমি আসলে ঠিক তৈরি নেই',—মারিয়া বললেন। 'পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাতালোনিয়ায় রয়েছি, অথচ এর আগে কাউকে এমন সময় মেনে আসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।' সামান্য কৃত্রিম কিন্তু বিশুদ্ধ কাতালান ভাষায় কথাগুলো বললেন তিনি। তবে তাঁর কথায় জড়িয়ে রয়েছে ভুলে যাওয়া পর্তুগিজ ভাষার ছোঁয়া। বয়স হয়েছে, চুল কোঁকড়ানোর ধাতব ক্লিপ্‌গুলো মাথায় লাগিয়ে রাখা সত্ত্বেও তাঁকে কিন্তু তন্বী মুলাটা রমণীব মতো দেখাচ্ছে। মাথায় দড়ির মতো একরাশ রুক্ষ চুল আর চোখগুলো ঘোলাটে হলুদ। পুরুষের প্রতি যাবতীয় আকর্ষণ হারিয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। রাস্তার আলোয় যুবকটির চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় সে স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলে কিছুই বলল না। পাটের তৈরি পাপোশে জুতোর তলাটা ভালো করে ঘষে নিয়ে আনত ভঙ্গিতে সে মারিয়ার হাতে চুম্বন করল।

'আমাদের সময়কার পুরুষেরা এমনটি করতেন',—শিলা বৃষ্টির মতো তীব্র হাসি হেসে মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ তাকে বসতে বললেন।

এই কাজে যুবকটি নতুন হলেও সে জানে যে সকাল আটটায় এমন সানন্দ স্বাগত সম্ভাষণ একেবাবে আশাতীত ; বিশেষ করে এমন এক হৃদয়হীনা বৃদ্ধার কাছ থেকে, প্রথম দর্শনে যাকে মনে হয়েছিল আমেরিকা মহাদেশগুলি থেকে পালিয়ে আসা একজন পাগলি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সে প্রথমে দরজা থেকে এক পা দূরে দাঁড়িয়ে রইল। সে তো বুঝতেই পারছে না কী বলবে। জানালার ভারী ভেলভেটের পর্দাগুলো ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। এপ্রিলের ক্ষীণ আলো এবার নিখুঁতভাবে সাজানো ঘরের সমস্ত কোনায় পৌঁছে গেল। বসার ঘর নয়, মনে হচ্ছে এটা যেন প্রাচীন

আমলের মহার্ঘ জিনিসপত্রের প্রদর্শনী তথা বিক্রয়কেন্দ্র। অথচ ঘরের প্রতিটি জিনিসপত্রই নিত্যব্যবহার্য। প্রয়োজনের বেশি কোনও জিনিস নেই আবার কোনও অভাবও নেই। প্রতিটি জিনিসই একেবারে যোগ্য জায়গায় নিখুঁতভাবে সুরুচির সঙ্গে সাজানো। মনে হতেই পারে এর চেয়ে সুন্দর সাজসজ্জা আর হতে পাবে না। এমনকি বার্সেলোনার মতো প্রাচীন ও বিশিষ্ট শহরেও নয়।

'মাপ করবেন',—সে বলল। 'আমি বোধ হয় ভুল ঠিকানায় এসেছি।'

'হায় রে, যদি তাই হত',—তিনি বললেন। 'তবে মৃত্যু তো কখনও ভুল করে না।'

সমাধির জন্যে জায়গা বিক্রি করতে আসা যুবকটি তখন খাবার ঘরের টেবিলের উপর একটা বিশাল নকশা বিছিয়ে দিল। কাগজটায় এত বেশি ভাঁজ, মনে হচ্ছে ওটা কোনও জলপথের মানচিত্র। কাগজটায় নানা রঙের ছক কাটা। প্রত্যেকটি রঙিন ছকে রঙিন ক্রুশচিহ্ন ও সংখ্যা দাগানো রয়েছে। মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ দেখলেন 'মন্তহুইখ্'-এর বিশাল সমাধিক্ষেত্রের এটি এক পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র। বহুদিন আগেকার এক আতঙ্কের স্মৃতি তাঁর মনের পর্দায় ভেসে উঠল। অক্টোবরের বৃষ্টিস্নাত 'মানাউস কবরখানা'-র স্মৃতি। নামহীন কবরগুলির মধ্যে জলকাদা ছিটোচ্ছে টেপিরের দল। ফ্লোরেন্সের রঙিন ছবি আঁকা কাচ দিয়ে তৈরি অভিযাত্রীদের স্মারক-স্তম্ভেও টেপিরগুলোর অবাধ আনাগোনা। একদিন সকালে, তখন তিনি খুব ছোট্টটি, দেখেছিলেন আমাজনের বন্যায় চারদিক পরিণত হয়েছে বীভৎস জলায় আর বাড়ির উঠোনে ভাসছে অসংখ্য ভাঙাচোরা কফিন। কফিনের ফাটাফুটো দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ছেঁড়া কাপড়েব টুকরো, মৃতের মাথার চুল। সেই স্মৃতি মনের মধ্যে সদা জাগরুক বলেই মন্তহুইখ্ পাহাড়কে বেছে নিয়েছেন তাঁর শেষ বিশ্রামস্থল হিসেবে। 'সানগারভাসিও'-র ছোট সমাধিস্থানটি অনেক বেশি পরিচিত এবং বাড়ির খুব কাছে হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পছন্দ নয়। 'আমি এমন একটা জায়গা চাই যেখানে কখনও বন্যা হবে না',—তিনি বললেন।

মানচিত্রের মধ্যে একটা জায়গাকে দেখিয়ে যুবকটি বলল,—'তাহলে এইখানে।' মানচিত্রে স্থান নির্দেশ করার জন্যে যে কাঠিটি সে ব্যবহার করল, সেটা ভাঁজ করে কলমের মতো পকেটে রাখা যায়। সে আবার বলল,—'পৃথিবীর কোনও মহাসাগরই এত উঁচুতে উঠতে পারবে না।'

মানচিত্রে রং দিয়ে ছকে রাখা সমাধির জন্যে নির্দিষ্ট টুকরো টুকরো জায়গাগুলিকে মন দিয়ে দেখতে লাগলেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। অবশেষে প্রধান প্রবেশদ্বারটি নজরে এল। দেখতে পেলেন একই বকমের তিনটে সমাধি যেগুলো নামবিহীন। এখানে গৃহযুদ্ধে নিহত বুয়েনা ভেন্তুরা দুর্‌রাতি এবং অন্য দু'জন সন্ত্রাসবাদী নেতাকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলায় কে বা কারা এসে কখনও পেনসিল বা রং কিংবা কাঠকয়লা অথবা নেল পালিশ দিয়ে সাদা পাথরের উপরে তাদের নাম লিখে দেয়। আর পরের দিন সকালে পাহারাদার তা মুছে দেয় যাতে কেউ জানতে না পারে কোন পাথরের তলায় শায়িত বয়েছে কার মরদেহ। বুয়েনা ভেন্তুরা দুর্‌রাতির শবযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন মারিযা দোস্ প্রাজেরেস্। সম্ভবত সেটিই ছিল বার্সেলোনার সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও বিক্ষুব্ধ শোকমিছিল। মারিয়া দোস্ প্রাজেরেসের ইচ্ছে হল এই সমাধিটির কাছেই কোথাও হবে তাঁর শেষ বিশ্রামস্থল।

কিন্তু তেমন কোনও জায়গা পাওয়া গেল না। তখন সবচেয়ে সেরা বিকল্পটিকেই তিনি মেনে নিলেন।

'তবে একটা শর্ত',—তিনি বললেন। 'আমায় কিন্তু ডাকবাক্সের মতো দেখতে পাঁচ বছর মেয়াদের কোনও কফিনে করে কবর দেওয়া চলবে না।' এবার তাঁর মনে হল ঠিক কী বলা উচিত। সেটা বলেই তাঁর কথা শেষ হল,—'আমাকে কিন্তু শুইয়ে কবর দিতে হবে।'

ব্যাপারটা হল,—মৃত্যুর আগেই কিনে রাখা যায় এমন সমাধিব্যবস্থার প্রচুর বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে এবং তাতে ভালোই সাড়া মিলছে। ফলে নানান গুজব ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। রটানো হচ্ছে জায়গা বাঁচানোর জন্যে এরা নাকি মৃতদেহকে দাঁড় করিয়ে কবর দেয়। এই জন্যেই ভয় পেয়েছিলেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ এবং সেই জন্যেই তাঁর এত সতর্কতা। সব শুনে যুবকটি বলতে শুরু কবল। সে এমনভাবে বলছে যেন মুখস্থ বলছে বা আবৃত্তি করছে। তবে বাহুল্য বর্জন করে সংক্ষেপেই সে বুঝিয়ে দিল ওইসব কথা আসলে গুজব ছাড়া অন্য কিছু নয়। মৃত্যুর আগেই কিস্তিতে কিনে রাখবার এই নতুন ধরনের সমাধিব্যবস্থাকে হেয় প্রতিপন্ন

করার জন্যে এসব আসলে প্রচলিত প্রথার অন্ত্যেষ্টি ব্যবস্থাপকদের মিথ্যে প্রচার।

যুবকটির কথা বলার সময় কে যেন দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিল।

তিনবার এবং স্পষ্ট। ঘাবড়িয়ে গিয়ে সে থেমে গেল। মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ কিন্তু তাকে চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। বললেন,—'কেউ না, নোই এসেছে।'

থেমে যাওয়া জায়গা থেকেই যুবকটি আবার শুরু করল।

তার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। মানাউসের সেই কিংবদন্তিতে পরিণত হওয়া বন্যার পর থেকে বহু বছর ধরে যে চিন্তাটা তাঁর মনের মধ্যে, হৃদয়ের সবচেয়ে গভীরে ও অন্তরঙ্গ অনুপুঙ্খে দানা বেঁধে আছে,--তিনি ভাবলেন দরজা খুলবার আগে সেই বিষয়টার মীমাংসা করে নেবেন।

'আমি বলতে চাইছিলাম',—বলে তিনি শুরু করলেন,—'আসলে আমি এমন একটা জায়গা খুঁজছি, যেখানে মাটির তলায় শুয়ে থাকতে পারব। বন্যার ভয় থাকবে না। সম্ভব হলে গ্রীষ্মে ছায়া পড়বে। আর যেখান থেকে কিছুদিন বাদেই আমাকে তুলে জঞ্জালের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে না।' কথা শেষ করে তিনি সামনের দরজাটা খুলে দিলেন।

একটা ছোট কুকুর, ভিজে সপসপে হয়ে ঘরের ভিতর ঢুকল। নেড়ি কুকুরের মতো চেহারা যা বাড়ির কোনও কিছুর সঙ্গেই মেলে না। আশপাশেই কোথাও প্রাতঃভ্রমণ করে সে ফিরল। ঘরে ঢুকেই হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিল। টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে খ্যাপার মতো ঘেউ ঘেউ শুরু করল। আর একটু হলেই কাদা মাখা থাবার দাপটে সমাধিক্ষেত্রের মানচিত্রটার দফা রফা হয়েছিল আর কি! কিন্তু গৃহকর্ত্রীর চোখের ভাষায় বন্ধ হয়ে গেল সব হুটোপাটি। 'নোই',—তিনি ডাকলেন। 'টেবিল থেকে নামো।' তাঁর কণ্ঠস্বরের কোনও পর্দা ওঠেনি, প্রাণীটি কেমন যেন কুঁকড়ে গিয়ে পিছনে সরে গেল। সভয়ে তাকাল তাঁর দিকে। তার চোয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা চকচকে চোখের জল। যুবকটির দিকে আবার চোখ ফেরালেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। কেমন যেন অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে যুবকটিকে। 'এ কী!' সে চেঁচিয়ে ওঠে,—'ও কাঁদছিল।'

'আসলে এই সময়ে এখানে কাউকে আসতে দেখে ও ঘাবড়িয়ে গেছে',—কোমল কণ্ঠে ক্ষমা চেয়ে নিলেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। 'বাড়িতে ফেরার পর ও মানুষের থেকে ভদ্র থাকে। শুধু আপনাকে দেখেই কেন জানি না, অন্যরকম করছে।'

'কিন্তু কেঁদে ফেলার ব্যাপারটা',—এই পর্যন্ত বলেই যুবকটি বুঝতে পারল এবার ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মুখ লাল করে সে ক্ষমা চাইল,—'মাপ করবেন। এমনটা আমি কখনও দেখিনি, এমনকি সিনেমাতেও নয়।'

'ঠিক মতো শেখালে সব কুকুরই পারে',—বললেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। 'কিন্তু ওদের প্রভুরা তা শেখাবেন না। সারা জীবন ধরে ওদের এমন সব জিনিস শেখাবেন যা ওদের ক্ষতি করে। নির্দিষ্ট জায়গায় নিজস্ব কাজকর্ম করতে শেখানো হয়। শেখানো হয় ঘড়ি ধরে নির্দিষ্ট সময়ে নিজস্ব থালা থেকে খেতে। যে সব কাজে ওরা আনন্দ পায়, যা কিছু ওদের পক্ষে স্বাভাবিক, তা কিন্তু কখনও শেখানো হবে না। হ্যাঁ, আমরা যেন কী কথা বলছিলাম?'

কথা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। গ্রীষ্মকালে গাছের ছায়া পাওয়া যাবে এমন কোনও জায়গা পাওয়া গেল না। তবুও মেনে নিতে হল। কারণ, সমাধিস্থানের যে সব জায়গা ছায়া ঢাকা সেগুলো সেনাবাহিনীর বড় কর্তাদের জন্যে আগে থেকেই সংরক্ষিত। তা ছাড়া অনেক আগে জমা দেওয়ার জন্যে কম দামেই নিজের সমাধির জন্যে জমি পেয়েছেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। অতএব, এখন আর নতুন কোনও শর্ত বা বাড়তি সুবিধার প্রশ্ন তোলা সম্ভব নয়।

কথাবার্তা শেষ হলে কাগজপত্র নিজের ব্রিফকেসে গুছিয়ে রাখার পর যুবকটি একনিবিষ্টভাবে ঘরটাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। গৃহসজ্জার সৌন্দর্যে বেচারি একেবারে মুগ্ধ। যেন এই প্রথমবার দেখছে এমনভাবে সে তাকাল মারিয়া দোস্ প্রাজেরেসের দিকে। হঠাৎ সে বলে বসে,—'আপনাকে একটা অশোভন প্রশ্ন করতে পারি?' যুবকটিকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যাবার সময় এমন প্রশ্ন শুনে মারিয়া

দোস্ প্রাজেরেস্ বললেন,—'নিশ্চয়ই, তবে আমার বয়স ছাড়া অন্য যে কোনও প্রশ্ন।'

'আসলে যে কোনও বাড়িতে গেলে সেখানকার গৃহসজ্জা দেখে ধরে নিতে পারি পরিবারের সদস্যদের জীবিকা কী। সত্যি বলতে কী, আপনার এখানে পারলাম না। যদি একবার বলেন, আপনার জীবিকা কী?'

হাসিতে ফেটে পড়ে মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ বললেন,—'আমার জীবিকা! দেহ ব্যবসা। কেন আমাকে আর সেরকম দেখাচ্ছে না বুঝি?'

যুবকটির মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। তবু সে কোনওরকমে বলল,—'আমি দুঃখিত।'

'না না, আমারই বেশি দুঃখ পাওয়ার কথা।'

দরজায় ছেলেটির মাথা প্রায় ঠেকে যায় আর কী! মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ কোনওরকমে তার হাতটা ধরে ফেলে বললেন,—'সাবধান! আমাকে ঠিক মতো কবর দেওয়ার আগে নিজের মাথাটা ভেঙে ফেলা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

দরজা বন্ধ করেই মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ নিজের ছোট্ট কুকুরটাকে কোলে তুলে নিলেন। সেটাকে আদর করতে করতে তাঁর সুন্দর সুরেলা আফ্রিকান গলা মিলিয়ে দিলেন পাশের বাড়ির নার্সারি স্কুল থেকে ভেসে আসা শিশুদের গানের সঙ্গে। মাস তিনেক আগে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি মারা যাচ্ছেন। আর তারপর থেকেই নিঃসঙ্গ জীবনের এই একমাত্র সঙ্গীটি আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে।

মৃত্যুর পর যাবতীয় বিষয়আশয় কাকে কাকে দেওয়া হবে বা কতটা দেওয়া হবে সব ঠিক করা হয়ে গেছে। নিজের মৃতদেহ সৎকারের সমস্ত ব্যবস্থা এমন নিখুঁতভাবে করা হয়েছে যে এক্ষুনি মারা গেলেও কোনও অসুবিধা হবে না। জীবিকা থেকে অনেককাল আগেই অবসর নিয়েছেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। নিজেকে বঞ্চিত না করেই অবসর নেওয়ার আগে অল্প অল্প করে তিনি সঞ্চয় করেছেন। এবং তাঁর শেষ জীবনের নিবাস নির্বাচন করেছেন বহু পুরোনো ও অভিজাত গ্রাসিয়া টাউন এলাকায়, সম্প্রসারিত হতে হতে যা এখন রীতিমতো বড় শহর। তিনতলার উপরে এই ভগ্নপ্রায় অ্যাপার্টমেন্টটা কিনে নিয়েছেন ; এর দেওয়ালগুলো নোনাধরা আর হেরিং মাছ সেঁকাব আঁশটে গন্ধ পুরো বাড়িটায় সারাক্ষণই ম' ম' করে। তা ছাড়া, ঘরের দেওয়াল জুড়ে রয়েছে সেই সব বুলেটের গর্ত যা আদতে যুদ্ধের স্মৃতি, আর সেই যুদ্ধেব পরিণাম মোটেও গৌরবের নয়।

এ বাড়িতে কোনও দারোয়ান নেই। অবশ্য সবকটা অ্যাপার্টমেন্টেই বাসিন্দা রয়েছে। অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে সিঁড়ির কোনও কোনও ধাপ খসে গেছে। নিজের খরচে রান্নাঘর আর স্নানের ঘরটা মনের মতো করে সারিয়ে নিয়েছেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। গাঢ় রঙের কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন সবকটা দেওয়াল। জানালায় খাঁজকাটা কাচ লাগিয়ে টাঙানো হয়েছে ভেলভেটের পর্দা। তারপর নিয়ে আসা হয়েছে ঘর সাজাবার এবং অবশ্যই কাজে লাগে এমন সব অপূর্ব সুন্দর আসবাবপত্র। এনেছেন সিল্ক ও ব্রোকেডের জিনিস রাখার বিশেষ ধরনের সিন্দুক। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারা পরাস্ত হওয়ার পর আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হয়ে যখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন তাদের বাড়ি থেকে ফ্যাসিস্তরা এইসব জিনিসপত্র চুরি করে। গোপন নিলামের বাজার থেকে অনেক দরদাম করে বহু বছর ধরে একে একে এগুলো কিনেছেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। অতীতের সঙ্গে তাঁর একমাত্র যোগসূত্র কার্দোনার কাউন্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রতি মাসের শেষ শনিবারে আসেন কার্দোনার কাউন্ট। তাঁর সঙ্গে নৈশভোজ সারেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। খাবার পরে সাঙ্গ হয় নিরুত্তাপ প্রেম। যৌবনে গড়ে ওঠা এই বন্ধুত্বটা কিন্তু একেবারেই গোপনীয় ব্যাপার। নিজের পদক আঁটা কোট গাড়িতেই রেখে আসেন কাউন্ট। আর গাড়িটি রাখা থাকে প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশি দূরে। তারপর ছায়ান্ধকারে নিজেকে আড়াল করে মারিয়া দোস্ প্রাজেরেসের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে আস্তে আস্তে উঠে আসেন কাউন্ট। নিজের সম্মানের কথা মনে করে তো বটেই, এমনকি মারিয়া দোস্ প্রাজেরেসেব জন্যেও এত সাবধানতা। এ বাড়ির কাউকেই চেনেন না মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। শুধ তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের উলটো দিকের বাসিন্দা দম্পতিটি যাদের একটা বছর নয়েকের মেয়ে আছে তাদের কথা আলাদা। বিষয়টা তাঁর কাছেও অবিশ্বাস্য

মনে হয়। অথচ বাস্তবে সত্যি সত্যি কোনওদিনই কাউকে তিনি সিঁড়িতে দেখেননি।

সম্পত্তির বিলি-বণ্টন করার সময় দেখা গেল পুনর্বাসনে অক্ষম কাতালোনিয়ানদের সঙ্গে তাঁর মানসিক সামঞ্জস্য তিনি যতটা ভেবেছিলেন তার থেকে অনেক বেশি গাঢ় ; কারণ জাতি হিসেবে তারা অনেক শোভন এবং তাদের নম্রতা রীতিমতো সম্মান জানানোর মতো। কাছের মানুষদের জন্যে মারিয়া দোস্‌ প্রাজেরেস্‌ রেখে গেলেন শুধু নিজের নামমাত্র গয়নাগাটি। আর নিকট প্রতিবেশীদের জন্যেও টুকিটাকি সামান্য কিছু।

বিলি-বণ্টন শেষ করার পর তাঁর মনে হল সবার জন্যে বোধ হয় সুবিচার করা হল না। তবে তিনি নিশ্চিন্ত যে যাদের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় তাদের সকলকেই খেয়াল করা হয়েছে। অন্ত্যেষ্টি সম্পাদনের দায়িত্বে থাকা 'কল দি আরবোল'-এর আধিকারিক ভদ্রলোক পর্যন্ত মারিয়া দোস্‌ প্রাজেরেসের নিখুঁত ও নির্দিষ্ট সম্পত্তি বিলি-বণ্টন ব্যবস্থা দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সবকিছু নিয়মনিষ্ঠভাবে গুছিয়ে রাখেন বলে ভদ্রলোকের এতদিনকার অহংকাব এক ধাক্কায় যেন গুঁড়িয়ে গেল। বিস্ময়মিশ্রিত দৃষ্টিতে তিনি দেখছিলেন কেমন নির্ভুলভাবে কেবলমাত্র স্মৃতি থেকে মারিয়া দোস্‌ প্রাজেরেস্‌ একে একে প্রত্যেকটি সম্পত্তির নাম এবং সেটির উত্তরাধিকার যার উপর বর্তাবে তার নাম-ঠিকানা-পেশা সংক্রান্ত বিস্তারিত তালিকাটি মধ্যযুগীয় কাতালান ভাষায় গড়গড় করে বলে গেলেন 'কল দি আরবোল'-এর কেরানিদের কাছে। এমনকি সেইসব উত্তরাধিকারীরা তাঁর হৃদয়ের কতটুকু জুড়ে আছে সে বিষয়েও লিখিয়ে দেওয়ার কথা ভুললেন না মারিয়া দোস্‌ প্রাজেরেস্‌।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত সম্পন্ন কবার পর থেকে প্রতি রবিবার সমাধিক্ষেত্রে অসংখ্য দর্শকদেব মধ্যে একজন হিসেবে উপস্থিত হন মারিয়া দোস্‌ প্রাজেরেস্‌। আশপাশের সমাধিগুলো দেখে সাবা বছর ফুল ফোটে এমন কিছু গাছের চারা লাগিয়ে দিলেন নিজের জন্যে নির্দিষ্ট কবা সমাধির চারপাশে। সদ্য গজিয়ে ওঠা ঘাসে জল দিতে তাঁব ভুল হয় না। বেড়ে ওঠা ঘাস কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেওয়ায় জায়গাটিকে মেয়রের দপ্তরেব কার্পেটের মতো দেখতে লাগছে। এইভাবে নিজের সমাধির জায়গাটির সঙ্গে তিনি এমনভাবে মিশে গেলেন যে তাঁব আর মনেই হয় না একদিন এই জায়গাটাকে পরিত্যক্ত বলে মনে হত।

নিজের সমাধির জায়গাটা প্রথমবার দেখতে আসার সময় সমাধিক্ষেত্রের সদরের সামনে নাম-ফলকহীন তিনটি সমাধি দেখে উত্তেজনায় তাঁর হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠেছিল। ওদিকে দু' দণ্ড তাকিয়ে থাকার অবকাশও তিনি পাননি। পাশেই উপস্থিত পাহারাদার। সুযোগ মেলে তৃতীয় রবিবারে। পাহারাদারের ক্ষণেকের অসাবধানতার সুযোগে প্রথম সমাধিটির বৃষ্টিতে ধোয়া পাথরের উপর লিপস্টিক দিয়ে লিখলেন,—দুর্‌রাতি। সেই শুরু। তারপব থেকে সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি লেখেন। কখনও প্রথম, কখনও দ্বিতীয় আবার কখনও বা তৃতীয়টিতে। তাঁর নাড়িব স্পন্দনে আর কোনওরকম তারতম্য ঘটে না তবে প্রত্যেকবার লেখার সময় তাঁর মনে ভিড় করে পুরোনো দিনের স্মৃতি।

পাহাড়েব ওপর অবস্থিত নিজের সমাধিটি প্রথমবার তিনি দেখেন সেপ্টেম্বরের শেষ রবিবারে। সপ্তাহ তিনেক বাদে, শীতের এক ঝোড়ো বিকেলবেলায় তাঁর নজরে এল কারা যেন পাশের সমাধিটিতে একট সদ্য বিবাহিতা অল্প বয়সী বধূর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করছে। স্বল্পায়ু শীত শেষ হল। মারিয়া দোস্‌ প্রাজেরেস্‌ কোনও অশুভ লক্ষণ দেখতে পাননি। কোনওরকম অসুস্থতাও বোধ করেননি। গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উন্মুক্ত বাতায়নে শোনা যেতে লাগল জীবনেব কলরব। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় স্বপ্নের হেঁয়ালিকে মিথ্যে প্রমাণিত করে তিনি বেঁচে থাকবেন। গ্রীষ্মের তীব্র দহনের দিনগুলোতে কার্দোনার কাউন্টের বসবাস পাহাড়ে। এবার পাহাড় থেকে ফিরে আসার পর কাউন্টের মারিয়াকে আরও আকর্ষণীয় মনে হল। পঞ্চাশ বছর বয়সে যখন যৌবনের হদিশ পাওয়া মুশকিল, সেই বয়সেও মারিয়ার সৌন্দর্য অটুট ছিল। আর এখন যেন তাঁকে আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।

অনেকবাব ব্যর্থ প্রচেষ্টার পব শেষ পর্যন্ত মারিয়া দোস্‌ প্রাজেরেস্‌ সেই বিশাল পাহাড়ের ওপরকার

অজস্র সমাধির মধ্যে থেকে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট সমাধিস্থানটি নোইকে চিনিয়ে দিতে সফল হলেন। এবার শুরু হল নোইকে কান্না শেখানোর কাজ, যাতে তাঁর মৃত্যুর পর নোই সমাধির সামনে এসে নিয়মিত কাঁদতে পারে। রামব্লাস থেকে বাস যাওয়ার রাস্তাটি ধরে পাহাড়ের ওপরে ওঠার পথটা চেনানোর জন্যে অনেকবার তিনি নোইকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি থেকে সমাধিস্থলেব দিকে গিয়েছেন। অবশেষে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে নোই এবার একা একা সমাধিস্থলে যেতে সক্ষম।

রবিবার চূড়ান্ত পরীক্ষা। বিকেল তিনটে নাগাদ নোইর গা থেকে বসন্তকালের উপযোগী জ্যাকেটটা খুলে নিলেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। প্রথমত, বাতাসে গ্রীষ্মের ছোঁয়া লেগেছে। তা ছাড়া জ্যাকেট ছাড়া গেলে নোই কারও নজরে পড়বে না। নোইকে ছেড়ে দিলেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। তিনি খেয়াল করলেন যে রাস্তার যে ধারে ছায়া রয়েছে সেই ধার ধরেই লাফাতে লাফাতে নোই চলেছে। অস্থির লেজের তলায় নোইর ছোট্ট পশ্চাদভাগ টানটান। কোনওরকমে কান্না চেপে রাখলেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। নিজের জন্যে তো বটেই, নোইর কথা ভেবেও বুকের ভিতর থেকে কান্না ফুটে বেরোচ্ছে। যে সময়টা দুঃখ এবং মিথ্যে মোহের ঘোরে তাঁকে কাটাতে হয়েছিল সেই সময়েও নোই কীভাবে সাহচর্য দিয়েছে, সে সব কথা মনে পডে যাওয়ায় আরও বেশি করে কান্না পাচ্ছে। 'ক্যালে মেয়র'-এর মোড়ে পৌঁছে নোই সাগরের দিকে রওনা দিচ্ছে দেখেই তিনি বাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। পনেরো মিনিট বাদে 'প্লাজা দে লেসেপ্‌স' থেকে পাওয়া গেল রামব্লাস যাওয়ার বাস। বাসের মধ্যে নিজেকে আড়ালে বেখে জানালা দিয়ে নোইকে দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য। এবং নোইকে দেখা গেল। রবিবারের ছুটিতে রাস্তায় বেরিয়ে হই-হুল্লোড করতে থাকা একদল বাচ্চাকাচ্চার মধ্যে নোইকে কেমন যেন গম্ভীব দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে ও যেন কত দূরে চলে গেছে। 'পাস্কো দে গ্রাসিয়া'-য রাস্তা পেবোনোব জন্যে নোই ট্রাফিক সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। 'হে ভগবান',—তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। 'বেচারিকে কী নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে!'

মন্তজুইখের প্রচণ্ড বোদে দাঁড়িয়ে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক তাঁকে নোইর জন্যে অপেক্ষা করতে হল। প্রায় ভুলে যাওয়া কোনও কোনও ববিবারে যে সব শোকসন্তপ্ত মানুষদেব তিনি দেখেছিলেন বলে মনে হচ্ছে, তাদেব তিনি অভিবাদন জানালেন ; তিনি যে তাদের সবাইকেই চিনতে পেরেছেন এমন নয়। কেমন কবে চিনবেন? মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ তাদের প্রথমবার দেখার পব অনেকদিন কেটে গেছে। তারা এখন আব শোকের পোশাক পরে নেই। তাছাড়া তাবা এখন প্রিযজনেব সমাধিতে ফুল রাখছে না, ফেলছে না চোখের জল। কিছুক্ষণ পরে, যখন তাবা সকলে চলে গেছে, তিনি একটা শোকজ্ঞাপক শব্দ শুনতে পেলেন। গাঙচিলদের একটা দল উড়ে যাচ্ছে। আদিগন্ত সাগরের দিকে তাকাতে গিয়ে নজবে এল একটা সাদা রঙের সমুদ্রগামী জাহাজ, যাতে উড়ছে ব্রাজিলেব পতাকা। মনেব মধ্যে একটা সুপ্ত বাসনা হঠাৎ আলোড়ন তুলল। জাহাজটা যদি এমন কারও কাছ থেকে কোনও চিঠি নিয়ে আসে, যে কিনা পেরনামবুকো জেলে তাঁর জন্যে প্রাণ দিতে পারত। পাঁচটা বাজার একটু পরেই, প্রত্যাশিত সময়েব মিনিট বারো আগেই পাহাড়ের ওপর নোইকে দেখা গেল। ক্লান্তিতে আর গরমে বেচারির জিভ থেকে লালা ঝরছে। কিন্তু চোখে শিশুর মতো বিজয়ের গর্ব। 'মৃত্যুব পরে সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদার মতো কেউ থাকবে না' এমন আশঙ্কাটা ঠিক সেই মুহূর্তে মুছে গেল মারিয়া দোস্ প্রাজেরেসের মন থেকে।

পরের শরৎকালে বেশ কিছু অশুভ সংকেত তাঁর নজরে এল। সেইসব সংকেতের মর্মোদ্ধারে ব্যর্থ হওয়ায় বৃদ্ধি পেল তাঁর মানসিক চাপ। গায়ে চড়ালেন সেই কোটটা যার কলার খেঁকশিয়ালের লেজের চামড়া দিয়ে তৈরি। মাথায় চাপালেন নকল ফুলে সাজানো সেই পুরোনো ফ্যাশনের টুপিটা, যা কিনা এখন আবার হালফ্যাশনের টুপি হিসেবে বাজারে খুব চলছে। নিজেকে এমনভাবে সুসজ্জিত করে 'প্লাজা দেল্ বেলজ্'-এর সোনালি অ্যাকাশিয়া গাছের তলায় বসে তিনি নিশ্চিন্তে কফি খেতে শুরু করলেন। তাঁর বোধশক্তি এখন অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। মনে মনে তিনি বিশ্লেষণ করেন মানসিক অস্থিরতার কারণ আর কান খাড়া কবে খুঁটিয়ে শোনেন রামব্লাসের পাখি বিক্রেতা মেয়েদের বকবকানি। বহুদিন বাদে ফুটবল বাদ দিয়ে অন্য কোনও বিষয় নিয়ে যে সব ভদ্রলোকেরা বইয়েব দোকানে আড্ডা দেওয়া শুরু

করেছেন, তাঁদের কথাবার্তাও তিনি শোনেন। যুদ্ধ ফেরৎ পঙ্গু সৈন্যেরা পায়রাদের দিকে রুটি ছুঁড়ে দেওয়ার সময় তাদের চোখে-মুখে যে গভীর নীরবতা প্রকাশ পায় তাও তিনি লক্ষ্য করেন। এবং সর্বত্র তাঁর চোখে পড়ে মৃত্যুর নির্ভুল সংকেত। বড়দিনের সময় অ্যাকাশিয়া গাছেদের রঙিন আলোয সাজানো হল। চারপাশের বারান্দা-অলিন্দ থেকে ভেসে এল আনন্দ মুখর গানের কলতান। রাস্তার কফির দোকানগুলোয় ভিড় বেড়েছে। কিন্তু এত আনন্দ উৎসবের মধ্যেও একটা চাপা উদ্বেগ নজরে পড়ছে। সন্ত্রাসবাদীরা শহরের সমস্ত রাস্তার দখল নিয়ে নেওয়ার আগেও এমন চাপা উত্তেজনা চোখে পড়েছিল। মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ সেই দিনগুলোর সাক্ষী। তাঁর পক্ষে তাই অস্বস্তি দমন করা সম্ভব নয়। এবং এই প্রথম ভয়ের নখর তাঁকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে আর বিঘ্নিত হচ্ছে তাঁর রাতের ঘুম। একদিন রাতে 'কাতালোনিয়ার জয় হোক' শ্লোগান দেওয়ালে লেখার সময় তাঁর জানালার বাইরে দেশের নিরাপত্তা রক্ষীরা জনৈক ছাত্রকে গুলি করে মেরে ফেলল। 'হা ঈশ্বর'—উচ্চারণ করে তিনি আপন মনে বলে উঠলেন,—'সবকিছুই কি আমার সঙ্গে মরতে চলেছে?'

মানাউসেও তিনি দেখেছিলেন এমনতর অস্থিরতা। তখন তিনি খুবই ছোট। ভোর হওয়ার আগের মুহূর্তে রাত্রির সমস্ত শব্দ একসঙ্গে থেমে যেত। এমনকি জলের স্রোতও যেন রুদ্ধ। সময়ও যেন ইতস্তত করছে, ঠিক সেই সময়ে আমাজনের জঙ্গল মৃত্যুর অতল নীরবতায় ডুব দিত। এমন অপ্রতিবোধ্য উদ্বেগের দিনে, এপ্রিলের শেষ শুক্রবারে রীতিমতো নিয়ম মেনে মারিয়া দোস্ প্রাজেরেসের বাড়ি এলেন কার্দোনার কাউন্ট।

কার্দোনার কাউন্টের আগমন যেন ধর্মীয় নিয়মরক্ষা। রাত সাতটা থেকে নটার মধ্যে পৌঁছিয়ে যান সময়নিষ্ঠ কাউন্ট। হাতে থাকে বিকেলের খবরের কাগজে জড়ানো একটা শ্যাম্পেনের বোতল। অন্য কারও নজর এড়ানোর জন্যেই এমন বন্দোবস্ত। আর থাকে এক বাক্স আচার। সুখ-শান্তির দিনে সুরুচিসম্পন্ন ও বনেদি কাতালোনিয়ান পরিবারে যে সমস্ত খাদ্য জনপ্রিয় ছিল তাদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে 'কান্নেল্লোনি অ গ্রাতিন' এবং ছোট মুরগি দিয়ে বানানো 'অ জুস্' বানান মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। একটি পাত্রে রাখা থাকে সেই ঋতুর ফল। মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ যখন রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকেন সেই সময় কার্দোনার কাউন্ট মেতে ওঠেন ফোনোগ্রাম নিয়ে। মদের গেলাসে হালকা চুমুক দিতে দিতে তিনি শোনেন ইতালিয়ান অপেরার বাছাই করা ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। তারপর শুরু হয় পুরোনো অভ্যেসের প্রেম,—স্থবিরের প্রেম। শেষে দুজনেরই মনে হয়,—'এ কী দুর্বিপাক।' মাঝরাতের আগেই অস্থির হয়ে ওঠা কাউন্টের বরাবরের অভ্যেস। চলে যাওয়ার আগে শোবার ঘরের ছাইদানি চাপা দিয়ে রেখে যান পাঁচ পেসেতা। এটাই মারিয়া দোস্ প্রাজেরেসের পারিশ্রমিক। 'প্যারালেলো'-র এক অস্থায়ী হোটেলে প্রথমবার দেখা হওয়ার পর থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। অন্য সবকিছুতে সময় ঘুণ ধরিয়ে দিলেও এই সাবেকি হিসেবে হাত দিতে পারেনি।

তাঁদের বন্ধুত্বের ভিত্তি কোথায় নিহিত তা কিন্তু কেউই ভেবে দেখেননি। কাউন্টের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে কিছু কিছু আনুকূল্য পেয়েছেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। কাউন্ট তাঁকে সঞ্চয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন। কাউন্টের সহায়তায় তাঁর সংগৃহীত পুরোনো জিনিসগুলোর আসল মূল্য যে সময়, তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। কাউন্টের পরামর্শে এইসব পুরোনো জিনিসকে এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে বোঝা না যায় যে আদতে এগুলো সব চোরাই মাল। সবচেয়ে বড় কথা কাউন্টই তাঁকে বুঝিয়েছিলেন কীভাবে গার্সিয়া প্রদেশে ভদ্রভাবে বার্ধক্যের দিনগুলো কাটানো যেতে পারে। যে পতিতালয়ে তাঁর জীবন কেটেছে সেখানকার বাসিন্দারা তাঁকে বলেছিল যে আধুনিক মাপকাঠিতে তিনি বৃদ্ধ; অতএব তাঁকে অবসর নিতে হবে। তাঁকে যেতে হবে সেখানে, যেখানে অবসরপ্রাপ্ত বারবনিতাদের বসবাস আর পাঁচ পেসেতার বিনিময়ে নব্য যুবকদের শেখানো হয় রতিক্রিয়া। কাউন্টকে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর যখন চোদ্দো বছর বয়স তখন তাঁর মা তাকে মানাউস বন্দরে বিক্রি করে দেন। তুর্কি জাহাজে করে আটলান্তিক পার হওয়ার সময় তাঁর প্রথম সঙ্গী নির্দয় ব্যবহার করেছিল। অবশেষে প্যারালেলোর আলোয় ভর্তি জলায় তাঁকে কপর্দকশূন্য, পরিচয়হীন অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যাওয়া

হয়। স্থানীয় ভাষাও ছিল তাঁর আয়ত্তের বাইরে। তাঁদের মধ্যে কোনও মিলই নেই,—কাউন্ট এবং মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ এই ব্যাপারটায় পুরোপুরি সচেতন। সেই কারণেই দুজনে একসঙ্গে থাকার সময় সবচেয়ে বেশি একাকীত্ব বোধ করেন। তবুও, অভ্যেস তো এক রকমের সুখ। আর তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করার সাহস হয না তাঁদের। এতদিন ধরে একে অন্যের প্রতি কতটা ঘৃণা এবং দরদ মনে মনে পোষণ করে এসেছেন তা দুজনেই একসঙ্গে অনুধাবন করেন জাতীয় অভ্যুত্থানের সময়।

অগ্নিকাণ্ডটা সেদিন হঠাৎই ঘটে। রেডিওতে 'লা বোহেমে' অপেরা থেকে বেছে নেওয়া একটা প্রেম পর্যাযের দ্বৈতসংগীত সম্প্রচার করা হচ্ছিল। শিল্পী লিসিয়া আলবানিজ এবং বেনিয়ামিনো গিগ্‌লি। কার্দোনার কাউন্ট তন্ময় হয়ে গান শুনছেন। গান থামিয়ে হঠাৎ জরুরি ঘোষণা করা হল। রান্নাঘরের ব্যস্ততার মধ্যেও রেডিও শুনছেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। গান থেমে যেতেই পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দিকে রওনা দিলেন কার্দোনার কাউন্ট। ঠিক তখনই শুনতে পেলেন স্পেনের চিরন্তন স্বৈরাচারী শাসক জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো তিনজন বাস্ক বিচ্ছিন্নতাবাদীর ভাগ্য নির্ধারণ করে ফেলেছেন। তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কাউন্ট স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। 'যাক, তাহলে মৃত্যুদণ্ড হচ্ছেই।' কাউন্ট আরও বললেন,—'হবে না, জেনারেল একজন সাচ্চা লোক।'

রাজগোখরোর মতো জ্বলন্ত দুই চোখে কাউন্টের দিকে তাকালেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। সোনালি ফ্রেমের চশমার পেছনে চোখের মণির শীতল চাউনি, হিংস্র লোলুপ দাঁত আর ভ্যাপসা অন্ধকারে থাকতে অভ্যস্ত কোনও দোআঁশলা প্রাণীর মতো দুটি হাত মিলিয়ে কাউন্টের চেহারা সত্যিই বড় বীভৎস। ক্রোধ এবং বিরক্তি মেশানো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাউন্টের দিকে তাকিয়ে মারিয়া বললেন,—'প্রার্থনা করো, এমনটা যেন না হয। ওঁদের একজনকেও গুলি করা হলে তোমার স্যুপে আমি বিষ মিশিয়ে দেব।'

কাউন্ট তো হতবাক। বললেন,—'কেন? তুমি এমন করবে কেন?' মারিয়ার পরিষ্কার জবাব,—'কারণ, আমি একজন সাচ্চা বারবনিতা।'

কার্দোনার কাউন্ট আর আসেননি। মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ বুঝলেন যে তাঁর জীবন বৃত্তটা এবার সম্পূর্ণ হল। বাসে কেউ তাঁকে বসার জাযগা ছেড়ে দিলে আগে তাঁর রাগ হত। রাস্তা পার হওয়ার সময় কেউ তাঁকে সাহায্য করতে চাইলে বা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কেউ হাত বাড়িয়ে দিলে আগে তিনি রেগে যেতেন। কিন্তু এখন এসব ক্ষেত্রে তিনি শুধু সম্মতি দেওয়া নয ররং সহাযতা প্রত্যাশা করেন। এটা তাঁর প্রয়োজন, ঘৃণ্য হলেও দরকারি। এই সময়েই তিনি একজন সন্ত্রাসবাদীর সমাধিতে সমাধিস্তম্ভ গড়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। তাতে কোনও নাম বা তারিখ লেখা থাকবে না। ঘুমোবার সময এখন আর তিনি দরজায় তালা লাগান না যাতে ঘুমের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হলে নোই যেন বাইরে বেরিয়ে কাউকে না কাউকে খবরটা দিতে পারে।

এক রবিবার সকালে সমাধিক্ষেত্র থেকে ফেরার সময উল্টোদিকের অ্যাপার্টমেন্টের বাচ্চা মেয়েটির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সহজ-সরল একজন সাধারণ ঠাকুমার মতো এটা ওটা বলতে বলতে কিছুটা পথ মেয়েটির সঙ্গে হেঁটে রাস্তা পার হলেন তিনি। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল মেয়েটি আর নোই দুই পুরোনো বন্ধুর মতো খেলা করছে। 'প্লাজা দেল দিয়ামান্তে'-তে পৌঁছোনোর পর তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন সে আইসক্রিম খাবে কিনা। কথাটা তিনি অনেকক্ষণ আগেই মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন। তাঁর পরের প্রশ্ন,—'তুমি কি কুকুর ভালোবাসো?' উত্তরে মেয়েটি বলল,—'কুকুর আমার ভীষণ পছন্দ।'

এবার সবচেয়ে মোক্ষম প্রস্তাবটা পেশ করলেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্, যার জন্যে বহুদিন ধরে তিনি মনে মনে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। 'আমার যদি কিছু হয়ে যায, আমার ইচ্ছে নোইকে তোমার কাছেই রাখবে। তবে একটা শর্ত, প্রত্যেক রবিবারে ওকে ছেড়ে দেবে। এটা নিয়ে একেবারে ভাববে না তুমি। ও জানে রবিবারে ওকে কী করতে হবে।'

মেয়েটি তো ভীষণ খুশি। হৃদয় জুড়ে এবং বহু বছর ধরে যে স্বপ্নকে তিনি লালনপালন করেছেন তা এতদিনে বাস্তবায়িত হতে চলেছে বুঝতে পেরে মহা আনন্দে বাড়ি ফিরলেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্।

বাস্তবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেল এবং জরা-জনিত ক্লান্তি বা বিলম্বিত মৃত্যু কিংবা তাঁর নিজের কোনও সিদ্ধান্ত এর জন্যে দায়ী নয়।

নভেম্বর মাসের হাড়-কাঁপানো এক শীতের অপরাহ্নে জীবন তাঁর জন্যে ঘটনাটা ঘটাল। সমাধিক্ষেত্র থেকে ফেরার সময় হঠাৎ ঝড় উঠল। তার আগে সমাধি তিনটিতে তিনি নাম লিখেছেন। বাস স্টপের দিকে নেমে আসার সময় প্রবল বৃষ্টির ঝাপটা তাঁকে পুরোপুরি ভিজিয়ে দিল। কোনওরকমে একটা দরজার সামনে আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল। এলাকাটা একেবারে জনমানবহীন ; দেখে মনে হয় যেন অন্য কোনও শহরের অংশ। চারিদিকে ভাঙাচোরা গুদামঘর, ধূলায় ধূসরিত কলকারখানা। বিশাল বিশাল মালবাহী ট্রাকের ঘন ঘন চলাচলে ঝড়ের গর্জনকে আরও ভয়াবহ করে তুলল। তিনি তখন ভিজে চুপসে যাওয়া কুকুরটিকে শরীরের উত্তাপে গরম করতে ব্যস্ত। চোখের সামনে দিয়ে যাত্রী বোঝাই বাসগুলো দ্রুত বেগে চলে যাচ্ছে। ফাঁকা ট্যাক্সিগুলোও মিটার ডাউন করে বেরিয়ে গেল। তাঁর বিপন্ন আবেদনে কেউই সাড়া দিল না। ঠিক সেই সময়ে আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল। ইস্পাত-ধূসর রঙের একটা সুদৃশ্য গাড়ি প্রায় নিঃশব্দে জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়ার সময় হঠাৎ রাস্তার মোড়ে গিয়ে থেমে গেল। পরমুহূর্তেই গাড়িটা ঘুরে এসে দাঁড়িযে গেল একেবারে তাঁর সামনে। যাদুর ছোঁয়ায় যেন নেমে গেল গাড়িটার জানালার কাঁচ। এবং দামি গাড়িটার চালক মুখ বাড়িয়ে মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্‌কে গাড়িতে চড়ার আমন্ত্রণ জানাল।

'আমি অনেকটা দূরে যাব',—মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ সত্যি কথাটাই বললেন। 'তবে কিছুটা পথ এগিয়ে দিলে উপকার হয়।'

'কোথায় যাবেন',—চালকের প্রশ্ন।

তিনি বললেন,—'গ্রাসিয়ায়।'

চালক হাত না লাগানো সত্ত্বেও দরজা নিজের থেকেই খুলে গেল।

'আমিও ওই পথেই যাব, আপনি উঠুন',—চালকের শান্ত মন্তব্য।

গাড়ির ভেতর হিমায়িত ওষুধের গন্ধ। মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ গাড়িতে চড়া মাত্রই শুরু হল অস্বাভাবিক দুর্যোগের তুমুল বর্ষণ। বদলে গেল শহরের রং। তাঁর মনে হচ্ছে তিনি যেন এক অচেনা সুখের জগতে রয়েছেন যেখানে সবকিছুই পূর্বনির্দিষ্ট। বিশৃঙ্খল যানবাহনের মধ্যে দিয়ে চালক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অনায়াসে, যেন যাদুবলে পথ করে নিচ্ছে। শুধু নিজের জন্যে নয়, অসহায় ছোট কুকুরটির কথা ভেবেও মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ এবার কেমন যেন বিষণ্ণ বোধ করছেন। বেচারি তাঁর কোলে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

'গাড়িটা যেন একটা জাহাজ',—তিনি বললেন। আসলে তাঁর মনে হচ্ছে, এই সময়ে বলা যায় এমন কিছু একটা বলা দরকার। 'এমনটা আগে কখনও দেখিনি, এমনকি স্বপ্নেও নয়।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তবে সামান্য একটু ভুল হল। গাড়িটা আমার নয়।' অদ্ভুত কাতালান ভাষায় সে কথা বলছে। তারপর একটু থেমে কাস্তিলিয়ান ভাষায় সে যোগ করে,—'আমার সারা জীবনের রোজগার এক করলেও এমন একটা গাড়ির দাম উঠবে না।'

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,—'বুঝলাম।'

আড়চোখে ড্যাশবোর্ডের আবছা আলোয় চালককে খুঁটিয়ে দেখলেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। সদ্য কৈশোর পেরোনো চালকটির মাথায় একরাশ ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুল। পাশ থেকে দেখলে মনে হয় ব্রোঞ্জের তৈরি রোমান মূর্তি। তাঁর মনে হল ছেলেটি রূপবান নয়, তবে চেহারায় যথেষ্ট আকর্ষণী শক্তি রয়েছে। চামড়ার ছেঁড়া জ্যাকেটটা তাকে চমৎকার মানিয়েছে। বাড়ি ফেরার সময় ওর পায়ের আওয়াজ শুনে ছেলেটির মা নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়। শুধু ওর শ্রমিকের মতো হাত দুটি দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই গাড়ির মালিক ও নয়।

তারপর সারা পথে আর কোনও কথা হল না। তবে মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্ অনুভব করলেন যে ছেলেটিও কয়েকবার আড়চোখে তাঁকে দেখে নিয়েছে। এই বয়সেও বেঁচে থাকার জন্যে আবার তাঁর

অনুতাপ হল। নিজেকে ভীষণ কুৎসিত আর করুণাপ্রার্থী বলে মনে হচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হওয়ার পরই একটা শাল মাথায় জড়িয়ে নিয়েছেন তিনি। গায়ে চড়ানো হালকা কোটটার শোচনীয় অবস্থা। বেরোনোর আগে ওটা পালটানোর কথা একেবারেই খেয়াল ছিল না। আসলে তখন তো তিনি মৃত্যুচিন্তায় বিভোর।

গ্রাসিয়ায় ঢোকার পর চারদিক পরিষ্কার হয়ে এল। রাত্রি হয়ে যাওয়ায় রাস্তার বাতিগুলো জ্বলছে। বাড়ির কাছাকাছি একটা মোড়ে তাঁকে নামিয়ে দেওয়ার কথা বললেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। ছেলেটি রাজি নয়। বাড়ির সদরেই সে নামিয়ে দেবে মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্কে। শুধু তাই নয়, যাতে তিনি ভিজে না যান, গাড়িটাকে একেবারে ফুটপাথের ওপর সে তুলে দিল। গাড়ির দরজা খোলা মাত্র কুকুরটাকে ছেড়ে দিলেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। তারপর যথাসম্ভব মর্যাদা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে গাড়ি থেকে নামলেন। ছেলেটিকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যে পেছন ফিরে তাকাতেই তাঁর চোখে পড়ল ছেলেটির দু'চোখে ছড়িয়ে রয়েছে পুরুষের দৃষ্টি। তাঁর দম বন্ধ হয়ে এল। মুহূর্তকাল সেই অবস্থাটা সহ্য করলেন। তাঁর কাছে স্পষ্ট নয় কে অপেক্ষারত,—তিনি নিজে নাকি সেই মানুষটি। কীসের প্রত্যাশায়?

ছেলেটি বলিষ্ঠ স্বরে প্রস্তাব দেয়,—'আসতে পারি?' এবার অপমানিত বোধ করলেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। 'আপনি আমায় অনুগ্রহ করে পৌঁছিয়ে দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ',—তিনি বললেন। 'কিন্তু সেজন্যে আপনি আমাকে নিয়ে পরিহাস করতে পারেন না।'

'পরিহাস কেন করব? আর কার সঙ্গেই বা করব?'—কণ্ঠস্বরে সম্পূর্ণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে কাস্তিলিয়ান ভাষায় সে মন্তব্য করে। 'বিশেষত আপনার মতো একজন মহিলার সঙ্গে?' এমন মানুষ অনেক দেখেছেন মারিয়া দোস্ প্রাজেরেস্। এর থেকে অনেক আগ্রহী পুরুষকে সর্বনাশের পথ থেকে তিনি ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ জীবনে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে এমন ভয় কখনও পাননি।

'আমি কি উপরে আসতে পারি?' অপরিবর্তিত ভঙ্গির সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর তিনি আবার শুনতে পেলেন। গাড়ির দরজা বন্ধ না করেই তিনি এগিয়ে চললেন এবং ছেলেটি যাতে স্পষ্ট করে বুঝতে পারে সেই জন্যে কাস্তালিয়ান ভাষায় বললেন,—'আপনার যা ইচ্ছে।'

সদর পেরিয়ে সিঁড়ির সামনে পৌঁছাতেই তাঁর চোখে পড়ল রাস্তার আলো তেরছাভাবে বাড়ির ভেতরে আসায় একটা আলো-আঁধারি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সিঁড়ির প্রথম ক'টা ধাপ উঠে গেলেন। তাঁর পা কাঁপছে। এক অজানা ভয়ে তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তাঁর মনে হল মরবার সময় বোধ হয় এরকমই হয়। তিনতলায় উঠে দরজা খোলার জন্যে ব্যাগের মধ্যে রাখা চাবিটা মরিয়া হয়ে খোঁজার সময় তিনি কাঁপতে শুরু করলেন। আর ওই অবস্থায়ই শুনতে পেলেন গাড়িটার দুটো দরজাই বন্ধ করা হল। নোই তাঁর আগেই উপরে উঠে এসেছে। নোই হঠাৎ গলা ফাটিয়ে ডাকতে শুরু করল। উদ্বেগকাতর ফ্যাশফ্যাশে গলায় তিনি নোইকে থামতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কানে এল নড়বড়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপের পদধ্বনি। মুহূর্তের ভগ্নাংশে তিনি তিন বছর আগেকার সেই স্বপ্নটিকে আরেকবার বিশ্লেষণ করে দেখলেন। এটা সেই স্বপ্ন যা অশুভ পূর্বাভাসের ইঙ্গিত দিয়েছিল এবং যার ফলে গত তিন বছরে বদলে গিয়েছে তাঁর জীবন। এবার তিনি বুঝতে পারলেন যে স্বপ্নটার ব্যাখ্যা করতে তাঁর ভুল হয়েছিল। 'হে ভগবান',—সবিস্ময়ে তিনি উচ্চারণ করলেন,—তাহলে তা মৃত্যু নয়।'

অবশেষে চাবিটা খুঁজে পেলেন তিনি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসা পায়ের আওয়াজ, অন্ধকারে এগিয়ে আসা ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যা তাঁরই মতো ভীত এবং বিস্মিত। এতক্ষণে তিনি বুঝলেন তাঁর এত বছরের প্রতীক্ষা, অন্ধকারে এত যন্ত্রণা ভোগ করার কষ্ট সবকিছুই যেন নিহিত ছিল শুধু এই মুহূর্তটির জন্যে।

মূল শিরোনাম Maria dos Prazeres

আলো, সে তো জলের মতো

বড়দিনের সময় বাচ্চারা আবার বইঠা লাগানো নৌকোর জন্যে বায়না ধরল। বাবা বললেন,—'ঠিক আছে, কারতাহেনায় গিয়ে কিনে দেওয়া যাবে।'

ন' বছরের তোতো আর সাত বছরের হোয়েল যে এমন জেদ ধরে বসবে তা মা বা বাবা একেবারেই ভাবেননি।

'না, আমরা এখানে এবং এক্ষুনি চাই',—দুই ছেলেই একসঙ্গে দাবি জানাল।

'অসুবিধে আছে',—মা বললেন। 'আমাদের এখানে নৌকো ভাসাবার মতো জল নেই। সবটাই শাওয়ারের জল।' মা-বাবা ঠিকই বলেছিলেন। 'কারতাহেনা দে ইন্দিয়াস্'-এর বাড়ির উঠোন পেরোলেই খাঁড়ির উপর জেটি আর উঠোনে দু'দুটো ঢাউস ইয়াচ রাখার জায়গা। এখানে মাদ্রিদ শহরের 'পাসেও দে লা কাস্তেয়ানা'-র ৪৭ নম্বর বাড়ির ছ'তলার এই ফ্ল্যাটটায় রীতিমতো ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি মা বা বাবা কেউই অস্বীকার করতে পারলেন না যে পরীক্ষায় পুরস্কার পেলে ছেলেদের বইঠা লাগানো নৌকো উপহার দেওয়াব কথা দেওয়া হয়েছিল। নৌকোটাতে আবার একেবারে সত্যিকারের দিগ্‌নির্ণয়যন্ত্র লাগানো থাকতে হবে। পরীক্ষায় ওরা পুরস্কার পেয়েছে। অতএব মাকে না জানিয়ে সবরকমেব দিগ্‌দর্শনযন্ত্র লাগানো নৌকো কিনে দিলেন বাবা। মায়ের আপত্তির কারণ স্বামীব জুয়া খেলার দেনা শোধ করাব ব্যাপাবটাও তাঁকেই সামলাতে হয়। এবং তাতেও তাঁব ঘোব আপত্তি। সোনালি রঙের ফ্লোট লাইন দেওয়া অ্যালুমিনিয়ামের নৌকোটি কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দব।

প্রাতরাশেব সময় বাবা বললেন,—'নৌকোটা গ্যারেজে বয়েছে। ওপরে তোলার কোনও উপায় নেই। লিফ্‌টে করে আনা যাবে না। সিঁড়ি দিয়ে বয়ে আনাও সম্ভব নয়। আব ওটাকে গ্যাবেজে রাখায় সেখানেও আর কোনও জায়গা নেই।'

নৌকোটাকে সিঁড়ি দিয়ে বয়ে উপরে আনাব জন্যে পবেব শনিবাব ছেলেবা সহপাঠীদের বাড়িতে আসতে বলল। সবাই মিলে ওটাকে সার্ভিস রুম পর্যন্ত নিয়ে এল।

বাবা তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন,—'এরপর কী?'

ছেলেবা বলল,—'ব্যস, আর কিছু নয়। নৌকোটাকে এই পর্যন্ত টেনে আনতে চেয়েছিলাম আর আমবা তা পেরেছি।'

অন্যান্য বুধবারের মতো সেই বুধবার বাতেও তোতো এবং হোয়েলের মা-বাবা চলে গেলেন সিনেমা দেখতে। তখন আর তাদেব কে পায়,—তাবাই বাড়িব মালিক এবং প্রভু। দবজা, জানালা বন্ধ কবে বসাব ঘরের একটা জ্বলন্ত বাল্বের কাচটা ভাঙা হল। ভাঙা বাল্ব থেকে ফিনকি দিয়ে একরাশ তাজা সোনালি আলো জলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। আলোর ধারাকে ওরা চার ইঞ্চি পর্যন্ত উঠতে দিল। তারপর তা বন্ধ করে নৌকোটিকে ভাসিয়ে দিয়ে ইচ্ছেমাফিক বাড়িব দ্বীপমালার চাবপাশে চালাতে লাগল।

আমার অবিমৃষ্যকারিতাই এই অবিশ্বাস্য অ্যাডভেঞ্চারেব প্রাথমিক সূত্র। বাসনকোসনের কাব্যের ওপর একটা আলোচনাসভায় আমি অংশ নিয়েছিলাম। তাই তোতোব প্রশ্ন'—শুধুমাত্র বোতাম টিপলেই কেন আলো বের হয়, নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবতে হয়নি। বলেছিলাম,—'আলো জলের মতো। কল খুললে যেমন জল বেরোয় ঠিক তেমনি সুইচ টিপলেই আলো।'

এইভাবে মা-বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত ছেলেবা সবরকমের দিগ্‌দর্শনযন্ত্র ব্যবহার করে নৌকো বাইবার বিদ্যে সম্পূর্ণ আয়ত্ত কবে ফেলল। বাড়ি ফিরে ছেলেদের ঘুমিয়ে থাকতে দেখে মা-বাবার মনে

হল যেন দুটি ঘুমন্ত দেবশিশু। অ্যাডভেঞ্চার আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কয়েক মাস বাদে ছেলেদের আবদার,—জলের তলায় মাছ ধরার সাজসরঞ্জাম অর্থাৎ মুখোশ, ডানা, অক্সিজেন ট্যাঙ্ক, বন্দুক চাই।

বাবা বললেন,—'একে তো ওরা বাড়ির মধ্যে একটা নৌকো রেখে দিয়েছে যেটা কোনও কাজেই লাগে না। তার উপর জলের তলায় সাঁতার কাটার সাজসরঞ্জাম চাইছে। এসব মোটেও কোনও কাজের কথা নয়।'

'প্রথম সেমেস্টারে যদি সোনার গন্ধরাজ মেডেল পাই তাহলে?' হোয়েল প্রশ্ন করে।

'না না, আর কোনও জিনিস নয়',—মায়ের সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর। বাবা অবিশ্যি মাকে এতটা কঠোর না হওয়ার পরামর্শ দিলেন। মা উত্তরে জানালেন,—'শোনো, ছেলেদের কর্তব্য হল পড়াশোনা করা। সেই কর্তব্য পালনের জন্যে আর কিছুই দেওয়া যাবে না, এমনকী একটা পেরেকও নয়। দৈবাৎ শিক্ষকের পদ পেয়ে গেলেও নয়।'

শেষ পর্যন্ত ছেলেদের কাছে হ্যাঁ কিংবা না কিছুই পরিষ্কার করে বলা হল না। এদিকে তোতো আর হোয়েল, গত দু'বছর যারা মেধাতালিকার একেবারে নিচের দিকে ছিল, দুজনেই জুলাই মাসে পেয়ে গেল সোনার গন্ধরাজ মেডেল। স্কুলের অধ্যক্ষ সকলের সামনে ওদের প্রশংসাও করলেন। এবার আর ওদের নতুন করে কিছু চাইতে হল না। সেদিন বিকেলেই ওরা দেখতে পেল ওদের ঘরে প্যাকেট করে সাজানো রয়েছে জলের তলায় সাঁতার কাটার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম। পরের বুধবার মা-বাবা 'লাস্ট ট্যাংগো ইন প্যারিস' দেখতে যাওয়ার পর ওরা সারাটা বাড়ি দু'বাঁও জলে ভরিয়ে তার তলায় পোষা হাঙরের মতো সাঁতার কাটতে শুরু করল। আসবাবপত্র ও খাটের তলায় সাঁতরাতে সাঁতরাতে আলোর গহন-গভীর থেকে ওরা উদ্ধার করতে শুরু করল বহু বছর আগে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া জিনিসপত্র।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তোতো এবং হোয়েল স্কুলের আদর্শ ছাত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেল। এর জন্যে ওদের দেওয়া হল বিশেষ শংসাপত্র।

এবার মা-বাবা নিজেরাই ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন ওরা কী চায়। যুক্তি দিয়ে ওরা বুঝিয়ে দিল যে সহপাঠীদের একদিন নৈশভোজে আপ্যায়ন করলে সবচেয়ে ভালো হবে।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাবা ওদের মাকে বললেন,—'ওরা যে বড় হচ্ছে তা কিন্তু বুঝিয়ে দিল।'

'তোমার কথা যেন সত্যি হয়',—মা মন্তব্য করলেন।

পরের বুধবার মা-বাবা যখন হলে বসে 'দ্যা ব্যাটল অফ্ আলজিয়ার্স্' সিনেমায় আলজেরিয়ার যুদ্ধ দেখছিলেন তখন কাস্তেয়ানার 'পাসেও দে লা কাস্তেয়ানা'-র ৪৭ নম্বর বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় লোকেরা দেখল গাছে ঢাকা একটি পুরোনো বাড়ি থেকে জলপ্রপাতের মতো আলো ঝরে পড়ছে। বারান্দা হয়ে আলোর ঢল বাড়ির সদর দিয়ে বিপুল বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে বড়রাস্তায়। সেই আলোর সোনালি রেখায় 'গুয়াদারারামা' পর্যন্ত শহর আলোকোজ্জ্বল হয়ে গেল।

জরুরি তলব পেয়ে দমকলবাহিনী ছ'তলার দরজা ভেঙে ভিতরে গিয়ে দেখে ঘরের ছাদ পর্যন্ত আলোর প্লাবন। চিতাবাঘের চামড়া ছাওয়া সোফা আর হাতলওয়ালা চেয়ার বসার ঘরে বিভিন্ন উচ্চতায় ভাসছে। গ্র্যান্ড পিয়ানোটি ছিল একদম নিচে আর সবচেয়ে উঁচুতে মদের বোতলগুলো। পিয়ানোর ঢাকনা আর এমব্রয়েডারির কাজ করা সিল্কের শাল জলে ভাসছে। কাব্যের পরিপূর্ণতার চরম মুহূর্তে বাড়ির সমস্ত বাসনকোসন যেন রান্নাঘরের জানালা দিয়ে ডানা মেলে আকাশে মিলিয়ে গেল। মায়ের অ্যাকোয়ারিয়াম থেকে ছড়িয়ে পড়া রং-বেরঙের মাছেদের মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফৌজি ব্যান্ডের সমস্ত বাদ্যযন্ত্র যেগুলো ছেলেদের নাচবার জন্যে লাগে।

আলোয় ঝলমল করা এই বিশাল জলাশয়ে ভাসমান জিনিসগুলির মধ্যে একমাত্র মাছগুলিই জীবন্ত এবং ওরা আনন্দে বিচরণ করছে। স্নানের জায়গায় ভাসছে সকলের দাঁত মাজবার ব্রাশ, বাবার কন্ডোম, ক্রিমের বোতল, মায়ের নকল দাঁত। শোবার ঘরের বড় টিভি সেটটা চালু অবস্থাতেই কাত হয়ে ভাসছে এবং তখনও চলছে সেইরকম একটা সিনেমার শেষ পর্ব যা ছোটদের দেখার অনুপযুক্ত।

বারান্দার শেষ প্রান্তে আলোর দুই ধারার মধ্যে নৌকোর পেছন দিকে বসে তোতো বইঠা বাইছে। মুখে মুখোশ আঁটা। বন্দরের লাইটহাউস খুঁজতে খুঁজতে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক রাখার জায়গায় সে উপস্থিত। নৌকোর সামনের দিকে বসে হোয়েল তখন মাপার চেষ্টা করছে শুকতারার দূরত্ব। ওদের সঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে সাঁইত্রিশ জন সহপাঠী। জেরানিয়াম ফুল গাছের টবে পেচ্ছাপ করা বা স্কুলের প্রার্থনাসংগীতের প্রতিটি শব্দ পালটিয়ে দিয়ে অধ্যক্ষকে নিয়ে প্যারোডি গাওয়া কিংবা বাবার ব্র্যান্ডির বোতলে চুমুক দেওয়ার ঘটনার মতো বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তে ওরা সকলেই যেন হঠাৎ করে ছবি হয়ে গেল। একসঙ্গে অনেক আলো জ্বেলে দেওয়ায় পুরো বাড়িটা সেদিন আলোয় ভাসছিল। 'সান্ হুলিয়ান এল্ হোসপিতালারিও'-র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ চতুর্থ শ্রেণী সেই রাতে স্পেনের মাদ্রিদ শহরের 'পাসেও দে লা কাস্তেয়ানা'-র ছ'তলা বাড়ির ৪৭ নম্বর ফ্ল্যাটে ডুবে গিয়েছিল। ঘটনাটি ঘটে গ্রীষ্মের উত্তাপ অথবা শীতের হিমেল বাতাস থেকে বহু দূরে মাদ্রিদ শহরে যেখানে সমুদ্র অথবা নদী নেই, যেখানকার শক্ত জমির বাসিন্দারা কখনও শেখেনি কী করে আলোকের ঝর্নাধারায় নৌকো চালাতে হয়।

মূল শিরোনাম La luz es como el agua

"আমি শুধু ফোন করতে এসেছিলাম"

বর্ষণমুখর বসন্তের বিকেলে ভাড়া করা গাড়ি চালিয়ে মারিয়া দে লা লুস্ সেরওয়ানতেস্ একা একাই বার্সেলোনায় ফেরার পথে। মোনোগ্রোস মরুভূমিতে গাড়িটা বিগড়ে গেল। সাতাশ বছরের মারিয়া বুদ্ধিমতী এবং সুন্দরী। মেক্সিকোর মেয়ে মারিয়া বছর কয়েক আগেই সংগীতশিল্পী হিসেবে বেশ নাম করেছে। হোটেল রেস্তোরাঁয় ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ানো এক যাদুকরের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়। সারাগোসায় কয়েকজন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সেরে দিনের শেষে বাড়ি ফিরে স্বামীর সঙ্গে বেরোনোর কথা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। ঝড়ের চেয়েও জোরে ছুটে যাওয়া গাড়ি-লরিগুলোকে থামানোর ব্যাকুল প্রয়াস ঘণ্টাখানেক ধরে চালানোর পর একটা ভাঙাচোরা-বিধ্বস্ত বাস ওকে করুণা দেখাল। যদিও বাসের ড্রাইভার ওকে আগেভাগেই জানিয়ে দিল যে তারা কিন্তু বেশি দূরে যাচ্ছে না। 'এটা কোনও ব্যাপার নয়',—মারিয়া বলল। 'আমি শুধু একটা টেলিফোন করতে চাই।'

সেটা সত্যি সত্যিই দরকার। সাতটার আগে বাড়ি পৌঁছোতে না পারার খবরটা স্বামীকে জানানো প্রয়োজন। গোড়ালির উপর পর্যন্ত ঢাকা বুট জুতো মানে 'বিচ্ শ্যু' আর ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্মের মতো 'স্টুডেন্টস্ কোট্' পরিহিতা মারিয়াকে এপ্রিল মাসের বৃষ্টিতে ভেজার পর চুপ্‌সে যাওয়া একটা ছোট্ট পাখির মতো লাগছিল। গাড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় মারিয়া মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পড়েছে যে গাড়ি থেকে চাবিটা খুলে নেওয়ার কথাও মনে নেই। ড্রাইভারের পাশে বসে থাকা মিলিটারি মেজাজের এক মহিলা একটু সরে বসে মারিয়ার বসার জায়গা করে দিয়ে ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন একটা তোয়ালে আর একটা কম্বল। মারিয়া তোয়ালে দিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা গা-হাত-পা ভালো করে মুছে নিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে গুছিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখল দেশলাইটা ভিজে গেছে। পাশে বসা মিলিটারি মেজাজের মহিলা একটা লাইটার এগিয়ে দিয়ে মারিয়ার কাছে তখনও পর্যন্ত শুকনো থাকা একটা সিগারেট চাইলেন। ধূমপান করতে করতে মারিয়া উচ্চ স্বরে নিজের অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করল। বাসের ঘরঘর আওয়াজ এবং বৃষ্টির ঝমঝমানিকে ছাপিয়ে কথা বলবার জন্যই ওকে গলা তুলতে হয়েছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্তিনী নিজের ঠোঁটের উপর তর্জনী চেপে ধরে মারিয়াকে থামতে ঈঙ্গিত করলেন।

'ওরা ঘুমোচ্ছে',—তিনি ফিসিফিসিয়ে বললেন। মারিয়া কাঁধ বাঁকিয়ে পেছন ফিরে দেখল যে পুরো বাসটা নানান বয়সের এবং চেহারার ঘুমন্ত মহিলায় ভর্তি। তারা প্রত্যেকেই মারিয়ার মতো কম্বল মুড়ি দিয়ে আছে। তাদের ঝিমুনিটা ছোঁয়াচে। মারিয়া গুটিসুটি মেরে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙার পর মারিয়া দেখল আঁধার নেমেছে আর ঝড় থেমে গিয়ে শুরু হয়েছে তুষারপাত। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে অথবা পৃথিবীর কোন প্রান্তে আছে,—এ বিষয়ে মারিয়ার কোনও ধারণা নেই। পার্শ্ববর্তিনী ওকে খুঁটিয়ে দেখছেন। 'আমরা কোথায় এলাম',—মারিয়া প্রশ্ন করল।

'আমরা পৌঁছে গেছি',—মহিলা জবাব দিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন এক বিশাল বাড়ির পাথর বাঁধানো উঠোনে বাসটা ঢুকছে। মনে হচ্ছে নান বা সন্ন্যাসিনীদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই অতি প্রাচীন বাড়িটি। উঠোনের আবছা আলোয় বাস যাত্রীদের স্থানুবৎ হয়ে বসে থাকাটা চোখে পড়ছে। মিলিটারি মেজাজের মহিলা স্কুলের বাচ্চাদের দেওয়া নির্দেশের মতো মহিলাদের বাস থেকে নামতে না বলা পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। ওরা সবাই বয়স্কা নারী। ওদের চলা-ফেরা, নড়া-চড়া এত শ্লথ যে উঠোনের আলো-আঁধারিতে ওদের স্বপ্নে দেখা ছবির ছায়া বলে মনে হচ্ছে। বাস থেকে সবার শেষে নামার সময় মারিয়া ভাবল যে ওরা সবাই নান। কিন্তু যখন দেখল ইউনিফর্ম পরিহিতা কয়েকজন মহিলা বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে বাস যাত্রীদের কম্বল ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বাস থেকে

নামিয়ে মুখে কোনও শব্দ না করে শুধুমাত্র নির্দেশাত্মক হাততালি দিয়ে বাসযাত্রীদের সারিবদ্ধ করাচ্ছে, তখন আবার মারিয়ার ধারণার নিশ্চিন্ত ভাবটা একটু আলগা হল। যিনি ওকে কম্বলটা দিয়েছিলেন এবং বাসে বসতে দিয়েছিলেন, তাঁকে বিদায় জানিয়ে কম্বলটা ফেরৎ দিতে গেলে তিনি বললেন উঠোনটা পেরোবার সময় মাথা ঢাকার জন্য কম্বলটা লাগবে ; আর পরে ওটা রিসেপশন অফিসে জমা দিয়ে দিলেই চলবে। 'ওখানে কোনও টেলিফোন আছে?'—মারিয়া প্রশ্ন করে। 'নিশ্চয়ই',—মহিলা বললেন। 'ওরা তোমায় দেখিয়ে দেবে টেলিফোনটা কোথায় আছে।' তিনি আরেকটা সিগারেট চাইলেন এবং মারিয়া ভেজা প্যাকেটের বাকিটুকু তাঁর হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বলল 'যেতে যেতে রাস্তাতেই ওগুলো শুকিয়ে যাবে'। চলন্ত বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে বিদায় জানাবার সময় 'তোমাব সৌভাগ্য কামনা করি' কথাগুলো তিনি চিৎকার করার মতো জোরে উচ্চারণ করলেন। তাঁকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বাসটা রওনা দিয়ে দিল।

বাড়িটার দরজার দিকে দৌড় লাগাল মারিয়া। জোরালো হাততালি দিয়ে জনৈক মেট্রন ওকে থামানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ধমকের সুরে চিৎকার করে বলল,—'থাম। আমি থামতে বলছি।' মারিয়া কম্বলের তলা থেকে মাথা বের করে দেখল বরফের মতো ঠান্ডা একজোড়া চোখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে আর একটা তর্জনী উঁচিয়ে রাখা আছে ওর দিকে। নির্দেশটা ও মেনে নিল। রিসেপশন অফিসের সামনে মেয়েদের দলটা যখন দাঁড়িয়েছিল তখন হঠাৎ নিজেকে ছিটকিয়ে বেব করে নিয়ে ও টেলিফোনটার খোঁজ নিল। জনৈক মেট্রন ওর কাঁধে একটা ছোট্ট চাপড় মেরে ওকে লাইনে ঢুকিয়ে দিতে দিতে স্যাকারিনের মতো মিষ্টি ঝরানো স্বরে বলল,—'এই দিকে, সুন্দরী, টেলিফোনটা এই দিকে।'

অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে মারিয়াও আলো-আঁধারিতে ঘেরা একটা বারান্দা দিয়ে চলতে শুরু করে একটা ডর্মিটরিতে পৌঁছোনোর পর মেট্রন কম্বলগুলো ওদের কাছ থেকে তুলে নিয়ে যার যার নির্দিষ্ট বিছানা দেখিয়ে দিল। অন্য একজন মেট্রন যাকে কিছুটা মানবিকতাসম্পন্ন মনে হচ্ছিল এবং মারিয়ার থেকে অনেকটা আগে লাইনের পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে একটা লিস্ট হাতে নিয়ে সদ্য আগতা মহিলাদের জামাব সঙ্গে লটকানো কার্ডবোর্ড ট্যাগে লেখা নামের সঙ্গে লিস্টটা মেলাতে শুরু করল। মারিয়ার কাছে এসেই সে চমকে উঠল। মারিযার জামায় কোনও পরিচয়পত্র না দেখে সে তো পুরোপুরি বিস্মিত।

'আমি শুধু ফোন করতে এসেছিলাম,'—মারিয়া তাকে বলল। মারিয়া খুব দ্রুততার সঙ্গে ব্যাখ্যা করে বলল, হাইওয়েতে গাড়িটা বিগড়ে যায়। ওর স্বামী এখানে-ওখানে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ায়। আপাতত সে ওর জন্য বার্সেলোনায় অপেক্ষা করছে। মাঝরাতের আগে ওদের তিন জায়গায় ম্যাজিক দেখানোর কথা আগে থেকেই ঠিক করা আছে এবং নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি পৌঁছে তার সঙ্গে বেরোতে না পারার কথা ও স্বামীকে জানাতে চায়। তখন প্রায় সন্ধে সাতটা। তাকে আর দশ মিনিটের মধ্যে বাড়ি থেকে বেরোতে হবে। ওর আশঙ্কা ঠিক সময়ে উপস্থিত না হওয়ায় ওর স্বামী সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করে দেবে। মেট্রন মন দিয়ে শোনার জন্য ওর কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল।

'তোমার নাম কী?'—সে প্রশ্ন করল।

মারিয়া নিজেব নামটা উচ্চারণ করে কিছুটা স্বস্তি পেল। কিন্তু মহিলা বারংবাব লিস্ট মিলিয়েও ওর নাম দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে অন্য একজন মেট্রনকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করল। তারও কিছু জানা নেই বলে সে শুধু কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে দিল।

'কিন্তু আমি শুধু একটা ফোন করতে এসেছিলাম,'—মারিয়া বলল।

'নিশ্চয়ই',—সুপারভাইজার ওকে নির্ধারিত বিছানার দিকে নিয়ে যেতে যেতে প্রকৃত ধৈর্য বজায় রেখে যথেষ্ট শান্তস্বরে বললেন,—'তুমি যদি ভালো হও তা হলে যাকে ইচ্ছে ফোন কবতে পাববে। তবে এখন নয়, আগামীকাল।'

তখন মারিয়ার মনে চিন্তার উদ্রেক হল। এবং ও বুঝতে পারল কেন বাসে করে আনা মহিলাবৃন্দ অ্যাকোয়ারিয়ামের নিচে পড়ে থাকা খাবি খাওয়া মাছের মতো নড়াচড়া করছিল। আসলে তাদের ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল এবং ভারি পাথরের দেওয়াল এবং হিমশীতল সিঁড়ি সমন্বিত এই অন্ধকার

প্রাসাদটা মহিলা মানসিক রোগীদের একটা হাসপাতাল। মারিয়া ডর্মিটরি থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছোনোর আগেই মিস্ত্রিদের মতো সারা শরীর ঢাকা 'কভার-অল' পোশাক পরিহিতা বিপুলকায় এক মেট্রনের বিরাট হাতের এক ধাক্কায় মারিয়ার গতি একেবারে স্তব্ধ। এক প্যাঁচেই ধরাশায়ী মারিয়া। মারিয়া সন্ত্রস্ত হয়ে, থমকে গিয়ে দেখে নিল নিজের চারপাশটা।

'ভগবানের দোহাই',—সে বলল,—'আমার মরা মায়ের নামে দিব্যি করে বলছি যে আমি শুধু একটা ফোন করতে এসেছিলাম।' কভার-অল পরিহিতা এই মহিলা তার অসাধারণ শক্তির জন্য হারকুলিনা নামে পরিচিত। তার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই মারিয়া বুঝে গেল কোনওভাবেই তাকে গলানো সম্ভব নয়।

গোলমেলে রোগীদের সামলানো হারকুলিনার দায়িত্ব। 'ভুল করে খুন করার কাজে' দক্ষ মেরু ভল্লুকের মতো তার হাত দুটো এর আগে দু'জন আবাসিককে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলেছে। প্রথম ঘটনাটা দুর্ঘটনা বলে প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটা কম পরিষ্কার ছিল এবং হারকুলিনাকে মৃদু অথচ দৃঢ় তিরস্কার করে এই মর্মে সাবধান করে দেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে এমন ঘটলে তাকে সরেজমিন তদন্তের সম্মুখীন হতে হবে। তবে স্পেনের বিভিন্ন মানসিক হাসপাতালের যাবতীয় সন্দেহজনক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেই অভিজাত পরিবারের এই কালো ভেড়িটার একটা বিতর্কিত ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। ঘুম পাড়ানোর জন্য প্রথম রাতে মারিয়াকে একটা ঘুমের ইঞ্জেকশন দিতে হল। ভোর হবার আগে ধূমপানের নেশায় ঘুম ভেঙে গেলে ও বুঝতে পারল যে ওর কবজি এবং গোড়ালি বিছানার লোহার রডের সঙ্গে বাঁধা। ও চিৎকার করল, কিন্তু কেউ এল না। সকালে বার্সেলোনায় ওর স্বামী যখন মারিয়ার কোনও সন্ধান পেল না, তখন মারিয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ, যন্ত্রণায় জ্ঞানহীন অবস্থায় ওকে পড়ে থাকতে দেখা গেছিল।

জ্ঞান ফেরার পর মারিয়া বুঝতে পারল না যে কতটা সময় কেটে গেছে। কিন্তু এখন জগৎটাকে ভালোবাসার স্বর্গ বলে মনে হল। ওর বিছানার পাশে দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন যাঁর শান্ত পদচারণ, সৌম্য হাসি এবং হাতের বরাভয় ভঙ্গি ওকে আবার ফিরিয়ে দিল বেঁচে থাকার আনন্দ। তিনি এই উন্মাদ আশ্রমের অধ্যক্ষ এবং অবশ্যই ডাক্তার।

তাঁকে কিছু বলার আগেই এমনকি শুভেচ্ছা বিনিময়েরও আগে মারিয়া একটা সিগারেট চেয়ে বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে মারিয়াকে দিলেন তিনি। প্রায় ভর্তি সিগারেটের পুরো প্যাকেটটাও দিয়ে দিলেন। মারিয়া চোখের জল আটকে রাখতে পারল না। 'এখন তোমার প্রাণভরে কাঁদার সময়',—ডাক্তার ভদ্রলোক ঘুম মেশানো গলায় বললেন। 'চোখের জল সবচেয়ে ভালো ওষুধ'।

কোনওরকম লজ্জা ছাড়াই নিজেকে প্রকাশ করল মারিয়া। অথচ খুচরো প্রেমিকদের সঙ্গে বিছানা পর্যন্ত গড়ানো অবসর বিনোদনের সময়েও মারিয়া এতটা খোলামেলাভাবে নিজেকে কখনও মেলে ধরতে পারেনি। ডাক্তার সব শুনছেন। আঙুল দিয়ে ওর চুল পরিপাটি করে সাজিয়ে তুললেন। ঠিক ভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য বালিশটা ভালো করে গুছিয়ে দিলেন।

ও স্বামীকে জানাতে চায়। জটিল এবং অনিশ্চিত মানসিক অবস্থা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করার জন্য অধ্যক্ষ জ্ঞান ও মাধুর্য মেশানো কথায় এমন পরামর্শ দিলেন যা কোনওদিন স্বপ্নেও সম্ভব বলে ভাবতে পারেনি মারিয়া। জীবনে এই প্রথমবার একজন পুরুষ সর্বান্তকরণে ওকে বুঝে উঠে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনেও আশ্চর্যজনকভাবে পারিশ্রমিক হিসাবে বিছানায় যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন না। দীর্ঘ একঘণ্টা বাদে মনের গভীরের আস্তরণগুলো আস্তে আস্তে তাঁর সামনে খুলে ফেলার পর মারিয়া স্বামীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা করল।

আভিজাত্য-ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেই উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। 'রাজকন্যে, এখন নয়',—আগের চেয়ে অনেক বেশি স্নেহ দিয়ে ওর গালে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন,—'না মা, এখন নয়। ঠিক সময়ে সব কিছু হবে।' দরজা থেকে তিনি বিশপের ভঙ্গিতে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর উপর আস্থা রাখতে বলে চিরতরে বিদায় নিলেন তিনি।

সেদিন বিকেলে মারিয়াকে একটা ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে মানসিক হাসপাতালে নথিভুক্ত করে নেওয়া হল। কোথা থেকে ও এসেছে এবং ওর পরিচয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে প্রশ্ন তুলে লিখে রাখা হল একটা সাদামাটা মন্তব্য। নথির পাশে হাসপাতালের অধ্যক্ষ স্বহস্তে মতামত জ্ঞাপন কবে লিখলেন,— 'বিক্ষুব্ধ'।

মারিয়া যেমন আন্দাজ করেছিল সেদিন কিন্তু ঠিক তার উলটোটাই ঘটেছিল। বার্সেলোনাব 'হোর্তা' এলাকার আধুনিক ফ্ল্যাট থেকে ওর স্বামী তিনটি অনুষ্ঠানের কর্মসূচি রক্ষার জন্য নির্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টা বাদে বেরিয়ে পড়ে। গত দু'বছরের স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দ দাম্পত্য জীবনে এই প্রথম তার দেরি। স্বামী ভদ্রলোকের আশঙ্কা অবিশ্রান্ত বর্ষণ, যার ফলে সপ্তাহের শেষে পুরো জেলাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তার জন্যই এই বিলম্ব। বাইরে বেরোনোর আগে সে একটা চিরকুটে ওই বাতের কর্মসূচি লিখে ফ্ল্যাটের দবজায় টাঙিয়ে দিয়ে যায়।

প্রথম অনুষ্ঠানে যেখানে সব বাচ্চাবা ক্যাঙারুর পোশাক পরেছিল, সেখানে তার সেরা খেলা, 'অদৃশ্য মাছ' বাদ পড়ে। কারণ মারিয়ার সহায়তা ছাড়া এই খেলাটা দেখানো সম্ভব নয়। এক তিরানব্বই বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধার বাড়িতে দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। এই বৃদ্ধা গত তিরিশ বছর ধবে বিভিন্ন জাদুকরকে বাড়িত আমন্ত্রণ করে জাদু-প্রদর্শনীর আযোজন করে নিজের জন্মদিন উদ্‌যাপন করেন। মারিয়ার অনুপস্থিতি তাকে এমন সমস্যায় ফেলে যে সহজ-সরল খেলাগুলোতেও মন বসানো তার পক্ষে সম্ভব হল না। 'রামব্লাস্'-এর একটা কাফেতে ছিল তার তৃতীয় অনুষ্ঠান। এখানে তাকে রোজই খেলা দেখাতে হয়। একদল ফরাসি পর্যটকেব জন্য আয়োজিত এই প্রদর্শনীটা এতই সাদামাটা হয়েছিল দর্শকদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হল না ; কারণ, তাদের জাদুতে আস্থা নেই। প্রতিটি প্রদর্শনীর শেষে সে বাড়িতে একবার ফোন কবেছে। এবং ব্যাকুলভাবে মাবিয়াব জবাবেব জন্য অপেক্ষা কবেছে। শেষ টেলিফোনটার জবাব না পেয়ে সে আব নিজের উপর আস্থা রাখতে পারেনি এবং বুঝল কিছু একটা ঘটেছে।

ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর জন্য বিশেষভাবে তৈবি করা তার ভ্যান গাডিতে চড়ে বাডি ফেবার পথে, 'পাসেও দে গ্রাসিয়া' দিয়ে যাওয়ার সময় পাম গাছগুলোব মধ্যে বসন্তকালেব শোভা দেখতে দেখতে মারিয়াকে ছাডা এই শহরটার হাল কী দাঁড়াবে এই আশঙ্কায় সে শিউরে ওঠে। বাড়ির দরজাব বাইরে আটকানো চিরকুটটা অবিকৃত অবস্থায় দেখে নিভে যায় তার শেষ আশা। মানসিকভাবে সে এতটাই বিপর্যস্ত যে পোষা বিড়ালটাকে খাওয়ানোর কথাও মনে নেই।

লিখতে লিখতে এখন খেয়াল হল তার আসল নামটাই আমি জানি না। কারণ, বার্সেলোনায় আমবা তাকে পেশাগত নামেই চিনতাম 'সাতুর্নো দ্যা ম্যাজিসিয়ান'। বিদ্‌ঘুটে চরিত্রের এই মানুষটাকে সামাজিক কবে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু মারিয়া মনোরম ব্যবহার কবে তার ঘাটতিগুলো পুষিয়ে দিত। বিচিত্র রহস্যের সমাহার এই সমাজ, যেখানে কোনও পুরুষ তাব স্ত্রীকে মাঝরাতের পর কাছে ডাকাব কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, সেখানে মাবিয়া তাকে সব দিক থেকে সামলিয়ে চলত। বাড়িতে পৌঁছে সাতুর্নো পুরো ঘটনাকে ভুলে যাওয়াই ভালো বলে মনে করল। এবং সেই রাতেই সে সারাগোসায় পৌঁছে ঠাকুমার ঘুম ভাঙানোর পর জানতে পারল যে দুপুবেলায় খাওয়াদাওয়া সেরে মাবিয়া সেখান থেকে বিদায় নিয়েছে। ভোবের দিকে সে ঠিক এক ঘণ্টা ঘুমোল। ঘুমের মধ্যে সে দেখল একটা অদ্ভুত স্বপ্ন। মাবিয়ার পরনে বিয়ের পোশাক। রক্তের ছিটে লাগা জীর্ণ-ছিন্ন বিয়ের পোশাক পরা মাবিয়াকে দেখে ঘুমটা ভেঙে গেল এবং তখনই তার গভীর আশঙ্কা হল মারিয়া চিরতরে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। আর এখন থেকে ওকে ছাড়াই সাতুর্নোকে একা একা এই বিরাট পৃথিবীর মুখোমুখি হতে হবে। তাকে নিয়ে গত পাঁচ বছরে তিন জন পুরুষকে ছে৲ ় চলে গেছে মারিয়া। দেখা হওয়াব ছ'মাস পরে তাকে মেক্সিকো শহবে ছেড়ে দিয়ে মারিয়া চলে যায়। অথচ তখন আন্‌জুরেশ জেলার এক পরিচারিকার ঘরে পাগলের মতো ভালোবাসার চরম আনন্দ খুঁজে পেতে ওরা রীতিমতো লড়াই চালাচ্ছিল। সারা রাত, ব্যাখ্যা কবা যায় না এমন সব বিদঘুটে আচরণ করে পরের দিন সকালে মারিয়া চলে যায়। ওর যাবতীয় জিনিসপত্র, এমনকী আগের বিয়ের আংটিটাও ফেলে রেখে গেল। পড়ে রইল সেই চিঠিটা,

যাতে ও লিখেছিল,—'এই রকম বন্য ভালোবাসার বেদনাদায়ক দাপট সহ্য করা সম্ভব নয়।' সাতুর্নো ভেবেছিল প্রথম স্বামীর কাছে ফিবে গেছে মারিয়া। হাই স্কুলে পড়ার সময়ই এক সহপাঠীকে মারিয়া গোপনে বিয়ে করেছিল। আইনের হিসাবে বিয়ের বয়স না হওয়ায় সেই বিয়েটা গোপনেই সারতে হয়। বছর দুয়েক প্রেম-ভালোবাসা ছাড়া কাটাবার পর ও আরেক জন পুরুষের খোঁজে হারিয়ে যায়। না, ঠিক হারিয়ে যায়নি। ও বাবা-মার কাছে ফিরে গেছিল এবং সাতুর্নোও যে কোনও মুল্যে ওকে ফেরৎ পাবার জন্য পিছু ধাওয়া করেছিল। তার নিঃশর্ত নিবেদন,—যতটুকু রাখতে পারবে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও, এক সুদৃঢ় ও প্রত্যয়সূচক 'না' শুনে তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল। 'ছোট-বড় সব রকমের প্রেমই আমি করেছি',—ও তাকে বলেছিল। এবং সবশেষে ও নির্দয়ভাবে বলেছিল,—'তোমার সঙ্গে এটা একটা ছোট্ট প্রেম।' ওর অনমনীয়তা তাকে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করে। প্রায় এক বছর পরে যখন সে জোর করে সব ভুলে গেছে, সেই সময় নিজের সরাইখানা গোছের ঘরে পয়লা নভেম্বরের 'অল্ সেন্ট্স্ ডে'র ভোরে হাজির হয়ে সাতুর্নো দেখল,—কমলা রঙের ফুলের মুকুট মাথায় পরে আর কুমারী কনের মতো পশমি ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে মারিয়া বসার ঘরের সোফায় ঘুমোচ্ছে।

মারিয়া তাকে সত্যি কথাই বলল। একজন স্বচ্ছল নিঃসন্তান বিপত্নীক,—ওর নতুন প্রেমিক। ক্যাথলিক নিয়ম মেনে ওকে পাকাপাকিভাবে বিয়ে করবে বলে সে দিন-ক্ষণ স্থির করে ; কিন্তু বিয়ের পোশাকে গির্জার বেদির সামনে অপেক্ষা করতে করতেই ওর সময় কেটে গেল। বিয়েটা না হলেও, বাবা-মায়ের সিদ্ধান্ত মেনে আনন্দানুষ্ঠানটা উদ্‌যাপন করা হল। মারিয়াও সেই সুরে তাল মেলাল। ও নাচল, গাইল। ওকে প্রচুর মদ্য পান করতে হল। অবশেষে মাঝ রাতে এক বিমর্ষ মানসিক অবস্থায় গৃহত্যাগ করে ও সাতুর্নোর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

সে বাড়িতে ছিল না। হলের মধ্যে রাখা ফুলদানিতে মারিয়া চাবির গোছাটা পেয়ে গেল। এটা ওর জানা। কারণ, চাবিগুলোকে ওরা সব সময়েই এখানে লুকিয়ে রাখত। এখন মারিয়া নিঃশর্ত আত্মসমপর্ণের জন্য প্রস্তুত। 'এবার কতদিন,'—সে প্রশ্ন করল। ভিনিসিউস্ দে মোরায়েস্-এর একটা ছোট্ট পংক্তিকে উদ্ধৃত করে ও বলল,—'যতদিন টিকে থাকে, ততদিন ভালোবাসা শাশ্বত।' দুবছর পরেও ভালোবাসা শাশ্বত ছিল। মারিয়াকে মনে হল অনেক পরিণত। অভিনেত্রী হবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করে সাতুর্নোকে কাজে আর বিছানায় পুরোপুরি সঙ্গ দিতে শুরু করল মারিয়া। গত বছরের শেষের দিকে ওরা জাদুকরদের এক সম্মেলন সেবে পেরপিগ্নান শহর থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রথম বারের জন্য বার্সেলোনায় যায়। বার্সেলোনা শহরটা ওদের এত ভালো লেগে গেল যে গত আটমাস ধরে ওরা এখানেই আছে। শহরটায় ওরা এতটাই মানিয়ে গেল যে কাতালোনিয়ান পাড়া 'হোর্তা'-য় একটা ফ্ল্যাটও কিনে ফেলল। এলাকাটা কলরব মুখর। ওদের কোনও কাজের লোক নেই। কিন্তু গোটা পাঁচেক ছেলে-পিলে নিয়ে থাকার জন্য ফ্ল্যাটটা যথেষ্ট। যতটা আশা করা যায়, ওরা ততটাই আনন্দে দিন কাটাচ্ছিল। শনিবার সকালে সারাগোসায় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে সোমবার সন্ধে সাতটাব মধ্যে ফিরে আসার কথা দিয়ে ভাড়া করা গাড়িটা নিয়ে মারিয়ার বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত মারিয়ার দিক থেকে কোনও খোঁজ খবর এল না।

পরের সপ্তাহের সোমবার বিমা কোম্পানির লোকজন মারিয়ার খোঁজ করতে এল। 'আমি কিছু জানি না'—সাতুর্নো বলল,—'সারাগোসায় ওর খোঁজ করুন।' সে এভাবেই ব্যাপারটা শেষ করল। সপ্তাহখানেক পরে একজন পুলিশ অফিসার এসে জানালেন মারিয়া যেখানে ছেড়ে চলে গেছিল তার থেকে নশো কিলোমিটার দূরে কাদিস্ শহরের পিছনের একটা রাস্তায় ভাঙাচোরা অবস্থায় গাড়িটাকে দেখা গেছে। গাড়ি চুরি যাওয়া নিয়ে মারিয়া বিস্তারিতভাবে কিছু বলতে পাবে কিনা অফিসার জানতে চাইলেন। সাতুর্নো বিড়ালটাকে খাওয়াচ্ছিল এবং সেই অবস্থাতেই অফিসারের দিকে একবারও না তাকিয়ে সরাসরি বলল যে পুলিশের এ ব্যাপারে একদম সময নষ্ট করা উচিত নয়। কারণ, তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে, কার সঙ্গে গেছে সেটাও তার জানা নেই। তার বলার ভঙ্গি এত দৃঢ় যে অফিসার

অস্বস্তি বোধ করলেন এবং নিজের প্রশ্নের জন্য ক্ষমা চেয়ে চলে গেলেন। পুলিশ এখানেই ঘটনাটার সমাপ্তিরেখা টেনে দিল।

মারিয়া তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে এমন সন্দেহ সাতুর্নোর মাথায় আগেও এসেছিল। রোজা রেগাস্-এর আমন্ত্রণে ইস্টারের ছুটিতে নৌবিহারের জন্য কাদাকেস্ সফরের সময় একবার এ রকম সন্দেহ হয়েছিল। ফরাসি গোধূলিবেলার ঘিঞ্জি স্বর্গ, সাগরের ধারের ভিড় ঠাসা এক পানশালায় ছ'জনের বসার টেবিলে কুড়িজনকে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে হয়েছিল। দিনের দ্বিতীয় প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে মারিয়া দেখল দেশলাইয়ে একটাও কাঠি নেই। টেবিলের ঘিঞ্জি ভিড়ের মধ্যে থেকে ব্রোঞ্জের ব্রেসলেট পড়া একটা লিকলিকে হাত মারিয়ার সিগারেটটা ধরিয়ে দিল। মানুষটকে না দেখেই মারিয়া ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু জাদুকর সাতুর্নো তাকে দেখল। নিখুঁতভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো, মৃত মানুষের মতো ফ্যাকাশে অথচ কিশোরসুলভ নাদুসনুদুস চেহারার একটা ছেলে আগুনটা এগিয়ে দিল। ছেলেটার কোমর ছাড়ানো এক রাশ চুল পনি-টেল করে বাঁধা। পানশালার জানালার শার্সিগুলো ত্রামোন্তানা ঝড়েব প্রবল বাতাসকে কোনওরকমে প্রতিহত করছে। অথচ ওই ঠান্ডাতেও ছেলেটির পবনে একটা সাদামাটা সুতোর পাজামা আর পায়ে এক জোড়া সস্তা চপ্পল।

লা বার্সেলোনেতার এক রেস্তোরাঁয় হেমন্তকালের আগে দেখা না পাওয়া পর্যন্ত ছেলেটি সাতুর্নো বা মারিয়ার নজরে আসেনি। সামুদ্রিক খাবারের জন্য প্রসিদ্ধ এই রেস্তোরাঁটায় ছেলেটিকে সেই একইরকম পাজামা পরা অবস্থায়ই দেখা গেল। তবে এবার পনি-টেল নয়, খোঁপা বাঁধা চুল। সে তাদেব দুজনকে এমন ভাবে স্বাগত জানাল যে দেখে মনে হল তারা কত পুরোনো বন্ধু। তারপরে যে ভাবে ছেলেটি মারিয়াকে চুমু খেল এবং মারিয়াও যে ভঙ্গিতে চুমু ফিরিয়ে দিল তাতে সাতুর্নোর সন্দেহ হল ওরা নিশ্চয়ই নিয়মিত গোপনে দেখাসাক্ষাৎ করে। কয়েকদিন বাদে বাড়ির নাম-ঠিকানা লেখার খাতার পাতা ওলটাতে গিয়ে সাতুর্নো দেখল মারিয়া একটা নতুন নাম এবং ফোন নম্বর লিখেছে। বিদ্বেষেব এক নির্দয় আগুন তক্ষুনি জ্বলে উঠল সাতুর্নোর মনে। আগন্তুকের পবিচিতিটাই চূড়ান্ত প্রমাণ। একুশ বছর বয়স। বড়লোকেব একমাত্র সন্তান। কেতাদুরস্ত দোকানের পসরাকে বাহারি কায়দায় সাজিয়ে রোজগার কবে। তবে অর্থের বিনিময়ে বিবাহিতা মহিলাদের শারীরিক চাহিদা পূরণ করে সন্তুষ্ট করাব কাজে ছেলেটি এর মধ্যেই যথেষ্ট নাম-ডাক করেছে। তবে যে রাতে মারিয়া বাড়ি ফিরল না সেই দিন পর্যন্ত সাতুর্নো নিজেকে সংযত রাখল। তারপর থেকে প্রতিদিন সকাল ছ'টা থেকে সাতুর্নো ছেলেটিকে পরের দিন ভোর পর্যন্ত ক্রমাগত ফোন করে যেতে লাগল। প্রথম প্রথম প্রতিদিন দু'-তিন ঘণ্টায় একটা ফোন করে যেত। তাবপর যখনই সে ফোনেব কাছে থাকত ছেলেটিকে ফোন করে যেত। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল এই যে সাতুর্নোর এই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি সম্পর্কে কেউই গুরুত্ব দিয়ে কথা বলত না।

চতুর্থ দিন ঘরদোর সাফসুথরো করতে থাকা জনৈকা আন্দালুসিয়ান মহিলা ফোনটা ধরলেন। সাতুর্নোকে পাগল করে দেবার জন্য যথেষ্ট এমন অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে তিনি উত্তর দিলেন,—'ভদ্রলোক বেরিয়ে গেছেন।' 'সেনোরিতা মারিয়া ঘটনাচক্রে ওখানে আছেন কিনা,'—এমন একটা প্রশ্ন না করাব উত্তেজনা সাতুর্নো দমন করতে পারল না।

'মারিয়া বলে কেউ এখানে থাকে না',—মহিলা তাকে বললেন। 'ভদ্রলোক অবিবাহিত।'

'আমি জানি',—সাতুর্নো বলল। 'মারিয়া ওখানে থাকে না ; তবে মাঝে মাঝেই ওখানে হাজির হয়, তাই না?'

মহিলা বিরক্ত হলেন 'ধ্যাৎ! এটা আবার কোন অপদার্থ?' সাতুর্নো ঝুলে রইল। মহিলা অস্বীকাব করায় সাতুর্নোর সন্দেহ স্থির নিশ্চয়তায় পরিণত হল। সে নিয়ন্ত্রণ হারাল। পরের ক'দিন বার্সেলোনেতার পরিচিত মানুষজনকে তাদের নামের বর্ণানুক্রম অনুযায়ী প্রশ্ন করে চলল সাতুর্নো। কেউ কিছু বলতে পারল না। কিন্তু প্রতিটি ফোন বাড়িয়ে চলল তার অস্বস্তি। কারণ, বিদ্বেষপূর্ণ বুনো উত্তেজনা ও ক্ষোভ সেই ঘিঞ্জি স্বর্গের মতো পানশালার পরিচিতদের মধ্যে যথেষ্ট তামাশার খোরাক হিসাবে এর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এবং তারা সাতুর্নোর প্রশ্নের জবাবে এমন সব বসিকতা কবত যাতে সে কষ্ট পায়।

কেবল তখনই সে বুঝতে পারল যে সেই সুন্দর-উদ্দাম-রহস্যাবৃত শহরে সে কত একা এবং সেখানে সে কোনওদিনই সুখী হতে পারবে না। ভোরবেলায় বিড়ালকে খাওয়ানোর পর, মনকে শক্ত করে মৃত্যুকে আহ্বান করার বদলে মারিয়াকে ভুলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সাতুর্নো।

দু'মাস বাদেও মারিয়া মানসিক হাসপাতাল বা উন্মাদ আশ্রমে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল না। এবড়ো-খেবড়ো কাঠের লম্বা টেবিলটার সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা রেশনের খাদ্যসামগ্রী টুকরিয়ে টুকরিয়ে কোনওরকমে ও বেঁচে ছিল। মধ্যযুগীয়, জীর্ণ খাবার ঘরটায় টাঙানো জেনারেল ফ্রান্সিস্কো ফ্র্যাঙ্কোর লিথোগ্রাফে আঁকা ছবিটার দিকে ওর দু'চোখ আটকিয়ে থাকত। সকাল-সন্ধ্যার প্রার্থনা ও গির্জাব অন্যান্য নিয়মকানুন যা দিনের বেশিরভাগ সময় ধরে চলত তার থেকে প্রথম দিকে ও নিজেকে এড়িয়ে চলত। ও উঠোনে বল খেলাও অপছন্দ করত। অথবা ওর সহ-আবাসিকদের যে দলটা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে কৃত্রিম ফুল তৈরির কষ্টসাধ্য কাজ করত তাতেও ওর অসম্মতি। কিন্তু তৃতীয় সপ্তাহের শেষে ও আস্তে-ধীরে গির্জার প্রাত্যহিক কাজকর্মে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল। ডাক্তারদের মতে প্রত্যেকেই এইভাবে শুরু করে। তারপর আগে-পরে প্রত্যেকেই উন্মাদ আশ্রমের নিয়মকানুনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়।

প্রথম ক'দিন সিগারেটের অভাব দূর করার জন্য মারিয়া সেই মেট্রনের দ্বারস্থ হত, যে সোনার পরিবর্তে সিগারেট দেয। কিন্তু ব্যাগের সামান্য অর্থ সিগারেটের জন্য খরচ হয়ে যাবার পর আবার ওর দুঃখের দিন উপস্থিত। তখন ও অন্যান্য সহ-আবাসিকদের মতো ফেলে দেওয়া সিগারেট থেকে কুড়োনো তামাক খবরের কাগজের টুকরোয় জড়িয়ে নিয়ে ধূমপান শুরু করে। এভাবে সিগারেট খেয়ে ফোন করার প্রবল আগ্রহ পূরণের চেষ্টা করে মারিয়া। পরে ঘর সাজানো নকল ফুল তৈবি করে কয়েকটা পেসেতো উপার্জন করার পর ও কিছুটা সাময়িক সান্ত্বনা পেল।

রাত্রির একাকীত্ব ওর কাছে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা। আলো-আঁধারিতে ওর মতো অন্য অনেক আবাসিকই জেগে জেগে শুয়ে থাকে। তাদের কিছু করার সাহস নেই কারণ, রাত্রির ডিউটিতে থাকা মেট্রন ভারী দরজাটা তালা-শেকল দিয়ে আটকে রেখে নিজেও জেগে থাকে। একরাতে মনের মধ্যে জমে থাকা দুঃখকে দূরে সরিয়ে অনেক সাহস নিয়ে পাশের বিছানার মহিলাকে প্রয়োজনের থেকে যথেষ্ট উচ্চস্বরে মারিয়া জিজ্ঞেস করল,—'আমরা কোথায় আছি?'

প্রতিবেশিনী দৃঢ়, শান্ত, বলিষ্ঠ ও টানটান ভাষায় উত্তর দিল,—'নরকের গর্তে।' 'ওরা যে বলে এটা মুরদের দেশ',—অন্য একজন বলল। শব্দটা একটু দূর থেকে আসায় সমস্ত ডর্মিটরিটা গমগম করে উঠল। 'এবং এটা নিশ্চিতভাবে সত্য। কারণ, গরমের সময় চাঁদ উঠলে সাগরের ধারে কুকুরের ডাক শুনতে পাবে।' মধ্যযুগের স্পেনীয় জাহাজের নোঙর তোলার শব্দের মতো তালা লাগানো শেকলটা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। এবং দরজাটা খুলল। তাদের নির্দয় অভিভাবিকা যাকে এই তাৎক্ষণিক নৈঃশব্দ্যের মধ্যে একমাত্র জীবন্ত প্রাণী বলে মনে হচ্ছিল,—ডর্মিটরিব এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পায়চাবি শুরু করে দিল। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল মারিয়া। এবং তার কারণ ওর অজানা নয়।

উন্মাদ আশ্রমে আসার প্রথম সপ্তাহ থেকে রাত্রির মেট্রন মারিয়াকে তার সঙ্গে নিরাপত্তা রক্ষীদের ঘরে শোয়ার জন্যে সরাসরি প্রস্তাব দিয়ে আসছিল। পুরোপুরি বাণিজ্যিক ভাষায়—সিগারেট, চকোলেট বা অন্য যা কিছু মারিয়া চায় তা ভালোবাসাব সঙ্গে বিনিময়ের প্রস্তাব সে ওকে দিয়েছে। 'তুমি সব কিছু পাবে',—মেট্রন চুক্তির সুরে বলে। 'তুমি রানি হবে।' মারিয়া প্রত্যাখ্যান করায়, সে পদ্ধতি পালটাল। ওব বালিশের তলায়, জামার পকেটে, অন্যান্য অপ্রত্যাশিত জায়গায় প্রেম নিবেদন করা চিরকুট রাখা শুরু করল। চিরকুটগুলোর ভাষা এতই হৃদয় বিদাবক যে পাথরকেও গলিয়ে দিতে পারে। ডর্মিটরির ঘটনা যে রাতে ঘটল তার মাসখানেকেরও বেশি আগে মনে হয় মারিয়া পরাজয় মেনে নিতে স্বীকার করে নিয়েছিল।

অন্য আবাসিকরা ঘুমিয়ে পড়েছে এটা নিশ্চিত হবার পব মেট্রন মারিয়ার বিছানায় এল এবং সব রকমের অশ্লীল শব্দ ওর কানে ফিসফিসিয়ে ঢেলে দিতে দিতে ওর মুখে চুমু খেল। ভয়ে ওর গলা শুকিয়ে

যাচ্ছে। ওর হাতগুলো আশঙ্কায় সিঁটিয়ে আছে। ওর পা দুটো অজানা ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। তারপর মারিয়ার অসারতাকে আশঙ্কাজনিত কারণের বদলে সন্তুষ্টির প্রকাশ বলে মনে করে নিয়ে মেট্রন সাহসের ডানায় ভর করে আরও এগোল। সেই মুহূর্তে মারিয়া হাতের উলটো পিঠ দিয়ে তাকে এক ধাক্কা দিয়ে পাশের বিছানায় পাঠিয়ে দিল। অগত্যা আবাসিকদের উত্তপ্ত প্রতিবাদের মধ্যে বিরক্ত মেট্রন উঠে দাঁড়িয়ে 'কুত্তি' বলে চিৎকার করল। 'যতক্ষণ না তুই আমার জন্য পাগল হবি ততক্ষণ এই নরকের গর্তে পচবি।'

জুন মাসের প্রথম রবিবারে কোনও রকম আভাস না দিয়েই গরম পড়ে গেলে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ, উন্মাদ আশ্রমের অধিকাংশ আবাসিক নিজেদের বেঢপ আকারের সার্জের শেমিজগুলো গরমের দাপটে খুলে ফেলতে শুরু করল। গির্জার বারান্দায় মুরগি তাড়ানোর মতো উদোম হওয়া আবাসিকদের পিছনে মেট্রনরা ছুটে বেড়াচ্ছে দেখে মারিয়া বেশ মজা পায়। এহেন বন্য ঘুযোঘুষির থেকে মারিযা একটা জনশূন্য দপ্তরে পৌঁছে গেল যেখানে একটা টেলিফোন আছে। ডায়ালটোনের ধারাবাহিক যান্ত্রিক শব্দও কানে এল। মারিয়া কোনওরকম চিন্তা না করেই টেলিফোনটা ধরল। টেলিফোনে বহু দূর থেকে ভেসে আসা এক হাসিসিক্ত কণ্ঠস্বর কানে এল যা শুনে ও ভীষণ মজা পায়। টেলিফোন কোম্পানি যান্ত্রিক স্বরে সময় বলছে—'এখন সময় হল,—৪৫ ঘণ্টা ৯২ মিনিট এবং ১০৭ সেকেন্ড।'

'যত্ত সব!' ও ফোনটা ধরেই থাকল এবং মজাটা উপভোগ করল। পালাবার এক অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত বুঝতে পেরে ও চলে যাবার উদ্যোগ নিল। সাংঘাতিক উত্তেজনা এবং প্রচণ্ড তাড়াহুড়োয় ও ছটা নম্বর ডায়াল করল। যদিও ওটা ওর বাড়ির নম্বর কিনা সে বিষয়ে ও নিশ্চিন্ত নয়। ও অপেক্ষা করল। ওর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি অনেক বেড়ে গেছে। অনেক আগ্রহ নিয়ে শূন্যগৃহে পরিচিত ফোনের দুঃখজনক আওয়াজটা ও শুনছে। একবার, দুবার, তিনবার,—এবং অবশেষে ও নিজের ভালোবাসার মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। 'হ্যালো?'

গলায় জমে থাকা কান্নাটা, যেটা গলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল, সেই স্বরে ও বলল, —'প্রিয় আমার, হৃদয় আমার।' কান্না ওর কথাকে ছাপিয়ে গেল। টেলিফোনের অপর প্রান্ত সংক্ষিপ্ত-শান্ত-বিরক্ত স্বরে জ্বলন্ত বিদ্বেষ ভরা শব্দে উচ্চারণ করল,—'বেশ্যা।'

সে টেলিফোনের রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেই রাতে মারিয়া রাগে অন্ধ হয়ে হিংস্রভাবে খাবার ঘরে টাঙানো সামরিক বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষের লিথোগ্রাফের ছবিটা এক টানে নামিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে ভেঙে চুরমার করে কাচের জানালা দিয়ে বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর এর ফলে নিজেও রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে গেল চিৎপাত হয়ে। যে মেট্রনরা ওকে বাধা দিতে গিয়ে ঘুসি মারছিল তাদের প্রতিহত করার মতো রাগ তখনও ওর মনে জমা ছিল। হারকুলিনা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুঠো পাকাচ্ছে। এই দৃশ্য না দেখা পর্যন্ত ও রাগে জ্বলছিল। মারিয়া ছেড়ে দিল। ওরা ওকে হিংস্র রোগীদের ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে ওর পায়ে টারপেন্টাইন ইঞ্জেকশান ফুঁড়িয়ে দিল। ইঞ্জেকশান দেওয়ায় পা দুটো ফুলে গিয়ে ওর চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল এবং মারিয়া বুঝল এ পৃথিবীতে এমন কোনও কিছু নেই যা ওকে এই নরক থেকে মুক্তি দিতে পারে। পরের সপ্তাহে ওকে ডর্মিটরিতে ফেরত পাঠানো হলে ও রাতের মেট্রনের ঘরের দিকে পা টিপে টিপে গিয়ে দরজায় টোকা দিল।

স্বামীর কাছে খবরটা পৌঁছে দেবার দাম মারিয়ার কাছে থেকে সে অগ্রিম হিসাবে দাবি করল। রাতের মেট্রন দেনা-পাওনার এই পুরো বিষয়টা একেবারে গোপন রাখার শর্ত দিল এবং মারিয়া অবশ্যই রাজি। ওর দিকে সুদৃঢ় তর্জনী উঁচিয়ে বলে উঠল,— ওরা যদি দেখে ফেলে তুমিই মরবে।'

পরের শনিবারে জাদুকর সাতুর্নো মেয়েদের উন্মাদ আশ্রমে তার ভ্যানটা চালিয়ে নিয়ে উপস্থিত। মারিয়ার উদ্ধার পর্ব উদ্‌যাপনের ছক তার মনে কষা হয়ে গেছে। উন্মাদ আশ্রমের অধ্যক্ষ নিজের দপ্তরে তাকে স্বাগত জানালেন। দপ্তরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং যুদ্ধ জাহাজের মতোই সুনিয়ন্ত্রিত। তিনি

সাতুর্নোর স্ত্রী সর্ম্পকে একটি সহানুভূতিশীল প্রতিবেদন পেশ করলেন। সাতুর্নোর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার আগে পর্যন্ত কেউ জানত না কবে, কখন, কোথা থেকে ও এসেছিল। সাতুর্নো কী করে তার স্ত্রীর খোঁজখবর পেল, এই প্রশ্নে অধ্যক্ষ যথেষ্ট কৌতূহল দেখালেন। সাতুর্নো মেট্রনকে রক্ষা করল। সে বলল 'আমায় বিমা কোম্পানি বলেছে।'

জবাবে অধ্যক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ালেন। 'আমি জানি না বিমা কোম্পানিগুলো কী করে সব খবর জোগাড় করে।' নিজের টেবিলে পড়ে থাকা একটা ফাইলের ওপর নজর দিয়ে তিনি বললেন,—'ওর অবস্থাটা যে যথেষ্ট খারাপ এটা একেবারে নিশ্চিতভাবে বলা যায়।'

তার স্ত্রীর ভালোর জন্য আশ্রমের বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন সাতুর্নো কোনও প্রশ্ন ছাড়াই মেনে চলবে এই প্রতিশ্রুতি পেলে সমস্ত প্রকার সাবধানতা নিয়ে মারিয়াকে সপ্তাহে একবার দেখতে দেবার সম্মতি দিতে তিনি প্রস্তুত। তা ছাড়াও, তিনি ওকে কীভাবে চিকিৎসা করছেন তা নিয়েও প্রশ্ন করা চলবে না। কারণ, এতে হিংস্র আচরণ ও জ্ঞান হারানোর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। এসব ঘটনা ঘনঘন ঘটছিল এবং বিপজ্জনকও বটে।

'কী আশ্চর্য,'—সাতুর্নো বলল। 'বরাবরই ও একটু রগচটা, কিন্তু নিজেকে স্থির রাখার ক্ষমতাও ওর প্রচুর।'

ডাক্তার জ্ঞানী ব্যক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। 'বেশ কিছু মানসিক আচরণ বহুদিন সুপ্ত থাকে। তারপর একদিন হঠাৎ বেরিয়ে আসে',—তিনি বলে চলেন। 'সে যাই হোক আমাদের সৌভাগ্য যে ও এখানে এসে গেছে। আর কড়া হাতে এইরকম রোগীদের চিকিৎসা করাই আমাদের বিশেষত্ব। এরপর তিনি টেলিফোন সম্পর্কে মারিয়ার অদ্ভুত এবং নির্দিষ্ট আকর্ষণের বিষয়ে সাতুর্নোকে সাবধান করে দিলেন।

'ওকে একটু মানিয়ে নিতে হবে',—তিনি বললেন।

'আপনি একদম ভাববেন না',—সাতুর্নো হালকা চালে ডাক্তারকে বলল। 'ওটা আবার আমার বিশেষত্ব।'

সাবেক আমলের গির্জার দরদালানটাকে গারদ আর ব্যক্তিগত ও গোপনীয় কথা বলার দুটো খুপরিতে ভাগ করে নিয়ে তৈরি হয়েছে উন্মাদ আশ্রমের—'ভিজিটিং রুম' বা সাক্ষাৎকক্ষ। ওরা দু'জনে আশা করে থাকতে পারে এমন কোনও খুশির জোয়ার ভিজিটিং রুমে সাতুর্নোর উপস্থিতির পরে সৃষ্টি হল না। ঘরের মাঝখানে একটা ছোট্ট টেবিল আর দুটো চেয়ারের পাশে মারিয়া দাঁড়াল। টেবিলের উপর একটা ফুলদানি। তবে তাতে কোনও ফুল নেই। স্ট্রবেরি রঙের ছেঁড়া-ফাটা কোট আর দাতব্য হিসেবে পাওয়া জুতো পরিহিতা মারিয়া নিশ্চয়ই ওই জায়গা থেকে চলে যেতে রাজি। হারকুলিনা ঘরের এক কোনায় প্রায় অদৃশ্যভাবে মুঠো পাকানো হাতে দাঁড়িয়ে। স্বামীকে ওখানে ঢুকতে দেখে মারিয়া নড়তে পারল না। জানালার কাচে কেটে যাওয়া ওর মুখের দাগগুলো এখনও মিলিয়ে যায়নি। এবং ওর মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। ওরা নিয়মমাফিক চুম্বন বিনিময় করল।

'কেমন লাগছে?'—সাতুর্নো জিজ্ঞেস করল মারিয়াকে।

'তুমি এখানে শেষ পর্যন্ত এসেছ',—ও বলল। 'এটা মৃত্যুপুরী।' বসার মতো সময় ওদের ছিল না। কান্নায় ভেঙে পড়ে মারিয়া কষ্টকর জীবন, মেট্রনদের নৃশংসতা, কুকুরের পক্ষেও অযোগ্য খাদ্য এবং সীমাহীন সেই রাতগুলোর কথা, যখন সে ত্রাসে-ভয়ে-শঙ্কায় দু' চোখের পাতা বন্ধ করতে পারে না,—তাকে এক নাগাড়ে বলে গেল।

এমনকি এটাও জানি না যে কত দিন বা কত মাস কিংবা কত বছর আমি এখানে আছি। আমি শুধু জানি প্রতিটা দিন আগের দিনের চেয়ে আরও বেশি খারাপ,'—বলতে বলতে ও ফুঁপিয়ে উঠল। 'আমার মনে হয় না যে আমি একই রকম থাকব।'

'এখন ও সব চুকে গেছে',—বলতে বলতে সাতুর্নো মারিয়ার মুখের সদ্য কাটা দাগগুলোয় হাত বোলাতে লাগল। 'আমি প্রতি শনিবার আসব। অধ্যক্ষের অনুমতি পেলে আরও ঘন ঘন আসব। দেখে

নিও, শেষ পর্যন্ত সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

ওর ভীত-সন্ত্রস্ত চোখ দুটো এক দৃষ্টিতে সাতুর্নোকে দেখতে লাগল। সাতুর্নো তার পেশাগত দক্ষতা মিশিয়ে পরিস্থিতিটা হালকা করতে চাইল। গুরু-গম্ভীর চালে অথচ মিঠে বুলিতে সে এক রাশ মিথ্যায় ডাক্তারের ধারণাকে ওর কাছে নিবেদন করল। 'এর মানে হল,'—সে সবশেষে বলল,—'সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে তোমার আরও কয়েকটা দিন দরকার।' মারিয়া পরম সত্য বুঝে গেল।

'ভগবানের দিব্যি, তুমিও অন্তত আমায় পাগল ভেবোনা',—ও ডুকরে উঠে বলল।

'একটু বোঝবার চেষ্টা কর',—হাসার চেষ্টা করে সে বলল,—'তুমি এখানে ক'দিন থাকলে সেটা সবার জন্যই মঙ্গল। অবশ্যই ভালোভাবে থাকা দরকার।'

'কিন্তু তোমায় তো আগেই বলেছি যে আমি শুধু একটা ফোন করতে এসেছিলাম',—মারিয়ার মন্তব্য।

এহেন ভয়াবহ আচরণের প্রতিক্রিয়া কীভাবে প্রকাশ করা যায় তা সাতুর্নোর জানা নেই। সে তাকাল হারকুলিনার দিকে। হারকুলিনা নিজের ঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে,—সময় ফুরিয়ে এসেছে,—বোঝবার চেষ্টা করে সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল। এক ঝলকে পিছনের দিকে তাকিয়ে মারিয়া ঈঙ্গিতটাকে প্রতিহত করতে চাইল। এবং দেখল হারকুলিনা ওকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আক্রমণ হানতে চলছে। তারপর ও স্বামীর গলা আঁকড়ে ধরে সত্যিকারের পাগলির মতো ডুকরিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ভালোবেসে, যতটুকু ভালোভাবে পাবা যায় ততটুকু যত্ন দিয়ে মারিয়াকে হারকুলিনার করুণার উপরে ছেড়ে দিল সাতুর্নো। হারকুলিনা পিছন থেকে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনওরকম প্রতিবাদ করার সুযোগ না দিয়েই সে বাঁ হাতের প্যাঁচে মারিয়াকে বেঁধে ফেলল আর লৌহ-দৃঢ় ডান হাত দিয়ে ওর গলাটা আটকে ধরে জাদুকর সাতুর্নোকে চেঁচিয়ে বলল,—'চলে যান।'

ভয়ে পালিয়ে গেল সাতুর্নো। কিন্তু পরের শনিবার উন্মাদ আশ্রমে গিয়ে সাতুর্নোর মন থেকে আগের দিনের আশঙ্কা মিশ্রিত ভয়ার্ত ভাবটা দূর হ'ল। উন্মাদ আশ্রমে সে তার বিড়ালটাকে নিয়ে গেছিল। তার নিজের পোশাকের মতো পোশাকে বিড়ালটাকে সাজিয়েছিল। তার পরনে লিওতার্দো থেকে কেনা লাল-হলুদ থাইট্ আর মাথায় টুপি। মাথা নাড়ালে দোলে এমন একটা দোলানো ঝুঁটি টুপির উপরে বসানো। ভ্যানটাকে নিয়ে সে ঢুকে গেল আশ্রমের উঠোনে। ঘণ্টা তিনেকের এক জম-জমাট প্রদর্শনী করে সবাইকে মাতিয়ে দিল সাতুর্নো। আবাসিকরা ভীষণ উপভোগ করল। বারান্দা থেকে জাদুর খেলা দেখতে দেখতে তারা উত্তেজনায় চেঁচাচ্ছিল আর উৎসাহে হয়ে উঠছিল উচ্ছল-উদ্দীপ্ত। মারিয়া ছাড়া সবাই সেখানে উপস্থিত। স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করল মারিয়া। এমনকি বারান্দা থেকেও তাকে দেখল না। সাতুর্নো মর্মাহত। 'এটা একটা সাদামাটা প্রতিক্রিয়া',—অধ্যক্ষ তাকে সান্ত্বনার স্বরে বললেন, 'এটা কেটে যাবে'।

কিন্তু এটা কোনওদিনই কাটেনি। মারিয়াকে বহুবার দেখতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে চিঠি দিল সাতুর্নো। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। খামবন্ধ চিঠিটা চারবার মন্তব্যহীনভাবে ফেরত এল। হাল ছেড়ে দিয়ে উন্মাদ আশ্রমের দপ্তরে নিয়মিত মারিয়ার জন্য সিগারেট পাঠিয়ে যেতে লাগল সাতুর্নো। সিগারেট মারিয়ার কাছে পৌঁছায় কিনা, এ বিষয়ে অবিশ্যি সে কোনও দিনই খোঁজ নেয়নি। অবশেষে ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে বাস্তবতায় একদিন তাও বন্ধ হয়ে গেল।

সাতুর্নো আবার বিয়ে করে নিজের দেশে ফিরে গেছিল,—এর থেকে বেশি খবর কারও জানা নেই। বার্সেলোনে ছাড়বার আগে তার আধা-অনশনে থাকা বিড়ালটাকে জনৈকা বান্ধবীর কাছে সে দিয়ে যায়। বান্ধবীটি মারিয়াকে নিয়মিত সিগারেট পৌঁছে দিতেও সম্মত। রোসা বেগাস্ যতদূর মনে করতে পারে, বছর বারো আগে 'কোতে ইংলিসে'-র বিভাগীয় বিপণিতে সেই বান্ধবীটির সঙ্গে রোসার একবার দেখা হয়েছিল। মাথার চুল কামিয়ে গেরুয়া আলখাল্লা পড়ে থাকায় তাকে তখন প্রাচ্যের সন্ন্যাসিনীদের মতো লাগছিল ; এবং সে অন্তঃসত্ত্বা। রোসাকে সে বলেছিল যে, যখনই পেরেছে তখনই সে মারিয়াকে সিগারেট পৌঁছে দিয়েছে ; এমনকি বেশ কিছু আকস্মিক ঘটনায় সে মারিয়াকে সামলিয়েছে। দুর্দিনের দুঃস্বপ্নের মতো ধ্বংস হয়ে যাওয়া হাসপাতালটার ধ্বংসাবশেষ

দেখার দিন পর্যন্ত নিয়মিত এইসব কাজ করে গেছে বলে বোসাকে সে জানিয়েছিল। শেষ যেদিন সে মারিয়াকে দেখে সেদিন নাকি তাকে খুব প্রাণোচ্ছল এবং কিঞ্চিৎ পৃথুলা লাগছিল। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যে মারিয়ার মনে গির্জার শান্তির ছাপ পড়েছে। সেই দিন বান্ধবীটি তার কাছে গচ্ছিত রাখা বিড়ালটাকেও মারিয়ার কাছে নিয়ে গেছিল ; কারণ, বিড়ালটাকে খাওয়ানোর জন্য সাতুর্নো তাকে যা অর্থ দিয়েছিল তা-ও তদ্দিনে ফুরিয়ে গেছে।

মূল শিরোনাম "Solo vine a hablar por teléfono"

শ্রীমতী ফোর্বসের আনন্দঘন নিদাঘকাল

বিকেলবেলায় আমরা দু'ভাই বাড়ি ফিরে আসা মাত্রই নজরে এল সদর দরজার ফ্রেমে গাঁথা রয়েছে সাপের মতো একটা বিশাল সামুদ্রিক প্রাণী। গলায় পেরেক মেরে সেটাকে ক্রুশের মতো দরজায় লটকে দেওয়া হয়েছে। কালো রঙের উজ্জ্বল চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে আর ফাঁক হয়ে থাকা চোয়ালের ভিতর দেখা যাচ্ছে করাতের মতো ধারালো দাঁত। মনে হচ্ছিল বিষয়টা যেন জিপসিদের কোনও ভেলকির খেলা। আমার বয়স তখন বছর নয়েক। বিচিত্র প্রাণীটিকে দেখে আমার তো ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ। আমার থেকে দু' বছরের ছোট ভাইটা ভয়ের চোটে তাড়াহুড়ো করে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক, মুখোশ আর সাঁতার কাটার ডানা ফেলে দিয়ে চিৎকার করতে করতে দৌড় লাগাল। জেটি থেকে বাড়ি পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা শান বাঁধানো রাস্তাটা পেরিয়ে শ্রীমতী ফোর্বস্ তখন আঁকা বাঁকা সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন। ভাইয়ের চিৎকার কানে আসায় উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের কাছে এলেন। তারপর দরজায় ক্রুশবিদ্ধ প্রাণীটিকে দেখে বুঝতে পারলেন আমাদের ভয়ের কারণ। তিনি সবসময় বলতেন দু'ভাই যখন একসঙ্গে থাকে তখন তাদের একজন কোনও অন্যায় করলে দায়িত্ব দুজনেরই উপর বর্তায়। সেই কারণে ছোট ভাইয়ের চিৎকারের জন্যে আমাদের দুজনেরই বকুনি প্রাপ্য। আমাদের আচরণে আত্মসংযমের অভাব ফুটে ওঠায় দুজনকেই বকুনি দিলেন। ইংরেজিতে নয়, জার্মান ভাষায়। অথচ এটা কিন্তু তাঁর চুক্তির শর্তবিরোধী। হয়তো তিনি নিজেও খুব ভয় পেয়েছিলেন এবং তা স্বীকার করতে চাইছিলেন না। অবশ্য পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে স্বমূর্তি ধারণ করলেন তিনি। কাঠখোট্টা ইংরেজিতে দিদিমণিসুলভ বিশেষ ভঙ্গিতে বললেন,—'এটা সমুদ্রের পাঁকালমাছ। এগুলোকে বলে,—বানমাছ। এটার গ্রিক নাম মুরেনা হেলেনা। কারণ প্রাচীন গ্রিকরা একে পবিত্র প্রাণী বলে মনে করত।' হঠাৎ শিশলের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওরেস্তে। স্থানীয় ছেলে ওরেস্তে আমাদের সাঁতার কাটা শেখাত। মুখে ডুবুরির মুখোশ, সাঁতারের কস্ট্যুম আর কোমরের চওড়া বেল্টে আটকানো বিভিন্ন মাপের ছ'টি ছুরি। প্রয়োজনে সামনাসামনি লড়াই করে মাছ শিকারের জন্যে এগুলো খুব দরকারি। এছাড়া অন্য কোনও উপায়ে শিকারের কথা সে কল্পনাও করতে পারত না। বছর বিশেকের ওরেস্তোর বেশির ভাগ সময় মাটির বদলে কাটত অস্থির জলের তলায়। ফলে সবসময়ই সারা শরীরে গ্রিজ মেখে তেলতেলে করে রাখা ওরেস্তোকে কোনও সামুদ্রিক প্রাণী বলেই মনে হত। প্রথমবার ওকে দেখে শ্রীমতী ফোর্বস্ আমাদের মা-বাবাকে বলেছিলেন যে ওর থেকে বেশি সুন্দর কাউকে কল্পনাই করা মুশকিল। কিন্তু তাই বলে ওরেস্তেও তাঁর কঠিন নিয়মের শাসন থেকে রেহাই পায়নি। মুরেনা নাম পবিত্র প্রাণীটিকে অর্থাৎ বানমাছটাকে শুধুমাত্র বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্যে দরজায় টাঙিয়ে রাখার অপরাধে তাকে ইতালিয়ান ভাষায় যথেষ্ট গালি খেতে হয়। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটিকে দরজা থেকে খুলে ফেলতে বলে শ্রীমতী ফোর্বস আমাদের নৈশভোজের পোশাক পরে নিতে বললেন।

এতটুকুও ভুল না করে তাঁর নির্দেশ পালন করে আমরা ফিরে এলাম। শ্রীমতী ফোর্বসের শাসনের দু'সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম বেঁচে থাকা কী কঠিন। অন্ধকার স্নানঘরে স্নান করতে করতে আমার মনে হল ভাই তখনও মুরেনা সম্পর্কে ভেবে চলেছে। ও বলল,—'মানুষের মতো চোখ'। সম্মতি জানালেও ওকে বোঝালাম উলটোটাই সত্যি এবং কায়দা করে প্রসঙ্গ পালটিয়ে স্নান সেরে নিলাম। আমার সঙ্গে আসবে বলে স্নানঘর থেকে বেরোবার মুহূর্তে ও আমায় একটু দাঁড়াতে বলল।

'এখনও দিনের আলো রয়েছে',—আমি বললাম। জানালার পর্দা টেনে দিলাম। অগস্টের মাঝামাঝি।

চাঁদের স্নিগ্ধ আলো চরাচরব্যাপী ছড়িয়ে পড়ায় জানালা দিয়ে দ্বীপের শেষতম প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ওদিকে সূর্যও যেন আকাশে থমকে গিয়েছে।

'সে কারণে নয়, ভয় লাগতে পারে ভেবে আমার ভয় করছে',—ভাইয়ের মন্তব্য।

খেতে যাওয়ার সময় কিন্তু ওকে বেশ শান্তই মনে হল। খাবার টেবিলে যথাযথ আচরণ করার জন্যে শ্রীমতী ফোর্বস্ বিশেষ অভিনন্দন জানালেন ওকে। ওর সাপ্তাহিক প্রগতিপত্রে এর জন্যে জুড়ে দিলেন বাড়তি দু' নম্বর। দেরি হয়ে যাওয়ায় হাঁপাতে হাঁপাতে শেষ মুহূর্তে খাবার ঘরে পৌঁছানোর জন্যে আমার দু' নম্বর কাটা গেল। পঞ্চাশ পয়েন্ট জমলে পুডিঙের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা কেউই পনেরো পয়েন্টের বেশি জমাতে পারিনি। সত্যি সত্যিই শ্রীমতী ফোর্বসের তৈরি পুডিঙের মতো সুস্বাদু খাবার খাওয়ার সুযোগ আর কখনও হয়নি।

রাতের খাওয়া শুরু করার আগে খালি প্লেট সামনে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমরা প্রার্থনা করতাম। শ্রীমতী ফোর্বস্ ক্যাথলিক না হওয়া সত্ত্বেও চাকরির শর্ত অনুসারে দিনে দু'বার আমাদের প্রার্থনা করাবার কথা। সেজন্যে তিনি শিখেও নেন প্রার্থনা পদ্ধতি। প্রার্থনা শেষ করার পর আমরা তিনজন একসঙ্গে খেতে বসতাম। আমাদের চালচলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা দম বন্ধ করে বসে থাকতাম। সবকিছু ঠিকঠাক মনে হওয়ার পর ঘণ্টা বাজাতেন তিনি। ঘণ্টাধ্বনি শুনেই আমাদের রাঁধুনি ফুলভিয়া ফ্লামিনিয়া একঘেঁয়ে বিনের স্যুপ নিয়ে খাবার ঘরে প্রবেশ করত।

প্রথম দিকে মা-বাবার সঙ্গে থাকার সময় খাবার সময়টা ছিল উৎসবের মতো। ফুলভিয়া ফ্লামিনিয়া রীতিমতো হইচই করে খাবার পরিবেশন করত। সেই পরিবেশনের মধ্যে এমন একটা অগোছলো ভাব জড়িয়ে ছিল যা আমাদের জীবনের মাধুর্য্য বাড়িয়ে দিত। একেবারে শেষে সে-ও বসে পড়ত আমাদের সঙ্গে আর প্রত্যেকের প্লেট থেকে একটু একটু করে কিছু তুলে নিয়ে তার খাওয়া শেষ করত। কিন্তু যেদিন থেকে শ্রীমতী ফোর্বস্ আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে এলেন সেদিন থেকে ফুলভিয়া ফ্লামিনিয়ার ওপর নেমে এল নিশ্ছিদ্র নীরবতা। খাবার পরিবেশনের সময় সসপ্যানের ফুটন্ত জলে বুদবুদ কাটার আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যেত। চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে টানটান হয়ে বসে চোয়ালের ডানদিক দিয়ে দশবার এবং বাঁদিক দিয়ে দশবার চিবিয়ে প্রতিটি গ্রাস খাবার খেতে হত। নাগরিক শিষ্টতার পাঠ শেখানোর সময় কঠিন প্রকৃতির বিগত যৌবনা মহিলাটি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে আমাদের বিদ্ধ করতেন। ঠিক যেন রবিবার গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করার মতো ব্যাপার। তবে একটাই পার্থক্য,—খাবার টেবিলে কেউ গান গাইত না।

মুরেনা হেলেনা, মানে বানমাছটা দরজায় টাঙানো অবস্থায় যেদিন আমরা দেখি সেদিনই শ্রীমতী ফোর্বস্ আমাদের দেশাত্মবোধ সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এমন সময় স্যুপ পরিবেশনের পরে ফুলভিয়া ফ্লামিনিয়া কাঠকয়লায় ঝলসানো মাছের টুকরো হাতে করে খাবার টেবিলে উপস্থিত হয়ে গুরুগম্ভীর আবহাওয়াটাকে লঘু করে দিল। ওর ঘরে ঢোকার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এল। মাছের চমৎকার গন্ধটা ক্যারিবিয়ান এলাকায় অবস্থিত আমাদের গুয়াকামায়াল-এর বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিল। ওখানেই স্থলচর প্রাণী ও পাখির মাংসের বদলে মাছের দিকে আমার ঝোঁক বাড়ে। আমার ভাই কিন্তু পরখ না করে খাবারটা খেতে আপত্তি জানিয়ে বলল,—'এটা আমার পছন্দ নয়।'

শ্রীমতী ফোর্বস্ তাঁর শিষ্টাচারের পাঠ থামিয়ে বললেন,—'না খেলে জানবে কী করে? আগে খেয়ে তো দেখ।'

চোখের ইশারায় রাঁধুনিকে সতর্ক করার আগেই সে বলে ফেলল,—'বাছা বানমাছ হল পৃথিবীর সেরা। খেয়েই দেখো না একবার।'

শ্রীমতী ফোর্বস্ শান্ত স্বরে এবং সহানুভূতিহীন ভঙ্গিতে আমাদের বলতে শুরু করলেন,—'প্রাচীনকালে বানমাছ ছিল রাজারাজড়াদের খাবার। এই মাছ খেলে অস্বাভাবিক রকমের সাহস সঞ্চারিত হত বলে যোদ্ধারা বানমাছ নিয়ে রীতিমতো লড়াই করত।' এবার তিনি বলতে শুরু করলেন এই ক'দিনে

বহুবার বলা সেই আপ্তবাক্য,—'সুরুচি কোনও জন্মগত গুণ নয়। আবার যে কোনও বয়সে তা আয়ত্তও করা যায় না। একমাত্র ছোটবেলাতেই তা শেখানো যায়। সুতরাং বানমাছ খেতে না চাওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।' কোনও কিছু না জেনেই আমি কেন যে বানমাছ খেয়েছিলাম, এই প্রশ্ন চিরকাল রয়ে গেছে আমার মনে। বানমাছ খেতে শুরু করলেও দরজার ফ্রেমে লটকে থাকা মোলায়েম এবং বিষণ্ণ চেহারার প্রাণীটির স্মৃতি ভীষণভাবে আমার খাওয়ায় বাধ সাধছিল। আমার ভাই অনেক কষ্টে প্রথম গ্রাসটি মুখে তুললেও সহ্য করতে না পেরে, সঙ্গে সঙ্গেই বমি করে ফেলল।

'তাড়াতাড়ি ওদিকে যাও',—স্নানঘরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে নিস্পৃহভাবে বললেন শ্রীমতী ফোর্বস্। 'ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে আবার খেতে এসো।'

ভাইয়ের জন্যে আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল। সন্ধ্যার প্রথম ছায়াঘন অন্ধকারে পুরো বাড়ি পেরিয়ে স্নানঘরে গিয়ে ধোয়াধুয়ির জন্যে একা একা সময় কাটানো যে কিরকম ভয়ংকর তা আমার অজানা নয়। কিন্তু ভাই ধোয়ামোছার কাজটা চটপট সেরে জামা পালটিয়ে চলে এল। ওকে একটু ফ্যাকাশে লাগছিল। কোনও এক অজানা আশঙ্কায় বেচারি বেশ বিচলিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে শ্রীমতী ফোর্বসের কড়া নজর এড়িয়ে ও চেয়ারে বসে পড়ল। শ্রীমতী ফোর্বস্ মাছের এক টুকরো কেটে নিয়ে আমাদেরও তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। অতি কষ্টে দ্বিতীয় গ্রাসটাও মুখে তুললাম। ভাই তো আর ছুঁয়েও দেখল না।

'আমি খাব না',—ও এত দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি জানাল যে শ্রীমতী ফোর্বস্ আর অগ্রাহ্য করতে পারলেন না।

শ্রীমতী ফোর্বস্ রায় দিলেন,—'ঠিক আছে, ডেসার্টও পাবে না।'

ভাইয়ের দৃঢ়তায় আমিও সাহস সঞ্চয় করলাম। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে যেভাবে প্লেটের ওপর কাঁটা আর ছুরি আড়াআড়ি করে রাখতে হয় বলে শ্রীমতী ফোর্বস্ শিখিয়েছিলেন, সেভাবেই কাঁটা আর ছুরি রেখে বললাম,—'আমিও ডেসার্ট খাব না।'

'তোমাদের টিভি দেখতে দেওয়া হবে না',—তিনি হুমকি দিলেন।

'আমরা টিভি দেখব না',—জবাবে আমি বললাম।

শ্রীমতী ফোর্বস্ টেবিলের ওপর ন্যাপকিন রাখলেন। তিনজনেই প্রার্থনার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। প্রার্থনা শেষ হলে আমাদের তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বললেন। কারণ, তাঁর খাওয়া শেষ হতে সময় লাগবে। আমাদের জমা হওয়া সব পয়েন্ট বাতিল হয়ে গেল। কুড়ি পয়েন্টের লক্ষ্য অনেক দূরে, একেবারে আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেল। ক্রিম টার্ট, ভ্যানিলা পাই অথবা প্লাম প্যাস্ট্রির মতো সুস্বাদু ডেসার্ট খাবার সুযোগ আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেল। কারণ, কুড়ি পয়েন্ট পেরোতে না পারলে এসব ডেসার্ট খাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যায় না।

আসলে একদিন না একদিন শ্রীমতী ফোর্বসের সঙ্গে সংঘাতটা অবশ্যম্ভাবী ছিল! সিসিলির প্রত্যন্ত দক্ষিণের পানতেলারিয়া দ্বীপে স্বাধীনভাবে গরমের ছুটি কাটানোর জন্যে আমরা পুরো এক বছর উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। মা-বাবা প্রথম মাসটায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। রৌদ্রস্নাত আগ্নেয়শিলার উপত্যকা, শাশ্বত সাগর, ইটের গাঁথনি পর্যন্ত পুরু চুনের আস্তরণ দেওয়া রঙিন ঘরবাড়ি এখনও স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। বাতাসবিহীন রাতে জানালা দিয়ে দেখা যেত আফ্রিকার লাইটহাউস থেকে ভেসে আসা আলোকরশ্মির কাটাকুটি খেলা। দ্বীপের চারদিকে লুকোনো গভীর খাদে বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম দ্বি ীয় বিশ্বযুদ্ধে ডুবে যাওয়া সার দিয়ে সাজানো একগুচ্ছ টর্পেডো। সেখান থেকে প্রায় এক মিটার উঁচুতে প্রস্তরীভূত মালা পরানো একটা গ্রিক ঘরানার কুঁজোও উদ্ধার করেছিলাম, যার তলায় তলানি হিসেবে পড়েছিল বহু পুরোনো খানিকটা বিষাক্ত মদ। আমরা যে জমা জলে স্নান করছিলাম তা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। জলটা এত ঘন যেন তার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়। অবশ্য ওখানে আমাদের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার,— ফুলভিয়া ফ্লামিনিয়া। সুখী বিশপের মতো দেখতে ফুলভিয়া ফ্লামিনিয়াকে সবসময় ঘিরে থাকত একদল ঘুমকাতুরে বিড়াল। ওগুলো তার

চলাফেরায় অনবরত বাধা সৃষ্টি করত। তার মতে বিশেষ কোনও প্রীতির জন্যে নয়, ইঁদুরের হামলা থেকে বাঁচার জন্যেই বিড়ালগুলোকে সহ্য করতে হয়। রাতের দিকে মা-বাবা টিভিতে বড়দের অনুষ্ঠান দেখতে বসার পর ফুলভিয়া ফ্লামিনিয়া আমাদের নিয়ে যেত তার বাড়িতে। দুটো বাড়ির মধ্যে দূরত্ব একশো মিটারের থেকেও কম। নিজের বাড়িতে বসে সুদূর তিউনিসিয়ার প্রান্তর থেকে ভেসে আসা বাতাসের গুঞ্জন থেকে গানের সুর আর কান্নার ধ্বনি ফুলভিয়া ফ্লামিনিয়া চিনতে শিখিয়েছিল আমাদের। ফুলভিয়ার স্বামী বয়সে তার থেকে অনেক ছোট। দ্বীপের অপর প্রান্তে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে আসা পর্যটকদের হোটেলে কাজ করার জন্যে ফুলভিয়ার স্বামী বেশি রাতে শুধু ঘুমোবার জন্যে বাড়ি ফিরত। খানিকটা দূরে নিজের মা-বাবার সঙ্গে থাকত ওরেস্তে। সদ্য ধরে আনা বড় বড় চিংড়ি আর অন্যান্য মাছ ঝুড়িতে করে ও নিয়মিত রাতের বেলায় নিয়ে এসে ফুলভিয়াদের রান্নাঘরে রেখে যেত, যাতে পরের দিন সকালে ফুলভিয়ার স্বামী সেগুলো হোটেলে বিক্রি করতে পারে। তারপর ওর ডুবুরির মুখোশের টর্চ জ্বালিয়ে পাহাড়ি ধেড়ে ইঁদুর শিকার করতে আমাদের নিয়ে যেত। খরগোশের মতো বড় বড় ইঁদুরগুলো রান্নাঘরের এঁটোকাঁটা খেতে আসত। অনেক সময়ই মা-বাবা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমরা বাড়ি ফিরতাম। উঠোনে ফেলে রাখা খাবারের উচ্ছিষ্ট নিয়ে ইঁদুরদের কামড়াকামড়ির শব্দে আমাদের পক্ষে নিশ্চিন্তে ঘুমোনো কষ্টকর হত। এইসব অসুবিধাকে আমাদের সুখকর গরমের ছুটির এক মোহময় উপকরণ হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম।

আমাদের জন্যে জার্মান গভর্নেস রাখার সিদ্ধান্ত একমাত্র বাবার পক্ষেই নেওয়া সম্ভব। ক্যারিবিয়ান এলাকার লেখক হিসেবে তিনি যতটা বড়াই করতেন তাঁর ততটা প্রতিভা ছিল না। আমার ধারণা,—ইয়োরোপের গৌরবের তলানি নিয়ে মোহাচ্ছন্ন আমার বাবা সবসময় তাঁর লেখায় ও নিজের জীবনে স্বকীয়তার পরিচয় স্বীকার করতে কুণ্ঠিত বোধ করতেন। আর ছেলেদের মন থেকে নিজের অতীতের সব চিহ্ন মুছে ফেলার এক অলীক বাসনা তিনি পোষণ করতেন। গুয়াহিরা-র মালভূমি এলাকায় ভ্রাম্যমাণ শিক্ষিকার কাজ করার জন্যে আমাদেব মা নিজেকে অকিঞ্চিৎকর মনে করতেন। ফলে স্বামীর যে কোনও সিদ্ধান্তকেই অভ্রান্ত ও সকলের মঙ্গলের জন্যে বলে মনে করতেন তিনি। সুতরাং জার্মানির ডর্টমুন্ড প্রদেশের এক সার্জেন্টের হাতে আমাদের কী অবস্থা হতে পারে, এমন প্রশ্ন তাঁদের মাথায় আসেনি। ইয়োরোপীয় সমাজেব বস্তাপচা আদবকায়দা জোর করে রপ্ত করানোর ফলে আমাদের অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে কোনও চিন্তা-ভাবনা না করে মা-বাবা রওনা দিলেন আজিয়ান সাগরের দ্বীপমালার উদ্দেশ্যে। ওখানে তখন চল্লিশজন লেখকের উপস্থিতিতে পাঁচ সপ্তাহব্যাপী এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল।

পালেরমো থেকে জুলাই মাসের শেষ শনিবারের ফেরি নৌকায় চড়ে শ্রীমতী ফোর্বস্ এসে পৌঁছোলেন। প্রথম দর্শনেই বোঝা গেল আমাদের উৎসবের দিন শেষ। পায়ে ফৌজি বুটজুতো, দুপুরের প্রচণ্ড গরমে গলাবন্ধ পোশাক পরিহিত শ্রীমতী ফোর্বসের মাথায় চাপানো ফেল্ট টুপির নিচে ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে কাটা চুল আর গায়ে বাঁদরের পেচ্ছাপের গন্ধ। বাবা আগেই বলেছিলেন,—ইয়োরোপীয়দের গা থেকে গরমকালে এরকম গন্ধ বেরোয়। এটা সভ্যতার গন্ধ।' পরনে পরিচ্ছন্ন ফৌজি পোশাক থাকলেও শ্রীমতী ফোর্বস্ কিন্তু নিতান্তই নোংরা। আমাদের বয়স একটু বেশি হলে এবং তাঁর হৃদয়ে একটু স্নেহ-দয়া-মায়া থাকলে এত কিছু সত্ত্বেও তাঁর জন্যে আমরা কিঞ্চিৎ করুণা করতে পারতাম। তবে তাঁর আসার মুহূর্তে সবকিছুই পালটিয়ে গেল। গরম শুরুর সময়েই ভেবে রেখেছিলাম দিনে ঘণ্টা ছয়েক করে সাগরে কাটাব। শ্রীমতী ফোর্বস্ তা এক ঘণ্টায় নামিয়ে আনলেন। অর্থাৎ প্রতিদিন যে সময়টা সমুদ্রে কাটানোর ইচ্ছা ছিল তা তিনি ছ' দিনে ভাগ করে দিলেন। মা-বাবা যখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন তখন আমরা বহুক্ষণ ধরে সাঁতার কাটতাম। শুধু একটা ছুরি হাতে নিয়ে দুঃসাহস আব কৌশলকে হাতিয়ার করে কালি আর রক্তে ঘোলাটে হয়ে যাওয়া অক্টোপাসদের মুখোমুখি হয়ে ওরেস্তো যে সব কাণ্ডকারখানা ঘটাত তা আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখতাম। বেলা এগারোটা নাগাদ ও মোটরবোট চালিয়ে আসত। কিন্তু শ্রীমতী ফোর্বস্ জলের তলায় সাঁতার শেখার জন্যে ওকে বাড়তি এক মুহূর্তও আমাদের

সঙ্গে থাকতে দিতেন না। বাড়ির পরিচারিকার সঙ্গে মেলামেশা একেবারেই অনুচিত বলে রাতে ফুলভিয়া ফ্লামিনিয়ার বাড়িতে যাওয়াও নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ইঁদুর শিকার করে হল্লা করার সময়টা নির্ধারিত হয়ে গেল শেকস্‌পিয়রের রচনার বিশ্লেষণমূলক পাঠের জন্যে। অন্যের বাগানের আমগাছ থেকে আম চুরি বা গুয়াকামাল-এর রাস্তায় ঢিল ছুঁড়ে কুকুর মারার কাজে অভ্যস্ত আমাদের দু'ভাইয়ের পক্ষে শ্রীমতী ফোর্বসের আরোপ করা নিয়মানুবর্তিতা থেকে যন্ত্রণাপূর্ণ অন্য কিছু কল্পনা করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল।

তবে কিছুদিনের মধ্যেই আমরা লক্ষ করলাম শ্রীমতী ফোর্বস্ আমাদের বিষয়ে যতখানি কড়া নিজের সম্বন্ধে কিন্তু মোটেও তেমন নন। এটা বুঝে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ওপর তাঁর কর্তৃত্বের ফাটল ধরতে শুরু করল। ওরেস্তে যখন জলের নিচে আমাদের ডুব সাঁতার শেখাত সেইসময় বেলাভূমিতে রঙিন ছাতার তলায় বসে ফৌজি পোশাক পরিহিত শ্রীমতী ফোর্বস্ পড়তেন শিলারের প্রেমসংগীত। তারপরে দুপুরে খাওয়ার সময়টুকু ছাড় দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একনাগাড়ে তিনি ভদ্রসমাজের শিষ্টাচার সম্পর্কে ভাষণ দিয়ে যেতেন।

মোটরবোটে চড়িয়ে হোটেলের লাগোয়া পর্যটকদের দোকানগুলোয় নিয়ে যাওয়ার জন্যে একদিন ওরেস্তোকে অনুরোধ করলেন শ্রীমতী ফোর্বস্। সিলমাছের চামড়ার মতো কালো এবং ঘন ঘন রং বদলায় এমন একটা সাঁতারের পোশাক হাতে করে ফিরে এলেন তিনি। অবিশ্যি ওটা পরে তিনি কোনওদিনই জলে নামেননি। বালুকাবেলায় তিনি যখন রৌদ্রস্নান করতেন আমরা তখন সাঁতাব কাটতাম। গা না ধুয়েই সরাসরি তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছতেন। সেইজন্যেই দিন তিনেকের মধ্যেই তাঁকে সেদ্ধ করা চিংড়িমাছের মতো দেখাত। তাঁর শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়া সভ্যতার উৎকট গন্ধে আমাদের প্রায় দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

রাতে তাঁর ঘুম হত না। যেদিন থেকে তিনি আমাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেদিন থেকেই আমাদের মনে হত অন্ধকার বাড়িতে কেউ যেন হাত দোলাতে দোলাতে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ফুলভিযা ফ্লামিনিয়ার কাছ থেকে অনেকবার শোনা জলে ডুবে মরে যাওয়া মানুষের প্রেতাত্মাবা ঘুরে বেড়াচ্ছে ভেবে আমার ভাই ভয়ে আঁতকে উঠত। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা আবিষ্কার করলাম রাতের চলমান প্রাণীটি শ্রীমতী ফোর্বস্ ছাড়া অন্য কেউ নয়। রাতে তিনি সত্যি সত্যিই এক নিঃসঙ্গ মহিলার জীবনযাপন করতেন। রাতের কার্যকলাপ নিশ্চয়ই তাঁর দিনের সত্ত্বার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। একদিন ভোরবেলায় নজরে এল তিনি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে অপূর্ব ডেসার্ট তৈরি করছেন। তাঁর পরনে ছোটখাটো একটা রাতপোশাক। সারাটা শরীর, এমনকি মুখ পর্যন্ত পাউডারে মাখামাখি। এক গেলাস পোর্ত মদে চুমুক দিতে দিতে তিনি এমন মনোবিকার প্রকাশ করছিলেন যা দেখলে তাঁর অপর সত্ত্বা নিশ্চয়ই শিউরে উঠত। এই দৃশ্যটা দেখার পরেই জানতে পারলাম আমাদের ঘুমোতে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি কিন্তু নিজের বিছানায় যান না। লুকিয়ে চলে যেতেন সাঁতার কাটতে বা গভীর রাত পর্যন্ত নিজের তৈরি ফ্রুট পাই তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে টিভিটাকে শব্দহীন করে দিয়ে দেখতেন প্রাপ্তবয়স্কদের চ্যানেল। বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যে বাবা যে সব মদের বোতল সযত্নে সরিয়ে রাখতেন সেগুলি থেকেও মদ্যপান করতে তিনি ছাড়া দিতেন না। কৃচ্ছ্রসাধন এবং সংযম সম্বন্ধে তাঁর নিজের দেওয়া উপদেশের বিরুদ্ধাচারী এক অবাধ্য অনুভূতির তাড়না প্রতিহত করার জন্যে তাঁকে অবিরাম লড়াই চালাতে হত। পরে নিজের ঘরে বসে একা একা কথা বলতেও দেখা যেত তাঁকে। সুরেলা জার্মান ভাষায় তিনি 'ডি ইয়ুংফ্রাউ ফন্ ওরলীন্স'-এর অংশ বিশেষ সরবার আবৃত্তি করতেন। কোনও কোনও দিন ভোরের আলো ফুটে ওঠার সময় পর্যন্ত তাঁর গান শোনা যেত। বিছানায় শুয়ে তাঁর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজও পাওয়া যেত। সেইসব সকালে প্রাতরাশের সময় যখন তিনি খাওয়ার টেবিলে এসে বসতেন তখন তাঁর চোখ-মুখ ফুলে থাকত। তাঁর মুখের আদল এইভাবে উত্তরোত্তর করুণ হতে লাগল আর বাড়তে থাকল তাঁর শাসনের কড়াকড়ি। তখনকার মতো অসুখী আমরা আর কখনও বোধ করিনি। মেনে নিয়েছিলাম যে শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে সহ্য করতে হবে। কারণ, আমরা যাই করি না কেন শেষ পর্যন্ত তাঁর কথাই

টিকে যাবে। তবে আমার ভাইয়ের একগুঁয়ে জেদি স্বভাবের জন্যে প্রায়ই লেগে যেত ওদের খটাখটি। সবমিলিয়ে অসহনীয় হয়ে উঠল আমাদের গ্রীষ্মাবকাশ। বানমাছের ঘটনাটায় আমাদের সঙ্গে শ্রীমতী ফোর্বসের সংঘাত পৌঁছে গেল চরম সীমায়। সেদিন রাতে নিস্তব্ধ বাড়িতে তাঁর বিরামহীন পদচারণার শব্দ শুনতে শুনতে মনের মধ্যে জমে থাকা যাবতীয় ঘৃণা প্রকাশ করে বসল আমার ভাই।

সে বলল,—'আমি ওকে খুন করব।'

ওর এই সিদ্ধান্তে আমি যতটা না অবাক হলাম তার থেকেও অনেক বেশি আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে নৈশভোজ পর্ব চুকে যাওয়ার পর থেকে আমিও হেলাফেলা করে এই কথাটা নিয়েই চিন্তা করছিলাম। তবুও মুখে আমার ভাইকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে বললাম,—'তোমার মাথা কেটে নেবে।'

উত্তরে ও জানাল,—'সিসিলিতে গিলোটিন নেই। তাছাড়া হত্যাকারীকে কেউ চিনতে পারবে না।'

সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে আনা কুঁজোটার কথা ও ভাবছিল। যার মধ্যে তখনও ছিল বিষাক্ত মদের অবশেষ। বিষের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্যে বাবা কুঁজোটা সাবধানে সরিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর মতে পুরোনো হয়ে গেলেই মদ বিষিয়ে যেতে পারে না। শ্রীমতী ফোর্বস্‌কে হত্যা করার জন্যে এই মদ ব্যবহার করা হলে কেউ সন্দেহ করবে না যে দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা জনিত কারণে মৃত্যুটা ঘটেনি। অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণের ফলে ক্লান্ত হয়ে শ্রীমতী ফোর্বস্ ঘুমিয়ে পড়ার পরে একদিন ভোরবেলায় আমরা কুঁজোটা থেকে বিষাক্ত মদের তলানি মিশিয়ে দিলাম বাবার বিশেষ মদের বোতলে। পরে জানা যায় যে পরিমাণ বিষাক্ত মদের তলানি মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা একটা ঘোড়ার মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট। ঠিক ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতী ফোর্বস্ প্রাতরাশ হিসেবে পরিবেশন করলেন ছোট ছোট মিষ্টি রুটি। ফুলভিয়া ফ্লামিনিয়া খুব ভোরে ওগুলো ওভেনে তৈরি করে রেখে গিয়েছিল। বোতলে বিষাক্ত মদ মিশিয়ে দেওয়ার দিন দুই পরে হতাশ হয়ে ভাই আমায় দেখাল আলমারিতে রাখা বোতলটা তখনও ছোঁয়া হয়নি। এটা কোনও এক শুক্রবারের কথা। সপ্তাহান্তেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না। মঙ্গলবার রাতে টিভিতে অশ্লীল অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে শ্রীমতী ফোর্বস্ বিষাক্ত মদের বোতলের অর্ধেকটা শেষ করে দিলেন।

বুধবার সকালে অন্যান্য দিনের মতো ঠিকসময়েই প্রাতরাশের জন্যে চলে এলেন খাবার টেবিলে। অন্যদিনের মতোই মুখচোখে অনিদ্রার ছাপ। চশমার পুরু কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সদা উদ্বিগ্ন এক জোড়া চোখ। রুটির ঝুড়িতে রাখা জার্মানির ডাকটিকিট সাঁটা একটা খাম দেখে তাঁর চোখ দুটো আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কফি খেতে খেতে চিঠি পড়তে শুরু করলেন। যদিও এমনটা করতে বহুবার বারণ করেছিলেন আমাদের। পড়ার সময় চিঠিতে লেখা শব্দের থেকে বিচ্ছুরিত আলোর ঝলক তাঁর মুখের ওপর খেলে যাচ্ছিল। চিঠি পড়া শেষ হলে খাম থেকে ডাকটিকিটগুলো ছিঁড়ে নিয়ে রুটির ঝুড়িতে রেখে দিলেন। ওগুলো ফুলভিয়া ফ্লামিনিয়ার স্বামীর জন্যে রাখা হল। সকালের বিরূপ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও জলের তলায় অভিযানের জন্যে আমাদের সঙ্গে বেরোলেন। জলের তলায় সাঁতরাতে সাঁতরাতে অগভীর এলাকায় পৌঁছোনোর পর অক্সিজেনের ট্যাঙ্কে টান পড়তে শুরু করল। শিষ্টাচারের পাঠ ছাড়াই সেদিন আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। সারাটা দিনই কুমারী ফোর্বস্ ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন। আর নৈশভোজের সময় তো তাঁকে আগের থেকেও চনমনে মনে হচ্ছিল। আমার ভাই আর হতাশা চেপে রাখতে পারছিল না। খাওয়া শুরুর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আপত্তিজনক ভঙ্গি করে ও সরিয়ে রাখল বিনের স্যুপ। 'এসব বাজে জিনিস আমি খাই না।'

খাওয়ার টেবিলে যেন বোমা ফাটল। আবহাওয়া হালকা না হওয়া পর্যন্ত শ্রীমতী ফোর্বসের মুখ ফ্যাকাশে আর ঠোঁট শক্ত হয়ে থাকল। তাঁর চশমার কাচ কান্নায় ঝাপসা হতে শুরু করল। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে নিয়ে ন্যাপকিন দিয়ে মুছে রেখে দিলেন টেবিলের ওপর। তারপর অসম্মানজনক পরাজয়ের তিক্ততা প্রকাশ করে বললেন,—'তোমাদের যা ইচ্ছা, তা-ই করো।'

সন্ধে সাতটা নাগাদ তিনি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। প্রায় মাঝ রাতে আমাদের নজরে এল তিনি আধখানা চকোলেট আর বিষাক্ত মদের বোতলটা নিয়ে খাওয়ার ঘরের থেকে বেরিয়ে চলেছেন

নিজের ঘরের দিকে। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। তাঁর পরনে কিশোরীদের মতো ছোটখাটো রাতপোশাক। বোতলে তখনও আঙুল চারেক বিষাক্ত মদ রয়েছে। তাঁর জন্যে করুণাবশত আমার হৃৎকম্প শুরু হল।

'বেচারি শ্রীমতী ফোর্বস্',—নিজের অজ্ঞান্তেই আমি বলে ফেললাম।

আমার ভাইও নিশ্চিন্ত হয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না। সে বলে উঠল,—'আজ রাতে মারা না গেলে আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে।'

সারা রাত ধরে তিনি আপন মনে উন্মাদের মতো অনেক কথা বলে গেলেন। উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করে গেলেন শিলারের কবিতা আর সবশেষে তারস্বরে চিৎকার করে সারা বাড়ি মাতিয়ে তুললেন। এরপর এল গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ, যা কোনও দিশাহীন নৌকোর তীক্ষ্ণ হুইসলের মতো একটানা বাজার পর আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে গেল। রাত্রি জাগরণ এবং মানসিক টানাপোড়েনের ক্লান্তি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরেও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আসা সূর্যের তীব্র রশ্মি যেন ছুরির ফলার মতো আমাদের গায়ে এসে বিঁধছে। আর চারপাশের হালচাল দেখে মনে হচ্ছে ঘরটা কোনও পুকুরের তলায় তলিয়ে গেছে। তখনই প্রথম লক্ষ করলাম দশটা বাজতে চলেছে এবং শ্রীমতী ফোর্বস্ আমাদের ঘুম ভাঙাতে আসেননি। আটটা নাগাদ স্নানঘর বা মুখ ধোয়ার বেসিনে জল পড়ার আওয়াজ আমাদের কানে আসেনি। ঘোড়ার নাল লাগানো বুট জুতো বা ক্রীতদাস কারবারিদের মতো হাতের তালু দিয়ে দরজায় তিনবার সশব্দে চাপড় মারার আওয়াজও শোনা যায়নি। নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমার ভাই দেওয়ালে কান ঠেকিয়ে পাশের ঘরের সাড়াশব্দ শোনার চেষ্টা করছে। পরীক্ষা শেষ করার পর নিঃশ্বাস ফেলে ও উল্লসিত হয়ে বলল,—'যা চাইছিলাম, ঠিক তাই। সমুদ্র ছাড়া আর কোনও কিছুর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।'

এগারোটার একটু আগে নিজেরাই আমাদের প্রাতরাশ তৈরি করে খেয়ে নিলাম। একপাল বিড়াল নিয়ে ফুলভিয়া ফ্লামিনিয়া আমাদের বাড়ি-ঘর-দোর পরিষ্কার করতে আসার আগেই আমরা দু'ভাই দুটো করে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক নিয়ে সমুদ্রের ধারে রওনা দিলাম। সঙ্গে নেওয়া হল আরও দুটো বাড়তি ট্যাঙ্ক। ওরেস্তে তখন জেটিতে বসে সদ্য ধরে আনা একটা পাঁচ-ছ' পাউন্ড ওজনের বিশাল মাছকে কেটেকুটে নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। ওরেস্তেকে জানালাম যে আমরা বেলা এগারোটা পর্যন্ত শ্রীমতী ফোর্বসের ঘুম ভাঙার জন্যে অপেক্ষা করে নিজেরাই সমুদ্রের দিকে রওনা দিয়েছি। ওরেস্তেকে আরও বললাম যে গতরাতে খাওয়ার টেবিলে বসে তিনি অঝোরধারায় কাঁদছিলেন। সেই কারণেই হয়তো তাঁর ভালো ঘুম হয়নি এবং তিনি বিশ্রাম নিতে চাইছেন। আমাদের ধারণাকে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে ওরেস্তো এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আমাদের সঙ্গে জলের তলায় তোলপাড় করে বেড়াল। তারপর আমাদের জল থেকে উঠে পড়ার নির্দেশ দিয়ে নিজে ছোট মোটর বোট চড়ে মাছ বিক্রি করতে চলে গেল পর্যটকদের হোটেলের দিকে। বাঁধের আড়ালে তার অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত আমরা পাথরের সিঁড়ি থেকে হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাতে থাকলাম যাতে সে ভাবে আমরা বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। সে অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কারও অনুমতির অপেক্ষা না করে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক পিঠে লাগিয়ে নিয়ে আমরা আবার সাঁতার কাটতে শুরু করে দিলাম।

মেঘলা দিন, দিগন্তে কালো মেঘের আড়ালে বজ্র নির্ঘোষ। শান্ত ও স্বচ্ছ সমুদ্র নিজের আলোয় উদ্ভাসিত। পানতেলারিয়ার লাইটহাউস পর্যন্ত জলের ওপর সাঁতার কেটে ডানদিকে একশো মিটারের মতো বাঁক নিয়ে হিসেব করে জলের তল ডুব দিলাম যেখানে গ্রীষ্মের সূচনালগ্নে একগুচ্ছ জঙ্গি টর্পেডো দেখা গিয়েছিল। উজ্জ্বল হলুদ রঙের ছ'টি টর্পেডো। তাদের ক্রমিক সংখ্যাগুলোও অবিকৃত। নিখুঁত শৃঙ্খলায় টর্পেডোগুলি এমনভাবে পরপর সাজানো ছিল যা নিজে থেকে ঘটতে পারে বলে মনে হল না। এবার জলমগ্ন সেই শহরের সন্ধানে লাইটহাউসের চারপাশে সাঁতরে বেড়ালাম। ফুলভিয়া ফ্লামিনিয়া অনেক আগ্রহ নিয়ে এই শহরটার কথা আমাদের বলেছিল। অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত শহরটার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। ঘণ্টা দুয়েক বাদে যখন মনে হল আর নতুন কোনও রহস্য উদ্ঘাটনের

কাজ বাকি নেই তখন শেষবারের মতো অক্সিজেন ট্যাঙ্কে নিঃশ্বাস নিয়ে জল থেকে উঠে এলাম।

আমাদের সাঁতার কাটার সময় গরমকালের স্বাভাবিক ঝড় ওঠায় সমুদ্র অশান্ত হয়ে পড়ে। একঝাঁক পাখি হিংস্র চিৎকার করতে করতে মাংসের লোভে সমুদ্রের তীরে ভেসে আসা মৃতপ্রায় মাছগুলির ওপর চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শ্রীমতী ফোর্বস্ সঙ্গে না থাকায় জীবনকে মনে হচ্ছিল রীতিমতো সুন্দব আর বিকেলের ঢলে পড়া সূর্যালোককে লাগছিল একেবারে নতুন। এতকিছু সত্ত্বেও বাঁধের সিঁড়ি দিয়ে কষ্ট করে উপরে ওঠার পর নজরে এল বাড়িব সামনে অনেক লোকের ভিড় আর সদরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু'টো পুলিশের গাড়ি। ঠিক তখনই খেয়াল হল আমরা কী করেছি। আমার ভাই তো ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। ও ফিরে যেতে চাইল।

'আমি ভেতরে ঢুকব না',—ও বলল।

আমার মাথাও যে ঠিকমতো কাজ করছিল তা নয়। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যে বাড়ির ভেতরে গিয়ে আমাদের মৃতদেহটা দেখা দবকার যাতে আমাদের কেউ সন্দেহ না করে।

'ব্যাপারটাকে সহজভাবে মেনে নেওয়া দরকার',—আমি পরামর্শ দিই। 'বড় করে নিঃশ্বাস নে আর একটা কথা খেয়াল রাখিস যে এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।'

আমাদের দিকে কেউ তাকাল না। দরজার সামনে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক, ডুবুরির মুখোশ এবং সাঁতার কাটাব যাবতীয় সাজসরঞ্জাম নামিয়ে রেখে পাশের করিডর দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ক্যাম্পখাটের পাশে মেঝেতে বসে দু'জন সৈন্য সিগারেট খাচ্ছে। পিছনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা অ্যাম্বুলেন্স আর বন্দুক হাতে কয়েকজন সৈন্য। বসার ঘরের দেওয়ালের পাশে পাড়ার মহিলারা সমবেত হয়ে দক্ষিণ ইতালির নিজস্ব উপভাষায় প্রার্থনা করে চলেছেন আব তাঁদের স্বামীরা এমন কোনও বিযয নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা করছিলেন যা এই মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত নয়। ভাইয়ের হিমশীতল হাত শক্ত করে চেপে ধরে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকলাম বাড়ির ভেতর। আমাদের শোওয়ার ঘরের দরজা তখনও খোলা আব ঘবের ভেতরের অবস্থা সকালে আমরা যেমন বেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনি রয়েছে। পরের ঘরটাই শ্রীমতী ফোর্বসের। খোলা দরজার সামনে পাহারায় রয়েছে একজন বন্দুকধারী সৈন্য। ভয়ে ভয়ে দুরু দুরু বক্ষে ঘরটার ভেতরে উঁকি মারতে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ফুলভিয়া ফ্লামিনিয়া বান্নাঘব থেকে বিদ্যুতের মতো ছিটকে বেরিয়ে এসে ভয়ার্ত চিৎকার করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

'ভগবানের দোহাই, এই দৃশ্য দেখো না।'

ততক্ষণে বেলা গড়িয়ে প্রায় সন্ধে হতে চলেছে। ক্ষণেকের জন্যে সেদিন যা দেখেছিলাম সারা জীবনেও তা ভুলতে পারিনি। দু'জন সরকারি কর্মচারী একটা ফিতে দিয়ে খাট থেকে দেওয়ালের দূরত্ব মাপছিলেন আর একজন লোক পেশাদার ফোটোগ্রাফারের মতো কালো কাপড়ের ভেতর মাথা গলিয়ে ছবি তুলছিলেন। লণ্ডভণ্ড বিছানায় শ্রীমতী ফোর্বস্‌কে দেখা গেল না। তাঁকে বিছানা থেকে টেনে মেঝেতে নামানো হয়েছে। অজস্র ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত তাঁর নগ্ন শরীরের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা শুকনো রক্তে লাল হয়ে গেছে ঘরের মেঝে। প্রচণ্ড উন্মাদনায় কেউ তাঁকে ছুরি দিয়ে সাতাশবার মারাত্মক আঘাত করেছিল। অতৃপ্ত প্রেমই যে এই হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ, তা সকলের কাছে স্পষ্ট। সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় কোনওরকম চিৎকার বা কান্নার আওয়াজ না করে, সৈনিকের মতো সুন্দর কণ্ঠে শিলারের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে এই গ্রীষ্মকালে এটাই যেন তাঁর সুখের অনিবার্য প্রাপ্তি এমন কিছু ভেবে নিয়ে তীব্র আকুতিতে ফোর্বস্ মেনে নিয়েছিলেন চূড়ান্ত আঘাত।

মূল শিরোনাম El verano feliz de la señora Forbes

তুষারে তোমার রোহিতরেখা

গোধূলি বেলায় ওরা পৌঁছে গেল দেশের সীমানায়। ঠিক তখনই নিনা দাকঁতে টের পেল—বিয়ের আংটি পরা হাতের আঙুল থেকে রক্ত ঝরেই চলেছে। একটা খসখসে উলের কম্বলে পেটেন্ট চামড়ার তেকোনা টুপি ঢেকে অসামরিক রক্ষীটি কার্বাইড লণ্ঠনের আলোয় ওদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করছিল। পিরেনিজ পর্বতমালার ও'পাশ থেকে বয়ে আসা ঝোড়ো বাতাসের মুখে সে কোনওরকমে দাঁড়িয়ে থাকার সাধ্যমতো চেষ্টাও করে চলেছিল। দূতাবাস থেকে দেওয়া পাসপোর্টের ফোটোর সঙ্গে ওদের মুখের মিল মিলিয়ে দেখার জন্য সে লণ্ঠনটা উঁচুতে তুলে ধরে। নিনা দাকঁতেকে একেবারে শিশুর মতোই দেখাচ্ছিল। সুখী পাখির মতো ওর চোখ। বিষণ্ণ জানুয়ারিতেও ওব গুড়ের রঙের ত্বক ক্যারিবিয়ান এলাকাব সূর্যের মতো ঝলমল করছিল। নেউলের চামড়ার কোট চিবুক পর্যন্ত ওকে ঢেকে রেখেছে। দেশেব পুরো সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক বছবের মাইনে দিযেও হয়তো কোটটার দাম মেটানো যাবে না। মেয়েটিব স্বামী বিলি সাঞ্চেস্ দে আভিলা গাড়ি চালাচ্ছিল। মেয়েটির থেকে সে এক বছরের ছোটো এবং মেয়েটিব মতোই সুদর্শন। তার পরনে লম্বা পশমি জ্যাকেট, মাথায় বেস্‌বল খেলার টুপি। তার দীঘল দেহ। চেহারাটাও খেলোয়াড়সুলভ। তবে মুখটা ভয় পাওয়া দস্যুর মতো কঠিন। মেয়েটির সঙ্গে তার চেহারার এইটুকুই পার্থক্য। তবে রুপোলি মোটর গাড়িটাই ওদের পরিচয়কে সবচেয়ে বেশি করে জাহিব করছিল। গাড়িব ভেতরকার সাজ-সজ্জা যেন জীবন্ত প্রাণীর মতোই শ্বাস ফেলছিল। অনাহাবতাড়িত এই সীমান্ত এলাকায় এমন বস্তু আগে কখনও কারও চোখে পড়েনি। গাড়ির পেছনেব সিটটায় বেশ কয়েকটা স্যুটকেস আর উপহাবের বাক্স অগোছালোভাবে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। বাক্সগুলোর মোড়ক পর্যন্ত খোলা হয়নি। চড়া সুরে বাঁধা যায় এমন একটা স্যাক্সোফোনও ওখানে পড়ে রয়েছে। সমুদ্র সৈকতে নরম মনেব মস্তানটার উদ্দাম প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণের আগে পর্যন্ত ওই যন্ত্রটাই ছিল নিনা দাকঁতের ক্লান্তিকর উন্মাদনার একমাত্র আশ্রয়।

রক্ষীটি স্ট্যাম্প লাগানো পাসপোর্ট দুটো ফেরত দেবাব সময় বিলি সাঞ্চেস্ তাকে জিজ্ঞেস করল নিনার আঙুলের চিকিৎসা করানোর জন্য ডাক্তাবখানা কোথায় পাওয়া যাবে। ঝোড়ো বাতাসের মধ্যে চিৎকাব করে রক্ষীটি ওদের ফ্রান্সের হেন্‌দাই এলাকায় বড় বড় গেলাস ভর্তি মদ নিয়ে তাস খেলতে ব্যস্ত। মাঝে মধ্যে মদের মধ্যে রুটি চুবিয়ে খাচ্ছে। খুঁজতে বলল। কিন্তু হেন্‌দাই-এ রক্ষীবা কাচের সুসজ্জিত এবং আলোকজ্জ্বল 'সেন্ট্রি বক্স'-এ বসে বড বড গেলাস ভর্তি মদ নিয়ে তাস খেলতে ব্যস্ত। মাঝে মধ্যে মদেব মধ্যে রুটি চুবিয়ে খাচ্ছে। তাদের গায়ে কোনও কোট বা জ্যাকেট নেই। গাড়ির চেহারা আব নির্মাতা কোম্পানির নামটা পডে নিয়েই তারা হাত নেড়ে ওদেব ফ্রান্সের মধ্যে এগোনোর অনুমতি দিয়ে দিল। স্টিয়াবিঙের ওপর ঝুঁকে পড়ে বিলি সাঞ্চেস্ কয়েকবার হর্ন বাজাল। তবে রক্ষীরা বুঝতেই পারেনি যে বিলি তাদের ডাকছে। আর তখনই জানালা খুলে বাতাসের চেয়েও বেশি ক্রুদ্ধ স্বরে তাদের একজন চিৎকাব করে বলে ওঠে,—'শুয়োরের বাচ্চা! কোথায় যাচ্ছিস, বল তো?'

নিনা দাকঁতে তখন কান পর্যন্ত ঢেকে গাড্ডি থেকে বেরিয়ে নিখুঁত ফরাসিতে ডাক্তারখানার হদিশ জানতে চাইল। মুখ ভর্তি রুটি নিয়ে অভ্যাসমাফিক রক্ষীটি মন্তব্য করে ডাক্তারখানার খবর জানা, বিশেযত এমন ঝড়ের রাতে, তার কাজ নয়। সে জানালাটাও বন্ধ কবে দিল। ঠিক তখনই পুরোপুরি তাব নজবে এল,—নেউলের চামড়ার চকচকে কোট পরা মেয়েটি কেটে যাওয়া আঙুলটা চুষছে। হয়তো মেয়েটাকে জড়িয়ে গোটা দৃশ্যটাই তার চোখে মায়াবী ঠেকল। আর তক্ষুনি তাব মেজাজটা বদলে গেল। সবিস্তারে সে বলে চলে সব থেকে কাছেব শহর বলতে সেই 'বিয়ারবিৎস'। কিন্তু গভীর শীতের এই রাতে, নেকড়ের

মতো গর্জন করে দাপিয়ে বেড়ানো বাতাসের মধ্যে বিয়াররিৎস থেকে সামান্য দূরের বেয়নে শহরের আগে কোনও ডাক্তারখানাই খোলা পাওয়া যাবে না।

'ব্যাপারটা কি গুরুতর?'—সে জিজ্ঞেস করল।

'তেমন কিছু নয়',—এক গাল হাসি ছড়িয়ে নিনা দাকঁতে বলল। হিরের আংটি পরা আঙুলটাও দেখাল তাকে। আঙুলের ডগায় প্রায় দেখাই যায় না, এমন একটা ক্ষত—গোলাপ ফুল থেকে কেটেছে। 'একটা কাঁটা ফুটেছে।'

বেয়নে শহরে পৌঁছোনোর আগেই শুরু হল তুষারপাত। তখন সন্ধে সাতটাও বাজেনি। কিন্তু রাস্তায় মানুষজন নজরে এল না। প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে সবাই ঘরে আগল দিয়ে বসে আছে। শহরের মধ্যে বেশ কয়েক পাক চক্কর মেরেও কোনও ডাক্তারখানা খুঁজে না পেয়ে তারা সোজা গাড়ি ছোটানোর সিদ্ধান্ত নিল। সিদ্ধান্তটা বিলি সাঞ্চেস্‌কে খুশি করল। দুর্লভ গোষ্ঠীর গাড়ির ওপর তার দুর্নিবার আকর্ষণ। তবে ছেলের খামখেয়ালি মানসিকতাকে মদত দিতে যেটুকু দরকার তার থেকে বেশি আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও বিলির বাবার মনোভাব কেমন যেন একটা অপরাধ পীড়িত। ফলে বিয়ের উপহার হিসেবে পাওয়া, প্রয়োজনে ছাদটা গুটিয়ে ফেলা যায়, এই বেন্ট্‌লে গাড়িটার মতো গাড়ি সে আগে কখনও চালায়নি। গাড়ির গতির ভেতর আবার নিবিষ্ট হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় বিলির তো তুরীয় অবস্থা। যত জোরে চালায় তত যেন তার ক্লান্তির মাত্রা কমে। সেই রাতেই ও বোরদিউ পৌঁছোতে চাইল। সেখানে 'হোটেল স্প্লেন্‌ডিড্'-এ নব-দম্পতিদের জন্য বিশেষভাবে সাজানো ঘরটা আগে থেকেই ভাড়া করা আছে। সমস্ত প্রতিকূল বাতাস আর আকাশ ভেঙে পড়া বরফের সাধ্য নেই যে বিলির পথ আটকায়। ওদিকে নিনা দাকঁতেকে ততক্ষণে অবসাদ ছেয়ে ফেলেছে। মাদ্রিদ থেকে বেরিয়ে আসা বড় রাস্তাটার শেষটুকু পার হওয়ার সময় বিশেষ করে নিনাকে আরও বেশি অবসন্ন মনে হচ্ছিল। খাড়া পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে যাওয়া রাস্তাটা পাহাড়ি ছাগল চরানোর জন্য অনেক বেশি যথার্থ। রাস্তাটায় তখন শিলাবৃষ্টির চাবুক পড়ছে। অবসন্ন থাকার জন্য বেয়নেতে গাড়ি পৌঁছোনোর পর যে আঙুল থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল তার ওপর খুব কষে রুমাল জড়িয়ে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল নিনা। মাঝরাতের কাছাকাছি কোনও এক সময়ে বিলি সাঞ্চেস্ লক্ষ্য করল তার বউ ঘুমোচ্ছে। বরফ পড়াও বন্ধ। পাইন বন দাপিয়ে বেড়ানো বাতাসটাও হঠাৎ থেমে গেছে। গোচারণভূমির ওপরের আকাশ উত্তর গোলার্ধের তুষারযুগীয় নক্ষত্রে ভরে গেছে। বোরদিউ-এর ঝিমিয়ে পড়া আলোর সারি পেরিয়ে গেল ওরা। তেলের ট্যাঙ্কটা ভরে নেওয়ার জন্য বড় রাস্তার পাশের একটা তেলের পাম্পিং স্টেশনে ওরা শুধু একবার থামল। কোথাও না থেমে প্যারিস অবধি ছুটে চলার শক্তি বিলির মধ্যে তখনও অবশিষ্ট। পঁচিশ হাজার পাউন্ডের বড় খেলনাটা নিয়ে বিলি এতই পুলকিত যে পাশেই ঘুমিয়ে থাকা উজ্জ্বল চেহারার প্রাণীটির মধ্যেও একইরকম আনন্দের অনুভূতি হচ্ছে কিনা, তা নিয়ে ওর মনে কোনও প্রশ্ন জাগেনি। মেয়েটির আঙুলের ব্যান্ডেজ ততক্ষণে রক্তে ভিজে গেছে। সেই প্রথম বিদ্যুৎ ঝলকের মতো এক অনিশ্চয়তা বোধ তার বয়ঃসন্ধির স্বপ্নকে বিদ্ধ করল।

দশ হাজার কিলোমিটার দূরের কারতাহেনা দে ইন্দিয়াস্-এ মাত্র তিন দিন আগে ওদের বিয়ে হয়েছে। ছেলেটার মা-বাবার সব সুখস্বপ্নই এর ফলে নষ্ট হয়ে যায়। আর্চবিশপ নিজে ওদের আশীর্বাদ করে গেছেন। ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ ধারণাই করতে পারেনি যে এই অচিন্তনীয় ভালোবাসার সঠিক ভিত্তি ও উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে। বিয়ের তিন মাস আগে, সমুদ্রের ধারে এক রবিবারে ব্যাপারটার সূত্রপাত। সেদিন মার্বেলা সৈকতে মেয়েদের জামা-কাপড় পালটানোর ড্রেসিং রুমে বিলি সাঞ্চেসের দল হানা দিয়েছিল। নিনা তখন সবে আঠারোয় পড়েছে। সুইজারল্যান্ডের সেন্ট ব্লেইজ-এর শাটেলেনি স্কুল ছেড়ে নিনা সদ্য বাড়ি ফিরেছে। যথার্থ মাত্রা বা টান ছাড়া চার-চারটে ভাষায় ও কথা বলতে পারে। চড়া সুরে স্যাক্সোফোন বাজানোতেও নিনা দক্ষতা অর্জন করেছে। বাড়ি ফেরার পর সমুদ্র সৈকতে সেটাই ওর প্রথম রবিবার। ড্রেসিং রুমের ভেতর সম্পূর্ণ উদোম হয়ে স্নানের পোশাক পরার মুহূর্তে আতঙ্কগ্রস্ত মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। আশপাশের ড্রেসিং রুমগুলো থেকে জলদস্যুদের মতো উল্লাস ধ্বনি ভেসে এল। ওর নিজের ড্রেসিং রুমের ছিটকিনিটা ভেঙে ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন দুর্বৃত্তটি

নিনার সামনে এসে দাঁড়ানোর আগে পর্যন্ত নিনা কিছুই বুঝতে পারেনি। ছেলেটার পরনে শুধু চিতাবাঘের চামড়ার মতো ছাপানো, আঁটোসাঁটো, দড়ি লাগানো শর্ট-প্যান্ট। নমনীয় শান্ত শরীর। মহাসাগরের পাশে বসবাসকারী মানুষের মতো সোনালি ত্বক। ডান কবজিতে পেশাদার রোমান মল্লযোদ্ধাদের মতো ধাতব বালা। মুঠো করা ডান হাতে একটা লোহার শিকল জড়ানো যাকে ও মারাত্মক অস্ত্রের মতো ব্যবহার করে। ওর গলায় ঝুলছিল একটা পদক। শিকলটাও পদকটার সঙ্গে নিঃশব্দে কাঁপছে। ছেলেবেলায় স্কুলে ওরা একসঙ্গে পড়াশোনা করত। বেশ কয়েকটা জন্মদিনের উৎসবে দু'জনের দেখাও হয়। সে সময় দু'জনে মিলে অনেক কেকের টুকরো ভেঙে নিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের সময় থেকেই ওদের পরিবারগুলো নিজেদের খুশি অনুযায়ী সারা শহরের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করত। বহু বছর ওদের দেখা হয়নি। তাই প্রথমে ওরা নিজেদের চিনতে পারেনি। নিনা স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিল। নিজের প্রকট নগ্নতা ঢাকার কোনও চেষ্টাই ও করেনি। আর তখনই বিলি সাঞ্চেস্ শিশুসুলভ আচরণ শুরু করে দিল। চিতাবাঘের চামড়ার মতো ছাপানো আঁটোসাঁটো শর্ট-প্যান্টটা নিচের দিকে নামিয়ে সম্ভ্রম জাগানোর মতো ঋজু ও কঠিন পুরুষত্বের চিহ্নটি নিনাকে দেখাল। নিনাও নিঃসংকোচে দেখছিল। ওর চোখে বিস্ময়ের কোনও চিহ্নই নেই। 'এর থেকেও বড় আর শক্ত অনেক দেখেছি',—সন্ত্রস্ত ভাবটা গোপন করার জন্য বলল নিনা। 'কাজেই কী করছ,—একবার ভেবে দেখ। আমার সঙ্গে শুতে হলে কালো মানুষদের চেয়েও ভালো হতে হবে।'

আসল ঘটনা হল নিনা দাকঁতে শুধুমাত্র কুমারীই নয়, এর আগে কখনও নগ্ন পুরুষই দেখেনি। তবু ওর চ্যালেঞ্জে কাজ হল।

শিকল জড়ানো হাত দিয়ে দেওয়ালে ঘুসি মেরে হাতটা ভেঙে ফেলা ছাড়া আর কোনও কাজের কথা সেই মুহূর্তে বিলি সাঞ্চেসের মাথাতেই এল না। তারপর নিনাই নিজে গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল ওকে। বিলিকে সুস্থ হয়ে উঠতে যথাসাধ্য করল নিনা। অবশেষে সঙ্গমের নির্ভুল পদ্ধতি ওদের জানা হয়ে যায়। যে বাড়িতে নিনা দাকঁতের বিশিষ্ট পূর্বসূরিদের ছ'পুরুষ চোখ বুজেছিল সেই বাড়ির ভেতর দিকের গাড়ি বারান্দায় ওরা জুন মাসের রুক্ষ উত্তপ্ত বিকেলগুলো কাটিয়ে দিল। স্যাক্সোফোনে নিনা কিছু জনপ্রিয় গানের সুর বাজাত আর প্লাস্টার করা হাত নিয়ে বিলি সাঞ্চেস্ শুয়ে থাকত দোলনায়। বিলি পলকহীন দৃষ্টিতে দেখত নিনাকে। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু অসংখ্য জানালার সামনেই ছিল উপসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত পূতিগন্ধময় এক বদ্ধ জলাশয়। বাড়িটা 'লা মাঙ্গা' জেলায় সবচেয়ে বড় আর পুরোনো বাড়িগুলোর অন্যতম। এবং নিঃসন্দেহে সব থেকে কুৎসিতও বটে।

তবে রংবাহারি চৌকো টালি বসানো যে গাড়িবারান্দায় বসে নিনা দাকঁতে স্যাক্সোফোন বাজায়, বিকেলের চারটের উত্তপ্ত পরিবেশে সেই জায়গাটাকে মনে হয় এক মরূদ্যান। গাড়ি বারান্দার সামনের উঠোনে পর্যাপ্ত ছায়া। সেখানে আম আর কলা গাছের ভিড়। গাছের নিচে একটি মাত্র সমাধি। সমাধির ওপর কোনও নাম লেখা নেই। বাড়িটার থেকেও সমাধিটা পুরোনো। সমাধিটি সম্পর্কে কোনও তথ্য এ পরিবারের কারও স্মৃতিতে ধরা নেই। সংগীত সম্পর্কে যাদের কোনও ধারণাই নেই তারাও ভাবে অমন অভিজাত পরিবারে স্যাক্সোফোনটা বড় সেকেলে ব্যাপার। 'অনেকটা যেন জাহাজের হর্ন-এর মতো লাগছে,'—যন্ত্রটার বাজনা প্রথমবার শুনে নিনা দাকঁতের ঠাকুমা ঠিক এভাবেই বলেছিলেন। মেয়ে যাতে স্বাচ্ছন্দ্যের অজুহাতে উরুর ওপর স্কার্ট তুলে হাঁটু দুটো না ছড়িয়ে সংগীতের সঙ্গে বেমানান উত্তেজক ভঙ্গিতে যন্ত্রটা না বাজায় সে জন্যে নিনা দাকঁতের মায়ের চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু সফল হননি। 'কী যন্ত্র তুমি বাজাচ্ছ, তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই,—অন্তত যতক্ষণ তুমি পা দুটো জোড়া করে বাজাচ্ছ।'

অথচ জাহাজের বিদায় সংগীতের মূর্ছনা আর বাধাহীন ভালোবাসা বিলি সাঞ্চেসের তিক্ততার খোলসটা ছিঁড়ে ফেলতে নিনা দাকঁতেকে সাহায্য করল। এমনিতে একটা আকাট বর্বর হিসেবেই ওর পরিচিতি। তবুও দু'টো বিশিষ্ট পরিবারের সম্মিলিত আনুকূল্যে সফলভাবেই বিলি বর্বর অভ্যাসগুলো বজায় রেখেছে। এই বর্বর স্বভাবের আড়ালেই নিনা দাকঁতে খুঁজে পেল এক সন্ত্রস্ত কোমলমতি

অনাথকে। ওদিকে বিলি সাঞ্চেসের হাতের হাড় ক্রমশ জুড়ে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জেনে ফেলল নিনা আর বিলি। এক বর্ষণসিক্ত বিকেলে যখন বাড়িতে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না, ছেলেটিকে নিনা তখন নিজের পবিত্র কুমারী শরীরে আশ্রয় দেয়। এত স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপারটা ঘটল যে বিলি সাঞ্চেস্ তো অবাক। তারপর থেকে প্রতিদিন ঠিক একই সময়ে প্রায় সপ্তাহ দুয়েক ধরে ওরা উত্তেজিত ও নগ্ন অবস্থায় দেওয়ালে প্রতিকৃতি হয়ে ঝুলে থাকা গৃহযুদ্ধের সৈনিক ও অতৃপ্ত পিতামহীদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে স্ফূর্তিতে মেতে থাকত। ওদের আগে সেই পিতামহীরাও ঐতিহাসিক এবং পরম সুখের ওই বিছানাটা ভোগ করেছিলেন। সঙ্গমের ফাঁকে বিশ্রামের সময় ওরা নগ্ন থাকে। জানালাগুলোও খোলা থাকে। উপসাগরের ওদিক থেকে বাতাসে বয়ে আসা জাহাজি আবর্জনা ও পেচ্ছাপের গন্ধ ভেসে আসে ওদের নাকে। স্যাক্সোফোন বাজনা থেমে যাওয়ায় উঠোনের কিছু রোজকার শব্দও ওদের কানে পৌঁছোয়। কলাগাছের তলায় ব্যাঙটা একই সুরে ডাকে। অজানা-অচেনা মানুষটার সমাধির ওপর ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে এভাবে জানবার সুযোগ আগে কখনও ওদের হয়নি।

নিনা দাকঁতের মা-বাবা যখন ফিরে এলেন, ওদের প্রেম তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। পৃথিবীটা ওদের আর যথেষ্ট বড় বলে মনে হয় না। যে কোনও জায়গায়, যে কোনও সময়ে ওরা মিলিত হয়। প্রতিবারই যেন ওরা প্রেমের নতুন মর্ম আবিষ্কার করছে। প্রথমে ওরা স্পোর্টস্ কারের ভেতর মিলিত হবার চেষ্টা করেছিল। ছেলেকে বঞ্চনা করার অপরাধ বোধ থেকে কিছুটা মুক্তি পাওয়াব আশায় গাড়িটা বিলি সাঞ্চেসের বাবাই দিয়েছিলেন। তারপর নানা রকমের গাড়ি ওদের কাছে সহজলভ্য হয়ে যাওয়াব পর রাত-বিরেতে মার্বেলার সমুদ্র সৈকতের পোশাক পালটানোর সেই নির্জন ড্রেসিং রুমগুলোয চলে যেত ওরা—ঠিক যেখানে নিয়তি দু'জনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিয়েছিল। নভেম্বর মাসে কার্নিভাল উৎসবের সময় উৎসবের পোশাক পরেই ওরা চলে যায় পরিবারের শাসনাধীন জেতসেমানি এলাকায়। সেখানে ওরা ঘর ভাড়া করেছিল। মাত্র কযেক মাস আগেই সেই ঘরের মালকিন বিলি সাঞ্চেস্ ও তার মস্তানবাহিনীর দৌরাত্ম্য সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্যাক্সোফোন চর্চায় নিনা দাকঁতে যে উন্মত্ত অনুরাগেব অপচয় করেছে, সেই একই আবেগ নিয়ে ও গোপন প্রেমে মেতে উঠল। স্বাভাবিক বন্যতা হারানো মস্তানটি বুঝতে পারে, 'একটা কালো মানুষের থেকে ভালো হওয়া' কথাটা নিনা কী অর্থে বলেছিল। অবিশ্যি বিলি সাঞ্চেস্ও সমান দক্ষতায় ও উৎসাহে নিনার ভালোবাসাব প্রতিদান দিতে থাকে। বিয়ের পর ওরা আটলান্টিকের উপর সঙ্গমের প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করে। এরোপ্লেনের স্টুয়ার্ডেস্ মেয়েটি তখন ঘুমিয়েছিল। ওদিকে এরোপ্লেনের টয়লেটের মধ্যে ঘনিষ্ঠ দু'জনের যত না আনন্দ হচ্ছিল তার থেকে বেশি হাসি পাচ্ছিল। বিয়ের চব্বিশ ঘণ্টা পরে একমাত্র তখনই নিনা বুঝতে পারে এবং বিলি সাঞ্চেস্ও বুঝে যায় যে নিনা দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

তাই ওরা যখন মাদ্রিদে পৌঁছোল, তখন প্রেমে পবিতৃপ্তি না এলেও সত্যিকারের নববিবাহিত দম্পতির উপযুক্ত আচরণ করার মতো বিচক্ষণতা ওদের ছিল। অবশ্য দু'পক্ষের মা-বাবাই সব বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। প্লেন থেকে নামার আগেই একজন প্রটোকল অফিসার প্রথম শ্রেণীর কেবিনে এসে নিনা দাকঁতেকে চকচকে কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা সাদা রঙের নেউলের চামড়ার কোটটি দিয়ে গেলেন। ওটা নিনার বিয়েতে ওর মা-বাবার উপহার। ওই ভদ্রলোকের হাত থেকেই বিলি সাঞ্চেস্ পেল ভেড়ার লোম দিয়ে বানানো একটা জ্যাকেট। ওইরকম জ্যাকেটের সে বছর খুব চাহিদা। ওই অফিসারই সবার অলক্ষ্যে বিলির হাতে গুঁজে দিলেন একটা চোখ ধাঁধানো অবাক করা গাড়ির চাবির গোছা। গাড়িটা এয়ারপোর্টের বাইরে ওদের জন্যেই অপেক্ষা কবছিল।

মাদ্রিদে অবস্থিত ওদের দেশের দূতাবাসেব অভ্যর্থনা কক্ষে নিনা আর বিলিকে সরকারিভাবে স্বাগত জানানো হল। রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর পত্নী পাত্র-পাত্রীব পারিবারিক বন্ধু। এছাড়াও রাষ্ট্রদূত ডাক্তার হিসেবে নিনা দাকঁতেকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিলেন। গোলাপেব গুচ্ছ হাতে সেদিন তিনি ওদের অপেক্ষায় ছিলেন। গোলাপগুলো এত সতেজ যে ফুলগুলোর ওপর শিশিরের ফোঁটাকেও কৃত্রিম মনে হয়। কপট

চুম্বনে নিনা ওদের অভিনন্দন জানাল। অল্প বয়সে কনের মর্যাদা পাওয়ায় বেচারি একটু অস্বস্তি বোধ করছে। তারপরই ও হাতে তুলে নিল ফুলগুলো। হাত বাড়িয়ে ফুল নেওয়ার সময় আঙুলে কাঁটা বিঁধিয়ে ফেলল নিনা তবে চমৎকার কায়দায় দুর্ঘটনাটা সামলেও নিল। 'ইচ্ছে করেই বিঁধিয়েছি',—ও বলল,—'যাতে আংটিটা আপনাদের চোখে পড়ে।'

আংটিটার ঔজ্জ্বল্য চমকে দিল দূতাবাস প্রতিনিধিদের। আংটিটার জন্যে অবশ্যই প্রচুর খরচ হয়েছিল। হীরকখণ্ডটার যত না দামি তার চেয়ে ওটার মধ্যে সুরক্ষিত প্রাচীন ঐতিহ্যের দাম অনেক বেশি। নতুন গাড়িটার দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সবাই। গোটা গাড়িটাকে সেলোফেন কাগজে মুড়ে, অস্বাভাবিক চওড়া সোনালি ফিতে দিয়ে বেঁধে এয়ারপোর্টে নিয়ে আসার কৌতুককর ভাবনাটা রাষ্ট্রদূতের মাথাতেই প্রথম খেলে। তবে বিলি সাঞ্চেস্ রাষ্ট্রদূতের উদ্ভাবনী ক্ষমতা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয়। গাড়িটাকে নিয়েই তখন ওর তীব্র কৌতূহল। তক্ষুনি ছিঁড়ে ফেলল গাড়ির মোড়কটা। তারপর রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রয়োজনে ছাদটা খুলে গুটিয়ে রাখা যায় এমন বেন্ট্লে গাড়ি সেই বছরেই প্রথম বাজারে আসে। গাড়ির ভেতরকার সাজ-সজ্জা নির্ভেজাল চামড়ায় তৈরি। ওদিকে আকাশকে ছাইমাখা কম্বলের মতো লাগছিল। গুয়াদারামার দিক থেকে বয়ে যাচ্ছে হাড় কাঁপানো হিমেল হাওয়া। বাইরে ঘোরাঘুরির পক্ষে সময়টা ভালো নয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ঠান্ডা আবহাওয়ার ভালো-মন্দ সম্পর্কে বিলি সাঞ্চেসের কোনও ধারণা হয়নি। ফলে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদেরও বাইরে গাড়ি রাখার জায়গাতেই দাঁড় করিয়ে রাখল। সৌজন্যতার খাতিরে বাইরে ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে তারা যে জমে যাচ্ছে সেটা বিলির খেয়াল নেই। গাড়ির ক্ষুদ্রতম অংশগুলো দেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওর হুঁশ ফিরল না। সরকারি বাসভবনের পথটা চিনিয়ে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রদূত সাঞ্চেসের পাশেই বসলেন। ওখানেই নবদম্পতির জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন। যাওয়ার পথে তিনি শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত ও দর্শনীয় জায়গাগুলো ওদের দেখিয়ে দিলেন। অথচ বিলি সাঞ্চেস্ তখন গাড়ির অভিনবত্বেই নিবিষ্ট।

দেশের বাইরেও সেই প্রথম ওর বেড়াতে আসা। নিজের এলাকার সব প্রাইভেট ও পাবলিক স্কুলে বিলি ঘুরেছে। বিস্মৃতি আর উদাসীনতার ঘোরে না পড়া পর্যন্ত একই কোর্স বারবাব পড়েছে। ওদের চেনা জগতের বাইরের সেই শহরে সারিবদ্ধ ছাইরঙা বাড়িগুলোতে দিনের মাঝামাঝি সময়েই বিজলি বাতি জ্বলে ওঠে। গাছগুলো পত্রশূন্য। দূরে মহাসাগর। প্রথম দর্শনেই এসব সাঞ্চেস্‌কে বিষণ্ণ করে তোলে। অথচ বিষণ্ণতাকে ও মনের মধ্যে কোণঠাসা করে রাখতে চায়। কিন্তু খুব শিগ্‌গিরি নিজের অজান্তেই বিস্মৃতির প্রথম ফাঁদটায় সে পা ফেলল। হঠাৎই উঠল এক শব্দহীন ঝড়। একেবারে অসময়ের ঝড়টা চারদিকে দ্রুত ছড়িয়েও পড়ল। ফ্রান্সে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্নভোজ শেষ করে রাষ্ট্রদূতের বাড়ি ছেড়ে বেরোতেই ওরা দেখল পুরো শহর উজ্জ্বল তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে। বিলি সাঞ্চেস্ তখন ভুলে গেল গাড়ির কথা। ও আনন্দে চিৎকার করতে শুরু করল। মাথার ওপর ছুঁড়ে দিল মুঠো মুঠো বরফ। ওকে দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে গেল সবাই। নতুন জ্যাকেটটা গায়ে জড়িয়েই সে রাস্তার মাঝখানে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল।

ঝড়ের পর ঝরঝরে পরিষ্কার বিকেলবেলায় মাদ্রিদ থেকে বেরিয়ে পড়ার পর নিনা দাকঁতে টের পেল আঙুল থেকে রক্ত ঝরছে। বিষযটা নিয়ে ও চিন্তিত নয়, বরং বিস্মিত। কারণ, আনুষ্ঠানিক মধ্যাহ্নভোজের পর রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী ইতালীয় গীতিনাট্যের গান গাইতে শুরু কবার পর নিনা তাঁর সঙ্গে স্যাক্সোফোন বাজাচ্ছিল। তখন কিন্তু ওর আঙুল কোনও অসুবিধা সৃষ্টি করেনি। পরে স্বামীকে সীমান্তের দিকের সবচেয়ে কাছের পথটা চিনিয়ে দিতে দিতে নিনা আনমনা হয়ে রক্তাক্ত আঙুলটা চুষছিল। পিরেনিজ পর্বতমালা এলাকায় পৌঁছোনোর আগে ও ডাক্তারখানা খোঁজার কথা ভাবেওনি। তারপর গত কয়েকদিনের কর্মব্যস্ততার ফলে জমে থাকা স্বপ্নের জগতে ডুবে গেল নিনা। এক দুঃস্বপ্নের ঝাঁকুনিতে স্বপ্নটা ভাঙল। স্বপ্নটা এই রকম—গাড়িটা জলের ভেতর দিয়ে চলেছে। ঘুম ভাঙার অনেক পরে ওর মনে পড়ল রুমালটা ও আঙুলে জড়িয়ে রেখেছিল। গাড়ির ড্যাশবোর্ডের আলোকজ্জ্বল ঘড়িতে দেখল

তিনটে বেজে গেছে। মনে মনে হিসেব করে নিনা বুঝতে পারল বোরদিউ, আঙ্গিউলেমে, পোইতিয়ের্স ছাড়িয়ে ওরা লইর-এর জল উপচে পড়া বাঁধ বরাবর চলেছে। কুয়াশার ছাঁকনি ভেদ করে তখন চাঁদের আলো নেমে আসছিল। পাইন গাছের ভিড়ের মধ্যে প্রাসাদের আবছায়া দেখে মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন রূপকথার গল্প থেকে প্রাসাদটা উঠে এসেছে। ওখানকার পথঘাট নিনা দার্কঁতের মনে গাঁথা। তাই ও হিসেব করে দেখল প্যারিস তখনও প্রায় ঘণ্টা তিনেকের পথ। একমনে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছে বিলি সাঞ্চেস্।

'তুমি একটা পাগল।' নিনা বলে। 'একটা কিছু দাঁতে না কেটে একটানা এগারো ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালাচ্ছ।'

আসলে নতুন একটা গাড়ি পাওয়ার উত্তেজনাই ওকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্লেনেও টান টান হয়ে ও জেগেই ছিল। বিলি অনুভব করল যে ভোরের আগে প্যারিসে পৌঁছোনোর মতো শক্তি ওর মধ্যে অবশিষ্ট আছে।

'দূতাবাসের দুপুরের খাওয়াটাই এখনও পুরোপুরি হজম হয়নি',—বিলি বলল। 'যাই বল, আমাদের কারতাহেনায় সবে তো সিনেমার শো ভাঙল। নিশ্চয়ই এখন প্রায় দশটা।

তা হলেও, নিনা দার্কঁতের আশঙ্কা—গাড়ি চালাতে চালাতেই যেন ও ঘুমে না ঢলে পড়ে। তারপরেই মাদ্রিদে পাওয়া উপহারের প্যাকেটগুলোর থেকে নিনা একটা খুলল। তার মধ্যে থেকে মিছরির পুর দেওয়া একটা কমলালেবুর টুকরো বের করে স্বামীর মুখে পুরে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু বিলি মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'সত্যিকারের পুরুষমানুষ মিষ্টি খায় না,'—বিলি বলল।

'অর্লিয়েন্স'-এ পৌঁছোনোর একটু আগে কুয়াশা কেটে গেল। মনে হল, যেন খুব বড় একটা চাঁদ তুষারাবৃত জমিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বড় রাস্তায় অসংখ্য ট্রাক আর মদের ট্যাঙ্কার বেরিয়ে পড়ায় গাড়ি চালানো কিন্তু ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ল। সবাই চলেছে প্যারিসের দিকে। নিনা দার্কঁতে হয়তো স্বামীকে গাড়ি চালানোয় সাহায্য করতে চাইছে। তবে, মুখ ফুটে কথাটা বলার মতো সাহস ওর নেই। প্রথম যেদিন ওরা এক সঙ্গে বেরিয়েছিল সেদিনই বিলি সাঞ্চেস্ জানিয়ে দেয় যে বউয়ের চালানো গাড়িতে বসে যাওয়ার মতো অপমান একজন পুরুষের কাছে আর কিছু হতে পারে না। প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক ঘুমিয়ে নিনা টের পেল যে মাথাটা ভারমুক্ত। ফ্রান্সের কোনও হোটেলের সামনে গাড়ি থামেনি বলে ও ভীষণ খুশি। কারণ, ছোটবেলা থেকেই মা-বাবার সঙ্গে অসংখ্যবার এ সব অঞ্চলে ও বেড়াতে এসেছে। 'এত সুন্দর গ্রাম পৃথিবীতে আর কোথাও নেই',—নিনা বলল। 'কিন্তু তেষ্টায় মরে গেলেও এমনিতে এক গেলাস জলও কেউ তোমায় দেবে না।' এ সব ভালো করে জেনে বুঝেই গত রাতে এক টুকরো সাবান আর এক রোল টয়লেট পেপার ও ভরে নিয়েছিল হাত ব্যাগে। কারণ. ফ্রান্সের হোটেলে কখনও কোনও সাবান থাকে না। আর টয়লেট পেপার হিসেবে আগের সপ্তাহের খবরের কাগজ চৌকো আকারে ছোট ছোট করে কেটে, পেরেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেই মুহূর্তে, একটা রাত সঙ্গমহীন অবস্থায় কাটানোর জন্য নিনার আফশোস হচ্ছিল। কথাটা পাড়তেই, দ্রুত স্বামীর জবাব পাওয়া গেল।

'ভাবছিলাম ব্যাপারটা বরফের মধ্যে সেরে নিলে কেমন হয়',—বিলির প্রস্তাব। 'যদি চাও তো এখানেই হতে পারে।' এসব নিয়ে নিনা দার্কঁতে গভীরভাবে ভাবতে থাকে। বড় রাস্তার ধারে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল, পেঁজা তুলোর মতো বরফের দৃশ্য বড় মনোরম। কিন্তু যতই ওরা প্যারিসের শহরতলির দিকে এগোচ্ছে রাস্তায় ততই বেড়ে চলেছে গাড়ির ভিড়। আলোকিত কারখানাগুলো যেন ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সাইকেলে চেপে এগিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য শ্রমিক। সময়টা শীতকাল না হলে এতক্ষণে পরিষ্কার দিনের আলো ফুটে যাওয়ার কথা।

'প্যারিসে পৌঁছোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক',—নিনা দার্কঁতে বলল। 'পরিষ্কার চাদর পাতা বিছানায়—ঠিক বিবাহিত দম্পতির মতো—ব্যাপারটা সুন্দর আর আরামদায়ক হবে।'

'এই প্রথম তুমি আমায় ফিরিয়ে দিলে'.—বিলি বলল। 'অবশ্যই',—নিনার জবাব। 'বিয়েটাও তো

আমাদের এই প্রথম হল।'

ভোরের সামান্য আগে পথের ধারের এক রেস্তোরাঁয় ওরা পরিষ্কার হয়ে নিল। তারপর কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে খেল মিষ্টি রুটি আর কফি। ট্রাক ড্রাইভারেরা ওখানে রেড ওয়াইন দিয়ে প্রাতরাশ সারছিল। বাথরুমে ঢুকে নিনা খেয়াল করল ওর স্কার্ট আর ব্লাউজে রক্তের ছাপ। তবে দাগগুলো ও ধোয়ার চেষ্টা করল না। রক্তভেজা রুমালটাকে আবর্জনার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল। বিয়ের আংটিটা পরে নিল বাঁ হাতের আঙুলে। সাবান আর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলল আহত আঙুলটা। ক্ষতটা প্রায় চোখেই পড়ে না। অথচ গাড়িতে ফিরতেই আবার রক্ত ঝরা শুরু হল। হাতটা জানালার বাইরে ঝুলিয়ে রাখল নিনা। হিমেল হাওয়ায় সংক্রমণ ঠেকানোর উপাদান থাকার কথা ওর জানা। তবে এই কৌশলেও কাজ হল না। তবুও, তখনও পর্যন্ত নিনা কোনও উদ্বেগ বোধ করেনি। 'যদি কেউ আমাদের খুঁজে নিতে চায়, তা হলে তার পক্ষে কাজটা একেবারেই সোজা',—স্বাভাবিক কায়দায় নিনা বলল। 'কেবল তুষারে আমার রক্তের ছোপ ধরে এগোতে হবে।' এর পর নিনা নিজের বলা কথাটা নিয়ে আরও বেশি করে ভাবতে শুরু করল। ভোরের প্রথম আলোয় ওর মুখ ফুলের মতো সুন্দর হয়ে উঠেছিল।

'একবার ভেবে দেখ',—নিনা বলল। 'মাদ্রিদ থেকে প্যারিস অবধি তুষারে রক্তের রেখা,—কথাটা দিয়ে সুন্দর একটা গান হয়,—না?'

তবে এ বিষয়ে আর বেশি কিছু ভাবার সময় পেল না নিনা। প্যারিসের শহরতলি দিয়ে যাবার সময় ওর আঙুল থেকে কোনও বাধা না মেনে ঝরঝর করে রক্ত ঝরতেই থাকে। ওর মনে হল,—ক্ষতটার ভেতর দিয়েই যেন প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে। হাত ব্যাগের ভেতর থেকে টয়লেট পেপার বের করে রক্তপাত আটকানোর চেষ্টা করল নিনা। কিন্তু টুকরো কাগজে রক্ত মুছে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে যত সময় লাগছিল, আঙুলে কাগজ জড়াতে সময় লাগছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। ওর পরনের জামা-কাপড়-কোট, গাড়ির সিট,—সবই আস্তে আস্তে, যেন কিছুতেই আর মুছে তোলা যাবে না এমনভাবে রক্তে ভিজে উঠছিল। বিলি সাঞ্চেস্ তো রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। নাছোড়বান্দাভাবে ডাক্তারখানা খুঁজতে লাগল বিলি। কিন্তু তার মধ্যেই নিনা বুঝে গেল এমন রক্তপাত বন্ধ করা ডাক্তারখানার কম্পাউন্ডারের কাজ নয়।

'পোর্তে দ্য অর্লিয়েন্স-এ প্রায় এসে পড়েছি,'—নিনা বলল। 'অ্যাভেনিউ দ্যু জেনারেল লেক্লার্ক ধরে সোজা চল,—সেই, যে সব চেয়ে বড় রাস্তাটা, যেখানে সব রকমের গাছের ভিড়। তারপর বলে দেব কী করতে হবে।'

ওদের সফরে এটাই সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত। অ্যাভেনিউ দ্য-জেনারেল লেক্লার্কের দু'দিকেই তখন জমজমাট যানজট। ছোট গাড়ি, মোটর সাইকেল, বড় বড় ট্রাকের সে এক নারকীয় জট। ট্রাকগুলো প্যারিসের বাজারগুলোয় পৌঁছোনোর চেষ্টা করছে। গাড়ির হর্নের অহেতুক শব্দ বিলি সাঞ্চেস্‌কে এমনই খেপিয়ে দিল যে কয়েকজন ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে ঝড়ের গতিতে ও গালাগালি ছুঁড়তে থাকে। এমনকি একজন ড্রাইভারকে মারবার জন্যে ও গাড়ি থেকে নামারও চেষ্টা করল। কিন্তু নিনা দাকঁতে ওকে বোঝাল মানুষ হলেও তারা কখনও ঘুসোঘুসি করে না। এটা নিনার সুবিবেচনার আরেকটা প্রমাণ। আসলে, সেই মুহূর্তে নিনা নিজে যাতে কিছুতেই জ্ঞান না হারায় তার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করছিল। লিয়ঁ দ্য বেলফোর্ট অভিমুখী গাড়ির দলে ভিড়ে যেতে ওদের ঘণ্টা খানেকের বেশিই লেগে গেল। কাফে ও দোকানগুলো তখন এমন আলো ঝলমল করছিল যেন গভীর রাত। কারণ জানুয়ারি মাসে এমন অন্ধকার প্যাচপেচে কাদা, সর্বক্ষণ বর্ষণ—যে কোনও মঙ্গলবারের মতোই প্যারিসের বৈশিষ্ট্য। ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কিন্তু জমে গিয়ে বরফ হয় না। অ্যাভেনিউ দেনফার্তরশোরোতে তখন গাড়ির ভিড় অপেক্ষাকৃত কম। কয়েকটা বাড়ির সারি পেরিয়ে নিনা দাকঁতে স্বামীকে ডান দিকে বাঁক নিতে বলল। তারপরই এক বিশাল, প্রায়ান্ধকার হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দরজায় গাড়ি ভিড়িয়ে দিল বিলি সাঞ্চেস্।

নিনাকে গাড়ি থেকে ধরে ধরে নামাতে হল। তবে নিনার স্থৈর্য বা প্রকৃতস্থ ভাবটা তখনও অটুট। রোগীর ছোট্ট বিছানায় শুয়ে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করার সময় নার্সের নিয়মমাফিক প্রশ্নের উত্তরে

নিনা নিজের পরিচয় এবং আগেকার অসুখ-বিসুখ চিকিৎসার কথা আদ্যোপান্ত গড়গড় করে বলে গেল। বিলি সাঞ্চেস্ তখন নিনার ব্যাগ বইছিল। ততক্ষণে বিয়ের আংটি পরা নিনার বাঁ হাতটা নিস্তেজ আর ঠান্ডা হয়ে গেছে। ওর ঠোঁটও হয়ে গেছে ফ্যাকাশে। যতক্ষণ না ডাক্তার এসে নিনার আহত আঙুলটাকে প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষা করল ততক্ষণ বিলি সাঞ্চেস্ নিনার হাত ধরে পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তারটি যুবক। তার মাথাটা নেড়া, গায়ের রঙ পুরোনো তামার মতো। নিনা দাকঁতে ডাক্তারের দিকে ফিরে না তাকালেও স্বামীর দিকে তাকিয়ে একবার নিষ্প্রাণ হাসি হাসল। 'ভয় পেয়ো না',—এক অজ্ঞেয় রসবোধে নিনা বলল। 'বড় জোর এই নরখাদকটা আমার হাতটা খেয়ে ফেলবে।'

ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করলেন। তারপরে এক অদ্ভুত এশীয় উচ্চারণে নিখুঁত স্প্যানিশ বলে ওদের চমকে দিলেন।

'না, বাছা',—ডাক্তার বললেন। 'নরখাদকটা বরং না খেয়ে মরবে, তবু কিছুতেই এত সুন্দর একটা হাত কাটতে পারবে না।'

ওরা লজ্জায় পড়ে গেল। কিন্তু ডাক্তার মনোরম ব্যবহার করে ওদের অস্বস্তি কাটিয়ে দিলেন। ডাক্তার সরিয়ে নিতে বললেন চাকা লাগানো খাটটাকে। বউয়ের হাত ধরা অবস্থায় বিলি সাঞ্চেস্ও এগোতে চায়। ডাক্তার ওকে হাত ধরে থামিয়ে দিলেন।

'তুমি নয়',—তিনি বললেন। 'মেয়েটা ইন্টেনসিভ্ কেয়ার ইউনিটে যাচ্ছে।' স্বামীর দিকে তাকিয়ে নিনা দাকঁতে আবার হাসল। করিডরের শেষ প্রান্তে চোখের আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ও স্বামীকে হাত নেড়েই চলল। ক্লিপবোর্ডে নার্সের লেখা নিনা সংক্রান্ত তথ্যগুলোর উপর চোখ বোলাতে বোলাতে ডাক্তার হাঁটছিলেন। বিলি সাঞ্চেস্ তাঁকে ডাকল।

'ডাক্তার',—বিলি বলল। 'ও কিন্তু অন্তঃস্বত্ত্বা।'

'কত দিনের?'

বিলি সাঞ্চেস্ যতটা ভেবেছিল, ডাক্তার খবরটাকে ততটা গুরুত্ব দিলেন না। 'খবরটা দিয়ে ঠিকই করেছ',—এ'টুকু বলেই তিনি খাটের পিছনে পিছনে চললেন। অসুস্থ মানুষের ঘামের গন্ধ ঘরটায় ছড়ানো, কেমন যেন একটা শোকের অনুভূতি সেখানে ছড়িয়ে আছে। বিলি দাঁড়িয়ে যায়। যে করিডর দিয়ে নিনা দাকঁতেকে ওরা নিয়ে গেল, সেদিকে তাকিয়ে কী করবে ভেবে পায় না বিলি। তখন ও একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসে পড়ে। ওখানে অন্য লোকেরাও তখন অপেক্ষা করছিল। কতক্ষণ বেঞ্চিটায় বসেছিল বিলি সাঞ্চেস্ নিজেও তা জানে না। বৃষ্টিরও বিরাম নেই। সারা পৃথিবীর বোঝা যেন বিলির ঘাড়ে চেপে বসেছে। তখনও বিলির হতভম্ব অবস্থা।

বেশ কয়েক বছর বাদে হাসপাতালের নথিপত্র ঘেঁটে জানতে পারি,—নিনা দাকঁতে সাতই জানুয়ারি মঙ্গলবার সকাল ন'টা তিরিশে ভর্তি হয়েছিল। প্রথম রাতটা বিলি সাঞ্চেস্ গাড়ির মধ্যেই ঘুমিয়ে কাটায়। গাড়িটা জরুরি বিভাগের দরজার বাইরে দাঁড় করানো ছিল। পরের দিন খুব সকালে হাসপাতালের সবচেয়ে কাছের কফির দোকানে বসে বিলি খেল ছ'টা সেদ্ধ ডিম আর দু'কাপ কফি। মাদ্রিদ ছাড়ার পর আর পেট ভরে খাওয়া হয়নি। তারপর জরুরি বিভাগে নিনা দাকঁতেকে দেখতে গেল বিলি। কিন্তু ওরা ওকে বোঝাল যে হাসপাতালে ঢোকবার জন্য সদর দরজাটাই ব্যবহার করতে হয়। অবশেষে ওখানকার জনৈক অস্ট্রিয়ান কর্মচারী, যে হাসপাতালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল, বিলিকে একজন রিসেপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলতে সাহায্য করে। রিসেপশনিস্ট স্বীকার করেন নিনা দাকঁতেকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি বিলিকে আরও জানান একমাত্র মঙ্গলবার সকাল ন'টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত হাসপাতালের রোগীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়। সপ্তাহের বাকি ছ'দিন এই সুযোগ থাকে না। স্প্যানিশ জানা সেই ডাক্তারের খোঁজ করল বিলি। চেহারার বর্ণনা করার সময় কালো চামড়া আর নেড়া মাথারও উল্লেখ করল। এই দুটো মামুলি সূত্রের উপর ভিত্তি করে কেউ কিছু বলতে পারেনি। নিনা দাকঁতের নাম হাসপাতালের খাতায় উঠে যাওয়ার খবরে আশ্বস্ত হয়ে বিলি সাঞ্চেস্ গাড়িতেই ফিরে এল। একজন পুলিশ অফিসার দুটো বাড়ির সারি পেরিয়ে সরু একটা রাস্তার জোড়

সংখ্যা চিহ্নিত প্রান্তে বিলিকে গাড়ি রাখতে বললেন। রাস্তার উলটো দিকে 'হোটেল নিকোলে' লেখা একটা বাড়ি। বাড়িটার আগাপাস্তালা মেরামত করা হয়েছে। ওটা 'এক তারা' হোটেল। হোটেলের রিসেপশনের জায়গাটাও ছোট। একটা সোফা আর একটা দাঁড় করানো পুরোনো পিয়ানো ছাড়া রিসেপশনে অন্য কিছুই নেই। তবে চড়া ও সুরেলা কণ্ঠস্বরের অধিকারী হোটেল মালিক ওখানেই বসেছিলেন। খদ্দেরদের পকেট ভর্তি থাকা পর্যন্ত যে কোনও ভাষায় বলা খদ্দেরদের কথা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয় না। এগারোটা স্যুটকেস আর ন'টা উপহারের প্যাকেট নিয়ে বিলি সাঞ্চেস্ পৌঁছে গেল হোটেলের একমাত্র 'বিনামূল্যে'-র ঘরটিতে। ঘর বলতে দশতলার একটা তিন-কোণা চিলেকোঠা। সেদ্ধ ফুলকপির গন্ধে মাতোয়ারা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে বিলি একেবারে কাহিল অবস্থায় পৌঁছোল সেখানে। ঘরের দেওয়ালগুলোয় রংচটা কাগজ সাঁটা। একটি মাত্র জানালা। জানালার কাছে কিছু রাখার মতো বা কোনও কাজ করার মতো জায়গা নেই। ন'তলার ভেতর দিকের একটা উঠোন থেকে আলতো আলো জানালা গলে ঢুকেছিল। দু'জনের শোওয়ার মতো একটা বিছানা, একটা বড় আলমারি, একটা সাদামাটা চেয়ার, বেড-প্যানের মতো শৌচকার্যের জন্য একটা অস্থায়ী কমোড, একটা গামলা আর কল লাগানো একটা জালা,—এই-ই হল ঘরটার সম্পদ এবং আসবাবপত্র। অর্থাৎ ঘরে থাকতে হলে বিছানায় শুয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। জিনিসপত্রগুলো পুরোনো তো বটেই, তার থেকেও পীড়াদায়ক হল যে সব কিছুতেই কেমন একটা দৈন্যের ছোঁয়া। তবে প্রতিটি জিনিসই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এমনকি সদ্য ছেটানো কীটনাশক ওষুধের গন্ধও ঘর থেকে ভেসে আসছে।

সহজাত কার্পণ্যের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা সেই হোটেলকেন্দ্রিক জগতের নানা রহস্য সমাধানের চেষ্টায় বাকি জীবনটুকু পার করে দিলেও বিলি সাঞ্চেস্ সফল হত না। দশতলায় পৌঁছোনোর আগেই সিঁড়ির আলোটা কেন নিভে যাচ্ছিল তা ওর কাছে রহস্যই থেকে গেল। আলোটা আবার জ্বালানোর কোনও উপায়ও বিলি খুঁজে পেল না। প্রত্যেক তলায় সিঁড়ির চাতালে যে একটা করে টয়লেট আছে আর তা'তে যে চেন টানলে জল পড়ে, এটা জানতেই আধখানা সকাল কেটে গেল। এর মধ্যে ও ভেবেছিল অন্ধকারেই কাজটা সারবে। কিন্তু ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করা মাত্রই টয়লেটের আলো জ্বলে উঠল। অভাবিত এই আবিষ্কার ওকে বুঝিয়ে দিল যে আলো নেভাতে কারও ভুল করার অবকাশ নেই। টয়লেটের শেষ মাথায় একটা শাওয়ার ছিল। নিজের দেশে দিনে দু'বার স্নান করার অভ্যেসটা পালটাতে না পারার জন্যে হোটেল কর্তৃপক্ষকে বিলি ধরাধরি করে। প্রতিবার ওকে নগদে স্নানের দাম মেটাতে হয়। গরম জলের ধারা কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিবারে মাত্র তিন মিনিট গরম জল পড়ে। এ সব নিয়মের সঙ্গে ওব নিজের জীবনের বিস্তর ফারাক থাকলেও জানুয়ারির ঠান্ডায় বাইরে ঘোরার থেকে হোটেলে থাকা যে অনেক বেশি আবামদায়ক,—এটা ও স্পষ্টই বুঝতে পারল। কিন্তু বিলি ভেবে পায় না নিনা দাকঁতের সাহায্য ও সুরক্ষিত আশ্রয় পাবার আগের দিনগুলো কীভাবে কাটত। এসব ভাবনার মুহূর্তেই ওর নিজেকে বিভ্রান্ত ও নিঃসঙ্গ মনে হল।

বুধবাব সকালে ঘরে ফিরে কোট পরা অবস্থাতেই বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল বিলি। দু'সারি বাড়ির ওপারে যে মায়াবী প্রাণীটার রক্ত ঝরে চলছিল,—তার কথা ওর মনে পড়ল। তক্ষুনি কোনওরকম চেষ্টা ছাড়াই ঘুমে ডুবে গেল বিলি। পরম প্রশান্তির সেই ঘুম ভাঙার পর ও দেখল ঘড়িতে পাঁচটা বেজেছে। কিন্তু তখন বিকেল না সকাল অথবা সেদিন কী বার কিংবা ওটা কোন শহর যার জানালায় বৃষ্টি ও ঝড়ের চাবুক পড়ছে,—তা ও মনে করতে পারল না। তারপর নিশ্চিতভাবে বুঝে গেল একটা নতুন দিন শুরু হচ্ছে। আগের দিন যে কাফেতে প্রাতরাশ করেছিল, সেখানেই গেল। ওখানেই শুনল,—দিনটা বৃহস্পতিবার। হাসপাতালের আলোগুলো তখনও জ্বলছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। হাসপাতালে সদরের বাইরে একটা বাদাম গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বিলি দাঁড়িয়ে থাকল। সাদা কোট পরা ডাক্তার ও নার্সরা ওখান দিয়ে যাতায়াত করছে। নিনা দাকঁতেকে যে এশীয় ডাক্তার ভর্তি করিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার আশায় বিলি সাঞ্চেস্ দাঁড়িয়েছিল। তবে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল না। দুপুরের খাবার পর বিকেলেও তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। ঠান্ডায় জমে যাচ্ছিল বলে বিকেলের পর বিলিকে প্রতীক্ষার

সমাপ্তি করতে হল। সাতটা নাগাদ দুটো সেদ্ধ ডিম আর এক কাপ দুধ দেওয়া সাদা কফি খেল বিলি। পর পর দু দিন একই দোকানে একই খাবার খাওয়ার জন্য বিলি নিজেই কাউন্টার থেকে ওগুলো বেছে নিয়েছিল। হোটেলে ঘুমোতে ফিরবার সময় বিলি দেখল রাস্তার একধারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে ওর গাড়িটা। গাড়ির সামনের কাচে একটা পার্কিং ফি-র টিকিট সেঁটে দেওয়া আছে। অন্যান্য গাড়িগুলো বিলির গাড়ির উলটোদিকে দাঁড় করানো রয়েছে। হোটেল নিকোলের দারোয়ানটা অনেক কষ্টে বিস্তর কায়দা-কানুন করে বিলিকে বোঝাল সপ্তাহের বিজোড় দিনে রাস্তার বিজোড় সংখ্যা চিহ্নিত প্রান্তে গাড়ি রাখাই ওখানকার নিয়ম। আবার জোড় দিনে গাড়িগুলোকে অন্য প্রান্তে ঘুরিয়ে রাখতে হয়। এমন বুদ্ধিদীপ্ত ঘোরপ্যাঁচের কী দরকার তা সহজ সরল মানুষ বিলি সাঞ্চেস্ বুঝে উঠতে পারল না। বছর দুয়েক আগে এই বিলিই মেয়রের সরকারি গাড়ি চালিয়ে প্রতিবেশী এলাকার সিনেমা হলে সটান ঢুকে পড়ে হলের সবকিছু সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল। সাহসী পুলিশবাহিনীও তখন ওকে সমর্থন করেছিল। সেই বিলিই কিন্তু এখন বোকা বনে গেল। দারোয়ান ওকে গাড়ি না সরিয়ে শুধু জরিমানাটা চুকিয়ে দিতে বলল। কারণ, সন্ধ্যায় গাড়ি সরালে নাকি মাঝরাতে উঠে আরও একবার সরাতে হবে। সেই রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে করতে সেই প্রথম ও নিনা দার্কতের কথা ভাবা ছাড়াও ক্যারিবিয়ান দ্বীপের কারতাহেনা শহরের বাজারে কলরব মুখর শুঁড়িখানাগুলোয় ওকে যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়ে যে রাতগুলো কাটাতে হত, সে কথাও স্মরণ করছিল। আরুবা থেকে আসা দ্রুতগামী জাহাজগুলো যে ঘাটে নোঙ্গর করত, তারই পাশের রেস্তোরাঁর ভাজা মাছ আর নারকেল মেশানো ভাতের স্বাদটাও ওর মনে পড়ল। বাড়ির কথাও মনে পড়ল। সেখানে হালকা বেগুনি রঙের দেওয়াল। যেন গতকাল সন্ধে সাতটার ঘটনা—এমনভাবে ওর মনের পটে ভেসে ওঠে—বাবা গাড়িবারান্দার শীতল পরিবেশে সিল্কের পাজামা পরে খবরের কাগজ পড়ছেন।

মাকেও মনে পড়ল। বয়ে যাওয়া সময় সম্পর্কে একেবারে নিস্পৃহ মানুষটা বাড়ির কোথায় কী করছে,—কেউ বুঝতে পারে না। সকলের ভালোবাসার পাত্রী ওর মা প্রয়োজনের থেকে একটু বেশিই কথা বলেন। তিনি খুব সুন্দর পোশাকে নিজেকে সাজান। রাত ঘনালেই কানের পেছনে একটা গোলাপ গুঁজে দেন। চমৎকার বুনোটের পোশাকের বোঝায় গুমোট গরমে হাঁসফাঁস করেন। এক বিকেলে—তখন ওর বয়স মাত্র সাত—দরজায় শব্দ না করেই মায়ের ঘরে ঢুকে পড়ে এক খুচরো প্রেমিকের সঙ্গে মাকে নগ্ন অবস্থায় দেখেছিল। তবে দুর্ঘটনাটা আর কখনও আলোচিত হয়নি। বরং এতে মা ও ছেলের পরস্পরের দুষ্কর্মের ব্যাপারে চোখ বুজে থাকার একটা অভ্যেস গড়ে ওঠে। এবং এই বোঝাপড়াটা ভালোবাসার বন্ধনের চেয়েও কার্যকরী হয়েছিল। সেই ঘটনা এবং মা-বাবার একমাত্র সন্তান হওয়ার জন্য বিলির নিঃসঙ্গ শৈশবে আরও যে সব ভয়াবহ ব্যাপার ঘটেছিল, তা নিয়েও আর ভাবেনি। অথচ প্যারিসের এক চিলেকোঠায় বিছানায় শুয়ে ছটফট করার সময় সেইসব ভাবনাগুলো ওকে আবার পেয়ে বসল। অথচ মন খুলে দুঃখের কথা বলার মতো কেউ পাশে নেই। তখন বিলি নিজের ওপরই প্রচণ্ড রেগে গেল। কান্নার ইচ্ছে সত্ত্বেও কাঁদতে পারল না।

ঘুম না হওয়ায় কাজ হল। দুঃসহ এক রাতের তিক্ত স্মৃতি নিয়ে শুক্রবার সকালে ও বিছানা ছাড়ল। জীবনের একটা মানে খুঁজে পাওয়ার জন্য ওর রোখ চেপে গেল। অবশেষে ও ঠিক করল, স্যুটকেসের তালা ভাঙবে। তারপর জামাকাপড় পালটাবে। কারণ, চাবির গোছাটা পড়ে রয়েছে নিনার হাত ব্যাগে। নোট, খুচরো এমনকি নাম-ঠিকানার খাতাটাও ওই ব্যাগেই রয়ে গেছে। খাতাটা সঙ্গে থাকলেও বিলি প্যারিসে দু-চারজন চেনাশোনা লোকের ফোন নম্বর খুঁজে বের করতে পারত। কফিখানায় নিয়মিত যাতায়াত করতে করতেই ফরাসি ভাষায় 'হ্যালো' বলার বিষয়টা বিলির শেখা হয়ে গেছে। হ্যাম, স্যান্ডউইচ আর সাদা কফির অর্ডার ও ফরাসিতেই দিতে শিখে ফেলেছে। বিলি এ-ও জানত যে ওর পক্ষে মাখন বা যে কোনওরকমের ডিমের অর্ডার দেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ ওগুলোর ফরাসি উচ্চারণ ও শিখবে না। তাছাড়া রুটিতে সব সময়ই মাখন মাখানো থাকে আর সেদ্ধ করা ডিমগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখায়, নিজের হাতেই তুলে নেওয়া যায়। তিনদিনের দিন ওয়েটাররা ওকে চিনতে তো পারলই

বরং চাহিদা বোঝাতে ওরা ওকে সাহায্যও করল। আর সেই জন্যই শুক্রবার মধ্যাহ্নভোজের সময় নিজের অধিকার নিয়ে ভাবতে ভাবতেই ও ভাজা আলু মেশানো বাছুরের রাং-এর মাংস এবং এক বোতল মদের অর্ডার দিয়ে দিল। বোতলটার অর্ধেক শেষও করে ফেলল। তারপর যেভাবে হোক হাসপাতালে ঢুকতেই হবে এমন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিলি রাস্তাটা পেরোল। কোথায় খুঁজলে নিনা দাকঁতের দেখা পাওয়া যাবে,—ওর জানা নেই। কিন্তু এশীয় ডাক্তারের ঐশ্বরিক চেহারাটা ওর মনে গাঁথা আছে। ডাক্তার ভদ্রলোককে খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে ও স্থির নিশ্চিত। সদরের বদলে জরুরি বিভাগের দরজাটা বেছে নিল বিলি। কারণ, ওটাই বিলির কাছে কম সুরক্ষিত মনে হল। কিন্তু যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে নিনা দাকঁতেকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছিল সেই জায়গাটাই বিলি পেরোতে পারল না। ওর পিছু নিল রক্তের ছিটে লাগা পোশাক পরা এক রক্ষী। ফরাসিতে একই প্রশ্ন বার বার করে চলে সেই রক্ষী। অবশেষে এত জোরে সে বিলির হাত চেপে ধরল যে বিলি ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল। চেন ঘোরানো মস্তানের কায়দায় লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল বিলি সাঞ্চেস্। রক্ষীটি 'মা' তুলে গালাগালি করল। কাঁধের কাছে বিলির হাতটাকে পেছন থেকে মুচড়ে তুলে ধরল। মাকে জড়িয়ে খিস্তি খেউড়ও বৃষ্টির মতোই চলতে থাকে। চরম যন্ত্রণা দিতে দিতে বিলি সাঞ্চেস্কে সে প্রায় দরজার কাছে নিয়ে গেল। তারপর বিলিকে প্রায় আলুর বস্তার মতো করে রাস্তার ঠিক মধ্যিখানে সে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সদ্য পাওয়া শাস্তির যন্ত্রণা অনুভব করতে করতে সেই বিকেল থেকেই ও যেন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে লাগল। প্রথমে ঠিক করল দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। এমন অবস্থায় নিনা দাঁকতেও তাই করত। হোটেলের দারোয়ানটা—এমনিতে অমিশুকে হলেও বিলিকে খুবই সাহায্য করে। যথেষ্ট ধৈর্য ধরে সে বিলির ভাষা বুঝতে চাইত। সেই-ই টেলিফোন নম্বর খুঁজে নিয়ে বিলিকে দিল। একজন খুবই অমায়িক মহিলা ফোন ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিলি সাঞ্চেস্ তাঁর ধীর ও একঘেয়ে স্বরের মধ্যে আন্দিজ পর্বতমালা এলাকার শব্দ ও বাচনভঙ্গি চিনে ফেলল। প্রথমে বিলি নিজের পরিচয় দিল। পুরো নামটা বলল। দুটো বিখ্যাত পরিবারের নাম যে মহিলাকে প্রভাবান্বিত করবেই এ ব্যাপারে বিলি নিশ্চিন্ত। কিন্তু টেলিফোনের মহিলার স্বর পালটাল না। যেন মুখস্থ করা বুলি আওড়াচ্ছেন এমন ভাবে তিনি বলতে থাকেন,—'মহামহিম রাষ্ট্রদূত এই মুহূর্তে দপ্তরে নেই। কালকের আগে আসবেনও না। আর যা কিছুই দরকার থাক না কেন, এমন কি একান্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও, আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।' বিলি সাঞ্চেস্ বুঝল যে এইভাবে নিনা দাকঁতেকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেমন অমায়িক ভঙ্গিতে মহিলাটি ওর সঙ্গে কথা বলছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই খবরটা দেওয়ার জন্য বিলি তাঁকে ধন্যবাদ জানাল। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে ও দূতাবাসের দিকে রওনা দিল।

প্যারিসের সব থেকে শান্ত অঞ্চলগুলোর অন্যতম 'রু দ্য শাম্পস্-ইলিজিস্' এলাকার বাইশ নম্বর বাড়িতে দূতাবাসটি অবস্থিত। বহু বছর বাদে 'কারতাহেনা দে ইন্দিয়াস্'-এ বিলি সাঞ্চেস্ আমায় বলেছিল যে ওখানে যাবার পর সেদিনই নাকি প্যারিসে ও প্রথম রোদ্দুর দেখেছিল। ক্যারিবিয়ান দ্বীপের মতো সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ভাসছিল। ঝলমলে আকাশের পটভূমিতে শহরের ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা আইফেল টাওয়ার দেখতে দেখতে বিলি নাকি অভিভূত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রদূতের তরফে যে ভদ্রলোক বিলি সাঞ্চেস্কে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে দেখে মনে হল সদ্য কোনও কঠিন অসুখ থেকে সেরে উঠেছেন। কেবলমাত্র তাঁর কালো স্যুট, ভারী কলার এবং অনুজ্জ্বল রঙের টাই,—এই সব মিলিয়ে তাঁকে অমন মনে হচ্ছিল তা নয়,—তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর আর সুবিবেচকের মতো ভাবভঙ্গিও এর জন্য দায়ী। বিলি সাঞ্চেসের উদ্বেগের যৌক্তিকতা তিনি বুঝতে পারেন। কিন্তু একটুও বিবেচনাবোধ না হারিয়ে বিলিকে তিনি মনে করিয়ে দেন তাঁরা এমন একটা সভ্য দেশে বসবাস করছেন যার কঠোর নিয়মগুলো সব থেকে প্রাচীন ও নিপুণ নিয়ম-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমেরিকার বর্বর দেশগুলোর থেকে নিশ্চয়ই এটা ভালো। কারণ, ও দেশগুলোর হাসপাতালে অসময়ে ঢুকতে গেলে দারোয়ানকে ঘুষ দিলেই হয়।

'না গো বাছা! হয় না',—তিনি শেষ পর্যন্ত বলেই দিলেন। যুক্তিপূর্ণ নিয়মটা মেনে নিয়ে মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া বিলি সাঞ্চেসের অন্য কোনও উপায়ই আর রইল না।

'আর তো মোটে চারটে দিন',—তিনি কথা শেষ করেন। 'এর মধ্যে লুভর ঘুরে এস। ওটা সত্যিই দেখার মতো।'

ওখান থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে বিলি সাঞ্চেস্ দেখল কখন যেন 'প্লেস দ্য লা কন্‌কর্দে' চলে এসেছে। ওখান থেকে বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে আইফেল টাওয়ার নজরে এল। টাওয়ারটা খুব কাছে মনে হওয়ায় জেটি বরাবর হেঁটে ও আইফেল টাওয়ারের কাছে পৌঁছাতে চাইল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারল যে যতটা কাছে ভেবেছিল,—ততটা নয়। যতই এগোয় ততই যেন ওটা দূরে সরে যায়। অবশেষে ও সেইন্ নদীর ধারে একটা বেঞ্চিতে বসে নিনা দার্কঁতের কথা ভাবতে শুরু করে। সেতুর তলা দিয়ে গুন টেনে নিয়ে যাওয়া একটা নৌকো ওর চোখে পড়ল। ওগুলোকে ওর নৌকো বলে মনে হয় না,—মনে হয় যেন চলমান বাড়ি। লাল ছাদ। জানালার গোবরাটে ফুলের টব। ডেকের ওপর টাঙানো রয়েছে কাপড়-জামা শুকোনোর দড়ি। এক নিশ্চল মৎস্য-শিকারির ওপর অনেকক্ষণ ধরে ওর চোখ স্থির। স্রোতের মধ্যেও লোকটার হাতের ছিপ আর বঁড়শি আটকানো সুতোটার কোনও নড়াচড়া নেই। এই নিশ্চল ভাবটা কেটে যাওয়া দেখার জন্য সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করল বিলি। তারপর বেহাল হয়ে হাল ছেড়ে দিল। ট্যাক্সি করে হোটেলে ফিরবার সিদ্ধান্ত নিল। ঠিক তখনই ওর খেয়াল হল যে হোটেলের নাম-ঠিকানা কিছুই তো জানা নেই। হাসপাতালটাও প্যারিসের ঠিক কোনখানে সে ধারণাও নেই ওর।

আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে প্রথমে যে কাফেটা চোখে পড়ল তাতেই বিলি সাঞ্চেস্ ঢুকে পড়ল। ফরাসি ব্র্যান্ডি চেয়ে নিয়ে শান্তভাবে গুছিয়ে নিতে শুরু করল চিন্তাভাবনাগুলো। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দেওয়ালের আয়নায় বিভিন্ন কোনা থেকে নিজেকে দেখার ছলে বিলি আসলে নিজের আতঙ্কগ্রস্ত নিঃসঙ্গ ভাবটাই দেখছিল। জন্মের পর এই প্রথম মৃত্যুর বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করল। মদের দ্বিতীয় গেলাসে চুমুক দিয়ে ও বেশ স্বস্তি পেল আর তখনই দূতাবাসে ফিরে যাবার বুদ্ধিটা যেন ভগবানই বিলিকে জুগিয়ে দিল। দূতাবাসের ঠিকানা লেখা কার্ডটা পকেট থেকে বের করল। ও আবিষ্কার করল কার্ডের উল্টো পিঠে হোটেলের নাম ও রাস্তার নম্বর ছাপা আছে। অভিজ্ঞতাটা ওকে এত ঘাবড়ে দেয় যে একমাত্র খাওয়া আর রাস্তার এধার থেকে ওধারে গাড়ি সরানোর জন্য ছাড়া শনি আর রবিবারে বিলি ঘর থেকেই বেরোল না। প্যারিসে পৌঁছোনোর দিন সকালে যেমন জঘন্য বৃষ্টি পড়ছিল সেই রকম বৃষ্টি তিন দিন ধরে হয়েই চলেছে। বিলি সাঞ্চেস্, যে কখনও একটা বই পুরো পড়ে শেষ করেনি, সেই বিলিও ভাবল একঘেয়েমি তাড়াতে একটা বই থাকলেও বোধহয় ভালো হত। বউয়ের স্যুটকেস ঘেঁটে যে বইগুলো পেল সেগুলোর সবকটাই স্প্যানিশ ছাড়া অন্য ভাষায় লেখা। আর সেজন্যই ও মঙ্গলবারের জন্য অপেক্ষা করে যেতে থাকে। ঘরের দেওয়ালে সাঁটা ওয়ালপেপারে ছাপা ময়ূরের ছবির পুনরাবৃত্তি নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে ভাবে। আর নিনার ভাবনাটা তো সর্বক্ষণের সঙ্গী। সোমবার ঘরটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাবার সময় ওর মনে হল ঘরের এই চেহারা দেখে নিনা দাকঁতের কী প্রতিক্রিয়া হবে। আর শুধু তখনই ওর চোখে পড়ল,—নেউলের চামড়ার কোটটায় শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। সেই বিকেলেই ও সুগন্ধি সাবান ঘষে দাগটাকে তুলবার চেষ্টা করল। নিনার ব্যাগে সাবানটা ছিল। অবশেষে মাদ্রিদে এরোপ্লেনে পৌঁছে দেবার সময় কোটটার যে চেহারা ছিল সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় বিলি সফল হল।

মেঘে ঢাকা আকাশ আর কন্‌কনে ঠান্ডা নিয়ে এল মঙ্গলবার। কিন্তু বৃষ্টি নেই। সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে হাসপাতালের সদরের সামনে শুরু হল বিলির অপেক্ষা। ওখানে রোগীদের আত্মীয়দের ভিড়। রোগীদের জন্য ওরা পুষ্পস্তবক এনেছিল। নেউলের চামড়ার কোটটা হাতে নিয়ে ভিড়ের সঙ্গেই বিলি হাসপাতালে ঢুকে পড়ল। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। নিনা দার্কঁতে কোথায় থাকতে পারে সে সম্পর্কে ওর কোনও ধারণাই নেই। তবে বিলির আশা এশীয় ডাক্তারটার সঙ্গে অবশ্যই দেখা হবে। ফুল আর বুনো পাখিতে ভরা একটা বিশাল উঠোনের দু'দিকেই রোগীদের ঘর। ডানদিকের

ঘরগুলো মহিলাদের আর বাঁ দিকেরগুলো পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট। অন্যান্যদের সঙ্গে বিলি মহিলাদের ঘরের দিকেই এগোল। হাসপাতালের পোশাক পরা মহিলারা সার বেঁধে বিছানায় বসে আছে। জানালা দিয়ে আসা পর্যাপ্ত আলোর ছটায় ওরাও তখন উদ্দীপ্ত। এমনকি বিলি সাঞ্চেস্‌ও ভাবল যে বাইরে থেকে যেমন মনে হয়, হাসপাতালের ভেতরের পরিবেশটা তার থেকে বেশি আনন্দের। রোগীদের মধ্যে নিনা দাকঁতে নেই,—এটা নিশ্চিতভাবে না বোঝা পর্যন্ত বিলি করিডরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে এল। তারপর বাইরের বারান্দায় একটু ঘুরে বেড়াল। পুরুষ রোগীদের জানালায় উঁকি মারল। আর তখনই ওর মনে হল এতদিন ধরে খুঁজে বেড়ানো ডাক্তারকে চেনা গেছে।

সত্যিই ও চিনতে পেরেছিল। আরও কয়েকজন ডাক্তার ও নার্সকে সঙ্গে নিয়ে সেই ডাক্তার এক রোগীকে পরীক্ষা করছিলেন। বিলি সাঞ্চেস্ ঘরে ঢুকে পড়ল। দলটার মধ্যে থেকে একজন নার্সকে ছিটকে সরিয়ে দিয়ে ও এগিয়ে গেল। তারপরই এশীয় ডাক্তারের মুখোমুখি ও দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এতদিন কোন নরকে কাটাচ্ছিলে?'—ডাক্তার প্রশ্ন করলেন। বিলি সাঞ্চেসের তখন বিমূঢ় অবস্থা। 'হোটেলে',—ও বলল। 'এখানকারই একটায়—ওই তো রাস্তার মোড়ের কাছে।'

তারপর ও শব্দটা শুনল। ন'-ই জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার সন্ধে সাতটা দশ মিনিটে ফ্রান্সের সব থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকদের ষাট ঘণ্টাব্যাপী একটানা প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে রক্তঝরা অবস্থাতেই নিনা দাকঁতে মারা গেছে। শেষ পর্যন্ত নিনা স্বাভাবিক এবং শান্ত ছিল। প্লাজা-আথেনিতে ওর স্বামীর খোঁজ করাব কথা নিনা সবাইকে বলেছিল। প্লাজা-আথেনি হোটেলেই নাকি নিনা আর বিলির জন্য ঘর ভাড়া করা ছিল। নিজের মা-বাবার সঙ্গে যোগাযোগের দরকারি তথ্যটুকু দেওয়ার কথাও নিনা ভোলেনি। ফ্রান্সের বিদেশ মন্ত্রক থেকে নিনার দেশের দূতাবাসে শুক্রবারে জরুরি তারবার্তা পাঠানো হয়। ততক্ষণে নিনা দাকঁতের মা-বাবা প্যারিসের পথে রওনা দিয়েছেন। রাষ্ট্রদূত নিজে মৃতদেহেব পচন নিবারণ ও অন্ত্যেষ্টির দায়িত্ব সামলাতে ব্যস্ত। প্যারিসের পুলিশ সদর-দপ্তরের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রেখে চলেছেন, যাতে বিলি সাঞ্চেস্‌কে খুঁজে পাওয়া যায়। শুক্রবার রাত থেকে রবিবার বিকেলে পর্যন্ত বিলির চেহারার বর্ণনা দিয়ে রেডিও-টেলিভিশনে জরুরি বুলেটিন প্রচার করা হয়। ওই চল্লিশ ঘণ্টা ধরে গোটা ফ্রান্সে বিলি সাঞ্চেস্‌কেই সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ নিয়ে খোঁজা হচ্ছিল। নিনা দাকঁতের হাত ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা বিলির একটা ফটোগ্রাফ প্যারিসেব বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শিত হয়। ছাদ খুলে ফেলা যায় এমন তিনটি একই মডেলের বেন্টলে গাড়িও চিহ্নিত করা হয়েছিল। তবে ওগুলোর কোনওটাই বিলি সাঞ্চেসের নয়।

শনিবার দুপুরে নিনা দাকঁতের মা-বাবা এসে পৌঁছোন। বিলি সাঞ্চেস্‌কে খুঁজে পাওয়া যাবে এই আশায় মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে তাঁরা শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। বিলি সাঞ্চেসের মা-বাবাকেও খবর দেওয়া হয়েছিল। তাঁরাও প্যারিসে উড়ে আসার জন্য তৈরি ছিলেন। কিন্তু তাববার্তাব মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি থাকায় তাঁরা শেষ পর্যন্ত রওনা দেননি।

যে বিশ্রী হোটেলে শুয়ে নিনা দাকঁতের প্রেমে কাতব বিলি সাঞ্চেস নিঃসঙ্গতাব যন্ত্রণায় ছটফট করছিল তার থেকে মাত্র দু'শো মিটার দূরে রবিবাব দুপুর দু'টোয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দূতাবাসের যে ভদ্রলোক বিলি সাঞ্চেস্‌কে অভ্যর্থনা করেছিলেন, কয়েক বছর বাদে তিনি আমায় বলেন,—বিলি সাঞ্চেস্ তাঁর দপ্তর থেকে চলে যাওয়াব ঘণ্টাখানেক বাদে বিদেশমন্ত্রক থেকে পাঠানো তারবার্তাটা তিনিই নাকি গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি নাকি 'রু দ্য ফাউবুর্গ-সেইন্ট-অনোরে' এলাকার সজ্জিত পানশালাগুলোয় ছেলেটার খোঁজ করেছিলেন। প্রথম দর্শনে তিনি যে বিলি সাঞ্চেস্‌কে পাত্তা দেননি,—তা-ও তিনি স্বীকার করেন। কারণ, প্যারিসের বৈচিত্র্যে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া ও ভেড়ার লোমের বেঢপ একটা জ্যাকেট পরিহিত ক্যারিবিয়ান উপকূলের ছেলেটা যে অত বিখ্যাত পরিবারের সন্তান হতে পারে এটা তাঁর কল্পনাতেও আসেনি।

সেই রাতে, যখন বিলি সাঞ্চেস্ তীব্র আবেগে সঞ্জাত কান্না চাপছিল তখন নিনা দাকঁতের মা-বাবা বিলিকে খুঁজবার কাজে ক্ষান্ত দেন। ওষুধ দিয়ে অবিকৃত রাখা মৃতদেহটা কফিনে ভরে

ওঁরা চলে যান। যারা দেখেছিল, অনেক বছর ধরে বার বার তারা একই কথা বলেছে—অমন সুন্দরী নারী—জীবিত বা মৃত—তাদের চোখে অন্তত পড়েনি। কাজেই মঙ্গলবার সকালে বিলি সাঞ্চেস্ যখন হাসপাতালে ঢুকল, লা মাঙ্গার কবরস্থানে মেয়েটি তখন সমাধিস্থ। ওদের সুখের প্রথম আশ্রয় হিসেবে যে বাড়িটা ওরা ব্যবহার করেছিল, তার থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে এই সমাধিক্ষেত্র। যে এশীয় ডাক্তার বিলিকে দুঃখজনক কাহিনিটা শুনিয়েছিলেন, তিনিই হাসপাতালের প্রতীক্ষালয়ে এসে ওকে কয়েকটা ঘুমের বড়ি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিলি নেয়নি। ডাক্তারকে বিদায় বা ধন্যবাদ না জানিয়েই ও বেরিয়ে পড়ল। সেই মুহূর্তে বিলি সবচেয়ে দরকারি হিসেবে এমন একজনের কথা ভাবছিল যে নিজের দুর্ভাগ্য নিজেই ডেকে আনার শাস্তি হিসেবে শিকলের আঘাতে ওর মাথার ঘিলু বের করে দিতে পারে। হাসপাতালের বাইরে এসে বিলি বুঝতে পারল না যে আকাশ ভেঙে ঝরে পড়া বরফে তখন আর রক্তের ছাপ নেই। পায়রার নরম পালকের মতো বরফের টুকরো ঝরছে তো ঝরছেই। বিলি সাঞ্চেস্ খেয়াল করল না কখন প্যারিসের রাস্তা উৎসবের হুল্লোড়ে মেতেছে। কারণ, গত দশ বছরে এত বেশি তুষারপাত আর হয়নি।

মূল শিরোনাম **El rostro de tu sangre en la nieve**

বেচারি এরেনদিরা ও তার নির্দয় ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনি

ঠাকুমাকে স্নান করাবার সময় থেকেই বইতে শুরু করে এরেনদিরার দুর্ভাগ্যের বাতাস। মরুভূমিতে নিঃসঙ্গভাবে একা দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ধবধবে জ্যোৎস্না-সাদা প্রাসাদটি প্রথম আঘাতেই কাঁদতে শুরু করেছে। কিন্তু এরেনদিরা আর তার ঠাকুমা সেখানকার বন্য প্রকৃতির অনিশ্চয়তার সঙ্গে অভ্যস্ত। এবং সেই কারণে এক সারি ময়ূর আর হালকা রোমান মোজাইকে সাজানো বাথরুমে থাকাকালীন সময়ে তারা বাতাসের খামখেয়ালিপনাকে খুব বেশি পাত্তা দেয়নি। মার্বেল পাথরের বাথটাবে বিশালকায় নগ্ন ঠাকুমাকে দেখাচ্ছে একটা চমৎকার সাদা তিমির মতো। সে তুলনায় সবে চোদ্দো পেরোনো নাতনি অবসন্ন, তুলতুলে আর বয়স অনুপাতে যথেষ্ট বিনীত। মিতব্যয়ের কাছে যেন কঠোরভাবে উৎসর্গীকৃত এমন একটা ভাব নিয়ে ঠাকুমাকে গাছগাছড়া আর কবিরাজি লতাপাতা সিদ্ধ করা জলে স্নান করাচ্ছে এরেনদিরা। মহিলা উবু হয়ে বসে আছেন। ইস্পাতকঠিন চুল পিঠ ছাপিয়ে বেয়ে পড়েছে আর কাঁধ দুটো এত চওড়া যে নাবিকরাও লজ্জা পাবে।

'কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম আমি একটা চিঠির জন্যে হন্যে হয়ে বসে আছি,'—ঠাকুমা বললেন।

একেবারেই এড়াতে না পারলে এরেনদিরা কথা বলে না। ও জিজ্ঞেস করল,—'স্বপ্নের দিনটা কী বার ছিল?'

'বিষ্যুতবার।'

'তাহলে ওটা দুঃসংবাদ বয়ে আনা চিঠি',—এরেনদিরা বলল। 'কিন্তু ওটা তো কিছুতেই আসবে না।'

স্নান করিয়ে সে ঠাকুমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ঠাকুমা এতই থলথলে মোটা যে নাতনির কাঁধে ভর না দিয়ে তাঁর পক্ষে হাঁটা সম্ভব নয়। যেন ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় একটা মাংসের ঢিবি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এতটা বিপর্যস্ত অবস্থাতেও তাঁর মধ্যে একটা ঝিমিয়ে পড়া বনেদিয়ানা ফুটে ওঠে। সমস্ত বাড়ির মতো শোবার ঘরটিও প্রাচীন অথচ সাজসজ্জা অত্যন্ত রুচিপূর্ণ। ঠাকুমাকে ফিটফাট করতে এরেনদিরার আরও ঘণ্টা দুয়েক দরকার। চুলের প্রতিটি গাছায় আলাদা করে সুগন্ধী তেল মাখিয়ে, সুন্দর ফুলেল পোশাক পরিয়ে, মুখে ট্যালকম পাউডার লাগিয়ে, ঠোঁট গাঢ় লাল লিপস্টিকে রাঙিয়ে, চোখের পাতায় কাজল দিয়ে, নখে মুক্তোর মতো নেলপালিশ লাগিয়ে একটি প্রমাণ আকারের পুতুলের মতো নকল বাগানের সিংহাসনের মতো চেয়ারে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে এল এরেনদিরা। তিনি রেকর্ডের গান শুনতে লাগলেন।

অতীত স্মৃতির আতিশয্যে ঠাকুমা যখন আপ্লুত, এরেনদিরা ততক্ষণে ঘরদোর পরিষ্কার করতে শুরু করে দিয়েছে। অন্ধকারে ডুবে থাকা হলঘরটা প্রাচীন দৈত্যের মতো আসবাবপত্র আর মূর্তিতে ঘিঞ্জি হয়ে রয়েছে। চোখের জলের মতো ঝরে পড়া ঝাড়বাতিগুলি যেন অ্যালবাট্রাস পাখির মতো ডানা মেলে উড়তে চাইছে। এছাড়া সোনার পাতে মোড়া বিশাল পিয়ানো আর অভাবনীয় কিছু মান্ধাতার আমলের বিরাট দেওয়াল ঘড়ি অন্ধকারকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করেছে। উঠোনে জল রাখার বিরাট এক চৌবাচ্চা। দূরের ঝরনা থেকে (রেড) ইন্ডিয়ানদের পিঠে করে বয়ে আনা জল দিয়ে বরাবর এটা ভরা হয়। এছাড়া বাঁধা রয়েছে একটা নুয়ে পড়া উটপাখি ; এই হতভাগ্য পরিবেশে একমাত্র এটাই পালকাচ্ছাদিত প্রাণী। বাড়িটা সব কিছু থেকেই দূরে, মরুভূমির প্রায় মাঝখানে, আশপাশে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি দুর্ভাগ্যের পথ। দুর্ভাগ্যের বাতাস বইতে শুরু করলে সেই রাস্তাগুলোয় গোরু-ছাগল নিঃসঙ্গতার কারণে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

এই দুর্বোধ্য বাড়িটি বানিয়েছিলেন ঠাকুমার স্বামী, আমাদিস্। এই চোরাচালানকারীটির ঔরসেই ঠাকুমা একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন অন্তত সেইরকমই জনশ্রুতি। তার নামও আমাদিস্ এবং সে-ই

এরেনদিরার বাবা। পরিবারটির উৎস বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কারও কিছু জানা নেই। (রেড) ইন্ডিয়ানদের ভাষায় সবচেয়ে বেশি প্রচলিত গল্পটি এইরকম : অ্যান্টিলেস্-এর এক পতিতালয়ে একজনকে ছুরি চালিয়ে হত্যা করে বাবা আমাদিস্ সুন্দরী স্ত্রীকে উদ্ধার করার পর তাঁকে চিরকালের মতো মরুপ্রান্তরে স্থানান্তরিত করেন। আমাদিস্দের একজন শোচনীয় জ্বরে ভুগে আরেকজন মেয়েমানুষ নিয়ে কামড়াকামড়ি করতে গিয়ে গুলিতে মারা গেলে ঠাকুমা দু'জনের মৃতদেহই উঠোনে কবর দেন আর জনা চোদ্দো ঝি-চাকরানিকে বিদেয় করে দেন। তারপর থেকে তিনি বিশাল প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের ছায়ায় বসে পুরোনো দিনের জাঁকজমকের স্মৃতি রোমন্থন করছেন আর আজন্ম লুকিয়ে রাখা জারজ নাতনিটাকে তার আত্মত্যাগের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

ঘড়িতে দম দেওয়ার জন্য এরেনদিরার ঘণ্টা ছয়েক সময় দরকার। যেদিন থেকে তার দুর্ভাগ্যের শুরু সেদিন কিন্তু তাকে ঘড়িতে দম দিতে হয়নি, কারণ কাঁটাগুলো এত বেশি এগিয়ে গেছে যে পরের দিন সকাল পর্যন্ত সেগুলো চলতে পারে। কাজেই তার আগে কাঁটাগুলো ঠিকঠাক করার চেষ্টাটা নিতান্তই অসঙ্গত। ওদিকে ঠাকুমাকে স্নান করানো, জামাকাপড় পরানো, ঘর মোছা, দুপুরের রান্না করা, বাসনপত্র মাজা সবই করতে হয়। বেলা এগারোটা নাগাদ যখন সে উটপাখির গামলার জল পালটাচ্ছিল, আমাদিস্দের জোড়া কবরের পাশের কাঁটাগাছটায় জল দিচ্ছিল, তখন তাকে হাওয়ার রাগের সঙ্গে রীতিমতো লড়তে হচ্ছিল ; সে হাওয়া ছিল অপ্রতিরোধ্য, কিন্তু ক্ষণিকের তরেও এরেনদিরা বুঝতে পারেনি যে এটা তারই দুর্ভাগ্যের বাতাস। বারোটা নাগাদ মদের শেষ গেলাসগুলো মোছবার সময় তার নাকে ঝোল ফুটবার গন্ধ এল। অভাবনীয়ভাবে ভেনিসীয় মদের গেলাসগুলো না ভেঙে এবং নিজের ভাগ্য বিপদাপন্ন না করেই রান্নাঘরে পৌঁছে গেল এরেনদিরা।

কোনওরকমে কড়াইটা স্টোভের ওপর থেকে নামাল। রান্না হয়ে গেছিল অনেকক্ষণ আগেই। কষানো মাংসের সঙ্গে ঝোলটা মিশিয়ে দেবার পর সে একটা টুলে বসবার মতো কিছুটা অবসর পেল। চোখ দুটোকে বন্ধ করেই আবার খুলে ফেলল, যেন তাতে এতটুকু অবসাদও নেই। তারপর স্যুপটা বাটির মধ্যে ঢেলে দিল। এমনভাবে সে কাজ করছিল, মনে হচ্ছিল যেন সে ঘুমের ঘোরে কাজ করে যাচ্ছে।

ব্যাঙ্কোয়েট টেবিলের একপ্রান্তে ঠাকুমা আর রুপোর বাতিদানে বারোজনের জন্য বারোটা মোমবাতি। তিনি তাঁর ছোট্ট ঘণ্টাটা বাজালেন আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধোঁয়া ওঠা বাটি হাতে এরেনদিরা হাজির। পরিবেশনের সময় ঠাকুমা লক্ষ্য করলেন, এরেনদিরা সব কিছু ঘুমের ঘোরে করে চলেছে। যেন অদৃশ্য কাচের উপর হাত বুলোচ্ছেন এইভাবে তিনি এরেনদিরার চোখের সামনে হাত নাড়লেন ; মেয়েটি হাত দেখতে পেল না। ঠাকুমা শ্যেনদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন এবং যখন এরেনদিরা রান্নাঘরে যাবার জন্য পিছন ফিরল, তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন,—'এরেনদিরা।'

মুহূর্তের মধ্যে জেগে উঠে মেয়েটা বাটিটা ধপ করে কার্পেটের উপর ফেলে দিল।

'বাঃ! বাছা, বাঃ!'—ঠাকুমা যেন শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিলেন। 'আবার হাঁটতে গেলেই ঘুমিয়ে পড়বি।'

'আমার অভ্যেস আছে',—এরেনদিরা অজুহাত খুঁজল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেই সে বাটিটা তুলে কার্পেট সাফ করবার চেষ্টা করল।

'ছেড়ে দে',—ঠাকুমা নিষেধ করলেন। 'ওটা বরং বিকেলে পরিষ্কার করিস।'

সুতরাং তার বিকালের কাজের ফিরিস্তিতে বাড়ল আরেক দফা কাজ। খাবার ঘরের কার্পেটটা ধুয়ে ফেলল এরেনদিরা। কাপড় কাচার গামলার কাছে তার উপস্থিতি সোমবারের ধোপাখানার ব্যস্ততার মতো। বাতাস তখন বাড়িতে ঢোকার ফিকির খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজ-কর্মে এরেনদিরা এতই ব্যস্ত যে সেটা বুঝে উঠবার আগেই রাত্রি ঘনিয়ে এল। আর যখন কার্পেটটা পাতা শেষ হল তখন তার বিছানায় যাবার সময় হয়ে গেছে।

ঠাকুমা সারাটা বিকেল পিয়ানোর কাছে ঘুরঘুর করতে করতে তাঁর সময়ের কিছু গান বেসুরো গলায় গাইবার চেষ্টা করলেন। জল আর কাজলে মাখামাখি তার চোখ। কিন্তু রাতে যখন মসলিনের নাইটগাউন

পরে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন, তখন বাছাই-করা স্মৃতির তিক্ততাগুলো ফিরে এল।

'শোবার ঘরের কার্পেটটা কাল সকালে কাচার জন্য গোছগাছ করে রাখ',—এরেনদিরা বললেন। 'পাতার পর থেকে ওটা সূর্যের মুখ দেখেনি।'

'আচ্ছা, ঠাকুমা',—মেয়েটা জবাব দেয়।

পালকের পাখা দিয়ে সে নির্দয় মালকিনকে হাওয়া করতে লাগল, ততক্ষণে তিনি রাতের আদেশগুলো বিড়বিড় করে আওড়াতে আওড়াতে ঘুমে ঢলে পড়েছেন।

'শান্তিতে ঘুমোনোর জন্য সাদা জামাকাপড়গুলো শুতে যাবার আগেই ইস্তিরি করে রাখিস।'

'আচ্ছা, ঠাকুমা।'

'কাপড়চোপড়ের আলমারিগুলো একটু দেখে নিস। ঝোড়ো রাতেই পোকামাকড়গুলো বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে।'

'আচ্ছা, ঠাকুমা।'

'আর উটপাখিটাকে খেতে দিস।'

তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু তখনও আদেশ দিয়ে চলেছেন। বোঝা গেল, তার নাতনি তার কাছ থেকেই ঘুমিয়ে বেঁচে থাকাব আশ্চর্য ক্ষমতাটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। এবেনদিরা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেবিয়ে গেল। ঘুমন্ত ঠাকুমার আদেশগুলোয় সাড়া দিতে সে রাতেব শেষ কাজকর্মগুলো করে যাচ্ছে।

'কবরগুলোয় একটু জল দিস।'

'আচ্ছা, ঠাকুমা।'

'আর যদি আমাদিস্‌রা পৌঁছে গিয়ে থাকে, বলে দিস ভেতরে যেন না আসে',—ঠাকুমা বলে চললেন। 'পোরফিরিও গালানের দল ওদের খুন করাব জন্য অপেক্ষা করছে।'

এরেনদিরা আর কোনও উত্তর দিল না। সে জানে ঠাকুমা অবচেতনে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু সে একটা আদেশও উপেক্ষা কবল না। জানালার কুলুপগুলো ভালো করে দেখে নিয়ে সবগুলো বাতি নিভিযে, সে যখন একটা মোমবাতি হাতে খাবার ঘর থেকে তাব শোবার ঘরের দিকে এগোচ্ছিল, বাতাস তখন শান্ত-স্নিগ্ধ। নিদ্রিত ঠাকুমার শ্বাস নেবার শব্দ ছাড়া আর সবকিছু নিস্তব্ধ। তার ঘরও যথেষ্ট বিলাসবহুল, তবে ঠাকুমার ঘরের মতো নয়। আর সেখানে সদ্য ফেলে-আসা শৈশবের স্মৃতিবহ পশম আর রবারের পুতুলগুলো এদিক-ওদিকে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। রোজকার কাজের কঠিন দায়িত্ব শেষ করতে গিয়ে এখন জামাকাপড় ছাড়বার শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট নেই তার। কোনওরকমে মোমবাতিটা টেবিলে রেখে এরেনদিরা বিছানায় ডুবে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্ভাগ্যের বাতাস একদল রক্তপিপাসু কুকুরের মতো তার শোওয়ার ঘরে ঢুকে পড়ে মোমবাতিটাকে পর্দার ওপর আছড়ে ফেলল।

বাতাস একদম স্তব্ধ হল ভোরবেলায়। বিচ্ছিন্ন এক পশলা বৃষ্টিতে আগুনের শেষ ফুলকিটা নিভে গেছে। প্রাসাদের পোড়া ছাই জমা হয়েছে মাটিতে। গ্রামবাসীরা, অধিকাংশই (রেড) ইন্ডিয়ান, ছুট্‌কো-ছাট্‌কা কিছু জিনিস উদ্ধারের চেষ্টা করল ; যেমন উটপাখিটার দগ্ধ দেহ, সোনার পাতে মোড়া পিয়ানোর কাঠামোটা, একটা মূর্তির কঙ্কাল ইত্যাদি। ঠাকুমা অবশিষ্টাংশগুলি এক অভেদ্য হতাশা নিয়ে নিরীক্ষণ করে যাচ্ছিলেন। আমাদিস্‌দের কবর দুটোর মাঝখানের খালি জায়গাটায় উবু হয়ে বসে এরেনদিবা কান্না থামিয়েছে। অতি সামান্য কয়েকটি জিনিস অক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে দেখে ঠাকুমা একাগ্র করুণার দৃষ্টিতে নাতনির দিকে তাকালেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন,—'অভাগা মেয়ে, এই দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ করার জন্য তোর জীবনটাই যথেষ্ট নয়।'

সেদিন থেকেই এরেনদিরা নেমে পড়ল ক্ষতিপূরণের কাজে। বৃষ্টির মধ্যেই তাকে অল্প বয়সে বিপত্নীক হওয়া চামড়াসর্বস্ব গ্রামের দোকানদারটার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। কারণ মরুপ্রান্তরে কুমারীত্বর ভাল দাম দেবার জন্য লোকটি সর্বজনবিদিত। ঠাকুমা যখন বুক উঁচিয়ে বাইরে অপেক্ষমাণ, বিপত্নীকটি তখন বৈজ্ঞানিকসুলভ কঠোরতায় এরেনদিরাকে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত। উরু দুটোর শক্তি পরীক্ষা করে,

বুকের মাপ, পাছার ব্যাস মেপে, তার দাম কত হতে পারে মনে মনে এমন একটা হিসেব না কষে সে মুখ খুলল না। 'এখনও ও যথেষ্ট অপরিণত',—সে তারপর মুখ খুলল। 'ওর ঠোঁট দুটো কুত্তির মতো।'

তারপর এরেনদিরাকে একটা দাড়িপাল্লায় তার সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণের জন্য চাপিয়ে দিল। এরেনদিরার ওজন নব্বই পাউন্ড।

'একশো পেসোর বেশি কিছুতেই নয়',—বিপত্নীকটি মন্তব্য করল।

ঠাকুমা খিঁচিয়ে উঠলেন। 'একটা আনকোরা নতুন মেয়ের জন্য মাত্র একশো পেসো,—না মশাই, আপনার দিক থেকে সৌজন্যের যথেষ্ট ঘাটতি আছে।'

'আমি দেড়শো করতে পারি',—বিপত্নীকটি বলল।

'এই মেয়ে আমার দশ লাখ পেসোর চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে'—ঠাকুমা বললেন। 'এই দরে ক্ষতিপূরণ করতে ওর দু'শো বছর লেগে যাবে।'

'আপনি ভাগ্যবতী যে ওর শুধু ওই বয়সটাই আছে',—বিপত্নীকটি বলল।

দমকা হাওয়ায় ঘরটার প্রায় উড়ে যাবার অবস্থা। ছাদে এত ফুটো যে ভিতরেও বাইরের মতোই বৃষ্টি। বিপদের মাঝখানে ঠাকুমা নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করলেন। 'অন্তত তিনশোয় উঠুন',—তিনি বললেন।

'আড়াইশো।'

অবশেষে তারা দুশো কুড়ি পেসোয় সমঝোতায় এল। সেই সঙ্গে আরও কিছু সুবিধা। তারপর এরেনদিরাকে তিনি বিপত্নীকটির সঙ্গে চলে যেতে ইশারা করলেন। আর সেই লোকটা এরেনদিরার হাত ধরে এমনভাবে পিছনের ঘরে নিয়ে গেল যেন সে তাকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে।

'আমি তোর জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি',—ঠাকুমা বললেন।

'আচ্ছা, ঠাকুমা',—এরেনদিরা উত্তর দিল।

পিছনের ঘরটা চারটে থামের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা চালার মতন, পচা তালপাতার চাল,—তিন ফুট উঁচু একটা দেওয়ালের মতো, যা ডিঙিয়ে অনায়াসেই বাইরের দুনিয়া ভিতরে উঁকি মারতে পারে। দেয়ালের উপর ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা ভাঁড়, কিছু শুকনো লতাপাতা। দুটো থামের মাঝে ঝুলছে একটা চটা-ওঠা দোলনা, মনে হতেই পারে যে, স্বাধীনভাবে ওড়বার একটা বিচক্ষণ যন্ত্রের সমাবেশ ঘটেছে এখানে। ঝোড়ো হাওয়ার সাঁ সাঁ শব্দ ছাড়িয়েও যে কেউ শুনতে পারে দূরের জানোয়ারগুলোর ঘেউ ঘেউ, যেন জাহাজ ডুবে যাবার আগের মুহূর্তের আর্তস্বর।

চালার তলায় যাওয়ার পথেই এরেনদিরা আর বিপত্নীকটা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল যাতে ঝোড়ো হাওয়া তাদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে না পারে। অবশ্য ইতিমধ্যেই জলের ঝাপটা তাদের ভিজিয়ে দিয়েছে। তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল না ঠিকই কিন্তু তাদের গতিবিধি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। বিপত্নীকটির প্রথম আক্রমণ থেকে এরেনদিরা ছাড়া পাবার চেষ্টা করল। লোকটা নিঃশব্দে তার উত্তর দিল। কবজি ধরে তার হাতটা মুচড়ে দিয়ে হিঁচড়িয়ে নিয়ে চলল দোলনার দিকে। এরেনদিরা লোকটার মুখে আঁচড় কেটে বাঁচবার চেষ্টা করল ; তার মুখে নিঃশব্দ চিৎকার। এবং লোকটা একটা থাপ্পড় মেরে জবাব দিল। মাটি থেকে সে ঠিকরিয়ে উঠল। মেডুসার মতো এরেনদিরার ঘন কেশরাশি তখন হাওয়ায় উড়ছে। মেয়েটা মাটি ছোঁবার আগেই সে তার কোমর খামচে ধরল। জান্তব তাড়নায় তাকে দোলনার দিকে টেনে নিয়ে চলল। অবশেষে দুই হাঁটুর মাঝখানে তাকে শুইয়ে দিল। ততক্ষণে এলিয়ে পড়েছে এরেনদিরা। সন্ত্রস্ত হয়ে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। ঝোড়ো রাতের চাঁদের আলোয় বশীভূত মাছের মতো পড়ে আছে বেচারি। লোকটা এই ফাঁকে তাকে নগ্ন করতে শুরু করে দিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী থাবার আঁচড়ে তার পরিচ্ছদ ফাঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। যেন সে ঘাস কাটছে। এইভাবে সে রংচঙে জিনিসগুলোকে এদিক ওদিক উড়িয়ে দিল।

এরেনদিরার ভালোবাসা কেনার মতো যখন গ্রামে আর কেউ রইল না তখন চোরাচালানকারীদের এলাকায় যাবার জন্য ঠাকুমা তাকে একটা ট্রাকে তুলে দিলেন। তাঁদের স্থান হল ট্রাকের পিছনের খোলা

জায়গায়। সঙ্গে চালের বস্তা, শুয়োরের চর্বির বালতি আর আগুন থেকে বেঁচে যাওয়া কিছু উচ্ছিষ্ট : রাজকীয় পালঙ্কের মাথাটা, একটা যুদ্ধোদ্যত দেবদূতের মূর্তি, ঝলসানো সিংহাসনটা আর কিছু অপ্রয়োজনীয় কাঠের তক্তা। বড় বড় আঁচড় কাটা, ক্রুশ আঁকা একটা ট্রাঙ্কে করে আমাদিস্‌দের হাড়গুলিও চলল।

কড়া রোদ থেকে বাঁচবার জন্য ঠাকুমা মাথায় দিলেন এক শতচ্ছিন্ন ছাতা। ধুলো আর ঘামের প্রাচুর্যে শ্বাস নেওয়া প্রায় দায় হয়ে পড়েছে। এমন অস্বস্তিকর মানসিকতার মধ্যেও সমস্ত মর্যাদাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছেন তিনি। চালের বস্তা আর বালতিগুলোর আড়ালে খালাসির গাড়িভাড়া মিটিয়ে দিল এরেনদিরা। মাত্র কুড়ি পেসোর ভালোবাসা। প্রথম দিকে তার প্রতিরোধের কায়দা ছিল ঠিক সেইরকম, যেমনভাবে সে বিপত্নীকটার বিরুদ্ধে এগিয়েছিল। কিন্তু খালাসিটা বড্ড সাবধানী, ধীর ও বিজ্ঞ। এবং অবশেষে সে কোমলভাবে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটাল। সুতরাং মহাপ্রস্থানের প্রথম পর্ব শেষ করে তারা যখন প্রথম শহরে পৌঁছোল তখন দেখা গেল এরেনদিরা আর খালাসিটা ট্রাকের মাথায় বসে ভালোবাসার তৃপ্তিতে জিরোচ্ছে। ড্রাইভার ঠাকুমার উদ্দেশ্যে চেঁচাচ্ছে,—'এখান থেকেই ওই দুনিয়ার শুরু'।

ঠাকুমা অবিশ্বাসের চোখে খুঁটিয়ে দেখলেন ; একটু বড়সড় হলেও একইরকম দুঃখে ভরা, দারিদ্রপীড়িত নিঝুম রাস্তাঘাট,—যা তাঁরা এই আগেরটাতেই ফেলে এসেছেন।

'আমার এটা পছন্দ হচ্ছে না',—ঘাড় নাড়লেন তিনি।

'এটা মিশনের দেশ',—ড্রাইভার আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল।

'আমি দানছত্র খুলতে আসিনি, আমার প্রয়োজন স্মাগলারদের',—ঠাকুমা বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

মালপত্রের পিছন থেকে কথাবার্তা শুনতে শুনতে এরেনদিরা একটা চালের বস্তায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিল। হঠাৎ দড়ির মতো কিছু একটায় তার হাত ঠেকল। এক টানেই বেরিয়ে এল একটা সত্যিকারের মুক্তোর হার। চকচকে চোখে সে সেটার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন আঙুলের মধ্যে একটা মরা সাপ ঝুলছে, আর নিচে তখন ড্রাইভার ঠাকুমাকে জবাবদিহি করছে।

'দিন দুপুরে স্বপ্ন দেখো না, দিদিমা। তেমন কোনও স্মাগলার কোথাও নেই।'

'অবশ্যই নয়',—ঠাকুমা কথা কেড়ে নিয়ে বললেন। 'আমি তোমার কথায় গুরুত্ব দিচ্ছি।'

'চেষ্টা করে যে কোনও একজনকে খুঁজে পেতে জিজ্ঞেস করতে পার',—ড্রাইভার ধমকে উঠল। 'প্রত্যেকেই তাদের কথা বলছে, কিন্তু কেউই তাদের চোখে দেখেনি।'

খালাসিটা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছে যে এরেনদিরা একটা হার বের করে ফেলেছে। প্রায় কেড়ে নিয়ে সে কাঠি দিয়ে ওটাকে বস্তাবন্দি করল। এদিকে শহরটার দৈন্যদশা সত্ত্বেও ঠাকুমা এখানে থাকার বিষয়ে মন স্থির করে ফেলেছেন। নেমে আসার জন্য নাতনিকে ডাকলেন। অকস্মাৎ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সত্যিকারের একটা চুমু খেয়ে এরেনদিরা খালাসিটার কাছ থেকে বিদায় নিল।

সমস্ত জিনিস নামিয়ে দেওয়া পর্যন্ত ঠাকুমা রাস্তার মাঝখানে তাঁর সেই পুরোনো সিংহাসনে বসে অপেক্ষা করেছিলেন। শেষ জিনিস বলতে, আমাদিস্‌দের দেহাবশেষ বহনকারী ট্রাঙ্কটি।

'এটার ওজন, একটা মরা মানুষের মতন',—হাসতে হাসতে ড্রাইভার বলল।

'ওখানে ওরা দু'জন আছে',—ঠাকুমা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন। 'সুতরাং উপযুক্ত শ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার কর।'

'আমি বাজি ধরতে রাজি ; ওটার মধ্যে মার্বেলের মূর্তি আছে',—ড্রাইভার আবার হাসতে হাসতে বলল। উদাসীনভাবে হাড়ভর্তি ট্রাঙ্কটা পিয়ানোর ওপর নামিয়ে দিয়ে সে ঠাকুমার কাছে হাত বাড়াল।

'পঞ্চাশ পেসো',—সে বলল।

'ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকা তোমার চ্যালা ইতিমধ্যেই দাম পেয়ে গেছে।'

ড্রাইভার একটু অবাক হয়ে খালাসির দিকে তাকাল এবং দ্বিতীয়জন ঠাকুমার কথায় সায় দিল। ড্রাইভার গাড়ির কাছে ফিরে এল। এক শোকবিহ্বল মহিলা তার গাড়িতে উঠছে। তার কোলের বাচ্চাটা গরমে চিল-চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

খালাসিটা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঠাকুমাকে বলল,—'আপনি যদি মত দেন এরেনদিরা আমার সঙ্গে থাকছে। আমার উদ্দেশ্য সৎ।

মেয়েটা অবাক হয়ে বাধা দিল,—'আমি কিছু বলিনি।'

'পরিকল্পনাটা পুরোটাই আমার',—খালাসিটা বলল।

ঠাকুমা তাকে একবার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখলেন। তাকে ছোট করার জন্য নয়, কতখানি সাহসে ভর করে সে কথাটা বলছে তা বোঝবার জন্যে তিনি অমনভাবে তাকালেন।

'আমার মত আছে',—ঠাকুমা বলতে আরম্ভ করলেন। 'ওর অপদার্থতায় আমার যা লোকসান হয়েছে তা যদি তুমি মিটিয়ে দাও। আটশো বাহাত্তর হাজার তিনশো পনেরো পেসো থেকে বাদ যাবে চারশো কুড়ি। ওটা ও ইতিমধ্যেই মিটিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন হচ্ছে আটশো একাত্তর হাজার আটশো পঁচানব্বই।'

ট্রাকটা চলতে শুরু করেছে। 'বিশ্বাস করুন, আমার যদি অত পেসো থাকত, আমি ঠিক দিয়ে দিতাম',—খালাসিটা গভীরভাবে বলল। 'ওই মেয়ের জন্য অতটা দেওয়া যায়।'

ঠাকুমা ছেলেটার সংকল্পে সন্তুষ্ট হলেন। 'ভালো, তাহলে তোমার যখন হবে, তুমি এসো বাছা',—দরদ মাখানো স্বরে তিনি বললেন। 'কিন্তু এখন তোমার মানে মানে ভেগে যাওয়াই ভালো। কারণ, আবার হিসেব কষতে বসলে দশ পেসোর বেশি আমায় দিতে পারবে না।'

খালাসিটা ট্রাকটার পিছনে লাফিয়ে উঠে পড়ল। এবং ট্রাকটা চলে গেল। সেখান থেকেই সে এরেনদিরার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। কিন্তু এরেনদিরা এমনই হতবাক হয়ে আছে যে উত্তরটাও দিতে পারল না।

শূন্য ভাগ্যের হাতে ট্রাকটা তাদের ছেড়ে দেবার পর, এরেনদিরা আর তার ঠাকুমা দস্তার পাত আর প্রাচ্যদেশীয় কম্বলের অবশিষ্টাংশ দিয়ে সেদিনের মতো একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারপর শুয়ে পড়ল মাটিতে দু'টো মাদুর বিছিয়ে। মাথার উপরের টুটা ফাটা ফাঁকফোকর দিয়ে যতক্ষণ না সূর্যের প্রখর কিরণ এসে মুখ ঝলসে দিল ততক্ষণ মনে হচ্ছিল তারা প্রাসাদেই শুয়ে আছে।

স্বাভাবিক অবস্থার ঠিক বিপরীতভাবে ঠাকুমা সেই সকালেই এরেনদিরাকে ঠিকঠাক করতে লেগে গেলেন। পৈশাচিক সৌন্দর্যের শৈলীতে তিনি তাকে সাজিয়ে দিলেন, যা তার যৌবনের পক্ষে যথেষ্ট বেমানান। কৃত্রিম নখ দিয়ে আঁচড়িয়ে মাথার ঝুঁটিতে বেঁধে দিলেন ছোট্ট একটা রেশমী ফুল ; মনে হচ্ছিল একটা প্রজাপতি তার মাথায় সেঁটে রয়েছে।

'তোকে তো দারুণ দেখাচ্ছে',—তিনি মন্তব্য করলেন। 'কিন্তু এটাই ঠিক পথ। মেয়েমানুষ সংক্রান্ত ব্যাপারের কাছাকাছি এলেই পুরুষগুলো কেমন যেন বোকা বনে যায়।'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তাঁরা দুজনেই সেই মরুভূমিতে খচ্চরের খুরের শব্দ শুনতে পেলেন। ঠাকুমার নির্দেশ অনুযায়ী এরেনদিরা এক পেশাদার অভিনেত্রীর মতো পর্দা তোলার অপেক্ষায় মাদুরের উপর শুয়ে পড়ল। ক্রুশটা বুকে চেপে ঠাকুমা খচ্চরগুলোর জন্য বাইরে তাঁর সিংহাসনে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ডাকহরকরা আসছিল। তার বয়স বছর কুড়ি। কিন্তু কাজের ধরন তাকে বয়স্ক করেছে। পরনে খাকি পোশাক। হাঁটুতে ফেট্টি বাঁধা। মাথায় আঁটোসাঁটো হেলমেট আর বেল্টের সঙ্গে ঝুলছে একটা সামরিক পিস্তল। একটা খচ্চরের পিঠে সে নিজে চলেছে। আরেকটার পিঠে চাপানো রয়েছে গাদা করা ডাকের বস্তা,—সেটাকে সে সামনে নিয়ে চলেছে।

ঠাকুমার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে তাঁকে সেলাম করল ; চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি তাকে ভিতরে তাকাবার জন্য ইশারা করলেন। ছেলেটি থামল ; দেখল ভয়ংকর সাজে সজ্জিতা এরেনদিরাকে। পবনে তার ঝলমলে পোশাক।

'তোমার কি এরকমটা পছন্দ'?—ঠাকুমা প্রশ্ন করলেন।

ডাকহরকরা তখনও উদ্দেশ্যটা বুঝে উঠতে পারেনি।

'একজন ক্ষুধার্তের কাছে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খারাপ নয়',—সে হেসে বলল।

'পঞ্চাশ পেসো',—ঠাকুমা হাঁকলেন।

'বাপ রে, আপনি যে টাঁকশালকে ডাকছেন। ও দিয়ে আমি সারা মাস খেতে পারি',—ডাকহরকরার বিনীত উত্তর।

'কিপটেমি কোরো না',—ঠাকুমা বললেন। 'গির্জার পাদ্রিগুলোর থেকে হাওয়াই ডাকের লোকেরা বেশি রোজগার করে।'

'আমি স্থানীয় ডাক বিলি করি',—লোকটি বলল। 'ওরা পিক্-আপ্ ভ্যানে চলাফেরা করে।'

'যাক গে, ভালোবাসাটা খাবারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়',—ঠাকুমা বললেন।

'কিন্তু এটা তোমায় খাওয়াবে না',—লোকটির ছোট্ট জবাব।

ঠাকুমা উপলব্ধি করলেন, নেই মামার চেয়ে কানা মামাই ভালো। এর সঙ্গে দর কষাকষিটা আপাতত বন্ধ করা দরকার। 'তোমার কাছে কত আছে?'—তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

লোকটা খচ্চরের পিঠ থেকে নামল। পকেট হাতড়ে কয়েকটা দোমড়ানো-মোচড়ানো নোট বের করে ঠাকুমাকে দেখাল। ঠাকুমা ওর হাত থেকে এমনভাবে নোটগুলো খাবলে তুলে নিলেন যেন ওগুলো খেলার বল।

'আমি তোমার জন্য দর কমাচ্ছি',—তিনি বললেন। 'কিন্তু একটা শর্ত আছে। তুমি চারদিকে খবরটা রটিয়ে দেবে।'

'সবটাই দুনিয়ার অন্য দিকে',—ডাকহরকরাটা বলে বসে। 'আর তার জন্যই আমি আছি।'

এতক্ষণ চোখ খুলতে পারছিল না এরেনদিরা। নকল চোখের পাতা তুলে ফেলে সে তাব ক্ষণিকের বন্ধুকে জায়গা করে দেবার জন্য মাদুরের একপাশে সরে এল। ডাকহরকরা তাঁবুতে ঢুকতে না ঢুকতেই ঠাকুমা সশব্দে পর্দাটা টেনে দিলেন।

লেনদেনটা যথেষ্ট কার্যকর হল। ডাকহরকরার কথা শুনে, অনেক দূর-দুরান্ত থেকে আসা মানুষ-জনও এরেনদিরাকে চাখতে এল। মানুষের পিছু পিছু এল জুয়ার বোর্ড, খাবারেব দোকান এবং তাদেব পিছনে পিছনে এল সাইকেলে চাপা এক ফোটোগ্রাফার। সে তাঁবুর পাশে তেপায়ার উপরে কালো কাপড়ে ঢাকা একটা ক্যামেরা বসাল ; পিছনে টাঙাল উড়ন্ত হাঁসের ছবি আঁকা বড় একটা থিয়েটারের পর্দা। ঠাকুমা তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন। যেন তাঁর নিজের তৈরি রাজ্যে তিনি নিজেই পরবাসী। যারা এরেনদিরার কাছে যাবার জন্য অগ্রিম বুকিং করে নিজেদের পালার জন্য অপেক্ষা করছে সেইসব খদ্দেরদের লাইনটা ঠিকঠাক করার ব্যাপারেই ঠাকুমার একমাত্র উৎসাহ। প্রথমটায় তিনি এত কড়া ছিলেন যে, মাত্র পাঁচ পেসোর জন্য একজন ভালো খদ্দেরকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মাস কয়েক যেতে না যেতেই তিনি বাস্তবের কাছ থেকে শিক্ষা নিলেন। এবং যারা কখনও ধর্মীয় মেডেল, পারিবাবিক স্মৃতিচিহ্ন, বিয়ের আংটি প্রভৃতি দিয়ে দাম মেটাত অর্থাৎ যা কিছু দাঁতে কামড়ে তিনি বুঝতে পারতেন,—সোনা, তা সে চকচকে হোক আর নাই হোক, এমন লোকদেরও তিনি ঢুকতে দিতেন।

অনেকদিন শহরে থাকার সুবাদে ঠাকুমা একটা খচ্চর কেনার মতো যথেষ্ট উপার্জন করে ফেললেন। ঋণ শোধবার জন্য আরও অনুকূল জায়গার সন্ধানে তিনি মরুভূমির মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন। খচ্চরের পিঠে বসানো একটা ডুলিতে চেপে তিনি ভ্রমণ করতেন। প্রখর সূর্য তাপ থেকে বাঁচবার জন্য একটা শতচ্ছিন্ন ছাতা ব্যবহার করা হত। সেটা ধরে থাকে এরেনদিরা। চারজন (রেড) ইন্ডিয়ান কুলি ছাউনির যাবতীয় জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে তাদের পিছনে পিছনে চলে। শোবার মাদুর, বসবার সিংহাসন, নরম পাথরের তৈরি দেবদূতের মূর্তি আর সেই বাক্সটি যার মধ্যে আমাদিস্‌দের অবশিষ্টাংশ পড়ে আছে,—সব নিয়ে তাদের পথ পরিক্রমা। মরুপ্রান্তরের এই যাত্রীদলকে ফোটোগ্রাফারটি সাইকেলে চড়ে অনুসরণ করে। কিন্তু কখনও একসঙ্গে নয়, যেন সে অন্য কোনও উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছে।

গৃহদাহের মাস ছয়েকের মধ্যেই ঠাকুমা ব্যবসার একটা পরিষ্কার ছবি বুঝে নিতে পারলেন।

'যদি সবকিছুই এইভাবে চলে',—এরেনদিরাকে তিনি বললেন,—'তুই আট বছর সাত মাস এগারো দিনের মধ্যেই আমার ধারটা শোধ করতে পারবি।'

চোখ বুজে, পেসোর থলিটা হাতড়াতে হাতড়াতে যেন নিজেকে শুদ্ধ করার তাগিদে তিনি আবার হিসেবে ফিরে গেলেন।

'অবশ্য ওর মধ্যে (রেড) ইন্ডিয়ানদের থাকা-খাওয়া আর কিছু ফালতু খরচ ধরা হয়নি।'

খচ্চরটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মরুভূমির দাবদাহ আর ধূলিঝড়ে এরেনদিরা প্রায় শুয়ে পড়েছে। ঠাকুমার হিসেবে এতটুকুও আপত্তি না জানিয়ে সে উথলে ওঠা অশ্রু চাপল।

'আমার অস্থি-মজ্জা এক হয়ে গেছে',—সে বলল।

'ঘুমোবার চেষ্টা কর।'

'আচ্ছা, ঠাকুমা।'

সে চোখ বুজল। ঝলসানো বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিল। আর তাবপর,—হাঁটতে হাঁটতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ভয়ার্ত ছাগলেব পাল আর কিচিরমিচির করা পাখিতে ভর্তি খাঁচা নিয়ে একটা ছোট্ট ট্রাক এগিয়ে চলেছে। সান মিগুয়েল দেল দেজিয়েরতো-র জন্যে রবিবারে আস্তে ধীবে ঠান্ডা জল ভরার সময় যেমন শব্দ হয় পাখিদের কলতান সেইরকমই লাগছে। একজন ওলন্দাজ কৃষক প্রায় চাকার উপর বসে আছে। তার গায়ের চামড়া ফুটি-ফাটা আর নাকের তলায় প্রায় কাঠবেড়ালির মতো এক ঝুঁপো গোঁফ,—ওটা নিশ্চয়ই তার ঠাকুরদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে মিলেছে। পাশের সিটে বসে আছে তার ছেলে ইউলিসিস। আনন্দোচ্ছল দিনের নিঃসঙ্গতায় ভরপুর, উজ্জ্বল দেবদূতের মতো চাহনি নিয়ে বয়ঃসন্ধির এই ছেলেটি চুপচাপ বসে বয়েছে। ওলন্দাজ কৃষকটি সামনের তাঁবুটার সামনে স্থানীয় সৈন্যদের লাইনটা লক্ষ্য করল। তারা সব মাটিতে বসে। একটা বোতল সবার মুখে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সেটা থেকেই সবাই গলায় ঢালছে। তাদের মাথায় বাদাম গাছেব ডালপালা, যেন তারা ছদ্মবেশ ধারণ করেছে।

ওলন্দাজটা তাব নিজের ভাষায় জিজ্ঞেস করল,—'হতভাগারা ওখানে কী বিক্রি করছে?'

'একটা মেয়েমানুষ',—নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে তার ছেলে উত্তর দিল। 'ওব নাম এরেনদিরা।'

'তুই কী করে জানলি?'

'মরুভূমির সবাই জানে',—ইউলিসিস জবাব দিল। ছোট্ট এক সরাইখানায় ওলন্দাজটা তার জিনিসপত্র রেখে বেরিয়ে পড়ল। ট্রাকেই থেকে গেল ইউলিসিস। তড়িৎগতিতে সে তার বাবার রেখে যাওয়া ব্রিফকেসটা খুলে একতাড়া নোট নিজের পকেটে গুঁজল। তারপর সবকিছু আগের মতো রেখে বেরিয়ে পড়ল। রাতে বাবা ঘুমিয়ে পড়ার পর সরাইখানার জানালা বেয়ে সে নিচে নেমে এসে চলে গেল এরেনদিবার ডেরায়।

উৎসবের ঘটা তখন চরমে পৌঁছেছে। মাতাল লোকগুলো নিজেদের মধ্যেই নাচানাচি করছে, যেন বাজনাকে এমনি এমনি বেজে যেতে দিতে তারা রাজি নয়। আর এদিকে ফোটোগ্রাফার ম্যাগনেসিয়াম কাগজে রাতের ছবিগুলো তুলে যাচ্ছে। সতর্ক ব্যবসায়ী ঠাকুমা কোলের উপর বাখা নোটগুলো গুনে গুনে বাণ্ডিল বেঁধে থলিতে ভরছিলেন। এখন মাত্র বারোজন সৈন্য, কিন্তু অসামবিক খদ্দেরদের লাইনটা বড় হয়েই চলেছে। শেষের জন,—ইউলিসিস।

কুৎসিত দর্শন এক সৈন্যের পালা এইবার। কিন্তু ঠাকুমা তাকে তো আটকালেনই, তার সঙ্গে কোনওরকম দরাদরিও করলেন না।

'না বাছা, পৃথিবীর যাবতীয় সোনার বদলেও তুমি ভিতরে যেতে পারবে না। তুমি দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছ।'

সৈন্যটা হতভম্ব হয়ে গেল।

'এর মানে কী?'

'তুমি শয়তানের ছায়া নিয়ে এসেছ',—ঠাকুমা বললেন। 'যে কেউ তোমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুক।'

এতটুকু স্পর্শ না করে তিনি তাকে চলে যেতে বললেন এবং পরের সৈন্যটিকে পথ করে দিলেন।

'ডানদিকে ঢুকে যাও দিকিনি, সোনা',—ভালোমানুষের মতো তিনি তাকে বললেন,—'খুব বেশি সময় নিও না কিন্তু। দেশের কাজে তোমায় ভীষণ প্রয়োজন।'

সৈন্যটি ঢুকেই বেরিয়ে এল। কারণ, এরেনদিরা তার ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। নোটের থলিটা বগলদাবা করে তিনি তাঁবুর ভিতর ঢুকে গেলেন। ঘুপচি হলেও ভেতরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একেবারে পিছন দিকে একটা ক্যাম্পখাটে এরেনদিরা বেসামাল হয়ে বসে আছে। তার ক্লান্ত শরীর সৈন্যদের ঘাম আর নোংরায় মাখামাখি।

'ঠাকুমা',—ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'আমি মরে যাচ্ছি।' ঠাকুমা তার কপালে হাত ছোঁয়ালেন; জ্বর নেই। তারপর তিনি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় বললেন,—'আর মাত্র দশজন সৈন্য বাকি।' এরেনদিরা ভয়ার্ত পশুর মতো কাঁপতে কাঁপতে কাঁদতে শুরু কবল। ঠাকুমা বুঝলেন মেয়েটার সহ্যের সীমা অনেকক্ষণ আগেই পেরিয়ে গেছে। তবুও তিনি ভয়বিহ্বল এরেনদিরার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

'মুশকিলটা হচ্ছে কী, তোব শরীরটা ভীষণ দুর্বল',—তিনি বলে চললেন। 'ঠিক আছে আর কাঁদতে হবে না। ঠান্ডা জলে একবার স্নান করে নিলেই শরীরটা জুড়িয়ে যাবে।'

এরেনদিরা শান্ত হতেই তিনি বেরিয়ে অপেক্ষমাণ সৈন্যটিকে পেসোর নোটটা ফিবিয়ে দিলেন। 'আজ এই পর্যন্ত, কাল এসো, কথা দিচ্ছি, তোমাকে লাইনের পয়লা জায়গা দেব।'

তারপর তিনি লাইনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন,—'আজ এই অবধি, বাছাবা। আবার কাল ঠিক ন'টায়।'

'সৈন্যরা এবং অসামরিক মানুষজনেরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। শান্তভাবে তিনি তাদের সংযত করার চেষ্টা কবতে লাগলেন। কিন্তু পরিস্থিতি তাঁকে উত্তেজিত করে তুলল।

'লালা ঝরানো গোঁয়ার কোথাকাব',—চিৎকার করে উঠলেন। 'কী দিয়ে তৈরি মেয়েটা, লোহা? ওর জায়গায় তোদের বসালে কেমন হবে? হাড়হাভাতে, বদ, গতরখেকোর দল!'

মানুষগুলো আরও বগরগে ভাষায় জবাব দিল। কিন্তু তিনি সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করলেন। বিশাল বপুটা নিয়ে দাঁড়িযে রইলেন, যতক্ষণ না লোকগুলো চাট খাবার টেবিল থেকে জুয়ার বোর্ডগুলো তুলে নিয়ে গেল। তাঁবুর ভিতরে ঢুকতে যাবার মুখে ইউলিসিসকে তাঁর চোখে পড়ল। অন্ধকার কোণটায় মূর্তিমান জীবনের মতো সে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ ওইখানে একটু আগেও মানুষগুলো হল্লা করছিল। তার চাবপাশে একটা অস্বাভাবিক প্রশান্তি। এবং শুধুমাত্র তার উজ্জ্বল সৌন্দর্যের জন্যেই সেই ছায়াচ্ছন্ন পবিবেশেও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল ইউলিসিস।

'তুমি',—ঠাকুমা তাকে প্রশ্ন করলেন। 'তোমার ডানার কী হযেছে?'

'যাঁর ডানা ছিল তিনি আমার ঠাকুর্দা',—ইউলিসিস উত্তর দিল। 'কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস কবে না।'

ঠাকুমা এবার তাকে একটু খুঁটিয়ে দেখলেন। 'ঠিক আছে, হবে'খন',—তিনি বললেন। 'ওগুলো বাখ, কাল এস।' জ্বলজ্বলে ইউলিসিসকে রেখেই তিনি ভিতবে ঢুকে গেলেন।

স্নানের পর এরেনদিরা একটু সুস্থ বোধ করছিল। পরনে লেসে বোনা ছোট জামা ; ঘুমোতে যাবার আগে সে চুলগুলো শুকোচ্ছিল, কিন্তু তখনও সে উপচে পড়া চোখের জল মুছে চলেছে। বৃদ্ধা ঠাকুমা তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

এরেনদিরাব বিছানার পিছনে খুব সন্তর্পণে ইউলিসিস উঁকি মারল। উদ্বিগ্ন অথচ নির্মল চোখ দু'টি দেখল এরেনদিরা এবং ইউলিসিস কিছু বলার আগেই আরেকবার মাথাটা তোয়ালে দিয়ে মুছে নিল। ভাবখানা এমন যে, যা কিছু সে দেখল তা মোটেই দৃষ্টিবিভ্রম নয়। ইউলিসিস প্রথমবার চোখ নাচাতেই এরেনদিরা প্রশ্ন করল,—'কে তুমি?'

ইউলিসিস তাব কাঁধ পর্যন্ত নিজেকে দেখাল। 'আমার নাম ইউলিসিস'। চুরি করা নোটগুলো

এরেনদিরাকে দেখিয়ে ইউলিসিস বলল,—'আমার কাছে অনেক পেসো আছে।' বিছানায় ভর দিয়ে এরেনদিরা ইউলিসিসের মাথার কাছে তার মুখ নিয়ে গেল। এমনভাবে কথাবার্তা শুরু হল যেন এটা একটা ছেলেমানুষি খেলা।

'তুমি সম্ভবত লাইনে ছিলে',—এরেনদিরা বলল।

'আমি রাতভর অপেক্ষা করেছি',—ইউলিসিসের জবাব।

'ভালো, এখন তোমায় কাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে',—এরেনদিরা বলল। 'এখন আমার মনে হচ্ছে কেউ যেন আমার কিডনি দু'টোকে থেঁতলে দিয়েছে।'

ঠিক তক্ষুনি ঠাকুমা ঘুমের ঘোরে কথা বলা শুরু করলেন। 'শেষ বৃষ্টিটা হবার পর কুড়িটা বছর কেটে গেল। কি ভয়ংকর ঝড়! মনে হল বৃষ্টি যেন সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গেছে। আর পরের দিন,—বাড়িটা মাছ আর সাপে থিকথিক করছে—তোর ঠাকুরদা আমাদিস্—ভগবান তাঁকে শান্তিতে রাখুক—একটা চকচকে জিনিস দেখতে পেল। তার রোশনাই হাওয়ার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠছে।' ইউলিসিস বিছানার পিছনে আবার লুকিয়ে পড়ল। এরেনদিরার মুখে মজার হাসি।

'আরে, ব্যাপারটা হালকাভাবে নাও',—এরেনদিরা তাকে বলল। 'ঘুমন্ত অবস্থায় উনি সব সময়ই ওই রকম পাগলামি করেন। এমনকি ভূমিকম্পও ওঁকে জাগাতে পারবে না।'

ইউলিসিস আবার মাথা তুলল। এরেনদিরা তাকাল তার দিকে। মুখে প্রশ্রয় মেশানো দুষ্ট হাসি। তারপর ক্যাম্পখাট থেকে সরিয়ে ফেলল নোংরা চাদরটাকে।

'এসো',—সে বলল। 'চাদরটা পালটাতে আমার সঙ্গে একটু হাত লাগাও।' ক্যাম্পখাটটার চেয়ে চাদরটা অনেক বড়, তাই চাদরটাকে কয়েকটা ভাঁজ করতে হল। প্রত্যেকটা ভাঁজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউলিসিস এরেনদিরার আরেকটু কাছে ঘেঁসে এল।

'তোমায় দেখার জন্য আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম',—ইউলিসিস হঠাৎ বলে উঠল। 'প্রত্যেকেই বলে তুমি ভীষণ সুন্দর, এবং তারা ঠিকই বলে।'

'কিন্তু আমি যে মরতে বসেছি',—এরেনদিরার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

'আমার মা বলেন যারা মরুভূমিতে মারা যায় তারা স্বর্গের বদলে সমুদ্রে যায়'—ইউলিসিসের সরল জবাব।

নোংরা চাদরটাকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে আর একটা ইস্তিরি করা পরিষ্কার চাদর দিয়ে এরেনদিরা ক্যাম্পখাটটা ঢেকে ফেলল।

এরেনদিরা বলে,—'আমি কখনও সমুদ্র দেখিনি।'

'ওটাও মরুভূমির মতোই, শুধু জলে ভর্তি',—ইউলিসিস বোঝায়।

'তাহলে তুমি ওর উপর দিয়ে হাঁটতে পারবে না।'

'আমার বাবা একজনকে জানেন, যে পারত',—ইউলিসিস বলে। 'কিন্তু সেও অনেককাল আগে।'

ভালো লাগলেও এরেনদিরার চোখ ঘুমে ঢলে আসছিল।

'কাল খুব ভোরে এলে লাইনের পয়লা জায়গাটা পেতে পার',—এরেনদিরা বলল।

'আমি কাল ভোরেই বাবার সঙ্গে চলে যাচ্ছি',—ইউলিসিসের খেদোক্তি।

'তুমি কি এ পথে আর ফিরবে না?'

'কে বলতে পারে',—ইউলিসিস হতাশভাবে জানায়। 'সীমান্ত হারিয়ে ফেলার জন্যই তো এই পথে আসতে হয়েছে।'

বিষণ্ণমুখে এরেনদিরা একবার ঠাকুমার দিকে তাকাল।

'ঠিক আছে',—সে মনস্থির করল। 'নোটগুলো আমায় দাও।'

ইউলিসিস দিল। এরেনদিরা শুয়ে পড়ল। কিন্তু সে তখনও থরথর করে কাঁপছে; চরম মুহূর্তে ইউলিসিসের দৃঢ়তা যেন ভেঙে পড়ল। এরেনদিরা হাত ধরে ইউলিসিসকে এক ঝটকায় উঠিয়ে দিল। আর তখনই তার দোমড়ানো ভীত চেহারাটা এরেনদিরার নজরে এল। এই রকম ভয়ের সঙ্গে সে

পরিচিত।

'এই কি প্রথম?'—এরেনদিরা প্রশ্ন করে। ইউলিসিস জবাব দেয়,—'না।' তার মুখে ধরা পড়ে যাওয়াব হাসি। ততক্ষণে এরেনদিরা অন্য মানুষে পরিণত হল।

'আস্তে আস্তে শ্বাস নাও',—এরেনদিরা বলে। 'প্রথমবার এমনই হয়, পরে তোমার নজরেই আসবে না।'

সে মাতৃসুলভ ভঙ্গিতে ইউলিসিসকে শান্ত করতে করতে তার জামাকাপড় খুলিয়ে পাশে শুইয়ে দিল।

'তোমার নাম কী?'

'ইউলিসিস'।

'বাঃ। একেবারে পুরাণের চরিত্র।'

'না, একজন নাবিকের নাম।'

ইউলিসিসের জামাটা সরিয়ে এরেনদিরা তার বুকে গাঢ়ভাবে কয়েকটা নিষ্পাপ চুমু খেল।

'সোনায় মোড়ানো মনে হলেও',—এরেনদিরা বলে,—'তোমার গন্ধ ফুলের মতো।'

'নিশ্চয়ই কমলার',—ইউলিসিসের প্রশ্ন।

এখন অনেক শান্ত, কিন্তু ইউলিসিসের ঠোঁটে পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসি।

'লোকের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা এক গাড়ি পাখি নিয়ে যাচ্ছি',—সে আরও বলে। 'আসলে আমরা এক বাক্স কমলালেবু চালান করছি।'

'কমলালেবুর চোরাচালান হয় না',—এরেনদিরার মন্তব্য।

'এগুলো হয়',—ইউলিসিসের জবাব। 'প্রত্যেকটার দাম পঞ্চাশ হাজার পেসো।'

এরেনদিরা এতক্ষণে এই প্রথম হাসল।

'তোমার কোনটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে জানো? তুমি খুব গম্ভীরভাবে বোকা বোকা কথা বল।'

এরেনদিরা আবার বকবক করতে লাগল। যেন ইউলিসিসের সারল্য শুধু তার মেজাজটাই নয় চরিত্রটাও পালটে দিয়েছে। দুর্ভাগ্য থেকে মাত্র হাত কয়েক দূরে ঘুমন্ত ঠাকুমা কথা বলেই যাচ্ছিলেন।

'সেই মার্চ মাসের গোড়ার দিকে তারা তোকে ঘরে আনল',—তিনি বলছিলেন। 'কাপড়ে ঢাকা একটা টিকটিকির মতো ছিলি তুই। আমাদিস্ তোর বাপ, কী দোহারা গড়নটাই না ছিল তার, এত খুশি হল যে সেদিন কুড়িটা গাড়ি করে ফুল ছড়াতে ছড়াতে চলল যতক্ষণ না গ্রামের সবগুলো রাস্তায় ফুল উপচে পড়ে।' অনেকক্ষণ ধরেই তাঁর অবরুদ্ধ আবেগ দমকে দমকে বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু ইউলিসিস কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। কারণ এরেনদিরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে দিয়েছে। নিষ্পাপ সেই ভালোবাসা। আদ্ধেক দামেই সেই দুর্লভ ভালোবাসা সে পেয়ে যাচ্ছিল, যা ঠাকুমা কিছুতেই ভোর হবার আগে পেতে দিতেন না।

একদল মিশনারি ক্রুশগুলো কাঁধে করে মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বুনো বাতাস তাদের ক্লান্তিকর অভ্যাসের উপর আছড়ে পড়ছিল। তাদের রুক্ষ দাড়িগুলো যেন ছিঁড়ে ফুঁড়ে যাচ্ছিল, তারা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছিল না। তাদের পিছনে পুরো দলটা দাঁড়িয়ে—যেন দূর দেশ থেকে লুটে আনা পাথরের স্তূপে তৈরি একটা শ্বেত-শুভ্র দেওয়াল যার মাথায় আবার একটা ঘণ্টা ঝুলছে। সবচেয়ে অল্পবয়স্কটি, যে আবার দলনায়ক, থকথকে মাটির ওপরকার একটা প্রাকৃতিক ফাটল আঙুল দিয়ে দেখাল।

'আপনারা কেউ এই দাগটা পেরোবেন না',—সে বলে উঠল এবং অবশ্যই চেঁচিয়ে বলল।

কাঠের ডুলিতে করে ঠাকুমাকে নিয়ে যাবার সময় চারজন (রেড) ইন্ডিয়ানের দল আওয়াজটা শুনে থমকে গেল। অস্বস্তিকরভাবে কোনওমতে হাঁটু গুঁজে বসে থাকা,—মরুভূমির ধুলো আর গরমে শ্বাসটাও এ পর্যন্ত ভালোভাবে নেওয়া যায়নি। অথচ ঠাকুমার মেজাজ কিন্তু অবিচল। এরেনদিরা পায়ে পায়ে

হাঁটছিল। ডুলির পেছন পেছন আটজন (রেড) ইন্ডিয়ান কুলির দলটি যাচ্ছে। আর তাদেরই ছুঁয়ে সাইকেলে চেপে ফোটোগ্রাফারটিও চলেছে।

'মরুভূমি কারও সম্পত্তি নয়',—ঠাকুমা বললেন।

'এটা ভগবানের',—মিশনারিটি বলল। 'নোংরা ব্যাবসা করে আপনি তাঁর পবিত্র বিধানকে অশুচি করছেন।'

ঠাকুমা মিশনারিদের কূট উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন খতিয়ে দেখে মুখোমুখি সংঘর্ষটা এড়িয়ে গেলেন। ফালতু ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করতে তিনি রাজি নন। তিনি নিজের খোপের ভিতর ঢুকে গেলেন।

'হেঁয়ালিটা বোঝা গেল না।' মিশনারিটি এরেনদিরাকে দেখিয়ে কথাটা বলল। 'বাচ্চাটা অপ্রাপ্তবয়স্ক।'

'কিন্তু ও আমার নাতনি।'

'সেই কারণেই আরও খারাপ',—মিশনারিটি ফিরে বলল। 'ওকে ভালোয় ভালোয় আমাদের হাতে তুলে দিন, নয়তো আমাদের অন্য রাস্তা দেখতে হবে।' ঠাকুমা এতটা ভাবেননি।

'ঠিক আছে এই যদি আপনাদের ইচ্ছে হয়, তাই হোক',—নিজেকে তিনি ভয়ের কাছে বিকিয়ে দিলেন। 'কিন্তু তাড়াতাড়িই হোক আর দেরিতেই হোক, তোমরাই ওকে দেখো, আমি তো মরবই।' মিশনারিদের সঙ্গে ঝামেলাটার দিন তিনেক বাদে মিশনের কাছেই একটা গ্রামের মধ্যে খাটানো তাঁবুতে এরেনদিরা যখন তার ঠাকুমার সঙ্গে শুয়েছিল তখন ইস্পাত কঠিন শরীরের একটা দল হামা দিয়ে নিঃশব্দে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করল। এরা ছ'জন আনকোরা শক্তসমর্থ (রেড) ইন্ডিয়ান যুবক। তাদের নতুন খসখসে জামাগুলো চাঁদের আলোয় ঝিলিক মারছিল। একটুও শব্দ না করে তারা এরেনদিরাকে ঘুম থেকে না জাগিয়েই একটা মশারিতে জড়িয়ে ফেলে কাঁধে তুলে নিল। মনে হচ্ছিল,—একটা বিরাট সোনালি মাছ জালে ধরা পড়েছে।

নাতনিকে মিশনারিদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ঠাকুমা চেষ্টার কসুর করেননি। একেবারে সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে অর্থাৎ সবরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেই তিনি শহর কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হলেন।

শহরের শাসনকর্তা জনৈক সামরিক ব্যক্তি। তাকে পাওয়া গেল নিজের বাড়ির উঠোনে। খালি গায়ে রাইফেল হাতে রোদ ঝলসানো আকাশের নিঃসঙ্গ মেঘকে গুলি ছুঁড়তে তিনি ব্যস্ত। বৃষ্টি নামাবার চেষ্টায় একনিষ্ঠভাবে আকাশ ফুঁড়ে যাচ্ছিলেন তিনি। ভয়ংকর হলেও তা একদমই ফালতু বিষয়। কিন্তু তিনি ঠাকুমাকে প্রয়োজনীয় সময় দিলেন।

'আমি কিছু করতে পারব না',—সব শুনে তিনি ব্যাখ্যা করতে বসলেন। 'আইন অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটিকে নিজেদের কাছে রাখার ক্ষমতা মিশনারিদের আছে। অথবা যতক্ষণ তার বিয়ে না হয়।'

'তাহলে সবাই কেন আপনাকে এখানে বসিয়েছে, মেয়র',—ঠাকুমা প্রশ্ন করলেন।

'বৃষ্টির জন্য',—মেয়রের ছোট্ট উত্তর। তারপর যখন মেয়র দেখলেন মেঘটা নিশানার বাইরে চলে গেছে, তিনি দপ্তরের কাজকর্মগুলো সরিয়ে রেখে ঠাকুমার দিকে পরিপূর্ণ মনোসংযোগ করলেন।

'আপনার সমর্থনে দাঁড়াবার জন্যে কাউকে দরকার',—তিনি পরামর্শ দিলেন। 'যিনি একটি লিখিত চিঠিতে আপনার নৈতিকতাকে প্রশংসা করে আপনার ভালো চরিত্রের সার্টিফিকেট দেবেন। আপনি সেনেটর ওসিমো সানচেস্‌কে চেনেন?'

কড়া রোদের মধ্যে একটা ছোট্ট টুলে বসে, যা কিনা তাঁর থলথলে বিশাল বপুর পক্ষে বেশ ছোট্ট, ঠাকুমা নিষ্কম্প স্বরে উত্তর দিলেন,—'এই বিশাল মরুভূমিতে আমি এক দরিদ্র, নিঃসঙ্গ মহিলা।'

মেয়রের চোখ দুটো রৌদ্রতাপে কুঁকড়ে গেছে। ঠাকুমার দিকে তিনি সহানুভূতির চোখে তাকালেন। 'তাহলে মা, আর সময় নষ্ট করবেন না',—মেয়র বলে চললেন। 'দেরি করলে সব ভেস্তে যাবে।'

অবশ্যই তাঁর কিছুই ভেস্তে যায়নি। তাঁবুটাকে মিশন থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে এনে, দুর্গসংকুল

শহরের মাঝে এক নিঃসঙ্গ যোদ্ধার মতো তিনি ভাবতে বসলেন। ভবঘুরে ফোটোগ্রাফারটি, ঠাকুমাকে যে ভালো করেই জানে, যখন দেখল ঠাকুমা গনগনে রোদে বসে উদাস দৃষ্টিতে মিশনের দিকে তাকিয়ে আছেন, সে তার সবকিছু সাইকেলের ক্যারিয়ারে তুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

'দেখা যাক কে প্রথম ক্লান্ত হয়',—ঠাকুমা আপন মনেই উচ্চারণ করেন। 'ওরা অথবা আমি।'

'ওরা এখানে তিনশ' বছর ধরে রয়েছে, ফলে ওদের সুবিধা বেশি',—ফোটোগ্রাফারটি বলল। 'আমি চললাম।'

এতক্ষণে ঠাকুমা মালপত্র ঠাসা সাইকেলটির দিকে তাকালেন।

'তুমি কোথায় চললে?'

'বাতাস যেদিকে আমায় নিয়ে যাবে',—ফোটোগ্রাফারটি বলল। তারপর সে চলে গেল।

'দুনিয়াটা বিশাল।'

ঠাকুমা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

'যতটা বড় তুমি ভাবছ, ঠিক ততটা নয়। তুমি অকৃতজ্ঞ।'

কিন্তু যেহেতু মিশনের ব্যবহার তাঁর রাগ এতটুকুও কমায়নি, তাই তিনি মাথা ঘোরালেন না। যেন হাজার হাজার দিনের ধাতব উত্তাপে, বহু বহু রাত্রির ঝোড়ো বাতাসে তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন। এবং মিশন থেকে একজনও বেরিয়ে এল না। (রেড) ইন্ডিয়ানরা তাঁবুর পিছনে একটি পামগাছে ঠেকনা দিয়ে তাতে তাদের জামাকাপড়গুলো ঝুলিয়ে দিল। কিন্তু ঠাকুমা অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আধসিদ্ধ ভাতগুলো চিবোতে চিবোতে তিনি অলস বিশ্রামে ক্লান্ত ষাঁড়ের মতো নড়েচড়ে বসলেন।

এক রাতে কয়েকটি ট্রাকের কনভয় তাঁর ভীষণ কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। রঙিন আলোয় ঝলমলে ট্রাকগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা ভুতুড়ে জাহাজ সমুদ্রে বিচরণ করছে। ঠাকুমা মুহূর্তের মধ্যে ওগুলোকে চিনে ফেললেন। কারণ ট্রাকগুলো একেবারে আমাদিস্‌দের ট্রাকগুলোর মতো। কনভয়ের শেষ ট্রাকটি আস্তে আস্তে থেমে গেল এবং পিছনের ঢাকা জায়গা থেকে একজন মানুষ নেমে এল। একেবারে আমাদিস্‌দের মতো তাকে দেখতে। ঢেউ খেলানো চুলে একটা টুপি বসানো, হাঁটু অবধি বুটজুতো, বুকের উপর দিয়ে আড়াআড়ি চলে গেছে গুলিভর্তি বেল্ট, কাঁধে যুদ্ধের রাইফেল, কোমরে গোঁজা দুটো পিস্তল। অপ্রতিরোধ্য আকুতিকে জয় করে ঠাকুমা লোকটিকে ডাকলেন।

'চিনতে পারছ না আমাকে',—ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন।

লোকটা নির্দয়ের মতো ঠাকুমার গায়ে উজ্জ্বল আলো ফেলল। মুহূর্তের জন্য সে তাঁর অনাহার ক্লান্ত মুখের রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। ক্লান্তিতে চোখদুটি পাণ্ডুর প্রায়। শীর্ণ চুলগুলো শণের নুড়ির মতো। এইরকম অসহায় অবস্থাতেও সেই তীক্ষ্ণ চোখ ধাঁধানো আলোয় একটা বিষয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল। বয়সকালে তিনি পৃথিবীর অন্যতম সেরা সুন্দরী ছিলেন। যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ করে যখন সে বুঝল তাঁকে কোনওকালেই দেখেনি, আলোটা নিভিয়ে দিল।

'একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে তোমরা কুমারীত্ব রক্ষার জন্য ব্যস্ত নও।'

'ঠিক তার উল্টোটা',—ঠাকুমা মিষ্টি গলায় বললেন। 'আমি একজন নারী।'

নিতান্তই অভ্যাস বশে লোকটি পিস্তলটা রাখল।

'এটা কার?'

'বড় আমাদিস্‌-এর।'

'তা হলে তুমি এই দুনিয়ার কেউ নও',—ভয়ার্ত স্বরে সে বলে উঠল। 'তুমি কী চাও?'

'তোমাকে। আমার নাতনি, বড় আমাদিসের নাতনি আমার ছেলে আমাদিসের মেয়ে—তাকে উদ্ধারের জন্য তোমাকে চাই। ওকে ওরা মিশনে আটকে রেখেছে।'

লোকটি এতক্ষণে ভয়মুক্ত।

'তুমি ভুল দরজায় ধাক্কা দিয়েছ',—সে বলল। 'যদি তুমি মনে করে থাক, আমরা ভগবানের ব্যাপারেও

নিজেদের জড়াতে পারি তা হলে তুমি আর যেই হও না কেন, নিজের সম্বন্ধে যা বললে তুমি তা নও। তুমি কখনও আমাদিস্‌দের চিনতে না আর তুমি স্মাগলিঙের সাধারণ নিয়মকানুনগুলোও জান না।'

সেই ভোরে ঠাকুমা তীব্র উদ্বেগ নিয়ে শুয়ে রইলেন। পশমে মোড়ানো জন্তুর মতো শুয়ে অথচ সজাগ হয়ে গুলিয়ে যাওয়া অতীতের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে তিনি শ্রান্ত হলেও বুকের উপর শক্ত করে রাখা তাঁর হাত দু'খানির ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি সমুদ্রে ভেসে যাওয়া লাল গোলাপকে অবশেষে আঁকড়ে ধরতে পেরেছেন। সব মিলিয়ে সুখের ঢেউ তাঁর মুখের আনাচে-কানাচে খেলে যাচ্ছে। বেজে উঠল মিশনের ঘণ্টাটা। প্রভাত সূর্যের প্রথম নরম আলো জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল। প্রভাতসংগীতে স্নান করে উঠল মরুভূমির শুকনো পরিবেশ। তিনি বহুক্ষণ সেইভাবে শুয়ে রইলেন। ততক্ষণে তিনি পথ খুঁজে পেয়েছেন। ক্লান্তির জড়তা কাটিয়ে উঠে এরেনদিরাকে বের করে আনার জল্পনায় তিনি মশগুল।

ওদিকে মিশনে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে এক রাত্রিও এরেনদিরা অনিদ্রায় কাটায়নি। চুলগুলো ছেঁটে প্রায় বুরুশের মতো করে দিয়ে ওরা তার মাথায় এঁটে দিল পাদ্রিদের খসখসে টুপি আর হাতে ধরিয়ে দিল ন্যাতা-বালতি। যাতে সে সকাল-বিকাল গির্জার সিঁড়িগুলো ঝকঝকে তকতকে করে রাখে। এটা ভীষণ বাজে কাজ। কারণ, মিশনারিরা ছাড়াও একেবারে আনকোরা কুলিগুলোও অনবরত কাদা পায়ে চলাফেরা করে। তবুও প্রত্যেকটা দিনই এরেনদিরার কাছে রবিবার। বিছানার সেই অক্লান্ত পরিশ্রম থেকে তো মুক্তি মিলেছে। তা ছাড়া সেই একমাত্র উদ্ধার পেয়ে এখানে এসেছে। মিশনটি শুধুমাত্র শয়তানের বিরুদ্ধেই নয়, মরুভূমির বিরুদ্ধেও নিজেকে উৎসর্গ করেছে। আনকোরা (রেড) ইন্ডিয়ানগুলোর কাজকর্মও এরেনদিরা লক্ষ্য করে। তারা গোরুর দুধ দোয়ায়। দিনের শেষে পনির তৈরি করে, আবার কোনও কোনও দিন ছাগলদের বাচ্চা বিয়ানোর কাজে সাহায্য করে। চৌবাচ্চা থেকে জল তুলবার সময় ওদের ঘামে ভেজা শরীরগুলোকে ট্যান করা চামড়ার মতো মনে হয়। বিশাল বাগানে তারা হাতে করে জল দেয় আবার অন্য কয়েকজন সেই মরুভূমির শুষ্ক প্রান্তরে ফসল ফলানোর জন্য কী চেষ্টাটাই না করে। রুটি বানানোর উনুনগুলি থেকে শুরু করে ইস্তিরি করার ঘর পর্যন্ত তার ঘুরে ঘুরে দেখা হয়ে গেছে। এদিকে একজন নান একটা শুয়োরের পিছনে পিছনে শুয়োরটাকে ধরবার জন্য ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। কাদায় মাখামাখি হয়ে নান বেচারি প্রায় বিপর্যস্ত। দু'জন (রেড) ইন্ডিয়ান তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল এবং বলা নেই কওয়া নেই আচমকা একটা ছুরি চালিয়ে দিল শুয়োরটার গলায়। ওরা তিনজনেই রক্ত কাদায় মাখামাখি—এ সবই এরেনদিরার স্বচক্ষে দেখা। পর্দা ঢাকা অন্দরমহলে নববধূর সাজের এম্‌ব্রয়ডারি করা পরিচ্ছেদ পরে অপুষ্ট নানগুলি রোজ রাতেই ভগবানের শেষ আদেশ শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। ওদিকে পুরুষরা ততক্ষণে মরুভূমিতে উপদেশ বিতরণের জন্য বেরিয়ে পড়েছে। রাতে নিজের খুপরিতে এরেনদিরা ভয় এবং সৌন্দর্যের অন্য এক চেহারার সঙ্গে পরিচিত হল। এমন অবস্থায় নিজের সরু বিছানায়ও তাকে এর আগে পড়তে হয়নি। কিন্তু না উপরতলার লোকজন কিংবা আনকোরা (রেড) ইন্ডিয়ানগুলো, সেই প্রথম যেদিন সে এখানে পা দিয়েছে সেদিন থেকে তাকে একটাও কথা বলার সুযোগ দিল না। এক সকালে সে যখন বালতিতে চুনকামের মশলা তৈরিতে ব্যস্ত, সে শুনতে পেল মন উতলা করা এক তারের বাজনা। এমনকি মরুভূমির প্রখর ঔজ্জ্বল্যের চেয়েও তার তীব্রতা অনেক বেশি। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থেকে চার দেওয়ালে ঘেরা বড় বড় দরজা-জানালা লাগানো নিচের একটা ঘরে সে উঁকি মারল। সেখানে তখন জুন মাসের সূর্যের কিরণ নিথর হয়ে পড়ে আছে। এক সুন্দরী নানকে সে দেখতে পেল, যাকে সে আগে কোনওদিন দেখেনি। লাউয়ের তৈরি একটা খোলার উপর সে ছড় চালিয়ে যাচ্ছে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা না বাজা পর্যন্ত এরেনদিরা হৃদয়টাকে মুঠোর মধ্যে ধরে পলকহীনভাবে বাজনা শুনে গেল। খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে যখন সে সিঁড়ির খাঁজগুলো একা একা নিঃসঙ্গভাবে চুনকাম করছিল ঠিক তখনই মিশনে ঢোকার পর এমনভাবে প্রথমবার কথা বলল যাতে কেউ শুনতে না পায়।

'আমি সখি',—সে বলল।

সুতরাং এরেনদিরা স্বেচ্ছায় পালিয়ে আসবে, ঠাকুমার এহেন কল্পনা—কল্পনাই থেকে গেল। কিন্তু তিনি তাঁর গ্রানাইট পাথরের মতো কঠিন ইচ্ছাকে এতটুকুও অবদমিত করলেন না। ইস্টার স্যাটারডের সাত সপ্তাহ পরের রবিবারে আয়োজিত অনুষ্ঠান 'পেন্টিকস্ট'-এর আগে কোনওরকম মনস্থিরও করলেন না। পেন্টিকস্টের সময় মিশনারিরা মরুভূমিতে অন্তঃসত্ত্বা রক্ষিতাদের খুঁজে বের করে তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়। ভাঙাচোরা মিলিটারি ট্রাক থেকে শুরু করে পরিত্যক্ত ছাউনি পর্যন্ত সর্বত্রই তারা খুঁজে ফেরে। সবচেয়ে অসুবিধা হয় ওই মেয়েগুলোকে নিয়ে, যারা মনে করে ভদ্দরলোকেদের সঙ্গে একটা ভদ্রলোকের চুক্তিই হয়েছে। ওই সমস্ত লোকেদের খাটে পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকার যথেষ্ট অধিকার তাদের আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা,—তারা নিজেদের বাড়ির বউ ভাবে না আবার রক্ষিতাও মনে করে না। তাই তাদের বোঝানোর জন্য বাঁকা পথ ধরতে হয়। ভগবানের নাম নিয়ে গণ্ডা গণ্ডা মিথ্যা কথা বলতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্থিব ক্ষতি খুব বেশি হলে কানে বন্দুকের কুঁদো ঠেকিয়ে দোলনা থেকে উঠে আসতে বাধ্য করা হয়। গোরু, ভেড়ার মতো ট্রাকে তুলে দেওয়া হয়। কারণ, বিয়েটা তো তাদেরই করতে হবে।

কয়েকদিন ধরে একটা ছোট্ট ট্রাকে করে গর্ভবতী মেয়েমানুষগুলোকে মিশনে নিয়ে যাবার ব্যাপারটা ঠাকুমার নজরে এসেছিল। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সুযোগ এল। পেন্টিকস্টের রবিবারে তিনি বাজি আর ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলেন। চোখে পড়ল কাঙালিগুলো উর্ধ্বশ্বাসে উৎসবের আঙিনায় ছুটে চলেছে। আর সেই জনতার ভিড়েই তিনি লক্ষ্য করলেন গর্ভবতী নারীরা মুখ ঢেকে উৎসবে যোগ দিতে এসেছে। আজকে রাতের রানি করে একটা সিংহাসনে তাদেরই একজন সঙ্গিনীকে গণবিবাহের প্রথম কনে হিসেবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মিছিলের শেষে এক সরলমনা বালক, মাথায় কদম ছাঁট চুল, পরনে ছেঁড়া জামা, হাতে ইস্টারের বাতি নিয়ে চলেছে। ঠাকুমা তাকে ডাকলেন।

'বাছা আমায় বল তো',—তাঁর গলার সবচেয়ে কোমল স্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন,—'এই অনুষ্ঠানে তোমার ভূমিকাটা কী?'

মোমবাতির জন্য ছেলেটি ভয় পেয়ে গেল আর গাধার দাঁতের মতো দাঁতের পাটির জন্যে মুখটি এগিয়ে নেওয়া তার পক্ষে কষ্টকর।

'পাদ্রিরা প্রথম খ্রিস্টভোজে আমায় নিয়ে যাচ্ছিলেন',—সে বলল।

'কত দিতে হয়েছে?'

'পাঁচ পেসো।'

ঠাকুমা তাঁর থলি থেকে এক গোছা নোট বের করলেন। ছেলেটি বিস্মিতভাবে ওগুলির দিকে তাকাল।

'তোমায় গোটা কুড়ি দিই',—ঠাকুমা বললেন। 'ভোজের জন্য নয়। তোমার বিয়ের জন্য।'

'কার সঙ্গে?'

'আমার নাতনি।'

সুতরাং বরের নামটি না জেনেই মিশনের চত্বরে এরেনদিরার বিয়ে হয়ে গেল। পাদ্রির গাউনটা ছাড়াও তার গায়ে ছিল আনকোরা কুলিগুলোর দেওয়া একটা সিল্কের শাল। এক অনিশ্চিত আশায় সে মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে আছে। দু'শো গর্ভবতী নববধূর পূতিগন্ধময় পরিবেশ। সেন্ট পলের দুর্বোধ্য লাতিন লিপি হাতুড়ির মতো তাকে আঘাত করে যাচ্ছে। কারণ, এই অভাবিত বিয়ের বিরুদ্ধে মিশনারিরা কিছুই করতে পারছে না। সুতরাং তাকে মিশনে ধরে রাখার এত প্রাণান্তকর চেষ্টা এখানেই সমাপ্ত। তা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানের পর, ঈশ্বরের প্রতিনিধিবৃন্দ, সেই সামরিক মেয়র যিনি আকাশ ফুঁড়ছিলেন,—এদের সকলের উপস্থিতিতে এই সাম্প্রতিক স্বামী এবং অবিচল ঠাকুমার সামনে এরেনদিরা আবার নিজের হদিশ করতে পারল। এই সেই ঠাকুমা জন্ম থেকে যে তার জীবনকে দাবিয়ে রেখেছে। যখন তাকে মুক্ত এবং নির্দিষ্ট ইচ্ছা প্রকাশ করতে বলা হল এরেনদিরা সম্মোহনী অবস্থায় থাকলেও একটুও দোনামনা

না করেই বলল,—'আমি যেতে চাই।' এবং তার সদ্য বিয়ে করা স্বামীর দিকে আঙুল উঁচিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করে বলল,—'ওর সঙ্গে নয়। আমার ঠাকুমার সঙ্গে।'

বাবার বাগান থেকে একটা কমলালেবু চুরি করার জন্য একটা গোটা বিকেল নষ্ট করল ইউলিসিস। কমলালেবু পেকে যাবার জন্য তার বৃদ্ধ বাবা ক্ষণিকের তরেও বাগান থেকে চোখ সরাচ্ছিলেন না। এদিকে তার মা বাড়ি থেকেই সমানে বাগানের দিকে কড়া নজর রাখছেন। ফলে অন্তত সেদিনের জন্য ইউলিসিস তার পরিকল্পনাটা খরচের খাতায় তুলে রাখল। বরং বিরক্ত হয়ে শেষ কমলার গাছটা ছাঁটা না হওয়া পর্যন্ত তার বাবাকে উঠে পড়ে সাহায্য করল।

টিনের ছাদ, তামার জানালা বসানো ঘরের গা বেয়ে ঘন-শান্ত-গভীর লতাগুলো উঠে গেছে। তার সঙ্গে মিশে আছে বহুদিনের পুরোনো ফুলওয়ালা লতাগুলি।

ইউলিসিসের মা একটা রকিং চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসে আছেন। মাথাব্যথা কমানোর জন্য তাঁর কপালে সাঁটা রয়েছে একগাদা সিদ্ধ লতাপাতার মণ্ড। বক্তিম (রেড) ইন্ডিয়ান চাউনিতে যেন কোনও এক অদৃশ্য আলোর রশ্মি দিয়ে ভদ্রমহিলা তাঁর ছেলেকে অনুসরণ করে চলেছেন। তিনি এই বয়সেও যথেষ্ট সুন্দরী। স্বামীর তুলনায় তাঁকে যথেষ্ট অল্পবয়স্ক দেখায়। এবং তা নিশ্চয়ই তাঁর স্বজাতীয় পোশাকের জন্যে নয়। রক্তের গভীরেই এর গোপন রহস্য রয়ে গেছে।

গাছ ছাঁটবার যন্ত্রগুলি নিয়ে ইউলিসিস বাগান থেকে ফিরতেই ভদ্রমহিলা তাকে সামনের টেবিল থেকে বিকেল চারটের ওষুধগুলি দিতে বললেন। সে স্পর্শ করতেই জলের গেলাস আর ওষুধের রঙটা পালটে গেল। এখন সে সম্পূর্ণ খেলাচ্ছলে প্রথমে টেবিলের উপর রাখা কাচের পিকদানিটা ধরল। পিকদানিটা নীল হয়ে গেল। ওষুধটা খেতে খেতে তিনি তাকে লক্ষ্য করলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে এটা তাঁর কুরেকুরে খাওয়া যন্ত্রণাটা নয়, তিনি তাঁর গুয়াহিরো এলাকার ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন—'কবে থেকে এটা শুরু হয়েছে?'

'মরুভূমি থেকে ফিরে আসার পর থেকে সর্বক্ষণ',—ইউলিসিস গুয়াহিরো ভাষাতেই বলল। 'শুধু কাচের জিনিসের বেলায় এমনটা হয়।'

বিষয়টা ব্যাখ্যা করতেই যেন সে একের পর এক টেবিলে রাখা কাচের জিনিসগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছিল। আর প্রত্যেকটিরই রঙ পালটে যাচ্ছিল।

'প্রেমের জন্যেই এমনটি হচ্ছে,'—মা বললেন। 'কে সে?'

ইউলিসিস উত্তর দিল না। তার বাবা সেই সময়টায় একগাদা কমলালেবু নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি গুয়াহিরো ভাষা কিছুই বোঝেন না।

'কী নিয়ে তোরা কথা বলছিস?'—ইউলিসিসের বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন। এবং অবশ্যই তার ওলন্দাজ ভাষায়।

'বিশেষ কিছুই নয়',—সে উত্তর দিল।

ইউলিসিসের মা ওলন্দাজ ভাষার কিছুই বোঝেন না। তাঁর স্বামী বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলে তিনি তাঁর ছেলেকে গুয়াহিরো ভাষায় প্রশ্ন করলেন,—'কী বলল ও?'

'বিশেষ কিছুই নয়,'—সে উত্তর দিল।

বাড়িতে ঢুকে বাবাকে দেখতে না পেলেও জানালা দিয়ে সে দেখল,—তিনি অফিসে বসে আছেন। ইউলিসিস ফিরে আসা অবধি তার মা অপেক্ষা করে রইলেন। ছেলেকে দেখেই আবার বলে উঠলেন,—'আমায় বল। কে সে?'

'আরে বাবা, কেউ নয়',—ইউলিসিস জবাব দেয়।

তেমন মনোযোগ না দিয়েই সে বলল। কারণ, সে তখন অফিসে বাবার গতিবিধির উপর নজর রাখতেই ভীষণ ব্যস্ত। কমলালেবুগুলোকে আলমারির উপর রেখে তিনি চলে গেলেন—এটা সে দেখল। কিন্তু সে যখন তার বাবার উপর নজর রাখছিল তখন তার মা কিন্তু নজর রাখছিলেন তার উপর।

'তুই অনেকক্ষণ একটা দানাও দাঁতে কাটিসনি',—তিনি সাবধানে কথাটা ছুঁড়লেন।

'আমার ভালো লাগে না।'

পলকে মায়ের মুখ প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে উঠল।

'এটা একেবারে মিথ্যে কথা',—তিনি বলে উঠলেন। 'এরকম হচ্ছে—কারণ, তুই প্রেমে দাগা খেয়েছিস। আর দাগা খেলে লোকের আচার-আচরণ এরকম হয়ে যায়।' তাঁর কণ্ঠস্বর তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্রয় থেকে ভর্ৎসনার দিকে ঝুঁকছিল। সুতরাং সে কে তা বলে ফেলাই ভালো—তিনি বলে চললেন,—'নইলে আমি তোকে শাস্ত্র অনুসারে স্নান করাব।'

এদিকে অফিসে ওলন্দাজ ভদ্রলোক আলমারি খুলে কমলালেবুগুলো রেখে দরজা বন্ধ করে দিলেন। জানালা থেকে সরে এসে ইউলিসিস এবার খেঁকিয়ে উঠল,—'তখন থেকে বলছি—কেউ নেই। আর আমার কথা বিশ্বাস না হয়, বাবাকেই জিজ্ঞাসা করো না।'

একটা বাইবেল বগলদাবা করে পাইপ ধরিয়ে ওলন্দাজ ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। স্প্যানিশ ভাষায় তাঁর স্ত্রী প্রশ্ন করলেন,—'মরুভূমিতে কার সঙ্গে তুমি দেখা করেছিলে?'

'কেউ না'—ধোঁয়ার আড়ালে স্বামী ভদ্রলোক জবাব দিলেন। 'বিশ্বাস না হয় ইউলিসিসকে জিজ্ঞাসা করো।'

হলের প্রান্তসীমায় বসে তামাক শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওলন্দাজ ভদ্রলোক ঘন ঘন ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করতে লাগলেন। তারপরে বাইবেলটা কোনওরকমে খুলে দাগ দেওয়া জায়গাগুলো প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক ধরে গুনগুন করে পড়ে গেলেন।

চিন্তার তীব্রতায় মাঝরাতেও ইউলিসিস ঘুমোতে পারল না। আরও ঘণ্টাখানেক সে এপাশ-ওপাশ করল। চেষ্টা করল স্মৃতির তীব্র যন্ত্রণা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণার একটা জোরালো ধাক্কা তাকে চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছে দিল। কাউবয় ট্রাউজার্সটা গলিয়ে, গায়ে পশমের জামাটা চাপিয়ে, রাইডিং জুতো জোড়া পরে নিয়ে সে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল। এবং সে বাড়ি থেকে পালাল। সে পালাচ্ছিল পাখি ভর্তি একটা ট্রাকে চেপে। বাগান দিয়ে যাবার সময় সে হ্যাঁচকা টানে গোটা তিনেক পাকা কমলালেবু ছিঁড়ে নিল, যেগুলো সে সারাটা বিকেল ধরে চুরি করতে পারেনি।

বাকি রাতটুকুতে মরুভূমি পেরিয়ে যাবার পর ভোর থেকেই সে বিভিন্ন শহরে এরেনদিরাদের খোঁজ শুরু করে দিল। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারল না। অবশেষে সে খবর পেল যে সেনেটর ওনিসেমো সানচেসের নির্বাচনী প্রচারের সঙ্গে এরেনদিরাকে দেখা গেছে এবং এখন খুব সম্ভবত সে নুয়েভা কাসতিয়াতে আছে। সেখানেও সে সেনেটরকে খুঁজে পেল না। তার পাশের শহরে কিন্তু সেনেটরকে পাওয়া গেল। তবে এরেনদিরা তাঁর সঙ্গে নেই। কারণ ঠাকুমা ইতিমধ্যেই সেনেটরের কাছ থেকে হাতে লেখা একটা অনুমতিপত্র আদায় করে মরুভূমির বুকে তাঁর জমজমাট ব্যাবসা ফেঁদে বসার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। তৃতীয় দিনে ইউলিসিসের দেখা হল স্থানীয় ডাক পিওনের সঙ্গে। এবং ডাক পিওনটি তাকে অনুসরণের পথ বাতলে দিল।

'ওরা সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে',—ডাক পিওনটি বলল। 'তুমি আরও তাড়াতাড়ি গেলে ভালো হয়। কারণ, ওই ডাইনিবুড়ি এরেনদিরাকে নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে আরুবা দ্বীপে যাবার প্যাঁচ কষছে!'

ডাক পিওনের কাছ থেকে পাওয়া নির্দেশানুযায়ী পথ চলায় ইউলিসিস আধ বেলার মধ্যেই ঠাকুমার বিরাট রঙচঙে তাঁবুটা দেখতে পেল। ওটা কেনা হয়েছে একটা নিলামে ওঠা সার্কাস কোম্পানির কাছ থেকে। ভবঘুরে ফোটোগ্রাফারটিও সেখানে হাজির। সে বুঝে গেছে যে সত্যি সত্যিই যেমনটি ভেবেছিল দুনিয়াটা ততটা বড় নয়। সে তার ছবি আঁক পর্দাটা ইতিমধ্যেই তাঁবুর কাছাকাছি একটা খোলা জায়গা বেছে নিয়ে টাঙিয়ে দিয়েছে। ঝলমলে পোশাকের একটা দল ব্যান্ড বাজিয়ে তখন নীরবে এরেনদিরার খদ্দেরদের স্বাগত জানাচ্ছে।

লাইনে দাঁড়িয়ে ভেতরে যাবার সময়ের প্রতীক্ষা করতে করতেই তাঁবুর ভিতরকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইউলিসিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সবকিছুই বেশ সাজানোগোছানো। ঠাকুমার পালঙ্কটা তার রাজকীয় ভড়ঙের খোলস ছেড়ে ফেলেছে। আমাদিস্‌দের অস্থি-আধারটির পিছনে দেবদূতের মূর্তিটি

দাঁড় করানো। বাড়তি হিসেবে সিংহের থাবার নকশার একটা পিতলের বাথটাব যোগ করা হয়েছে। নতুন গদিওয়ালা বিছানায় শুয়ে এরেনদিরা সম্পূর্ণ নগ্ন, নিথর। তাঁবুর কাপড়ের মধ্যে পরিশ্রুত হয়ে আসা আলোয় তাকে শিশুর মতো চকচকে দেখাচ্ছে। চোখ খোলা থাকলেও সে কিন্তু ঘুমোচ্ছে। কমলাগুলো হাতে নিয়ে ইউলিসিস তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সে লক্ষ্য করল যে তাকে না দেখেও এরেনদিরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে, সেই মুহূর্তে আবিষ্কার করা নামে ইউলিসিস তাকে ফিসফিসিয়ে ডাকল,—'আরিনদেরে।'

এরেনদিরা জেগে উঠল। ইউলিসিসের সামনে নিজেকে নগ্ন দেখে সে কঁকিয়ে উঠল। তারপর তাড়াতাড়ি চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলল নিজেকে।

'আমার দিকে তাকিয়ো না',—সে বলল। 'আমি ভয়ংকর।'

'কমলার মতো তোমার গায়ের রং',—ইউলিসিস বলল। তুলনা করার জন্যে লেবুগুলোকে সে তার চোখের সামনে তুলে ধরল।

'দেখো।'

এরেনদিরা চোখ খুলে দেখল সত্যিই কমলাগুলির রঙ তার গায়ের রঙের মতো।

'তোমায় এখানে থাকতে দিতে চাই না',—এরেনদিরা বলল।

'আমি শুধু তোমায় এটা দেখাতে এসেছি',—ইউলিসিস বলল। 'এদিকে তাকাও।'

নখ দিয়ে সে একটি কমলা ছিঁড়ে ফেলল, তার দু'হাতে দু'টো টুকরো, ভিতরটা দেখাল এরেনদিরাকে। লেবুটার ভিতরে একটা আসল হিরে।

'এই কমলাগুলোই আমরা সীমান্ত থেকে নিয়ে আসি',—সে বলল।

'কিন্তু, এগুলো তো টাটকা',—বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে এরেনদিরা।

'অবশ্যই',—ইউলিসিস হাসে। 'আমার বাবা এগুলো ফলায়।'

এরেনদিরা বিশ্বাস করতে পারে না। সে সরিয়ে ফেলে মুখের ঢাকনাটা। হিরেটা হাতে নেয়। চিন্তিত অথচ বিস্ময়ের সঙ্গে সে সেটাকে নিরীক্ষণ করে।

'এই রকম তিনটের বদলে আমরা সারা দুনিয়াটা এক চক্কর ঘুরে আসতে পারি',—ইউলিসিস বলে। আশাহত চোখে হিরেটা তাকে ফেরত দেয় এরেনদিরা। ইউলিসিস কিন্তু বলেই চলে,—'তাছাড়া আমার একটা ছোট্ট ট্রাক আছে, আর তাছাড়াও...এই দেখো।'

জামার ভিতর থেকে সে একটা পুরোনো আমলের পিস্তল বের করে।

'দশ বছরের জন্য আমি কোথাও যেতে পারব না',—এরেনদিরা বলল।

'তুমি যাবে',—ইউলিসিস বলল। 'আজ রাতে সাদা তিমিটা ঘুমিয়ে পড়লে আমি বাইরে থেকে পেঁচার ডাক ডাকব।'

ইউলিসিসকে পেঁচার ডাকের অবিকল অনুকরণ করতে দেখে এরেনদিরার চোখে এই প্রথমবারের মতো হাসির ঝিলিক দেখা গেল।

'ও আমার ঠাকুমা',—সে বলে।

'হুতোমটা?'

'তিমিটা।'

দু'জনেই ভুল বুঝতে পেরে হেসে উঠল। কিন্তু এরেনদিরা আবার কথার খেই ফিরিয়ে আনল।

'ঠাকুমার অনুমতি ছাড়া কারও কোথাও যাবার উপায় নেই।'

'এরকম কথাবার্তার কোনও মানে হয় না।'

'যে করে হোক ও ঠিক খুঁজে বের করবে',—এরেনদিরা বলে। 'ও স্বপ্নেও সব দেখতে পায়।'

'তুমি চলে এলে স্বপ্ন শুরু হবার মধ্যেই আমরা সীমান্ত পেরিয়ে চলে যেতে পারব। স্মাগলারদের মতো আমরা ওপারে যাব',—একটানা বলার পর থামে ইউলিসিস।

ফিল্মের নায়কের মতো পিস্তলটা হাতে নিয়ে সে এরেনদিরাকে খেপিয়ে তোলে। এরেনদিরা হ্যাঁ

বা না কিছুই বলল না। কিন্তু তার চোখ দু'টো দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে ইউলিসিসকে চুম্বন দিয়ে বিদায় জানায়। তাকে স্পর্শ করে ইউলিসিস ফিসফিস করে বলে,—'আগামীকাল আমরা জাহাজগুলোর যাতায়াতের ওপর নজর রাখব।'

সেই রাতে, সাতটার কিছু পরে ঠাকুমার চুল আঁচড়ানোর সময় এরেনদিরার দুর্ভাগ্যের বাতাস আবার বইতে শুরু করল। ছাউনির তলায় তখন (রেড) ইন্ডিয়ান কুলি আর ব্যান্ড বাজিয়েরা পাওনার জন্যে অপেক্ষা করছে। থলির মধ্যেকার সমস্ত নোট আর খুচরো গুনে, হিসেব-নিকেশ কষে পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্য সবচেয়ে বুড়ো লোকটাকে ঠাকুমা ডাকলেন।

'এদিকে আয়',—তিনি ডাকলেন তাকে। 'এক হপ্তার জন্যে বিশ পেসো, খানাপিনার জন্য আটটা বাদ যাবে, জলের জন্য তিনটে, নতুন জামার জন্য পঞ্চাশ সেন্ট—তা হলে হল গিয়ে, সাড়ে আট পেসো। নে, গুনে নে।'

বুড়োটি গুনে নিল। তারপর সকলে তাকে প্রণাম করে চলে গেল।

এরপর ব্যান্ড বাজিয়েদের নেতাটি এগিয়ে এল। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি ফোটোগ্রাফারটির দিকে তাকালেন। সে তখন ক্যামেরাটা সারাই করতে ব্যস্ত।

'এটা কী হচ্ছে',—তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন। 'তুমি বাজনার এক সিকি খরচাও কি দেবে না?'

উত্তর দেবার জন্য ফোটোগ্রাফারটি তার মাথাটাও ঘোরাল না। 'বাজনা ছবিতে আসে না।'

'কিন্তু ছবি কিনবার লোকদের টেনে আনে',—ঠাকুমা জবাব দিলেন।

ফোটোগ্রাফারটি বলে,—'বরং, এটা মৃতকে মনে করিয়ে দেয়, আর সকলে চোখ বন্ধ করে ছবির কাছে আসে।'

বাজিয়েদের নেতাটি ফোড়ন কাটে,—'চোখ বন্ধ করার কারণ বাজনা নয়।' সে বলে চলে,—'রাতে ছবি তোলার জন্য তুমি যে আলো ফেল তার জন্যে।'

'এটা বাজনার জন্য',—ফোটোগ্রাফার জোর দিয়ে বলল।

ঠাকুমা বচসাটাকে আর বাড়তে দিলেন না। 'ছাগলের মতো কথা বল না',—ফোটোগ্রাফারকে তিনি বললেন। 'চোখ মেলে দেখ সেনেটর ওনাসিমো সানচেসের ব্যবসাটা কেমন চলছে। আর এটা বাজনার জন্যই।' তারপর খসখসে কর্কশ গলায় প্রসঙ্গটার ইতি টেনে তিনি বললেন,—'সুতরাং যা ইচ্ছে দিয়ে দাও অথবা নিজের ভাগ্য নিজে দেখার ব্যবস্থা কর। একরত্তি মেয়েটার উপর সব বোঝা চাপিয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়।'

'নিজের ভাগ্য আমি নিজেই দেখব',—ফোটোগ্রাফারটি বলে। 'যতই হোক আমি একজন শিল্পী।'

ঠাকুমা একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাজিয়েদের দিকে তাকালেন। হিসেবের খাতার সঙ্গে মিলিয়ে বাজিয়েদের নেতার হাতে তিনি একগোছা নোট দিলেন।

'দুশো চুয়ান্ন',—তিনি বললেন,—'বাদ যাবে পঞ্চাশ সেন্ট ; তার সঙ্গে রবিবারের জন্যে বত্রিশ আর ছুটির দিনগুলোর জন্য ষাট সেন্ট করে। সব বাদ ছাদ দিয়ে একশো-ছাপান্ন পেসো কুড়ি-সেন্ট।'

বাজিয়েদের নেতা তা নিতে অস্বীকার করল,—'এটা হবে একশো চুরাশি পেসো চল্লিশ সেন্ট। ওয়াল্‌তসেস্‌-বাজিয়েদের বেশি।'

'কেন?'

'কারণ তারা বেশি ক্লান্ত হয়',—সে বলে।

ঠাকুমা কিন্তু ওই পেসোগুলোই তাকে নিয়ে যেতে বাধ্য করলেন।

'ঠিক আছে এই হপ্তায় তোমরা দুটো চমৎকার বাজনা বাজাও, আমি কথা দিচ্ছি সব হিসেব চুকিয়ে দেব।'

ঠাকুমার যুক্তিটা ভালো মতো পছন্দ না হলেও বিষয়টা ধামাচাপা দেবার জন্য সে ওই পেসোগুলোই নিয়ে নিল। ঠিক সেই সময়েই তাঁবুটা উড়িয়ে দিতে চাইল এক দানবীয় ঝড়। আর সেই ভয়ংকর নিস্তব্ধতার মধ্যে শোনা গেল পাণ্ডুর-কর্কশ-খসখসে গলার একটা পেঁচার ডাক।

ভবিতব্য তাকে নিয়ে কোন খেলা খেলতে চায় এরেনদিরা তা জানে না। সিন্দুক থেকে অনেকগুলো নোট বার করে নিয়ে সে গুঁজে রাখল তার বিছানার তলায়। কিন্তু চাবিটা ঠাকুমাকে ফেরত দেবার সময় ঠাকুমা তার ভয়ের কাঁপুনি টের পেলেন। তিনি বুঝলেন—সে ভয় পেয়েছে।

'ভয় পাস না',—তিনি আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন। 'ঝড়ের রাতেই পেঁচারা ডাকে।' কিন্তু সান্ত্বনা পাওয়াটাও তার কপালে পুরোপুরি জুটল না। কারণ ফোটোগ্রাফারটি ক্যামেরা কাঁধে চলে যাওয়ার উপক্রম করছে।

'কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করতে পার',—ঠাকুমা বললেন। 'অবিশ্যি যদি তোমার মর্জি হয়। আজ রাতে মৃত্যু বড্ড দরাজ।'

আবার পেঁচার ডাক শুনতে পেলেও ফোটোগ্রাফারটি কিন্তু তার মত পরিবর্তন করল না।

'থেমে যাও বাছা',—এবার একটু জোর দিলেন তিনি। 'আর কিছু না হোক আমি বলছি, এটা ভেবেও থেকে যাও।'

'আমি কিন্তু বাজনার জন্য পয়সা দেব না',—ফোটোগ্রাফারটি বলল।

'ওহো না',—ঠাকুমা বললেন। 'ওর জন্য নয়।'

'ঠিক তো',—ফোটোগ্রাফারটি বলে। 'আপনার তো কারও জন্যেই দরদ নেই।'

ঠাকুমা রাগে গুম মেরে গেলেন। 'তাহলে ঢাক পেটাও,—বজ্জাত কোথাকার।'

তাঁর মাথায় খুন চেপে গেল। তিনি সমস্ত রাগটা ফোটোগ্রাফারের উপরই মেটাবেন ঠিক করলেন। কিন্তু এরেনদিরা এসে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিল। 'শয়তানীর বাচ্চা',—বিড়বিড় করে তিনি বলে চলেন। 'কারও হৃদয় সম্পর্কে ওই বেজন্মাটা কী জানে?' এরেনদিরা কিছুই শুনতে পেল·না। কারণ, পেঁচাটা ডেকেই যাচ্ছে। একে তছনছ করা একটা পরিবেশ আর ওদিকে অনিশ্চয়তা তাকে কুরে খাচ্ছে। সংস্কারবশত কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করে ঠাকুমা অবশেষে বিছানায় উঠলেন। নাতনি তাঁকে হাওয়া করেই চলেছে। তিনি যেন সমস্ত রাগকে জয় করে একটা হাপরের মতো নিশ্বাস ফেললেন।

'সকাল সকাল উঠতে হবে',—তারপর তিনি মুখ খুললেন। 'কারণ আমার স্নানের জলটা লোকজন আসবার আগেই গরম করে ফেলতে হবে।'

'আচ্ছা, ঠাকুমা।'

'জলটা চাপিয়ে (রেড) ইন্ডিয়ানগুলোব নোংরা কাপড়গুলো কাচতে হবে। এর ফলে সামনের হপ্তায় ওদের মজুরি থেকে কিছুটা আমাদের থেকে যাবে।'

'আচ্ছা, ঠাকুমা',—এরেনদিরা বলল।

'আর শান্তভাবে ঘুমোতে হবে যাতে ক্লান্তি দাঁত ফোটাতে না পারে। কাল বিষ্যুৎবার, সপ্তাহের সবচেয়ে বড়দিন।'

'আচ্ছা, ঠাকুমা।'

'আর উটপাখিটাকে খেতে দিস।'

'আচ্ছা, ঠাকুমা',—এরেনদিরা বলল।

পাখাটা বিছানায় মাথার কাছে রেখে সে দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল। ঠাকুমার ঘুম ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে এবং তাঁর আদেশের গতিও কম আসছে।

'আমাদিস্‌দের আলো দিতে ভুলিস না যেন।'

'আচ্ছা, ঠাকুমা।'

এরেনদিরা জানে যে তাঁর পক্ষে আর জেগে ওঠা সম্ভব নয়। কারণ তিনি প্রলাপ বকতে শুরু করে দিয়েছেন। সে তাঁবুর চারধারে হাওয়ার গর্জন শুনতে পেল। কিন্তু বুঝতে পারল না তার দুর্ভাগ্যের বাতাস আবার বইতে শুরু করেছে। আবার পেঁচার ডাক শুনতে না পাওয়া পর্যন্ত সে বাইরের অন্ধকার রাতের দিকে তাকিয়ে রইল। আর তার স্বাধীন হবার এই শেষ ইচ্ছাটুকু ঠাকুমার ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল।

তাঁবুর বাইরে পাঁচ-সাত পা যেতে না যেতেই সে ফোটোগ্রাফারের একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। সে তখন তার সাইকেলের ক্যারিয়ারের সঙ্গে ক্যামেরার সাজসরঞ্জামগুলো বাঁধবার কাজে ব্যস্ত। পরিচিতের হাসি হেসে ফোটোগ্রাফার বলতে শুরু করে,—'আমি কিছুই জানি না। আমি কিছু দেখিওনি। আর আমি অবশ্যই বাজনার জন্য পয়সা দেব না।'

সকলের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে সে চলে গেল। এরেনদিরা তখন একবারের জন্য এবং বরাবরের জন্যে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে ছুটে গেল মরুভূমির দিকে। গাঢ় অন্ধকারে বাতাসের ছায়ায় নিমজ্জিত হয়েও পেঁচাটা যেদিকে ডেকে চলেছে সে ছুটে চলল সেদিক পানে।

এইবার ঠাকুমা সোজাসুজি সামরিক কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হলেন। সবে সকাল ছ'টা। সেনাবাহিনীর স্থানীয় কম্যান্ডান্টটি তখন বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। ঠাকুমা তার চোখের উপর সেনেটরের কাগজটি তুলে ধরলেন। ইউলিসিসের বাবা দরজায় অপেক্ষমাণ।

'কী করে আশা করেন যে আমি এটা পড়তে পারব',—চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমি পড়তে জানি না।'

'এটা সেনেটর ওনাসিমো সানচেসের আশীর্বাণী।'

আর একটাও প্রশ্ন না করে কম্যান্ডান্টটি খাটিয়ার পাশে পড়ে থাকা রাইফেলটা তুলে নিয়ে তার লোকজনদের হুকুম দিতে শুরু করে দিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা মিলিটারি ট্রাক প্রতিকূল হাওয়া ঠেলে রওনা হয়ে গেল সীমান্তের দিকে। সমস্ত রকম তথ্যসূত্রই এখন আবহাওয়ার দরুন বানচাল হতে বসেছে। কম্যান্ডান্টটি নিজে বসল ড্রাইভারের পাশের আসনে, পিছনে এক সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে ঠাকুমা আর ইউলিসিসের বাবা অর্থাৎ সেই ওলন্দাজ ভদ্রলোক।

শহরের কাছাকাছি এসে তারা আটক করল ওয়াটারপ্রুফে ঢাকা একটা ট্রাকের কনভয়কে। বেশ কিছু লোক যারা কনভয়ের ট্রাকগুলিতে বসেছিল ট্রাকের ক্যানভাস তুলে তাদের দেখল তারা। তারপর স্টেনগান আর মিলিটারি রাইফেল তুলে তাক করল ছোট্ট ট্রাকটার দিকে। কম্যান্ডান্ট প্রথম ট্রাকের ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল কতক্ষণ আগে তারা একটা পাখিভর্তি ট্রাক দেখেছে।

উত্তর না দিয়েই ড্রাইভারটি গাড়ি চালাতে শুরু করে দিল।

'আমরা হোঁৎকা পায়রা নই',—খেঁকিয়ে উঠল সে। 'আমরা স্মাগলার।'

মেশিনগানের সারিগুলোকে চোখের সামনে দিয়ে যেতে দেখে কম্যান্ডান্ট তার হাত ওঠাল। আর এক মুখ হাসি মিশিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল,—'অন্তত এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে না গেলেই বোধ হয় ভালো হয়।'

শেষ ট্রাকটার একেবারে পিছনের বাম্পারে লেখা আছে—*এরেনদিরা, তোমাকে আমার মনে পড়ে।*

যতই তারা উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে বাতাস যেন আরও গরম হয়ে উঠতে শুরু করল। সূর্যের তেজ যেন উত্তপ্ত বাতাসের চেয়েও ভয়ংকর। ধুলো আর গরমের দাপটে আগাপাস্তালা বন্ধ ট্রাকের ভিতরে নিশ্বাস নেওয়াটাও যথেষ্ট কষ্টকর।

ঠাকুমাই ফোটোগ্রাফারটিকে প্রথমে চিনতে পারলেন। তারা যেদিকে চলেছে সেও সেদিকে প্যাডেল করতে করতে সাইকেল চেপে চলেছে। আর এই গরমে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে মাথায় বেঁধে নিয়েছে একটা রুমাল।

'ওই যে, ও',—ঠাকুমা আঙুল দিয়ে দেখালেন। 'ওই বজ্জাতটাই ওদের ফুসলিয়েছে।'

কম্যান্ডান্ট ট্রাকের জনৈক পুলিশকে ফোটোগ্রাফারটিকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন।

'ওকে ধরে এনে এখানে অপেক্ষা কর',—সে বলে ওঠে। 'আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি।'

পুলিশটি লাফিয়ে মাটিতে নেমে ফোটোগ্রাফারটিকে থামাবার জন্য দু'বার চেঁচাল। কিন্তু বাতাস উলটোদিকে বইবার জন্য ফোটোগ্রাফার কিছুই শুনতে পেল না। ফোটোগ্রাফারের পাশ দিয়ে ট্রাকটি যাবার সময় ঠাকুমা তার উদ্দেশে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করলেন। কিন্তু সে ভুল বুঝল। হাত তুলে হেসে, সে বিদায় জানাল। সে গুলির শব্দ শুনতে পেল না। বাতাসে একবার ঘাই মেরে সে সাইকেলের উপরেই প্রাণহীন অবস্থায় বসে পড়ল। তার মাথাটা একটা বুলেটে দু-ফাঁক হয়ে গেছে। সে কোনওদিনও জানতে

পারল না এই গুলিটা কোথা থেকে এল।

দুপুরের আগেই তারা পালক দেখতে শুরু করল। বাতাসে পাখির পালকগুলো এদিক-ওদিক উড়ছে। বাতাসে উড়ন্ত পালকের একটি ধরে ওলন্দাজ ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন যে এগুলো তাঁরই পাখির পালক। ড্রাইভার দিক পরিবর্তন করে সবচেয়ে বেশি গতিতে ছুটে চলল। এবং আধঘণ্টার মধ্যেই দিগন্তে সেঁটে থাকা ট্রাকটি নজরে এল।

সামনের আয়নায় মিলিটারি ট্রাকটিকে দেখতে পেয়েই ইউলিসিস দূরত্ব বাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার গাড়ির যান্ত্রিক দুরবস্থার দরুন কিছুই হল না। সারারাত না ঘুমিয়ে তারা প্রায় অবসন্ন। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। এরেনদিরা ইউলিসিসের কাঁধে মাথা রেখে ঢুলছে। সে হঠাৎ ভয়ে শিউরে উঠল। মিলিটারি ট্রাকটাকে পাশ কাটাতে দেখে সে ধীর-নিঃশব্দে নিঃসংকোচে খুপরি থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিল।

'এটা ভালো নয়',—ইউলিসিস বলল। 'স্যার ফ্রান্সিস্ ড্রেকের হাতেই ওটাকে ভালো মানায়।' কিছুক্ষণ রগড়ে নিয়ে এরেনদিরা পিস্তলটাকে জানালা দিয়ে ফেলে দেয়। মিলিটারি ট্রাকটা তাদের পাখিভর্তি বিধ্বস্ত ট্রাকটির পাশ কাটিয়ে সামনে এসে একেবারে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে গেল।

তাদের জীবনের সবচেয়ে জমকালো সময়ে আমি তাদের সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু রাফায়েল এস্কালোনার সেই বিখ্যাত আবেগপূর্ণ কাব্যগীতি শোনার আগে বিশদভাবে আমিও তেমন কিছুই জানতাম না। আর সমস্তটা জানার পর আমার মনে হল—এটাকে একটা গল্পের রূপ দিলে ভালো হয়। রিওহাচা শহরে সেই সময় আমি বিশ্বকোষ আর ডাক্তারি বই বিক্রির ফিকিরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আলভারো সেপেদা সামুদিও নামের এক বিয়ারওয়ালার সঙ্গে হঠাৎ আমার পরিচয় ঘটে। সেই নিঃসঙ্গতার দিনে দু'জনের জন্যই লাভজনক বলে সে আমায় তার ট্রাকে তুলে নেয়। কিন্তু আমি এত বেশি কথা বলে গেলাম আর বোতলের পর বোতল বিয়ার শেষ করলাম যে আমি বুঝতেও পারলাম না কখন আমরা সম্পূর্ণ মরুভূমিটা পেরিয়ে সীমান্তে পৌঁছে গেছি।

কাছেই একটা সামরিক ছাউনি। তার গায়ে বড় বড় হরফে লেখা—

এরেনদিরা সবচেয়ে ভালো।
ফিরে এসো—এরেনদিরা তোমাদের প্রতীক্ষায়।
এরেনদিরা ছাড়া জীবন অচল।

ঢেউখেলানো দিগন্তে মিশে যাওয়া পথটি সাপের মতো এঁকেবেঁকে ফাঁকা ঘরদোর আর পুকুরের মধ্যে দিয়ে ঘিঞ্জি বাজারের মাঝখানে ঢুকে গেছে। রাস্তায় নানা জাতি-প্রজাতির মানুষজনের আনাগোনা। সমস্ত এলাকাটাই ব্যবসায়ীদের ভিড়ে জমজমাট। প্রতিটি রাস্তায় জুয়ার আড্ডা, প্রতিটি বাড়িই শুঁড়িখানা আর প্রত্যেক দরজায় পলাতকের ভিড়। বিশ্রী গরম। বেসুরো গানের রেওয়াজ আর উচ্চকণ্ঠের দরাদরি একটা দুঃসহ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ভিড়ের মধ্যে একটা লোক চেঁচাচ্ছে : সাপের ওষুধ আছে—সাপের ওষুধ আছে। প্রচার করবার জন্য সে মাঝে মধ্যে সাপের ছোবল খাচ্ছে। মাকড়সার মতো চেহারার এক মেয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলে যাচ্ছে। বাপ-মাকে অমান্য করার জন্যই নাকি আজ তার এই অবস্থা। যারা তার কথা পরখ করতে চায় তাদের কাছ থেকে সে গুনে গুনে পঞ্চাশ সেন্ট করে আদায় করে নিচ্ছে। শাশ্বত জীবনের একদল প্রতিনিধি এক ধূমকেতুর আগমনবার্তা ঘোষণা করছে—যাঁর ভয়ংকর পাথুরে নিশ্বাসে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে, সমুদ্রের যাবতীয় রহস্য মরুভূমিতে এসে আছড়ে পড়বে।

একমাত্র নিষিদ্ধপল্লীটি শান্ত। শহুরে গুঞ্জনের সামান্যই সেখানে কানে আসছে। খুপরিগুলো থেকে মেয়েরা একঘেয়েমির হাই তুলতে তুলতে পরিত্যক্ত ক্যাবারেগুলোয় ঢুকে পড়ছে। চটকানো বাসি ফুলের গন্ধ তাদের গায়ের থেকে এখনও যায়নি। রকে বসে তারা তখনও ঘুমে ঢলে ঢলে পড়ছে। খদ্দেররা তখনও তাদের বিরক্ত করা শুরু করেনি; কারণ, তারাও ধূমকেতুর জন্য অপেক্ষা করতে করতে

ছাদে ঝুলানো পাখার তলায় বসে ঝিমোচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে থেকে হঠাৎ একজন পর্দা ঢাকা বারান্দায় উঠে গেল। রাস্তা থেকে দেখা যায় না বারান্দাটা। নিচে তখন এরেনদিরার খদ্দেররা সার বেঁধে চলেছে।

'এদিকে আয় তো',—সে অন্যান্যদের চিৎকার করে ডাকল। 'ওর কাছে কী এমন আছে যা আমাদের নেই?'

'কোনও এক সেনেটরের একটা চিঠি',—অন্য একজন চিৎকার করেই জবাব দেয়।

হাসি আর চেঁচামেচিতে আকৃষ্ট হয়ে অন্য মেয়েরাও বারান্দায় বেরিয়ে এল।

'এই রকম লাইন সারাদিন চলবে',—ওদের একজন বলে। 'চিন্তা করো, প্রতি খেপে পঞ্চাশ পেসো।'

'ঠিক আছে। আমি গিয়ে দেখে আসি ওই সাত মাসের বাচ্চাটা কী এমন রত্ন।'

'আমিও যাই',—আর একজন বলে ওঠে। 'আমাদের চেয়ারগুলোকে একটু ফাঁকায় বিশ্রাম করতে দিয়ে গরম হয়ে ওঠার জন্য এটাই বরং মন্দের ভালো।'

পথে আরও কয়েকজন তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ফলে এরেনদিরার তাঁবুর কাছে যেতে যেতেই বেশ বড় একটা দঙ্গল তৈরি হয়ে গেল। তারা কিছু না বলেই ঢুকে পড়ল ভিতরে। পয়সা দিয়ে কেনা ভালোবাসা পাবার অপেক্ষায় বসে থাকা লোকগুলোকে তারা বালিশ নিয়ে তাড়া করল। এরেনদিরার বিছানাটা তাঁবুর বাইরে এনে ফেলে দিল,—যেন ওটা একটা আবর্জনার স্তূপ।

'এ কী অত্যাচার!'—ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠলেন। 'নেমকহারামের দল!' তারপর তিনি সার দিয়ে দাঁড়ানো মানুষগুলোর দিকে ঘুরে বলে উঠলেন,—'আর তোরা কতগুলো মেনিমুখো মিনসে। তোদের পুরুষত্ব আছে না গেছে? হাঁদা খোকার মতো চোখের সামনে এমন আক্রমণ হতে দিলি? নরকের কীট কোথাকার!'

যতক্ষণ সম্ভব তিনি চেঁচিয়ে গেলেন। হাতের কাছে যাকে পেলেন তাকেই ক্রুশটা দিয়ে পেটালেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চিৎকার, অবিশ্রান্ত চেঁচামেচি চারপাশে ঘিরে থাকা মানুষগুলোর ভেংচানির শব্দে প্রায় ডুবে যাচ্ছিল।

এরেনদিরাও এই ঘটনার হাত থেকে মুক্তি পেল না। কারণ, পালিয়ে যাবার ঘটনার পর থেকেই ঠাকুমা তার বিছানার সঙ্গে শিকল দিয়ে একটা কুকুর বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা এরেনদিরার কোনও ক্ষতি করেনি। জমজমাট রাস্তায় তাকে রঙিন চাদরে মুড়ে দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলল। তারপর ঠিক শহরের মাঝখানটিতে এরেনদিরাকে তাবা বসিয়ে দিল। মুখ লুকিয়ে এরেনদিরা বসে আছে। তার সারা শরীর ঝলসিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার চোখে জল নেই। কুকুরের শিকলে বাঁধা অবস্থায় ময়দানের সেই দারুণ দাবদাহে লজ্জা আর রাগ মাথায় করে সে বসে রইল—যতক্ষণ না একজন কেউ দয়াপরবশ হয়ে তার মুখটা নিজের জামা দিয়ে ঢেকে দিল।

সেই একবার মাত্র আমি তাকে দেখি। ঠাকুমার সিন্দুকটা খুলে যাওয়া পর্যন্ত ওদের সমস্ত নিরাপত্তা জনগণের হাতেই ছিল। এরপরই তারা সমুদ্র পেরিয়ে মরুভূমির দিকে চলে যায়। সেই গরিব লোকগুলোর আর কোনওদিন এমন সৌভাগ্য হয়নি। ষাঁড়ে-টানা একটা গাড়িতে করে তারা চলেছে, পিছনে স্তূপাকার তখনও অবশিষ্ট সেই ভয়ংকর গৃহদাহের কিছু সস্তা অবশেষ; শুধু সেই দুর্লভ ঘড়িটাই নয়, একটা পুরোনো পিয়ানোও ঠেসে দেওয়া হয়েছে। একদল (রেড) ইন্ডিয়ান মালপত্রের দায়িত্ব নিয়েছে। আর সবার সামনে চলেছে বাজিয়েদের একটা দল। প্রতি গ্রামে ঘোষিত হচ্ছে তাদের দিগ্বিজয়ী পদার্পণ।

ঠাকুমা আবার একটি ডুলিতে বসে। চারদিকে কাগজের দেয়াল, মাথার দিকটি গির্জার অনুকৃতি। তাঁর স্তনযুগল মিনারের মতো উঁচিয়ে আছে। কারণ ডাকাতরা যেমন বুকের মধ্যে গুলিগোলা রাখে তিনিও তেমনি সমস্ত সোনার বাট ওখানে জমা রেখেছেন। এরেনদিরার পরনে ঝলমলে পোশাক তবে তার গোড়ালি শিকল দিয়ে বাঁধা।

'তোর আর অভিযোগের কোনও কারণ নেই',—সীমান্ত শহরটা পেরিয়ে ঠাকুমা বললেন। 'রানির

মতো পোশাক, বিলাসবহুল বিছানা, নিজস্ব একটা রেডিও আর চোদ্দোজন কুলি তোর কথা শোনার জন্য একপায়ে খাড়া। জমকালো ব্যাপার নয় কি?'

'হ্যাঁ, ঠাকুমা।'

'যখন তুই আর আমার থাকবি না',--ঠাকুমা বলে চলেন। 'তোকে আর লোকের দাক্ষিণ্যে চলতে হবে না। কারণ, তোর নিজেরই একটা বাড়ি থাকবে। তখন তোর মুক্তি আর সুখ আটকায় কে?'

একেবারে নতুন, অভূতপূর্ব ভবিষ্যতের এক ছবি। অথচ সে কখনও পুরোনো ধারের কথা উচ্চারণ করতে পারছে না। তার বিস্তারিত হিসাব এখন আরও জটিল হয়ে পড়ছে, যেহেতু ব্যবসায় ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন ঘটছে। তবুও এরেনদিরা ক্ষণেকের তরেও নিজের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাল না। সব রকম অত্যাচারের কাছে সে আত্মসমর্পণ করল। নোনা পাথরের বিছানায়, হ্রদের পারের শহরের একঘেয়েমিতে, ট্যালকম্ খনির পাথুরে দেয়ালে—সর্বত্র। এদিকে ঠাকুমা কানের কাছে গুনগুন করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটা সুস্পষ্ট ছবি এঁকে যাচ্ছেন যেন উনি হাতের তাসগুলি দেখতে পাচ্ছেন। এক বিকেলে সংকীর্ণ গিরিখাত বেয়ে নেমে এসে জামাইকার দুর্বোধ্য কথাবার্তা শুনতে পেল এরেনদিরা আর ঠাকুমা। টের পেল প্রাচীন গুল্মের এক ঝোড়ো বাতাস। এক অভাবিত আশায় তাদের হৃদয় কেঁপে উঠল। তারা সমুদ্রের কাছে এসে পৌঁছেছে।

'এই হল সেই',—ঠাকুমা বললেন। বুকভরা বাতাস নিয়ে জীবনের অর্ধেকটা সময় নির্বাসনে থাকার পর তিনি যেন মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন। 'তোর ভালো লাগছে না?'

'হ্যাঁ, ঠাকুমা।'

সেইখানেই তারা তাঁবু খাটাল। সেই রাতে ঠাকুমা স্বপ্ন না দেখেই বকবক করতে লাগলেন। আর মাঝেমাঝেই তাঁর পুরোনো দিনের স্মৃতি আর অনাগত ভবিষ্যৎ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। তারপর তিনি অভ্যস্ত ঘুমে ঢলে পড়লেন। সকালে সমুদ্রের শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙল। তা সত্ত্বেও এরেনদিরা যখন তাঁকে স্নান করাচ্ছিল তখন তিনি অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে আবার অনুমানের খেলা শুরু করে দিলেন। আর এটা এমন এক আবেশ জড়ানো নেশা যে মনে হয় স্মৃতির অন্দরে ওলটপালট শুরু হয়ে গেছে।

'তুই একজন মহীয়সী',—তিনি তাকে বললেন। 'একেবারে সর্বগুণে গুণান্বিতা। যারা তোর দাক্ষিণ্যে বেঁচে আছে তাদের কাছ থেকে তোর শ্রদ্ধা পাওয়া উচিত। আর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের তো তোকে সম্মান প্রদর্শন বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি জাহাজের ক্যাপ্টেন পৃথিবীর সব বন্দর [illegible]ক তোকে পোস্টকার্ড পাঠাবে।'

এরেনদিরা তাঁর কথা শুনছিল না। বাইরে থেকে আসা একটি নল দিয়ে ইন্দ্রিয়াবিষ্টকারী সুগন্ধী বাথটাবটার জলে পড়ছিল। একহাতে মগ অন্য হাতে সাবান। এরেনদিরা ঠাকুমাকে স্নান করাতে বসে পড়ল।

'তোদের গুষ্টির কথা লোকের মুখে মুখে আনতিয়েস্ থেকে হল্যান্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে',—ঠাকুমা বলেই চলেন। 'আর এটা রাষ্ট্রপতি ভবনের চেয়ে বেশি জরুরি। কারণ, সেখানে শুধু সরকারের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা আর দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়।'

হঠাৎ নলের জল বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপারটা দেখার জন্য এরেনদিরা তাঁবুর বাইরে এসে দেখে যে কুলিটার নলে জল ভরবার কথা সে রান্নাঘরের পাশে বসে কাঠ কাটছে। 'বেরিয়ে যাচ্ছে',—কুলিটা বলে। 'আমাদের আরও জল ঠান্ডা করতে হবে।'

উনুনের কাছে গিয়ে এরেনদিরা দেখে আর এক গামলা জল ফুটছে। কুলিটার সাহায্য ছাড়াই সে হাতে কাপড় জড়িয়ে ওটা নামিয়ে ফেলে। 'তুমি যাও',—সে বলে। 'আমি জল ঢালছি।' কুলিটা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া অবধি সে অপেক্ষা করল। সেই ভারী গামলাটা অতি কষ্টে নলের গোড়ায় এনে যখন জল ঢালতে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে ঠাকুমার পরিত্রাহি চিৎকার কানে এল।

'এরেনদিরা!'

এমনভাবে ডাকলেন যেন তিনি সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন। চিৎকারে হতচকিত হলেও নাতনি শেষ মুহূর্তে অনুতপ্ত হল।

'আসছি, ঠাকুমা'—সে বলল। 'আমি তো জল ঠান্ডা করছি।'

সেই রাতে সে বহুক্ষণ অবধি জেগে রইল। ঠাকুমা ঘুমের ঘোরে গান গেয়ে চললেন। তাঁর পরনে একটা সোনালি শেমিজ। গভীর দৃষ্টি দিয়ে এরেনদিরা তাঁকে বিশেষত তাঁর ঘুমন্ত চোখ দু'টি লক্ষ্য করতে লাগল। ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে যেন তা বেড়ালের মতো উঁচিয়ে আছে। তারপর একজন ডুবন্ত মানুষের মতো বিছানার দিকে সে এগিয়ে গেল, তার হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করা, চোখ দু'টি দৃষ্টিশূন্য। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে গম্ভীরভাবে সে ফিসফিসিয়ে বলে উঠল,—'ইউলিসিস।'

কমলার বাগানে ঘেরা বাড়িতে ইউলিসিসের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। এরেনদিরার কণ্ঠস্বর এত স্পষ্ট যে সেই থমথমে অন্ধকার ঘরেই তাকে খোঁজার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অল্প সময়েই সে জামা-জুতো পরে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। পোর্টিকোতে পা দিতে না দিতেই বাবার গলা তার সমস্ত সত্তাকে শিহরিত করে তুলল।

'কোথায় চললি?'

চাঁদের আলোয় ইউলিসিসের চোখে তাঁকে নীলাভ দেখাচ্ছে।

'বিশ্বের আঙিনায়',—সে জবাব দেয়।

'এখন তোকে আর কোনও বাধা দেব না',—ওলন্দাজ ভদ্রলোক বললেন। 'কিন্তু একটা বিষয়ে সতর্ক করে দিই। যেখানেই যাস না কেন তোর বাবার অভিশাপ তোকে সর্বদা অনুসরণ করবে।'

'করুক গে',—ইউলিসিসের ছোট্ট জবাব।

ছেলে সম্পর্কে ভদ্রলোকের চোখে কিঞ্চিৎ বিস্ময়। একটু গর্বিত নয় কি? ওলন্দাজ ভদ্রলোক সাবধানি দৃষ্টিতে বাগান দিয়ে চলে যাওয়া ছেলের গতিপথ অনুসরণ করলেন। হাসির রেখা ফুটে উঠল তাঁর মুখে। আদিবাসী সুলভ সৌন্দর্য নিয়ে পিছনে তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে। ওলন্দাজ ভদ্রলোক আবার মুখ খুললেন ; ইউলিসিস ততক্ষণে সদর দরজাটা বন্ধ করেছে।

'ও ফিরে আসবে',—ভদ্রলোক বললেন। 'জীবনের মার খেয়ে ও ফিরে আসবে। তুমি যা ভাবছ তার অনেক আগেই ও ফিরে আসবে।'

'তুমি এত বোকা',—মহিলা বললেন। 'ও আর কোনওদিন ফিরবে না।'

এবার ইউলিসিস কারও কাছে এরেনদিরার খোঁজ করল না। চলন্ত ট্রাকগুলো থেকে নিজেকে লুকিয়ে সে মরুপ্রান্তর পেরোতে শুরু করল! খাওয়া, ঘুম সবই চুপিচুপি কয়েকবার সারল। এভাবেই যেতে থাকল যতক্ষণ না সেই শহরে পুরোনো তাঁবুটার সে দেখা পেল যেখানে সমুদ্রের ধারে আলো ঝলমল জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজগুলো আরুবা দ্বীপে যাবার জন্য বিশ্রাম নিচ্ছে। ডুবন্ত মানুষের মতো হাত-পা ছড়িয়ে এরেনদিরা সেইভাবে শুয়ে রয়েছে। তার পা শিকল দিয়ে বাঁধা। এভাবেই সে তার প্রেমাস্পদকে গভীরভাবে আহ্বান করেছিল। ইউলিসিস বহুক্ষণ ঘুমন্ত মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তার দৃষ্টি বড্ড তীক্ষ্ণ। মেয়েটি জেগে উঠল। সেই অন্ধকারে তখন তারা পরস্পরকে চুম্বন করল। জড়িয়ে ধরল একে অপরকে। ধীরে ধীরে নগ্ন হল। এক নীরব গভীর সুখে তারা ডুবে গেল যা ভালোবাসার চেয়েও মহান।

তাঁবুর অপরপ্রান্তে ঠাকুমা জলহস্তীর মতো একপাক ঘুরে প্রলাপ বকতে শুরু করলেন।

'সেই সময় গ্রিক জাহাজটা এসেছিল,'—তিনি শুরু করলেন। 'কতকগুলো পাগলে ঠাসা, যারা মেয়েদের পয়সা না দিয়ে স্পঞ্জ চটকানোর মতো শুধুমাত্র দলাই-মালাই করেই ভালোবাসা জানায়। আর তারপর সেই বিমথিত স্পঞ্জগুলো ...কগ্রস্তা রোগীর মতো হাসপাতালে যেত। তাদের কোলের বাচ্চাগুলো কুঁইকুঁই করত যাতে চোখের জলটুকুও খাওয়া যায়।'

দুনিয়া কাঁপানো শব্দে তিনি একপাক ঘুরে বিছানায় আবার টানটান হয়ে গেলেন।

'হা ভগবান, সেই সময় সে এসেছিল,'—তিনি চিৎকার করে উঠলেন। 'আমাদিস্‌দের চেয়েও বলিষ্ঠ। লম্বা। অনেক বেশি পুরুষালি।'

ইউলিসিস এতক্ষণ প্রলাপ ধ্বনির কোনও গুরুত্বই দিচ্ছিল না। কিন্তু এখন লুকোতে বাধ্য হল। কারণ, ঠাকুমা বিছানায় উঠে বসেছেন। এরেনদিরা তাকে আশ্বাস দিল।

'সহজভাবে নাও,'—সে ইলিসিসকে বোঝায়। 'এ রকম অবস্থায় উনি সব সময়ই উঠে বসেন, কিন্তু জাগেন না।'

ইউলিসিস এরেনদিরার ঘাড়ে মুখ গুঁজে দেয়।

'সেই রাতে আমি মাল্লাদের সঙ্গে গান গাইছিলাম। ভাবলাম এটা বোধহয় ভূমিকা',—ঠাকুমা বলেই চলেন। 'তারাও সবাই একইরকম ভেবেছিল ; চেঁচাতে চেঁচাতে পালাতে শুরু করল। হাসির হল্লায় একেবারে লুটোপুটি খাচ্ছিল। কেবল সে একা দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক যেন কালকের ঘটনা। ব্যাপারটা এতই পরিষ্কার। আমি সেই গানটা গাইছিলাম যেটা সকলের মুখে মুখে সেই সময় ফিরত। এমনকি উঠোনের পায়রাগুলোও গানটা গাইত।'

মাদুরের ওপর হাত পা ছড়িয়ে, কেবলমাত্র স্বপ্নেই যা সম্ভব, তিনি গাইতে শুরু করলেন। সেই তিক্তস্বরে তিনি শুরু করলেন,—

'প্রভু আমার, ও প্রভু! দাওনা ফিরিয়ে আমার সেই সরলতা,
যাতে সমস্ত হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারি ওর ভালোবাসা।'

এতক্ষণে ইউলিসিস ঠাকুমার স্মৃতিরোমন্থনে উৎসাহ পেল।

'সেখানে সে ছিল,'—ঠাকুমা বলে চলেন। 'এক কাঁধে ম্যাকাও পাখি আর অন্য কাঁধে শিকার করার ছোট্ট রাইফেলটা ঝুলছে। গায়নায় যেমন করে গুয়াতারাল পৌঁছেছিল ঠিক তেমনিভাবে সে আমার সামনে এল। আমি মৃত্যুর নিশ্বাস অনুভব করলাম। সে আমায় বলল,—আমি লক্ষবার পৃথিবী ঘুরেছি। সবদেশের নারী দেখেছি। সুতরাং যথেষ্ট জোর দিয়েই বলতে পারি তুমিই সবচেয়ে উষ্ণ, সবচেয়ে কাম্য আর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।' তিনি আবার শুয়ে পড়লেন। তিনি বালিশটাকে ধামসাচ্ছেন।

ইউলিসিস আর এরেনদিরা অনেকক্ষণ নিশ্চুপ। ঘুমন্ত ঠাকুমার নাসিকা গর্জনে তারা দু'জনেই শিউরে উঠছে! হঠাৎ এরেনদিরা গলায় এতটুকু দ্বিধা না রেখে প্রশ্ন করল,—'তোমার খুন করার সাহস আছে?'

ঘটনার আকস্মিকতায় ইউলিসিস বিমূঢ়।

'কে জানে,'—সে বলে। 'তুমি পারবে?'

'আমি পারব না,'—এরেনদিরা বলল। 'ও আমার ঠাকুমা।'

তখন ইউলিসিস ঘুমন্ত মহিলার বিশাল শরীরটার দিকে চোখ রেখে বলল,—'তোমার জন্য আমি সব পারি।'

ইউলিসিস এক পাউন্ড বিষ কিনে আনল। ভালো করে সেটা মেশাল ক্রিম আর জ্যামের সঙ্গে। তারপর সেই অনিবার্য মিশ্রণটি একটুকরো প্যাস্ট্রিতে ঢেলে দিল। প্যাস্ট্রির উপর চামচ দিয়ে আরও কিছু বিষাক্ত মিশ্রণ লাগিয়ে জিনিসটাকে এমন নরম করে দিল যাতে তার এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের বিন্দুমাত্রও বোঝা না যায়। তারপর বাহাত্তরটা ছোট ছোট মোমবাতি বসিয়ে বিষয়টাকে আরও পোক্ত করল।

ঠাকুমা তাঁর সিংহাসনে বসে ছিলেন। ইউলিসিসকে একটা জন্মদিনের কেক হাতে তাঁবু থেকে বেরোতে দেখলেন।

'শয়তানের বাচ্চা',—তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন। 'কোন সাহসে এখানে পা দিয়েছিস?'

ইউলিসিস তার দেবদূতের মতো নিষ্পাপ মুখের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখল।

'ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আপনার কাছে এসেছি'—সে বলে চলে। 'আজ আপনার জন্মদিন।'

তার ছলনায় ভুলে, ঠাকুমা টেবিলটা এমনভাবে সাজালেন যেন বিয়ের আসর বসতে চলেছে। যাক প্রথম ফাঁড়াটা ভালোভাবেই পেরোল! তারপর এক দানবীয় ফুৎকারে সবকটি জ্বলন্ত মোমবাতি নিভিয়ে কেকটি দুটো সমান ভাগে কাটলেন। তিনি ইউলিসিসকে খেতে দিলেন।

'যে লোক জানে কীভাবে ক্ষমা চাইতে হয়, অর্ধেক স্বর্গ তো তার হাতের মুঠোয়,'–তিনি বলে চলেন। 'প্রথম টুকরোটা তোমায় দিলাম, সুখের টুকরো।'

'আমি মিষ্টি ভালোবাসি না। আপনি খান,'–সে বলল। ঠাকুমা এরেনদিরাকে একটুকরো কেক দিলেন। সে সেটা রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে নোংরা জায়গায় ফেলে দিল। বাকিটা ঠাকুমা পুরোই খেলেন। বড় বড় টুকরোগুলো তিনি না চিবিয়ে গিলেই ফেললেন। আনন্দে তাঁর চোখে জলের ধারা নেমেছে। হৃদয়ের সমস্ত তৃপ্তি সহকারে তিনি ইউলিসিসের দিকে তাকালেন। নিজের প্লেটের সবটুকু ফুরিয়ে গেলে তিনি ইউলিসিসের টুকরোটায় হাত বসালেন। শেষ টুকরোটা যখন চিবোচ্ছিলেন তখন তিনি টেবিলক্লথটাও মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর আঙুলগুলো শক্ত দাঁড়ার মতো হয়ে উঠল।

একটা প্রজন্মের সমস্ত ইঁদুরকে মেরে ফেলবার মতো আর্সেনিক বিষ তিনি গলাধঃকরণ করলেন। তা সত্ত্বেও মাঝরাত অবধি তিনি পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইলেন। বিছানায় গেলেন। এবং তাঁর স্বাভাবিক ঘুম হল। নতুনত্বের মধ্যে তাঁর নিশ্বাসে ভেসে আসছে ফাটা বাঁশের আওয়াজ। এরেনদিরা আর ইউলিসিস অন্য বিছানা থেকে সন্তর্পণে তাঁকে লক্ষ্য করছে। অপেক্ষা করতে লাগল কখন তাঁর মৃত্যুর দামামা বেজে ওঠে। কিন্তু প্রলাপ বকার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর আগের মতোই উদ্দীপ্ত।

'আমি পাগল হয়ে গেছিলাম, হে ভগবান, একেবারে বিশুদ্ধ পাগল,'–তিনি চিৎকার করে উঠলেন। 'সে যাতে ঘরে আসতে না পারে তার জন্য আমি দরজায় দু-দু'খানা খিল দিয়ে দিলাম। শোয়ার ঘরের দরজায় প্রথমে আলনা, তারপর টেবিল, তার পিছনে চেয়ারগুলো–এইভাবে দরজার সঙ্গে সেঁটে দিলাম। সে শুধু আংটি দিয়ে একবার স্পর্শ করল। সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে গেল। চেয়ারগুলো টেবিলের উপর পড়ে গেল। টেবিল আর আলনা নিজেরাই আলাদা হয়ে গেল। আর খিল দুটো কুলুপ থেকে খুলে গেল।'

এরেনদিরা আর ইউলিসিস বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। নেশা আজ ভালোই জমেছে। তীক্ষ্ণ প্রলাপ ভীষণ নাটকীয় আর কণ্ঠস্বর প্রচণ্ড দরদি।

'আমার মনে হল আমি মরে যাচ্ছি। ভয়ে আমার জামা-কাপড় ভিজে গেছে। দরজা না খুলেই, তাকে ঢুকতে না দিয়েই, সে যেন চলেও না যায় আবার ফিরেও না আসে এইভাবে আমি তার কাছে ভিক্ষা চাইলাম, কারণ আমি তাকে খুন করতে পারব না।'

ঘণ্টা কয়েক ধরে তিনি নাটক চালিয়ে গেলেন। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে বিস্তারিত বিবরণ নিলে দেখা যেত তিনি স্বপ্নে বেঁচে উঠেছেন। ভোর হবার খানিক আগে তিনি বিছানায় গড়াগড়ি খেতে শুরু করলেন। তাঁর গলা তখন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।

'আমি ওকে সাবধান করেছিলাম, আর সে হাসল,'–ঠাকুমা চিৎকার করে উঠলেন। 'আমি আবার ওকে সাবধান করলাম, আর ও আবার হাসল। তারপরে ও বীভৎস চোখ দুটো মেলে বলতে শুরু করল,– ডাইনি রানি! আমার ডাইনি রানি!' তাঁর স্বর মোটেই মুখ দিয়ে বেরোচ্ছিল না। ছুরি দিয়ে কাটা গলার ফাঁক দিয়ে সেই শব্দ বেরোচ্ছিল।

ইউলিসিস ঠাকুমার ভয়ংকর আওয়াজে আতঙ্কিত হয়ে এরেনদিরার হাত দুটো আঁকড়ে ধরল।

'খুন হয়ে যাওয়া বুড়ি!'–তার কণ্ঠে অবাক বিস্ময়। এরেনদিরা তাকে তেমন আমল দিল না। ভোর হতে শুরু করেছে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজল।

'যাও,'–এরেনদিরা বলে। 'ও এক্ষুণি জেগে উঠবে।'

'একটা হাতির চেয়েও ওর জীবনীশক্তি বেশি,'–ইউলিসিসের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। 'না এটা হতে পারে না বলে।'

এরেনদিরা খর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল। 'পুরো ঝামেলাটা হল তুমি একজনকে খুনও করতে পার না।'

ভর্ৎসনার তীব্রতায় ইউলিসিস তাঁবু থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। এরেনদিরা তার সমস্ত গোপন ঘৃণা আর হতাশা নিয়ে ঠাকুমার উপর চোখ রাখল। ইতোমধ্যে সূর্য উঠে পড়েছে, বাতাসে ভেসে আসছে পাখির কূজন। ঠাকুমা চোখ মেললেন। এরেনদিরার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে মুখে মৃদু হাসি।

'ভগবান তোর সঙ্গে আছেন।'

একমাত্র চোখে পড়ার মতো ঘটনা হল এই যে তাঁর নিত্য কর্মপদ্ধতিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। দিনটা বুধবার। অথচ ঠাকুমা রোববারের কাপড়চোপড় চাইছেন। তিনি স্থির করলেন যে বেলা এগারোটার আগে এরেনদিরা কোনও খদ্দেরকেই বিছানায় তুলতে পারবে না। এরেনদিরাকে নখ রাঙাতে বললেন। একটা যাজকের টুপি দিলেন তার হাতে।

'নিজের ছবি তোলার জন্য আমি কোনওদিন এত ব্যগ্র হইনি,'—তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

এরেনদিরা ঠাকুমার চুল আঁচড়ানো শুরু করল। কিন্তু আঁচড়াতে গিয়েই একগোছা চুল চিরুনির দাঁতে আটকে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে সেটা ঠাকুমাকে দেখাল। ঠাকুমা নিবিষ্টভাবে দেখে, আবার চুল টানলেন, এবার আঙুল দিয়ে। একগোছা চুল উঠে এল। মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে তিনি আবার টানলেন, আবার একগোছা উঠে এল। এবার পরিমাণটা অনেক বেশি। এবার তিনি দু'হাতে চুল ওপড়াতে শুরু করলেন। পাগলের মতো হাসতে হাসতে তিনি ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করলেন গোছা গোছা চুল যতক্ষণ না মাথাটা খোসা ছাড়ানো নারকেলের মতো হয়ে গেল।

দু'সপ্তাহ এরেনদিরা ইউলিসিসের কোনও খবর পেল না। তারপর সে আবার তাঁবুর বাইরে পেঁচার ডাক শুনতে পেল। ঠাকুমা তাঁর স্মৃতির নেশায় মশগুল। দিন-রাত পিয়ানোর কাছে বসে গান করেন। বাস্তব সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অনবহিত। তাঁর মাথায় এখন একটা পালকের পরচুলা।

এরেনদিরা পেঁচার ডাকে সাড়া দিল। ঠিক তখনই সে লক্ষ্য করল পিয়ানো থেকে একটা পলতে বেরিয়ে এসেছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। ইউলিসিসের কাছে দৌড়ে গিয়ে সে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। তারপর তারা দু'জনে দমবন্ধ করে লক্ষ্য করতে লাগল কেমন করে নীল শিখাটি পলতে ধরে লতিয়ে লতিয়ে অন্ধকার জায়গাটা অতিক্রম করে তাঁবুতে ঢুকে গেল।

'কান চাপা দাও,'—ইউলিসিস বলল।

তারা দু'জনেই কান চাপা দিল। কিন্তু তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, কোনও বিস্ফোরণ ঘটল না, ঝলসানো আলোয় তাঁবুর ভিতরটা ঝলমলে হয়ে উঠে পিয়ানোটা নিঃশব্দে ফাটল। আর তারপর? তাঁবুটা ধুলোর মতো উড়ে গেল। সাহস করে এরেনদিরা ভিতরে ঢুকল। সে ধরেই নিল যে ঠাকুমা মারা গেছে। তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল। পরচুলাটি খসে পড়েছে। জামাকাপড় শতচ্ছিন্ন। কিন্তু অমিতবিক্রমে আগুন নেভাতে তিনি ব্যস্ত।

কুলিদের বেড়া ডিঙিয়ে পিছলে পালিয়ে গেল ইউলিসিস। একে তো তারা জানে না কী করতে হবে, তার উপর ঠাকুমার উলটোপালটা আদেশ তাদের আরও গুলিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত যখন আগুন-টাগুন সমস্ত কিছু নিভানো হয়ে গেল তখন মনে হল সবাই যেন একটা জাহাজডুবির অভিজ্ঞতা থেকে সবে ফিরে এসেছে।

'এটা নিশ্চয়ই কোনও শয়তানের কাজ',—ঠাকুমা বললেন। 'কোনওদিনই কোনও পিয়ানো এভাবে ফেটে যায় না।'

ঠাকুমা এই নতুন ধরনের ধ্বংসের সমস্ত রকম কারণ জোগাড় করতে শুরু করলেন। কিন্তু এরেনদিরার অভিনয় আর নৈর্ব্যক্তিক আচরণ তাঁকে ধাঁধায় ফেলে দিল। নাতনির আচরণে তিনি এতটুকুও ফাঁক খুঁজে পেলেন না। ইউলিসিসের উপস্থিতি সম্পর্কে কোনও চিন্তাকেই তিনি পাত্তা দিলেন না। একসঙ্গে বসে সব কিছু ক্ষতির খতিয়ানের জন্য তিনি সকাল পর্যন্ত জেগে রইলেন। গুঁড়ি মেরে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। পরের দিন সকালে এরেনদিরা যখন ঠাকুমাকে সোনার বাটগুলো পরিয়ে দিচ্ছিল তার চোখে পড়ল ঠাকুমার কাঁধে পোড়া দাগ আর স্তনের উপরটা ঝলসে গেছে। 'ঘুমের মধ্যে এপাশ-ওপাশ করার অভ্যেস আমার আছে,'—তিনি বলতে শুরু করলেন। তখন এরেনদিরা পোড়ো জায়গাগুলোতে ডিমের প্রলেপ লাগিয়ে দিচ্ছিল। 'আর তাছাড়া, আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম,'—একটু গম্ভীর হয়ে তিনি স্বপ্নের বিষয়বস্তু মনে করার চেষ্টা করলেন।

'একটা সাদা খাটিয়ায় একটা ময়ূর শুয়ে আছে,'—তিনি বললেন।

এরেনদিরা চমকে উঠেই চকিতে নিজেকে সামলে নিল।

'এটা তো ভালো চিহ্ন,'—সে মিথ্যে বলল। 'স্বপ্নে ময়ূর দেখলে আয়ু বাড়ে।'

'ভগবান তোর কথা শুনুক,'—ঠাকুমা বললেন। 'কারণ যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম আমরা সেখানে ফিরে যাচ্ছি। আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করব।'

এরেনদিরার মুখভঙ্গিতে কোনও পরিবর্তন নেই। সে তার ঠাকুমার ঘায়ে ডিমের প্রলেপ আর ন্যাড়ামাথায় সরষের তেল মাখিয়ে নোংরা তুলোগুলো নিয়ে বাইরে চলে গেল। আরও প্রলেপ তৈরির জন্য সে তালগাছের তলায় বসে ডিম ফাটাল। জায়গাটা এখন সাময়িক রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঠিক তখনই সে দেখতে পেল উনুনের পিছনে ইউলিসিসের চোখজোড়া উঁকি মারছে, ঠিক যেমনভাবে এরেনদিরা প্রথমবার তাকে বিছানায় দেখেছিল। সে চমকাল না, কিন্তু চাপাস্বরে বলল,—'আমার ঋণের বোঝা বাড়ানো ছাড়া তোমার দ্বারা আর কিছুই হল না।'

ইউলিসিসের চোখে অনিশ্চয়তার ছায়া। নিথর-নিশ্চুপ চোখে সে এরেনদিরার দিকে চেয়ে রইল। সে দেখল এরেনদিরা নির্বিকারভাবে ডিমই ফাটাচ্ছে। ক্ষণেক পরেই তার চোখজোড়া চঞ্চল হয়ে উঠল। রান্নাঘরে টাঙানো হাঁড়ি, বাসনকোসন আর বাঁকা ছুরিটা তার চোখে পড়ল। কোনও শব্দ না করে ইউলিসিস উঠে দাঁড়াল। তাকগুলোর দিকে এগিয়ে এল। হাতে তুলে নিল ছুরিটা। এরপরেও এরেনদিরা তার দিকে তাকায়নি। কিন্তু যখন ইউলিসিস তাকের তলা থেকে বেরিয়ে এল তখন এরেনদিরা খুব শান্তস্বরে বলল—'সাবধান। ও কিন্তু মৃত্যুর সংকেত পেয়ে গেছে। কাল রাতে ও সাদা খাটিয়ায় শোয়া ময়ূরের স্বপ্ন দেখেছে।'

ছুরি হাতে ইউলিসিসকে এগিয়ে আসতে দেখে ঠাকুমা তাঁর বিশাল থলথলে শরীর নিয়ে নিমেষে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাত দুটো সম্মুখপানে প্রসারিত।

'এই ছেলে তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'—তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

ইউলিসিস জ্যামুক্ত তীরের মতো এসে তাঁর খোলা বুকে ছুরিটা আমূল বিঁধিয়ে দিল। ঠাকুমা ইউলিসিসের উপর পড়ে গেলেন। তারপর তিনি কঁকিয়ে উঠলেন। তাঁর ওই বিশাল হাত দিয়ে ইউলিসিসকে পিষে ফেলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

'কুত্তির বাচ্চা,'—ঘরঘরে স্বরে তিনি গর্জে উঠলেন। 'তোর মুখটা যে বেইমান দেবদূতের মতো তা বুঝতে আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

আর কিছুই বলার সুযোগ তিনি পেলেন না। কারণ, ইউলিসিস নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুরিটা দ্বিতীয়বার বসিয়ে দিয়েছে। ঠাকুমা কঁকিয়ে উঠলেন। কিন্তু আরও শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর আক্রমণকারীকে। নির্দয় ইউলিসিস তৃতীয় ঘা বসিয়ে দিতেই এক ঝলক রক্ত তার সমস্ত মুখটা ভিজিয়ে দিল। তেলচিটে, চকচকে ঘন রক্ত, যেন মৌচাকের মধু।

পেশাদার খুনির নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে এরেনদিরা প্লেট হাতে প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই দেখতে লাগল।

বিশাল দানবীর শরীর নিয়ে যন্ত্রণায় আর রাগে অস্থির হয়ে ঠাকুমা ইউলিসিসকে আষ্টেপৃষ্টে জাপটে ধরলেন। ঠাকুমার হাত-পা এমনকি নেড়া মাথাটা পর্যন্ত রক্তে মাখামাখি। মৃত্যু গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসার সঙ্গে তাঁর হাপরের মতো নিশ্বাসের শব্দ চতুর্দিককে প্রকম্পিত করে তুলেছে। ইউলিসিস নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েই বৃদ্ধার পেটটা চিড়ে ফেলল আর সঙ্গে সঙ্গে রক্তের বন্যায় সে আপাদমস্তক ভিজে গেল। ঠাকুমা মাথা তুলে মুক্ত বাতাস নেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। ধপ করে তাঁর মাথাটা পড়ে গেল। মৃত বাহুদ্বয় থেকে নিজেকে মুক্ত করেই একটুও কালক্ষেপ না করেই ইউলিসিস শেষ আঘাতটা হানল।

এতক্ষণে এরেনদিরা প্লেটটা রেখে ঠাকুমার কাছে এগিয়ে এল। স্পর্শ না করে খুঁটিয়ে দেখল। যখন সে বুঝতে পারল যে সত্যি সত্যি তাঁর মৃত্যু হয়েছে, অকস্মাৎ তার মুখে ফুটে উঠল বয়স্ক মানুষের পরিণতির ছাপ, যা তার কুড়ি বছরের দুর্ভাগ্যময় জীবনের ফসল নয়। সংক্ষেপে দ্রুতগতিতে সে সোনার থলিটি হাতিয়ে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ইউলিসিস তখনও মৃতদেহটার পাশে বসে থকথকে রক্তে মাখা মুখ চোখ পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে তারই আঙুল কেটে যেন ঘন ও চাপ চাপ রক্ত ঝরে পড়ছে। এরেনদিরাকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখে সে নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হল।

সে এরেনদিরার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু কোনও সাড়া পেল না। লাফ দিয়ে দরজার কাছে এসে সে দেখল,—এরেনদিরা সমুদ্রতীরের রাস্তা দিয়ে শহরের বাইরের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। ভাঙা, যন্ত্রণাবিদ্ধ স্বরে সে চেঁচিয়ে এরেনদিরাকে ডাকার শেষ চেষ্টা করল। সে স্বর প্রেমিকের নয়, সন্তানের। অথচ সে কারও সাহায্য না নিয়েই এইমাত্র এক ভয়ংকর মহিলাকে নিজের হাতে খুন করেছে। ঠাকুমার ভৃত্যরা তাকে ধরে বেলাভূমিতে শুইয়ে দিল। নিঃসঙ্গতা আর ভয়ে ইউলিসিস তখন কাঁদতে শুরু করেছে।

এরেনদিরা শুনতে পায়নি ইউলিসিসের ডাক। বাতাস কেটে সে হরিণীর চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। পৃথিবীর কোনও ডাকই আর তাকে থামাতে পারবে না। মাথা না ঘুরিয়েই সে একে একে সোনার কুয়ো, অভ্রের খনি, জেলখানার প্রাচীর পেরিয়ে এগিয়ে চলল। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই সমুদ্র শেষ হয়ে মরুভূমি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এরেনদিরা সোনার থলি আঁকড়ে ধরে তীক্ষ্ণ বাতাস আর অশেষ সূর্যাস্ত পেরিয়ে তখনও ছুটে চলেছে। এরেনদিরা শুনতে পেল না আর কোনও পিছুডাক। তার দুর্ভাগ্যের এতটুকু ছায়াও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

মূল শিরোনাম · La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada.

ভালোবাসা পেরিয়ে শাশ্বত মরণ

মারা যাবার ছ'মাস এগারো দিন আগে সেনেটর ওনেসিমো সানচেস্ তাঁর জীবনের নারীর দেখা পেলেন। তিনি তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন 'রোসাল-দেল-ভিরে' বন্দরে। সেখানকার জেটি জঙ্গি চোরাচালানকারী জাহাজের আনাগোনায় সারারাত অস্থির আর দিনেরবেলায় বন্দরটি মরুভূমিতে মুখ থুবড়ে থাকা খাঁড়ির মতন শুকনো খটখটে। সবমিলিয়ে সবদিক থেকেই এমন দিকভ্রান্ত—যে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না যে জায়গাটায় আদৌ প্রাণের চিহ্ন আছে। এমনকী নামটাও একটা তামাশা মাত্র। কারণ, এই অঞ্চলের একমাত্র গোলাপ ফুলটি ব্যবহার করেন সেই বিকেলে স্বয়ং সেনেটর ওনেসিমো সানচেস্, যেদিন তিনি লরা ফারিনার দেখা পান।

নির্বাচনী প্রচারের কাজে জায়গাটা অপরিহার্য। নির্বাচনী প্রচার তাঁকে প্রতি চার বছর অন্তর করতে হয়। প্রচারের জন্য কার্নিভাল ওয়াগনগুলি সকালেই পৌঁছে গেছিল। তারপর এল ভাড়াটে (রেড) ইন্ডিয়ান ভর্তি লরিগুলো, জন মহোৎসবকে বিস্তৃতি দেবার জন্য যাদের একান্ত প্রয়োজন। এগারোটা বাজার কিছু আগেই জমজমাট বাজনা শুরু হল। আতসবাজি আর জিপের লাইনের মধ্যে সেনেটরের ঘিয়ে-সাদা গাড়িটা উপস্থিত হল। সেনেটর ওনেসিমো সানচেস্ নিস্তরঙ্গ, ভাবলেশহীন মুখে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ির মধ্যে বসে আছেন। গাড়ির দরজা খুলতে না খুলতেই তিনি যেন দমকা আগুনের মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁর ফিনফিনে রেশমি জামাটা যেন হালকা রঙের ঝোলের মধ্যে চোবানো হল। বয়সের তুলনায় নিজেকে তিনি অনেক বেশি বয়স্ক ও নিঃসঙ্গ মনে করলেন। আসলে তিনি সবে বিয়াল্লিশ পেরিয়েছেন। গোটিন্‌গেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানের সঙ্গে তিনি মেটালার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছেন। তিনি একজন কৌতূহলী পাঠক এবং যদিও তেমন নাম করতে পারেননি তবুও অনুবাদ করেছেন কিছু চিরায়ত ল্যাতিন সাহিত্যের। দীপ্তিময়ী এক জার্মান মহিলাকে বিয়ে করে তাঁকে উপহার দিয়েছেন পাঁচটি সন্তান। তাঁরা সকলেই সুখী এবং সেই মারাত্মক খবর পাবার আগে পর্যন্ত বাড়ির মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সুখী। এই মাত্র মাস তিনেক আগে তাঁকে খবর দেওয়া হল—যেভাবেই হোক না কেন আগামী বড়দিনের আগেই তিনি মারা যাবেন।

জনসমাবেশের প্রস্তুতির সময় তারা তাঁকে ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের জন্য একটি বাড়িতে নিয়ে এল। বিশ্রামের আগে গোলাপটাকে, তিনি যাকে মরুভূমির এতটা পথ বাঁচিয়ে রেখে নিয়ে এসেছেন, এক গেলাস জলে ডুবিয়ে রাখলেন। সঙ্গে আনা ভাত-ডাল দিয়েই সারা হল মধ্যাহ্নভোজ। কারণ এখানে মধ্যাহ্নভোজে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে ভাজা মাংস, যা তিনি এড়াতে চান। তারপর নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মুখে পুরলেন হজমের বড়ি। তিনি রোগের আগেই প্রতিষেধকে বিশ্বাসী। এরপর ঝুলন্ত ইলেকট্রিক ফ্যানটাকে পিছনের দিকে টেনে এনে মিনিট পনেরোর জন্যে গোলাপের ছায়ায় নগ্ন হয়ে শুয়ে পড়লেন। ডাক্তাররা ছাড়া কেউ জানে না যে তাঁর যাওয়ার ঘণ্টা বেজে গেছে। কারণ, জীবনের এতটুকু তালভঙ্গ না করে গর্বে নয়, লজ্জায় তিনি একাকীই সহ্য করে চলেছেন এই গোপনীয়তাটুকু।

নিজেকে পুরোপুরি নিজের জিম্মায় রেখে তিনটে নাগাদ তিনি জনতার সামনে উপস্থিত। পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম—পরনে ফ্লানেলের মোটা প্যান্ট, গায়ে ঢোলা জামা। আর ব্যথা কমাবার বড়ি খাওয়ায় মেজাজটিও এখন যথেষ্ট চাঙ্গা। মৃত্যুচিন্তা যেভাবে তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিল তা আরও বেশি ক্ষতিকর—অন্তত তেমনই তিনি ভেবেছিলেন। মঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসা খেয়োখেয়ি করা করমর্দন প্রত্যাশীদের সম্পর্কে তিনি অনুভব করলেন এক অদ্ভুত উন্নাসিকতা। এতটুকু দুঃখ আজ তাঁকে ছুঁতে

পারল না যা তিনি খালি পায়ের দেশি (রেড) ইন্ডিয়ানগুলোকে, যারা নিজেদের মুখের গর্তটাও ভরাতে অক্ষম, দেখে পেয়ে থাকেন। হাত নেড়ে থামালেন সমবেত বিশাল কলধ্বনি। এতটুকু সৌজন্যের মধ্যে না গিয়ে একটু ক্রুদ্ধ হয়েই শুরু করলেন তাঁর ভাষণ। সামনের জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখজোড়া স্থির। গরম নিশ্বাসে ওঠা-নামা করছে তাঁর বুক। মালা, গভীর কণ্ঠস্বর যেন তাঁর মনে ঠান্ডা জলের প্রলেপ লাগিয়ে দিল। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা যার সবটাই মুখস্থ করা আর উগ্‌রে দেওয়া, যার সবটাই সত্যি কথা বলে যাওয়া নয়, বরং মারকাস্ আরলিয়াস্-এর ধ্যান সংক্রান্ত বইয়ের চতুর্থ খণ্ড থেকে কয়েকটি অমোঘ উচ্চারণ মাত্র।

'প্রকৃতিকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি'—তাঁর সমস্ত রকম প্রত্যয়ের উল্টো স্রোতে তিনি শুরু করলেন। 'আমরা নিজ গৃহে পরবাসী হয়ে থাকব না। খারাপ আবহাওয়ায় তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়ে ভগবানের অনাথ শিশুর মতো নিজেদের দেশে বিতাড়িত হয়ে আমরা আর থাকব না। আমরা অন্যরকম মানুষ হব। ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ, আমরা মহান এবং সুখী মানুষ হব।'

তাঁর খেলায় রয়েছে একটা নির্দিষ্ট ছিরিছাঁদ। তিনি বলতে শুরু করলে তাঁর চ্যালাচামুণ্ডারা কাগজের পাখি তৈরি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। কৃত্রিম বস্তুগুলি যেন প্রাণ পেয়ে মাথার চারধারে উড়ে বেড়িয়ে শেষে সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। এবং ঠিক সেই সময় অন্য ক'জন গাছের নিষ্পত্র ডাল কার্নিভাল ওয়াগন থেকে বের করে এনে জনতার পিছনে পুঁতে দিতে থাকে। কার্ডবোর্ড দিয়ে কতগুলি বাড়ির মডেল তৈরি করা হয়। বাড়িগুলোয় কাচের জানালা আর ইটের রং লাল—অন্তত দেখে তাই মনে হয় আর তার উপরে তারা ছেয়ে দেয় বাস্তব জীবনের কয়েকটি প্রতিচ্ছবি।

দুটো লাতিন উদ্ধৃতি দিয়ে সেনেটর তাঁর বক্তৃতাকে দীর্ঘায়িত করতে পছন্দ করেন যাতে ধাপ্পাবাজিকে আরও কিছু সময় দেওয়া যায়। বৃষ্টি তৈরির যন্ত্র, হাঁস-মুরগির ডিমে তা দেবার যন্ত্র, সুখের একটা তেলতেলে পরিবেশ যাতে নোনামাটিতেই শাকসবজির উৎপাদন হয়, জানালার খোপে খোপে কাল্পনিক ফুলের গুচ্ছ—এমন সব প্রতিশ্রুতি তাঁর খুব পছন্দ। ওই রূপকথার জগৎ সম্পূর্ণ হওয়ামাত্র তিনি ওদিকে আঙুল উঁচিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন,—'এই পথেই ওটা আমাদের হবে, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ। দেখুন, ওই পথেই ওটা আমাদের হবে।'

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী ঘুরে দাঁড়ায়। বাড়িগুলোর পিছনে রঙিন কাগজের একটা সমুদ্র-তটরেখা ইতোমধ্যেই আঁকা হয়ে গেছে। এবং কাগুজে শহরের সর্বোচ্চ বাড়িটা থেকেও এটা দীর্ঘ। তৈরির সময় থেকে, এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে আসার ফলে, একমাত্র সেনেটরই তা লক্ষ্য করেন, চড়া আবহাওয়ায় এই কার্ডবোর্ডের শহরটা ক্ষয়ে গেছে এবং এটা এখন সম্পূর্ণভাবেই রোসাল-দেল-ভিরের মতোই দারিদ্র্যপীড়িত ও ধুলোমলিন।

দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে এই প্রথম সেনেটরকে শুভেচ্ছা জানাতে যায়নি নেলসন ফারিনা। সে তার দিবানিদ্রা সংক্ষিপ্ত করে অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা একটি খোলার বাড়ির শীতল নিকুঞ্জ ছায়ায় টাঙানো দোলনায় বসে ভাষণ শুনল। এই বাড়িটা সে তার ওষুধ বানানো হাতেই বানিয়েছে। এই হাত দিয়েই সে তার প্রথম স্ত্রীকে খুন করেছিল। শয়তানের দ্বীপ থেকে পালিয়ে একগাদা অবোধ টিয়াপাখি ভর্তি এবং পারামারিবো-য় দেখা এক চকচকে কালো মেয়েমানুষ রয়েছে এমন একটা জাহাজে করে সে রোসাল-দেল-ভিরেতে অবতরণ করে ; সেই মেয়ে মানুষটার গর্ভে তার একটা মেয়ে জন্মায়। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে মেয়েমানুষটা অন্যদের কষ্ট না দিয়ে মারা গেলে স্থানীয় কবরখানায় ওলন্দাজ নামেই তাকে কবরস্থ করা হয়। মেয়েটা তার মায়ের রঙ আর চেহারার সঙ্গে উত্তরাধিকার সূত্রে পেল বাবার হলুদ এবং বিস্ময়োৎফুল্ল একজোড়া নয়ন। আর সব মিলিয়ে লোকটা কল্পনা করতে পারল যে সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরীকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছে।

সেনেটর ওনেসিমো সানচেসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই, সেই প্রথমবারের নির্বাচনী প্রচারের সময়, নেলসন ফারিনা একটা ভুয়া পরিচয়পত্রের জন্য অনেক আবেদন-নিবেদন করে, যাতে আইন তাকে ছুঁতে না পারে। সেনেটর বিনীত স্পর্ধায় তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তবে নেলসন অত সহজেই ছেড়ে দিল

না এবং কয়েক বছর ধরেই সে এই অনুরোধটা সুযোগ পেলেই ঝালিয়ে নেয়। কিন্তু এবারই, এই প্রথম সে নিজের খোপে বসে শাপমন্যি করতে লাগল,—'সেনেটর যেন জলদস্যুদের জলন্ত আখড়ায় জীবন্তাবস্থায় পচে মরে।' জনসভার শেষ হর্ষধ্বনি শোনার পর সে মাথা তুলল। বেড়া ডিঙিয়ে বাইরে তাকাল এবং দেখতে লাগল জনসমাবেশের পেছনে ঘটে যাওয়া তামাশা। খেলনা বাড়িঘরগুলো, গাছপালার কাঠামো, এতক্ষণ সমুদ্রতটরেখা নির্মাণে ব্যস্ত লুকিয়ে থাকা পুতুল নাচিয়েদের—সবই সে দেখল। তারপর বিদ্বেষের মনোভাব ছাড়াই থুথু ফেলল। 'চমৎকার'—সে বলল। 'রাজনীতি নিয়ে ভালোই ধান্দাবাজি!'

ভাষণ শেষে, যেমন হয় সেনেটর শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলেন। বাজি আর বাজনায় ছেঁকে থাকা গাদাখানেক মানুষ, তাদের অভাব-অভিযোগ সমস্বরে বলে যাচ্ছে। সেনেটর ভালোমানুষের মতো তাদের সব কথা শুনলেন এবং কাউকেই তেমন কোনও প্রতিশ্রুতি না দিয়েই প্রত্যেককেই কিছু না কিছু সান্ত্বনা দিলেন। এক বাড়ির ছাদের ওপর থেকে ছ'টা ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে এক মহিলা বাজির শব্দ আর হই-হল্লা ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল,—'আমি বেশি কিছু চাই না সেনেটর।' সে বলল,—'কুয়ো থেকে জল তোলার জন্য শুধু একটা গাধা চাই।' সেনেটর বাঁকা চাউনিতে ছ'টা ডিগডিগে বাচ্চার দিকে তাকালেন। 'তোমার স্বামী কোথায়',—তিনি জিজ্ঞেস করলেন। 'সে আরুবা দ্বীপে ভাগ্যানুসন্ধানে গেছিল',—মহিলা মুচকি হেসে জবাব দিল। 'আর খুঁজে পেয়েছে এক বিদেশিনী, যার হাসিতে নাকি মুক্তো ঝরে।' উত্তরের ভঙ্গিতে একটা হাসির ছর্‌রা উঠল। 'ঠিক আছে',—সেনেটর মনোস্থির করলেন। 'তুমি তোমার গাধাটা পাবে।' কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনেটরের এক চ্যালা একটা সাজানো-গোছানো গাধা মহিলার সামনে নিয়ে এসে হাজির হল যেটার গায়ে কিছু নির্বাচনী শ্লোগান আঁকা আছে, যাতে সবাই বুঝতে পারে এটা সেনেটরের দেওয়া উপহার।

রাস্তার বাকিটুকুতে তিনি নেহাতই পাশ-কাটানো ভঙ্গিতে অন্য সবাইকে দেখে নিলেন। তবে এর মধ্যেই অসুস্থ একজনকে চামচ করে ওষুধ খাইয়ে দিলেন, কারণ লোকটি তাঁকে দেখবার জন্যই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। একেবারে শেষ প্রান্তে, বেড়ার জালি দিয়ে দেখতে পেলেন নেলসন ফারিনাকে। সে তখন সপ্রশ্ন অথচ ফ্যাকাশে মুখে হতবাক হয়ে তার ছোট্ট খোপের মধ্যে বসে আছে। তবুও সেনেটর মুখে একটুও মমতা না দেখিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'ও হে! কেমন আছ?' —নেলসন ফারিনা দুঃখদীর্ণ দৃষ্টিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর মনটা ভিজিয়ে দিল। 'আমি? এই চলছে আর কী',—সে কোনওরকমে জবাব দেয়।

কথাবার্তা শুনে তার মেয়েটা বেরিয়ে এল উঠোনে। পরনে সস্তা, রঙ-ওঠা গুয়াসিরো (রেড) ইন্ডিয়ানদের ফ্রক, রঙিন তীর দিয়ে সজ্জিত অলকদাম, আর সূর্যের তীব্রতা রোধের জন্য তার মুখটা রঙ করা। তবুও এই রকম এক অবিন্যস্ত অবস্থাতেও যে কেউ ভাবতে পারে—সারা দুনিয়ায় এত সুন্দরী আর কেউ নেই। সেনেটর দম বন্ধ করে এলাকাটা পেরিয়ে গেলেন। 'আমার ধ্বংস অনিবার্য',—বলে তিনি সবিস্ময়ে নিঃশ্বাস নিলেন। 'ভগবানই সবচেয়ে হাস্যকর জিনিসগুলো তৈরি করেন।'

সেই রাতে নেলসন ফারিনা সব সেরা পোশাকে সাজিয়ে মেয়েকে সেনেটরের কাছে পাঠাল। বন্দুকধারী দু'জন সিপাই অসহ্য গরমে মাথা নাড়তে নাড়তে ভাড়া করা বাড়িটার বৈঠকখানার একমাত্র চেয়ারটায় মেয়েটাকে বসতে বলে ভিতরে গেল।

সেনেটর পাশের ঘরে রোসাল-দেল-ভিরে-র গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁর ভাষণের সারমর্ম পেশ করবার জন্যই তাঁদের জড়ো করা হয়েছে। মরুভূমির অন্যান্য যে কোনও শহরের গণ্যমান্যদের মতোই তাঁদের চালচলন, কথাবার্তা। কোনও ফারাক নেই। একেবারেই একঘেঁয়ে। এমনকি সেনেটর স্বয়ং রাতের এই অধিবেশনে ভীষণ ক্লান্ত ও অসুস্থতা বোধ করলেন।

তাঁর জামা ঘামে সপসপ করছে, ঘরের গরম হাওয়ায় সেটাকে শুকোবার চেষ্টা করলেন। বৈদ্যুতিক পাখাটা বনবন করে ঘুরছেই, মনে হচ্ছে যেন ঘরের মধ্যেই একটা ঘোড়া প্রচণ্ড তাপে ছটফট করছে।

'আমরা নিশ্চয়ই কাগুজে পাখি খেতে পারি না',—তিনি বললেন। 'আপনারা এবং আমি সকলেই জানি যে একদিন এই ছাগলের নাদিতেই গাছপালা হবে, ফুল ফুটবে। জলে পোকামাকড়ের বদলে মাছ ঘুরে বেড়াবে। সেদিন আপনাদের এবং আমার কারওই কিছু করবার থাকবে না। আমি কি নিজেকে পরিষ্কার করতে পেরেছি?'

কেউ কোনও উত্তর দিলেন না। কথা বলতে বলতেই সেনেটর ক্যালেন্ডার থেকে একটা পাতা ছিঁড়লেন। নিজের হাতেই বানালেন একটা কাগজের প্রজাপতি। কোনওরকম লক্ষ্য স্থির না করেই ওটাকে বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসে উড়িয়ে দিলেন। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে প্রজাপতিটা আধখোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেনেটর মৃত্যুর পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য নিয়ে নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বরে কথা বলে যাচ্ছিলেন। 'অতএব'—তিনি বলে চললেন,—'আপনারা যা জেনেই গেছেন তার পুনরাবৃত্তি করতে আমি চাই না। আমার পুনর্নির্বাচন আমার চেয়েও আপনাদের পক্ষে ভালো ব্যাপার। কারণ, আমি নিঃস্তরঙ্গ জল আর (রেড) ইন্ডিয়ান ঘামে নিরাশ হয়ে গেছি আর আপনারা এর থেকে বাঁচার রসদ খুঁজে পান।'

লরা ফারিনা কাগজের প্রজাপতিটা বেরিয়ে আসতে দেখল। একমাত্র সেই দেখল, কারণ সিপাই দুটো ইতিমধ্যে বন্দুক ঘাড়ে করে ঢুলতে শুরু করে দিয়েছে। কয়েকটা পাক খাওয়ার পর বিশাল কাগজের প্রজাপতিটা ভাঁজ খুলে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে সেখানেই আটকিয়ে গেল। লরা ফারিনা সেটাকে নখ দিয়ে তোলার চেষ্টা করল। সিপাইদের একজন, পাশের ঘরের হর্ষধ্বনিতে এর মধ্যেই যার ঝিমুনি কেটে গেছে, লক্ষ্য করল লরার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। 'ওটা কিছুতেই উঠবে না',—সে ঘুম জড়ানো স্বরে বলে উঠল। 'ওটা ওখানেই সেঁটে গেছে।'

লরা ফারিনা বসে পড়ল। ততক্ষণে ভদ্রমহোদয়গণ মিটিং শেষে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছেন। সেনেটর দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বৈঠকখানা একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবার পর তিনি লরা ফারিনাকে লক্ষ্য করে বললেন,—'তুমি এখানে কী করছ?' সে বলল,—'আমার চাইবার কিছুই নেই।'

সেনেটর ব্যাপারটা বুঝলেন। ঘুমন্ত সিপাই দুটোকে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর দেখলেন লরা ফারিনাকে, যার অস্বাভাবিক সৌন্দর্য তাঁর যন্ত্রণার থেকেও বেশি কাম্য। তিনি বুঝলেন, মরণ তাঁর জন্যে শেষ সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেলেছে।

'ভিতরে এসো',—তিনি বললেন। ঘরে ঢুকতে গিয়েই লরা ফারিনা হতভম্ব হয়ে গেল। হাজার হাজার ব্যাঙ্ক নোট প্রজাপতির মতো পতপত করে হাওয়ায় উড়ছে। সেনেটর পাখাটা বন্ধ করে দিলেন। হাওয়াহীন ঘরে সেগুলো এদিক-সেদিকে ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রকে ঝলমল করে এঁটে বসল।

'দেখেছ',—তিনি সহাস্যে বললেন,—'এমনকি কাগজও উড়তে পারে!' লরা ফারিনা বসে পড়ল একটা টুলের উপর। তার ত্বক মসৃণ, টানটান, অপরিশোধিত তেলের মতনই রঙটা আর রোদে পোড়া তন্বী লেজের মতো ঝুঁটি করে তার চুল বাঁধা। তার চোখ দু'টি আলোর চেয়েও উজ্জ্বল। সেনেটর লরার দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে সেই গোলাপটা খুঁজে পেলেন, যেটা এতক্ষণে সোরার দাক্ষিণ্যে শুকোতে শুরু করেছে।

'একটা গোলাপ',—তিনি পরিচয় করিয়ে দেবার গলায় বলে উঠলেন। 'হ্যাঁ',—বিমূঢ়ভাবে সে বলল,—'রিওহাচায় ওদের আমি চিনেছি।'

গোলাপ সম্পর্কে কথা চালাতে চালাতে, জামার বোতাম খুলতে শুরু করে সেনেটর একটা ক্যাম্পখাটে বসলেন। বুকের ভিতরে যেখানে হৃৎপিণ্ডটা আছে তিনি বুঝতে পারলেন সেটা বোম্বেটেদের তীরবিদ্ধ টাট্টুঘোড়ার মতো লাফাতে শুরু করে দিয়েছে। জুতো খোলার জন্য লরাকে একটু সাহায্য করার জন্যে অনুরোধ করলেন।

লরা ক্যাম্পখাটের দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে বসল। সেনেটর তখনও তাকে খুঁটিয়ে দেখে চলেছেন। এবং যখন ফিতে দুটো খোলা হয়ে গেল তিনি অবাক বিস্ময়ে ভাবলেন, এই সাক্ষাৎকারের কোন অংশটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেষ হতে চলেছে।

'তুমি নেহাতই বাচ্চা'—তিনি বলে ফেললেন। 'আপনি বিশ্বাস করবেন না',—সে বলল 'সামনের

এপ্রিলেই আমি উনিশে পা দেব।' সেনেটর উৎসাহী হলেন।

'দিনটা?'

'এগারোই এপ্রিল',—সে বলল।

সেনেটর একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করলেন। 'আমরা দু'জনে বন্ধু',—তিনি সহাস্যে বলে চললেন। তিনি আরও বললেন,—'এটা নিঃসঙ্গতার প্রতিকৃতি।'

লরা ফারিনা কোনওরকম মনোযোগ দিতে পারছিল না, কারণ সে জানে না বুটজোড়া নিয়ে কী করতে হবে। সেনেটরও তাঁর দিক থেকে জানেন না লরা ফারিনাকে নিয়ে কী করতে হবে। কারণ, তিনি বাজারি প্রেমে অভ্যস্ত নন। আর তাছাড়াও তিনি জানতেন ব্যাপারটার উৎস অমর্যাদাকর। কিছুক্ষণ চিন্তা করেই তিনি হাঁটুজোড়ার মাঝে লরাকে চেপে ধরলেন, তার কোমরটা ধরলেন জড়িয়ে, ক্যাম্পখাটের ওপর তাঁর শরীরটা নুইয়ে পড়ল। তখনই তিনি অনুভব করলেন পরিধানের তলায় তার শরীরটা নগ্ন, ঘন জঙ্গলের বুনো জন্তুর গন্ধ তার শরীরে কিন্তু তার হৃদয় ভয়বিহ্বল আর তার ত্বক আঠালো ঘামে চ্যাটচেটে।

'আমাদের কেউ ভালোবাসে না',—তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। লরা ফারিনা কিছু বলার চেষ্টা করল, তবে দম নেবার জন্যে সেখানে বাতাস খুবই কম। তিনি তাকে শুতে সাহায্য করে আলোটা নিভিয়ে দিলেন। ঘরটা ঢাকা পড়ে গেল গোলাপের ছায়ায়। সে ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল। সেনেটর ধীরে ধীরে তাকে আলিঙ্গন করলেন, হাত বুলিয়ে তাকে খোঁজার চেষ্টা করলেন, কিন্তু যেখানে তিনি তাকে খুঁজছিলেন সেখানে লোহার মতো একটা কিছুর স্পর্শ পেলেন।

'এখানে এটা কী?'

'একটা তালা',—সে বলল।

'এর মানে কী',—ভয়ংকরভাবে সেনেটর চেঁচিয়ে উঠলেন। 'চাবিটা কোথায়?'

লরা ফারিনা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। 'আমার বাবার কাছে',—সে উত্তর দিল—'বাবা আপনাকে বলতে বলেছেন যে আপনি যেন তাঁর কাছে আপনার একজন লোক পাঠান। আর তার মারফত আপনি একটা লিখিত বিবৃত পাঠাবেন।

সেনেটর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। 'বেজন্মা',—তিনি গরগর করে উঠলেন। একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি চোখ বুঁজলেন এবং নিজেকে অন্ধকারের মাঝে ডুবিয়ে দিলেন।

[মনে করো, তিনি মনে করলেন, তুমি অথবা অন্য যে কেউ হও না কেন, তুমি মারা যাবার অত আগে নয় এবং যখন তোমার নামও মনে থাকবে না তার পক্ষেও এটা ততটা তাড়াতাড়ি নয়।]

বিহ্বলতাকে দূর করার জন্য তিনি অপেক্ষা করলেন। 'একটা জিনিস আমায় বলো',—তারপর তিনি বললেন। 'আমার সম্পর্কে কী শুনেছ?'

'আপনি কি ভগবানের দিব্যি দেওয়া সত্যটা জানতে চান?'

'ভগবানের দিব্যি দেওয়া সত্যি?'

'বেশ',—লরা সাহসে ভর দিয়ে আর একটু এগোল। 'লোকে বলে—আপনি আর সকলের থেকে খারাপ, কারণ আপনি সম্পূর্ণ অন্যরকম।'

সেনেটর একটুও বিস্মিত হলেন না। চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন এবং যখন আবার চোখ দুটো উন্মুক্ত করলেন, মনে হল তিনি তাঁর মনের গভীরতম কোণে লুকিয়ে থাকা প্রবৃত্তির কাছ থেকে ফিরে এসেছেন। 'ওঃ! কী বিচ্ছিরি কাণ্ডকারখানা',—তিনি স্থির করলেন। 'তোমার কুত্তির বাচ্চা বাপটাকে বলে দিও যে আমি তার ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেব।' লরা মন্তব্য করে, 'যদি আপনি চান আমি নিজেই গিয়ে চাবিটা আনতে পারি' সেনেটর তাকে পিছন থেকে আঁকড়ে ধরলেন। 'চাবিটার কথা ভুলে যাও',—তিনি বলতেই থাকেন। 'আমার সঙ্গেই ঘুমোও। তুমি যখন এতটা নিঃসঙ্গ তখন কারও সঙ্গে থাকাটাই ভালো।'

নিষ্পলক দৃষ্টিতে গোলাপটার দিকে তাকিয়ে সে তাঁর মাথাটা নিজের কাঁধে এলিয়ে দিল। সেনেটর

তার কোমর জড়িয়ে ধরে সমস্ত রকম ভয়-শঙ্কা ঝেড়ে ফেলে বন্য কুক্ষির গহ্বরে মুখটা ডুবিয়ে দিলেন। সেনেটর বুঝলেন, ছ'মাস এগারো দিন পরে তিনি ওই একই রকম ভাবে পদচ্যুত এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা যাবেন। কারণ, লরা ফারিনার সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য কেচ্ছা। যেহেতু সেই সময় লরা তাঁর কাছে থাকবে না রাগে তাঁর চোখ দুটো অশ্রুপ্লাবিত হবে।

মূল শিরোনাম · Muerte constante más allá del amor

নিমজ্জিত বিশ্বের সেরা রূপবান

(ছোটদের জন্যে একটি গল্প)

সমুদ্রে ভেসে আসা কুচকুচে কালো ফুলে ওঠা জিনিসটাকে প্রথমে দেখে বাচ্চাগুলো। তারা ধরেই নিয়েছিল,—ওটা শত্রুপক্ষের জাহাজ। তারপর যখন তারা দেখল ওটার মাস্তুল বা নিশান নেই, তখন তারা ধরে নিল,—ওটা হয়তো একটা তিমি। কিন্তু তীরে আছড়ে পড়ার পর সামুদ্রিক আগাছা, জেলিমাছ, কুঁচোমাছ আর শ্যাওলা-জঞ্জালের এঁটুলি থেকে ছাড়ানো মাত্র ওরা দেখতে পেল,—সেটা একটা ডুবে যাওয়া মানুষ।

সারাটা বিকেল ধরে ওরা খেলা করল ওকে নিয়ে। বালিতে কবর দেওয়া আবার খুঁড়ে বের করা—সব কিছুই হল। এর মধ্যেই ব্যাপারটা বড়দের কারও কারও নজরে পড়ল আর খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামে। সমুদ্রের সবচেয়ে কাছের বাড়িটায় যারা তাকে বয়ে নিয়ে গেল তারা বুঝল,—সে যে কোনও মৃতদেহর চেয়ে অনেক বেশি ভারী। মোটামুটি একটা ঘোড়ার মতো ওজন ধারণা করে অবশেষে তারা ঠিক করল যে,—হয়তো অনেকক্ষণ জলে ডুবে থাকার জন্য তার হাড়গুলোর ভেতরে জল ঢুকে গেছে। মেঝেয় শুইয়ে দিয়ে তারা বলাবলি শুরু করল,—অন্য কোনও মানুষের চেয়ে সে অনেক বেশি লম্বা। কারণ, গোটা বাড়িটায় এমন কোনও ঘর খুঁজে পাওয়া গেল না যেখানে তাকে শোয়ানো যায়। এবং অবশেষে তারা একটা সিদ্ধান্ত নিল,—জলে ডোবা কোনও কোনও মানুষ মৃত্যুর পরেও বাড়তে থাকে! তার সারা গায়ে সমুদ্রের গন্ধ। শুধুমাত্র চেহারাতেই সে মনুষ্য প্রজাতির মৃত সত্তা। তার সারাটা গায়ে লেপা রয়েছে কাদা আর শামুক।

মৃত ব্যক্তিটি যে একজন আগন্তুক, এটা জানবার জন্যও তারা ওর মুখ পরিষ্কারের কাজে উৎসাহ দেখাল না। খান কুড়ি ছোট ছোট কাঠের বাড়ি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই ছোট্ট গ্রামটি। প্রতিটি বাড়ির লাগোয়া এক চিলতে নিষ্ফলা পাথুরে উঠোন। সুতরাং তাতে ফুলও ফোটে না। বাড়িগুলি তারপর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে অন্তরিপের সঙ্গে মিশে গেছে। জমি এতই কম যে মায়েরা সব সময়েই ত্রস্ত থাকে,—এই বুঝি তাদের ছেলেমেয়েরা হাওয়ার দাপটে উড়ে গেল। আর প্রতি বছরই যত শিশুর মৃত্যু হয়, তার অধিকাংশই ঘটে ওই খাঁড়িটার মধ্যে আছড়ে পড়ে গিয়ে। কিন্তু সমুদ্র একাধারে শান্ত এবং বিশাল আর গ্রামবাসীরা সাতটা নৌকোতেই সকলে এঁটে যায়। সুতরাং জলে ডোবা মানুষটাকে পেয়েই তারা একে অপরকে দেখে নিল। সকলেই সেখানে আছে কিনা জেনে নেওয়াটাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

সেই রাত্রে তারা কেউ সমুদ্রে গেল না। আশপাশের গ্রাম থেকে কেউ হারিয়েছে কিনা জানার উদ্দেশ্যে গ্রামের পুরুষ মানুষেরা যখন বেরিয়ে পড়ল, জলে ডোবা মানুষটার পাহারায় তখন বসে রইল মেয়েরা। ঘাস দিয়ে তার কাদায় লেপা দেহটা মুছে দিল। চুল থেকে কুচো পাথর বেছে তুলল। আঁশ ছাড়ানোর ঝিনুক দিয়ে তুলে দিল গায়ের ময়লার আস্তরণ। এসব করতে গিয়েই তাদের নজরে পড়ল,—তার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লতাপাতা দূর সমুদ্রের। তার সমস্ত পোশাকই ছিঁড়ে কুটিকুটি,—যেন সে কোনওরকমে প্রবাল প্রাচীরের গোলকধাঁধা কেটে পালিয়ে এসেছে। আরও লক্ষ্য করল,—তার মৃত্যু গর্বের। অন্যান্য সমুদ্রে ডোবা মানুষের চো । নিঃসঙ্গ চাউনি তার দৃষ্টিতে অনুপস্থিত। তবে গা সাফাই শেষ হয়ে আসার মুহূর্তে তারা শুয়ে থাকা মানুষটা সম্বন্ধে সজাগ হল। বন্ধ হয়ে এল তাদের নিঃশ্বাস। তাদের দেখা পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা, শক্তিশালী, বীর্যবান তো বটেই, তাদের কল্পনাতেও এমন মানুষ সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না।

সমস্ত গ্রাম খুঁজেও এমন কোনও বিছানা অথবা টেবিল পাওয়া গেল না যেখানে তাকে শোয়ানো

যায়। সবচেয়ে লম্বা গ্রামবাসীর উৎসবের ট্রাউজার্সটা অথবা সবচেয়ে মোটা লোকের রবিবারের জামাটা কিংবা সবচেয়ে বড় পা-ওয়ালা গ্রামবাসীর জুতো আক্ষরিক অর্থেই তার পক্ষে ছোট হল। তার বিশাল চেহারা আর রূপে পাগল হয়ে মহিলারা তখনই সিদ্ধান্ত নিল,—তারা পালের টুকরো থেকে তার ট্রাউজার্স বানাবে, বধূবরণের লিনেনের ওড়না থেকে হবে তার শার্ট যাতে সে মৃতাবস্থায়ও সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারে। মৃতদেহকে মাঝখানে রেখে তারা গোল হয়ে বসে তার পোশাক তৈরি করে চলল। তাদের মনে হল,—আজকের রাতের মতো বাতাস এত তীব্র কোনওদিন হয় না, সমুদ্র এত অশান্ত হয় না। তাদের মনে হল,—মৃত মানুষটার সঙ্গে এই পরিবর্তনের একটা সম্পর্ক রয়েছে। তারা ভাবছিল,—যদি এই মৃত মানুষটি তাদের গ্রামে বাস করত তার বাড়ির দরজা হত সবচেয়ে চওড়া, ছাদ হত সবচেয়ে উঁচু, মেঝে হত সবচেয়ে শক্ত, দু-দিকে দু'টো বড় বড় লোহার পাতের উপর মস্ত এক জাহাজি বিছানা থাকত এবং তার স্ত্রী হত সবচেয়ে সুন্দরী। তারা ভেবেই নিয়েছিল সমুদ্রের উপর তার এতখানি কর্তৃত্ব থাকত যে সে কেবল সমুদ্রের কিনারায় দাঁড়িয়ে ডাকলে মাছেরা ভিড় করে তীরে এসে ঠোক্কর মারত কিংবা জমিতে সে এতখানিই জোর ফলাতে পারত যে ঊষর পাথুরে জমি থেকে এক ঝলকে বেরিয়ে আসত অনর্গল ঝরনাধারা। মরুভূমিতেও ফুল ফোটানো সম্ভব হত। মনে মনে তারা প্রত্যেকে তাকে নিজেদের পুরুষদের পাশে বসাল। দেখতে পেল তাদের জীবনের প্রতিটি পলের পরিশ্রমকে একত্র করলেও তার একরাত্রির পরিশ্রমের কাছে সেটা কিছুই নয়। বিষণ্ণ চিত্তে তারা এই সিদ্ধান্তে এল,—তাদের প্রত্যেকের পুরুষমানুষই পৃথিবীর সবচেয়ে রুগ্ন-নিচুমনা-অপদার্থ জীবদেহ। সুখাবেশের গোলকধাঁধায় যখন তারা ঘুরপাক খাচ্ছে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধাটি তখন নিজের বয়সোচিত আবেগের তুলনায় অনেক বেশি অন্তর্বেদনায় প্লাবিত হচ্ছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল,—'এসতেবান নামের লোকটির মুখ এই রকমই ছিল।'

এটা সত্যি। প্রায় প্রত্যেকেই আর একবার মাত্র নজর করেই বুঝতে পারল,—আর কোনও নাম তার হতে পারে না। যখন তারা তাকে শুইয়ে পোশাক পরাচ্ছিল, কড়া চামড়ার শক্ত জুতো পরা মানুষটাকে ফুলের স্তূপে শুয়ে থাকতে দেখে সবচেয়ে ছোট একগুঁয়ে মেয়েটির মনে হল,—ওর নাম লাউতারো হলেও হতে পারে। কিন্তু এটা নিতান্তই বিভ্রম। ক্যাম্বিসের কাপড় যথেষ্ট না থাকায় এলোমেলো করে কাটা ট্রাউজার্সটা আঁটোসাটো হয়ে গেল। বুকের ভেতর লুকিয়ে থাকা শক্তি পটপট করে ছিঁড়ে ফেলছে জামার বোতামগুলো। মধ্যরাত্রির পর বাতাসের শিস বন্ধ হল। সমুদ্র বুধবারের তন্দ্রায় নিমগ্ন। সব সন্দেহেরই অবসান ঘটাল নিস্তব্ধতা,—সে এসতেবান। যখন তাকে ঘিরে বসেছিল, পোশাক পরিয়ে দিচ্ছিল, চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল, এমনকি নখ কাটা থেকে দাড়ি কামানো পর্যন্ত সবকিছুই করে দিচ্ছিল, তারা আর দুঃখ প্রকাশ না করে থাকতে পারল না। সেই প্রথম তারা বুঝতে পারল সে নিজে বিশালত্ব নিয়ে জীবিতকালে কী ভীষণ অসুখী ছিল, যা কিনা মৃত্যুর পরেও তাকে শান্তি দিচ্ছে না। জীবিত অবস্থায় হলে তারা অভিশপ্ত এমন একজনকে দেখতে পেত,—যে কিনা দরজা দিয়ে কাত হয়ে ঢোকে, মাথাটা দরজার উপরে ধাক্কা খায়, কারও বাড়ি গেলে খালি পায়েই যেতে হয়, তার নরম-পিঙ্গল-সিংহসদৃশ হাত নিয়ে কী করবে তা সে জানে না। বাড়ির গিন্নি সবচেয়ে শক্তসমর্থ চেয়ারটার সন্ধানে ব্যস্ত,—'বসো, এসতেবান, এই এখানে'—ভয়ে সে সিঁটিয়ে গেছে, পাছে ভেঙে পড়ে যায়। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সে বসে ; মুখে একফালি বিনীত হাসি,—'আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি এখানে বেশ আছি।' তার গোড়ালি ফেটে গেছে, পিঠটা ইতিমধ্যেই শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। যে কোনও ভদ্রলোকের বাড়ি গেলে তাকে এমনটাই করতে হয়,—'এ-হে-হে ব্যস্ত হবেন না, ব্যস্ত হবার কিচ্ছু নেই। আমি তো ঠিকই আছি, বেশ আছি।' শুধুমাত্র একটা-দু'টো চেয়ার ভেঙে ফেলার ফালতু ঝামেলা এড়াবার জন্য তাকে এমনটাই করে যেতে হয়। এবং সে হয়তো জানে না,—সামনে বসে নাছোড়বান্দার মতো যে বলে চলেছে, 'এই, যেও না, এসতেবান, অন্তত কফিটা পর্যন্ত...' ; অথচ, এসতেবান চলে গেলেই সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। পাশের বাড়ির গিন্নিকে ফিসফিস বলে,—'যাক বাবা, মাকাল ফলটা শেষ পর্যন্ত বিদেয় হয়েছে।'... মৃতদেহের পাশে বসে ভোর পর্যন্ত মহিলারা এমনটাই ভাবছিল। পরে যখন কেউ রুমাল দিয়ে তার মুখটা ঢেকে দিল, যাতে রোদ বিরক্ত করতে না পাবে, তখন তাকে এত মৃত মনে হচ্ছিল, এত অসহায়

দেখাচ্ছিল,—ঠিক তাদের নিজেদের পুরুষমানুষদের মতো—সেই প্রথম তাদের হৃদয় থেকে অশ্রুবিন্দু উৎসারিত হল। অল্পবয়সিদের মধ্যে একজন বিলাপ শুরু কবল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলাপ শুরু করতে অন্যরাও দেরি করল না। তারা যতটা বিমূঢ় তার চেয়েও বেশি ক্রন্দনসিক্ত। কারণ নিমজ্জিত মানুষটি যেমন ভাবেই হোক তাদের এসতেবান। অতএব বরাদ্দকৃত কান্নাটা তারা কাঁদবেই। সে পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃস্ব-শান্তিপ্রিয়-দুঃখী,—সে তাদের হতভাগা এসতেবান। সুতরাং যখন পুরুষেরা ফিরে এসে খবর দিল,-- 'না আশপাশের কোনও গ্রামেরই সে নয়',—'ভগবানের কৃপায় ও আমাদের।'

পুরুষেরা ভাবল, কোলাহলটা নেহাতই মেয়েলি ন্যাকামি। সারারাতের নিষ্ফল অন্বেষণের ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ায়, নতুন লোকটাকে নিয়ে হট্টগোলে তারা বিরক্ত হচ্ছিল। এদিকে সেই গুমোট, দমবন্ধ দিনে সূর্য ক্রমশই অসহনীয় হয়ে উঠছে। মাস্তুল আর পালের অবশেষটুকু দিয়ে তারা একটা ডুলি বানাল। বেশ শক্তপোক্ত যাতে ওই বিরাট দেহখানি নিয়ে অন্তত পাথুরে খাঁড়িটা পর্যন্ত যাওয়া যায়। তারা চাইছিল মৃতদেহটা জাহাজে করে মাঝদরিয়ায় নিয়ে গিয়ে নোঙর বেঁধে আসতে, যেখানে মাছেরা কিছু দেখতে পায় না আর ডুবুরিরা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক অতীত স্মৃতির দাপটে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। সেখানে সে নিশ্চিন্তে ডুবে যেতে পারবে। কারণ, সেখানে তেমন কোনও খারাপ স্রোত নেই যা তাকে তীরে ফিরিয়ে দেবে, যেমনটা অন্যান্য অধিকাংশ মৃতদেহর ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। কিন্তু তারা যতই তাড়াহুড়ো করতে লাগল, মেয়েরা তত বেশি সময় নষ্ট করার ফন্দি আঁটতে লাগল। ভীত-সন্ত্রস্ত মুরগির মতো তারা ছোটাছুটি কবতে লাগল। কেউ কেউ বুক চাপড়াতে থাকল। অন্যদিকে বসে কেউ নিমজ্জিত মানুষটির মঙ্গলকামনায় ব্যস্ত রইল। অন্য আব একজন তার কবজিতে একটা কম্পাস বেঁধে দিল। অবশেষে ছলছুতো করে মূল্যবান সময় ছিনিয়ে নেবার পব,—'মেয়েরা রাস্তা থেকে সবে দাঁড়াও। মৃতদেহটা নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করতে তোমরা আমাদের বাধ্য করছ'—এমন একটা অনুভূতি পুরুষদের মধ্যে উদ্ভূত হল। পুরুষেরা ইতিমধ্যেই নিজেদের পাকস্থলীকে অবিশ্বাস করতে শুরু কবে দিয়েছে। আশপাশে শুরু হয়েছে অসন্তোষের গর্জন। কেন একজন আগন্তুকের জন্য এত সাজসজ্জা, খোল-নলচের পরিবর্তন? কতকগুলো নখ আর পবিত্র জলের শিশি তাব চারপাশে আছে,—অথচ, গভীব জলে গেলেই সবসুদ্ধ ওগুলো হাঙবেব পেটে চলে যাবে। কিন্তু বাড়িব পবিত্র জিনিস নিয়ে মেয়েদের এত ধ্যাষ্টামো কেন? এদিকে ছুটছে, ওদিকে যাচ্ছে, কখনও থমকে দাঁড়িযে পডছে। যখন এত দীর্ঘশ্বাসই ফেলছে তখন কেনই বা এত কান্না! সুতরাং পুরুষেবা শেষ পর্যন্ত কেটে পড়ল। যখন অচেনা অজানা একজনকে নিয়েই এত মাতামাতি যে ইতিমধ্যেই পচতে শুরু করে দিয়েছে যাব দেহটা এখন একখণ্ড বাসি পচা মাংস মাত্র তখন থাকার কী দরকার। মেয়েদের মধ্যে একজন কাণ্ডজ্ঞানহীনেব মতো হিতাহিত ভুলে মৃত মানুষটার মুখেব উপরকার রুমালটি টেনে সবিয়ে দিল। পুরুষদেরও নিঃশ্বাস বন্ধ হযে এল।

সে এসতেবান। তাকে চিনবার জন্য আর কোনও পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের গল্প যদি তাদের বলা যেত, এমনকি যদি তারা স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের আমেরিকান-স্প্যানিশ উচ্চারণে মুগ্ধ হত, মোহিত হত তার কাঁধের ম্যাকাও পাখিটাকে দেখে অথবা তার মানুষ মারার পৌরুষ দেখে,— কিন্তু এসতেবান—সে তো একজনই, এই যে সামনে পা ছড়িয়ে শুযে রয়েছে। বিশাল তিমি মাছের মতো চেহারা, পায়ে জুতো নেই, পরনে বাচ্চাদের মতো বেখাপ্পা ট্রাউজার্স, আর আঙুলে সেই পাথুরে নখ যেগুলি ছুবি দিয়ে কাটবাব অপেক্ষায় বযেছে। তাবা শুধু রুমালটাই সবাল। লজ্জা তার সমস্ত মুখে ছেয়ে রয়েছে। সে এত বড বা এত বিশাল কিংবা এত সুন্দর—এটা তার কোনও অপরাধ নয় আর যদি সে জানত যে এমনটাই ঘটবে,--সে ডুবে মরার জন্য আরও দুর্গম জায়গা খুঁজত। সত্যি বলছি, এমনকি নিজের গলায অর্ণবপোতেব নোঙর পর্যন্ত ডুববার জন্য বেঁধে নেওয়া যেত যাতে খাঁড়ির ঘূর্ণি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে মানুষকে বিব্রত করবাব সম্ভাবনাও থাকত না। যেমনটা আজ হল, এই বুধবারেব মৃতদেহ নিয়ে,—যেমন এই মহিলারা বলছে যে এক টুকরো ঠান্ডা মাংসের বিনিময়ে সবাইকে নিরাশ করার কোনও মানেই হয় না,—অথচ আর কোনও কাজই সম্ভব নয়। তার মুখভঙ্গির মধ্যে এমন একটা

আকৃতিপূর্ণ সত্য ছিল যে, সবচেয়ে অবিশ্বাসী মানুষগুলোও যারা নিঃসীম রাত্রিতে খোঁজাখুঁজিতে ক্লান্ত হয়ে চিন্তা করছিল তাদের নিয়ে আদরের বউয়েরা তাদের স্বপ্ন দেখতে দেখতে শ্রান্ত হয়ে পড়ে নিমজ্জিত লোকটিকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনা শুরু করেছে। এসতেবানের দৃঢ়তায় অন্যদের তো বটেই এমনকি তাদেরও হাড়ের ভিতরকার মজ্জা পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠল।

সেই কারণেই একজন বেওয়ারিশ নিমজ্জিত ব্যক্তির জন্য তারা সবচেয়ে জমকালো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন কবল। কয়েকজন মহিলা যারা পাশের গ্রামে ফুল আনার জন্য গিয়েছিল আরও কয়েকজন নতুন মহিলাকে নিয়ে ফিরে এল তারা। তাকে দেখার পর নতুন মহিলাদের অবিশ্বাস দূর হয়ে গেল এবং আরও অনেকে ফুল আনতে গেল। তারাও আরও নতুন কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে ফিরে এল। এবং এই ভাবেই চলল, যতক্ষণ না ফুল আর মানুষে একাকার হয়ে হাঁটা-চলা দায় হয়ে ওঠে। শেষ মুহূর্তে, একজন অনাথ হিসেবে তাকে জলে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থায় সমবেত জনতা বেদনা অনুভব করল। সুতরাং তারা সবচেয়ে ভালো লোকেদের মধ্যে থেকে একজন বাবা এবং মা বেছে নিল, কাকা-কাকিমা এবং জ্ঞাতি ভাই-বোনদেরও বাছা হল। ফলে, তার মাধ্যমে সমস্ত গ্রামবাসী স্বগোত্রায়িত হল। জনাকয়েক মাঝি দূর থেকে কান্নার আওয়াজ পেয়ে ছুটে গেল। এবং জনগণ শুনল কেউ একজন প্রধান মাস্তুলের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রেখেছে কারণ সে রূপকথার সাইরেনের গল্পটা জানে। তারা যখন উঁচু পাথুরে ভূমির বন্ধুর পথ ধরে তাকে বহন করবার জন্য প্রায় লড়াই করছিল তখনই পুরুষ এবং মহিলাদের চেতনা ফিরল। রাস্তাগুলির শূন্যতা, মেঠোজমির রুক্ষতা আর স্বপ্নের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তাদের সচেতনতা তখনই প্রকাশ পেল যখন তাদের নিমজ্জিত ব্যক্তিটি তার সমস্ত সৌন্দর্য আর কল্পনা নিয়ে সমুপস্থিত। নোঙর ছাড়াই তারা তাকে সমুদ্রে যেতে দিল আর তারা শতাব্দীর খণ্ডাংশের জন্য তার রৌরবে প্রবেশের সময় নিঃশ্বাস ফেলল। সকলেই সেখানে হাজির আছে কিনা জানবার জন্য কেউই পরস্পরের প্রতি চোখ ফেরাবার প্রয়োজন বোধ করল না। তারা কখনওই তা হতে দিতে চায় না। কিন্তু তারা জানে,—সবকিছুই এরপর অন্যরকম হওয়া উচিত। যেমন তাদের দরজাগুলি এখন বেশি চওড়া, ছাদ আরও উঁচু এবং আরও শক্ত মেঝে,—যেহেতু এসতেবানের স্মৃতি কড়িকাঠে ঠোক্কর না খেয়েই সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং ভবিষ্যতে কেউ ফিসফিস করেও বলতে পারবে না,—'সেরা অপগণ্ডটা শেষকালে মরল' অথবা আরও কদর্যভাবে,—'মাকাল ফলটা এতদিনে মরেছে',—কারণ, এসতেবানের স্মৃতিকে শাশ্বত রূপ দেবার জন্য তাদের বাড়ির সামনেটা তারা আনন্দোজ্জ্বল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। বাড়ির পিছনের পাথুরে জমিগুলো তারা এখন থেকেই ঝরনাধারার জন্য খুঁড়তে শুরু করেছে। খাঁড়ির ধারে তারা ফুলের গাছ বসিয়েছে যাতে ভবিষ্যতে দূর সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের যাত্রীরা নতুন সূর্যোদয়কে প্রত্যক্ষ করতে পারে। ফুলের মন ভোলানো তীব্র গন্ধে ক্যাপ্টেন সিঁড়ি বেয়ে উপর থেকে নেমে আসবেন, তার পরনে নিখুঁত জাহাজি পোশাক সঙ্গে মানচিত্র এবং যুদ্ধ জয়ের স্মারকচিহ্ন স্বরূপ মেডেলগুলি সগর্বে তার বুকের ওপর দুলবে এবং দূর দিগন্তে গোলাপের অন্তরীপের দিকে উঁচিয়ে থাকবে তার তর্জনী। চোদ্দোটা ভাষায় নিশ্চয়ই তার দখল থাকবে। দেখো ওদিকে, বাতাস যেখানে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তারও ওপারে সূর্য যেখানে এত চড়া কিরণ বিলোয় যে সূর্যমুখীরাও অন্যদিকে মুখ ঘোরাতে পারে না, হ্যাঁ, তারই ওপারে সেই এসতেবানের গ্রাম।

মূল শিরোনাম El ahogado más hermoso del mundo.

অলৌকিক জাহাজের অন্তিম অভিযান

এরা এবার বুঝতে পারবে আমি লোকটা কে, নিজেকেই সে শোনাচ্ছিল উঠতি যুবকের জোরালো গলায়, বহু বছর পেরিয়ে গেছে প্রথম সে যখন দেখেছিল সেই অতিকায় সামুদ্রিক জাহাজটিকে। গ্রামের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আলোকবিহীন-শব্দহীন যেন একটা পোড়ো প্রাসাদ, পুরো গ্রামটার থেকে লম্বায় বড় আর গির্জার চুড়োটার থেকেও উঁচু, যাচ্ছিল অন্ধকারে খাঁড়ির ওপারে জলদস্যুদের ঠেকাবার জন্যে পাঁচিল ঘেরা সেই ঔপনিবেশিক শহরে, সেখানকার ক্রীতদাস চালান দেওয়া বন্দরে এবং ঘুরন্ত পথ দেখানো আলোয়, যে বিষণ্ণ আলোর রশ্মিতে প্রতি পনেরো সেকেন্ড অন্তর গ্রামটা হয়ে পড়ে চাঁদের বসতি, তার প্রোজ্জ্বল ঘরবাড়ি আর রাস্তা যেন মরুভূমিতে আগ্নেয়গিরির লাভা ছেটানো, যদিও তখনও সে বালক, পায়নি যুবকের কণ্ঠস্বর, মায়ের অনুমতি ছিল গভীর রাত্রিতেও সমুদ্রের তীরে বসে বাতাসের বাঁশি শোনার, স্পষ্ট তার মনে আছে, যেন এখনও দেখতে পাচ্ছে, ঘুরন্ত আলো গায়ে এসে পড়লেই জাহাজটা কেমন যেন অদৃশ্য হয়ে পড়ে আবার আলো সরে গেলেই দেখা যেত, ফলে একটা তাৎক্ষণিক অনুভূতি জন্ম নেয়, একটা জাহাজ এই আছে এই নেই, চলেছে খাঁড়ির মুখ বরাবর, নিশি পাওয়া লোকের মতো হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে। সেই বন্দরের বয়াগুলির পথ চিনতে চিনতে হঠাৎ কিছু একটা গোলমাল হয়ে যায় কম্পাসের কাঁটায়, কারণ জাহাজ মাথা ঘোরায় চড়ার দিকে, আটকে যায়, টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ে নিঃশব্দে ডুবে যায়, অথচ জানা ছিল ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে এইরকম একটা ধাক্কায় জাহাজের ইস্পাতের খোল গুঁড়িয়ে যাওয়ার এবং ইঞ্জিনের বিস্ফোরণে গ্রামের শেষ রাস্তায় শুরু হয়ে যে প্রাগৈতিহাসিক জঙ্গল চলে গেছে পৃথিবীর প্রত্যন্ত প্রান্তে তার গভীরে সবচেয়ে ঘুমন্ত ড্রাগনটারও ভয়ে জমে যাওয়ার, ফলে সে ভাবে সবটাই স্বপ্ন, বিশেষ করে পরের দিন, যখন সে দেখে উজ্জ্বল খাঁড়িতে মাছের মেলা, বন্দরের মাথায় পাহাড়ের উপর এলোপাথারি রঙের বাহারি নিগ্রো বস্তি, গুয়ানা থেকে আসা চোরাচালানের জাহাজ যাতে চালান যাচ্ছে নিরীহ টিয়াপাখি যাদের পেটে পোরা আছে বহুমূল্য হিরে, সে ভাবল, আকাশের তারা গুনতে গুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর স্বপ্নে দেখেছি সেই অতিকায় জাহাজটাকে, তাই হবে, সে এত নিশ্চিন্ত ছিল যে কাউকেই বলেনি অথবা মনে রাখেনি এই দৃশ্য পরের বছরের মার্চ মাসের ঠিক সেই রাত অবধি, যে রাতে সে ডলফিনদের সমুদ্রে ছলকে ওঠা দেখার জন্যে গিয়ে দেখতে পেল সেই দুঃস্বপ্নের জাহাজ, বিভীষিকাপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক, প্রথম বারের মতোই ভুল পথে চলেছে, শুধু সেবার নিজের জেগে থাকা সম্বন্ধে এতই নিশ্চিত ছিল যে ছুটে গিয়ে মাকে খবর দিয়েছিল, আর মা-ও সেই সুবাদে হতাশাচ্ছন্ন হয়ে সপ্তাহ তিনেক কাটিয়ে দেন, কারণ যতসব উলটোপালটা কাজে তোর মগজ পচে যাচ্ছে, সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে রাতের বেলায় চোর-ডাকাতের মতো ঘুরে বেড়ানো, এবং যেহেতু কথা ছিল সেই সময়ে শহরে গিয়ে আরামপ্রদ একটা কিছু কিনে আনবেন যার ওপর বসে তিনি মৃত স্বামীর কথা ভাববেন, কারণ এগারো বছরের বৈধব্যে তাঁর দোলচেয়ারটার তলার দিকটা ক্ষয়ে গেছে, তিনি এই সুযোগটা নিতে চেয়ে মাঝিকে নিয়ে গিয়েছিলেন চড়ার কাছে যাতে ছেলে বুঝতে পারে সে যা দেখেছিল তা হল কাচ-স্বচ্ছ সমুদ্রের জলে বসন্তোৎসবের সময় জলজ গুল্মের সঙ্গে জ্যোৎস্নার কামলীলা, লাল মাছ আর নীল পাখিদের ঝাঁপিয়ে পড়া জলের গভীরে আরও নরম জলের ইঁদারায়, এবং এমনকি ভেসে বেড়ানো চুলের গোছা যেগুলো সেইসব মানুষের যারা সে কোন কালে উপনিবেশের যুগে মারা গিয়েছে, সেই অতিকায় জাহাজ বা সেরকম কোনও কিছুরই চিহ্ন নেই, এবং তা সত্ত্বেও

সে এত গোঁয়ার যে মা আশ্বাস দিয়েছিলেন পরের মার্চে একসঙ্গে বসে দেখবেন। অবশ্যই না জেনেই, আর তাঁর ভবিষ্যতে একমাত্র নিশ্চিত ছিল ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত তথা কুখ্যাত ব্রিটিশ নৌ-সেনানায়ক স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক-এর আমলের আরামকেদারাটি যেটা তিনি এক তুর্কির দোকান থেকে কিনে আনলেন, যেটায় তিনি বসেন সেই রাতেই, দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, ওহ্, আমার ভাগ্যহীন ওলোফের্নোস, যদি দেখতে ভেলভেট দিয়ে মোড়ানো এবং রানির দেওয়া ব্রোকেডে সাজানো এই চেয়ারে বসে তোমাকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা কত মনোরম। কিন্তু যতই তিনি মৃত স্বামীর স্মৃতি টেনে আনছিলেন ততই তাঁর হৃৎপিণ্ডে রক্ত উথলে উঠছিল এবং ঘন হচ্ছিল, যেন বসে থাকার বদলে তিনি দৌড়চ্ছেন, শিরশিরে ঠান্ডায় জ্বরে ঘামে জবজবে আর নিশ্বাসে ধুলো, অবশেষে একেবারে ভোরবেলায় সে ঘরে ফিরল আর দেখল আরামকেদারায় শায়িত মায়ের মৃতদেহ, তখনও শরীরটা গরম কিন্তু আধপচা, যেন সাপে কামড়েছে, এমনটাই ঘটেছিল একের পর এক চারজন মহিলার ক্ষেত্রে। এই চেয়ারটাকে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলাব আগে, অনেক দূরে যেখান থেকে এই চেয়ারটা আর কারও ভাগ্যে অভিশাপ বয়ে আনতে পারবে না, কাবণ আসলে বহু শতাব্দীর ব্যবহারে চেয়ারটার যা কিছু শান্তি বিলোবার ছিল তা শেষ হয়ে গেছে, ফলে তাকে অভ্যস্ত হতে হয়েছিল সেই মাতাপিতৃহীন অবস্থার মর্মান্তিক দিনযাপনে যাকে দেখিয়ে সবাই বলত এই সেই বিধবার ছেলে যে গ্রামে এনেছিল সেই অভিশপ্ত চেয়াবটা, বেঁচে থাকত পাঁচজনের দয়া-দাক্ষিণ্যে আর তারও চেয়ে বেশি নৌকো থেকে চুবি করা মাছের ওপব, এভাবেই গলায় এসেছে হাঁক এবং ভুলেই গিয়েছিল অতীতে দেখা সেইসব অলৌকিক দৃশ্য, যদি না আর এক মার্চ মাসের রাতে কোনও কারণ ছাড়াই হঠাৎ চোখ পড়ত সমুদ্রে, দোহাই ঈশ্বর, ওই যে আবার, অতিকায় ধাতব তিমি, দানব-জন্তু, দেখে যাও তোমবা, পাগলেব মতো চেঁচিয়েছিল সে, এসে দেখে যাও, এমন এক শোরগোল উঠেছিল কুকুরের গলা ফাটানো চিৎকারে আর মেয়েদের আর্তস্বরে যে সবচেয়ে বৃদ্ধ গ্রামবাসীটিও বাপ-ঠাকুরদার সময়কাব আতঙ্ক এবং সতেরো শতকের কুখ্যাত ব্রিটিশ জলদস্যু তথা বিখ্যাত সমুদ্রবিজ্ঞানী-পর্যটক-আবিষ্কারক উইলিযাম ড্যামপিয়ের ফিরে এসেছে ভেবে লুকিয়েছিল খাটের তলায়, কিন্তু যাবা ছুটে বেরিয়ে এসেছিল রাস্তায় তাবাও চেষ্টা করল না সেই অসম্ভব দৃশ্যটি দেখতে যা সেই মুহূর্তে পূর্বদিকে মিলিয়ে গেল এবং ঘটালো তাব বাৎসরিক দুর্ঘটনা, ববং ঝাঁপিযে পড়েছিল তার ওপব আর এমন মার দিয়েছিল যে সে শুনিয়েছিল নিজেকে, রাগে গরগর করতে করতে, *এবার ওদের দেখাব আমি লোকটা কে, সাবধানে, কাউকেই জানায়নি তার প্রতিজ্ঞার কথা, কিন্তু সারাটা বছর কাটিয়েছিল সেই একই চিন্তায়,* এবার ওরা দেখবে আমি লোকটা কে, এভাবেই সে ছিল সেই ভৌতিক দৃশ্যের পূর্ব-মুহূর্তের অপেক্ষায়, আসলে একটা কাজ করার জন্যে সে এমনটা করেছিল, একটা নৌকো চুরি করা, খাঁড়ি পেরোনো, সারাটি বিকেল দাস-চালানি বন্দরের অলিগলিতে কাটিয়ে দেওয়া জীবনের সেরা সময়টির অপেক্ষায, ক্যারিবিয়ানে, নোনা গন্ধ ছড়ানো মানুষের ভিড়ে, কিন্তু অভিযানের চিন্তায় এতই বিভোর যে রোজকাব মতো হিন্দুদের দোকানগুলোর সামনে দাঁড়ায়নি, যেখানে হাতির দাঁতের তৈরি রাজা-রাজরাদেব মূর্তি সাজানো আছে, কিংবা ওলন্দাজ-নিগ্রোদের গাড়িতে চড়ে হাড কাঁপিযে দেওয়া মজা করেনি, অথবা তামাটে চেহারার মালয়ীদের দেখে ভয পায়নি আগের মতো, যারা অবাস্তব কল্পকথায় মুগ্ধ হয়ে দেশে দেশে খুঁজে বেড়ায় সেইসব নিষিদ্ধ পানশালা যেখানে নাকি বিক্রি হয় ব্রেজিলের মেয়েদেব ভাজা জঙ্ঘা, আসলে কোনও কিছুই নজবে আসেনি যতক্ষণ না তারাদের নিয়ে বাত নেমে এল এবং জঙ্গলের প্রশ্বাসে ভেসে এসেছিল গার্দেনিয়া ফুল আর পচা সালামান্দারের মিষ্টি গন্ধ, এবং তখন ওকে দেখা গেল, চুরি কবা নৌকো বেযে চলেছে খাঁড়ির মুখের দিকে, লণ্ঠনটা নেভানো যাতে শুল্কবিভাগের পুলিশের নজরে না পড়ে, পথ দেখানো আলোর সবুজ ডানাব ঝাপটায় প্রতি পনেরো সেকেন্ড অন্তব যেন মূর্তি আবাব আলো সরে গেলেই মানুষ, জানত যে বন্দরেব পথ বরাবব বয়াগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে, ধাঁধানো আলোটার তেজ বাডছিল বলেই শুধু নয়, আসলে জলেব নিশ্বাসে বিষাদ, এবং ও শুধু দাঁড় বেয়েই

চলেছে, এতই আত্মমগ্ন যে হঠাৎ যখন হাঙরের নিঃশ্বাসে গায়ে কাঁটা দিল সেটা কোথা থেকে এল বুঝতেই পারল না, অথবা রাত কেন এত গহীন-ঘন হয়ে উঠল, হয়তো সবকটা তারা একসঙ্গে নিভে গেছে, অথচ সবকিছুই ঘটছিল জাহাজটা সেখানে ছিল বলে, তার অতিকায় অবয়বের সবটা নিয়ে, হে ভগবান, পৃথিবীর যে কোনও বড় জিনিসের থেকেও অনেক বড়, জলে স্থলে যে কোনও অন্ধকারের চেয়েও ঘন কালো, তিন লক্ষ টন হাঙরের গন্ধ নৌকোটার এত কাছ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল যে ইস্পাতের খাড়া জোড়গুলোকেও সে দেখতে পাচ্ছিল, খুপরি জানালাগুলোর একটাতেও আলো দেখা যাচ্ছে না, এমনকি ইঞ্জিনেও একটা শ্বাস ফেলার শব্দ নেই, জনপ্রাণীহীন, নৈঃশব্দ্যের এক নিজস্ব গন্ডি টেনে, নিজস্ব মৃত বাতাস, স্তম্ভিত সময়, দোষী সমুদ্র, যেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে ডুবে মরা জীবজন্তুর দল, এবং হঠাৎই সবকিছু উধাও পথ-দেখানো-আলোর রশ্মিতে, এবং একমুহূর্তের জন্যে আবার অস্বচ্ছ ক্যারিবিয়ান সমুদ্র, মার্চ মাসের রাত্রি, পেলিকানদের নিত্যদিনের বাতাস, এভাবেই সে ছিল বয়াগুলোর কাছাকাছি, কী করতে হবে না বুঝে, প্রশ্ন করে যাচ্ছিল নিজেকেই, হতভম্ব হয়ে, জেগে ঘুমোচ্ছে কি, শুধু এবারই নয় আগেকার প্রত্যেকবারেই, ভাবতে ভাবতেই বয়াগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়, প্রথমটা থেকে শেষ বয়াটা পর্যন্ত, ফলে আলো সরে গেলে জাহাজটা আবার দেখা গেল আর তখন জাহাজটার সবকটা কম্পাসই খারাপ হয়ে গেছে, হয়তো বুঝতে পারছে না সমুদ্রের কোথায় সে আছে, হাতড়ে বেড়াচ্ছে বন্দরের অদৃশ্য পথ, কিন্তু আসলে যাচ্ছে চড়ার দিকে, যতক্ষণ না সে অবাক বিস্ময়ে বুঝে উঠতে পারল যে বয়া-দুর্ঘটনা এ রহস্যের শেষ চাবিকাঠি এবং নৌকোয় তার লণ্ঠনটি জ্বেলেছিল, খুদে একটা লাল আলো যেটায় পাহারাদারের নজর কাড়বার সম্ভাবনা ছিল না, অথচ জাহাজ-চালকের কাছে হবে দিশারী সূর্য, কারণ, এটা থাকায়, জাহাজটা তার পথ শুধরিয়ে নিয়ে এবং মুখ ঘুরিয়ে বন্দরের আসল স্রোতে ফিরে এল, মনে হল যেন কপালজোরে জীবন ফিরে পাওয়া, এবং তারপরেই একসঙ্গে সবকটা আলো জ্বলে উঠল আর বয়লারে শুরু হল ঘড়ঘড় শব্দ, আকাশের তারাগুলোকে নিজেদের জায়গায় দেখা গেল, জন্তুদের শবগুলি তলিয়ে গেল অতলে, আর বাসনপত্রের ঝনঝনানি ও পুদিনার চাটনির গন্ধ ভেসে এল রান্নাঘর থেকে, খোলা ডেকে অর্কেস্ট্রার ছন্দ আর বসার ঘরের আলো-আঁধারিতে মহাসাগরীয় প্রেমিক-প্রেমিকাদের ধমনিতে বেড়ে গেল রক্তের স্পন্দন, কিন্তু তখনও তার রাগ এতটাই চড়ে ছিল যে এই অলৌকিক ঘটনায় নিজেকে ভীত বা বিচলিত হতে দেয়নি, বরং আগের থেকে ও কৃতসংকল্প হয়ে নিজের মনে বলছিল, আমি মানুষটা কেমন এবার এরা বুঝবে, ভীরুর দল, এবার দেখতে পাবে, এবং পাশ না কাটিয়ে, এই বিশাল যন্ত্রদানবটা যেন ঘাড়ে এসে না পড়ে, সমানে সে দাঁড় বেয়ে যাচ্ছিল, কারণ এবার সবাই সত্যিই বুঝবে আমি লোকটা কে, এবং লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখিয়ে চলতে থাকার বাধ্যবাধকতায় নিশ্চিত হয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল বন্দরের বিপরীতে, অদৃশ্য সেই পথের বাইরে, এবং লাগাম ধরে নিয়ে চলেছিল ঘুমন্ত সেই গ্রামের বাতিগুলোর দিকে যেন একটা সামুদ্রিক ভেড়া, আসলে আস্ত একটা বাস্তব জাহাজ, বন্দরের আলোয় যার কিছুই হয় না, অদৃশ্য হওয়ার বদলে প্রতি পনেরো সেকেন্ড অন্তর অ্যালুমিনিয়ামের মতো ঝলসে ওঠে, আর গির্জার ক্রশগুলো, জীর্ণ ম্রিয়মান, ঘরবাড়ি, কল্পনা ক্রমশ বাস্তব হয়ে উঠছে, এবং সেই সামুদ্রিক জাহাজ তখনও চলেছে তার পিছুপিছু, ওর ইচ্ছে জাহাজের একেবারে অন্দরমহলে যারা কাজ করছে, ক্যাপ্টেন ঘুমিয়ে আছে বাঁ পাশ ফিরে, ভাঁড়ারের বরফে ডুবে থাকা লড়াকু ষাঁড়, হাসপাতাল-ঘরে এক নিঃসহায় রোগী, সেখানে গামলায় [illegible] সহায় জল, দুর্ভাগা পাইলট নিশ্চয়ই জলের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে থাকা টিলাগুলোকে মনে করেছে বন্দর, কারণ সেখানেই তীব্র শব্দে বেজে উঠল জাহাজের বাঁশি, একবার, সে ভিজে সপসপে জলজ বাষ্পের বৃষ্টিতে, এদিকে আবার, চুরি করা নৌকোটা প্রায় ডুবে গিয়েছিল আর কি, এবং আবার, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে ভাঙা পাড়, রাস্তার নুড়ি, অবিশ্বাসীদের ঘর-দরজা, এই ভয়াবহ জাহাজের আলোয় পুরো গ্রামটাই আলোকিত, এবং কোনওরকমে সে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে খুলে দিয়েছিল সেই ধ্বংসের পথ, গলা

ফাটিয়ে সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে চিৎকার করেছিল, এই যে সেটা, ভীরুর দল, ঠিক এক সেকেন্ড আগে, তারপর অতিকায় ইস্পাতের খোলটা আছড়ে পড়ল চড়ায় এবং সবাই শুনতে পেল একসঙ্গে নব্বই হাজার পাঁচশোটা গেলাসের পুরোপুরি গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দ, একটার পর একটা, আগাপাশতলা সবটা, এবং তারপর সূর্য উঠল আর সেটা মোটেই মার্চ মাসের সকাল ছিল না, বরং ছিল একটা উজ্জ্বল বুধবারের দুপুর, এবং সে তারিয়ে তারিয়ে সুখ উপভোগ করছিল সেই সব অবিশ্বাসীদের দেখে, যারা হতচকিত হয়ে মুখ হাঁ করে দেখছিল গির্জার সামনেকার চড়ায় ভেঙে পড়ে আছে সেই সামুদ্রিক জাহাজ, এ জগৎ বা পর-জগতে যা সবচেয়ে বড়, যে কোনও কিছুর থেকেই ধবধবে সাদা, গির্জার চূড়াটার থেকেও কুড়ি গুণ উঁচু এবং পুরো গ্রামটা থেকে লম্বায় সাতানব্বই গুণ বড়, লোহার অক্ষরে খোদা রয়েছে নাম,—'আলাক্সিলিয়াগ', এবং তার গা থেকে গড়িয়ে পড়ছে প্রাচীন সমুদ্রের অসংখ্য মৃত্যুর অলস জলের বিন্দু।

মূল শিরোনাম El últimino viaje del buque fantasma.

বিশাল ডানাওয়ালা এক থুত্থুড়ে বুড়ো

দু' দিন ধরে একটানা বৃষ্টি চলার পর, তৃতীয় দিন সকালে পেলাইয়ো বাড়ির ভেতরেই এত কাঁকড়া মারল যে ওগুলোকে ফেলে দেওয়ার জন্যে উঠোন এবং বাড়ির সামনের চত্বর পেরিয়ে সমুদ্রে যেতে হল। সমুদ্রে যাওয়ার সময় অনেকটা জল ভাঙতে হল ওকে। সদ্যোজাত শিশুটি আগের রাতে প্রবল জ্বরে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছে। অতএব, ভেবে নেওয়া হল যে কোনও এক দৈবদুর্বিপাকের ফলেই নবজাতকের এমন ভোগান্তি। মঙ্গলবার থেকেই চারদিক বিষাদে আচ্ছন্ন। আকাশ থেকে সাগর,—সব কিছু ছাই রঙে ছেয়ে আছে। মার্চ মাসের পোড়া কয়লাব মতো বেলাভূমির বালিব রং। চারপাশে পাঁক আর পচা মাছের উৎকট দুর্গন্ধ। বেলা গড়িয়ে যাওয়ার আগেই একটা অপ্রত্যাশিত অন্ধকারে পেলাইয়োর চোখে সব কিছুই ঝাপসা, আবছা ঠেকছে। কে আসছে, কে যাচ্ছে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছে না। উঠোনের সামনে এসে ও মনে মনে বিড়বিড় করে,—'জিনিসটা কী, ঠিক মতো তো বোঝা যাচ্ছে না।' না বুঝতে পারা বস্তুটার দিকে ও খানিকটা এগিয়ে গেল। এতক্ষণে বিষয়টা স্পষ্ট হল। একজন বুড়ো মানুষ পাঁকভর্তি ডোবায় আটকে আছে। মাথাটা নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে আর বিশাল দুটো ডানার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেও মানুষটা ওপরে উঠতে পারছে না।

এ যেন এক ভয়ঙ্কর দিবাস্বপ্ন। প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে স্ত্রী এলিসেন্দাকে ডাকে পেলাইয়ো। সে বেচারি তখন ছেলের যত্নআত্তিতে ব্যস্ত। বউকে সঙ্গে করে পেলাইয়ো উঠোনের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। ওরা নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে বুড়ো মানুষটির দিকে। তার পরনে ছেঁড়াফাটা পোশাক, মাথায় সুতোর মতো আটকে আছে কয়েকগাছা বিবর্ণ চুল আর দাঁত প্রায় নেই বললেই চলে। কাদা মাখা, রোঁয়া ওঠা বডসড়ো মোবগের পাখার মতো জলে ভেজা এমন করুণ চেহারা তার প্রপিতামহের ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দিয়েছে। পাখা দুটো তার দেহের সঙ্গে জোড়া। পাখাগুলো যেন চিরকালের মতো ডোবার পাঁকে আটকে গিয়েছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে অনেকক্ষণ দেখার পর পেলাইয়ো আর এলিসেন্দা প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠল। সাহস করে বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। সে-ও উত্তর দিল। তার ভাষা বুঝতে না পারলেও কণ্ঠস্বর শুনে ওরা বুঝল যে বৃদ্ধ আসলে একজন নাবিক। ওদের ধারণা যে ডানাদুটোর জন্যেই যত বিপত্তি। বিদেশি নাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পচা ডোবায় আটকে গিয়েছে। ওদের এমন চিন্তায় ভুল নেই। যাই হোক, ওরা এক প্রতিবেশীকে ডেকে এনে অবস্থাটা দেখাল। এই মহিলা জীবন ও মৃত্যুর অপার রহস্য জানেন। মাত্র একবার এক পলক দেখেই জ্ঞানী বলে পরিচিত প্রতিবেশী মহিলা ওদের ভুল ভাঙিয়ে দিলেন।

প্রতিবেশী মহিলা বললেন,—'উনি এক দেবদূত। নিশ্চয়ই সন্তানের কাছে আসার পথে উলটোপালটা বৃষ্টির দাপট সামলাতে না পেরে আটকে পড়েছেন। বয়সও তো হয়েছে।' পরের দিন সকলে জানতে পারল যে পেলাইয়োর উঠোনের পাশের পাঁকভর্তি ডোবাটায় রক্তমাংসের মানুষের মতো একটা দেবদূত বন্দি হয়ে রয়েছে। সেই জ্ঞানী প্রতিবেশী মহিলার মন্তব্য,—'কোনও দৈব চক্রান্তে দেবদূতদের এমন হাল হয়েছে। ওরা এখন কোনওরকমে এইভাবে টিকে থাকার চেষ্টা করছে।' এমন রায় শুনে ওর গায়ে হাত দেবার সাহস হল না পেলাইয়োদের। সন্ধে থেকে চৌকিদারের লাঠিটা হাতে নিয়ে পেলাইয়ো রান্নাঘর থেকে নজরদারি চালিয়ে গেল। শুতে যাওয়ার আগে ডোবার চারপাশটা দেখে নিয়ে বেড়া দেওয়া মুরগির খাঁচায় বুড়ো মানুষটাকে বন্দি করল। মাঝরাতে বৃষ্টি থামার পর পেলাইয়ো আর এলিসেন্দা অনেকগুলো কাঁকড়া ধরল। খানিকক্ষণ বাদে ঘরে এসে দেখে বাচ্চাটার ঘুম ভেঙেছে, জ্বরটাও ছেড়ে গেছে। বোঝা গেল বেচারির খিদেও পেয়েছে। এবার এদের খুশি হওয়াব মুহূর্ত। এই খুশিতেই ওদের

মনটা বড় উদার হয়ে যায়। দেবদূতের জন্যে ওদের দরদ উথলে উঠল। ওরা ভাবল যে দেবদূতকে দিন তিনেকের মতো খাবার আর পানীয় দেবে, তারপর ছেড়ে দিয়ে আসবে সমুদ্রে। কিন্তু ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ওরা দেখে খাঁচাটার সামনে জড়ো হয়েছে কাতারে কাতারে লোক। শ্রদ্ধা ভক্তির বালাই নেই, দেবদূতের সঙ্গে রীতিমতো ঠাট্টা-মস্করা করছে। খাঁচার ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে খাবারের টুকরো। যেন সে দেবলোকের জীব নয়, সার্কাসের জন্তু।

এই অলৌকিক ঘটনার সংবাদে স্থানীয় পাদ্রি গোনসাগা তো একেবারে স্তম্ভিত। সকাল সাতটা নাগাদ তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত। তখনও অনেকে আসছে, তবে এরা ভোররাতের লোকগুলোর মতো অভব্য ব্যবহার করছে না। খাঁচাবন্দি দেবদূতের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই জল্পনাকল্পনা শুরু করে দিয়েছে। যারা সবচেয়ে সহজ-সরল গোছের মানুষ তারা ভাবল সারা পৃথিবীর 'মেয়র' করে দিলে তাকে যোগ্য সম্মান দেওয়া হবে। আর যারা একটু রুক্ষ প্রকৃতির তাদের ধারণা,—তাকে পাঁচ তারা পদকপ্রাপ্ত সৈন্যাধক্ষের পদে নিয়োগ করলে যুদ্ধে জয় হবেই হবে। আরেকটু কল্পনাবিলাসী মানুষদের মনে হল মানবজাতির আদর্শ হিসেবে ওকে প্রতিষ্ঠা করা উচিত ; চিরজীবী করে রাখার জন্যে বুড়ো মানুষটির একটা মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা দরকার। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানুষের কাছে সবচেয়ে উচ্চতম এক লক্ষ্যের প্রতীক হয়ে থাকুক এই ডানাওয়ালা দেবদূত। পাদ্রি হওয়ার আগে গোনসাগা কাঠুরে ছিলেন। পাহাড়ের গাছ কাটায় তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে। মুরগির খাঁচার কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখলেন। তবে তাঁর মন ভরল না। বাইরে থেকে বেচারিকে একটা বড়সড়ো মুরগি ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। তাই একেবারে ভেতরে গিয়ে তিনি ভালো করে দেখতে চাইলেন। খাঁচার ভেতর এক কোণায় বসে আপন মনে সে রোদে ডানা শুকোচ্ছে; ওর চারপাশে খাবারের ছোট ছোট টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ভোররাতের দর্শনার্থীরা ফল আর খাবারের টুকরো খাঁচার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল। খাঁচার বাইরেকার কোলাহল-কলরবে উদাসীন সেই বৃদ্ধ সবেমাত্র চোখ তুলে নিজের ভাষায় কী যেন বিড়বিড় করা শুরু করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে পাদ্রি গোনসাগা খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ে লাতিন ভাষায় সুপ্রভাত জানালেন। বৃদ্ধ দেবভাষার এক বর্ণও বুঝতে পারেনি, এই বিষয়টা উপলব্ধি করা মাত্রই গোনসাগার সন্দেহ শুরু হল। পাদ্রি গোনসাগা এবং তাঁর অনুচরদের বৃদ্ধ সুপ্রভাত জানাল না। পরে গোনসাগা বললেন কাছ থেকে ওকে অন্তত মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। ওর গায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের গন্ধ। ডানার পেছন দিকে কিছু জলজ লতা-গুল্ম আটকে আছে আর ঝড়ের দাপটে বড় বড় ডানাগুলো ভালো মতো ধাক্কা খেয়েছে। পার্থিব আঘাতের এমন সব চিহ্ন দেবদূতসুলভ আভিজাত্যের সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না। খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে গোনসাগা উৎসুক জনতার উদ্দেশ্যে একটি ছোট উপদেশ বাণী দিয়ে তাদের বোকামি সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। তিনি আবও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে শয়তানের ছলের অভাব হয় না; সে দেবতার চেহারা ধারণ করে সরলমতি অসাবধানী মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। তিনি বোঝালেন যে বাজপাখি এবং উড়োজাহাজেব মধ্যে পার্থক্য বোঝাবার জন্যে শুধুমাত্র ডানাই বিচার্য নয়। তাই দেবদূত চেনবার জন্যে শুধু ডানা দেখলেই হবে না। বুড়োলোকটি দেবদূত কিনা তা তদন্তসাপেক্ষ। যাই হোক, প্রথমে তিনি তাঁর ওপরওয়ালা বিশপকে লিখে জানাবেন, বিশপ আবার লিখবেন তাঁর ওপরওয়ালাদের ; আর তাঁরা লিখবেন গির্জার সর্বোচ্চ স্তরে, যেখান থেকে আসবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

পাদ্রি গোনসাগা উলুবনে মুক্তো ছড়ালেন। খাঁচায় বন্দি হওয়া দেবদূতের খবর হাওয়ায় উড়ে দূর-দূরান্তে খুব তাড়াতাড়ি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পেলাইয়োদের বাড়ির চৌহদ্দিব বাইরেকার খোলা চত্বরে রীতিমতো বাজার বসে গেল। মেলাও বলা যেতে পারে। হইচই এমন পর্যায়ে পৌঁছোল যে শেষ পর্যন্ত বন্দুকধারী সৈন্যবাহিনীকে আইন শৃঙ্খলা সামাল দিতে হল। দেবদূত দেখাব জন্যে মাথাপিছু পাঁচ সেন্দাভো দর্শনী ধার্য করল এলিসেন্দা। মেলায় সমবেত মানুষের বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করানোর তো একটা খবচ আছে।

বহু দূরের গ্রাম মারতিনিকা থেকেও কৌতূহলী মানুষ এল। পেলাইয়োদের বাড়ির সামনে পর্যন্ত জনতার ঢেউ আছড়ে পড়ল। এমনকী একটা ভ্রাম্যমান মেলাও পৌঁছে গেল। এরা আসলে একটা সার্কাস

কোম্পানি। ট্র্যাপিজের এক খেলোয়াড় আসর জমাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। মুখে আওয়াজ করে, নানান রকমের কসরত দেখিয়েও, সে জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হল। তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না। কারণ, তার ডানাগুলো দেবদূতের মতো নয়। বাদুড়ের মতো ডানা নিয়ে সে পেরে উঠল না। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের হতভাগ্য অসুস্থ মানুষেরা স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় হত্যে দিয়ে পড়ল। জনৈক মহিলা হৃদরোগী যে আগে নিজের হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারত, এখন আর পারছে না। জামাইকা থেকে আসা এক ভদ্রলোক আকাশের তারার গর্জনে সারা রাত নিদ্রাহীন। একজন বাতজাগা মানুষ অন্যদের ঘুমোতে দেয় না। এই সব বিচিত্র ধরনের রোগী ছাড়াও রোগমুক্তির আশায় এল আরও অনেক মানুষ। বাইরের বাজারের হইচই আর মেলার উত্তেজনায় ক্লান্তি এলেও পেলাইয়ো এবং এলিসেন্দার কিন্তু বেশ আনন্দ হচ্ছে। কারণ, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ছোট-বড় রজতমুদ্রায় ঘর ভরে গেল। আর দেবদূত দেখার প্রবল আগ্রহে অগুনতি মানুষের সারি কোন দিগন্তে গিয়ে শেষ হয়েছে তার সুলুক সন্ধান করা এক কথায়,—অসম্ভব।

দেবদূত কিন্তু নিজের সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। তাকে নিয়ে এত কিছু ঘটে চলেছে, অথচ তার মধ্যে কোনও ভাবান্তর নেই। ধার করা আস্তানায় কী করবে ভাবতে ভাবতে তার সময় কেটে যাচ্ছে। তেলের প্রদীপের আলো আর একটু দূরে রাখা মোমবাতি খাঁচার মধ্যে একটা নারকীয় পরিবেশ তৈরি করেছে। গরমে বেচারির প্রাণ ওষ্ঠাগত। পাড়ার সেই জ্ঞানী মহিলাব মতে দেবদূতের সেরা খাদ্য হল,—কর্পূর। অতএব, সমবেত জনতা তাকে কর্পূর খাওয়ানোর চেষ্টা করল। পছন্দ না হওয়ায় সে কর্পূর খেল না। চেখেও দেখল না পাদ্রিদের দেওয়া খাবার . ভক্তবা তার জন্যে খাবারদাবার এনেছিল। কেউই জানে না যে এই সমস্ত খাবার দেবদূতের না সেই সব বৃদ্ধদের যারা বাচ্চাদের মতো মণ্ড জাতীয় জিনিস খায়। তার যদি কিছু অলৌকিক গুণ থেকে থাকে তবে তা হল,—অস্বাভাবিক ধৈর্য। প্রথম কয়েক ঘণ্টা ধরে মুরগিগুলো ওর পাখায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খাবার ঠুকরে খাচ্ছিল। বিকলাঙ্গ মানুষেরা তার পালকেব ছোঁয়ায় বোগ সেরে উঠবে ধরে নিয়ে ডানার পালক ছেঁড়ার চেষ্টা করেছে। আব তার পুবো শরীরটা দেখে ধন্য হওয়ার আশায় বেশ কিছু ভক্ত ছোট ছোট নুড়ি ছুঁড়ে তাকে ওঠাবার চেষ্টা করে চলছিল। এমন নিশ্চলভাবে সে এতক্ষণ বসেছিল যে মানুষ ওকে মৃত বলেই ভাবতে শুরু করে। চাষিরা যেভাবে অলস বলদকে খোঁচা মেরে ওঠায়, ঠিক সেইভাবে একটা লোহার শিক দিয়ে তাকে ওঠাবার চেষ্টা করল কয়েকজন। তখন তাকে একবার জায়গা বদল করতে দেখা গেল। ভয়ে চমকে ওঠায়, তাব ঘুমও গেল ভেঙে। দুর্বোধ্য ভাষায় কেঁদে ককিয়ে তাব অভিযোগ জানালো। তার দু' চোখ ভরে গেছে কান্নায়। কাঁদতে কাঁদতেই দু'বার ডানা ঝাপটাল। ডানা থেকে মেঝেতে ঝরে পড়ল খাবারের টুকরোগুলো। মুরগিগুলো পরম আনন্দে ঝরে পড়া খাবারগুলো খুঁটে খেতে লাগল। কিছু ধুলো উডল। হাওয়ায় ছড়িয়ে পডল কিছু অপার্থিব আতঙ্ক। অনেকে ভাবল যে এই প্রতিক্রিয়াটা রাগের নয় যন্ত্রণার। এবাব সবাই ওকে বিরক্ত না করাব দিকে নজর দিল। অধিকাংশের ধারণা,—দেবদূতের নিষ্ক্রিয়তা বীরেব অবসর যাপন নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর এক অদ্ভুত স্থবিরতা মাত্র।

সংসারী মানুষের অনাবশ্যক কৌতূহল হিসেবে জনতার চাপল্যকে পাদ্রি গোনসাগা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিলেন। খাঁচায় বন্দি হয়ে থাকা মানুষটার স্বভাব সম্পর্কেও তাঁর একটা ধারণা হল। কিন্তু রোমের ডাকবিভাগ ঘটনার গুরুত্ব বোঝেনি। বন্দি মানুষটার নাভি আছে না নেই বা তার ভাষার সঙ্গে আর্মেনীয় ভাষার কতটুকু মিল কিংবা সে অনেকবাব আলপিনের খোঁচা সহ্য করতে পাবে কিনা অথবা সেই ডানাওয়ালা মানুষটি নরওযেবাসী না অ[illegible] কিছু,—এই সব সাত পাঁচ ওরা ভাবতে শুরু করল। এমন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে চিঠি চালাচালি চলতেই থাকত, যদি না একটা দৈব ঘটনায় এর ইতি ঘটত। সেই ঘটনাটাই পাদ্রিদের পত্রালাপেব সমাপ্তি ঘটায়।

ক্যারিবিয়ান এলাকার হাজারো ভ্রাম্যমাণ মেলার নানান আকর্ষণেব মধ্যে এক দুঃখী মেয়ের অতিপ্রাকৃত জীবনকাহিনি সবার নজর কেড়ে নিয়েছিল। বাবা-মায়েব অবাধ্য হওয়ার জন্যেই নাকি মেয়েটি মাকড়সায় পরিণত হয়েছে। ওকে দেখতে দেবদূত দেখাব চেয়ে কম দর্শনী লাগে। তা ছাড়া

ওকে আলাদা করে সামনে বা পিছন থেকে দেখতে হয় না। এমনকী এই ভয়ঙ্কর অবস্থা নিয়ে নানা রকমের রোমহর্ষক প্রশ্ন করার জন্যে কোনও বাড়তি খরচ নেই। কারও কোনও সন্দেহ হলেই সরাসরি প্রশ্ন করতে পারে। মাকড়সার দেহে বসানো এক বিষণ্ণ মেয়ের মুখ। ওকে দেখে এক বীভৎস অনুভূতি জাগে। বিসদৃশ অবয়বটা যত না ভয়ঙ্কর তার চেয়ে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর হল ওর মাকড়সায় রূপান্তরিত হওয়ার অনুপুঙ্খ বিবরণ। খুব অল্প বয়সে বাবা-মায়ের অনুমতি ছাড়াই একবার ও নাচতে যায়। নাচ সেরে যখন ও বনের মধ্যে দিয়ে আসছিল তখন এক ভীষণ বজ্র-বিদ্যুৎ আকাশটাকে দু'ভাগ করে দেয়। আর সাংঘাতিক আওয়াজের মধ্যে বাজ থেকে গড়িয়ে পড়া গন্ধকের ধারা ওর গায়ে লাগতেই বেচারি পরিণত হয় মাকড়সায়। ওর একমাত্র খাদ্য মাংসের টুকরো। কেউ দয়া করে ওর মুখে তা তুলে দেয়। মানবিক আবেদনে ভরা এমন কাহিনির সত্যতা এবং বেদনা দেবদূতের ঘটনাকে অনেকাংশে ম্লান করে দেওয়ায় তার বাজারদর দ্রুত পড়তে থাকে। বরং যেটুকু অতিলৌকিক ক্ষমতা দেবদূতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতেও কিছু অঘটন ঘটে ; অবিশ্যি এই অঘটন মানসিক জগতের। যেমন, এক অন্ধ দৃষ্টি ফিরে না পেলেও তার তিনটে দাঁত গজাল। পক্ষাঘাতে পঙ্গু লোকটি হাঁটবার ক্ষমতা পেল না কিন্তু একটা লটারির পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করল। কুষ্ঠাক্রান্তের ক্ষতস্থানে জন্ম নিল সূর্যমুখী ফুল। এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা থেকে কেউ সান্ত্বনা পেতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই এতে সাময়িক মজা পেল। দেবদূতের সম্মান বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। এদিকে মাকড়সায় রূপান্তরিত মেয়েটি আত্মহত্যা করল। আরও বড় ঘটনা,—পাদ্রি গোনসাগার অনিদ্রারোগ চিরকালের মতো সেরে গেল। এবং পেলাইয়োদের উঠোনের লাগোয়া চত্বর একেবারে আগের মতো নির্জন হয়ে গেল, যেমন ছিল একটানা তিন দিন বৃষ্টির সময়। আগের মতো কাঁকড়ার দল ওদের শোয়ার ঘর পর্যন্ত হেঁটে বেড়াতে লাগল।

বাড়ির মালিকদের অবিশ্যি দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। এত দিন ধরে উপার্জিত বিপুল অর্থে একটা দোতলা প্রাসাদ হয়ে গেছে। বারান্দা আর বাগান দিয়ে ঘেরা প্রাসাদের চারদিকে পাঁচিল থাকায় কাঁকড়াদের অবাধ যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ। গ্রামের পাশেই পেলাইয়ো একটা খরগোশের খামার গড়ে তুলে পাহারাদারের জঘন্য চাকরিটায় দিয়ে দিল ইস্তফা। এলিসেন্দা উঁচু হিলের জুতো আর রং-বাহারি সিল্কের জামাকাপড় কিনল। সেইসঙ্গে আয়ত্ত করে নিয়েছে শৌখিন মহিলাদের চালচলন। মুরগির খাঁচায় আর কোনও আকর্ষণ নেই। কেউ ওদিকে ফিরেও তাকায় না। ফিনাইল দিয়ে খাঁচাটা নিয়মিত ধোয়া হয় বটে তবে তা দেবদূতের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়, দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে। বাড়ির চারপাশে জমে ওঠা বিষ্ঠার পাহাড় থেকে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল বলেই এত সাবধানতা। তার ওপর চারদিকে ময়লা জমে থাকলে নতুন বাড়ির মর্যাদা নষ্ট হয়। বাচ্চাটা হাঁটতে শেখার পর ওকে খাঁচাটার কাছে যেতে দেওয়া হত না। তবে কিছুদিন বাদেই ওর ভয় কেটে যায়। দাঁত ওঠার সময় বাচ্চাটা খাঁচার মধ্যে ঢুকে গিয়ে দিব্যি খেলা করত। ততদিনে অবিশ্যি খাঁচার বেড়া পচে দু'টুকরো হয়ে মাটিতে মিশে গিয়েছে। অন্যান্যদের পছন্দ না করলেও বাচ্চাটার ওপর কিন্তু দেবদূত মোটেও বিরক্ত হত না। দিনে দিনে সে পোষা কুকুরের মতো সমস্ত রকমের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ওরা দুজনেই একসঙ্গে জলবসন্তে আক্রান্ত হল। বাচ্চাটাকে দেখতে আসা ডাক্তারের ইচ্ছে হল দেবদূতকেও একবার দেখে গেলে হয়। দেবদূতের শরীর পরীক্ষা করার সময় তার কিডনি এবং হৃৎযন্ত্রে ডাক্তার এমন সব শব্দ শুনতে পেল যে মনে হল দেবদূতের বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। ডাক্তার সবচেয়ে বেশি অবাক হল তার ডানাগুলো ভালো করে দেখার সময়। একটা জলজ্যান্ত মানুষের শরীরে এমন মজবুত ডানা গজাতে পারলে অন্য সবার তাহলে দোষ কোথায়? কেন সব মানুষেরই ডানা থাকবে না? ডাক্তার ভাবতেই থাকে।

রোজ সকালে সূর্য ওঠার সময় বাচ্চাটা ইস্কুলে যায়। বৃষ্টিতে মুরগির খাঁচাটা ততদিনে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। দেবদূত মুমূর্ষু প্রাণীর মতো ছটফট করে; বাড়ির চৌহদ্দির ভেতরেই, একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে সে নিজের শরীরটাকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে টেনে চলে। তার চোখে ঘুম

নেই। শোয়ার ঘর থেকে হয়তো ঝাঁটা মেরে তাকে বের করে দেওয়া হল, পরমুহূর্তেই সে রান্নাঘরে হাজির। একই সময়ে সে এত জায়গায় চলাফেরা করে যে পেলাইয়োরা ভাবতে থাকে যে দেবদূত বোধ হয় এক থেকে অনেক হয়ে যেতে পারে। মনে হয়, সারা বাড়িতে অনেকগুলো দেবদূত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিহ্বল হয়ে পড়ে এলিসেন্দা। দেবদূতগুলো বাড়িটাকে নরক করে তুলছে বলে এলিসেন্দা চিৎকার করে ওঠে। এত দেবদূতের মধ্যে বাস করা অসম্ভব। এলিসেন্দা হতাশ ও বিভ্রান্ত। দেবদূত প্রায় কিছুই খায় না, খেতে পারে না। তার অতি প্রাচীন চোখ দুটো প্রায় দৃষ্টিহীন। সে হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়ায়। আর ডানার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা-ও প্রায় না থাকারই মতো। পেলাইয়োর মায়া হয়। বাইরের একটা ভাঙাচোরা ঘরে একটা কম্বলের ওপর সে দেবদূতের শোবার ব্যবস্থা করে। তখনই প্রথম নজরে আসে যে বৃদ্ধ নরওয়েবাসী ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে অস্পষ্ট কিছু বলছে। বোঝা যায় সে ভুল বকছে। সেই মুহূর্তে ওরা প্রথম ভয় পেল। কারণ, দেবদূতের মৃত্যু হলে কী করা উচিত, তা কারও জানা নেই। এমনকী পাড়ার সেই জ্ঞানী মহিলা পর্যন্ত বলতে পারল না। মৃত দেবদূতের কী হাল হয় কেউ জানে না।

তবে বিচ্ছিরি রকমের ভয়ঙ্কর ঠান্ডাতেও সে বেঁচে রইল। শুধু তাই নয়, একটু একটু করে বেশ সুস্থও হয়ে উঠল। অনেকদিন ধরে সে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। আর সবার চোখের আড়ালে নিঃসঙ্গ দিন কাটাতে লাগল। ডিসেম্বরের গোড়ায় তার ডানায় বড় বড় শক্ত-পোক্ত নতুন পালক গজাতে থাকল। বুড়ো পাখিদের যেমন পালক গজায়, ঠিক তেমনি আর কী। এ যেন বিদ্ধস্ত মানুষের আরেক বিপাক। তবে সে নিশ্চয়ই পরিবর্তনের কথাটা জানত। কারণ, সে সব সময় সতর্ক যেন কেউ তার সদ্যোজাত পালক দেখতে না পায় আর কেউ যেন তার গাওয়া নাবিকের গান না শোনে। অসংখ্য তারা ঝিকমিক করতে থাকা আঁধার রাতে সে একা একা নাবিকের গান গাইত।

একদিন সকালবেলায় দুপুরের খাবার বানানোর জন্যে এলিসেন্দা পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছিল। ঠিক তখনই রান্নাঘরের সবকিছু এলোমেলো করে দিল একটা ঝোড়ো হাওয়া। মনে হয়, গভীর সমুদ্রের হাওয়া। জানালায় গিয়ে দাঁড়াল এলিসেন্দা। দেবদূতের ওড়ার চেষ্টা দেখে এলিসেন্দা রীতিমতো বিস্মিত। বিদঘুটে অঙ্গভঙ্গি করে ওড়ার চেষ্টা করার জন্যে তাকে বিশ্রী দেখাচ্ছে। ডানার ঝাপটায় ঘরটা ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। বাতাসে সে ভর দিতে পারছে না। সব মিলিয়ে সে এক উদ্ভট কাণ্ড। অবশেষে সফল হল তার আকাশের দিকে ওড়ার চেষ্টা। গভীর শান্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এলিসেন্দা। এলিসেন্দা দেখে সে বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে,—ওপরে, আরও ওপরে। কোনওরকমে ডানা ছড়িয়ে অসুস্থ চিলের মতো সে উড়ে যাচ্ছে। এলিসেন্দা ওকে দেখে আর পেঁয়াজ কাটে। পেঁয়াজ কাটা শেষ হওয়ার পরেও দেখতে থাকে। যখন দেবদূতকে আর দেখা যাচ্ছে না, তখনও এলিসেন্দা চেষ্টা করে চলে। কারণ, তখন সে এলিসেন্দার সুখী জীবনে আর কোনও সমস্যা তৈরি করছে না, বরং আদিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের ওপর সেই দেবদূত এখন একটা কাল্পনিক বিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়।

মূল শিরোনাম : Un senor muy viejo con unas alas enormes

যাদুর ফেরিওয়ালা, ভালোমানুষ ব্লাকামান

তাঁকে দেখা মাত্রই মনে পড়ে গেছিল একটা লড়াইয়ের খচ্চরের কথা। যেদিন তাঁকে প্রথম দেখি, সেই রবিবার থেকেই তাঁর সম্পর্কে আমার এমন ধারণা। তাঁর পরনে গ্যালিশ দেওয়া ট্রাউজার্স্। সাদা রঙের গ্যালিশগুলো সোনালি সুতো দিয়ে ট্রাউজার্সের কোমরের সঙ্গে সেলাই করা। প্রতিটি আঙুলে রঙিন পাথরের আংটি। সারা শরীরে জড়ানো বিনুনি পাকানো ঘণ্টার মালা। কলোম্বিয়ার আটলান্টিক উপকূলের মাগদালেনা উপসাগরের তীরের ছোট্ট বন্দর-শহর 'সান্তা মারিয়া দেল দারিয়েন'-এর জেটিঘাটের পাশে একটা টেবিলের উপর বিশেষ কোনও অসুখের ওষুধেব বোতল আর ওষধি লতাপাতা রেখে তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলছিলেন,—নিজের তৈরি এই ওষুধগুলো ক্যারিবিয়ান উপকূলের সমস্ত শহরেই তিনি ফেরি করে বেড়াচ্ছেন। কেবলমাত্র সেই মুহূর্তেই তিনি কিছু বিক্রি করার বদলে ওখানকার প্রাচীন বাসিন্দাদের বলছিলেন তারা যেন সত্যিকারের একটা সাপ ধরে নিয়ে আসে যাতে নিজের শরীরে সাপের কামড়ের প্রতিক্রিয়া এবং তাঁর আবিষ্কৃত প্রতিষেধকের কার্যকারিতার প্রমাণ দেওয়া যায়। ভাঙা ভাঙা গলায় তিনি বলে যাচ্ছিলেন,—'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, এই ওষুধটা সাপ, বিষাক্ত মাকড়শা, বিছে থেকে শুরু করে সব রকমের বিষাক্ত স্তন্যপায়ীর কামড় থেকে বাঁচার জন্যে অব্যর্থ।' তাঁর ভাষণে মোহিত হয়ে জনৈক দর্শক বোতলে ভরে সাংঘাতিক একটা জংলি সাপ জোগাড় করে নিয়ে এল। নিঃশ্বাসের বিষ দিয়েই নাকি এই ধরনের সাপ মানুষ মারতে পারে। যে উৎসাহ নিয়ে তিনি বোতলটার ছিপি খুলছিলেন মনে হচ্ছিল, তিনি যেন সাপটাকেই খেতে চলেছেন। কিন্তু ছিপিটা খোলা মাত্রই প্রাণীটা বোতল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে ওঁব গলায় একটা কামড় লাগিয়েই কোথায় যেন চলে গেল। ভাষণ শুরুর জন্যে দম নেওয়ার সুযোগও তিনি পেলেন না। এমনকী প্রতিষেধকটা প্রয়োগেরও সময় পাওয়া গেল না। হাতুড়ে ফেরিওয়ালা দর্শকদের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। তাঁর বিশাল বপু এমনভাবে শুকিয়ে যেতে লাগল যেন তাঁর ভেতরটা একেবারে ফোঁপরা। তবে তিনি শুধু সব কটা সোনার দাঁত বের করে হেসে যেতে লাগলেন। চিৎকার চেঁচামেচি এমন তীব্র হয়ে উঠল যে উত্তর থেকে শুভেচ্ছা সফরে আসা যুদ্ধজাহাজটা যেটা কুড়ি বছর ধরে ওখানে নোঙর করে আছে, সংক্রমণ আটকাবার জন্যে দর্শকদের ওঠানামা বন্ধ করে দিল। গুড ফ্রাইডের আগের রবিবার মানে 'পাম্ সানডে'-র প্রার্থনা সেরে পবিত্র তাল পাতা হাতে নিয়ে গির্জা থেকে ফেরার সময় বিষিয়ে যাওয়া মানুষটাকে না দেখে কেউই জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে চাইল না। মৃত্যুর ছোঁয়ায় মানুষটা ততক্ষণে গর্বে ফুলে উঠে আগের চেয়ে দ্বিগুণ মোটা হয়ে গেছে। সাপের কামড়ে তাঁর মুখ থেকে গাঁজলা বেরোতে শুরু করেছে। কিন্তু তখনও তিনি প্রাণ খুলে হেসে চলেছেন এবং তাঁর শরীরে জড়ানো ঘণ্টার মালাগুলো ঢং ঢং করে বেজেই চলেছে। শরীরটা ক্রমশ ফুলে ওঠায় জুতোর ফিতে থেকে শুরু করে জামাকাপড় সবই ফেটে-ফুটে গিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। আংটির চাপে আঙুলগুলো লালচে বেগুনি হয়ে উঠল। তাঁর গায়ের রং ক্রমশ নুনজলে চোবানো হরিণের মাংসের মতো হয়ে যাচ্ছে। আর শরীরের পিছন দিকটা দেখে তাঁর শেষ মুহূর্তটার আন্দাজ পাওয়ায় প্রত্যেকে বুঝতে পারল যে সাপের কামড়ে মারা যাওয়ার আগেই ওঁর দেহটা পচতে শুরু করেছে এবং ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছে। একটা বেলচা দিয়ে তাঁকে রাস্তায় ভবতে হবে বলে লোকেরা স্থির করল। তারা আরও ভাবল যে বরফ আর কাঠের কুচিতে রাখা শবদেহটাও বোধ হয় হাসতে থাকবে। সে এক সাংঘাতিক অবস্থা। ওঁব রঙিন ছবি তোলার জন্যে জাহাজের ডেকে আধুনিকতম ক্যামেরা নিয়ে নৌ সেনারা হাজির। গির্জা থেকে ফিরতে থাকা মহিলাবা মৃতপ্রায় মানুষটার উপব একটি কম্বল চাপিয়ে

দিয়ে, আবার তারও উপরে পবিত্র তাল পাতা চড়িয়ে দিয়ে নৌ-সেনাদের মতলবটাকে বানচাল করে দিলেন। মহিলাদের অনেকে ভেবেছিলেন যে যন্ত্র দিয়ে ছবি তুলে শবটাকে যেন অপবিত্র না করা হয়। হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করতে চাওয়া উপাসককে বিরক্ত করা অনুচিত বলে কেউ কেউ ভাবছিলেন। বাদবাকিরা চেয়েছিলেন তাঁর আত্মা যেন বিষিয়ে না যায়। সবাই যখন তাঁকে মৃত বলে ধরে নিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে, আধা হতবাক অবস্থায় এবং খারাপ সময়কে ভালো করে কাটিয়ে না উঠেই, এক হাত দিয়ে তাল পাতা সরিয়ে, ঠিক তক্ষুনি কারও সাহায্য ছাড়াই আস্তে আস্তে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলটাকে সাজিয়ে কাঁকড়ার ভঙ্গিতে টেবিলের উপর চড়ে, তাঁর প্রতিষেধক সম্পর্কে চিৎকার করে বলে যেতে লাগলেন যে মাত্র দুই কুয়ারতিয়ো দামের এই ওষুধটা বিক্রির জন্যে তিনি আবিষ্কার করেননি। সমগ্র মানবসমাজের ভালো করার জন্যে তৈরি করা বোতল ভর্তি পদার্থটা আসলে ভগবানের হাতের ছোঁয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ বলে সবাইকে আহ্বান করে তিনি বললেন,— 'ভিড় করার দরকার নেই, সবাই পাবেন।'

চারপাশের লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরল। অবিশ্যি এত করেও সবাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওষুধ পেল না। যুদ্ধজাহাজের অ্যাডমিরাল একটা বোতল নিয়ে এসেছিল। তার ধারণা হয়েছিল যে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে বিষিয়ে যাওয়া শরীরেও ওষুধটা কাজে লাগবে। টেবিলের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁর রঙিন ছবি তুলে নৌ-সেনারা অবিশ্যি সন্তুষ্ট নয়। কারণ, ওরা তাঁর মৃতদেহের ছবি ক্যামেরায় ধরে রাখতে পারেনি। তবে ওঁর হাতটা ক্লান্তিতে অবশ না হওয়া পর্যন্ত নৌ-সেনারা তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে যেতে লাগল। আঁধার নেমে আসায় আমাদের মতো কয়েকজন বেকুব ছাড়া আর সবাই জেটিঘাট ফাঁকা করে চলে গেল। তার মধ্যেই তিনি সবচেয়ে মূর্খটাকে খুঁজতে লাগলেন যে তাঁকে জিনিসপত্র গোছানোয় সাহায্য করতে পারে ; এবং তিনি আমাকে বেছে নিলেন। শুধু আমি নই, উনিও ভাবলেন যে আমাদের দেখা হওয়াটা নিয়তি নির্দিষ্ট,—যেন প্রায় এক শতাব্দী আগেই ঠিক করা ছিল। তবু কেন যেন মনে হল ব্যাপারটা গত রবিবারেই ঘটেছে। ছাত্রদের বই-খাতা রাখা বাক্সের মতো একটা ট্রাংকে আমরা যখন ওষুধপত্রগুলো সাজিয়ে রাখছিলাম তখন নিশ্চয়ই তিনি আমার ভিতরে আগে কখনও না দেখা একটা আলো দেখতে পান। এরপর উনি আমার পরিচয় জানতে চাওয়ায় আমি জানাই যে প্রকৃত অর্থে অনাথ হলেও আমার বাবা মারা যাননি। কথাটা শুনেই তাঁর অট্টহাসি শুরু হল। বিষে জর্জরিত অবস্থায়ও তিনি অত জোরে হাসেননি। কী ভাবে আমার পেট চলে জানতে চাওয়ায় আমি বলি যে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছুই করি না ; কারণ, বাদবাকি সব কিছুই সমস্যা সৃষ্টি করে। এ কথা শুনে তিনি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন যে বিজ্ঞানের কোন শাখায় আমার উৎসাহ। উলটোপালটা না বলে সরাসরি সত্যি কথাটাই বলে ফেললাম,—আমি গণৎকার হতে চাই। এবার কিন্তু তিনি হাসলেন না। স্বগতোক্তির ধাঁচে কথা শুরু করে তিনি জানালেন যে জ্যোতিষচর্চার সবচেয়ে কঠিন কাজটাই নাকি আমার শেখা হয়ে গেছে। আমার বোকা বোকা মুখটাই নাকি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সেই রাতেই বাবার সঙ্গে কথা বলে তিনি আমায় চিরকালের জন্যে কিনে নিলেন। বিনিময় মূল্য,—এক রেয়াল, দুই কুয়ারতিয়ো আর লোক ঠকিয়ে বা ভাঁওতা দিয়ে ভবিষ্যৎ বলার কাজে লাগে এমন এক প্যাকেট তাস।

ব্লাকামান, খারাপ ব্লাকামান এই রকমই ছিল। কারণ, আমিও তো ব্লাকামান,—ভালো ব্লাকামান। তিনি একজন জ্যোতির্বিদকে বোঝাতে পারতেন যে ফেব্রুয়ারি মাস আসলে একপাল অদৃশ্য হাতি ছাড়া কিছুই নয়। তবে ভালো দিন ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মনের ভেতর থেকে একটি পশুতে পরিণত হলেন। সেই সব গৌরবের দিনে তিনি রাজপুরুষদের মৃতদেহে ওষুধপত্র মাখানোর কাজ করতেন। জনশ্রুতি, তিনি এত যত্ন আর দায়িত্ব নিয়ে কাজটা করতেন যে রাজপুরুষেরা জীবিতাবস্থার থেকে অনেক ভালোভাবে বহুদিন ধরে শাসনকার্য চালাতে পারতেন। তাঁদের চেহারায় তিনি মৃত মানুষের আদল ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত সেই সব রাজপুরুষদের সমাধি দেওয়ার কারও সাহস হত না। মাথা খাটিয়ে তিনি এমন এক দাবাখেলা আবিষ্কার করেছিলেন যা একটানা ও অবিরাম খেলে যাওয়া যায়। বিশেষ ধরনের এই দাবা খেলতে খেলতে একজন পারিবারিক যাজক পাগল হয়ে যাওয়ায় এবং দুজন বিচিত্র

ভাবে আত্মহত্যা করায় তাঁর মান-সম্মানে ভাটা পড়তে শুরু করে। স্বপ্ন বিচারের কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি ঠিকুজি-কোষ্ঠী নিয়ে পড়লেন। তোলা আদায়কারীদের পরামর্শদাতার ভূমিকা পালটিয়ে হয়ে গেলেন হাতুড়ে চিকিৎসক। ফলে, আমার সঙ্গে আলাপের সময় থেকে সাধারণ মানুষ তো বটেই, জলদস্যুরাও তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখে আসছে। চালিযাতির ব্যবসায় মেতে উঠে এক অনিশ্চিত জীবনের পিছনে আমরা ছুটে চললাম। আমরা এমন সব ওষুধ বিক্রি করতাম যা চোরাচালানকারীদের ব্যবসাকে স্বচ্ছ করে তোলে। নীতিপরায়ণ-ধার্মিক বউদের কাছে বিক্রি করতাম সেই গোপন ওষুধটা যার কয়েক ফোঁটা মাংসের ঝোলে মিশিয়ে দিলে চূড়ান্ত নাস্তিক ওলন্দাজ স্বামীরাও ভগবানে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ইচ্ছানুযায়ী সব কিছু করার ওষুধ, মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা বিক্রি করি,—না এটা কোনও আদেশ নয়, কোনও বাধ্যবাধকতা নয়, পরামর্শ মাত্র। তাঁর রঙ্গরসিকতায় মজে থাকলেও বাস্তব সত্য হল যে রোজ দু'বেলার খাবার জোটানোও তখন আমাদের পক্ষে কষ্টকর। আমাকে দিয়ে ভাগ্যগণনা করানোই তখন তাঁর একমাত্র ভরসা। জাপানীদের মতো সাজপোশাকের ছদ্মবেশে সাজিয়ে জাহাজ নোঙর করার কাছি দিয়ে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে এমন একটা ট্রাংকের মধ্যে ভরে দেওয়া হত যা কবর দেওয়ার কাজে লাগে। নতুন বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ভালোভাবে দেওয়ার জন্যে ট্রাংকের মধ্যেই আমার চারপাশে একটা ব্যাকরণ বইয়ের পাতাগুলোকে ছিঁড়েখুঁড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে দেওয়া হত। মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,—বুকে হাত দিয়ে বলুন তো এথ্‌কিয়েল-এর জোনাকি পোকার কামড়ে মরণাপন্ন এই বাচ্চাটা বাঁচবে কিনা তা ওঁকে জিজ্ঞেস করার সাহস আপনাদের আছে? অথবা আপনি, এই যে অবিশ্বাসী মুখ নিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন,—পারবেন ওঁকে প্রশ্ন করতে যে কবে আপনি মারা যাবেন? সেদিন তো নয়ই, আমি কিন্তু কোনওদিনই পারিনি। তিনি বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। মাথায় বেশ কয়েকবার লাঠি পেটানো সত্ত্বেও সৌভাগ্যের দরজা না খোলায় আমার দ্বারা গণৎকারের কাজ হবে না ধরে নিয়ে উনি আমায় বাবার কাছে ফেরৎ দিয়ে নিজের সোনা-রূপোর মুদ্রাগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। তবে ঠিক সেই সময় এক ঝলক বিদ্যুতের মতো নতুন এক মতলব তাঁর মাথায় খেলে যাওয়ায় আমাদের ফিরে যাওয়াটা গেল পিছিয়ে। শরীরের যন্ত্রণা কমানোর জন্যে তিনি আবিষ্কার করলেন নতুন এক যান্ত্রিক পদ্ধতি। মদের গেলাস আর সেলাই মেসিন মিলিয়ে গড়ে তোলা এই ব্যবস্থাটার গুণাগুণ প্রয়োগ করার জন্যে আমাকে দরকার। তাই মাথার ব্যথার জন্যে আমার দুর্ভাগ্যকে দায়ী করে সারা রাত মিনতি করা সত্ত্বেও মুক্তি পেলাম না। যন্ত্রণার তীব্রতা অনুযায়ী যন্ত্রটা নানা রকমের সূচীশিল্প তৈরি করত। আমাদের সাফল্যে আমরা নিজেরাই তখন মাতোয়ারা। ঠিক সেই সময় ফিলাডেলফিয়া থেকে খবর এল যে যুদ্ধজাহাজটার কম্যান্ডার নিজের বাহিনীর সামনে পুরোনো প্রতিষেধকটা নিজের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে এক তাল জেলিতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

আবার হারিয়ে গেল তাঁর হাসি। পাহাড়-কন্দর-গুহা-গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে আমরা পালাতে থাকলাম। খবর এসেছিল যে পীতজ্বর নির্মূল করার অছিলায় নৌ-সেনারা আক্রমণ হেনেছে। দেশের মানুষের মাথা কাটতে কাটতে ওরা এগিয়ে আসছিল। ওদের রোষানল থেকে কেউই নাকি ছাড়া পায়নি। নিতান্তই অভ্যাসবশত প্রাচীন জনজাতির লোকেদের ওরা খুন করে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হত্যা করা হল চীনাদের। সাপ খেলানোর অভিযোগে হিন্দুদের হত্যা করার পর ওরা চারপাশের গাছপালা থেকে শুরু করে প্রাণী-অপ্রাণী সব কিছুই কোপাতে লাগল। এমনকী খনিজ সম্পদও ওদের হাত থেকে রক্ষা পেল না। ওদের উপদেষ্টারা নাকি বুঝিয়েছিল যে ক্যারিবিয়ান উপসাগর অঞ্চলের মানুষেরা প্রকৃতির চেহারা পালটিয়ে দিতে পারে। তবে এতকাল ধরে মাটির পাত্র বানিয়ে আসছিল যে কুমোরেরা, তাদের কেন খুন করা হয়েছিল তার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না কেন ওরা এত রেগে গেল আর আমরাই বা এত ভয় পেলাম কেন। অবশেষে লা গোয়াহিয়ার প্রশস্ত সমভূমির খোলা হাওয়ায় নিশ্চিন্তে দম নেওয়ার ফুরসৎ পেয়ে তিনি আমায় বললেন যে এক ধরনের শেকড়-বাকড় আর তারপিন তেল মিশিয়ে সেই প্রতিষেধকটা তৈরি। এক ভবঘুরেকে দুটো রজতমুদ্রা দিয়ে নাকি তিনি শেকড়-বাকড়গুলো জোগাড় করেছিলেন। ঔপনিবেশিক আমলের

একটা ভাঙাচোরা প্রাসাদের ভিতরে তখন আমাদের বসবাস। আর প্রাণপণে ছুটে চলেছি। ও পথে চোরাচালানকারীদের নিয়মিত যাতায়াত। একমাত্র ওরাই সেই পারদের মতো প্রখর রোদের ঝাঁঝ সহ্য করে ছুটতে পারে। প্রথম দিকে আমরা ভাঙাচোরা প্রাসাদের দেওয়ালে-পাঁচিলে জন্মানো ফুলের সঙ্গে আধপোড়া সালামান্দার খেতাম। সালামান্দার নামের উভচর শ্রেণীর এই প্রাণীটা সাধারণ আগুনে অদাহ্য। তাঁর হাসির ভাঁড়ারে কিন্তু তখনও টান পড়েনি। জুতোর সুকতলাগুলোকে সেদ্ধ করে খাওয়ার সময় তো তিনি হেসেই খুন। তবে শেষ পর্যন্ত চৌবাচ্চার শ্যাওলাগুলোকেও খাওয়ার সময় বুঝতে পারলাম আমরা বিশ্ব-সংসার থেকে কতটা বঞ্চিত। মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনও উপায় সে সময় জানা না থাকায় মাটিতে শুয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতাম মরণের কামড়টা সবচেয়ে কম ব্যথা কখন দেবে। আর সেই দিনগুলোতে তিনি বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো ভাবতেন এক নারীর কথা যে তাঁর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে সোহাগ করবে। মরণকে বুড়ো আঙুল দেখানোর এক বিচিত্র স্বপ্নে তিনি তখন বিভোর। যখন আমাদের মরে যাওয়ার কথা সেই সময় এক রাতে প্রাণখোলা আনন্দে উচ্ছল হয়ে তিনি আমার কাছে এলেন। তখন একটা শিসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার জন্যে নাকি তাঁর চিন্তা থেকে শব্দটা তৈরি হচ্ছিল,—তা আমি বুঝতে পারিনি। তবে ভোর হওয়ার আগেই পুরোনো কেতায় আগেকার মতো দৃঢ়তা নিয়ে তিনি বললেন,—'এতদিনে বোঝা গেল।' আমার জন্যেই তাঁর ভাগ্যটা অমন জট পাকিয়ে গেছে, এমন একটা অভিযোগ হেনে তিনি আমাকেই জট খোলার নির্দেশ দিলেন।

তাঁর প্রতি যেটুকু টান তখনও অবশিষ্ট ছিল, তা-ও এবার ঘুচে গেল। আমার গায়ের ছেঁড়া চাদরটা তিনি কেড়ে নিলেন। একটা কাঁটা তার দিয়ে আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবার পর আমার দেহে যে সব কাটা-ছেঁড়া-ঘা ছিল তাদের উপর নির্মম ভাবে ঘষতে লাগলেন সৈন্ধব লবণ। আমার পেচ্ছাপের মধ্যেই আমায় চোবানো হল। তারপর গোড়ালি দুটোকে জড়ো করে শক্ত করে বেঁধে মাথাটা নিচের দিকে করে রোদের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হল ছাল ছাড়ানোর জন্যে। এতেও ওঁর রাগ পড়ল না। চিৎকার করে বলতে লাগলেন যে ওভাবে আমার দেহটা পচে গলে গেলেও নাকি নির্যাতনকারী হিসেবে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। দুর্দশার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে আমার দেহটাকে আরও ভালোভাবে পচাবার জন্যে এবাব ভাঙা প্রাসাদের ভেতরকার একটা অন্ধকার চোরা কুঠরির মধ্যে ছুঁড়ে ফেললেন আমাকে। ঔপনিবেশিক আমলে প্রতিবাদী জনতাকে বন্দী করে রাখা হত এই সব চোরা কুঠরিতে। ওদিকে বাইরে তখন শুরু হয়েছে বীভৎস চিৎকারের ভয়ঙ্কর তান্ডব। কণ্ঠস্বরকে বিচিত্র কায়দায় ব্যবহার করে তিনি যে কত রকমারি সব স্বর ও শব্দ তৈরি করতে পারতেন তা না শুনলে বিশ্বাস করা মুশকিল। চোরা কুঠরির অন্ধকারে বসেই আমি শুনতে পেলাম নানান রকমের বুনো জন্তু-জানোয়ারের হুঙ্কার, ক্ষেতের মাটি খুঁড়ে বীট-গাজর তোলার শব্দ, আবার কখনও বা ভয়ঙ্কর ঝরণার আছড়ে পড়াব আওয়াজ। সত্যি, রীতিমতো স্বর্গীয় আবহে আমায় মেরে ফেলার কী চমৎকার বন্দোবস্তই না হয়েছিল! শেষ পর্যন্ত চোরাচালানকারীরা তাঁর অভাব দূর করার পর তিনি ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরটায় আমায় দেখতে এলেন। গালভরা হাসি নিয়ে আসলে তিনি দেখতে এসেছিলেন আমি মরে গেছি কিনা। কিন্তু তখনও আমাকে বেঁচে থাকতে দেখে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন যাতে আমি অনাহারে মরে না যাই। তবে বেঁচে থাকার জন্যে আমায় যথেষ্ট মূল্য দিতে হল। সাঁড়াশী দিয়ে নখগুলোকে উপড়ে ফেলার পর একটা শানপাথর দিয়ে আমার দাঁতগুলোকে ঘষা মাজা শুরু হল। এমন যন্ত্রণাদগ্ধ অবস্থাতেও আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে আমারও সময়-সুযোগ-সৌভাগ্য আসবে এবং শহীদ হওয়ার এই জঘন্য দুর্দশা থেকে মুক্তি পাব। হয়তো ভগবানের আশীর্বাদেই আমার শরীরে ত .নও পচন ধরেনি। নিজের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে এঁটোকাঁটাগুলো উনি নিয়ম করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিতেন। আমায় অসুস্থ করে তোলার উদ্দেশ্যেই দমবন্ধ করা ঘুপচি ঘরটার পরিবেশ বিষাক্ত বানাবার জন্যে তিনি মাঝে মধ্যে পচা-গলা টিকটিকি, মরা ঈগল পাখির দেহের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেন। কতদিন পরে তিনি একটা মরা খরগোশ, খাওয়ার জন্যে নয়, ছুঁড়ে মারার উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিলেন তা ঠিক খেয়াল নই। ধৈর্যচ্যুত

না হয়ে মনের ভেতরে জমে থাকা শঙ্কা মেশানো বিদ্বেষ মুখে ফুটিয়ে না তুলে, খরগোশটার কান দুটো পাকড়িয়ে মরদেহটাকে চোরা কুঠরির অন্ধকার দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারলাম। অবলা প্রাণীটার মৃতদেহটাকে উপলক্ষ্য করে আসলে এটা ছিল তাঁর প্রতি আমার ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। ঠিক তখনই সেই ঘটনাটা, যেন একটা স্বপ্ন, ঘটল। আকস্মিক ভয় কাটিয়ে উঠে খরগোশটা যেন আর্তনাদ করে উঠল। তারপর বদ্ধ পরিবেশ আর অন্ধকারের মধ্যেই লাফিয়ে লাফিয়ে আমার কাছে ফিরে এল।

এভাবেই শুরু হল আমার মহান জীবন। সেই থেকে সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। ম্যালেরিয়া রোগীকে সারিয়ে তুলতে নিই দু' পেসো। সাড়ে চারশো পেসো নিয়ে অন্ধের চোখে এনে দিই দৃষ্টিশক্তি। শোথ রোগে আক্রান্ত রোগীর শরীর থেকে জল বের করে দেওয়ার জন্যে আঠারো পেসো। খোঁড়াদের জন্যে দু' রকম দর। জন্ম থেকেই যারা হাঁটতে পারে না তাদের লাগে কুড়ি পেসো। দুর্ঘটনা বা মারামারি করে যাদের পা জখম হয়েছে, তাদের বাইশ পেসো খরচ করতে হয়। আর যুদ্ধ, ভূমিকম্প, কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিকলাঙ্গ মানুষদের সারাতে পঁচিশ পেসো। সাদামাটা অসুখ-বিসুখের জন্যে দরদস্তুর করে একটা কিছু ঠিক করে নিলেই হল। মাথা খারাপের লক্ষ্মণ অনুযায়ী স্থির করা হয় পাগলদের সারিয়ে তোলার খরচ। বাচ্চাদের অর্ধেক দাম আর কৃতজ্ঞতাবশত গবেটদের কাছ থেকে কিচ্ছুটি নয়। আমাকে জনসেবক হিসেবে কে অস্বীকার করবে? মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ এবং স্যার, মানে বিংশতি নৌ-বহরের কম্যান্ডান্ট আপনার কাছে অনুরোধ,—আপনার লোকেদের বলুন প্রতিবোধটা তুলে নিতে। মানবতাকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করুন। কুষ্ঠ রোগীরা যাক বাঁ দিকে। মৃগিতে আক্রান্তরা যাক ডান দিকে। আর যে দিকে যাওয়ার রাস্তা নেই, সেই দিকে যাবে বিকলাঙ্গরা। যাদের এখন-তখন অবস্থা নয় তাবা থাক পিছনের দিকে দয়া করে আমাকে ঘিরে ভিড় করবেন না। সব ধরনের রোগীরা মিলে-মিশে একাকাব হয়ে গেলে সব কিছু উলটো-পালটা হয়ে যেতে পাবে। তখন যেন আমায় দোষ দেবেন না। ভিড়ভাট্টার গোলমালে সুস্থ মানুষের চিকিৎসা করে ফেললে আমায় দোষ দিতে পারবেন না কিন্তু। গয়নাগুলো গরম জলে সেদ্ধ হয়ে পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত গান চলতে থাকুক আর দেবদূতেরা যতক্ষণ না জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ততক্ষণ আকাশে হাউই ছুটুক। উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত মদের ফোয়াবা উছলে উঠুক। ট্র্যাপিজের খেলা দেখাবার জন্যে মাদারির দলের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ডেকে আনুন। ডেকে আনুন কসাই আব ফোটোগ্রাফারদের। মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, চিন্তা করবেন না, এ সবই হবে আমার খবচে। কারণ, খারাপ ব্লাকামানের দুর্নামের এখানেই সমাপ্তি আর সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক এক মহাজাগতিক আলোড়ন। সাংসদদের কায়দায় এভাবেই আমি সবাইকে ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন করে রাখতে চাই যাতে সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে আগের মতো আমি আর আক্রান্ত না হই। আমি শুধু মৃতদেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনি না। কারণ চোখ খুললেই মরদেহটা প্রচণ্ড রাগে খুনির মতো আচরণ করে। এমনকী, যার কল্যাণে প্রাণ ফিরে পায়, পারলে তাকেই আক্রমণ হানে। আর যারা আত্মহত্যা করে মারা যায়নি, মোহাচ্ছন্নতা কেটে যাওয়াব ক্ষোভে তারা আত্মঘাতী হয়। গোড়ার দিকে একদল বিজ্ঞ ব্যক্তি আমার ব্যবসার বৈধতা নিয়ে খোঁজখবর করেছিল। কোনও খুঁত খুঁজে না পেয়ে তারা আমায় হুমকি দিয়ে বলেছিল আমি যেন মহান সন্ন্যাসী সিমোন মাগুস-এব শরণাপন্ন হয়ে আত্মশুদ্ধির বন্দোবস্ত করি যাতে নিজের পরিত্রাণেব একটা উপায় হয়। তারা আবও পবামর্শ দিয়েছিল আমি যেন কৃত কর্মের জন্যে সমস্ত পাপ স্বীকার করে নিয়ে ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসী হয়ে যাই। তবে তাদের কর্তৃত্বকে অশ্রদ্ধা না করেই জবাব দিয়েছিলাম যে ঠিক যেমনভাবে শুরু হয়েছিল এখনও সেই ভাবেই এগিয়ে চলেছি। আসলে মরে যাওয়ার পরে পুণ্যাত্মা বলে বিবেচিত হওয়াব মতো কোনও কাজই আমি করিনি। আমি একজন শিল্পী। বেঁচে থেকে মানুষকে শুধু মাত্র ভাষণ দিয়ে মুগ্ধ করে রাখাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। নৌ-বহরের দপ্তর থেকে কেনা পুরোনো গাড়িটা চড়ে আমি ঘুবে বেড়াই। নিউ অর্লেয়ন্স শহরের জলদস্যুদের আখড়ায় ত্রিনিদাদের যে লোকটা উদাত্ত সুরে গান গাইত সে এখন আমার গাড়ি চালায়। স্বপ্নসুন্দরীদের সঙ্গে যখন আমি নাচব তখন আমার পরনে থাকবে রং-বেরঙেব বোতাম লাগানো আসল সিল্কের জামা, মাথায় শোলার টুপি। পোখরাজের মতো দাঁতগুলো ছিরকুটিয়ে আমি হাসব আর আমাব শরীব থেকে ভেসে

আসবে প্রাচ্য দেশীয় সুগন্ধ। মন্ত্রীদের মতো এমন জীবনযাত্রার জন্যে আমার দরকার একটা বোকা বোকা মুখ। সত্যি বলতে কী,—আমার তো তা আছে। তাই সূর্যাস্তের পরে আমায় ঘিরে পর্যটকদের অত ভিড়। আমার সই করা ছবি ওরা কেনে। কেনে আমার লেখা প্রেমের কবিতা। যে সব স্মারকে আমার জীবনপঞ্জি ছাপানো থাকে, সেগুলো ওরা সংগ্রহ করে। এমনকী আমার জামা কাপড়ের এক-একটা টুকরোও ওরা কিনতে চায়। ভগবানের কাছে কোনও পরিতাপ স্বীকার না করেই এই ভাবে কেটে যায় আমার প্রতিটা দিন প্রতিটা রাত্রি, যেমনভাবে জীবন কাটে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিদের।

একটা বিষয় মেনে নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছে যে খারাপ ব্লাকামান এই ঘটনাটার পুনরাবৃত্তি করতে পারল না বলে লোকে ভাবল নতুন কিছুই তো আবিষ্কৃত হল না। আগেরবারে যারা তাঁকে এখানে দেখেছে তারা জানে যে তাঁর জাঁকজমকের দাপট একেবারেই হারিয়ে গেছে। তাঁর অন্তরাত্মা এখন পরিণত হয়েছে এক মাংসের বাজারে আর শরীরের হাড়গুলো এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় মরুভূমির হাওয়ার মতো শিহরণ মেশানো শীতে কাঁপছে। ঘণ্টার মালাটা একইরকমভাবে গায়ে জড়িয়ে পরের রবিবারে সান্তা মারিয়া দেল দারিয়েন বন্দরের জেটিঘাটে কবরখানার সেই পুরোনো ট্রাংকটা নিয়ে তিনি আবার উপস্থিত। এবার কিন্তু আগেকার সেই প্রতিষেধকটা বেচার চেষ্টা করলেন না। তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলার জন্যে তিনি আবেগ মেশানো ভাঙা গলায় নাবিকদের কাছে করুণ সুরে কাকুতি-মিনতি করলেন। নিজের শরীরের উপর অতিজাগতিক প্রাণীটির প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেওয়ার জন্যেই এমন কাতর আবেদন। মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, প্রবঞ্চক ও প্রতারক হিসেবে বদ মতলবের ফলে যে দুরবস্থায় আগে তাঁকে পড়তে হয়েছিল তার জন্যে আমাকে বিশ্বাস না করার সম্পূর্ণ অধিকার আপনাদের আছে। তবে আমার মায়ের হাড় ছুঁয়ে দিব্যি করে বলছি যে আজকের প্রমাণটা অন্য কোনও জগৎ থেকে আমদানি করা হয়নি। প্রকৃত অর্থেই এটা একেবারে নিখাদ এবং নিরহঙ্কারী সত্য। যদি এরপরেও কারও সন্দেহ থাকে তবে লক্ষ্য করুন, আমি কিন্তু আগেকার মতো হাসছি না বরং অতি কষ্টে কান্না চেপে রেখেছি।

নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে তিনি জামার বোতামগুলো খুলে ফেললেন। চোখ দুটো গেল জলে ভেসে আর বুকের বাঁ দিকে গোঁয়ারের মতো ঘুষি মেরে তিনি বোঝাতে চাইলেন যে মরণকে নিশ্চিন্তে শরীরে বরণ করার জন্যে ওটাই সবচেয়ে সেরা জায়গা। রবিবারের সমবেত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে এই ভয়ে নাবিকরা গুলি চালাল না। ব্লাকামানের আগের কীর্তি-কাণ্ড ভুলে যায়নি এমন একজন কোত্থেকে যেন এক পাত্র বারবাস্কোর শিকড় জোগাড় করে ফেলল। মাছেদের দেহকে অবশ করে তুলতে আর কবিরাজি চিকিৎসায় প্রাকৃতিক স্টেরয়েড হিসেবে ব্যবহার করা হয় অতি মূল্যবান বারবাস্কোর শিকড়। ক্যারিবিয়ান উপকূল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত কর্বিনা মাছকে ধরার জন্যেই হয়তো সে এতগুলো বারবাস্কোর শিকড় জোগাড় করেছিল। সত্যি সত্যিই যেন বারবাস্কোর শিকড়গুলো খাবেন এমন একটা ভাব দেখিয়ে তিনি অনেক আশা নিয়ে পাত্রটার ঢাকনাটা খুললেন। এবং অবশ্যই খেলেন। মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, অনুগ্রহ করে চলে যাবেন না বা আমার আত্মার শান্তির জন্যে প্রার্থনা করবেন না। কারণ, মৃত্যু তো একটা পরিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। এইসময় তিনি এত সৎ ছিলেন যে মৃত্যুর আগমন সংবাদ প্রকাশ না করে কাঁকড়ার ভঙ্গিতে টেবিল থেকে নেমে মাটিতে একটা জায়গা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেছে নিয়ে অনেক অস্বস্তির সঙ্গে শুয়ে পড়লেন। আমার দিকে এমন কাতরভাবে তাকালেন যে মনে হল তিনি নিজের মাকে খুঁজছেন। তারপর নিজের হাতের উপরে মাথা রেখে সত্যিকারের কান্নায় চোখ ভিজিয়ে এবং শরীরটা ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর মতো বেঁকিয়ে-দুমড়িয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এটাই অবিশ্যি একমাত্র ব্যতিক্রমী ঘটনা যখন আমার বিজ্ঞান কাজ করেনি। কবরখানার সেই পুরোনো ট্রাংকটার মধ্যে তাঁকে শুইয়ে দিলাম। রাজকীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করার জন্যে সোনার পোশাক পরিহিত যাজক এলেন ; তাঁকে সাহায্য করতে এবং মৃতের আত্মার শান্তি বিধানে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইবার

জন্যে গির্জা থেকে এলেন তিনজন পাদ্রি ; আর এ সমস্ত কাজে আমার খরচা হয়ে গেল চুয়ান্নটা স্বর্ণমুদ্রা। সমুদ্রের ধারের সেরা জায়গায় পাহাড়ের উপর তাঁর জন্য সম্রাটের উপযোগী একটা সমাধি তৈরি করা হল। শুধুমাত্র সমাধিটার জন্যেই গড়ে দেওয়া হল একটা ছোটো গির্জা। আর সমাধিটার উপর একটা ইস্পাতের ফলক গেঁথে দিয়ে গথিক রীতিতে লেখা হল,—

'মৃত ব্লাকামান এখানে শায়িত।
নাবিকদের প্রতারণা করে এই খারাপ লোকটির জীবন কেটেছিল।
এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজে বিজ্ঞানের শিকার হয়'।

তাঁর গুণাবলীর জন্যে এমন সম্মান জ্ঞাপনকে যথেষ্ট মনে করে আমি তাঁর কুকীর্তির প্রতিশোধ নেওয়া শুরু করলাম। সমাধিস্থল ছেড়ে আসার আগে তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করে দিয়ে এলাম যাতে সমাধির ভিতরেই তিনি বন্দী হয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে কাতরাতে পারেন। ভয়ঙ্কর জাতের ফায়ার-অ্যান্ট নামের পিঁপড়েরা সান্তা মারিয়া দেল দারিয়েন বন্দরকে গোগ্রাসে গিলে ফেলার অনেক আগেই এ সব ঘটে গেছে। তবে সেই রাজকীয় সমাধিটা পাহাড়ের উপর ড্রাগনের ছায়ায় একই রকম অবস্থায় আছে। আটলান্টিক মহাসাগরের মনোরম আবহাওয়ায় নিশ্চিন্তে ঘুমোনোর জন্যে ড্রাগনদের এই জায়গাটা খুব পছন্দ। ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে থাকে এক গাড়ি গোলাপ। তাঁর গুণাবলীর জন্যে আমার হৃদয় বেদনায় পরিপূর্ণ। ভাঙাচোরা ট্রাংকটার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তাঁর কান্নার শব্দ শোনার জন্যে সমাধিটার উপর আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করি তিনি বেঁচে আছেন কিনা। যদি কোনওরকমে তিনি মারা যান, তক্ষুণি তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তুলি যাতে শাস্তির সৌন্দর্যটা বজায় থাকে। যতদিন বেঁচে থাকব, মানে চিরকালের জন্যেই তাঁকে যেন এই সমাধিটার মধ্যেই বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

মূল শিরোনাম : Blacamán el bueno, vendedor de milagros

নকল গোলাপ

ভোরের আলো-আঁধারিতে হাতড়ে হাতড়ে মিনা হাতা ছাড়া জামাটাই কোনওরকমে গায়ে চড়িয়ে নিল। কাল রাতে বিছানার পাশেই জামাটা টাঙিয়ে রেখেছিল। জামাটার হাতা দুটো ইচ্ছে মতো খুলে রাখা যায় আবার প্রয়োজন মতো জুড়ে নেওয়া যায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ট্রাংকের ভেতরটা হাতড়ানোর পর দেওয়ালের পেরেকে, দরজার পেছন দিকটায় ও হাতা দুটোর খোঁজ করল। খুব সাবধানে আর ভীষণ সন্তর্পণে কাজটা করতে হচ্ছে যাতে কোনওরকম শব্দে ঠাকুমার ঘুম ভেঙে না যায়। দৃষ্টিহীন বৃদ্ধা এই ঘরেই ঘুমোচ্ছেন। অন্ধকারে চোখটা একটু সয়ে যেতেই মিনা বুঝতে পারল ঠাকুমা চলে গেছেন রান্নাঘরে। মিনা তাঁকে হাতা দুটোর কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন,—'ওগুলো তো স্নানের ঘরে রয়েছে। কাল বিকেলে আমি কেচে দিয়েছি।'

সত্যি সত্যিই হাতা দুটো ওখানেই দড়িতে টাঙানো আছে। ওগুলো নিয়েই রান্নাঘরে গেল মিনা। উনুনের পাশের পাথরটার ওপর হাতা দুটোকে ভালো করে বিছিয়ে দিল। দৃষ্টিহীন বৃদ্ধা ওখানে বসেই কফি বানাচ্ছেন। বারান্দার একেবারে ধারে রাখা পাথরের টবের দিকে শূন্য দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রয়েছেন দৃষ্টিহীন বৃদ্ধা। টবগুলোয় রয়েছে নানান রকমের ভেষজ ও আয়ুর্বেদিক গাছগাছালি।

মিনা বলে ওঠে,—'আমার জিনিসপত্রে হাত দিয়ো না। কেউ বলতে পারে না কবে রোদ উঠবে।'

মিনার কথা যে দিক থেকে আসছে দৃষ্টিহীন বৃদ্ধা সে দিকে মুখ ফেরালেন। 'এটা যে প্রথম শুক্রবার, সে কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।' গভীর শ্বাস টেনে ঠাকুমা বুঝলেন,—কফি তৈরি। উনুনের ওপর থেকে কফির পাত্রটা নামালেন।

'ওটার তলায় একটা কাগজ রাখ। পাথরটা যা ময়লা',—ঠাকুমা নির্দেশ দেন।

উনুনের পাশের পাথরটায় মিনা তর্জনী ঘষল। তবে না ঘষলে ময়লাটা ভেজা হাতায় লাগবে না।

'ওগুলো নোংরা হলে তোমার দোষেই হবে',—মিনা হুংকার ছাড়ে।

দৃষ্টিহীন মহিলা নিজের জন্যে একটা পেয়ালায় কফি ঢেলে নিয়ে একটা চেয়ার বারান্দার দিকে টানতে টানতে মন্তব্য করলেন,—'বড্ড রেগে গেছিস। মনে রাগ পুষে গির্জার কম্যুনিয়ন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া উচিত নয়।' বারান্দার গোলাপের টবগুলোর সামনে বসে তিনি কফির পেয়ালায় চুমুক দিলেন। উপাসনা শুরুর তৃতীয় ঘণ্টাটাও এবার বেজে গেল। পাথরের উপর বিছিয়ে রাখা হাতা দুটো তুলে নিয়ে মিনা জামার সঙ্গে লাগিয়ে নিল। হাতা দুটো এখনও ভেজা। কাঁধ খোলা, হাত কাটা জামা পরে গির্জায় গেলে ফাদার আনখেল তাকে কম্যুনিয়ন অনুষ্ঠানের পবিত্র খাবার দেবেন না। এখনও ওর মুখ ধোয়া হয়নি। একটা তোয়ালে মুখের ওপর ঘষে প্রসাধনের চিহ্নগুলো তুলে দিয়ে গায়ে একটা শাল জড়িয়ে, হাতে একটা প্রার্থনা পুস্তিকা নিয়ে মিনা নেমে পড়ল রাস্তায়। মিনিট পনেরো বাদেই ও আবার বাড়িতে উপস্থিত।

বারান্দার গোলাপগুলোর সামনে বসে দৃষ্টিহীন মহিলা বললেন,—'তুই নিশ্চয়ই সুসমাচার পড়া হয়ে যাওয়ার পর পৌঁছেছিলি।'

মিনা স্নানঘরের দিকে যেতে যেতে বলল,—'মাস্-এর অনুষ্ঠানে আমি যেতে পারি না। হাতা দুটো ভেজা। তা ছাড়া জামা-কাপড় ইস্ত্রি করা হয়নি।' মিনার মনে হল, এক স্বচ্ছ দৃষ্টি তাকে যেন অনুসরণ করে চলেছে।

'প্রথম শুক্রবারেই তুই মাস্-এ গরহাজির',—দৃষ্টিহীন মহিলা মন্তব্য করলেন।

স্নানঘর থেকে বেরিয়ে মিনা এক পেয়ালা কফি ঢেলে নিল। দরজার এক দিকে হেলান দিয়ে দৃষ্টিহীন

মহিলার পাশে বসল। তবে কফিটা খেতে পারল না।

'দোষ তো তোমারই',—চাপা রাগের সুরে ও বলল। ওর মনে হচ্ছিল ও যেন কান্নায় ভেঙে পড়বে।

'তুই কাঁদছিস',—দৃষ্টিহীন মহিলা বিস্ময় বোধ করলেন।

তিনি জলের ডেকচিটা ওরেগানো ফুলের টবের পাশে রেখে উঠোনের দিকে রওনা দিলেন। আর বলতে থাকলেন,—'তুই কাঁদছিস।' উঠে বসার আগেই মিনা কফির পেয়ালাটা মেঝেতে রাখল।

'কাঁদছি রাগের চোটে',—মিনা জানান দেয়। ঠাকুমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ও মন্তব্য করে,—'প্রথম শুক্রবারের মাস্‌ কামাই করার জন্যে তোমার গির্জায় গিয়ে স্বীকারোক্তি করা উচিত।'

মিনা শোয়ার ঘরের দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত দৃষ্টিহীন মহিলা চুপ করে অপেক্ষা করলেন।

তারপর বারান্দার শেষ সীমানা পর্যন্ত হেঁটে চললেন। একটু ঝুঁকে, হাতড়ে হাতড়ে না খাওয়া কফির পেয়ালাটা স্পর্শ করলেন। মাটির হাঁড়িতে কফি ঢালতে ঢালতে বললেন,—'ঈশ্বর জানেন। আমার বিবেক কিন্তু একেবারে পরিষ্কার।'

শোয়ার ঘর থেকে মিনার মা বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন,—'কার সঙ্গে কথা বলছেন?'

'কারও সঙ্গেই নয়',—দৃষ্টিহীন মহিলা উত্তর দেন। 'তুমি তো বরাবরই বলে এসেছ যে আমার মাথা খারাপ।'

ঘরের দরজা বন্ধ করে মিনা জামাটা ছাড়ল। অন্তর্বাসের ভেতর থেকে সেফটিপিন গাঁথা তিনটে ছোট্ট চাবির একটা গোছা বের করল। তার থেকে একটা চাবি দিয়ে আলমারির নিচের দেরাজটা খুলে বের করে নিল একটা ছোট্ট কাঠের বাক্স। তারপর আরেকটা চাবি দিয়ে বাক্সটা খুলে ফেলে বের করে আনল একতাড়া রঙিন কাগজ। চিঠিগুলো রবার-ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। চিঠির তাড়াটা অন্তর্বাসের ভেতরে চালান করে বাক্সটাকে আলমারির দেরাজের মধ্যে রেখে দিল। এবার চাবি দিয়ে দেরাজটা বন্ধ করে মিনা রওনা দিল স্নানঘরের দিকে। পায়খানার কমোডে চিঠিগুলোকে ফেলে দিয়ে ও জল ঢেলে দিল।

রান্নাঘরে মিনা এলে মা বললেন,—'আমি ভাবলাম তুই গির্জায় গেছিস।'

'যেতে পারেনি',—দৃষ্টিহীন মহিলা মন্তব্য করলেন। 'আজ যে প্রথম শুক্রবার, আমার একেবারে খেয়াল ছিল না। কাল সন্ধ্যায় ওর জামার হাতা দুটো কেচে দিয়েছিলাম।'

'এখনও ওগুলো ভেজা',—মিনা বিড় বিড় করে।

দৃষ্টিহীন মহিলার স্বগতোক্তি,—'ক' দিন যা খাটুনি গেল।'

'ইস্টারের সময় দেড়শো ডজন গোলাপ লাগবে',—মিনা খবর দেয়।

সকাল সকালই রোদের দাপট গেল বেড়ে। সাতটা বাজার আগেই বসার ঘরে মিনা নকল গোলাপ তৈরির কাজ শুরু করে দিল। এক ঝুড়ি পাপড়ি আর সরু তার, এক বাক্স ক্রেপ কাগজ, দু' জোড়া কাঁচি, একটা সুতোর গুলি আর এক শিশি আঠা। পরের মুহূর্তেই কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স হাতে করে ত্রিনিদাদ হাজির হয়েই মিনাকে জিজ্ঞেস করল কেন ও মাস্‌-এ যায়নি।

'আমার জামার হাতা দুটো ঠিক নেই',—মিনা জবাব দেয়।

ত্রিনিদাদ পরামর্শ দেয়,—'কারও কাছ থেকে ধার নিলেই হত।'

পাপড়ির ঝুড়ির পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ত্রিনিদাদ বসল।

একটা গোলাপ শেষ করে মিনা বলে,—'আসলে বড্ড দেরি হয়ে গেছিল।' এবার কাঁচি দিয়ে পাপড়িগুলো কোঁচকানোর জন্যে ঝুড়িটা কাছে টেনে নিল।

কার্ডবোর্ডের বাক্সটা মেঝেতে রেখে ত্রিনিদাদ কাজ শুরু করে দেয়। মিনা বাক্সটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,—'জুতো কিনলি?'

ত্রিনিদাদের সংক্ষিপ্ত উত্তর,—'ওগুলো মরা ইঁদুর।'

কাগজে কুঁচি দিয়ে পাপড়ি তৈরির কাজে ত্রিনিদাদ ভীষণ দক্ষ। সেই জন্যে সবুজ কাগজ তারের ওপর জড়িয়ে গোলাপের ডাঁটা বানাবার কাজে মিনা মন দিল। মুখ বুজে ওরা কাজ করে চলেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আর পারিবারিক ফোটো দিয়ে সাজানো বসার ঘরটা যে রোদে ভরে গেছে, তা-

ও ওরা খেয়াল করেনি। সব কটা ডাঁটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর ত্রিনিদাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মিনার মনে হল মেয়েটার মুখ যেন অপার্থিব কিছু দিয়ে গড়া। অদ্ভুত দক্ষতায়, আঙুলের ডগা প্রায় না নাড়িয়েই ত্রিনিদাদ কাগজ কোঁকড়ানোর কাজ করে চলেছে। ওর একটা পা আরেকটার ওপর আড়াআড়িভাবে চড়ানো রয়েছে। মিনা তাকাল ওর জুতোর দিকে। ছেলেদের জুতো। মিনার তাকানোকে পাত্তা না দিয়ে ত্রিনিদাদ পা দুটো পিছন দিকে টেনে এনে কাজ থামিয়ে প্রশ্ন করে,—'কী হয়েছে?'

মিনা ত্রিনিদাদের দিকে মাথা নোয়াল। তারপর মন্তব্য করে,—'ও চলে গেছে।'

ত্রিনিদাদ কোলের উপর কাঁচিটা রেখে প্রশ্ন করে,—'কী বলছিস?' মিনা আবারও বলে,—'ও চলে গেছে।'

পলক না ফেলে ত্রিনিদাদ মিনার দিকে তাকাল। ওর জোড়া ভুরুর মধ্যে কুঞ্চন রেখা ফুটে উঠেছে।

'আর এখন?'—ত্রিনিদাদের প্রশ্ন। উত্তর দিতে কিন্তু মিনার গলার স্বর একটুও কাঁপল না।

বেলা দশটার আগেই বিদায় নিল ত্রিনিদাদ। এতক্ষণে মিনার অস্বস্তি দূর হল। ত্রিনিদাদের উপস্থিতি যেন একটা ভয়ের বোঝার মতো লাগছিল। এবার ও মুক্তি পেয়ে রওনা দিল স্নানঘরের দিকে। দৃষ্টিহীন মহিলা তখন গোলাপগাছ ছাঁটার কাজে ব্যস্ত।

তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মিনা প্রশ্ন করে,—'তুমি নিশ্চয়ই জান না, এই বাক্সের মধ্যে কী আছে।' মিনা এবার বাক্সটা ঝাঁকাল।

দৃষ্টিহীন মহিলা এবার বিষয়টায় মন দিলেন। 'আর একবার এদিক দিয়ে নিয়ে যা তো',—তিনি অনুরোধ করলেন। দৃষ্টিহীন মহিলা কানের লতিতে তর্জনী রেখে আবারও শোনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাক্সের ভেতরে কী আছে, বুঝতে পারলেন না।

'মরা ইঁদুর। কাল রাতে গির্জার ইঁদুর মারা কলে ধরা পড়েছে',—মিনা বুঝিয়ে বলে।

এবার স্নানঘরে গিয়ে মিনা ইঁদুরগুলোকে ফেলে দিল। ফেরার সময় ও কোনও কথা না বলেই দৃষ্টিহীন মহিলার পাশ দিয়ে চলে গেল। তিনি কিন্তু মিনার পেছন পেছন এলেন। বসার ঘরে পৌঁছে তিনি বুঝতে পারলেন যে মিনা বন্ধ জানালার পাশে বসে একা একাই কাগজের তৈরি নকল গোলাপগুলো শেষ করছে।

'মিনা',—বলে ডাক পেড়ে দৃষ্টিহীন মহিলা বললেন,—'সুখী হতে চাইলে বাইরের চাকচিক্য দেখে ভুলিস না যেন।'

মিনা নীরবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টিহীন মহিলা আরাম কেদারাটা মিনার মুখোমুখি টেনে এনে বসলেন। তিনি ওর কাজে সাহায্যও করতে চাইলেন। তবে মিনা আপত্তি করল।

'তুই কিন্তু ঘাবড়ে গিয়েছিস',—দৃষ্টিহীন মহিলা মন্তব্য করলেন।

'দোষটা তো তোমার',—মিনার অভিমান ভরা উত্তর।

'আজ গির্জার মাস্-এ গেলি না কেন?'—দৃষ্টিহীন মহিলা প্রশ্ন করেন।

জবাবে মিনা বলল,—'তুমিই তো সেটা সবচেয়ে ভালো জান।'

'জামার হাতার জন্যে যেতে না পারলে বাড়ি থেকে বেরোতে গেলি কেন?'—প্রশ্ন করেও দৃষ্টিহীন মহিলা থামেন না। তিনি বলেই চলেন,—'পথে কারও সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। আর সে-ই তো মেজাজটা বিগড়িয়ে দিয়েছে।'

ঠাকুমার চোখের উপর মিনা হাত বুলোয়। ওর মনে হল কোনও অদৃশ্য স্ফটিককে যেন ও জল দিয়ে ধুয়ে চলেছে।

'তুমি একটা ডাইনি',—মিনা বলল।

দৃষ্টিহীন মহিলা বললেন,—'আজ সকালে দু'দুবার স্নানঘরে গেছিলি। অন্যদিন তো একবারের বেশি কখনও যাস না।' উত্তর না দিয়ে মিনা গোলাপ বানানোর কাজে মন দিল।

'তোর আলমারির দেরাজে যা রেখেছিস, তা কি আমাকে দেখাতে পারবি?'—দৃষ্টিহীন মহিলা জিজ্ঞেস করলেন।

তাড়াহুড়ো না করে মিনা জানালার ফ্রেমে গোলাপটা বিঁধিয়ে দিল। তারপর অন্তর্বাসের ভেতরে লুকিয়ে রাখা ছোট্ট চাবি তিনটে তুলে দিল দৃষ্টিহীন মহিলার হাতে। তিনি হাত বাড়িয়ে সেগুলো নিয়ে আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন।

মিনা বলল,—'তুমি নিজের চোখেই দেখে নাও।' দৃষ্টিহীন বৃদ্ধা আঙুলের ডগা দিয়ে চাবি তিনটে পরীক্ষা করলেন।

'স্নানঘরের নর্দমার তলায় কী লুকিয়ে আছে তা তো আর আমি দেখতে পারি না।' দৃষ্টিহীন মহিলার এমন মন্তব্যে মিনা মাথা তুলে তাকাল। ঠিক তখনই ওর মনের মধ্যে একটা নতুন অনুভূতি জন্ম নিল। ওর মনে হল ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে থাকার বিষয়টা দৃষ্টিহীন মহিলা বুঝতে পারছেন।

'নর্দমা ঘেঁটেই না হয় বের করে আনো',—মিনা বলে চলে,—'আমার ব্যাপার নিয়ে তোমার যখন এত মাথাব্যথা।'

দৃষ্টিহীন মহিলা এ কথায় কান দিলেন না। নিজের মতো তিনি বলে চলেন,—'সারা রাত জেগে ভোর পর্যন্ত তুই লিখে যাস।'

মিনা মন্তব্য করে,—'তুমি নিজেই তো আলো নিভিয়ে দাও।'

'আর তারপর তুই টর্চ জ্বালিয়ে লিখিস'—দৃষ্টিহীন মহিলা বলতেই থাকেন,—'তোর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেই আমি বুঝতে পারি যে তুই শুধু লিখেই চলেছিস।'

মিনা জোর করে নিজেকে সংযত রেখে মাথা না তুলেই বলে,—'বেশ তো। ধরা যাক ব্যাপারটা এমনই হয়েছে। কিন্তু তাতে কী আসে যায়?'

'কিছুই নয়',—দৃষ্টিহীন মহিলা উত্তর দিলেন। 'কেবল প্রথম শুক্রবারের মাস্-এ তুই হাজির থাকতে পারলি না।'

কাজ শেষ না করেই মিনা দু' হাতে সুতোর গুলিটা, কাঁচি আর একগোছা গোলাপের ডাঁটা জড়ো করল। সব কিছু একটা ঝুড়ির মধ্যে ভরে নেওয়ার পর ও মুখ ফেরাল দৃষ্টিহীন মহিলার দিকে।

'তুমি কী জানতে চাও, আমি স্নানঘরে কী করছিলাম',—এবার সরাসরি প্রশ্ন করে। প্রশ্নটার উত্তর মিনা নিজেই না দেওয়া পর্যন্ত দুজনেই নীরব হয়ে প্রতীক্ষা করে। 'হাগতে গিয়েছিলাম।'

দৃষ্টিহীন মহিলা ঝুড়িটার ভেতর ছোট্ট চাবি তিনটে ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর রান্নাঘরের দিকে এগোতে এগোতে তিনি মৃদু স্বরে বললেন,—'অজুহাতটা বেশ ভালো। আমি হয়তো বিশ্বাসও করতাম, যদি না তোর মুখে এমন একটা খারাপ কথা শুনতাম।'

বারান্দার অন্য দিক থেকে মিনার মা এসে পড়লেন। কাঁটা মেশানো ফুলের তোড়ার ভারে তিনি যেন নুইয়ে পড়েছেন।

'কী হয়েছে?'—মিনার মা প্রশ্ন করলেন।

'আমি পাগল হয়ে গেছি',—দৃষ্টিহীন মহিলা বললেন,—'তবে যতক্ষণ না পাথর ছোঁড়া শুরু করি ততক্ষণ পাগলা গারদে পাঠাবার দরকার নেই।'

মূল শিরোনাম : Rosas artificiales

বালতাসারের বিচিত্র বিকেল

খাঁচা তৈরি শেষ। এবার নিয়মমাফিক বালতাসার জানালার কাছাকাছি দেওয়ালের হুকে খাঁচাটা ঝুলিয়ে রাখল। মধ্যাহ্নভোজের পর সবার মুখে খাঁচার প্রশংসা,—'এত সুন্দর খাঁচা পৃথিবীতে আর একটাও নেই।' এত লোক খাঁচাটা দেখতে এল যে বাড়ির সামনে হাট বসে গেল। তাই বালতাসার খাঁচাটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে নিয়ে ওর কাজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

বালতাসারের বউ উরসুলা বলল,—'দাড়িটা কামাও। তোমাকে ঠিক কাপুচিন বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে।'

'দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর দাড়ি কামানো ঠিক নয়',—বালতাসার মন্তব্য করে। দু'সপ্তাহ ধরে দাড়ি কামানো হয়নি। মাথার চুল একেবারে ছোটো ছোটো, খাড়া খাড়া,—যেন খচ্চরের লোম, একদম নড়নচড়ন নেই। ওর মুখেচোখে বালকসুলভ ভীরুতা মিশে আছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বালতাসার তিরিশ পেরিয়েছে। উরসুলার সঙ্গে ও বছর চারেক আছে, তবে বিয়ে করেনি আর ছেলেপিলেও হয়নি। জীবন থেকে সচেতন হতে শিখলেও ভীতু হওয়ার কোনও সুযোগ জীবন ওকে দেয়নি। ও কখনও ভাবেনি যে সদ্য শেষ করা খাঁচাটা কয়েকজনের এত ভালো লেগে যাবে। ছোটবেলা থেকেই খাঁচা বানিয়ে আসছে। এ কাজটা ওর কাছে কখনও অন্য কাজের থেকে দারুণ কঠিন বলে মনে হয়নি।

'তাহলে বাড়িতেই বিশ্রাম নাও',—উরসুলা বলে। 'এরকম একমুখ দাড়ি নিয়ে কোথাও যেতে পারবে না।'

আরামকেদারায় শুয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে বারবারই ওকে উঠতে হল। কারণ, প্রতিবেশীরা একের পর এক খাঁচাটা দেখতে আসছে আর ওকেও দেখাতে হচ্ছে। তখনও পর্যন্ত উরসুলা ওকে কিছুই বলেনি। স্বামীর ওপর ও খুবই বিরক্ত। খাঁচা নিয়ে এমনই মেতেছে যে ছুতোরের কাজে একেবারেই মন দেয়নি। আর গত দু' সপ্তাহ ধরে খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, দুমদাম কথা বলছে, ছটফট করছে, ঘুম-নিদ্রার বালাই নেই এমনকী দাড়ি কামাবার কথাও বেমালুম ভুলে বসে আছে। খাঁচাটা শেষ হওয়া মাত্র ওর বিরক্তি কমে গেছে। বালতাসারের দিবানিদ্রা শেষ হলে উরসুলা ওর জামা-প্যান্ট ইস্তিরি করে দিল। বিছানার পাশে একটা টুলের উপর ইস্তিরি করা জামা-প্যান্ট রেখে উরসুলা খাঁচাটাকে নিয়ে এসে খাবার টেবিলে রাখল। তারপর নীরবে এক দৃষ্টিতে খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

উরসুলা প্রশ্ন করে,—'কত পাবে ভাবছ?'

'জানি না। তিরিশ পেসো চাইব, তা হলে হয়তো গোটা কুড়ি দেবে',—বালতাসার উত্তর দেয়।

উরসুলার পরামর্শ,—'পঞ্চাশ চাইবে। পনেরোটা দিন রাতেও ঘুমাওনি। একটু-আধটু খাটনির কাজ! তাছাড়া কত বড়! জীবনে কখনও এত বড় খাঁচা দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

বালতাসার দাড়ি কামাতে বসল। 'পঞ্চাশ পেসো কে দেবে?'

'দোন চেপে মোনতিয়েলের কাছে ও কিচ্ছু না। দেখলেই ওর পছন্দ হবে। আসলে ষাট পেসো চাওয়া উচিত',—উরসুলার মন্তব্য।

সারাটা বাড়ি জুড়ে দমবন্ধ করা অন্ধকার। এটা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ। এর মধ্যেই অসহ্য গরম পড়ে গেছে। ঘুর্ঘুরে পোকার একঘেয়ে ক্যাচর ক্যাচর আওয়াজ কানে তালা ধরিয়ে দেওয়ায় গরমটা আরও অসহনীয় মনে হচ্ছে। পোশাক পালটানোর পর বালতাসার উঠোনের দিকের দরজাটা খুলে দিল যাতে বাড়ির ভেতর একটু হাওয়া ঢুকতে পারে। তবে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একদল বাচ্চা খাবার ঘরে ঢুকে পড়ল।

খবরটা বেশ ভালো রকমই রটেছে। ডাক্তার ওকতাভিও হিরালদো পঙ্গু স্ত্রীর সঙ্গে খেতে বসে বালতাসারের খাঁচাটার কথা ভাবছিলেন। বৃদ্ধ চিকিৎসকটি পেশায় ক্লান্ত অথচ জীবনে বেশ সুখী। গরমের সময় বাড়ির ভেতরকার বারান্দায় একটা টেবিলের ওপর কয়েকটা ফুলের টব আর ক্যানারী পাখির দুটো খাঁচা রাখা থাকে। ডাক্তারের স্ত্রী পাখি ভালোবাসেন। বিড়ালগুলো পাখিদের খেয়ে ফেলে বলে তিনি বিড়ালদের দু' চক্ষে দেখতে পারেন না। স্ত্রীর কথা ভাবতে ভাবতে বিকেলবেলায় ডাক্তার হিরালদো রোগী দেখতে গেলেন এবং ফিরে এসে খাঁচাটা দেখার জন্যে গেলেন বালতাসারের বাড়ি।

খাবার ঘরে অনেক লোকের ভিড়। সবাই দেখতে পাবে বলে খাঁচাটা টেবিলের ওপর রাখা আছে। তারের বিশাল গম্বুজ, ভেতরে তিন তিনটে খোপ, যাতায়াতের পথ, খাওয়া-দাওয়া-ঘুমোনোর জন্যে আলাদা আলাদা খুপরি, দোল খাওয়ার জন্যে দোলনা,—এককথায় বিনোদনের কোনও ত্রুটিই নেই। বড় মাপের বরফ কারখানার ছোটোখাটো সংস্করণ বলে মনে হচ্ছে। হাত না ঠেকিয়ে ডাক্তার খাঁচাটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তাঁর মনে হল, যা রটেছে তার চেয়েও এটা অনেক বেশি সুন্দর। এবং স্ত্রীর জন্যে এতদিন যেরকম খাঁচার স্বপ্ন দেখে এসেছেন, এটা তার থেকে অনেক, অ-নে-ক বেশি সুন্দর।

কল্পনার অবাধ বিচরণের এ এক বাস্তব রূপ,—নিজের মনে এমন মন্তব্য করে ডাক্তার জটলার মধ্যে থেকে বালতাসারকে ডেকে এনে অভিভাবকসুলভ স্নেহের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন,—'তুমি খুব ভালো স্থপতি হতে পারতে।'

বালতাসার তো লজ্জায় লাল। শান্তভাবে জবাব দিল,—'ধন্যবাদ।'

ডাক্তার বললেন,—'সত্যি তাই।' বিগতযৌবন সুন্দরী মহিলাদের মতো মসৃণ লাবণ্য মেশানো মোটাসোটা চেহারা ডাক্তারের। তাঁর হাত দুটো বেশ গোলগাল। আর লাতিন ভাষায় কথা বলা পাদ্রিদের মতো তাঁর কণ্ঠস্বর। খাঁচাটাকে দর্শকদের সামনে এমনভাবে তিনি ঘোরাতে লাগলেন যেন এক্ষুণি ওটাকে নিলামে চড়ানো হবে। ডাক্তার পরামর্শ দেন,—'এতে পাখি রাখার দরকার নেই। গাছে টাঙিযে দিলে এ নিজেই গান গাইতে শুরু করে দেবে।'

আগের জায়গায় খাঁচাটাকে রেখে তিনি বললেন,—'ঠিক আছে, আমিই তাহলে এটা নিচ্ছি।'

পাশ থেকে উরসুলা বলে,—'এটা তো আগেই বিক্রি হয়ে গেছে।' বালতাসার জুড়ে দেয়,—'সেনোর চেপে মোনতিয়েলের ছেলে এটা নিয়েছে। এখন এটা ওরই। ওরই অর্ডার ছিল।'

মুখে একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়ে তুলে ডাক্তার প্রশ্ন করেন,—'খাঁচাটার নকশা কি ও তোমায় দিয়েছিল?'

বালতাসার মাথা নাড়িয়ে জানায়,—'না।' তারপর বলে,—'ও আমায় এই রকম একটা বড় খাঁচা বানাতে বলেছিল। ওর কাছে এক জোড়া ত্রোপিয়াল আছে। সেগুলোকে রাখার জন্যে ওর এরকম একটা বড় খাঁচা দরকার।'

ডাক্তার আবার খাঁচার দিকে তাকালেন। 'কিন্তু এটা তো ত্রোপিয়ালের খাঁচা নয়',—ডাক্তারের মন্তব্য।

টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বালতাসার বলল,—'ডাক্তারবাবু, এটা ওদেরই জন্যে।' ততক্ষণে বাচ্চারা ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। খাঁচার খোপগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বালতাসার বলে,—'অনেক হিসেব করে দেখে শুনে একেবারে মাপে মাপে খোপগুলো করা হয়েছে।' এবার একটা আংটা দিয়ে গম্বুজের গায়ে টোকা দেওয়ায় প্রত্যেকটা তারের মধ্যে একটা ঝঙ্কার শোনা গেল। বালতাসার বোঝায়,—'সবচেয়ে মজবুত তার দিয়ে তৈরি। সব কটা জোড় পড়েছে বাইরের দিকে, ভেতরে শক্ত করে আটকানো।'

বাচ্চাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল,—'টিয়া পাখিব পক্ষে বেশ বড়।'

বালতাসার বলে,—'ঠিক বলেছিস।'

ডাক্তার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন,—'সবই ভালো, তবে খাঁচাটার নকশা ও তোমায় দেয়নি। মাপজোকও দেয়নি তোমায়। আর এটাও নিশ্চয়ই বলে দেয়নি যে খাঁচাটা কত বড় হবে।' জবাবে বালতাসার বলে,—'তা অবশ্যি ঠিক।'

'তাহলে তো আর কোনও সমস্যাই নেই',—ডাক্তার এখন উত্তেজিত। 'ট্রোপিয়ালের বড় খাঁচার সঙ্গে এই খাঁচাটাকে এক করে দেখা উচিত নয়। ও যে এটাই করতে বলেছিল, তার কোনও প্রমাণ নেই।

একটু হকচকিয়ে গিয়ে বালতাসার বলে,—'আজ্ঞে হ্যাঁ, এটাই করতে বলেছে। বলেছে বলেই আমি করেছি।'

হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ডাক্তার ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছেন।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে উরসুলা বলে ফেলল,—'তুমি তো আরও একটা বানাতে পার।' তারপর ডাক্তারকে বলে,—'আপনার তো তেমন কোনও তাড়া নেই।'

তিনি উত্তর দেন,—'আসলে আজ বিকেলের মধ্যে কিনে দেব বলে বউকে কথা দিয়েছি।'

বালতাসার শান্তভাবে বলল,—'আমি খুবই দুঃখিত ডাক্তারবাবু, একবার বেচে দেওয়া মাল আরেকবার বেচা যায় না।'

নিজের কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডাক্তার অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। রুমাল দিয়ে ঘাড়ের ওপর জমে ওঠা ঘাম মুছে খাঁচাটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। চাহনিটা স্থির। নিস্পৃহ জাহাজ চলতে শুরু করলে ঘাটের মানুষ যেমনভাবে বাকরহিত অবস্থায় তাকিয়ে থাকে, ঠিক সেই রকম।

'ওরা কত দাম দিয়েছে?' ডাক্তারের এই প্রশ্নটার উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বালতাসার উরসুলার দিকে তাকিয়ে আশ্রয় চাইল। উরসুলা জবাব দেয়,—'ষাট পেসো।'

ডাক্তারের আর চোখ সরে না। একইভাবে তাঁর দৃষ্টি খাঁচায় আবদ্ধ। গভীর শ্বাস ফেলে বললেন,—'দারুণ জিনিস। ভীষণ সুন্দর।'

খাঁচাটাকে তারিফ করতে পেরেছেন বলে আত্মতৃপ্তির হাসি নিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। এবং সেই সময়ই এই ঘটনাটার স্মৃতি তাঁর মন থেকে চিরকালের জন্যে মুছে গেল। যাবার সময় শুধু বলে গেলেন,—'মোনতিয়েল খুবই ধনী।'

আসলে যতটা ধনী মনে হয়, হোসে মোনতিয়েল কিন্তু তেমন কিছু নয়। তবে তেমন হওয়ার জন্যে যা দরকার তা করার ক্ষমতা তার আছে। কয়েকটা বাড়ির পরেই হোসে মোনতিয়েলের বসতবাড়ি। যন্ত্রপাতি বোঝাই এই বাড়িটায় হেন জিনিস নেই যা বেচা যায় না। তবে খাঁচার খবরে তার চোখে-মুখে অন্তত কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তার স্ত্রী মৃত্যুর ভয়ে সবসময়ই আড়ষ্ট। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পরে ঘরের দরজা জানালা ভালোভাবে বন্ধ করে ঘণ্টা দুয়েক ধরে সে আঁধারের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই অবসরে হোসে মোনতিয়েল নাক ডাকিয়ে দিবানিদ্রায় ব্যস্ত। চেঁচামেচি শুনে হোসে মোনতিয়েলের স্ত্রী চমকে উঠল। বাইরের ঘরের দরজা খুলে সে দেখে বাড়ির সামনে মানুষের জটলা। আর ভিড়ের মধ্যিখানে খাঁচা হাতে দাঁড়িয়ে আছে বালতাসার। সদ্য দাড়ি কামানো মুখ, পরনে সাদা পোশাক ; তার মুখচোখে ভদ্র বিনয়ী ভাবটা লেগে রয়েছে যা বড়লোকের বাড়িতে আসার সময় দরিদ্রের মুখে শোভা পায়।

শ্রীমতী হোসে মোনতিয়েল রীতিমতো বিস্মিত। বালতাসারকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসার সময় তার মুখ ঝলমলিয়ে ওঠে। বিস্ময় গোপন করতে না পেরে সে বলেই ফেলল,—'আহা! কী চমৎকার, কী চমৎকার।' তারপরেই বলল,—'এমন চমৎকার জিনিস আমি জীবনে দেখিনি।' বাড়ির সামনের ভিড় দেখে উষ্মা প্রকাশ করে সে বলে ওঠে,—'তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে এস, না হলে ওরা আমার ঘরটাকে ভাগাড় করে ছাড়বে।'

হোসে মোনতিয়েলের বাড়ি বালতাসারের অচেনা নয়। ছুতোরের কাজে পেশাদারি দক্ষতার জন্যে অনেক সময়ই ছোটখাটো কাজে এখানে ওর ডাক পড়ে। তবে বড়লোকেদের মধ্যে ও কোনওদিনই স্বাভাবিক হতে পারে না। অনেক সময়েই বালতাসার ভেবেছে এই সব বড়লোকেদের কথা। ওদের কুৎসিত ঝগড়াটে বউ, শরীরে বড় বড় অপারেশনের দাগ। এই সব দেখেশুনে সবসময়ই বালতাসারের মনে ওদের জন্যে একটা করুণার উদ্রেক হয়। ওদের বাড়ির ভেতরে ঢোকার সময় ওর পা দুটোর গতি মন্থর হয়ে যায়, ওকে যেন পা টেনে টেনে ঢুকতে হয়।

খাঁচাটা খাবার টেবিলে রেখে বালতাসার প্রশ্ন করে,—'পেপে কি বাড়িতে?'

হোসে মোনতিয়েলের বউ বলল,—'স্কুলে গিয়েছে, এক্ষুনি এসে পড়বে। আর মোনতিয়েল স্নান করছে।'

আসলে এটা হোসে মোনতিয়েলের স্নানের সময় নয়। তড়িঘড়ি অ্যালকোহলের একটা মালিশ লাগিয়ে নিয়েই কী হচ্ছে তা জানার জন্যে সে উদগ্রীব। অতি সাবধানি মানুষ হোসে মোনতিয়েল। এতই সাবধানি যে ঘুমোনোর সময় পাখাটাও চালায় না, পাছে পাখার শব্দে বাড়ির হইচই চাপা পড়ে যায়। সে চিৎকার করে ওঠে,—'আদেলাইদে, কী হচ্ছে ওখানে?' ওর বউও চেঁচিয়ে জবাব দেয়,—'দেখবে এস, কী দারুণ জিনিস।'

হোঁদল কুৎকুৎ, লোমশ শরীরের হোসে মোনতিয়েল ঘাড়ে তোয়ালে জড়িয়ে শোবার ঘরের জানালায় মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে,—'কী ওটা?'

বালতাসার উত্তর দেয়,—'পেপের খাঁচা।' বিহ্বল হয়ে হোসে মোনতিয়েলের স্ত্রী স্বামীর দিকে তাকায়।

'কার?'

বালতাসার আবার বলল,—'পেপে, পেপের।' বালতাসারের দিকে তাকিয়ে হোসে মোনতিয়েল প্রশ্ন করে,—'পেপে কি ওটা করতে বলেছিল?'

তক্ষুনি কিছু হল না বটে, তবে বালতাসারের মনে হল কেউ যেন ওর মাথায় বাথরুমের দরজাটা ফেলে দিয়েছে। শোবার ঘর থেকে হোসে মোনতিয়েল বাইরে বেরিয়ে এল। তার পরনে একটা আন্ডারওয়্যার।

আবার চিৎকার,—'পেপে।' নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে তার বউ ফিসফিস করে কোনওরকমে বলে,—'এখনও ফেরেনি।'

বলতে না বলতেই পেপে দরজায় উপস্থিত। বছর বারো বয়সের বালক, মায়ের মতো বাঁকা এক জোড়া ভ্রূ আর মায়ের মতোই অসহায়, শান্ত। হোসে মোনতিয়েল প্রশ্ন করে,—'এটা তুই বানাতে বলেছিলি?'

ছেলে মাথা নামিয়ে নেয়। চুলের গোছা ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে হোসে মোনতিয়েল ছেলের মুখ ওপরে উঠিয়ে হাঁক পাড়ে,—'উত্তর দে।'

ছেলে টু শব্দটি না করে ঠোঁট কামড়ায়। হোসে মোনতিয়েলের বউ ফিসফিস করে বলে,—'মোনতিয়েল।'

হোসে মোনতিয়েল ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে রাগে গরগর করতে করতে বালতাসারের দিকে তাকিয়ে বলল,—'আমি খুবই দুঃখিত, বালতাসার। কাজটা শুরু করার আগে আমাকে অন্তত একবার জানানো উচিত ছিল। একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে কেনাবেচার কথা পাকা করার কাজ তোমার মতো লোক ছাড়া আর কে করবে?'

কথাগুলো এক দমে বলে ফেলার পর হোসে মোনতিয়েলের মেজাজটা নরম হল। খাঁচাটার দিকে না তাকিয়েই সে ওটাকে বালতাসারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,—'এক্ষুনি এটাকে নিয়ে বিদেয় হও। যার কাছে খুশি বেচে দিতে পার। ভালো কথা, আমার সঙ্গে তর্কাতর্কি করার দরকার নেই।' এবার, বালতাসারের পিঠে আলতো করে একটা চাপড় মেরে বলে,—'বুঝলে না, ডাক্তার আমাকে রাগারাগি করতে বারণ করেছে।'

ছেলে তো পাথর, চোখের পাতা পড়ছে না। খাঁচাটা হাতে নিয়ে বালতাসার ওর দিকে তাকানো মাত্র ওর গলা থেকে কুকুরের গোঙানির মতো একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে এল। আর তারপরেই ছেলেটা মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে ভীষণ জোরে কেঁদে উঠল।

মা ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়। ওকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করে। হোসে মোনতিয়েলের কিন্তু ভাবান্তর নেই। বউয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'থাক, ওকে তোলবার দরকার নেই। মেঝেতে পড়ে ওর মাথাটা

ফেটে গেলে নুন লেবু ঘষে দিও। তখন ও প্রাণভরে গোঙাতে পারবে।'

ছেলেটার চোখে জল নেই, তবে ফোঁপাচ্ছে। ওর মা হাত ধরে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে। হোসে মোনতিয়েল আবার বলে ওঠে,—'ওকে ছেড়ে দাও, একা একা থাকুক।'

বালতাসারের মনে হল মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরানো একটা জানোয়ারের মতো দেখাচ্ছে ছেলেটাকে। প্রায় চারটে বাজে। বালতাসারের বউ উরসুলা তখন নিজের বাড়িতে বসে পেঁয়াজ কাটতে কাটতে একটা খুব পুরোনো গান গুনগুনিয়ে গেয়ে চলেছে।

বালতাসার ডাকল,—'পেপে।' তারপর হাসতে হাসতে ছেলেটার কাছে গিয়ে খাঁচাটা বাড়িয়ে ধরল। ছেলেটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে নিজের সমান খাঁচাটাকে জাপটিয়ে ধরে আর তারের ফাঁক দিয়ে চেয়ে থাকে বালতাসারের দিকে। এমন মুহূর্তে কী বলতে হয় তা ওর জানা নেই। তবে চোখে আর এক ফোঁটাও জল নেই।

হোসে মোনতিয়েল এবার মোলায়েম সুরে বলে,—'বালতাসার তোমায় বললাম না,—ওটা নিয়ে যাও।'

হোসে মোনতিয়েলের বউ ছেলেকে আদেশ করে,—'ফেরৎ দিয়ে দে।'

ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বালতাসার বলল,—'এটা নাও, তোমার কাছেই রেখে দাও।' তারপর হোসে মোনতিয়েলকে বলল,—'যাই হোক না কেন, আমি কিন্তু এটা ওর জন্যেই বানিয়েছি।'

হোসে মোনতিয়েল বালতাসারের পেছন পেছন বসার ঘর অবধি এগোয়। বালতাসারের পথ আটকে বলে,—'বোকার মতো কাজ কোরো না, বালতাসার। তোমার জিনিস তুমি বাড়ি নিয়ে যাও। এসব ধ্যাষ্টামি আমার ভালো লাগে না। এটার জন্যে, তোমায় কিন্তু আমি একটা সেন্টও দেব না।'

'তাতে কিছু যায় আসে না',—বালতাসার জবাব দেয়। 'পেপেকে উপহার দেওয়ার জন্যে আমি এই খাঁচাটা বানিয়েছি। এর জন্যে আমি কোনও দাম চাই না।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ভিড় ঠেলে বালতাসার যখন ফিরে যাচ্ছে তখনও হোসে মোনতিয়েল বসার ঘর থেকে হাঁক পেড়ে চলেছে। তার পাণ্ডুর মুখ আর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

'অপদার্থ',—হোসে মোনতিয়েল চেঁচিয়ে ওঠে। 'আমরা করতে বলেছি, যত সব বাজে কথা। বদমায়েশ কোথাকার।'

বিলিয়ার্ড হলে পৌঁছোনোর পর লোকজনেরা বালতাসারকে অভিনন্দন জানাল। একটু আগে পর্যন্ত বালতাসারের মনে হচ্ছিল জীবনের শ্রেষ্ঠ খাঁচাটা বানিয়েছে এবং হোসে মোনতিয়েলের ছেলের কান্না বন্ধ করার জন্যে ওকে সেটা দিয়ে দিয়েছে। আর এসব জিনিসের তেমন কোনও দাম নেই। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে যে অনেকের কাছেই এমন জিনিসের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। আর এটা ভেবেই সে একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

'তা হলে ওরা পঞ্চাশ পেসো দিল',—কেউ ওকে জিজ্ঞেস করে।

'ষাট',—বালতাসার জবাব দেয়।

একজন বলে ওঠে,—'কামাল করেছ, বালতাসার। হোসে মোনতিয়েলের কাছ থেকে তুমি এই প্রথম এত মাল কামালে। আমাদের এখন স্ফূর্তি করার সময়।'

ওরা প্রথমে বালতাসারের জন্যে আনালো এক বোতল বিয়ার। আর ওদের সৌজন্যে অভিভূত হয়ে বালতাসার সবাইকে এক পাত্তর করে মদ খাওয়াল। এই প্রথম সে বাড়ির বাইরে মদ নিয়ে বসেছে। সন্ধের অনেক আগেই বালতাসার পুরোপুরি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে এলোমেলো কথার ফুলঝুড়ি ছোটাতে শুরু করল। এক হাজার খাঁচা বানাবার পরিকল্পনা তার মাথায় ঘুরছে যেগুলোর প্রত্যেকটার দাম ষাট পেসো। তারপর দশ লক্ষ খাঁচা, তার হাতে আসবে ছয় কোটি পেসো। মত্ত অবস্থায় সে বলে চলে,—'ধনীরা পুরোপুরি সাবাড় হয়ে যাওয়ার আগেই ওদের কাছে বেচতে হবে অনেক জিনিস। নানানরকমের জিনিস বানাতে হবে। সবকটা বড়লোকই নানান অসুখে ভুগছে। সবাই মরতে বসেছে। ওরা সকলেই এমন হেজে-মজে-গলে-পচে গেছে যে বেশি করে রাগতেও পারছে না।' পাক্কা দু'ঘণ্টা ধরে বালতাসারের

স্বয়ংক্রিয় টেপরেকর্ডার একটানা বেজে চলল। সকলে ওর মঙ্গল কামনা করল। ওর সৌভাগ্য এবং ধনীদের মৃত্যু কামনা করে একে একে সবাই খাবার সময় খেতে চলে গেল। অত বড় হলঘরটায় পড়ে রইল কেবলমাত্র একা বালতাসার।

রাত আটটা পর্যন্ত উরসুলা স্বামীর অপেক্ষায় বসেছিল। কাঁচা পেঁয়াজ আর ভাজা মাংস দিয়ে তৈরি হয়েছে নৈশভোজ। উরসুলাকে কেউ এসে খবর দেয় বালতাসার বিলিয়ার্ড হলে বসে স্ফূর্তি করছে, বন্ধুবান্ধবদের মদ খাওয়াচ্ছে। কথাটা উরসুলার বিশ্বাস হয়নি। কারণ, বালতাসারকে ও কখনও মাতাল হতে দেখেনি। প্রায় মাঝরাতে উরসুলা যখন শুতে গেল, তখনও বালতাসার ফাঁকা হলঘরটায় একা একা বসে আছে। ছোট ছোট টেবিলের সঙ্গে চারটে করে চেয়ার দিয়ে বিশাল হলঘরটা সাজানো। এক পাশে রয়েছে নাচের জন্যে খোলা মঞ্চ। মঞ্চে এখন ঘুরঘুর করছে ছাতার পাখির দল। বালতাসারের মুখে প্রসাধনীর ছোপ। বেচারি এক পা-ও চলতে পারছে না আর ওর মনে হচ্ছে এক বিছানায় দুটো মেয়েকে নিয়ে শুলে কত মজা হত। খরচের বহরটা বিরাট হয়ে যাওয়ায় বালতাসারকে ঘড়িটা বন্ধক রাখতে হয়েছে। বকেয়া মিটিয়ে দিলেই ঘড়িটা ছাড়ানো যাবে। কয়েক মুহূর্ত বাদেই বালতাসার হাত পা ছড়িয়ে রাস্তায় পড়ে গড়াগড়ি খেতে থাকে। ওর মনে হচ্ছে যে কেউ যেন জুতোজোড়া খুলে নিচ্ছে। তবে সেই অবস্থাতেও বালতাসার জীবনের সবচেয়ে মধুর স্বপ্নটাকে হারিয়ে ফেলতে চাইল না। ভোর পাঁচটা নাগাদ প্রার্থনায় যাওয়ার সময় মেয়েরা ওর দিকে তাকাতে ভয় পেল। ওদের ধারণা মানুষটা মারা গিয়েছে।

মূল শিরোনাম La pradigiosa tarde de Baltazar

মোনতিয়েলের বিধবা

হোসে মোনতিয়েল যখন মারা গেলেন তখন একমাত্র তাঁর বিধবা পত্নী ছাড়া সকলেই তৃপ্তি পেল। কিন্তু সত্যি সত্যি যে তিনি মারা গেছেন, এটা বিশ্বাস করতে প্রত্যেকের কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে গেল। ঘরের মধ্যে মৃতদেহটি দেখেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। মৃতদেহটি একটা হলদে কফিনে বালিশ আর লিনেনের চাদরের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে ঢোকানো আর ধারগুলো কাঁকুড়ের মতো গোল। নিখুঁতভাবে কামানো দাড়ি, সাদা পোশাক আর শক্ত চামড়ার জুতোয় কফিনের ভেতর তাঁকে এত ছিমছাম দেখাচ্ছে যে এই মুহূর্তের মতো এত জীবন্ত তাঁকে কোনওদিনই দেখা যায়নি। সেই একই হোসে মোনতিয়েল যিনি প্রতি রবিবার সকাল আটটায় গির্জার উপাসনায় হাজিরা দেন, শুধু আজ তাঁর হাতে ঘোড়ায় চড়ার লাঠির বদলে রয়েছে একটা ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি। কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে দেওয়া হল। দর্শনীয় পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হল। তিনি মৃত্যুকে নিয়ে রসিকতা করছেন না যেন এটা গোটা শহরটাকে বোঝানোর জন্যই এত সব করা হল। সমাধির পরেও হোসে মোনতিয়েলের মৃত্যু যে স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে একমাত্র বিধবা পত্নী বাদে এ কথাটা আর কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না। এটাই একমাত্র অবিশ্বাস্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। যখন সবাই আশা করেছিল যে কোনও এক নিভৃত স্থানে তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হবেন তখন তাঁর স্ত্রী এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাঁর স্বামীকে একজন বুড়োমানুষের মতো বিছানায় শুয়ে সমস্ত দোষ-অপরাধ স্বীকার করতে করতে, যন্ত্রণাবিহীনভাবে এ যুগের সন্ন্যাসীদের মতো মারা যেতে দেখবার সুযোগ তিনি পাবেন। তাঁর কল্পনায় মাত্র কয়েকটা বিষয়ে ভুল হয়েছিল। হোসে মোনতিয়েল ১৯৫১-র দোসরা অগস্ট দুপুর দুটোর সময় তাঁর দড়ির খাটিয়ায় মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ প্রচণ্ড ক্রোধ। ডাক্তার তাঁকে রাগতে নিষেধ করেছিল। তাঁর স্ত্রী আশা করেছিলেন যে সমস্ত শহর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ভেঙে পড়বে আর সব ফুল রাখবার পক্ষে তাঁদের বারান্দাটাকে বড্ড ছোট মনে হবে। কেবলমাত্র তাঁর পার্টির সদস্যরা এবং তাঁর গুরুভাইরা উপস্থিত হল। তাঁরা শুধুমাত্র পুরসভা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফুলের মালা পেলেন। জার্মানির দূতাবাসের দপ্তর থেকে তাঁর ছেলে এবং প্যারিস থেকে তাঁর দুই মেয়ে তিন পাতা টেলিগ্রাম পাঠাল। যদি কেউ দেখতে যেত তবে সে দেখতে পেত যে তাঁর ছেলে-মেয়েরা টেলিগ্রাফ অফিসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেখানকার বিনি পয়সার কালিতে টেলিগ্রাম ফর্মগুলোয় লিখছে আর ছিঁড়ছে। কারণ কিছুতেই তারা শোকবার্তাকে কুড়ি-ডলারের মধ্যে ধরে রাখতে পারছিল না। তাদের কেউই ফিরে আসার কথা বলেনি। সেদিন রাতে হোসে মোনতিয়েলের বিধবা পত্নী বাষট্টি বছর বয়সে তাঁর স্বামীর, যে তাঁকে সুখী করেছিল, কথা মনে করে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদবার সময় জীবনে প্রথমবারের মতো প্রতিহিংসার স্বাদ পেলেন। তিনি ভাবছিলেন—আমি নিজেকে চিরকালের জন্য বন্দি করে ফেলব। যদি ওরা আমায় হোসে মোনতিয়েলের সঙ্গে একই বাক্সে রেখে দিত, যেমন হত আমার অবস্থা এখন ঠিক তেমন। আমি এই পৃথিবী সম্বন্ধে আর বেশি কিছু জানতে চাই না। তিনি একজন সহজ-সরল পোড়খাওয়া মহিলা। কুসংস্কারে শতচ্ছিন্ন। বাবা-মা কুড়ি বছর বয়সে তাঁর বিয়ে দিয়েছিল। তিরিশ ফুটের কম দূরত্ব থেকে যাঁকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এখন থেকে সেই মহিলাই হবেন মোনতিয়েলের একমাত্র উপাসনাকারী। বাস্তবের সঙ্গে তাঁর কোনওদিনই যোগাযোগ ছিল না।

স্বামীর দেহ বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাবার তিনদিন পর তিনি বুঝতে পারলেন তাঁকে সংযত হতে হবে। কিন্তু তিনি তাঁর নতুন জীবনের কোনও উদ্দেশ্যই খুঁজে পেলেন না। প্রথমে তাঁকে সিন্দুকের চাবিটা দিয়ে শুরু করতে হবে। কারণ, অসংখ্য গোপন জিনিসের সঙ্গে সিন্দুকের চাবিটাও হোসে

মোনতিয়েল কবরে নিয়ে গেছেন। শহরের মেয়র সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিলেন। তিনি সিন্দুকটাকে উঠোনে, দেওয়ালের উলটো দিকে রাখবার হুকুম দিলেন এবং দুজন পুলিশের লোক তালাটা তাক করে রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। সারা সকাল ধরে বিধবা মহিলা শোবার ঘর থেকে মেয়রের চিৎকার মারফত ক্রমাগত কানে তালা ধরানো শব্দ শুনতে পেলেন।

তিনি ভাবলেন,—এই বোধ হয় শেষ। গত পাঁচ বছর ধরে গোলাগুলি বন্ধ করার জন্য ভগবানকে এত করে ডেকেছি। এখন আমার বাড়িতে গুলি ছুঁড়বার জন্য ওদের ধন্যবাদ জানাতে হবে। সেইদিন তিনি একাগ্র চিত্তে মৃত্যুকে ডাকলেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। তিনি যখন প্রায় ঘুমিয়েই পড়ছিলেন ঠিক তক্ষুনি বাড়ির ভিত কাঁপানো এক ভয়ংকর শব্দ শোনা গেল। সিন্দুকটা খোলার জন্য ওরা ডিনামাইট ব্যবহার করেছিল। মোনতিয়েলের বিধবা পত্নী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অক্টোবর মাস শেষ হতে চলল অথচ বৃষ্টির আর শেষ নেই। হোসে মোনতিয়েলের প্রবাদসম গোলমেলে গোলাবাড়িতে তিনি কোনও দিশা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

মিস্টার কারমাইকেল একজন উদ্যমী বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মোনতিয়েল পরিবারের বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি মোনতিয়েলের সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। অবশেষে মোনতিয়েলের বিধবা পত্নী বুঝলেন তাঁর স্বামী সত্যি সত্যি মারা গেছেন। তিনি তখন বাড়ির যত্ন নেবার জন্য শোবার ঘর ছেড়ে বাইরে এলেন। বাড়ির সাজসজ্জা পালটিয়ে বাড়িটাকে শোকের প্রতিচ্ছবি করে তুললেন। দেওয়ালে ঝোলানো মৃতব্যক্তির ছবির চারধারে কালো ফিতে আটকে দিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবার দু'মাসের মধ্যে তিনি দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাসটি আয়ত্ব করে ফেললেন। একদিন,—অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে যখন তাঁর চোখ লাল হয়ে গেল তিনি বুঝতে পারলেন মিস্টার কারমাইকেল খোলা ছাতা হাতে বাড়িতে ঢুকছেন। 'মিস্টার কারমাইকেল ছাতাটা বন্ধ করুন',—তিনি বললেন। 'আমার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটার পর আপনাকে দরকার।' মিস্টার কারমাইকেল ছাতাটা এক কোনায় রেখে দিলেন। তিনি একজন বৃদ্ধ নিগ্রো। পরনে সাদা পোশাক, পায়ের কড়ার উপর চাপ কমাবার জন্য জুতোর উপরটা ছুরি দিয়ে ছেঁদা করেছেন। বললেন, 'ওটা শুকোবার জন্য খোলা ছিল।'

স্বামী মারা যাবার পর এই প্রথম মোনতিয়েলের বিধবা পত্নী জানালা খুললেন।

'এবছর শীতের সঙ্গে অনেক দুর্ভোগ জড়িয়ে গেছে',—তিনি নখ কাটতে কাটতে বিড়বিড়িয়ে বললেন। 'মনে হচ্ছে, এর আর শেষ নেই।'

আবহাওয়া সংক্রান্ত পূর্বাভাসের ব্যাপারে মিস্টার কারমাইকেলের উপর তাঁর অগাধ আস্থা। তিনি একনিবিষ্টভাবে জনশূন্য ছোট্ট ময়দানের কথা ভাবছিলেন। ভাবছিলেন সেই সব নীরব বাড়িগুলোর কথা যেগুলোর দরজা হোসে মোনতিয়েলের অন্ত্যেষ্টিযাত্রা দেখবার জন্য খোলেনি। হাত কচলাতে কচলাতে তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ জমি আর অসংখ্য দায়দায়িত্বর কথা ভাবছিলেন। এসব কী করে সামলাবেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ফুঁপিয়ে উঠে তিনি বললেন,—'পৃথিবীটাই ভুলে ভরা।' ইদানীং যারা তাঁর বাড়িতে এসেছে তাদের পক্ষে তাঁকে পাগল হিসাবে ঠাউরাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু তিনি এর চেয়ে বেশি খোলামেলা কোনওদিনই ছিলেন না। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার আগে অক্টোবর মাসের বিষণ্ণ ভোরের আলোয় তিনি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তিদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। আর ভাবতেন ভগবান রবিবার যদি বিশ্রাম না নিতেন তাহলে তিনি সুন্দরভাবে পৃথিবীকে সৃষ্টি করার সময় পেতেন। 'ভগবান রবিবারকে অনেক বাজে কাজ শেষ করার জন্য ব্যবহার করতে পারতেন',—তিনি নিয়মিত একথা বলতেন। অবশ্য ভগবানের বিশ্রামের ব্যাপারটা চিরসত্য। স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র তফাত হল,—এখন এইসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবার যথেষ্ট কারণ আছে। মোনতিয়েলের বিধবা পত্নী যখন হতাশায় কুরে কুরে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছেন তখন মিস্টার কারমাইকেল তাঁকে আসন্ন ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছেন। হোসে মোনতিয়েল ভয় দেখিয়ে শহরের সব ব্যবসাকে একচেটিয়াভাবে নিজের করে নিয়েছিলেন। এখন সবাই সন্ত্রাসমুক্ত হয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে। অপেক্ষা করে করেও খদ্দের আসে

না। উঠোনে পচা দুধ ভর্তি টবের লাইন জমে যাচ্ছে। চাকের মধ্যেই মধু নষ্ট হচ্ছে। খামারের অন্ধকার ভাঁড়ারে রাখা পনীরে পোকা জন্মাচ্ছে। বৈদ্যুতিক বাতি আর নকল মার্বেলে সাজানো সমাধিতে শুয়ে হোসে মোনতিয়েল ছয় বছরের হত্যা আর অত্যাচারের দাম শোধ করছেন। এত কম সময়ে দেশের ইতিহাসে কেউ কখনও এত বড়লোক হয়নি। স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরে শহরে যখন প্রথম মেয়র এলেন তখন হোসে মোনতিয়েল একজন বিচক্ষণ রাজনৈতিক কর্মী। সব আমলেই তিনি সুবিধা ভোগ করেছেন আর ততদিনে তাঁর অর্ধেক জীবন আন্ডারওয়্যার পরে চালকলের গদিতে বসে কেটে গেছে। একটা সময়ে তিনি একজন ভাগ্যবান হিসাবে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি কথা দিয়েছিলেন যদি তিনি লটারিতে পুরস্কার পান তাহলে তিনি গির্জাতে সেন্ট জোসেফের একটা প্রমাণ আকারের মূর্তি বসিয়ে দেবেন। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে তিনি লটারিতে পুরস্কার জেতেন এবং কথা রাখেন। শহরে যখন নতুন মেয়র এলেন, যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর সার্জেন্ট, যাঁর উপর নির্দেশ ছিল অতি দ্রুত বিরোধীদের শহরছাড়া করতে হবে, তখন হোসে মোনতিয়েলকে প্রথম জুতো পরতে দেখা গেল। হোসে মোনতিয়েল পরিণত হলেন মেয়রের বিশ্বস্ত চরে। সেই ভদ্র ব্যবসায়ী যার মোটা রসিকতা কারও মনে দাগ কাটত না, কোনও অস্বস্তি সৃষ্টি করত না, সেই হোসে মোনতিয়েল তাঁর শত্রুদের ধনী ও গরিব দু'ভাগে বিভক্ত করলেন। পুলিশ গরিবদের ময়দানে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করত। বড়লোকদের শহর পরিত্যাগের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হত। দিনের পর দিন মেয়রের সঙ্গে নিজের দম বন্ধ করা অফিস ঘরে বসে হোসে মোনতিয়েল পাইকারি হারে হত্যার নিখুঁত পরিকল্পনা করে চলেন। আর বাড়িতে বসে তাঁর স্ত্রী মৃত ব্যক্তিদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। মেয়র চলে গেলে তিনি স্বামীর সামনে এসে বললেন,—'ওই লোকটা খুনি। সরকারের উপর তোমার প্রভাব খাটিয়ে ওই জন্তুটাকে বিদেয় কর। ও শহরের একটা মানুষকেও বাঁচতে দেবে না।' তখন হোসে মোনতিয়েল এতই ব্যস্ত ছিলেন যে স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে বলতেন,—'বোকামি কোরো না।' আসলে গরিব হত্যা তাঁর ব্যবসা ছিল না। বড়লোকদের তাড়ানোই ছিল তাঁর কাজ। ধনীদের বাড়ির দোরগোড়ায় গুলির প্রহেলিকা সৃষ্টি করে মেয়র তাদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শহর পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিতেন। হোসে মোনতিয়েল তাঁর নিজের ঠিক করা দামেই সেইসব পরিত্যক্ত জমি, গৃহপালিত পশু কিনে ফেলতেন। তাঁর স্ত্রী বলতেন,—'এরকম বোকামি কোরো না। এভাবে নিজেই নিজের সর্বনাশ করবে। ওরা যেখানেই থাক, না খেতে পেয়ে মরবে না। আর কখনওই তোমায় ধন্যবাদ দেবে না।' আর হোসে মোনতিয়েল যাঁর তখন হাসবার পর্যন্ত সময় ছিল না, স্ত্রীকে দূরে ঠেলে দিয়ে বলতেন,— 'রান্নাঘরে যাও, এসব নিয়ে তোমায় এত ভাবতে হবে না।' এইভাবে এক বছরের মধ্যে বিরোধীরা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হোসে মোনতিয়েল শহরের সবচেয়ে ধনী এবং ক্ষমতাশালী মানুষে পরিণত হলেন। মেয়েদের দিলেন প্যারিসে পাঠিয়ে, ছেলের জন্য জার্মানির রাষ্ট্রদূতের দপ্তরে একটা পদ খুঁজে পেলেন।

নিজেকে নিয়োজিত করলেন সাম্রাজ্য গুছোবার কাজে। কিন্তু এত বিপুল ধন-সম্পদ উপভোগ করার জন্য নিজে ছ'টা বছরও বাঁচতে পারলেন না। হোসে মোনতিয়েলের মৃত্যুর প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের পর তাঁর বিধবা পত্নী শুধু দুঃসংবাদের আশঙ্কায় সিঁড়ির ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দের দিকে কান পেতে থাকতেন। অনেকে আসে সন্ধ্যার আঁধারে। 'আবার লুটেরা',—তারা বলে। 'গতকাল পঞ্চাশটা গরু লুট করে নিয়েছে।' নিস্পন্দ অভিব্যক্তি। দাঁতে নখ কাটতে কাটতে মোনতিয়েলের বিধবা পত্নী রাগে লালচে হয়ে ওঠেন। নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি বলেন,—'হোসে মোনতিয়েল আমি তোমায় বলেছিলাম, এই শহরটা অসহ্য। কবরের মধ্যে তুমি এখনও তাজা আছ, কিন্তু এর মধ্যেই প্রত্যেকে পিঠটান দিয়েছে, বাড়িতে আর কেউ আসে না।' বর্ষার এই অ...নীয় দিনগুলোতে একমাত্র যার দেখা তিনি পান, তিনি হলেন কর্তব্যে অবিচল মিস্টার কারমাইকেল আর তিনি কখনওই ছাতা বন্ধ করে বাড়িতে ঢোকেন না। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হোসে মোনতিয়েলের ছেলের কাছে মিস্টার কারমাইকেল অনেকগুলো চিঠি লিখেছেন। তিনি তাকে জানিয়েছেন,—সে এসে সব দায়িত্ব বুঝে নিলে এবং তার মাকে নিজের চোখে দেখে গেলে ভালো হয়। সব জবাবই ফাঁকা। অবশেষে হোসে মোনতিয়েলের ছেলে

জানিয়েছে গুলি খেয়ে প্রাণ হারাবার ইচ্ছা তার নেই বলে সে ফিরতে সাহস করছে না। তারপর মিস্টার কারমাইকেল হোসে মোনতিয়েলের বিধবা পত্নীর শোবার ঘরে গেলেন। উদ্দেশ্য তার কাছে স্বীকার করে আসা যে তিনি ডুবে গেছেন। 'সেই বরং ভালো'—মহিলা বললেন,—'আমি এই পনীর আর পোকার মধ্যে ডুবে থাকি। আপনার যা যা দরকার নিয়ে যান। আমায় শান্তিতে মরতে দিন।' সেই থেকে বর্হিবিশ্বের সঙ্গে তার একমাত্র সংযোগ হল—মেয়েদের কাছে লেখা চিঠি, যা তিনি প্রত্যেক মাসের শেষে লেখেন। 'এটা একটা ধসে যাওয়া শহর',—তিনি তাদের লেখেন,—'ওখানে, বরাবরের মতো থেকে যাও। আমার জন্য চিন্তা করার দরকার নেই। তোমরা সুখে আছ জেনেই আমি খুশি।' তাঁর মেয়েরা উত্তর পাঠায়। তাদের চিঠিতে সব সময় লেখা থাকে সুখের খবর। যদি কেউ সে সব চিঠি দেখে তা হলে সে বুঝবে এসব চিঠি সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো ঘরে বসে, মুখোমুখি আয়নায় নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে চিন্তা করে লেখা হয়েছে। তারা কখনওই ফিরবার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। তাদের মতে দেশের পরিবেশ খুব খারাপ। যে দেশে রাজনৈতিক কারণে মানুষ খুন করা হয়—এমন জঙ্গলের দেশে বেঁচে থাকা অসম্ভব। এইসব চিঠি পড়তে পড়তে মোনতিয়েলের বিধবা পত্নী মেয়েদের সঙ্গে একমত হয়ে মাথা নাড়েন। কোনও এক বিশেষ উপলক্ষে তাঁর মেয়েরা প্যারিসের কসাইখানা সম্বন্ধে লিখল। তারা জানাল যে হলদে শুয়োর মেরে দোকানের সামনে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। সেগুলো আবার ফুলের মালা দিয়ে সাজানো থাকে। চিঠির শেষে তারা অন্য কায়দায় লিখল,—'ভেবে দেখ, বোকা শুয়োরগুলোর সবচেয়ে সুন্দর অভিষেকের জন্যে কী চমৎকার ব্যবস্থা।'

কথাটা পড়ে দু'বছরের মধ্যে এই প্রথম মোনতিয়েলের বিধবা পত্নী হেসে ফেললেন। বাড়ির আলোগুলো না জ্বালিয়ে শোবার আগে দেয়ালের উপরকার ফ্যানটা চালিয়ে দিলেন। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে কাঁচি, প্লাস্টার আর জপমালাটা বার করে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটায় প্লাস্টার দিয়ে ব্যান্ডেজ করে নিলেন। অনবরত দাঁত দিয়ে নখ কাটায় সেখান থেকে রক্ত ঝরছিল। তারপর তিনি প্রার্থনা শুরু করলেন। এবং এবার দ্বিতীয় রহস্যজনক কাজটি করলেন। জপমালাটা ডানহাতের বদলে বাঁ হাতে ধরলেন। ডান হাতের আঙুলে ব্যান্ডেজ থাকায় মালাটার দানাগুলো ঠিক ছোঁয়া যাচ্ছিল না। এক মুহূর্তের জন্যে দূরে কোথাও বাজ পড়ার শব্দ পাওয়া গেল। মাথাটা বুকের কাছে নুইয়ে দিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। খসে পড়ল জপমালাটা আর বাঁ হাতটা পাশে পড়ে রইল। তিনি স্বপ্নে দেখলেন উঠোনে বড়মা দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে একটা সাদা চাদর আর একটা চিরুনি তার কোলে। চিরুনি দিয়ে চুল থেকে উকুন বের করে নখ দিয়ে তিনি টিপে টিপে মারছেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—'আমি কখন মরব?'

উকুন মারা থামিয়ে বড়মা তার মাথাটা উঠিয়ে বললেন,—'যখন তোমার হাতদুটো পরিশ্রান্ত হয়ে উঠবে।'

মূল শিরোনাম La viuda de Montiel

শনিবারের পরের এক দিন

জুলাই মাস নাগাদ সমস্যাটার সূত্রপাত। একটানা দুটো দরদালান আর ন'টা ঘরের এই বিশাল বাড়িটায় নিঃসঙ্গ বিধবা রেবেকার বসবাস। জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ ও তিতিবিরক্ত রেবেকা আবার বাড়িটার মালকিনও বটে। জুলাই মাস নাগাদ হঠাৎ রেবেকার নজরে পড়ল,—বাড়ির সব কটা পর্দাই ছেঁড়া। দেখে মনে হচ্ছে, বাইরে থেকে ঢিল ছুঁড়ে ওগুলোকে ছেঁড়া হয়েছে। শোবার ঘরের জানালার পর্দাটা সবার আগে নজরে আসার পরই রেবেকা ভেবেছিলেন যে বিষয়টা নিয়ে আরখেনিদার সঙ্গে কথা বলতে হবে। স্বামীর মৃত্যুর পর এ বাড়ির পুরোনো ভৃত্য আরখেনিদাই রেবেকার এক এবং একমাত্র বিশ্বস্ত মানুষ। পুরো বাড়িটায় একটা চক্কর লাগানোর পর রেবেকা বুঝতে পারলেন যে শুধু শোবার ঘরই নয় বাড়ির সবগুলো পর্দারই একই হাল। রেবেকার মেজাজে কর্তৃত্বের একটা সুর সবসময় সক্রিয় ; সম্ভবত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রপিতামহের মতো এমন একটা মেজাজ তিনি আয়ত্ত করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে রেবেকার প্রপিতামহ রাজকীয় বাহিনীর হয়ে লড়াই করার পর স্পেনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। শুধুমাত্র তৃতীয় চার্লস্ নির্মিত 'সান্ ইলদেফোন্সো' প্রাসাদটা স্বচক্ষে দেখার জন্যেই এমন কষ্টকর সফর। সবগুলো পর্দার একই রকম দুরাবস্থা দেখে রেবেকা ঠিক করলেন, আরখেনিদার সঙ্গে কথা বলার কোনও দরকার নেই। অতএব ভেলভেটের ফুল গোঁজা শোলার টুপিটা মাথায় চাপিয়ে একটা অভিযোগ দায়ের করার জন্যে তিনি টাউন হলের দিকে রওনা হলেন। ওখানে পৌঁছে রেবেকা দেখলেন খোদ মেয়র, টাউন হলের পর্দা সারানোর কাজে ভীষণ ব্যস্ত। খালি গায়ে মেয়রের লোমশ শরীরটা রেবেকার চোখে বেশ অশালীন ঠেকল।

মেয়রের দপ্তরের এলোমেলো আর অপরিষ্কার চেহারাটা দেখেই রেবেকা রাগে ফেটে পড়লেন। সবার আগে তাঁর নজরে এল টেবিলের ওপর জমিয়ে রাখা এক ঝাঁক মরা পাখি। রাগে অস্থির হয়ে পড়লেন রেবেকা। বাড়ির পর্দা ছিঁড়ে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা দেখানোর জন্যে তিনি আগে থেকেই রাগে ফুঁসছিলেন। টেবিলের ওপর ডাঁই করে রাখা পাখিদের মৃতদেহ দেখে তিনি আর বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না। কর্তৃপক্ষের তাচ্ছিল্যে তাঁর কোনওরকম মানহানি হয়নি। দোতলার সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে মেয়র নিজেই একটা পর্দা মেরামত করছিলেন। নিজের সম্মান ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে রেবেকা আর চিন্তিত নন। নিজের বাড়ির ছেঁড়া পর্দার সঙ্গে টাউন হলের অবস্থা মিলিয়ে দেখতেও তাঁর আপত্তি। ঠিকমতো গোছগাছ না করেই একটা গম্ভীর ভাব মুখে ফুটিয়ে দরজা ঠেলে একটা পা ঘরের ভেতরে রেখে, শক্ত হাতে ছাতার হাতলে ভর দিয়ে বললেন,—'আমি একটা অভিযোগ দায়ের করতে চাই।'

সিঁড়ির ওপর থেকেই মুখটা ঘুরিয়ে মেয়র রেবেকাকে দেখলেন। নিজের দপ্তরে একজন সুন্দরীর উপস্থিতিতেও মেয়র বিচলিত হলেন না। ছেঁড়াখোঁড়া পর্দাটাকে জানালা থেকে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খুলতে খুলতে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে মেয়র দোতলা থেকেই বললেন,—'সমস্যাটা কী?'

রেবেকার বিরক্তি ভরা জবাব,—'পাড়ার ছেলেরা আমার সব পর্দা ছিঁড়ে দিয়েছে।' মেয়র আবার তাকালেন রেবেকার দিকে। ভেলভেটের তৈরি সুন্দর ফুল থেকে শুরু করে সাবেক আমলের রুপোলি জুতো পর্যন্ত এমনভাবে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন যেন জীবনে এই প্রথম তিনি রেবেকাকে দেখছেন। অত্যন্ত আস্তে আস্তে, রীতিমতো নিয়ন্ত্রিত গতিতে নিচে নেমে মেয়র কোমরের বেল্টে একটা হাত রেখে দাঁড়ালেন। অন্য হাতের স্ক্রুড্রাইভারটাকে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বললেন,—'ছেলেরা নয়, এটা পাখিদের কাজ।'

মরা পাখির স্তূপ, বাড়ির ছেঁড়া পর্দা এবং সিঁড়ির ওপরে দাঁড়ানো মানুষটাকে রেবেকা নিমেষের মধ্যেই এক সূত্রে গেঁথে ফেললেন। তিনি অস্থির হয়ে ভাবতে থাকলেন যে বাড়ির সব কটা ঘর পাখিদের মৃতদেহে ভরে গেছে। বিস্মিত হয়ে তিনি শুধোলেন,—'পাখি?'

মেয়র সায় দিলেন,—'হ্যাঁ, পাখি। আশ্চর্য ব্যাপার! আপনি খেয়ালই করেননি যে গত তিনদিন ধরে পাখিগুলো জানালার কাচ ভেঙে পর্দা ছিঁড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে মরছে!'

টাউন হল থেকে বেরিয়ে আসার সময় রেবেকার কেমন যেন লজ্জা করল। আরখেনিদা একটু অসন্তুষ্ট। সারা শহরের গুজবকে বাড়িতে জড়ো করতে পারলেও পাখিদের ব্যাপারে রেবেকার সঙ্গে সে একটাও কথা বলল না। আসন্ন অগস্ট মাসের রোদের চড়া তাপ থেকে বাঁচতে রেবেকা ছাতাটা খুলে নির্জন রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলেন,—এতক্ষণে পুরো বাড়িটা নিশ্চয়ই পাখিদের মৃতদেহে ভরে গেছে।

জুলাই মাসের শেষে এত গরম,—এ শহরের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া ভার। গরমের দাপটে পাখিদের সার বেঁধে মৃত্যুর বিষয়টা শহরবাসীদের নজর এড়িয়ে গেল। শহরবাসীর রোজকার জীবনযাত্রায় এমন সাংঘাতিক ঘটনাটা কোনও ছাপই ফেলল না। বরং অধিকাংশ মানুষই আসন্ন অগস্ট মাসের জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। 'অল্টার কাস্তানেদা ই মোন্তেরো' গির্জার শ্রদ্ধেয় যাজক ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলও সেই দলে পড়েন। চুরানব্বই বছর বয়সের এই অমায়িক ভদ্রলোক সবাইকে বললেন যে তিনটি ঘটনায় শয়তানের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও গির্জায় খুঁজে পাওয়া দুটো পাখির মৃতদেহকে তিনি গুরুত্ব দিতে রাজি নন। মঙ্গলবারের প্রার্থনার পরে গির্জার পোশাক রাখার জায়গায় একটা মরা পাখি দেখে তিনি ভাবলেন যে আশপাশের বাড়ির কোনও বিড়াল ওটাকে টেনে এনেছে। বুধবার গির্জার বারান্দায় আরেকটা পাখির মৃতদেহ দেখে সেটাকে জুতোর ডগা দিয়ে এক ধাক্কায় রাস্তায় পাঠিয়ে দিতে দিতে তিনি ভাবলেন বিড়ালের অস্তিত্ব বিলোপ পাওয়া দরকার।

শুক্রবার সকালে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল রেল স্টেশনে গিয়ে রোজকার মতো তাঁর নির্দিষ্ট বেঞ্চিটায় বসলেন। বেঞ্চিতে তাঁব পাশেই আরেকটা মৃত পাখি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যেন তড়িতাহত হয়ে পড়লেন। পা দুটো ধরে মরা পাখিটাকে নিজের চোখের সামনে এনে উলটেপালটে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে তিনি আপন মনেই মন্তব্য করলেন,—'তাজ্জব ব্যাপার! এটা নিয়ে এক সপ্তাহে তিন-তিনটে মরা পাখি দেখলাম।'

শহবে যা সব ঘটে চলেছে, সে সব বিষয়ে সেই মুহূর্ত থেকে মাথা ঘামানো শুরু করলেন তিনি। একেবারে ধরাবাঁধা রাস্তায় তাঁর চিন্তা এগোল না। বয়স একটা বড় বাধা। তা ছাড়া তিনবার শয়তানের মুখোমুখি হওয়ার কথা তিনি রীতিমতো শপথ করে বলেছেন। তাঁর গির্জায় যারা নিয়মিত আসে তাদের কাছে নিজের সুনাম রক্ষা,—এই বকম সাত পাঁচ নানান বিষয়ে ভাবতে ভাবতে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ক্রমশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। পাখিদের নিয়ে কিছু একটা ঘটার বিষয় তাঁর নজরে এলেও তিনি কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষ প্রার্থনাসভার আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন না। অথচ সবার আগে তিনিই কিন্তু গন্ধটা পেয়েছিলেন। শুক্রবার রাতে গন্ধটা তাঁর নাকে আসে। আচমকা কোনও এক বিচিত্র ভয়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর গা বমি করা একটা গন্ধ তাঁর নাকে এসেছিল। এটা কোনও দুঃস্বপ্ন নাকি ঘুম ভাঙানোর জন্যে শয়তানের নতুন মতলব তা অবিশ্যি তিনি বুঝতে পারেননি। চারপাশে একটু শোঁকাশুঁকি করে বিছানায় উপুড় হয়ে তিনি ভাবলেন যে এ ব্যাপারে একটা বিশেষ প্রার্থনাসভার আয়োজনের দরকার হতে পারে। 'পঞ্চেন্দ্রিয়র কোনও একটি ছিদ্রপথে মানব হৃদয়ে শয়তানের অনুপ্রবেশ' জাতীয় একটা নাটকীয় নাম দিয়ে এই বিশেষ প্রার্থনাসভার আয়োজন করা যায় বলে তাঁর মনে হল।

পরের দিন সকালে প্রার্থনাসভার আগে গির্জার দরদালানে পায়চারি করার সময় তাঁর কানে এল মরা পাখিদের নিয়ে কারা যেন বলাবলি করছে। শয়তান কীভাবে নাসিকা দিয়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে পাপ কাজ করায়, তা নিয়ে যখন তিনি গভীর চিন্তামগ্ন, ঠিক সেই সময় কেউ বলল যে সারা সপ্তাহ ধরে জমে থাকা মরা পাখিদের দেহ থেকেই গন্ধটা আসছে। ফাদার তখন মনে মনে বাইবেলের

সাবধানবাণী, দুর্গন্ধ এবং পাখিদের মৃতদেহ নিয়ে একটা সরল সমীকরণ তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। পরের রবিবারের প্রার্থনাসভায় 'দান ও দাতব্য' প্রসঙ্গে একটা গুরুগম্ভীর ভাষণ দেওয়ার বাসনা তাঁর মাথায় থাকলেও শয়তান এবং পঞ্চেন্দ্রিয়র সম্পর্ক সব কিছু এলোমেলো করে দিল।

ফাদারের চিন্তার মধ্যে তবুও পুরোনো অভিজ্ঞতাগুলো নিশ্চয়ই গোপনে নড়াচড়া করছিল। এটা তাঁর বরাবরের অভ্যেস। সত্তর বছর আগে যাজক হওয়ার শিক্ষানবিশ থাকার সময়ও এরকম হত। তাঁর নব্বই বছর পূর্তির সময়ও একই রকম ঘটনা ঘটে। তিনি তখন যাজক-শিক্ষণকেন্দ্রের ছাত্র। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়া এক ঝলমলে বিকেলে সফোক্লেসের মূল লেখা পড়তে পড়তে আচমকা জানালা দিয়ে ক্লান্ত-সিক্ত-শ্রান্ত মাঠের দিকে নজর গেল। ঠিক তখনই গ্রিক নাটকের প্রসঙ্গ বেমালুম ভুলে গেলেন। তবুও অবচেতন মনে উচ্চারিত হল গ্রিক নাটক সম্বন্ধে তাঁর মার্কামারা বিশেষণ,—'প্রাচীনদের মধ্যে প্রাজ্ঞ।' তিরিশ-চল্লিশ বছর পরের এক বৃষ্টিহীন বিকেলে পাথরে ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থল পেরোনোর সময় কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই তিনি সফোক্লেসের রচনা থেকে একটি অনুচ্ছেদ আবৃত্তি করছিলেন। নিজের, একান্তভাবেই তাঁর নিজের তৈরি মার্কামারা বিশেষণ,—'প্রাচীনদের মধ্যে প্রাজ্ঞ' প্রসঙ্গে সেই একই সপ্তাহে তিনি জনৈক জনপ্রতিনিধির সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন।

নিজের ঢাক নিজে পেটাতে ব্যস্ত সেই বৃদ্ধ জনপ্রতিনিধিটি বড্ড বেশি বকবক করতেন। তা ছাড়াও নানান জটিল ধাঁধা সেই জনপ্রতিনিধিটির ভীষণ প্রিয়। ধাঁধাগুলিকে তিনি নিজের আবিষ্কার বলে চালাতেন। পরে অবিশ্যি সেগুলি খবরের কাগজের 'ক্রসওয়ার্ড' বা 'শব্দধাঁধা' নামে জনপ্রিয় হয়।

বৃদ্ধ জনপ্রতিনিধির সঙ্গে সেই দীর্ঘমেয়াদি আলোচনার ধাক্কায় তিনি চিরায়ত গ্রিক সাহিত্য থেকে মুক্তি পান। সে বছরই বড়দিনের সময় ফাদার একটা চিঠি পেলেন। তবে, সেই সুদীর্ঘ আলোচনার সুবাদে বোধ হয় সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়নি। হয়তো অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ, বাইবেলের বিচিত্র ভাষ্যকার এবং প্রার্থনাসভায় বিচার-বুদ্ধিহীন আচরণের জন্যে ততদিনে যথেষ্ট নাম-ডাক হওয়ার জন্যেই তাঁকে শহরের প্রধান যাজক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল।

ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল ১৮৮৫-র যুদ্ধের অনেক আগেই এই শহরে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিলেন। শোবার ঘরে পাখিদের মৃত্যুর সময় শয়তানের মুখোমুখি হওয়ার কাহিনি শোনানোর পর তাঁর জায়গায় একজন অল্পবয়সীকে নতুন যাজককে দায়িত্ব দেওয়ার দাবি ওঠে। চশমা ছাড়াই নিয়মিত প্রার্থনা-পুস্তক গড়গড়িয়ে পড়তে পারা সত্ত্বেও তখন থেকেই তাঁকে যে আর পাত্তা দেওয়া হচ্ছিল না, তা তিনি খেয়াল করেননি।

বরাবরই তিনি সংযমী। উল্লেখ করার মতো নয়, এমন বহু ছোটখাটো ঘটনার কথা বলা যায়। তবে শান্ত-সুস্থির অথচ বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরের আলোচনা বা প্রার্থনায় সবাই মুগ্ধ। দিবানিদ্রা পর্যন্ত একটা টুইলের পাজামা পরে তিনি শোবার ঘরেই কাটান। পাজামাটা আবার গোড়ালির কাছে শক্ত করে বাঁধা।

নিয়মিত প্রার্থনা পরিচালনা ছাড়া ফাদার আর কিছুই করেন না। গির্জার স্বীকারোক্তির বেদিতে তিনি সপ্তাহে দু'দিন বসেন। যদিও স্বীকারোক্তির জন্য বহুদিন ধরেই কেউ আর আসে না। আধুনিক আদব-কায়দা রপ্ত করার জন্যেই মানুষ ধর্মে আস্থা হারাচ্ছে বলে তাঁর ধারণা। সেই কারণে, তিন তিনবার শয়তানের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টা সবার নজরে আনার জন্যে এই সময়টাকেই আদর্শ বলে মনে করলেন তিনি। তবে তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে কেউ তাঁর কথায় পাত্তা দিচ্ছে না আর তাঁর বাচনভঙ্গিও খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিজেকে মৃত হিসেবে আবিষ্কার করা নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা ; শুধু মাত্র গত পাচ বছরে নয়, প্রথম দুটো মৃত পাখিকে দেখার সময়েও এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। স্টেশনের বেঞ্চিতে পড়ে থাকা তৃতীয় মৃত পাখিটাকে দেখার পর তিনি যেন আবার বাস্তবে ফিরে এলেন।

গির্জা থেকে মাত্র কয়েক পা দূরের একটা ছোট্ট বাড়িতে ফাদারের বসবাস। রাস্তার দিকে একটা বারান্দা আর দুটো ঘরের এই বাড়িটায় পর্দার কোনও বালাই নেই। ঘর দুটোর একটায় তাঁর দপ্তর আর

অন্যটা শোবার ঘর। তাঁর ধারণা যখন খুব গরম থাকে না তখনই চরম পার্থিব সুখ সংগ্রহ সম্ভব। অবাস্তব বা কল্পনার পথ পরিক্রমায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ। সকালে শোবার ঘরে আধখোলা দরজার দিকে চোখ বন্ধ করে বসে থাকার সময় তাঁর মধ্যে একটা শিহরন খেলে যায়। তিনি বুঝতে পারতেন না যে তাঁর চিন্তাগুলো ক্রমশ অবোধ্য হয়ে পড়ছে। অন্তত গত তিন বছর ধরে ধ্যান করার মুহূর্তগুলোয় তিনি আর অন্য কিছুই ভাবতেন না।

ঠিক বেলা বারোটায় রোজকারমতো সেই ছেলেটি খোপ কাটা থালায় দুপুরের খাবার নিয়ে হাজির। ভাত, কলা ভাজা, মুসুরির ডাল, ভুট্টার তরকারি, পেঁয়াজ ছাড়া মাংস আর শাপলার লতিতে মাংসের হাড় মিশিয়ে তৈরি একটা ক্বাথ,—মধ্যাহ্নভোজের এমন আয়োজন ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলের কাছে একেবারে নতুন।

খাবারের থালাটা চেয়ারের পাশে রাখার সময় ছেলেটা দেখল,—ফাদারের চোখ বন্ধ। বারান্দা থেকে ছেলেটার চলে যাওয়ার আওয়াজ কানে না আসা পর্যন্ত তিনি চোখ খুললেন না। ফলে সারা শহরে রটে গেল যে মধ্যাহ্নভোজের আগেই ফাদার দিবানিদ্রায় ব্যস্ত। অথচ বাস্তবে তিনি সাধারণত রাতেও ঘুমোন না।

ফাদারের অভ্যাসগুলো ক্রমশ জটিলতা মুক্ত হয়ে প্রায় আদিম এক সারল্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। ক্যানভাসের চেয়ারে গা এলিয়ে রেখেই মধ্যাহ্নভোজ সারলেন। খাবারের বাটি, ছুরি, কাঁটা এমনকী থালাটাও প্রায় না ছুঁয়েই তিনি শুধু চামচ দিয়েই খাওয়া শেষ করলেন। খাওয়ার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে মাথায় খানিকটা জল ছিটিয়ে, তিনি রওনা দিলেন স্টেশনের দিকে। পুরো শহর তখন দিবানিদ্রায় বিভোর। শেষবার শয়তানের মুখোমুখি হওয়ার সময় যে শ্লোকটা রচনা করেছিলেন, বাড়ি থেকে স্টেশন পর্যন্ত সারাটা পথ বিড়বিড় করে সেটাই বারেবারে উচ্চারণ করতে থাকলেন।

পাখিদের মৃত্যু শুরু হওয়ার ঠিক ন'দিন পরের এক শনিবারে স্টেশনে যাওয়ার সময় রেবেকাদের বাড়ির একেবারে সামনে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলের পায়ের উপর একটা মুমূর্ষু পাখি লুটিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় একটা অদ্ভুত চিন্তা খেলে গেল। তিনি ভাবলেন,—পাখিটাকে বাঁচানো যেতে পারে। পাখিটাকে হাতে নিয়ে তিনি রেবেকার বাড়ির কড়া নাড়লেন। রেবেকা তখন বেশভূষা আলগা করে দিবানিদ্রার বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত।

শোবার ঘর থেকেই কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনে রেবেকা পর্দার দিকে তাকালেন। গত দু'দিনে শোবার ঘরে একটাও পাখি আসেনি। পর্দাগুলো অবিশ্যি এখনও ছেঁড়া। পাখিদের আক্রমণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পর্দা সারানো মানে গাদাগুচ্ছেব বাজে খরচ,—রেবেকার অন্তত তাই ধারণা। বনবন করে ঘুরতে থাকা পাখার আওয়াজের মধ্যে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে রেবেকার মনে পড়ল যে বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরে আরখেনিদা ঘুমোচ্ছে। অতএব, সদরের কড়া নাড়ার শব্দ নিশ্চয়ই ওর কানে পৌঁছোবে না। এমন অসময়ে কে তাঁর খোঁজ করতে পারে ভেবে রেবেকা একটু আশ্চর্য হলেন। জামাকাপড় আবার ঠিকঠাক করে, টানটান শরীরে লম্বা লম্বা পা ফেলে বসার ঘরটা পেরিয়ে সদরে উঁকি মারতেই ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলকে দেখতে পেলেন রেবেকা। হাতের পাখিটার দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে আছেন ফাদার। রেবেকা দরজাটা খোলার আগেই তিনি বললেন,—'একটু জল দিলে পাখিটা বেঁচে যেতে পারে।' দরজাটা খুলতে খুলতে রেবেকার মনে হল,—ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ফাদার কিন্তু মিনিট পাঁচেকের বেশি থাকলেন না। ফাদারের এত ক্ষণস্থায়ী উপস্থিতির জন্যে রেবেকা নিজেকেই মনে মনে দুষলেন। অথচ বাস্তবে কিন্তু ফাদার নিজেই এ বাড়িতে বেশি সময় থাকা পছন্দ করেন না। ঠিকমতো খেয়াল করলে রেবেকার নিশ্চয়ই মনে পড়ত যে গত তিরিশ বছরে এই শহরের যাজক তাঁদের বাড়িতে পাঁচ মিনিটের বেশি কখনও থাকেননি। প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ বসার ঘরে লাস্যময়ী গৃহকর্ত্রীর উপস্থিতিই হয়তো এমন অনীহার মূল কারণ। যদিও সবাই জানে রেবেকা তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। কথিত আছে রেবেকার জ্ঞাতিভাই কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া। পরিবার-পরিজনের স্নেহ-ভালোবাসা না পাওয়া কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া সেই সুবাদে ফাদারেরও আত্মীয়। এদিকে

এই বিশাল প্রাসাদোপম বাড়িটা নাকি আদতে গির্জারই সম্পত্তি। কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া নাকি হলফ করে রেবেকাকে বলেছিলেন যে গির্জার যাজক ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল এই শতাব্দীতে এ শহরে আসেননি। এত সব পাঁচমিশেলি কানাঘুসো বা ইতিহাস এড়িয়ে থাকার জন্যেই নাকি ফাদার এ বাড়িতে এসে এতটুকু স্বস্তি পান না। তার ওপর এ বাড়ির একমাত্র বাসিন্দা মানে রেবেকার, ধর্মে কোনও আস্থা নেই। মেরেকেটে বছরে একবার রেবেকা পাপস্খালনের স্বীকারোক্তি করেন। আর যতবারই তাঁর স্বামীর ধোঁয়াশায় ভরা মৃত্যু নিয়ে ফাদার রেবেকাকে চেপে ধরার চেষ্টা করেন, রেবেকা বিচিত্র কৌশলে বিষয়টা এড়িয়ে যান। সেই জন্যেই মরণাপন্ন পাখিটার জন্যে জল নিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা ফাদারের কাছে নিতান্তই বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়াল। বিশেষত যে অবস্থার জন্যে তিনি আদৌ দায়ী নন তার জন্যে এমন প্রতীক্ষা, এক অর্থে নেহাতই কাকতালীয়।

বসার ঘরের কারুকার্য করা বিলাসবহুল কাঠের সোফাটায় বসে ফাদার এক অদ্ভুত হিমশীতল আর্দ্রতা অনুভব করলেন। কুড়ি বছর আগে কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার জ্ঞাতি হোসে আরকাদিও বুয়েন্দিয়া আচমকা পিস্তলের গুলিতে ছটফটিয়ে মারা যাওয়ার পর ফাদার এ বাড়িতে কোনওদিন এমন শান্তি বিরাজ করতে দেখেননি। ঘটনাচক্রে হোসে আরকাদিও বুয়েন্দিয়া আবার তাঁর স্ত্রীর জ্ঞাতি।

জল নিয়ে ফিরে আসার পর উদাসভাবে বসে থাকা ফাদারকে দেখে রেবেকা যারপরনাই বিরক্ত হলেন। ফাদার কিন্তু পরম নিশ্চিন্তির সঙ্গে উচ্চারণ করলেন,—'ঈশ্বরের কাছে একটা প্রাণীর জীবন কিন্তু মানুষের প্রাণের মতোই মূল্যবান।'

হোসে আরকাদিও বুয়েন্দিয়াকে স্মরণ না করেই ফাদার কথাটা বললেন। ঠিক এই মুহূর্তে রেবেকারও হোসেকে মনে পড়ল না। শয়তানের সঙ্গে বার তিনেক মুখোমুখি হওয়ার কাহিনি প্রার্থনার সময় শোনানোর পর থেকে ফাদারের কথায় আর গুরুত্ব দেন না রেবেকা। ফাদারের দিকে নজর না দিয়ে রেবেকা পাখিটাকে জলের গেলাসের ভেতর একবার চুবিয়েই তুলে নিলেন। জলে ভেজা পাখিটাকে ঝাঁকালেন। পুরো ঘটনাটার মধ্যে অধর্মের হদিশ পেলেন ফাদার। প্রাণীদের জীবন সম্পর্কে সাবধানতার অভাব রেবেকার আচরণে চোখে পড়ল। বলিষ্ঠ উচ্চারণে, কিন্তু কোমল স্বরে ফাদার বললেন,—'আপনি পাখিদের পছন্দ করেন না।'

কোঁচকানো ভুরুজোড়াই বিধবা মহিলার বিরক্তি ও ধৈর্যহীনতাকে ফুটিয়ে তুলল। তাঁরও জোরালো মন্তব্য,—'এক সময় পছন্দ করলেও, এখন নয়। বাড়ির ভেতর ঢুকে মরতে শুরু করার পর থেকে পাখিদের ওপর আমার ভীষণ ঘেন্না।'

ফাদারের কথায় প্রকাশিত হল অশান্ত মনোভাব,—'অনেকগুলো মরেছে।' কথা বলার কায়দায় যেন একটা চালাকির ছোঁয়া।

এর পরেও রেবেকার মন্তব্য,—'সবগুলো।' অত্যন্ত বিরক্তি নিয়ে পাখিটাকে একটা পিরিচের তলায় চেপে ধরে তিনি আরও বললেন,—'পর্দাগুলো না ছিঁড়লে বিষয়টাকে আমি পাত্তাই দিতাম না।'

ফাদার বোধ হয় কখনও এমন অনমনীয় হৃদয়ের সম্মুখীন হননি। পর মুহূর্তেই পাখিটার প্রতিরোধহীন ছোট্ট দেহটাকে হাতে তুলে নিয়ে ফাদার বুঝলেন যে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। সব কিছু,—এ বাড়ির হিমশীতল আর্দ্রতা, লাস্যময়ী গৃহকর্ত্রী, হোসে আরকাদিও বুয়েন্দিয়ার দেহের বারুদের অসহ্য গন্ধ,—এক কথায় সবই তিনি ভুলে গেলেন। সপ্তাহের শুরু থেকে ঘিরে থাকা সেই অতিকায় সত্যকে তিনি উপলব্ধি করলেন। ফাদারের দৃষ্টিতে রেবেকা প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারির পরিচয় পেলেন। মরা পাখিটাকে হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় ফাদারের মনে হল যেন সারা শহর জুড়েই মরা পাখিদের বৃষ্টি পড়ছে। তিনি আরও বুঝতে পারলেন ঈশ্বরের মন্ত্রী কেন গরমের দিনগুলোকে সুখের সময় হিসেবে বেছে নেননি। আর সেই মুহূর্তে তিনি বাইবেলের শেষ পরিচ্ছেদ মানে 'অ্যাপোকালিপ্স' অধ্যায়টিও ভুলে গেলেন।

অন্য দিনের মতো আজও ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল একই সময় স্টেশনে উপস্থিত। তবে আজ স্টেশনে কেন এসেছেন,—তা তাঁর জানা নেই। ভাসাভাসাভাবে তিনি বুঝতে পারছেন যে পৃথিবীতে কিছু

একটা হচ্ছে। হতবুদ্ধি হয়ে তাঁব কথা হারিয়ে গেল। স্টেশনের বেঞ্চিতে বসে 'অ্যাপোকালিপ্স' অধ্যায়ে বর্ণিত পূর্বাভাস প্রসঙ্গে মৃত পাখিদেব সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে কি না মনে করার চেষ্টা করলেন। তবে কিছুই মনে পড়ল না। হঠাৎ তাঁর মনে হল রেবেকার বাড়িতে সময় নষ্ট না করলে ট্রেনটা পেয়ে যেতেন। বেঞ্চি থেকে উঠে টিকিট ঘরের ধুলোয় ঢাকা ভাঙা কাচটার ভেতর দিয়ে অতি কষ্টে নজর করলেন যে তখনও একটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। বেঞ্চিটায় আবার ফিরে আসার পর তাঁর কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে এল। সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হল,—আজ শনিবার। পরনের জোব্বার পকেট থেকে তালপাতার হাতপাখাটা বের করে হাওয়া খেতে লাগলেন। বড্ড গরম। খুলে ফেললেন জোব্বাটার বোতামগুলো জুতোর ফিতে খুলে একটু আলগা করলেন পা দুটোকে। আর ঠিক তক্ষুনি তাঁর মনে হল জীবনে কখনও এত গরম লাগেনি।

বেঞ্চিতে বসে বসেই প্রথমে জোব্বার কলারটা খুলে ফেললেন। রুমাল বের করে হাত-মুখ মুছতে মুছতে ভাবলেন ফাদার,—হয়তো ভূমিকম্প হবে। কোথায় যেন তিনি এরকম কিছু একটা পড়েছেন। ঝকঝকে ও স্বচ্ছ নীল আকাশ থেকে পাখিগুলো যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে। আকাশের রং আর স্বচ্ছতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি এই মুহূর্তে মরা পাখিদের কথা একেবারে ভুলেই গেলেন। এবার তাঁর মনে হল একটা ঝড় উঠতে পারে। আকাশের ঝলমলে ভাব আর নির্মলতা দেখে ফাদারের মনে হল অন্য শহরের থেকে এখানকার আকাশটা নিশ্চয়ই একটু অন্য রকম। অন্য কোনও জায়গায় তাঁর এত গরম না লাগলেও এখানকার আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন অন্য কারও চোখ দিয়ে তিনি এমন সৌন্দর্য দেখছেন। তার পরেই রেললাইনের ওপারের বাড়িগুলোর তালপাতা আর মরচে পড়া টিনের চালার মধ্যে দিয়ে উত্তরের আকাশের দিকে তাকাতেই ফাদার দেখতে পেলেন,—ভীষণ আস্তে আস্তে, শান্তভাবে শকুনগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে।

কোনও এক রবিবারের প্রার্থনার শেষে কতগুলো ছোটখাট নির্দেশ জ্ঞাপনের পরে নিজেকে যেমন হালকা লেগেছিল কোনও এক অজ্ঞাত কারণে আজও তাঁর নিজেকে সেই রকম মুক্ত মনে হল। গির্জার অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে তখন তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিশেষত রবিবারে বই পড়তেন। হলদে হয়ে যাওয়া বইয়ের পাতা থেকে ছড়িয়ে পড়া পুরোনো কাঠের গন্ধ আর লাতিন ভাষার ছন্দ তাঁকে মুগ্ধ করে রাখত। কোনও এক রবিবারে সারাটা দিন পড়াশোনা করার পর যখন তিনি একেবারে ক্লান্ত, ঠিক সেই সময় অধ্যক্ষ হঠাৎই সেখানে উপস্থিত। যে বইটা তখন তিনি পড়ছিলেন তার থেকে পড়ে যাওয়া একটা কার্ড অধ্যক্ষ খুব তাড়াতাড়ি মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলেন। কার্ডটা হাতে নিয়ে অধ্যক্ষ নির্লিপ্ত থাকলেও ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল কিন্তু এক লহমায় কার্ডের বিষয়বস্তু পড়ে নিয়েছিলেন। লালচে বেগুনি রঙের কালিতে মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে লেখা একটি বাক্য,—'আজ রাতে মারা গেছেন শ্রীমতী ইভেন্তে'। অর্ধেক শতাব্দীর বেশি পেরিয়ে যাওয়ার পরে কোনও এক অজানা শহরের ওপর উড়তে থাকা শকুনদের দেখে ফাদারের মনে হল অধ্যক্ষ তাঁর সামনে গম্ভীরভাবে বসে আছেন। আলো-আঁধারির প্রেক্ষাপটে অধ্যক্ষের মুখটাকে যেন লালচে আভা মেশানো বেগুনি রঙের দেখাচ্ছে আর ফাদারের শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত চলাচল করতে শুরু করে দিল।

ঘটনাটা তাঁকে এতই বিচলিত করল যে তাঁর আর গরম লাগছে না। বরং একটা তুষারশীতল স্রোত যেন তাঁর শরীরে বয়ে যাচ্ছে। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। কাদায় শয়তানের খুর আটকে যাওয়া থেকে শুরু করে মৃত পাখিদের বৃষ্টি পর্যন্ত অনেক কিছু নিয়ে চিন্তা করতে করতে বমি পেয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত তিনি, মানে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল নির্লিপ্তই থেকে গেলেন। তার পর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হাতটাকে সামনের দিকে তুলে ধরে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আর্ত চিৎকার করে উঠলেন।

ঠিক সেই সময়েই শোনা গেল ট্রেনের বাঁশির আওয়াজ। অথচ বহু, ব-হু বছরে মধ্যে এই প্রথম তিনি সেই আওয়াজটা শুনতে পেলেন না। একরাশ ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে আর ক্রমাগত ছাই ছিটোতে ছিটোতে ক্লান্ত একটা ইঞ্জিন ট্রেনটাকে স্টেশনে টেনে আনছিল। তবে এটা যেন তাঁর কাছে অনেক দূরের

এক অস্পষ্ট স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নটা তিনি অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। বিকেল চারটের একটু পরে যখন ভালো করে তাঁর ঘুম ভাঙল তখন মনে মনে রবিবারের প্রার্থনার খসড়া ছকা হয়ে গেছে। জনৈকা মহিলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অন্তিম ক্রিয়াকর্মাদি সম্পন্ন করার জন্যে সেদিনই আট ঘণ্টা বাদে তাঁর ডাক পড়ল।

ফলে সেদিন ট্রেনে করে কে শহরে এল তা ফাদারের জানা হল না। বেশ কয়েক বছর ধরে জীর্ণ ও বিবর্ণ চার কামরার এই ট্রেনটার নিয়মিত যাতায়াত দেখতে তিনি অভ্যস্ত। তবে ট্রেনটা থেকে গত কয়েক বছরে কে বা কারা নেমেছেন তা তাঁর পক্ষে মনে করা সম্ভব নয়। আগে পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। একশো চল্লিশটা কামরায় কলা বোঝাই হয়ে ট্রেনটা রওনা দিত। একেবারে শেষ কামরায় ঝোলানো সবুজ আলোর লণ্ঠনটা স্টেশন পেরোতে পেরোতে সন্ধ্যা নেমে আসত। তখন রেললাইনের অন্য পারে আলোকোজ্জ্বল শহরটাকে দেখতে পেতেন। সন্ধেবেলার শান্ত শহরকে দেখে তাঁর মনে হত ট্রেনটার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে তিনিও যেন ট্রেনটার সঙ্গেই অন্য কোনও শহরে পৌঁছে গেছেন। হয়তো তখন থেকেই রোজ স্টেশনে আসার অভ্যাসটা গড়ে উঠেছে। এমনকী যেদিন কলা-বাগিচায় শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা করা হল বা তার পরে কলা পাঠানো বন্ধ হয়ে গেল কিংবা তারও পরে ধূসর-বিবর্ণ চার কামরার যাত্রীবিহীন ট্রেনটা আসা-যাওয়া শুরু করল তখনও বজায় রইল সেই একই নিয়ম।

তবে সেই শনিবারে কেউ এসেছিল। ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল স্টেশন ছেড়ে চলে যাওয়ার পবে ট্রেনের চতুর্থ অর্থাৎ একেবারে শেষ কামরাটা থেকে সাদামাটা চেহাবার একটা শান্তশিষ্ট ছেলে নেমে এল। ট্রেনের জানালা থেকে ফাদারকে দেখতে পেয়ে ক্ষুধায় ক্লান্ত ছেলেটি আন্দাজ করল,—যে শহরে যাজক আছে সেখানে নিশ্চয়ই হোটেল আছে। ছেলেটির আরও মনে পড়ল যে আগের দিন থেকেই কিছু খাওয়া হয়নি। ট্রেন থেকে নেমেই ও রাস্তাটা পার হয়ে একটা বাড়ির ছায়াঘেরা আঙিনায় ঢুকে পড়ল। অগস্ট মাসের গরমে রাস্তায় যেন ফোসকা পড়েছে। গন্ধ চেনাব ওর সহজাত ক্ষমতাটা যেন দু'দিনের ক্ষিধেতে আরও চাগিয়ে উঠেছে। গন্ধটাই ওকে বুঝিয়ে দিল যে ওটা একটা হোটেল। 'হোটেল মাকোন্দো' লেখা সাইনবোর্ডটাকে খেয়াল না করেই ও সরাসরি ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতরে তখন গ্রামোফোন বাজছিল।

হোটেল-কর্ত্রীর গায়ের রং সর্ষের মতো এবং তিনি মাস পাঁচেকের অন্তঃসত্ত্বা। লোকে বলে যে তিনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন তাঁব মাকেও নাকি ঠিক এরকমই দেখাত। ছেলেটি বলল,—'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমায় কিছু খেতে দিন।' তিনি অবিশ্যি কোনও তাড়াহুড়ো না কবেই এক বাটি স্যুপ পরিবেশন করলেন। স্যুপের মধ্যে মাংসের হাড় ছাডাও কাঁচকলার টুকরো মেশানো। ঠিক সেই সময়ে শোনা গেল ট্রেনের বাঁশির আওয়াজ। গরম অথচ স্বাস্থ্যকর স্যুপ গলায় চালান করতে করতে ছেলেটা মনে মনে হিসেব কষতে থাকল হোটেল ও স্টেশনের দূরত্ব। আর ট্রেন ধরতে না পাবার আশংকা সেই মুহূর্তে ওকে গ্রাস করল।

ও দৌড়োনোর চেষ্টা করল। দরজা পর্যন্ত পৌঁছেই ও বুঝে গেল ট্রেনটা ধবা সম্ভব নয়। খাবার টেবিলে ফিবে আসতে আসতে ও কিন্তু ক্ষিধের কথা বেমালুম ভুলে গেল। ওর নজরে এল,—একটি মেয়ে গ্রামোফোনের পাশে বসে ওর দিকে করুণভাবে তাকিয়ে আছে আর তার পাশে ভয়ংকর চেহারার একটা কুকুর লেজ নাড়াচ্ছে। সারাদিনেব মধ্যে এই প্রথম ও মাথার টুপিটা খুলল। মাস দুয়েক আগে ওর মা এটা দিয়েছেন। টুপিটা দুই হাঁটুব মাঝখানে চেপে ধরে ও খাওয়ায় মন দিল। খাওয়া শেষ করে টেবিল ছেড়ে ওঠার পর ওকে কিন্তু ট্রেন ধরতে না পারার জন্যে উদ্বিগ্ন দেখাল না। অথবা নাম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর এমন একটা শহরে সপ্তাহ-শেষের দিনগুলো কীভাবে কাটাবে তা নিয়েও ওর যেন কোনও চিন্তা নেই। ঘরটার এক কোনায় একটা চেয়ারে পিঠটা টান টান করে ও চুপ করে বসে রইল। হঠাৎ মেয়েটি বলল,—'বারান্দাটা কিন্তু অনেক ঠান্ডা।'

ছেলেটা অসুস্থ বোধ করল। অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ জমানোর এটা একটা কায়দা। লোকের মুখের দিকে তাকাতে ও ভয় পায়। কিন্তু কথা বলা ছাড়া অন্য কোনও উপায় না থাকায় ও ভীষণ সংক্ষিপ্তভাবে বলল,—'ঠিকই তো।' এতেই ওর মধ্যে একটু কাঁপুনি দেখা গেল। দোলচেয়ার না

হওয়া সত্ত্বেও ও চেয়ারটাকে দোলানোর চেষ্টা করল।

'বারান্দাটি বেশ ঠান্ডা বলে এখানে যারা আসে তারা চেয়ারটাকে বারান্দায় টেনে নিয়ে গিয়ে বসে',—মেয়েটি আবারও বলল। আর ছেলেটা ভাবল,—মেয়েটি কথা বলার জন্যে মুখিয়ে আছে। মেয়েটিকে গ্রামোফোনটা গুটিয়ে ফেলতে দেখে ও একবার ভয়ে ভয়ে সেদিকে তাকাল। তাকে দেখে ছেলেটার মনে হল,—সে যেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ওখানে বসে আছে ; যেন একটুও নড়াচড়ার ইচ্ছে নেই তার। মেয়েটি গ্রামোফোনটা গুটিয়ে ফেললেও তার নজর কিন্তু ছেলেটির দিকে। মেয়েটি হাসছে।

একটু স্বস্তি পেতে আর নিজেকে সাবলীল করে তোলার জন্যে ছেলেটা বলল,—'ধন্যবাদ।' মেয়েটি কিন্তু ওর ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই বলল,—'সবাই দেওয়ালের পেরেকে টুপি টাঙিয়ে রাখে।'

ওর কান এখন রীতিমতো জ্বালা করছে। যেভাবে মেয়েটি উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে তাতে ওর ভেতরে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। চূড়ান্ত অস্বস্তির মধ্যে ধরতে না পারা ট্রেনটার জন্যে ওর আবার মন কেমন করে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে হোটেল-কর্ত্রী ঘরে প্রবেশ করে প্রশ্ন করলেন,—'তুমি কী করছ?'

মেয়েটি উত্তর দিল,—'আর সকলের মতো ও চেয়ারটাকে বারান্দায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে।' ছেলেটা ভাবল যে কথাগুলোর মধ্যে ওকে ব্যঙ্গ করার একটা চেষ্টা আছে।

হোটেল-কর্ত্রী বললেন,—'ঠিক আছে। আমি একটা টুল এনে দিচ্ছি।'

মেয়েটি হাসতে থাকল আর অস্থির হয়ে পড়ল ছেলেটা। বড্ড গরম। বিরামহীন গরমে ও তখন দরদরিয়ে ঘামছে। হোটেল-কর্ত্রী চামড়ার গদি লাগানো একটা টুল জোগাড় করে বারান্দায় রাখলেন। ছেলেটা তাঁকে অনুসরণ করে বারান্দায় যেতে যেতে মেয়েটির কথা শুনতে পেল,—'ওখানে কিন্তু পাখিরা ওকে ভয় দেখাবে।'

হোটেল-কর্ত্রী কটমটিয়ে মেয়েটির দিকে তাকালেন। বিষয়টা ওর নজর এড়াল না। তড়িৎগতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। হোটেল-কর্ত্রী ওর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে মেয়েটিকে বললেন,—'তোমার একটু চুপ করে থাকা উচিত।' তখন যেন নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে কথা বলার একটা কারণ ও খুঁজে পেল।

ছেলেটি হোটেল-কর্ত্রীকে প্রশ্ন করল,—'ও কী বলছিল?'

মেয়েটিই জবাব দিল,—'সারা দিনের মধ্যে এই সময়টাতেই বারান্দায় মরা পাখিরা ঝরে পড়ে।'

হোটেল-কর্ত্রী আশ্বাস দেন,—'এটা ওর ধারণা।' সামান্য ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ঘরের মাঝখানে টেবিলের ওপর রাখা নকল ফুলের স্তবকটাকে তিনি আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

মেয়েটি বলল,—'আমার ধারণা! মোটেই নয়। পরশু দিনও ঝাঁট দেওয়ার সময় তুমি দুটো মরা পাখি ফেলেছ।'

হোটেল-কর্ত্রীর চোখে রীতিমতো জ্বলন্ত রোষাগ্নি। মেয়েটির কাতর অভিব্যক্তি যেন বোঝাতে চাইছে যে সম্পূর্ণ সন্দেহ দূর না হওয়া পর্যন্ত সে কথা বলেই যাবে।

'আসলে কী হয়েছিল জানেন তো, পরশুদিন ছেলেরা ওঁকে রাগাবার জন্যে দুটো মরা পাখি হলঘরে ফেলে রেখে বলে যে আকাশ থেকে নাকি ওগুলো ঝরে পড়েছে। আর উনি তো লোকে যা বলে তাই বিশ্বাস করেন',—একটানে এতগুলো কথা বলার পর মেয়েটি থামে। ছেলেটা হাসল। এমন চমৎকার ব্যাখ্যায় ও বেশ মজা পেয়েছে। মেয়েটি তখনও ওর দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। গ্রামোফোনটা অনেকক্ষণ ধরেই বন্ধ। রাগে গরগর করতে করতে হোটেল-কর্ত্রী পাশের ঘরে চলে গেলেন। মেয়েটি কিন্তু তখনও ওকে নিচু গলায় বলে চলেছে,—'আমি নিজের চোখে ওগুলোকে আকাশ থেকে ঝরে পড়তে দেখেছি। সত্যি, সব্বাই দেখেছে।'

গ্রামোফোনের প্রতি মেয়েটির আকর্ষণ এবং হোটেল-কর্ত্রীর বিতৃষ্ণা আন্দাজ করতে পেরে ছেলেটা হলঘরের দিকে যেতে যেতে সহানুভূতি মেশানো গলায় বলল,—'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি।'

আলামন্দ গাছের ছায়া থাকায় বাইরে গরম একটু কম। ছেলেটা টুলটাকে দু' হাতে করে মাথার ওপর তুলে ধরে দরজার বাইরে নিয়ে যেতে যেতে ভাবল,—গরমের হাত থেকে বাঁচার আশায় সারাটা দিন চেয়ারে বসে আলসেমি করে কাটিয়ে এখন নিশ্চয়ই মা ঝাঁটা হাতে মুরগিগুলোকে তাড়া করে চলেছেন।

এই প্রথম ওর খেয়াল হল,—এখানে মা কোথায়। শুধু বাড়ির বাইরে নয়, বাড়ি থেকে ও যে অনেক দূরে রয়েছে, সেটাও এবার ওর মনে পড়ে গেল।

জীবনটা বেশ সহজ-সরল সুরে বাঁধা,—অন্তত দিন সাতেক আগেও ও নিজের সম্পর্কে এ রকম কিছু ভাবতে পারত। গৃহযুদ্ধের সময় বর্ষণসিক্ত এক জুন মাসের সকালে মাটির তৈরি একটা স্কুলবাড়িতে ওর জন্ম হওয়ার পর থেকে গত জুনে বাইশতম জন্মদিনে মায়ের কাছ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা পাওয়া পর্যন্ত এমনটাই হয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে ও নিজের স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণ করত। ব্ল্যাকবোর্ডে টাঙানো দেশের মানচিত্রটা যেন ওর চোখের সামনে ভাসত। ওদের ওখানে গরম এত তীব্র নয়। শান্ত-সবুজ-উদ্বেগবিহীন একটা চরম নিশ্চিন্তির শহর। মুরগিগুলো লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে দৌড়তে দৌড়তে স্কুলবাড়িতে ঢুকে পড়ত। আসলে স্কুলের জল খাওয়ার বেসিনের নিচের ঠান্ডা জায়গাটা ডিম পাড়ার জন্যে ওদের খুব পছন্দ। ওর মা নিজের দুঃখের কথা কখনও মুখ ফুটে বলতে পারেন না। কফি বাগিচার ভেতর দিয়ে বয়ে আসা হাওয়ায় শরীরটা জুড়িয়ে নেওয়ার জন্যে তিনি সন্ধ্যাবেলায় বাইরের বারান্দায় বসে থাকেন। তখন তাঁর মনে হয়,—'মানাউরে হল পৃথিবীর সেরা শহর।' তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন,—'বড় হ', তখন বুঝবি।' তবে ও কিছুই বোঝেনি। পনেরো বছরেই শরীরটা বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ায় ও বড্ড জেদি আর অলস হয়ে পড়ে। দোলনায় এপাশ-ওপাশ করে দোল খেতে খেতেই কেটে গেল জীবনের প্রথম কুড়িটা বছর। তার কিছু আগে-পরে, গেঁটেবাতের জন্যে ওর মা আঠারো বছর ধরে করতে থাকা স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে মুরগি পালনের ব্যবসা শুরু করলেন। তখন থেকে টানা বারান্দা আর দুটো ঘরের এই বাড়িতে ওদের বসবাস।

মুরগিদের ঠিক মতো দেখভাল করাই এ ব্যবসার প্রাথমিক শর্ত। জুলাই মাসে ওর মা অবসর নেওয়ার সময় ভেবেছিলেন যে তাঁর ছেলে এ কাজটা সামলাতে পারবে। ব্যবসার দলিল দস্তাবেজ ও ভালোভাবেই গোছগাছ করে নিয়েছিল। এমনকী মায়ের বয়স সংক্রান্ত নথিটাও গির্জা থেকে ছেলেটিই ঠিক করিয়ে আনে। এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই নথিটা সময়মতো ঠিক করিয়ে না নিলে ওর মায়ের অবসর পেতে আরও মাস ছয়েক দেরি হয়ে যেত। বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ ওর হাতে এসে গেল মায়ের চাকরির অভিজ্ঞতার যাবতীয় বিবরণ সমেত চূড়ান্ত দলিল-দস্তাবেজ। তারপর ও চটপট জামা-প্যান্ট পালটিয়ে, দরকারি কাগজপত্র ঠিক করে গুছিয়ে নিয়ে, পকেটে মাত্র বারোটা পেসো গুঁজে রওনা দিল। চাকরি থেকে মায়ের অবসর নেওয়ার ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারলে সরকারের কাছ থেকে শুয়োর পালনের জন্যে ও কিছু অনুদান পেতে পারে।

ঘেমে নেয়ে হোটেলের বারান্দায় বসে ঝিমোবার সময়ও কিন্তু ওর চিন্তা-ভাবনা থেমে থাকেনি। ওর মনে হল পরের দিনই গোলমালটা মিটিয়ে ফেলা যাবে। তারপর শুধু রবিবারের জন্যে প্রতীক্ষা। রবিবার সকালে ট্রেনটা ফিরে এলেই ও ফিরে যেতে পারবে আর চিরতরে ভুলে যাবে এই শহরের এমন অসহনীয় গরমের কথা। চারটের একটু আগে ওর চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে এল। সেই অবস্থায় ওর মনে হল যে শখের দোলনাটা সঙ্গে করে নিয়ে এলে বড় ভালো হত। এই ভাবনাতেই ওর ঘুমটা ভেঙে গেল। আর তক্ষুনি ওর মনে পড়ল যে জামা-কাপড় সমেত কাগজপত্রগুলো ট্রেনের কামরায় পড়ে আছে। একটা মানসিক ঝাঁকুনিতে ওর ঘুমের ঘোর পুরোপুরি কেটে গেল আর ওর ভীষণ ভয় করতে লাগল। মায়ের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও হয়ে পড়ল রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত।

বারান্দা থেকে টুলটাকে খাওয়ার ঘরের দিকে টেনে আনার সময় ওর খেয়াল হল সন্ধে হয়ে গেছে। বিদ্যুতের আলোয় শহরটা ঝলমল করছে। বৈদ্যুতিক বাতি আগে কখনও না দেখায় হোটেলের টিমটিমে বাল্‌বগুলোর দিকেই ও হাঁ করে তাকিয়ে রহল। মনে পড়ে গেল, মায়ের কাছে কোনও এক সময় এমন বাতির কথা ও শুনেছিল। মাছির দাপট থেকে বাঁচার জন্যে ও টুলটাকে ক্রমশ খাওয়ার ঘরের দিকে টেনে আনছিল। ক্ষিধে না থাকলেও খেয়ে নিল। প্রচণ্ড গরম আর চরম একাকিত্বে বেচারি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। আসলে এর আগে তো কখনও ও নিঃসঙ্গতার শিকার হয়নি। ওর ঘুমোনোর ব্যবস্থা হল রাত ন'টার পরে।

ওর রাত কাটানোর বন্দোবস্ত হয়েছে বাড়ির পিছন দিকের একটা কাঠের ঘরে। ঘরটা খবরের কাগজ আর পত্র-পত্রিকায় ভর্তি। মাঝরাত নাগাদ বেচারি অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। আসলে ছেলেটি তখন জ্বরে বেহুঁশ, সঙ্গে বমি বমি ভাব। ওদিকে কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলের ঘরে সেই সময়ে সম্পূর্ণ এক অন্য চিত্র। খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল চিন্তা করছেন যে কাল সকালের প্রার্থনাসভার পরে যে ভাষণটা পড়ার কথা তা তো একটু আগে সেই মহিলার অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষ্যে পড়তে হল। কাল সকালে তাহলে কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে শুয়ে থাকলেন। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা একটা ছাতার পাখির ডাকে একেবারে উষালগ্নে তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করলেন। প্রথমে বিছানাতেই খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। শরীরে অসম্ভব যন্ত্রণা সত্ত্বেও মাথাটা তুলে আস্তে আস্তে মেঝেতে পা রাখলেন।

পাথরের মেঝেতে পায়ের ছোঁয়া লাগা মাত্রই যেন তাঁব চেতনা ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের ওজন আন্দাজ করতে পারলেন। দেহ-মন-বয়সের ওজন একই সঙ্গে আন্দাজ করতে করতে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল মেঝেতে শুয়ে পড়ে শঙ্কিত হয়ে ভাবলেন,—আর বোধ হয় কিছুই করা যাবে না।

কতক্ষণ যে মেঝেতে পড়েছিলেন তা ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলের মনে নেই। এমনকী সেই অবস্থায় শান্তিতে মারা যাওয়ার জন্যে ঈশ্বরের কাছে করুণা প্রার্থনা করেছেন কিনা তা-ও তিনি মনে করতে পারলেন না। বাস্তবিকই তিনি যেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে মারা গেছিলেন। তবে পুরোপুরি ধাতস্থ হওয়া মাত্র তাঁর মধ্যে থেকে ভয় ও যন্ত্রণা একেবারে উধাও হয়ে গেল। দরজার তলা দিয়ে একফালি ঝলমলে রোদ ঘরে ঢুকছে। বহু দূর থেকে মুরগিদের কোঁকোর কোঁ আওয়াজ ভেসে আসছে। এবং এখন পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে তিনি জীবিত ও প্রার্থনার প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সক্ষম।

ছিটকিনিটা খুলে দরজার বাইরে এসে দেখলেন চারদিক রোদে ভাসছে। ব্যথা তো বটেই, তাঁর মনে হল বয়সটাও যেন কমে গেছে। মুরগির দুর্গন্ধ চাবপাশের বদ্ধ হাওয়ায় পাক খাচ্ছে। প্রথমবার শ্বাস নেওয়া মাত্রই তাঁর মনে হল যা কিছু ভালো আর তার সঙ্গে সমস্ত রকমের পাপ এবং শহরের সব দুঃখ-কষ্ট তাঁর হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করেছে। একটু ধাতস্থ হয়ে নিজের একাকিত্বকে কিছুটা মানিয়ে নিয়ে ভোরের শান্ত পরিবেশে চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন,—একটা, দুটো নয়, তিন-তিনটে পাখি বারান্দায় মরে পড়ে আছে।

পাক্কা ন' মিনিট ধরে মৃতদেহগুলোর দিকে তিনি একটানা তাকিয়ে রইলেন। প্রার্থনাসভায় যে ভাষণটা দেওয়ার কথা তা নিয়েও একই সঙ্গে ভাবতে ভাবতে মনে হল পাখিদের এমন যৌথ মৃত্যুর জন্যে একটা প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। বারান্দার অন্য প্রান্তে রাখা কলসিটার সবুজ রঙের স্থির জলে একের পর এক পাখি তিনটের মৃতদেহকে কোনও কারণ ছাড়াই চুবিয়ে দিলেন। আগে তিনটে আর এখন তিনটে,—সব মিলিয়ে এক সপ্তাহে মোট আধ ডজন। হিসেবটা কষা মাত্রই তাঁর মাথার মধ্যে চড়াৎ করে যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। ফাদার বুঝতে পারলেন,—জীবনের সেরা দিনটা আরম্ভ হতে চলেছে।

সকাল সাতটাতেই রোদ ভয়ংকর চড়ে গেছে। হোটেলের একমাত্র যাত্রীটি প্রাতরাশের অপেক্ষায় বসে আছে। গ্রামোফোন চালানো মেয়েটি এখনও বোধ হয় ঘুম থেকে ওঠেনি। হোটেল-কর্ত্রী ছেলেটার খাবার-দাবার জোগাড় করছিলেন। ঠিক সেই সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজল। হোটেল-কর্ত্রীর মনে হল তাঁর ফোলা পেটের ভেতর থেকেই যেন আওয়াজটা আসছে।

'তা হলে ট্রেনটা ধরা হল না',—ছেলেটাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে হোটেল-কর্ত্রী ডিম ভাজা, কলা আর কফি দিয়ে প্রাতরাশ সাজিয়ে দিলেন।

খিদে পায়নি। তবুও ছেলেটা খাওয়ার চেষ্টা করল। গরম বাড়ছে বলে ওর ভয় করছে। এর মধ্যেই বেচারি ঘেমে নেয়ে একাকার। ঘুমটাও হয়নি ঠিকমতো। সামান্য জ্বরও আছে। এঁটো থালা-বাসনগুলো নিতে আসাব সময় হোটেল-কর্ত্রীব ঝলমলে পোশাক আর হাতে একগুচ্ছ ফুল দেখে ওর হঠাৎ মায়ের

কথা মনে পড়ল। ওর মনে পড়ে গেল,—আজ রবিবার। হোটেল-কর্ত্রীকে ও প্রশ্ন করল,—'আজ কি প্রার্থনা হবে?'

হোটেল-কর্ত্রী জবাব দেন,—'হ্যাঁ, তবে না হওয়ারই মতো। কারণ, কেউই প্রায় যায় না। আসলে এখন যিনি আছেন তাঁর কোনও একটা গোলমাল আছে। আর ওরা এখানে নতুন যাজক পাঠাতে চায় না।' মহিলা শান্তভাবে আরও বলে চললেন,—'ওনার বয়স প্রায় একশো বছর। তার ওপর প্রায় আধ-পাগল। এই তো সেদিন, প্রার্থনার পর শপথ করে বললেন যে উনি নাকি শয়তানকে দেখেছেন। তার পর থেকে কেউ আর প্রার্থনায় যায় না।'

কিছুটা হতাশ হলেও একশো বছর বয়সী একজন বৃদ্ধকে নিজের চোখে দেখার কৌতূহল দমন করতে না পেরে ও গির্জায় গেল। ও খেয়াল করল,—এটা একটা মৃত শহর। ধুলোয় ভরা সীমাহীন রাস্তা, গাঢ় রঙের কাঠের বাড়িগুলোর ওপরে দস্তার চালা। দেখে মনে হয়, এখানে কেউ থাকে না। রবিবারের সকালে শহরটাকে এ রকমই মনে হচ্ছিল। রাস্তায় ঘাস নেই। বাড়িগুলোর দরজা-জানালায় কোনও পর্দা ঝুলছে না। দম বন্ধ করা তাপের উপর ঘন নীল আকাশ। জনশূন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় ওর মনে হল,—রবিবারের সঙ্গে সপ্তাহের অন্য দিনগুলোর তফাত কোথায়। সেই সময় মায়ের বলা কথাটা ওর আবার মনে পড়ল,—'যে কোনও শহরের সব রাস্তাই শেষপর্যন্ত একটা গির্জা বা সমাধিক্ষেত্রে পৌঁছে যায়।' ততক্ষণে ও শহরের খোয়া বিছানো কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে গেছে। সদ্য রং করা একটা সাদা বাড়ি ওর চোখে পড়ল। বাড়ির চূড়ার ওপব একটা কাঠের তৈরি হাওয়া-মোরগ বসানো আছে। আর চূড়ার গায়ে সাঁটা ঘড়িটায় তখন বাজে,—চারটে বেজে দশ মিনিট।

তাড়াহুড়ো না করে সিঁড়ির ধাপগুলো আস্তে আস্তে পেরিয়ে ও গির্জার ভেতরে গেল। ওর নাকে এল গির্জার বয়সের গন্ধের সঙ্গে মিশে যাওয়া ধূপ-ধুনোর গন্ধ। প্রায় ফাঁকা উপাসনাগারে তখন ও পৌঁছে গেছে।

ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল সবেমাত্র উপাসনা মঞ্চে পৌঁছেছেন। প্রার্থনা শুরুর প্রাক্‌মুহূর্তে তাঁর চোখে পড়ল যে টুপি মাথায় একটা অল্পবয়সি ছেলে উপাসনাগারে ঢুকছে। গির্জা প্রায় জনমানবহীন। টানা টানা স্বচ্ছ চোখে তিনি দেখলেন ছেলেটি একেবারে শেষ সারিতে খুঁজছে বসার আসন। মাথাটা একদিকে কাত করে হাঁটুর ওপর হাতদুটো জোড়া করে রেখে ছেলেটা শান্তভাবে বসে আছে। ছেলেটো এ শহরে নতুন। প্রায় তিরিশ বছর এ শহরে থাকার দরুন এখানকার বাসিন্দাদের গন্ধ শুঁকেই তিনি চিনে নিতে পারেন। অতএব তিনি নিশ্চিন্তভাবে সিদ্ধান্ত করলেন,—ছেলেটা এ শহরে আগন্তুক। এক লহমায় তিনি বুঝে গেলেন যে ছেলেটা শান্ত আত্মার প্রতীক। ময়লা, কোঁচকানো জামাকাপড় পরা ছেলেটা আদতে দুঃখী। বিরক্তির সঙ্গে করুণা মেশানো একটা অনুভূতি নিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে বেচারি এই পোশাকেই ঘুমিয়েছে। তবুও উপাসনাগারে ওকে বসে থাকতে দেখে ফাদারের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণ দেওয়ার জন্যে এখন তিনি মনে মনে প্রস্তুত। তিনি মনে মনেই উচ্চারণ করলেন,—'হে প্রভু, টুপিটা ও মাথা থেকে নামিয়ে নিক, যাতে ওকে গির্জা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলতে না হয়।' এবং তিনি প্রার্থনা শেষের ভাষণ আরম্ভ করলেন।

কোনও কিছু না ভেবেই এবং কী বলছেন না বুঝেই তিনি শুরু করে দিলেন প্রার্থনা শেষের ভাষণ। এমনকী নিজের কথাও তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। নিজের আত্মার মধ্যে পৃথিবীর সূচনাপর্ব থেকে বয়ে যাওয়া সুপ্ত ঝরনার সুরমূর্ছনাও তিনি শুনতে পেলেন না। একটু বিভ্রান্ত হলেও তিনি খুব নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাঁর কথাগুলো সরাসরি ঠিক জায়গায় পৌঁছোচ্ছে। একটা গরম ভাপ যেন তাঁর পেটের ভেতরকার নাড়িভুঁড়িকে চাপ দিচ্ছে। তবে তিনি জানেন যে তাঁর আত্মা অহঙ্কার থেকে মুক্ত। সুখের যে অনুভূতি তাঁর চেতনাকে অসার করে দিচ্ছে তাও গর্ব বা অবজ্ঞা কিংবা অহংবোধ নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে নিজের আত্মার পূর্ণ আহূতি।

একটু বাদেই প্রচণ্ড তাপের অসহনীয় দাপট শুরু হয়ে যাওয়ার কথা মনে হতেই রেবেকা কেমন যেন অসুস্থবোধ করলেন। এ শহরের সঙ্গে প্রাণের টান অনুভব না করলে, এমন আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে

তিনি নিজের যাবতীয় পোশাক-আশাক একটা ন্যাপথালিন দেওয়া ট্রাংকের মধ্যে ভরে নিয়ে পৃথিবীর অন্য কোনও প্রান্তে তাঁর প্রপিতামহের মতো, অন্তত তেমনই লোকশ্রুতি, রওনা দিতেন। তবে মানসিকভাবে তিনি নিশ্চিন্ত যে এ শহরেই তাঁর মৃত্যু হবে। সুদীর্ঘ বারান্দা আর ন'টা ঘরের এই বিশাল বাড়িতেই তিনি মারা যাবেন। গরম কমলে ঘরের পর্দাগুলো পালটিয়ে অস্বচ্ছ কাচ লাগানোর কথাও তাঁর এখনই মনে পড়ল। এখানে থাকার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তিনি ভাবলেন এ শহরে একজন নতুন যাজক পাঠানোর জন্যে তাঁর বিখ্যাত জ্ঞাতিকে অনুরোধ জানিয়ে একটা চিঠি লেখা দরকার। তারপরই তিনি ভেলভেটের ফুল লাগানো টুপিটা মাথায় চাপিয়ে আবার গির্জায় যাবেন। কাল সোমবার। বিশপকে সম্ভাষণ করে একটা, মাত্র একটা চিঠি লেখার কথাও তাঁর মাথায় এল। মনে পড়ে গেল যে কর্নেল বুয়েন্দিয়া অবিশ্যি এই সব চিঠিপত্রকে বরাবরই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন। হঠাৎ পর্দা সরিয়ে, প্রায় চিৎকার করতে করতে আরখেনিদা ঘরে ঢুকল,—'সবাই বলাবলি করছে, ফাদার নাকি পাগল হয়ে গেছে।'

তিতিবিরক্ত হয়ে নির্জীব মুখে রেবেকা দরজার দিকে তাকালেন। এটা একেবারেই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। জামাকাপড় ঠিকঠাক করতে করতে রেবেকা বললেন,—'বছর পাঁচেক ধরেই ওঁর মাথার ঠিক নেই। উনি নিশ্চয়ই আবার শয়তানকে দেখেছেন।'

আরখেনিদার মন্তব্য,—'না এবার শয়তান নয়।'

রেবেকার গতানুগতিক প্রশ্ন,—'তবে কে?'

'উনি নাকি সেই যাযাবর ইহুদীটাকে দেখেছেন, অন্তত উনি সেই রকমই বলছেন',—আরখেনিদার সুচিন্তিত উত্তর।

রেবেকার মনে হল,—নিজের গায়ের ত্বকটা সরীসৃপদের চামড়ার মতো হয়ে যাচ্ছে। নানারকমের বিচিত্র সব চিন্তা-ভাবনা এক সঙ্গে মাথায় ভিড় করছে। ছেঁড়া পর্দা, গ্রীষ্মের দাবদাহ, পাখিদের মরে যাওয়া, প্লেগের প্রকোপ থেকে শুরু করে সেই সুদূর অতীত থেকে ঘটে যাওয়া অনেক কিছু তাঁর মাথা ছুঁয়ে গেলেও 'যাযাবর ইহুদী' কথাটা এর আগে কখনও শুনেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। তবুও তিনি আস্তে আস্তে উঠে আরখেনিদার দিকে এগোতে এগোতে শুধু একটি কথাই বললেন,—'সত্যি!' তারপরেও তাঁর অন্তরের গহন থেকেও যেন বেরিয়ে এল এক গভীর মন্তব্য,—'পাখিগুলো মরার কারণ এখন বুঝতে পারছি।'

প্রায় আঁতকে উঠলেন রেবেকা। সুতোর নকশা কাটা একটা কালো রঙের শাল গায়ে জড়িয়ে দীর্ঘ বারান্দা পেরিয়ে, আসবাবপত্র বোঝাই বসার ঘরটা ছাড়িয়ে একেবারে বাড়ির বাইরে চলে এলেন। একটু দূরের গির্জায় তখন ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল বলে চলেছেন,—'আমি শপথ করে বলছি যে তাকে আমি দেখেছি। আবারও শপথ করে আমি বলতে চাই যে সূত্রধর হোমাস্-এর স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করে ভোরবেলায় বাড়ি ফেরার সময় সে আমাকে ডিঙিয়ে গেল। দিব্যি করে বলছি তার মুখটা ঈশ্বরের অভিশাপে কুচকুচে কালো হয়ে গেছে আর তার চলার পথে ছড়িয়ে পড়ছে গনগনে লাল ছাই।'

প্রার্থনাসভা ভেঙে গেল। হাতের কাঁপুনিটা যে থামাতে পারছেন না তা ফাদার বুঝতে পারলেন। সারাটা শরীরও কাঁপছে। তাঁর মেরুদণ্ড দিয়ে ঠান্ডা ঘামের একটা তীব্র স্রোত বয়ে চলেছে। তিনি অসুস্থ বোধ করছেন। কাঁপুনি ও তেষ্টায় তিনি কাতর। পেটের ভেতর একটা মোচড়ও অনুভব করছেন। পেটের ভেতরকার দারুণ আলোড়ন থেকে ভাঙা হারমোনিয়ামের মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। তখন তিনি প্রকৃত সত্যিটা উপলব্ধি করলেন।

গির্জার জনসমারোহ তাঁর নজরে এল। এমনকী রেবেকাও উপস্থিত। হাত দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা রেবেকার বিরক্তি ভরা গম্ভীর মুখটা দেখে করুণা হয়। সেই অবস্থাতেই রেবেকা উপাসনা মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছেন। একটু সন্দেহ হলেও ফাদার বুঝলেন কী যেন একটা ঘটতে চলেছে। সম্ভবত ফাদার একটা বিস্ময়কর ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছেন। বিনীতভাবে কাঁপা কাঁপা হাত দুটোকে মঞ্চের কাঠের পাটাতনের ওপর রেখে তিনি আবার ভাষণ শুরু করলেন।

'তারপর সে আমার দিকে এগিয়ে এল',—ফাদারের কথাগুলো এখন বেশ বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। 'ক্রমশ সে আমার দিকে এগোচ্ছে। তার চোখজোড়া পোখরাজের মতো, মাথায় লম্বা লম্বা কোঁকড়ানো চুল আর গায়ে ছাগলের মতো বোটকা গন্ধ। আমাদের মহান প্রভুর নাম নিয়ে ভর্ৎসনা করার জন্যে হাত তুলে তাকে থামার নির্দেশ দিলাম। তাকে বললাম,—ভেড়া বলি দেওয়ার জন্যে রবিবার কখনওই শুভ দিন নয়।'

ভাষণ শেষ হওয়ার আগেই তাপ প্রবাহ শুরু হয়ে গেছে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া অগস্ট মাসের প্রখর তাপ। ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল কিন্তু গরম নিয়ে আদৌ চিন্তিত নন। শহরবাসী আবার সমবেত হয়ে বিনম্র ভঙ্গিতে শান্তভাবে প্রার্থনা শেষের ভাষণ শুনছে দেখেও ফাদার সন্তুষ্ট হননি। পবিত্র সুরা তাঁর গলায় সাময়িক আরাম দিলেও তিনি খুশি নন। নানা রকমের অসন্তোষ তাঁকে বিহ্বল করে তুলেছে। কোনও এক মহত্তর ত্যাগের জন্যে তিনি কিছুতেই মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না। একই ঘটনা বারেবারেই ঘটে চলছিল। তবে এবারকার বিহ্বলতার চরিত্র ভিন্ন। কারণ, তাঁর চিন্তা এখন একটা নির্দিষ্ট রকমের অস্বস্তিতে পরিপূর্ণ। গর্ব কাকে বলে,—বিষয়টা জীবনে প্রথমবারের মতো তিনি অনুভব করলেন। কল্পনায় এর একটা রূপরেখা আঁকতে আঁকতে আর সেই ধারণাটাকে নিজেরই দেওয়া উপদেশাবলীর মধ্যে চারিয়ে দেওয়ার সময় তাঁর মনে একটা নতুন ভাবের উদয় হল। তিনি অনুভব করলেন গর্ব একটা বিচিত্র আর্তি বিশেষ, অনেকটা যেন গভীর তৃষ্ণার মতো। এবং সেই প্রেরণার কথাটা তিনি ভাষণের মধ্যে বলেই ফেললেন। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে তিনি উপাসনার সমাপ্তি ঘোষণা করে হাঁক পাড়লেন,— 'পিথাগোরাস।'

ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলের ধর্মপুত্র তথা সহকারী, মুণ্ডিত মস্তকের বালকটি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল। ফাদার বললেন,—'আজকের প্রার্থনার দর্শনী সংগ্রহ করো।'

বালকটি চোখ পিট পিট করতে করতে ফাদারের দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়িয়ে, প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় মিন মিন করে বলল,—'দর্শনীর থালাটা কোথায় আছে আমি জানি না।'

কথাটা একেবারেই সত্যি। বহুদিন ধরেই দর্শনী সংগ্রহের সুযোগ ঘটেনি। ফাদারের পাল্টা নির্দেশ,— 'তাহলে একটা থলি নিয়ে এসে দর্শনী সংগ্রহ করো।'

বালকটি ঘাবড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে,—'আমি কী বলব?' কোনও জবাব না দিয়ে ফাদার মনোযোগ দিয়ে বালকটির মাথার খুলির জোড়টা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

'যাযাবর ইহুদীটাকে তাড়াবার কথা সবাইকে বলো',—ফাদার নির্দেশ দিলেন। তাঁর মনে হল তিনি অন্তর থেকেই এমন নির্দেশের জন্যে সমর্থন পেয়েছেন। নিঃশব্দ গির্জায় মোমবাতির শিখার কেঁপে ওঠার আর নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া অন্য কোনও আওয়াজ কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাঁর কানে পৌঁছোল না। তারপর তিনি সহকারী বালকটির কাঁধে হাত রেখে বললেন,—'সমস্ত দর্শনী জড়ো করে সেই ছেলেটিকে দিয়ে দাও যে সবার আগে আজকের প্রার্থনায় এসেছে। আর ওকে বলে দিও যে এটা ফাদারের তরফ থেকে একটা টুপি কেনার জন্যে ওকে দেওয়া হচ্ছে।'

মূল শিরোনাম Un dia despuês del sábado

বড়মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

বিশ্বের সমস্ত অবিশ্বাসীদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে এটাই হল বড়মার সত্যিকারের কাহিনি। তিনি ছিলেন মাকোন্দো রাজ্যের প্রবল প্রতাপান্বিত রানি। বিরানব্বই বছর বেঁচে থাকার পর গত সেপ্টেম্বর মাসের এক মঙ্গলবারে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন দেশের শীর্ষ যাজক।

বড়মার মৃত্যুজনিত কারণে উদ্ভূত হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি দেশ এখন কাটিয়ে উঠেছে। 'সান্ হাসিন্তো'-র বাঁশি বাজিয়েরা, 'গোয়াহিরা'-র চোরাচালানকারীরা, 'সিনু'-র ধান চাষিরা, 'কাউকামায়াল'-এর দেহোপজীবিনীরা, 'সিয়েরপ'-এর জাদুকররা আর 'আরাকাতাকা'-র কলা-বাগিচার শ্রমিকেরা বড়মার আসন্ন মৃত্যুর জন্যে এতদিন ধরে প্রতীক্ষার পরে ক্লান্ত হয়ে তাঁবু গুটিয়ে বিশ্রাম করতে চলে গেছে। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীবৃন্দ ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা এই ঐতিহাসিক এবং সাড়ম্বর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন পারলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী গির্জার প্রতিভূবৃন্দ। এখন সবাই মানসিক শান্তি ফিরে পেয়ে নিজের নিজের কাজে যোগ দিয়েছেন। দেহে ও মনে যাজকের স্বর্গারোহণ সম্পূর্ণ হয়েছে। সারা রাস্তায় ছড়ানো আছে খালি বোতল, সিগারেটের টুকরো, শুকনো হাড়, টিন, ন্যাকরা ইত্যাদি জঞ্জাল। এ সবই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখতে আসা বিশাল জনতার অবদান। ফলে, পথে চলাফেরা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিকরা পুঁথির পাতায় এ সব লিখে ফেলার আগে বড় রাস্তার ধারে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে এ রকম একটা জাতীয় শোকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার এটাই সেরা সময়।

বহু দিন ধরেই রাতের দিকে বড়মাব পেট ফাঁপছিল। সরষে বাটার পুলটিশ লাগানোয় কষ্টটা আরও বেড়েই চলছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে প্রায় শেষ অবস্থায় পৌঁছে গেছিলেন। তবু চোদ্দো সপ্তাহ আগে তিনি হুকুম দিলেন তাঁকে যেন লিয়ানা কাঠের দোলচেয়ারে বসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় যাতে তিনি সুষ্ঠভাবে তাঁর শেষ ইচ্ছা সবাইকে শুনিয়ে যেতে পারেন। মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্যে এইটুকু কাজই বাকি ছিল। এর মধ্যে সেদিন সকালেই তিনি ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলের সাহায্যে নিজের আত্মার বন্দোবস্ত করে ফেলেছিলেন। বাকি ছিল,—বাক্স-তোরঙ্গ-সিন্দুকে রাখা তাঁর যাবতীয় পার্থিব সম্পদের বিলিবন্দোবস্ত। ন' জন ভাইপো-ভাগ্নেব মধ্যে ওগুলো বিলোতে হবে। কারণ ওরাই তাঁর বৈধ ওয়ারিশ। ওরা পালা করে তাঁর বিছানার পাশে বসে থাকত। নিজের মনে অনবরত কথা বলতে থাকা প্রায় একশো বছর বয়সী মাকোন্দোর প্রবীণ যাজক বড়মার ঘবেই প্রায় পাকাপাকিভাবে আস্তানা গেড়েছিলেন। ও ঘরে তাঁকে পৌঁছে দিতে জনা দশেক লোক লেগেছিল। তখন তিনি ঠিক করেন যে শেষ পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন যাতে বাবে বারে নামা-ওঠার হাঙ্গামা না পোয়াতে হয়। সব চেয়ে বড় কথা, এতে শেষ মুহূর্তে বড়মার পাশে থাকাটাও নিশ্চিত করা যাবে।

সবচেয়ে বড় ভাইপো নিকানোর আকৃতিতে দৈত্যের মতো আব প্রকৃতিতে বুনো এবং চোয়াড়ে। তার পরনে খাকি পোশাক আর পায়ে কাঁটা লাগানো বুট জুতো। তার জামার নিচে একটা ০ ৩৮ ক্যালিবারের রিভলবার সদাপ্রস্তুত। উকিলের খোঁজ কবতে নিকানোরই গেছিল। গুড় আর সুগন্ধি পাতার নির্যাসে সুবাসিত বিরাট দোতলা বাড়িটার খাঁজে খাঁজে বেশ কিছু লুকোনো ঘরে রাখা ছিল বিশাল সব বন্দুক আর ধুলোর সঙ্গে মিশে যাওযা চাব প্রজন্মের টুকিটাকি জিনিসপত্র। সপ্তাহখানেক আগে থেকেই যেন বাড়িটা এই মুহূর্তের প্রতীক্ষায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাড়ির মাঝখানের বিশাল বসার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে ছাল ছাড়ানো শুয়োর আর রক্ত বেব করে নেওয়া হরিণের মৃতদেহ। নুন আর চাষের যন্ত্রপাতি ভরা বস্তার উপর ক্ষেতের মুনিষবা গুটিসুটি মেরে শুয়েছিল। আসলে নির্দেশ পাওয়া

মাত্রই যাতে খচ্চরে চেপে ক্ষেতখামারের চতুর্দিকে খবরটা পৌঁছিয়ে দিতে পারে তারই জন্যে ওরা অপেক্ষা করছিল। পরিবারের বাদবাকিরা বসার ঘরে সমবেত। মেয়েরা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। মরণাপন্ন মানুষটির মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা আর উত্তরাধিকারের চিন্তা যেন ওদের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে। কুলকর্ত্রী হিসেবে বড়মার দাপটে বিষয়-সম্পদ আর বংশের সুনাম সুরক্ষিত। বড়মাকে না জানিয়ে, তাঁকে আড়াল করে কাকারা ভাইঝির মেয়েদের, জ্ঞাতি ভাইরা মাসি-পিসিদের আর ভাইরা নিকট আত্মীয়াদের বিয়ে করেছিল। এ ভাবেই গড়ে উঠেছিল পরিবার তথা গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্বিবাহের এক জট পাকানো জটিল চক্র। বংশবৃদ্ধি পরিণত হয়েছিল এক দুষ্টচক্রে। কেবলমাত্র সবচেয়ে ছোট ভাইঝি মাগদালেনা এই চক্র থেকে পালাতে পেরেছিল। অলৌকিক এক আতঙ্ক যেন তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলের সাহায্যে সে নিজেকে অশুভ আত্মার হাত থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। শেষে সংসারের সব সাধ-আহ্লাদ ত্যাগ করে মাথা মুড়িয়ে মাগদালেনা সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়।

বৈধ পরিবারের পাশাপাশি জমিদারির অধিকার খাটিয়ে এ বাড়ির পুরুষবা গাঁয়ে-গঞ্জে, ক্ষেতখামারে, পথে-ঘাটে অসংখ্য জারজ বংশধর ছড়িয়ে দেয়। তাদের পদবির বালাই নেই। বড়মার ধর্ম সন্তান, পুষ্যি, প্রিয়পাত্র,—এ সবই তাদের পরিচিতি।

আসন্ন মৃত্যু ক্লান্তিকর প্রতীক্ষার অবসান ঘটায়। মৃতপ্রায় মহিলা সকলেব বশ্যতা ও স্তুতিতে অভ্যস্ত। তাঁর কণ্ঠস্বর অর্গানের মৃদু সুরেব চেয়ে উঁচু তানের না হলেও, বাড়ির লাগোয়া ক্ষেতখামাবেব নির্জন কোনা থেকেও তা শোনা যেত। এই মৃত্যুটা সম্পর্কে কেউ উদাসীন ছিল না। পুরো শতাব্দী ধরে বড়মা ছিলেন মাকোন্দোর মধ্যমণি। আগেকার দিনে যেমন ছিলেন তাঁর ভাই, বাবা বা আরও প্রাচীন সব পূর্বপুরুষেরা। দু' শতাব্দী ধরে পারিবারিক রাজত্ব কায়েম থাকায় তাঁদের গোষ্ঠীকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল জনবসতি। তাঁদের পদবি দিয়েই হয়েছিল এলাকাটার নামকরণ। এদের উৎপত্তি নিয়ে কেউ কখনও মাথা ঘামায়নি। এ পরিবারের বিষয়-সম্পত্তির সঠিক পরিমাণ ও মূল্যেব হিসেব-নিকেশও কেউ কখনও করেনি। মানুষের বিশ্বাস,—বহতা জলধারা থেকে শুরু করে বদ্ধ জলাধার, পৃথিবীর বুকে নেমে আসা বৃষ্টি, আশপাশের রাস্তাঘাট, টেলিগ্রাফের খুঁটি, ঋতুচক্র এমনকী সূর্যের তাপ পর্যন্ত সব কিছুই বড়মাব সমতুল্য। তার উপর তিনি আবার উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষেতখামার আর সব মানুষের দণ্ডমুণ্ডেব কর্ত্রী। বড়মা যখন বাড়ির বারান্দায় বসে সন্ধ্যার হাওয়া খেতেন তাঁর নাড়িভুঁড়ি আব কর্তৃত্বের চাপ লিয়ান কাঠের দোলচেয়ারটার ওপর পড়ত। তখন মনে হত বাস্তবিকই তিনি অপরিসীম সম্পদের অধিকারিণী ও প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন। মনে হত তিনি দুনিযার সব চেয়ে ধনী ও ক্ষমতাশালিনী গৃহকর্ত্রী।

কোনওদিন যে বড়মার জীবনাবসান হতে পারে, এমন কথা তিনি নিজে আর তাঁর গোষ্ঠীর সদস্যারা ছাড়া আর কেউ ভাবেনি। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল অবিশ্যি ভবিষ্যদ্বাণী মারফত বড়মাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তবুও বড়মার বিশ্বাস ছিল যে নিজেব দিদিমার মতো তিনিও একশো বছরের বেশি বাঁচবেন। সেই মহিলা ১৮৮৫-র গৃহযুদ্ধের সময ক্ষেতখামারের ভেতরে ঘাঁটি গেড়ে বসা কর্নেল আউরেলিযানো বুয়েন্দিয়ার এক রক্ষীর মুখোমুখি হয়েছিলেন। তবে এ বছর এপ্রিল মাস নাগাদ বড়মা বুঝতে পারলেন যে সামনাসামনি লড়াইয়ে বিপ্লবীদের দল 'হেদারালিস্ত মেসন'-কে পর্যুদস্ত করার সুযোগ ঈশ্বর তাঁকে দেবেন না।

যন্ত্রণা শুরুর প্রথম সপ্তাহে পারিবারিক ডাক্তার লক্ষ্য করলেন সরযের পুলটিশ লাগিয়ে তার ওপর উলের মোজা পরে রয়েছেন বড়মা। এই ডাক্তারটিও উত্তরাধিকারসূত্রে চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। আদতে তিনি মন্তপোলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। দার্শনিক বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি বিজ্ঞানের তথা প্রগতিবিরোধী। বড়মার হুকুমনামার জোরে তি. . মাকোন্দোয় অন্য কোনও ডাক্তারের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। ঘোড়ায় চড়ে তিনি পুরো এলাকাটা চযে বেড়ান। সন্ধ্যার অন্ধকারে যন্ত্রণা-কাতর রোগীদের দেখতে যাওয়াটা তাঁর বহুদিনের পুরোনো অভ্যাস। প্রকৃতির আনুকূল্যে তিনি পেয়েছেন অজস্র অবৈধ সন্তানের বাবা হওয়ার অধিকার। তবে ইদানীং বাতের ব্যথায় অথর্ব হয়ে পড়ায় তিনি নিজের বাড়ির দোলনা ছেড়ে বিশেষ বেরোতে পারেন না। অসুখের লক্ষ্মণের কথা শুনে আর আন্দাজের বশে রোগীদের

না দেখেই চিকিৎসা শুরু করেন। বড়মার নির্দেশে পায়জামা পরে, দুটো লাঠির ওপর ভর দিয়ে কোনওরকমে রোগিণীর ঘরে এসে পাকাপোক্তভাবে ঠাঁই নিলেন। বড়মার চরম অবস্থার আভাস পাওয়া মাত্র তিনি বাড়ি থেকে একটা সিন্দুক আনানোর বন্দোবস্ত করলেন। সিন্দুকটার মধ্যে ছিল অনেকগুলো ছোট ছোট কৌটো। কৌটোগুলোর গায়ে লাতিন ভাষায় নাম লেখা। সপ্তাহতিনেক ধরে তিনি মুমূর্ষু রোগিণীর সব রকমের স্বাস্থ্যসম্মত পরিচর্যা করলেন। কড়া ঝাঁজের উত্তেজক আরক দিলেন। প্রয়োগ করলেন সাংঘাতিক কড়া জোলাপ। এত কিছু করার পর প্রচণ্ড চিন্তাভাবনায় বিভোর হয়ে তিনি সিগারেটে লম্বা লম্বা টান দিতে দিতে সেই ঘরেই বসে রইলেন। অবশেষে এল সেদিনের ভোর, যখন ডাক্তারের সামনে মাত্র দুটো রাস্তা,—হয় নাপিত ডেকে এনে বড়মার শরীরের দূষিত রক্ত বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা নয়তো ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলকে ভূত তাড়াবার জন্যে অনুরোধ করতে হবে।

যাজককে ডেকে আনার হুকুম দিল নিকানোর। বাছাই করা জনা দশেক লোক বড়মার ঘরে বয়ে নিয়ে এল তাঁকে। বড়মা তখন চাঁদোয়া লাগানো উইলো কাঠের দোলচেয়ারে বসে। মরচে ধরা, ক্যাঁচোর-ক্যাঁচ শব্দ করা এই দোলচেয়ারটা সাধারণত উৎসব-অনুষ্ঠানে বাইরে আনা হত। সেপ্টেম্বর মাসের ভোরে, যখন হালকা গরম ছড়িয়ে পড়া শুরু হয়েছে, ঠিক তখনই গির্জার ছোট ঘণ্টার আওয়াজ মাকোন্দোর বাসিন্দাদের কাছে খবরটা পৌঁছিয়ে দেয়। সূর্য উঠতে না উঠতেই বড়মার বাড়ির সামনেকার রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য। মনে হচ্ছিল, কোনও মেলা বসেছে।

এইসব দেখে শুনে পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। নিজের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে বড়মা এমন ধুমধাম করে জন্মদিন পালন করেছিলেন যা আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। আনন্দ-উৎসবের যেন বান ডেকেছিল। মদ বিলোনো হয়েছিল সারা শহরে। শহরের প্রধান প্লাজায় মানে কেন্দ্রীয় চত্বরে কাটা হয়েছিল প্রচুর গোরু-ভেড়া ; আর একটা ব্যান্ডপার্টি তিনদিন ধরে একটানা বাজনা বাজায়। ধুলোমাখা যে আলামন্দ গাছটার তলায় এই শতাব্দীর প্রথম সপ্তাহে কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার সেনাবাহিনী তাঁবু খাটিয়েছিল, সেখানে হরেকরকম জিনিসপত্র বিক্রির ধুম লেগে যায়। কী না ছিল সেখানে—ধান আর ভুট্টার তৈরি মদ, পাঁউরুটির রোল, ভুট্টার রোল, পনীরের রোল, শুয়োরের মাংস দিয়ে রান্না করা রকমারি লোভনীয় খাদ্য, গলদা চিংড়ি ভাজা, নানানরকমের কেক-প্যাস্ট্রি, নারকেলের মিঠাই, আখের রস থেকে শুরু করে গয়নাগাঁটি-হাঁড়িকুড়ি পর্যন্ত,—এক কথায় সব কিছু। মোরগের লড়াই আর লটারির ব্যবস্থাও ছিল। উত্তেজিত জনতার কোলাহলের মধ্যে বিক্রি হচ্ছিল বড়মার ছাপা ছবি এবং তাঁর ছবি আঁকা জামা।

জন্মদিনের দু'দিন আগে উৎসবটা শুরু হয়ে জন্মদিনের সন্ধ্যায় কান ফাটানো আতসবাজির ঝলসানিতে শেষ হয়। রাতে বড়মার বাড়ির সেই বিশাল বসার ঘরটায় এক নাচের আসর বসে। বাছাই করা অতিথি আর পরিবারের বৈধ সদস্যেরা সেখানে উপস্থিত ছিল। পুরোনো পিয়ানোটায় বাজানো হচ্ছিল আধুনিক সুর। জারজ সন্তানদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে অতিথিরা বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচল। বড়মা পিঠের তলায় একটা বালিশ রেখে আরামকেদারায় বসে সব কিছুর তত্ত্বাবধান করছিলেন। প্রতিটি আঙুলে আংটি পরা ডান হাত নাড়িয়ে তিনি একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওখানে বসেই তিনি সেরে ফেললেন সেই সব বিয়েগুলোর পাকা কথাবার্তা যেগুলো পরের বছর হওয়ার কথা। প্রেমিক-প্রেমিকার ইচ্ছানুসারে কয়েকটা বিয়ে তিনি মেনে নিলেও বেশিরভাগ বিয়েই তাঁর মতানুযায়ী স্থির হল। উৎসবের একেবারে শেষ লগ্নে বড়মা মাথায় মুকুট পরে জাপানি লণ্ঠনের আলোয় বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে মুঠো মুঠো পয়সা-কড়ি ছড়াতে লাগলেন।

মাঝে কিছুদিন এই ঐতিহ্যে বাধা পড়ে। পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব আংশিকভাবে এর জন্যে দায়ী। আবার গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক ঘটনাবলিরও এ বিষয়ে অবদান আছে। নতুন প্রজন্ম এমন জাঁকজমকের গল্পই শুনে এসেছে, কোনওদিন দেখার সুযোগ পায়নি। বড়মার গির্জায় যাওয়ার দৃশ্য তারা কখনও নিজেদের চোখে দেখেনি। বড়দের কাছে তারা বরাবরই শুনে এসেছে যে গির্জায় যাওয়ার সময় জনৈক রাজপুরুষ নাকি বড়মাকে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে পথ চলত। এমনকী গির্জাও তাঁকে কিছু

বিশেষ সুবিধা দিয়েছিল। প্রার্থনাসভার পবিত্রতম মুহূর্তেও তিনি নতজানু হতেন না, পাছে তাঁর পোশাকের ভাঁজ নষ্ট হয়ে যায়। যৌবনের কল্পনার মতো সেই দিনটার কথা প্রবীণরা আজও মনে করে যে দিন বড়মার পৈতৃক বাড়ি থেকে গির্জার সর্বোচ্চ বেদি পর্যন্ত দুশো গজ লম্বা মাদুর পাতা হয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় মারিয়া দেল রোজারিও কাস্তাখেদাইমন্তেরো তাঁর বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন। মাদুর বিছানো পথ পেরিয়ে মাত্র বাইশ বছর বয়সেই 'বড়মা' আখ্যায় ভূষিত হয়ে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। মধ্যযুগের এমন জীবনদর্শন কেবলমাত্র এই পরিবারের নয়, জাতীয় ইতিহাসের অংশে পরিণত হয়। বেশিরভাগ সময়েই বড়মা একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন এবং নিজেকে কিছুটা প্রচ্ছন্ন করে রাখতেন। ক্বচিৎ তাঁকে গরমকালের সন্ধ্যায় বারান্দায় দেখা যেত। সেরানিয়াম ফুলের ভারে প্রায় দম বন্ধ করা অবস্থায়ও তাঁকে নিয়ে গড়ে ওঠা গল্পকথার আড়ালেই বড়মা অদৃশ্য হয়ে থাকতেন। নিকানোর মারফত তাঁর কর্তৃত্ব বাস্তবে কার্যকরী হত। ঐতিহ্যানুযায়ী একটা অঘোষিত প্রতিশ্রুতি ছিল যে বড়মা যেদিন তাঁর অন্তিম ইচ্ছাপত্র বা উইল করবেন সে দিন তাঁর উত্তরাধিকারীরা জনসাধারণের জন্যে তিন রাত্রিব্যাপী এক উৎসবের ব্যবস্থা করবে। আবার লোকে এটাও জানত,—বড়মা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন যে মৃত্যুর মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে তিনি অন্তিম ইচ্ছাপত্র বা উইল রচনা করবেন। তবে বড়মা যে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষেরই মতো মারা যেতে পারেন, এমন কথা কেউ মন থেকে বিশ্বাস করেনি। কেবল সেদিন ভোরে গির্জার ঘণ্টার শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর মাকোন্দোর বাসিন্দারা বুঝতে পারল যে বড়মা অমর নন। এবং তিনি মরণাপন্ন।

তাঁর অন্তিম মুহূর্ত সমাসন্ন। তাঁর কান পর্যন্ত সুগন্ধি ছড়ানো। সুতির চাদর বিছানো বিছানায় ধুলো ভরা চাঁদোয়ার তলায় তিনি শায়িত। কুলকর্ত্রী বড়মার হৃৎস্পন্দনে জীবনের এতটুকু চিহ্নও খুঁজে পাওয়া ভার। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত বড়মা তাঁর প্রেমে উত্তাল হয়ে ওঠা পাণিপ্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রকৃতি তাঁকে যা ক্ষমতা দিয়েছিল তাতে তিনি একাই একটা গোটা প্রজাতির জন্ম দিতে পারতেন। অথচ, তিনি কুমারী ও নিঃসন্তান অবস্থায় মরণের দিকে এগিয়ে চলেছেন। শেষ মুহূর্তে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল বুঝতে পারলেন মৃত্যু পথযাত্রীর হাতের তালুতে তেল মাখানোর চেষ্টা করা বৃথা ; কারণ, মরণ যন্ত্রণায় বড়মা হাত দুটো মুঠো করে রয়েছেন। ভাইঝিদের সমবেত প্রচেষ্টাও কোনও কাজে এল না। এক সপ্তাহের টানাহ্যাঁচড়ার মধ্যে মুমূর্ষু মানুষটি এই প্রথম মূল্যবান অলংকারে ভূষিত নিজের বুকে হাত রাখলেন। ভাইঝিদের দিকে চাউনিবিহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—'মেয়ে ডাকাতের দল'। তারপর দেখলেন ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল মৃত্যুকালীন ক্রিয়াকর্মাদি সম্পন্ন করার পোশাক পরে অপেক্ষা করছেন। তাঁর সহকারী প্রয়োজনীয় উপকরণাদি গোছগাছ করে ফেলেছে। বড়মা শান্ত স্বরে গভীর বিশ্বাস নিয়ে বললেন,—'আমি মরতে চলেছি।' এবার তিনি সব চেয়ে বড় হিবে বসানো আংটিটা হাত থেকে খুলে নিয়ে বললেন,—'এটা পাবে নবীন সন্ন্যাসিনী মাগদালেনা।' সম্পত্তির সামান্য কিছু অংশ দিয়ে যাবেন বলে মাগদালেনাকে বড়মা আগেই চিঠি দিয়েছিলেন। এ ভাবেই একটা উত্তরাধিকারের অবসান হল। মাগদালেনা উত্তরাধিকার ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করল।

ভোরবেলায় নিকানোর ছাড়া আর সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে বড়মা হুকুম জারি করলেন। রীতিমতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাক্কা আধ ঘণ্টা ধরে তিনি বিষয়-সম্পত্তির যাবতীয় খবরাখবর নিলেন। তার পর নিজের শেষকৃত্য, অন্ত্যেষ্টি, সমাধি ইত্যাদি নিয়ে সবিস্তারে অনুপুঙ্খ আলোচনা সেরে বড়মা বললেন,—'সবসময় চোখ-কান খোলা রাখবে। দামি জিনিসপত্র তালা-চাবি দিয়ে সাবধানে রাখবে। জানো তো, অনেকেই এ সময় চুরি-চামারির মতলবে হাজির হয়।' এরপর গির্জার পাদ্রির সামনে বিশদাকারে স্বীকারোক্তির সময় বড়মার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। অবশেষে ভাইপো-ভাইঝিদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হল বাইবেলের প্রথানুসারী আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তির অনুষ্ঠান। সব শেষে অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশের উদ্দেশ্যে বেতের দোলচেয়ারটায় বসিয়ে দেওয়ার হুকুম তামিল করার পর বড়মার কাজ শুরু হল।

গোটা চব্বিশ দলিলে পরিষ্কার হাতের লেখায় নিকানোর বড়মার যাবতীয় বিষয়-আশয়ের বিস্তারিত

বিবরণ তৈরি করে রেখেছিল। ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল আর ডাক্তারকে সাক্ষী রেখে, শান্তভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বড়মা সম্পত্তির তালিকা জোরে জোরে পড়ে গেলেন যাতে সরকারের আইন সংক্রান্ত আধিকারিকের কানে সব কটা কথা ঠিকমতো পৌঁছোয়। এটাই তাঁর ক্ষমতা ও মান-মর্যাদার চরম ও একমাত্র উৎস। বাস্তবে দেখা গেল বড়মার সম্পত্তি বলতে বোঝাচ্ছে মাত্র গুটি তিনেক জেলার ভূ-সম্পদ। উপনিবেশ শুরুর যুগে সরকারের দেওয়া দখলি সত্বের দলিল অনুযায়ী এগুলো তাঁদের হাতে এসেছিল। তার পর কয়েক প্রজন্ম ধরে ধনী পরিবারে বিয়ে-শাদির ফলে সম্পত্তি অনেক ফুলে ফেঁপে গড়ে ওঠে বড়মার পরিবারের খাস তালুক। এই স্পষ্ট সীমারেখা ছাড়া আশপাশের পাঁচটা শহরে তাঁর মালিকানাধীন ছড়ানো-ছিটানো এমন অনেক জমি রয়েছে যেখানে কোনওদিনই ফসল ফলানো হয়নি। মালিকের গরজ না থাকলেও তিনশো-বাহান্নটা পরিবার এই সব জমিতে ঠিকা-প্রজা হিসেবে বসবাস করে। প্রতি বছর নিজের জন্মদিনের আগের তিনদিন ধরে বড়মা এদের কাছ থেকে নিয়ম করে খাজনা আদায় করতেন। নিজের কর্তৃত্বের এটাই ছিল একমাত্র পরিচয়। আর এর ফলেই এই সমস্ত জমি সরকারের হাতে ফিরে যায়নি। বাড়ির ভেতরকার দরদালানে বসে বড়মা নিজের হাতে জমিজমার ঠিকাসত্বের খাজনা নিতেন। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে তাঁর পূর্বপুরুষেরা একইভাবে এইসব ঠিকা-প্রজাদের পূর্বসূরিদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে অভ্যস্ত ছিলেন। খাজনা নেওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার দিনতিনেক বাদে দেখা যেত বাড়ির উঠোনটা শুয়োর, মুরগি আর টার্কিতে ভরে গেছে। জমিতে ফলানো ফসল ও ফল-মূলের যে অংশটুকু মালকিনের পাওনা তা উপহার হিসেবে রেখে যাওয়া হত। ঐতিহাসিক কারণেই এই জমিদারির সীমানার মধ্যেই ছিল মাকোন্দো জেলার অধিকাংশ মানুষের বসবাস আর রমরমা। জেলা সদরও এখানেই অবস্থিত। ফলে ব্যাপারটা এমনই দাঁড়ায় যে যারা ওখানে বসবাস করত তাদেরও জানা ছিল যে নিজেদের বাড়ির ইট-বালি ছাড়া অন্য কোনও কিছুর উপরই তাদের মালিকানা নেই। জমির মালিক বড়মা। এর জন্যে তাঁকে নিয়মিত ভাড়া দেওয়া হয়, ঠিক যেমনভাবে রাস্তাঘাটের জন্যে সরকারকে কর দেওয়া হয়ে থাকে।

জমিদারির চতুর্দিকে অসংখ্য গোরু-ঘোড়া চড়ে বেড়াত। ওগুলোকে কেউ গুনত না আর সেগুলোর দেখভাল হত আরও কম। পশুগুলোর পেছন দিকে একটা করে তালার ছবি উল্কির মতো এঁকে দেওয়া হত। শুধুমাত্র সংখ্যা নয়, যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ওরা দূর দূর এলাকায় পরিচিত ছিল। গরমের দিনে তেষ্টায় ছটফট করতে থাকা প্রাণীগুলো কোথায় কোথায় না ছড়িয়ে পড়ত! কে জানে কেন শেষ গৃহযুদ্ধের পর থেকেই বড়মার বাড়ির গোয়াল আর আস্তাবলগুলো ক্রমশ শূন্য হয়ে পড়েছিল। ইদানীং সেখানে চালু হয়েছে চিনির কল, দুধের ডেয়ারি আর ধানের কল।

এই তালিকাটা ছাড়াও 'অন্তিম ইচ্ছা' প্রকাশের সময় বড়মা তিন ঘড়া সোনার মোহরের কথা ভুললেন না। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় স্পেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ওগুলো যেন বাড়ির কোথায় পুঁতে রাখা হয়েছিল। পরে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করেও ওগুলোর আর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। ঠিকাসত্ব বাবদ খাজনা আদায়ের দায়িত্বের পাশাপাশি ওয়ারিশেরা পেল এই লুকোনো ধনরত্ন উদ্ধার করার একটা পরিকল্পনা। একের পর এক প্রতিটি প্রজন্মের হাতে উত্তরাধিকার সূত্রে তুলে দেওয়ার জন্যেই পরিকল্পনাটি এমন নিখুঁতভাবে রচিত হয়েছিল।

বৈষয়িক কথাবার্তা শেষ করতে বড়মার ঘণ্টা তিনেক লেগে গেল। দম বন্ধ হয়ে আসা ঘরের ভেতর মৃত্যুপথযাত্রিণীর কণ্ঠস্বর যেন হিসেব করে প্রতিটি জিনিসকে মর্যাদা দিচ্ছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে বড়মা যখন অন্তিম ইচ্ছাপত্রে স্বাক্ষর করলেন আর তার তলায় সাক্ষীদের সই শেষ হল, তখন বাড়ির সামনেকার ধুলো মাখা আলামন্দ গাছের ছায়ায় জড়ো হতে শুরু করা জনসমুদ্রের হৃদয়ে গোপনে বয়ে গেল অদ্ভুত এক শিহরন।

এবার বাকি রইল কেবল অ-পার্থিব সম্পত্তির তালিকা। অনেক কষ্টে বিশাল শরীরটাকে কোনওরকমে সামলিয়ে তিনি উঠে বসলেন। বংশের প্রতাপ-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে তাঁর পূর্বপুরুষেরাও অন্তিমকালে ঠিক এই কাজটি করে এসেছিলেন : স্মৃতির গহনে অবগাহন করে, জোরালো

ও আন্তরিক কণ্ঠে বড়মা উচ্চারণ করলেন তাঁর যাবতীয় অদৃশ্য সম্পদের তালিকা : মাটির তলার সম্পদ, দেশের জল, জাতীয় পতাকার রং, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, প্রচলিত রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা, বিচারব্যবস্থা, রাষ্ট্রের নেতৃত্ব, আবেদনের অধিকার, আইনসভার বিতর্ক, সুপারিশের চিঠি, ঐতিহাসিক নথি, স্বচ্ছ নির্বাচন, সৌন্দর্যের রানিরা, আধ্যাত্মিক কথাবার্তা, বিশাল মিছিল, সম্ভ্রান্ত যুবতী নারী, যথার্থ ভদ্রলোক, মর্যাদাসম্পন্ন সামরিকবাহিনী, রাষ্ট্রের উচ্চ গৌরব, সর্বোচ্চ আদালত, যে সব জিনিসের আমদানি নিষিদ্ধ, উদার মহিলাবৃন্দ, মাংস সংক্রান্ত সমস্যা, ভাষার পবিত্রতা, দৃষ্টান্ত সৃষ্টির যোগ্য উদাহরণ, স্বাধীন অথচ দায়িত্বশীল প্রচারমাধ্যম, দক্ষিণ আমেরিকার এথেন্স, জনমত, গণতন্ত্রের শিক্ষা, খ্রিস্টীয় নীতিবোধ, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকার, কমিউনিস্ট বিপদ, রাষ্ট্রের জাহাজ, নিত্য প্রয়োজনীয় ও ভোগ্যপণ্যের আকাশছোঁয়া দাম, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষেরা এবং রাজনৈতিক সমর্থন জানানোর প্রস্তাব।

বড়মা অবিশ্যি তালিকার শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারলেন না। দীর্ঘ তালিকা আউড়ে যাওয়ার পরিশ্রমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বিমূর্ত সূত্রের যে মহাসাগর দুই শতাব্দী ধরে এই পরিবারের ক্ষমতার নৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি করেছিল, তার মধ্যে ডুবে গিয়ে বড়মা সশব্দে হেঁচকি তুলে মারা গেলেন।

সে দিন বিকেলে রাজধানীর বিষণ্ণ নাগরিকেরা খবরের কাগজের বিশেষ সংস্করণের প্রথম পাতায় বছর কুড়ি বয়সের একটি মেয়ের ছবি দেখে মনে করল,—নতুন কোনও সুন্দরী। দরকার মতো তুলি বুলিয়ে ঠিকঠাক করে খবরের কাগজের চার কলাম ধরে ছাপানো ছবিটার মধ্যে বড়মার যৌবন মুহূর্তের জন্যে ধরা পড়ল। ছবিতে তাঁর আলুলায়িত কেশরাশি হাতির দাঁতের চিরুনি দিয়ে মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। আর তার ওপরে শোভা পাচ্ছে,—মুকুট। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে জনৈক ফোটোগ্রাফার মাকোন্দোর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় এই ছবিটা তুলেছিল। বহু বছর ধরে ছবিটি খবরের কাগজের দপ্তরে 'অচেনা মানুষ'-এর ছবি হিসেবে পড়ে থাকার পর এই বিশেষ সংস্করণের দৌলতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে গেল। হয়তো এমনই ছিল তাঁর ভাগ্যলিপি। ভাঙাচোরা বাসের মধ্যে, সরকারি দপ্তরের লিফ্‌টে, বিবর্ণ ছবি টাঙানো চায়ের দোকানে,—সর্বত্র লোকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে বলাবলি করতে থাকল। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত বড়মার নিজের জেলা মানে সেই গরমে ক্লান্ত, ঘামে সিক্ত ও ম্যালেরিয়া পীড়িত 'মাকোন্দো' ছাড়া বাদবাকি দেশে তাঁর নামই প্রায় কারও জানা ছিল না। বড়মার বহু আলোচিত মৃত্যুই মাকোন্দোকে বিখ্যাত করে তোলে। অবিশ্বাস আর কুয়াশাকে পথচারীদের সামনে থেকে আড়াল করেছিল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। গির্জায় গির্জায় তাঁর স্মৃতিতে ঘণ্টা বাজছিল। সদ্য উত্তীর্ণ হওয়া সামরিকবাহিনীর নবীন সেনাদের অভিবাদন নেওয়ার সময় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির কাছে খবরটা পৌঁছোয়। অনুষ্ঠানের শেষে বড়মার স্মৃতিতে এক মিনিটের নীরবতা পালনের পরামর্শ প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে দিয়ে, রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে বড়মার জন্যে শোকবার্তা লিখলেন।

এই মৃত্যুর দরুন সমাজ ব্যবস্থায় একটা চিড় ধরে। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নিজে ব্যাপারটা অনুধাবন করেন। শহরের বাসিন্দাদের প্রতিক্রিয়া তাঁর কাছে সবসময়েই একটু পরিশোধিত হয়ে পৌঁছোয়। তবে এবার গাড়িতে যেতে যেতে আচমকা কয়েকটা নির্মম দৃশ্যের মাধ্যমে নাগরিকদের একনিষ্ঠ নীরবতা আন্দাজ করলেন। কেবল মাত্র গুটি কয়েক ছোট ছোট কফির দোকান খোলা রয়েছে। আর শহরের প্রধান গির্জাটা ন'দিন ধরে বড়মার শেষকৃত্য পালনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। দেশের রাজধানীতে রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনেকার চত্বরে প্রাচীন গ্রিক স্থাপত্যের অনুকরণে গড়ে তোলা স্তম্ভ আর তার মধ্যে বাখা প্রয়াত রাষ্ট্রপতিদের মূর্তির ছায়ায় যেখানে ভিখিরিরা খবরের কাগজ মুড়ি দিয়ে ঘুমোয়, সেখানে আলো ঝলমলিয়ে উঠল। শোকবিহ্বল শহরের হালচাল স্বচক্ষে দেখে নিজের দপ্তরে ঢোকার সময় রাষ্ট্রপতির নজরে এল, তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী কালো রঙের শোক-পরিচ্ছদ পরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। অন্য দিনের তুলনায় তাদের মুখ অনেক বেশি বিবর্ণ ও বিষণ্ণ।

সেই রাতের এবং তার পরের ঘটনাবলি পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়। শুধু মাত্র সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রনায়কদের মনে খ্রিস্টীয় অনুভূতির বান ডেকেছিল,—এমন নয় ; সমস্ত

রকম পরস্পরবিরোধী স্বার্থ বা মতাদর্শের ভেদাভেদও যেন মুছে গিয়েছিল। মতৈক্য হয়েছিল মহিয়সী নারীর মরদেহ সমাধিস্থ করার প্রস্তাবে। তিন ট্রাংক ভর্তি নকল নির্বাচনী পরিচয়পত্রর মালিকানা সূত্রে বহু বছর ধরে বড়মা নিজের এলাকায় সামাজিক শান্তি ও রাজনৈতিক ঐক্য বজায় রেখেছিলেন। বড়মার চাকর-বাবুর্চিরা, তাঁর আশ্রিত মানুষ ও ঠিকা-প্রজারা, সাবালক বা নাবালক যাই হোক না কেন, তারা যে কেবল নিজেদের ভোট দিত তা নয়, এই শতাব্দীতে যত ভোটার মারা গেছে, তাদের সকলের নামে জাল ভোট দিয়ে আসত। বড়মা ছিলেন ঐতিহ্যবাহী ক্ষমতার প্রতীক। সরকার তো সাময়িক। ফলে তাঁর মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের ওপর ছড়ি ঘোরানো অভিজাততন্ত্রের আদর্শ দৃষ্টান্ত। জোড়াতালি দিয়ে জীবন কাটিয়ে যাওয়া সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন ঐশ্বরিক জ্ঞানের শেষ কথা। শান্তির সময়ে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য সর্বোচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিদেরও রীতিমতো চিন্তিত রাখত। তবে তিনি নিজের সাথি ও সহযোগীদের ভালো-মন্দ দেখতেন। তার জন্যে ষড়যন্ত্র বা জাল ভোটের পথে যেতে তিনি পিছপা হতেন না। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় বড়মা নিজের দলের লোকেদের গোপনে অস্ত্রশস্ত্র জোগাতেন। আবার এই সব লোকেরা যাদের ওপর হামলা করত, জনসমক্ষে বড়মা সে সমস্ত নিগৃহীতদের সাহায্য করতেন। এমন বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের জন্যেই তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন।

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নিজের দায়িত্বের বোঝা কমানোর জন্যে উপদেষ্টাদের সহায়তা পছন্দ করতেন না। রাষ্ট্রপতি ভবনের যে হলঘরে বসে তিনি জনগণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন তার অন্য পাশে ছিল একটা শান-বাঁধানো উঠোন। ঔপনিবেশিক আমলের লাটসাহেবরা সেটাকে গুদাম বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার কাজে ব্যবহার করতেন। হলঘর আর উঠোনের মধ্যিখানে ছিল সাইপ্রাস গাছে ঘেরা এক ঘরোয়া বাগান। প্রেমঘটিত কারণে ঔপনিবেশিক আমলের শেষ দিকে এক পর্তুগিজ সন্ন্যাসী সেখানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। বহু পুরস্কারে ভূষিত দেহরক্ষীবাহিনীর সতর্ক পাহারায় থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি কিন্তু সন্ধ্যার পর এখান দিয়ে যাওয়ার সময় গা ছমছম ভাব এড়াতে পারতেন না। সে রাতে কিন্তু শিহরন এত গভীর ছিল যে সেটাকে অশুভ সংকেত বলে মনে না কবে উপায় ছিল না। রাষ্ট্রপতি তাঁর ঐতিহাসিক ভবিতব্য সম্পর্কে সচেতন হলেন। নির্দেশ জারি হল,—ন' দিন ধরে জাতীয় শোক পালন করা হবে। আর বড়মাকে ভূষিত করা হবে দেশের জন্যে রণক্ষেত্রে নিহত বীরাঙ্গনার মরণোত্তর সম্মানে। ভোরবেলা রাষ্ট্রপতি রেডিও, টেলিভিশনসহ সমস্ত প্রচার মাধ্যম মারফত তামাম দেশবাসীর কাছে এই নাটকীয় ঘোষণা করলেন। সেই সঙ্গে আশা প্রকাশ করলেন যে বড়মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সারা পৃথিবীর কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ হেন প্রস্তাব যে খুব সহজে বিনা বাধায় কার্যকরী করা সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য। যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে তার জন্যে বড়মার পূর্বপুরুষদের তৈরি করা দেশের আইনি কাঠামো যথেষ্ট নয়। আইনজ্ঞ পণ্ডিতের দল, সংবিধান বিশেষজ্ঞরা আইনি তর্কে জড়িয়ে গিয়ে হাবুডুবু খেতে খেতে এমন এক সূত্র অনুসন্ধান শুরু করলেন যার ফলে বড়মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি আইনত সিদ্ধ হয়। ক'দিন ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মহলে তুলকালাম চলল। এক শতাব্দীরও পুরোনো, বিমূর্ত আইনের জমিতে শিকড় গজিয়ে যাওয়া আইনসভা গৃহে জাতীয় নেতা ও গ্রিক চিন্তাবিদদের আবক্ষ মূর্তির অন্তরালে বড়মাকে নিয়ে এমন বিতর্ক শুরু হল যা শেষ হওয়ার কোনও লক্ষণই নেই। এ দিকে সেপ্টেম্বরের গরমে মাকোন্দোয় তাঁর মৃতদেহে ততদিনে পচন ধরতে শুরু করেছে। বেতের দোলচেয়ার, দুপুর দু'টোর দিবানিদ্রা বা সর্ষের পুলটিশ ছাড়াই তাঁর সম্বন্ধে এই প্রথম লোকজন কথা বলতে বা ভাবতে শুরু করল। নাম-গোত্র সম্পন্ন মানবীরূপে নয়, বিমূর্ত কিংবদন্তির নায়িকা হিসেবে লোকে তাঁকে দেখতে লাগল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বকবকানি আর গুলতানি চলল। সারা প্রজাতন্ত্র জুড়ে যেন ছড়িয়ে পড়ল তার প্রতিধ্বনি। অবশেষে সেই বিশুদ্ধ আইন বিশারদদের মধ্যে থেকে এমন একজন মুখ খুললেন যার বাস্তব সম্পর্কে অন্তত কিছুটা জ্ঞানগম্যি আছে। ঐতিহাসিক কচকচানি থামিয়ে তিনি মনে করিয়ে দিলেন যে

তাঁদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বড়মার মরদেহ ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় পড়ে রয়েছে। লিখিত আইনের তাত্ত্বিক পরিবেশে হঠাৎ যেন সাধারণ বোধের বিস্ফোরণ ঘটল। প্রতিবাদ করার সাহস কারও হল না। সুগন্ধি যুক্ত ওষুধ লাগিয়ে মৃতদেহটা তাজা রাখার নির্দেশ দেওয়া হল। ওদিকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আইনসিদ্ধভাবে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি নিশ্চিন্ত করার জন্যে সমাধান-সূত্র সন্ধান, মত পার্থক্য মেটানো, সংবিধান সংশোধন ইত্যাদির উদ্যোগ নেওয়া হল।

এত কথা হয়েছিল যে সে সব আলোচনা দেশের সীমানা পেরিয়ে, মহাসাগর ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতের মতো 'কাস্তেল গানদোলফো'-তে অবস্থিত পোপের প্রাসাদেও পৌঁছে যায়। অগস্ট মাসের তীব্র গরমের দিনে দিবানিদ্রা সেরে মহামান্য পোপ তখন সবে জানালার কাছে এসে বসেছেন। জানালা দিয়ে তিনি দেখছিলেন যে ডুবুরিরা পুকুরে ডুব দিয়ে একটি মেয়ের কাটা মাথা খুঁজে চলেছে। মেয়েটিকে মাথা কেটে হত্যা করা হয়েছিল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সান্ধ্য সংবাদপত্রে এই হত্যাকাণ্ডের খবর ছাড়া অন্য কোনও বিষয় ছিল না বললেই চলে। নিজের গ্রীষ্ম-আবাসের এত কাছে ঘটে যাওয়া এই রহস্যময় অপরাধ সম্বন্ধে স্বাভাবিক কারণেই মহামান্য পোপ উদাসীন থাকতে পারেননি। তবে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দেখা গেল, খবরের কাগজগুলো অপ্রত্যাশিতভাবে বিষয় বদল করেছে। যে সব নিরুদ্দিষ্ট মেয়েদের একজন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে থাকতে পারে, এতদিন নিয়ম করে প্রতিদিনই তাদের ছবি ছাপা হচ্ছিল। তার বদলে একটি বছর বিশেকের তরুণীর ছবি ছাপা হয়েছে। ছবিটির চার পাশে মোটা করে কালো দাগ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে মেয়েটি প্রয়াত। মহামান্য পোপ চেঁচিয়ে উঠলেন,—'বড়মা।' বহু বছর আগে যখন তিনি সেন্ট পিটারের আসন প্রথম অলংকৃত করেছিলেন, তখন এই অস্পষ্ট ছবিটি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ফোটোগ্রাফির প্রথম যুগে যখন রুপোর পাতের উপর ফোটো তোলা হত, সেই পদ্ধতিতে তোলা ছবিটি তিনি দেখামাত্রই চিনতে পারলেন। পোপের সহকারী অন্যান্য যাজকরাও নিজের নিজের বাসস্থানে বসে একইভাবে সমবেত সুরে চিৎকার করলেন,—'বড়মা'। কুড়ি শতাব্দীর মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার খ্রিস্টান ধর্মের সীমাহীন সাম্রাজ্য ভীত, বিচলিত ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। অবশেষে মহামান্য পোপ বড়মার অত্যাশ্চর্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত হওয়ার জন্যে তাঁর বিশাল গণ্ডোলা জলে ভাসিয়ে সুদূরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

চকচকে পিচফলের বাগিচা পিছনে পড়ে রইল। রোম শহর থেকে আলবান পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীন রোমান যুগে নির্মিত 'ভিয়া আপিয়া আন্তিকা' নামের ঐতিহাসিক রাস্তার দু' পাশের অভিজাত বাড়িগুলোর ছাদে শুয়ে চলচ্চিত্রাভিনেত্রীরা তখন রৌদ্র-স্নান করে ত্বকের চাকচিক্য বাড়াচ্ছিলেন। গোলমাল নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা কারও খেয়াল ছিল না। রোম শহরের অন্য প্রান্তে টাইবার নদীর তীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে 'কাস্তেল সন্ত আঞ্জেলো'-র ছোটখাট অথচ গম্ভীর দর্শন পাহাড়। সন্ধ্যাবেলায় মাকোন্দোর ভাঙা ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে সেন্ট পিটারের গির্জার ঘণ্টাধ্বনি সৃষ্টি করল বিচিত্র সুর-মূর্ছনা। রোমান সাম্রাজ্য আর বড়মার নিজস্ব এলাকার মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছিল ঘাস-আগাছায় ভরা চোরা জলাভূমি। সেখানে দমবন্ধ হওয়া তাঁবুর ভিতরে শুয়ে সারারাত ধরে মহামান্য পোপ শুনতে পেতেন বাঁদরদের কিচিরমিচির। লোকজনের চলাফেরায় ওরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। নৈশ সফরের সময় ইউকা গাছের বস্তা, কাঁদি কাঁদি কাঁচাকলা আর মুরগির ঝাঁকায় তাঁর নৌকো ভরে উঠত। যে সব নারী-পুরুষ নিজেদের রোজকার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করে কিছু কামানোর জন্যে বড়মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে যাচ্ছিল, তারা উঠে পড়ে মহামান্য পোপের নৌকোয়। মহামান্য পোপ সে রাতে জ্বর জ্বর ভাবের জন্য ঘুমোতে পারলেন না। মশার কামড়ে সারাটা রাত ছটফট করে কাটালেন। তবে মহান বৃদ্ধার এলাকায় অপূর্ব সূর্যোদয় দেখে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। একই সঙ্গে সুগন্ধি আপেল আর ইগুয়ানা জাতীয় বিশালাকার টিকটিকির জন্মস্থান দেখে বিভোর হয়ে যাওয়ায় মহামান্য পোপের মন থেকে দীর্ঘ সফরের সব কষ্টের স্মৃতি মুছে গিয়ে মনে হল,—এত কষ্টের বিনিময়ে এ যাত্রায় যা পেয়েছেন তা কিছু কম নয়।

দরজায় তিনটি টোকা শুনে নিকানোরের ঘুম ভেঙেছিল , আসলে সেই তিনটি টোকাই মহামান্য

পোপের আবির্ভাব ঘোষণা করেছিল। মৃত্যু যেন বাড়িটার মালিকানা দখল করে রীতিমতো জাঁকিয়ে বসেছে। রাষ্ট্রপতি বারেবারে বড়মার মৃত্যু নিয়ে ভাষণ দেওয়ায় বিষয়টির গুরুত্ব ফুটে ওঠে। সংসদ সদস্যরা তো প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে তর্ক করতে করতে গলাই ভেঙে ফেললেন ; তার পর ইঙ্গিত-ঈশারায় চালিয়ে গেলেন তাঁদের বিতর্ক। এই সব দেখে-শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজারে হাজারে মানুষ নিজেদের কাজ-কর্ম শিকেয় তুলে বড়মার বাড়িতে জড়ো হয়। অন্ধকার বারান্দা, জিনিসপত্রে ঠাসা দরদালান, দমবন্ধ করা চিলেকোঠা সব লোকে লোকারণ্য। যারা দেরিতে পৌঁছোল, তারা বেড়ার ওপর, পাহারাদারের গুমটিতে, কাঠের কাজ করা দেওয়ালে বা ঝোপঝাড় বেয়ে উঠে বেশ আরামেই আস্তানা গড়ে তোলে। বড় হলঘরটায়, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় মমিতে পরিণত হওয়া বড়মার মরদেহ চিরনিদ্রায় শায়িত। তার ওপর জমে ওঠে টেলিগ্রামের পাহাড়। কান্নায় অবশ হয়ে যাওয়া ন'জন ভাইপো গভীর আবেগ ও পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে সারা রাত জেগে মৃতদেহের পাশে বসে নজরদারি করে যাচ্ছিল।

তারপরেও বেশ কয়েক দিন অপেক্ষা না করে উপায় ছিল না। পুরসভা ভবনের একটি ঘরে মহামান্য পোপের থাকার বন্দোবস্ত হল। সেখানে আসবাবপত্র বলতে ছিল গোটা চারেক চামড়ার গদি আঁটা টুল। বিশুদ্ধ পানীয় জলে ভরা একটি মাটির কলসি আর একটা দড়ির দোলনা। ঘেমে নেয়ে, অনিদ্রার যন্ত্রণায় ভুগে পোপ সেখানে দমবন্ধ করা রাত কাটাতেন। দপ্তরের পুরোনো নথি পড়ে তাঁর সময় কাটে। যে সমস্ত বাচ্চা জানালার বাইরে থেকে তাঁকে দিনের বেলায় দেখতে আসত, তাদের তিনি মুঠো মুঠো ইতালিয়ান চকোলেট বিলোতেন। আর হিবিস্‌কাস জাতীয় গাছ দিয়ে ছাওয়া ছাউনির তলায় বসে কখনও ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল আবার কখনও বা নিকানোরের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারেন। প্রতীক্ষা আর উষ্ণতায় ভরা দিনগুলো যেন বড্ড দীর্ঘ আর প্রলম্বিত মনে হচ্ছিল। সময় যেন আর কাটতেই চায় না। অবশেষে একদিন ফাদার পাসত্রানা একজন ঢুলিকে সঙ্গে করে শহরের কেন্দ্রীয় চত্বরে দাঁড়িয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত চিৎকার করে পড়তে শুরু করলেন। 'সরকারের তরফ থেকে বলছি',—টাক ডুমা ডুম করে ঢোল বেজে উঠল। ফাদার আবার সুর ধরলেন,—'বিশেষ আইন চালু হওয়ার দরুন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি বড়মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে পারবেন।' তাঁর বয়ান ভালোমতো শেষ হওয়ার আগেই টাক ডুমা ডুম আওয়াজ করে ঢোল বেজে উঠল।

শেষপর্যন্ত এসে গেল সেই স্মরণীয় দিন। রকমারি জুয়া-লটারি, নানান রকমের ভাজাভুজি, খাবার-দাবারের দোকান-পাটে ভরে গেল সব রাস্তা-ঘাট। জনাকয়েক লোক গলায় সাপ জড়িয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে এক ধরনের মলম বিক্রি করতে শুরু করে দিল। ওটা নাকি যে কোন সংক্রমণজনিত রোগের অব্যর্থ ওষুধ। এমনকী অমরত্ব লাভের উপায় বলেও দাবি করা হচ্ছিল। কেন্দ্রীয় চত্বরে লোকজনেরা টাঙিয়েছিল নানান রঙের তাঁবু। বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিচিত্র সব বিছানার চাদর। সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত তীরন্দাজেরা কর্তাব্যক্তিদের জন্যে পথ পরিষ্কার করছিল। 'সান খোর্খে'-র ধোপানীরা, 'কেপ ভেলা'-র মুক্তো-তোলা জেলেদের বাহিনী, 'সিয়েনাগা'-র মাছের জাল বানানোর কারিগরেরা, 'তাসাহেরা'-র চিংড়িমাছ ধরা জেলেদের দল, 'মোহাহানা'-র জাদুকরেরা, 'মানাউরে'-র লবণ খনির শ্রমিকবাহিনী, 'ভাইয়েদুপার'-এর বেহালা বাজিয়ের দল, 'আয়াপেল'-এর দক্ষ ঘোড়সওয়ারেরা, 'সান পেলায়ো'-র দরিদ্র সঙ্গীতশিল্পীবৃন্দ, 'লা কুয়েভা'-র মুরগি পালনকারীরা, 'সাবানাস দে বলিভা'-র জাত শিল্পীর দল, 'রেবোলো'-র ফুলবাবুদের দল, 'মাগদালেনা'-র দাঁড়-টানা মাঝিরা, 'মোনপক্স'-এর কলম পেশা করণিককুল, আর যাদের নাম এই কাহিনির সূচনায় বলা হয়েছে,—সবাই চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় জড়ো হয়েছিল। এমনকী কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার পুরোনো সৈন্যেরা বড়মার ওপর তাদের একশো বছরের পুরোনো রাগ ভুলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে এল। তাদের পুরোভাগে ছিলেন বাঘের নখ-দাঁত-ছাল দিয়ে তৈরি পোশাক পরা ডিউক অফ মার্লবরো। গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এই সৈনিকেরা তাদের প্রাপ্য পেনশনের জন্যে ষাট বছর অপেক্ষা করেছে। এই সুযোগে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিকে পাওনা পেনশন বরাদ্দ করার অনুরোধ জানানোর উদ্দেশ্যে তারা সমবেত হয়েছিল।

জনতা প্রায় উন্মত্ত। গরমে তাদের দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। সৈনিকের পোশাকে সুসজ্জিত

অভিজাত সেনাবাহিনী কোনওরকমে জনতাকে সামলায়। বেলা এগারোটা নাগাদ জনতা আনন্দে সমস্বরে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। জ্যাকেট আর আনুষ্ঠানিক টুপি পরে গম্ভীর, সৌম্য দর্শন রাষ্ট্রপতি উপস্থিত। সঙ্গে রয়েছে মন্ত্রীমণ্ডলী, মাননীয় সাংসদবৃন্দ, সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারকমণ্ডলী, সংবিধান স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির প্রধানেরা, দেশ-বিদেশের পাদ্রিকুল এবং ব্যাঙ্ক-বাণিজ্য-শিল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আসা এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা টেলিগ্রাফ অফিসের পাশে সমবেত হলেন। বেঁটে, মোটা, বৃদ্ধ রাষ্ট্রপতির মাথা জোড়া টাক। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি জনগণকে বিস্মিত করে রীতিমতো প্যারেডের ভঙ্গিতে হেঁটে গেলেন। এরাই তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। তবে সামনাসামনি কখনও দেখেনি। এই সুযোগে লোকে তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে নিশ্চিন্ত হল। পদমর্যাদার ভারে নুইয়ে যাওয়া পাদ্রি আর প্রশস্ত বুকে তকমা লটকানো সামরিক কর্তাব্যক্তিদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের অধিপতি যেন ক্ষমতার জ্যোতি বিকিরণ করলেন।

এবার দেখা দিল দ্বিতীয় সারি। শোকের পোশাক পরিহিত শান্ত মিছিলে দেশের রানিরা পা মেলাল। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং যারা হতে পারে সব কিছুর রানি, তারা জীবনে এই প্রথম কোনও রকম পার্থিব জাঁকজমক ছাড়া এখান দিয়ে হেঁটে গেল। সবার আগে বিশ্ব রানি ; তার পিছনে সার দিয়ে সয়াবিন রানি, কলা রানি, টুকরো ফলের রানি, ময়দার মতো ইউকা রানি, পেয়ারা রানি, ডাবের রানি, কালো দানার সয়াবিন রানি, ৪২৬ কিলোমিটার লম্বা ফিতে-ওয়ালা ইগুয়ানার ডিমের রানি, এবং আরও অনেক কিছুর রানি। সব কিছুর নাম এখানে করা সম্ভব নয়। কারণ, তাহলে কাহিনি শেষ করা যাবে না।

বড়মা এখন লালচে বেগুনি রঙের কাপড়ের পাকে মোড়া কফিনে শায়িত। তামার তৈরি আটটা টার্নবাক্‌ল গোছের বোতাম তাঁকে বাস্তব থেকে আলাদা করে রেখেছে। নিয়মমাফিকভাবেই বড়মা এখন চিরন্তনের সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। আর এভাবেই তাঁর মহত্ত্বের মাত্রা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যখন গরমে ঘুমোতে না পেরে তিনি বারান্দায় বসে স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর মধ্যে থেকে ফুটে বেরোত এক বিশেষ ধরনের ঔজ্জ্বল্য আর মর্যাদা। এখন তার সঙ্গে মিশে গেছে আটচল্লিশ জন রানি, যারা তাঁর স্মৃতিকে জানিয়েছে মরণোত্তর সম্মান। স্বয়ং পোপ মানসিকভাবে অস্থির অবস্থায় কল্পনা করছিলেন, বড়মা যেন এক চোখ ঝলসানো গাড়িতে চড়ে ভ্যাটিকানের বাগানের ওপর শূন্যে ঝুলছেন। তবুও গরম অগ্রাহ্য করে, নকশা কাটা তাল পাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে নিজের উপস্থিতির মাধ্যমে পৃথিবীর সবচেয়ে জমকালো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে সম্মানিত করলেন।

কে সবচেয়ে পদমর্যাদা সম্পন্ন, কারা কফিন বয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার পাবে, তা নিয়ে বিতর্ক শেষমেশ মিটল। সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিরা কাঁধে করে কফিন পথে নিয়ে এলেন। ঠিক তখনই আকাশে উড়তে থাকা পায়রাদের ছায়া প্রহরীর মতো কফিনটাকে আগলে রেখেছিল। লোকেরা অবিশ্যি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেনি। ক্ষমতার জৌলুশে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। মাকোন্দোর মাথাগরম মানুষেরা যখন শোক মিছিলে চলেছিল, এক পাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন অশুভ শকুনও যে তাদের অনুসরণ করছিল, তা কেউ নজর করেনি। কর্তাব্যক্তিদের চলার পথে যে জঞ্জালের স্তূপ সৃষ্টি হচ্ছিল, তা কেউ খেয়াল করেনি। মৃতদেহ বাড়ি থেকে বেরোতে না বেরোতেই বড়মার ভাইপো, পুষ্যি, আশ্রিত আর কাজের লোকেরা বাড়ির সব দরজা-জানালা বন্ধ করে বাড়ি ভাগের আগ্রহে এখানে-ওখানে সর্বত্র খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দেয় ; এই বিষয়টা অবিশ্যি কারও নজরেই এল না। আরও একটা বিষয় কারও চোখে পড়েনি,—একটানা চোদ্দোদিনব্যাপী প্রার্থনা, আবেগ, উচ্ছ্বাস শেষ হওয়ার পর দস্তার ডালা দিয়ে বড়মার সমাধি পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে দেওয়ার পর মুহূর্তেই সমবেত জনতা যেন এক বিশাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন কয়েকজন বুঝতে পারে যে তারা এক নতুন যুগের জন্ম দেখছে। এখন মহামান্য পোপ দেহ ও আত্মাসহ স্বর্গে আরোহণ করতে পারেন। মর্ত্যলোকে তাঁর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নিজের বিবেচনা অনুযায়ী দেশ শাসন করতে পারেন। রানিরা বিয়ে-শাদি করে সুখী হতে পারে। জন্ম দিতে পারে বহু পুত্রসন্তানেব। জনগণ খাঁটি মানুষ হিসেবে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে বড়মার সীমাহীন জমিদারির যে কোনও অংশে তাঁবু খাটাতে পারে। কেননা সেই

একটি মানুষই তাদের বাধা দেওয়ার হিম্মত রাখতেন। দস্তার ডালার তলায় রাখা তাঁর দেহটা এখন ধুলোর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কেবল একটা কাজই বাকি। সবার সামনে একটা টুলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে কোনও একজনের এই কাহিনিটা বলে যাওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষ শিক্ষা নিতে পারে। দুনিয়ার কোনও অবিশ্বাসী মানুষ বড়মার ইতিবৃত্ত না জেনে পারবে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী এ সংবাদ প্রবাহিত হবে। এদিকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ফলে জমে ওঠা যাবতীয় জঞ্জাল কাল সকালে ঝাড়ুদারেরা এসে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেবে।

মূল শিরোনাম . Los funerales de la Mamá Grande

মঙ্গলবারের দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম

তূণের মতো বেলেপাথরের সুড়ঙ্গ পেরিয়ে ট্রেনটা সুন্দরভাবে দিগন্ত ছুঁয়ে থাকা সাজানো কলাবাগান অতিক্রম করতে লাগল। বাতাস আর্দ্র হয়ে উঠছে। বেশিক্ষণ সাগরের হাওয়া উপভোগ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হল না। গাড়ির জানালা দিয়ে একরাশ দমবন্ধ করা ধোঁয়া আসছে। রেললাইনের পাশ ঘেঁষে যে সরু রাস্তাটি গেছে সেখানে সবুজ কলার কাঁদি ভর্তি গোরুর গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা পেরিয়ে চাষ না হওয়া জমিতে এলোপাথাড়িভাবে দাঁড়িয়ে আছে লাল ইটের বাড়িগুলো। ওগুলো সব অফিস। ওই সব অফিসে আবার ইলেকট্রিক পাখাও আছে। আর রয়েছে কিছু গৃহস্থ বাড়ি। সেগুলোর উঠোনে রয়েছে ধুলো ভর্তি পামগাছ, গোলাপ ঝাড়। সিঁড়ির উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে চেয়ার আর ছোট ছোট সাদা টেবিল। বেলা সবে এগারোটা এবং এখনও রোদের দাপট শুরু হয়নি। 'তুই বরং জানালাটা বন্ধ করে দে',—মহিলা বললেন। 'তোর চুল ধুলোয় ভরে যাবে।'

মেয়েটি চেষ্টা করল। কিন্তু মরচের জন্যে জানালাটা বন্ধ করা গেল না। অতএব ছায়াও পাওয়া গেল না। তৃতীয় শ্রেণীর এই নির্জন কামরায় কেবলমাত্র তারাই যাত্রী। জানালা দিয়ে গলগলিয়ে ইঞ্জিনের ধোঁয়া ঢুকছে বলে মেয়েটি জায়গা বদলে নিল। আর সরিয়ে রাখল তাদের একমাত্র সম্বলটিকে। প্লাস্টিকের প্যাকেটে মোড়ানো কিছু খাবার আর খবরের কাগজে মোড়া একগুচ্ছ ফুল। এবার জানালা থেকে দূরে সরে সে মায়ের মুখোমুখি। দুজনেরই পরনে জীর্ণ শোকের পোশাক। মেয়েটির বয়স বছর বারো আর এটাই তার জীবনের প্রথম রেলভ্রমণ। তার মা হিসাবে মহিলাকে তাঁর ঢলঢলে পোশাকে বেঢপ চেহারায়, নীল শিরা ওঠা চোখে যথেষ্ট বয়স্ক লাগছে। তিনি যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে শিরদাঁড়ায় ভর দিয়ে, সিটে পিঠ ঠেকিয়ে বসে দু'হাতে রঙ চটে যাওয়া চামড়ার হাত ব্যাগটি জাপটে ধরে দারিদ্রের এক বিশুদ্ধ প্রশান্তি বহন করছিলেন।

বারোটা নাগাদ শুরু হল গরম হাওয়া। ট্রেনটা জল নেবার জন্য এমন এক স্টেশনে দাঁড়াল যার আশপাশে কোনও লোকালয় নেই। বাইরে কলাবাগানের রহস্যময় নিস্তব্ধতায় ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ বিরাজমান। কিন্তু কামরার মধ্যেকার স্থির বাতাসে কাঁচা চামড়ার মতো গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। ট্রেনের গতি কখনওই বাড়ছে না। একই জাতের কাঠের তৈরি চকচকে রঙের বাড়ি, দেখলে মনে হয় একই শহর; পর পর এমন দুটো একইরকম স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়াল। মহিলার মাথা আস্তে আস্তে দুলতে লাগল এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। মেয়েটি জুতো খুলে রাখল। তারপর ফুলগুলোকে জলে ভিজিয়ে আনার জন্য সে বাথরুমে গেল।

ফিরে এসে সে দেখে খাবার নিয়ে মা অপেক্ষা করছেন। তিনি এক টুকরো পনির আর আধখানা কেক দিলেন। মোড়কের বাকিটুকু রাখলেন নিজের জন্য। তাদের খাওয়ার সময় ট্রেনটা ধীরে ধীরে একটা লোহার ব্রিজ পেরিয়ে একটা শহর অতিক্রম করল। এ শহরটাও আগেরগুলোরই মতো। শুধুমাত্র এখানে আলাদাভাবে ময়দানের জনসমাবেশ নজরে পড়ল। প্রখর সূর্যের তলায় একটা ব্যান্ডপার্টি প্রাণোচ্ছল বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে। শহরের অন্য পাশে খরায় ফেটে যাওয়া মাঠে কলাবাগানের শেষ সীমানা দেখা যাচ্ছে।

মহিলা খাওয়া থামালেন। 'জুতো পরে নে',—তিনি বললেন।

মেয়েটি বাইরে তাকিয়েছিল। খটখটে মাঠ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। ইতোমধ্যে বাড়তে শুরু করেছে ট্রেনের গতি। মেয়েটি খুব তাড়াতাড়ি কেকের শেষ টুকরোটুকু মোড়কবন্দি করে জুতো পরে নিল। মহিলা তাকে একটি চিরুনি দিলেন। 'চুলটা আঁচড়ে নে',—তিনি বললেন।

মেয়েটি চুল আঁচড়ানো শুরু করলে বাজতে আরম্ভ করল ট্রেনের বাঁশি। মহিলা তাঁর গলার ঘাম মুছতে লাগলেন। হাতের আঙুল দিয়ে মুখের তেলতেলে ভাবটা দূর করলেন। মেয়েটির আঁচড়ানো যখন শেষ হল, ট্রেনটি তখন শহরের প্রান্তসীমার বাড়িগুলো পেরোতে শুরু করছে। এই বাড়িগুলো আগেরগুলোর চেয়ে বড়, কিন্তু জীর্ণ।

'যদি কিছু করার থাকে এখনই সেরে নে',—মহিলা বললেন। 'পরে ছাতি ফেটে গেলেও জল পাবি না। আর কান্নাকাটি একদম নয়।'

মেয়েটি মাথা নাড়ল। খোলা জানালা দিয়ে জ্বালা ধরানো গরম হাওয়ার হলকার সঙ্গে ইঞ্জিনের বাঁশির তীক্ষ্ণ আওয়াজ আর পুরোনো কামরার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ আসছে। মহিলা বাকি খাবারটুকু প্লাস্টিকের প্যাকেটে মুড়িয়ে হাত ব্যাগে রেখে দিলেন। এক মুহূর্তের জন্যে অগস্ট মাসের রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে শহরটির সম্পূর্ণ চিত্র খোলা জানালার মধ্য দিয়ে দেখা গেল। ফুলগুলো খবরের কাগজে মুড়িয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে মেয়েটি মায়ের উপর চোখ রাখল। বিনিময়ে সে পেল একনিবিষ্ট অভিব্যক্তি। ট্রেনের বাঁশি বাজতে শুরু করেছে এবং গতিও কমে আসছে। খানিকক্ষণ বাদেই থেমে গেল ট্রেনটা।

স্টেশনে কেউ নেই। রাস্তার অন্য পাশে বাদাম গাছে ছাওয়া ফুটপাতের উপর কেবলমাত্র জলসত্রটি খোলা। শহর গরমে ভাসছে। মহিলা এবং মেয়েটি নামল ট্রেন থেকে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে ওঠা ঘাসে ঢাকা ফাঁকা স্টেশন পেরিয়ে রাস্তার ছায়াবৃত দিকে তারা এগোতে থাকল।

বেলা প্রায় দুটো। পুরো শহর ঝিমোতে ঝিমোতে মধ্যাহ্নের বিশ্রাম নিচ্ছে। এগারোটার মধ্যেই দোকানপাট-আপিস-কাছারি-স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। চারটের কিছু আগে যখন সব খুলবে ট্রেনটি তখন ফেরত যাবে। স্টেশনের বাইরের হোটেলগুলো, জলসত্র আর ময়দানের পাশের টেলিগ্রাফ অফিসটি খোলা। বাড়িগুলোর অধিকাংশই আসলে কলাবাগান কোম্পানির তৈরি। সব বাড়িরই দরজা ভেতব থেকে বন্ধ, পর্দা টানা। গরম এত বেশি যে কিছু কিছু লোক বাড়ির ছায়াঘেরা উঠোনে বসে দুপুরেব খাওয়ার পাট চুকিয়েছে। অন্য সবাই বাদাম গাছের ছায়ায় চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরোনোর আগে একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছে।

দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের মেজাজ এতটুকু নষ্ট না করে মহিলা এবং মেয়েটি সবুজ বাদাম গাছের ছায়ায় ছায়ায় শহরে প্রবেশ করল। সোজা যাজকের বাড়ি পৌঁছে মহিলা তাঁর নখ দিয়ে ধাতব দরজায় আঁচড় কাটলেন। এক মুর্হূত অপেক্ষা করেই আবার আঁচড় কাটতে শুরু করলেন। ভিতরে একটা ইলেকট্রিক পাখা ঘোরার শব্দ হচ্ছে। তাঁরা কোনও পদধ্বনি শুনতে পেলেন না। একটু পরে একটা দরজা খোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শোনা গেল এবং প্রায় একই সঙ্গে মানে, আঁচড় কাটার শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই একটা সাবধানী কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'কে?' মহিলা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন।

'আমার ফাদারকে দরকার,'—তিনি বললেন।

'তিনি এখন ঘুমোচ্ছেন।'

'বিষয়টা অত্যন্ত জরুরি,'—মহিলা একটু জোর দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত অথচ দৃঢ়।

দরজাটি নিঃশব্দে একটু খুলল এবং একজন মোটা চেহারার বুড়ি বেরিয়ে এল। তার চামড়া ফ্যাকাশে আর চুলগুলোর রঙ লোহার মতো। চশমার পুরু কাচের ভেতর দিয়ে তার চোখদুটোকে ভীষণ ছোট দেখাচ্ছে।

'ভিতরে আসুন,'—বলতে বলতে বুড়ি পুরো দরজাটা খুলে দিল।

তাঁরা ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের বাতাস বাসি ফুলের গন্ধে ভারী হয়ে আছে। বুড়ি তাদের একটা বেঞ্চিতে বসতে ইঙ্গিত করল। মেয়েটি তাই করল কিন্তু তাব মা হাত-ব্যাগটাকে শক্ত করে ধরে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাখা ঘোরার শব্দ ছাড়া আব কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

ঘরের শেষ প্রান্তের দরজা দিয়ে বুড়ি আবার ঘরে ঢুকল। 'উনি বললেন আপনারা তিনটের পর আসুন,'—বুড়ি খুব নিচু গলায় কথা বলল। 'মাত্র মিনিট পাঁচেক আগে তিনি শুয়েছেন।'

'ট্রেন সাড়ে তিনটেয় ছাড়বে',—মহিলা বললেন। সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ় উত্তর। কণ্ঠস্বর নিচু হলেও সুন্দর।

বুড়ি এই প্রথম হাসল।

'ঠিক আছে',—বুড়ি বলল। ঘরের শেষ প্রান্তের দরজাটি আবার বন্ধ হয়ে গেলে মহিলা মেয়ের পাশে বসলেন। বসবার ঘরটি খুবই সংকীর্ণ আর চেহারায় দীন দরিদ্র হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরটিকে দুটো অংশে ভাগ করে দেওয়া কাঠের রেলিঙের ওধারে একটি অয়েল ক্লথ পাতা লেখাপড়ার টেবিল। টেবিলের উপরে পুরোনো টাইপ মেশিন। পাশে একটা ফুলদানি আর তার পিছনে গির্জার দলিল-দস্তাবেজ। এটাকে একটি কুমারী মেয়ের পরিচালনাধীন অফিস হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

শেষ প্রান্তের দরজাটি খুলে গেল। এবার রুমাল দিয়ে চশমা মুছতে মুছতে ফাদার প্রবেশ করলেন এবং চশমাটি চোখে লাগাতেই বোঝা গেল যে বুড়ি দরজা খুলে দিয়েছিল, উনি তারই ভাই।

'আপনাকে কীভাবে সাহায্য করব?'—তিনি প্রশ্ন করলেন।

'কবরখানার চাবিটা দিয়ে'—মহিলা বললেন।

মেয়েটি ফুলগুলো কোলের উপরে রেখে বসে আছে। তার পা দুটো জড়াজড়ি করে ঢুকে আছে বেঞ্চির তলায়। ফাদার তার দিকে তাকালেন তারপর তাকালেন মহিলার দিকে। আর তারপর জানালার তারের জালের মধ্যে দিয়ে বাইরের মেঘমুক্ত উজ্জ্বল আকাশপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

'এই গরমে'—তিনি বললেন। 'সূর্যাস্ত হওয়া পর্যন্ত আপনার প্রতীক্ষা করা উচিত।' মহিলা নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন। ফাদার রেলিঙের ওধারে গিয়ে আলমারি খুলে একটা অয়েলক্লথে মোড়ানো খাতা বার করে কলম আর কালির দোয়াত নিয়ে টেবিলে বসলেন। তার হাত এতই লোমশ যে হাত দুটোকে অনায়াসে চুলহীন মাথার পরিপূরক হিসাবে দেখানো যায়।

'কার কবর দেখতে চান'—তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'কার্লোস্ সেনতেনোর',—মহিলা বললেন।

'কার?'

'কার্লোস্ সেনতেনো,'—মহিলা আবার বললেন।

ফাদার এখনও বুঝতে পারলেন না।

'গত সপ্তাহে এখানে যে চোরটিকে মারা হয়েছে'—মহিলা একই সুরে বললেন। 'আমি তার মা।'

ফাদার মহিলাকে এবার একটু খুঁটিয়ে দেখলেন। মহিলা যথেষ্ট হিসাব করে চোখ রাখলেন তাঁর দিকে। ফাদারের মুখ লালচে হয়ে উঠল। তিনি মাথা নামিয়ে লিখতে শুরু করলেন। পাতা ভর্তি করে তিনি মহিলাকে আত্মপরিচয় দিতে বললেন। মহিলা নিঃসংকোচে খুব সংক্ষিপ্তাকারে উত্তর দিতে লাগলেন। যেন ওই পাতায় যা লেখা হয়েছে তা তাঁর পড়া হয়ে গেছে। ফাদার এবার ঘামতে শুরু করলেন। মেয়েটি তার বাঁ পায়ের জুতো খুলে ফেলল। গোড়ালিটা জুতো থেকে বের করে বেঞ্চির তলার কাঠের উপর রাখল। ডান পায়ের বেলায়ও সে একইরকম করল।

গত সপ্তাহের সোমবার রাত তিনটে নাগাদ এখান থেকে কয়েকটা পাড়া দূরে এ ঘটনার সূত্রপাত। রেবেকা এক নিঃসঙ্গ বিধবা। তাঁর বাড়ি-ঘর অত্যন্ত অগোছালো। ঝিরঝিরে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে কানে এল কেউ যেন তাঁর বাড়ির সদর দরজা খোলার চেষ্টা করছে। তিনি উঠলেন। খুপরির মধ্যে সেকেলে রিভলবারটির জন্য হাতড়ালেন যেটি কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া শেষবারের মতো ব্যবহার কবেছিলেন এবং আলো না জ্বেলেই শোবার ঘরে গেলেন। আঠাশ বছরের একাকিত্ব তাঁর মধ্যে যে ভয় সৃষ্টি করেছিল, দরজার শব্দ তার চেয়ে বেশি ত্রাস সঞ্চার করতে পারেনি। অন্ধকারে তিনি শুধু দরজাটিই আন্দাজ করলেন না, ছিটকিনির সঠিক অবস্থানটাও বুঝে নিলেন। তিনি অস্ত্রটিকে দু' হাতে চেপে ধরে চোখ বুঁজে ট্রিগারে চাপ দিলেন। জীবনে এই প্রথম তাঁর বন্দুক চালানো। গুলি করার পর তিনি টিনের চালে ঝিরঝিরে বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলেন না। তারপর সিমেন্টের মেঝেয় কিছু গড়িয়ে পড়ার ভারী শব্দ তার কানে এল। নিঃশেষ হয়ে আসা নিচু গলার 'ও! মা!' আওয়াজও তিনি শুনলেন। পরদিন সকালে বাড়ির সামনে লোকটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার নাক ভেঙে গেছে। পরনে রঙিন ডোরা কাটা ফ্লানেলের জামা। আটপৌরে প্যান্ট সঙ্গে বেল্ট হিসাবে ব্যবহৃত এক চিলতে দড়ি

এবং খালি পা। শহরের কেউই তাকে চিনতে পারল না।

'তাহলে তারই নাম কার্লোস্ সেনতেনো',—লেখা শেষ করে ফাদার বিড়বিড় করে বললেন। 'সেনতেনো আইয়ালা',—মহিলা বললেন। 'আমার একমাত্র ছেলে।'

আলমারির দিকে ফিরে গেলেন ফাদার। দুটো মরচে ধরা চাবি আলমারির দরজার ভিতর দিকে ঝুলছিল। মেয়েটি কল্পনায় তার মাকে বাল্যাবস্থায় দেখবার চেষ্টা করল। তার মনে হল ফাদার নিশ্চয়ই কখনও ভেবেছেন যে এগুলি সেন্ট পিটারের চাবি। ফাদার চাবিগুলো নামিয়ে এনে খোলা খাতাটির উপর রাখলেন। এবং সবেমাত্র লিখে ফেলা পাতাটার দিকে তর্জনী উঠিয়ে মহিলার দিকে তাকালেন।

'এখানে সই করুন।' হাতব্যাগটি বগলে চেপে স্বাক্ষর করলেন মহিলা। মেয়েটি ততক্ষণে ফুলগুলো তুলে নিয়েছে। পা ঘসটাতে ঘসটাতে রেলিঙের দিকে এগিয়ে আসার সময় সে একনিবিষ্টভাবে তার মায়ের দিকে তাকাল।

ফাদার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আপনি কি কোনওদিন ওকে সঠিক পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন?'

সই করা শেষ করে মহিলা উত্তর দিলেন,—'ও খুব ভালো মানুষ ছিল।' ফাদার প্রথমে মহিলার দিকে তাকালেন, তারপর মেয়েটির দিকে এবং কিঞ্চিৎ আনন্দের সঙ্গে অনুভব করলেন মা এবং মেয়ে দু'জনেই এতক্ষণ অবধি একটি বারের জন্যেও কাঁদেনি।

মহিলা একই সুরে বলে চললেন,—'আমি ওকে কারও পাতের খাবার চুরি করতে নিষেধ করেছিলাম এবং ও আমার কথা রেখেছিল। আগে, যখন ও বক্সিং লড়ত মাঝেমধ্যেই নাকে ঘুষি খেয়ে দিন তিনেক ঘরে পড়ে থাকত।'

'ওর সব দাঁতগুলোকেও ফেলে দিতে হয়েছিল,'—মেয়েটি বলল। 'ঠিক,'—মহিলা সম্মতি দিলেন। 'সে সময় প্রতি গ্রাস খাবার মুখে নিলেই আমার ছেলের শনিবার রাতের ঘুষি খাওয়ার কথা মনে পড়ত।'

'ভগবানের ইচ্ছা দুর্জ্ঞেয়',—ফাদার বললেন। তবে তিনি কথাটি খুব একটা প্রত্যয় নিয়ে বলতে পারলেন না। হয়তো অভিজ্ঞতা তাঁকে কিছুটা অবিশ্বাসী করে তুলেছে অথবা প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ এর জন্য অংশত দায়ী। গরম হলকা থেকে বাঁচার জন্য তিনি তাদের মাথা ঢাকবার পরামর্শ দিলেন। হাই তুলতে তুলতে এবং প্রায় ঘুমে চোখ জুড়ে আসা অবস্থায় ফাদার তাদের বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে কার্লোস্ সেনতেনোর কবর খুঁজে পাওয়া যাবে। যখন তাঁরা ফিরে আসবেন তখন আর দরজার কড়া নাড়ার দরকার নেই। দরজার নিচে চাবিদুটো রেখে দিলেই হবে। এবং যদি তাদের ক্ষমতায় কুলোয় ওই একই জায়গায় গির্জার জন্য কিছু রেখে দিলে ভালো হয়। মহিলা খুব মনোযোগ সহকারে ফাদারের নির্দেশবাণী শুনলেন। কিন্তু একটুও না হেসে তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন।

ফাদার হঠাৎ লক্ষ্য করলেন কেউ ঘরের ভিতরের ব্যাপার-স্যাপারের ওপর নজর রাখছে। এমনকি সদর দরজা খোলার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও তার নাক দরজার ফোকরের মধ্যে ঢোকাচ্ছিল। বাইরে রাস্তায় রয়েছে একদল বাচ্চা। দরজা পুরোটা খুলে যাওয়ামাত্রই বাচ্চাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। সাধারণত এই সময় কারুরই রাস্তায় থাকার কথা নয়। কিন্তু এখন শুধু বাচ্চারাই নয়। সবুজ গাছের তলায় কিছু মানুষের জটলা। রোদ সাঁতরে রাস্তাটিকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখার পর বিষয়টা তাঁর বোধগম্য হল। তিনি আস্তে করে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

'একটু অপেক্ষা করুন',—মহিলার দিকে না তাকিয়েই তিনি বললেন।

দূরের দরজায় তখন তাঁর বোন দেখা দিয়েছে। একটা কালো জ্যাকেট রাতের পোশাকের উপর চড়ানো। চুলগুলো কাঁধ ছাপিয়ে নেমে এসেছে। বুড়ি নিঃশব্দে ফাদারের দিকে তাকাল।

'কী হয়েছে?'—ফাদার জিজ্ঞেস করলেন।

'সবাই লক্ষ্য করছে,'—বিড়বিড় করল বোনটি।

'আপনি বরং উঠোনের দিকের দরজা দিয়ে চলে যান,'—ফাদার বললেন।

'সেখানেও একই অবস্থা,'—বোন বলল। 'সবাই জানালায়।'

মহিলা মনে হয় এতক্ষণেও কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি। দরজার ধাতব ফুটোটা দিয়ে তিনি রাস্তাটা দেখবার চেষ্টা করলেন। তারপর মেয়েটির হাত থেকে ফুলের স্তবক নিয়ে দরজার দিকে এগোলেন। মেয়েটি তাকে অনুসরণ করল।

'সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ভালো হয় না?'—ফাদারের কণ্ঠে আর্তনাদ। 'গরমে গলে যাবেন,'—ঘরের পেছন দিক থেকে তার বোন যোগ করল। 'দাঁড়ান, আমি বরং আপনাকে একটা ছাতা দিই।'

'ধন্যবাদ,'—মহিলা উত্তর দিলেন,—'আমরা এভাবেই ঠিক আছি।'

তিনি মেয়েটির হাত ধরলেন এবং রাস্তায় নেমে গেলেন।

মূল শিরোনাম : La siesta del martes

এইরকম একদিন

সোমবার সকাল। বৃষ্টি নেই, বেশ গরম। দাঁতের ডাক্তার অরেলিও এসকোবার, যাঁর কোনও ডিগ্রি নেই, সকাল ছ'টায় ডাক্তারখানার ঝাঁপ খুলে, সাজিয়ে-গুছিয়ে বসে পড়লেন। কয়েক পাটি নকল দাঁত, যেগুলো এখনও প্লাস্টারের সঙ্গে জুড়ে তৈরি করা শেষ হয়নি, আর কয়েকটা যন্ত্রপাতি টেবিলে সাজানো আছে। ডাক্তারবাবুর গায়ে ডোরাকাটা জামা। জামায় কলার নেই। কিন্তু গলায় সোনালি বোতাম আটকানো। পরনে প্যান্ট। এমনিতে খ্যাংরাকাঠি হলে কী হবে, বসে আছেন একেবারে সিধে টানটান হয়ে। তাঁকে বোবা লোকের মতো দেখাচ্ছে। কারণ ঠিক ওইভাবেই তিনি চারপাশে পিটপিট করে তাকিয়ে দেখছেন। টেবিল সাজানো হয়ে গেল। ছোট্ট ড্রিলটা নিয়ে ডাক্তারবাবু আস্তে আস্তে তাঁর ডেন্টাল চেয়ারটার কাছে গেলেন। খুব সন্তর্পণে, নিবিষ্টমনে নকল দাঁতগুলো পালিশ শুরু করলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি কী করছেন তা নিয়ে আদৌ চিন্তিত নন, নেহাত করতে হয় তাই করে চলেছেন। ঘড়িতে আটটা বাজল। ডাক্তারবাবু মুখটা তুলে জানালার দিকে তাকালেন। উদাস দৃষ্টিতে সামনের বাড়ির দরজায় বসে থাকা দুটো চিলকে দেখতে থাকলেন। চিল দুটোকে দেখে মনে হচ্ছে, ওরা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আসলে বৃষ্টিতে ভেজা চিল দুটো সকালের রোদে স্নান করে নিজেদের শুকিয়ে নিচ্ছে। ডাক্তার আবার কাজের দিকে নজর দিলেন। দুপুরে খেতে যাবার আগেই হাতের কাজটা তুলে ফেলতে হবে। রোগিদের অপেক্ষা করার ছোট্ট ওয়েটিংরুম থেকে ডাক্তারবাবুর এগারো বছরের ছেলের চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ার আওয়াজ আসছে। ডাক্তারবাবুর একনিবিষ্টতা কিঞ্চিৎ বিঘ্নিত হচ্ছে।

'বাবা।'

'কী?'

'মেয়র জিজ্ঞেস করছেন তুমি ওঁর দাঁতটা তুলে দেবে কিনা?'

'ওঁকে বলে দাও, আমি এখানে নেই।'

ডাক্তারবাবু একটা সোনার দাঁত পালিশ করছিলেন। দাঁতটা হাতে করে চোখের থেকে খানিকটা দূরে নিয়ে আধবোজা চোখে দাঁতটাকে নিরীক্ষা করতে লাগলেন। ওয়েটিং রুম থেকে ছেলেটা আবার চেঁচিয়ে উঠল।

'মেয়র বলছেন, তুমি এখানে রয়েছ। কারণ, উনি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছেন'।

ডাক্তারবাবু দাঁতটা পরীক্ষাই করতে থাকলেন। পরীক্ষা শেষ হলে দাঁতটা টেবিলের উপর রেখে তিনি বললেন,—'খুব ভালো কথা'।

আবার ড্রিলটা চালু করলেন। তাঁর সাজসরঞ্জামের ছোট্ট বাক্স থেকে কযেকটি টুকিটাকি জিনিস বের করে আবার দাঁতটা পালিশ করতে শুরু করলেন।

'বাবা।'

'কী?' ডাক্তারবাবুর মুখভঙ্গি কিন্তু একটুও বদলায়নি।

'উনি বলছেন, তুমি ওঁর দাঁতটা তুলে না দিলে উনি তোমায় গুলি করবেন।'

কোনও তাড়াহুড়ো নেই। ড্রিলটা বন্ধ করে, আস্তে ধীরে সেটা সরিয়ে রেখে টেবিলের নিচের ড্রয়ারটা খুললেন। ড্রয়ারের মধ্যে একটা রিভলবার রয়েছে। 'ঠিক আছে',—ডাক্তারবাবু বললেন। 'ওঁকে আমায় গুলি করতে আসতে বলো।'

দরজার দিকে তাকিয়ে চেয়ারটা এগিয়ে দিলেন আর হাতটা থাকল ড্রয়ারের হাতলে। দরজায় মেয়র

দেখা দিলেন। মেয়রের মুখের বাঁদিকটা সুন্দরভাবে কামানো। অথচ ডানদিকটা যন্ত্রণায় ফুলে আছে, আর তাতে রয়েছে দিন পাঁচেকের না-কামানো দাড়ি। ডাক্তারবাবু নির্জীব চোখে বহু বিনিদ্র-বিষণ্ণ রাতের ছবি দেখতে পেলেন। হাতের ছোট্ট ঠেলায় আস্তে করে ড্রয়ারটা বন্ধ করে বললেন,—'বসে পড়ুন।'

'সুপ্রভাত',—মেয়র বললেন।

ডাক্তারবাবু শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন।

যন্ত্রপাতিগুলো গরম জলের মধ্যে ফুটছিল। মেয়র চেয়ারের পিছনে মাথা রাখার জায়গায় তাঁর মাথাটা এলিয়ে দিলেন। তাঁব নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস শীতল-মন্থর। ডাক্তারবাবুর চেম্বারে বড়ই দৈন্য দশা। একটা পুরোনো কাঠের চেয়ার, একটা পায়ে চালানো ড্রিল, কয়েকটা বোতল রাখা একটা কাচের আলমারি—এই সম্বল। চেয়ারের উলটো দিকের জানালায় কাঁধ পর্যন্ত ঝোলানো একটা পর্দা। মেয়র যখন বুঝলেন ডাক্তারবাবু তাঁর দিকেই আসছেন, তিনি হাঁ করলেন।

ডাক্তার অরেলিও এসকোবার মেয়রের মাথাটা আলোর দিকে ঘোবালেন। ভালো করে যন্ত্রণাদগ্ধ দাঁতটি পরীক্ষা করে খুব সাবধানে মেয়রের চোয়ালে চাপ দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিলেন। 'অবশ না করেই দাঁতটা তুলতে হবে।'

'কেন?'—মেয়র জিজ্ঞেস করলেন।

'মাড়িতে একটা ফোঁড়া রয়েছে।'

মেয়র ডাক্তারবাবুর চোখের দিকে তাকালেন। 'ঠিক আছে',—সম্মতি প্রদান করার সময় তিনি মৃদু হাসবার চেষ্টা করলেন। ডাক্তারবাবু কিন্তু ফিরে হাসতে পারলেন না। তিনি পরিশুদ্ধ যন্ত্রপাতির পাত্রটি ডেন্টাল চেয়ার সংলগ্ন টেবিলের উপর রাখলেন তারপর একটা ছোট্ট সাঁড়াশি দিয়ে গবম জল থেকে যন্ত্রপাতিগুলি বের করতে আরম্ভ করলেন। অবশ্যই এসব কাজে কোনও তড়িঘড়ি নেই। এরপর জুতোর ঠোক্কায় থুকদানটাকে ঠেলে দিয়ে হাত ধোয়া শুরু করলেন। এসব কাজ করবার সময় তিনি মেয়রের দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। ডাক্তারের দিক থেকে কিন্তু এক পলকের জন্যও চোখ সরাননি মেয়র।

নিচের পাটির আক্কেল দাঁত। পা দুটো ফাঁক করে ডাক্তারবাবু গরম সাঁড়াশি দিয়ে দাঁতটাকে চেপে ধরলেন। মেয়র চেয়ারের হাতল দুটো আঁকড়ে ধরে পা দুটো যত জোরে সম্ভব মেঝেব সঙ্গে চেপে ধরলেন। তাঁর পেটের ভিতরটা শূন্য মনে হতে লাগল, কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারিত হল না। শুধুমাত্র ডাক্তারবাবুর কবজিটা নড়তে লাগল। কোনও বিদ্বেষমূলক মনোভাব ছাড়াই এক অদ্ভুত তিক্ত কোমলতায় গলা ভিজিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন,—'এবার আমাদেব কুড়িজন মৃত মানুষের দাম দেবেন" মেয়র চোয়ালের হাড়ের ছোঁয়া পেলেন। তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে গেল। দাঁতটা বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে রইল। অবশেষে চোখের জলের মধ্যে তিনি দাঁতটাব দেখা পেলেন। অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক; গত পাঁচটা রাত্রির জন্য এই দাঁতটাই যে দায়ী এটা তাঁর বোধগম্য হচ্ছিল না।

ঘেমে নেয়ে, থুকদানটার দিকে ঝুকতে ঝুকতে তিনি প্যান্টের পকেট থেকে রুমালটা বার করতে চাইছিলেন। ডাক্তারবাবু তাঁকে একটুকরো পরিষ্কার কাপড় দিলেন।

'চোখের জলটা মুছে ফেলুন',—ডাক্তারবাবু বললেন। মেয়র তাই করলেন। তিনি কাঁপছেন। ডাক্তারবাবু যখন হাত ধুচ্ছিলেন মেয়র তখন ঘরের উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটা ধুলো ভর্তি মাকড়সার জাল আর তাতে কিছু মরা পোকামাকড়, মাকড়সার ডিম এইসব আটকে আছে। ডাক্তারবাবু হাত মুছতে মুছতে ফিরলেন।

'একদম বিশ্রাম,'—ডাক্তারবাবু বললেন। 'নুনজলে কুলকুচি করবেন।' মেয়র উঠে দাঁড়িয়ে পরিচিত মিলিটারি কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। কোটের বোতামগুলোও আটকানো হল না।

'বিলটা পাঠিয়ে দেবেন',—মেয়র বললেন।

'আপনার নামে না শহরের নামে?'

মেয়র ফিরেও তাকালেন না। দরজাটা বন্ধ করে দেবার পর ওপাশ থেকে শোনা গেল,—'দুই-ই সমান ব্যাপার।'

মূল শিরোনাম Un día de éstos.

এই শহরে কোনও চোর নেই

সূর্যের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গেই দামাসো ঘরে ফিরে এল। তার স্ত্রী আনা মাস দুয়েকের অন্তঃসত্ত্বা। সারাটা রাত তার জন্য অপেক্ষা করেছে বেচারি। বাইরে বেরোবার পোশাকে সে এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এমনকী জুতো জোড়াও পায়ে রয়েছে। লণ্ঠনটা দপদপ করে নিভতে শুরু করেছে। দামাসো অনুভব করল যে আনা সারাটা রাত্তির ধরে তার জন্য প্রতীক্ষা করেছে। এমনকী এই মুহূর্তে যখন সে আনার সামনে দাঁড়িয়ে আশ্বাসসূচকভাবে হাত নাড়ল তখনও কিন্তু আনার মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। আনার দৃষ্টি দামাসোর হাতের দলামোচড়া করা রক্তাক্ত কাপড়চোপড়গুলোর ওপর আটকে আছে। ঠোঁট জোড়া যেন দৃঢ়তার প্রতীক। সে থরথরিয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। শব্দহীন কাঠিন্যে শেমিজ সমেত তার হাতটা ধরে ফেলল দামাসো। আনা এক তিক্ত নিঃশ্বাস ছাড়ল।

নিজেকে শূন্যে ভাসিয়ে দিল আনা। তারপর হঠাৎই সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্বামীর লাল ডোরাকাটা জামায় মুখ রেখে ককিয়ে উঠল। এবং নিজেকে শান্ত করতে না পারা পর্যন্ত স্বামীকে আঁকড়ে জড়িয়ে থাকল।

‘একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,’—সে বলল। ‘বসে থাকতে থাকতে চোখ জুড়ে এসেছিল। আচমকা দরজাটা খুলে গেল আর তুমি রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে ঘরে ঢুকলে।’ দামাসো কিছুই না বলে আনাকে হাত ধরে উঠিয়ে বসাল। নিজেও তার পাশে বসল। মোড়কটা তার কোলে ফেলে বাথরুমে গেল দামাসো। মোড়কটা খুলতেই আনার নজরে পড়ল তিনটে বিলিয়ার্ড বল। দুটো সাদা আর একটা লাল। প্রত্যেকটাই অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বিবর্ণ আর ছেঁড়াখোঁড়া। ঘরে এসে দামাসো দেখল আনা গম্ভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে। ‘এগুলো কী হবে,’—আনা কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করল।

‘বিলিয়ার্ড খেলবার জন্যে।’

এবার মোড়কটা বেঁধে ট্রাঙ্কের তলায় বাড়িতে তৈরি হাড়ের চাবি, টর্চ আর ছুরিটার সঙ্গে সযত্নে রেখে দিল। জামাকাপড় না পালটিয়েই আনা দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়ল। দামাসো প্যান্টটা ছেড়ে বিছানায় ছড়িয়ে দিল। অন্ধকারে বসে সিগারেটে সুখটান মারতে মারতে দামাসো সেই কাক ভোবে দুঃসাহসিক অভিযানেব কয়েকটা টুকরো নিয়ে মনের মধ্যেই নাড়াচাড়া করতে লাগল যতক্ষণ না সে বুঝতে পারল তার বউ জেগে রয়েছে।

‘ভাবছটা কী?’

‘কিছু না’,—আনার ছোট্ট উত্তর। আনার গলার স্বব স্বাভাবিক অবস্থায় চাপা এবং মিঠে। এখন একটু ভারী ঠেকল, সম্ভবত ঘেন্নায়।

দামাসো সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে টুসকি মেরে খাটের নিচের মাটির মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল। ‘আর কিছুই পাওয়া গেল না,’—দামাসো দম নিয়ে বলল। ‘আমি একঘণ্টা ভিতরে ছিলাম।’

‘ওরা তোমায় গুলি করতে পারত’,—আনার মন্তব্য।

দামাসো কেঁপে উঠল। ‘চুপ করো’,—আঙুল দিয়ে খাটের বাজুর ওপরে টোকা মারতে মারতে সে ধমকিয়ে উঠল। সিগারেট আর দেশলাইয়ের জন্য সে মেঝের ওপর প্রায় নুইয়ে পড়ল।

‘তোমার অনুভূতি গাধার মতো,’—আনা বলল। ‘তোমার মনে রাখা উচিত ছিল এখানে আমি ঘুমোতে পারছি না। রাস্তায় যে কোনও গোলমালের শব্দ হলেই আমার মনে হচ্ছে, এই বুঝি তোমার মৃতদেহ নিয়ে ওরা হাজির হল।’ খানিকটা দম নিয়ে সে যোগ করে,—‘আর এতকিছুর শেষে—তিনটে বিলিয়ার্ড বল।’

'ড্রয়ারের ভেতর পঁচিশটা সেন্ট ছাড়া আর কিছুই ছিল না।'

'তার জন্যে তোমার যা খুশি আনার অধিকার নেই।'

'ঝামেলাটা শুরু হয়ে গেল,'—দামাসো বলল,—'আমি খালি হাতে ফিরে আসতে পারতাম না।'

'অন্য কিছু আনতে পারতে।'

'ওখানে আর কিছুই ছিল না।'

'ক্লাব হলের মতো অত জিনিস অন্য কোথাও নেই।'

'ওটা মনে হয়,'—দামাসো বলল। 'কিন্তু গোটাটা আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখলে দেখবে কোনওটাই এমন কিছু দামি নয়।'

অনেকক্ষণ সে চুপ করে থাকল। দামাসো ভাবল আনার চোখ খোলা, স্মৃতির গহন অন্ধকার থেকে যেন কিছু সংগ্রহে ব্যস্ত।

'হয়তো, তাই,'—আনা বলে উঠল। মদের ঝাঁঝটা তাকে ছেড়ে যেতে শুরু করেছে। একটা সমকেন্দ্রিক ঢেউয়ের ছন্দে সে আরও একবার বুঝতে চেষ্টা করল কতটা দায়িত্ব তার কাঁধে রয়েছে।

'ওখানে একটা বিড়াল ছিল',—দামাসো বলে উঠল। 'একটা বিরাট সাদা বিড়াল'। আনা ঘুরে শুল। ফুলে ওঠা থল্‌থলে পেটটা সে স্বামীর শরীরে চেপে ধরল। দামাসোর গায়ে পেঁয়াজের বোটকা গন্ধ।

'তুমি কি খুব ভয় পেয়েছিলে?

'আমি?'

'হ্যাঁ তুমি,'—আনা বলল। 'লোকে বলে মানুষ নাকি ভয়ও পায়।' দামাসো আনার হাসিটা অনুভব করতে পেরেই হেসে উঠল। 'এই একটু',—সে বলল। 'আমার পেটের অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়ছিল যে আমি আর সামলাতে পারছিলাম না।' চুমু না খেয়েই সে আনাকে চুমু খেতে দিল। তারপর ঝুঁকি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়ে সে আনাকে তার অভিযানের কথাটা একেবারে খুঁটিনাটি পর্যন্ত গড়গড়িয়ে বলে গেল। এতটুকুও অনুতাপ নেই। যেন বেড়িয়ে আসার পর সরস-সরল বৃত্তান্ত পরিবেশন করছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আনা বলল,—'পুরোটাই খুব হাস্যকর।'

'এটা একটা শুরু করার প্রশ্ন,'—চোখ বন্ধ রেখেই দামাসো উত্তর দিল। 'আর তা ছাড়া প্রথমবার হিসেবে এটা ততটা খারাপ নয়।'

সূর্যের তীব্রতা বাড়তে দেরি হচ্ছে। দামাসো ঘুম থেকে ওঠার খানিক আগেই তার বউ বিছানা ছেড়েছে। আলিস্যিটা পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলা অবধি দামাসো মাথাটা উঠোনের কলের নিচে রেখে দিল। অন্যগুলোর মতো এই ঘরটাও একই সারিতে সাজানো। মাঝখানে একটা বারোয়ারি উঠোন। দিনের অষ্টপ্রহর সেখানে ভিজে জামাকাপড় সার বেঁধে ঝোলে। ঘরের পিছনের দেওয়ালটার সঙ্গেই টিন দিয়ে ঘিরে উঠোন থেকে এক টুকরো জায়গা ছিনিয়ে নিয়ে একটা আলাদা না-ঘর-না-বারান্দা গোছের ছাউনি করা হয়েছে। সেখানেই একটা টেবিলের উপর রান্নাবান্না থেকে ইস্তিরি পর্যন্ত সবই হয়। দামাসোকে উঠতে দেখে আনা ইস্তিরি করা জামাকাপড়গুলো একপাশে সরিয়ে রেখে তোলা উনুনে কফি বসাল। দামাসোর তুলনায় আনার বয়সটা একটু বেশি। বিবর্ণ চামড়া আর চলাফেরার রূঢ়তা একসঙ্গে মিলে-মিশে ব্যাপারটা আরও বেশি করে চোখে পড়ে।

ঝিমধরা মাথা ব্যথার মধ্যেও স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল, আনা কিছু একটা বলতে চায়। এতক্ষণ পর্যন্ত উঠোনের গুলতানির দিকে তার নজর যায়নি।

'সকালের ব্যাপারটা ছাড়া অন্য কিছু নয়,'—কফি ঢালতে ঢালতে আনা বিড়বিড় করে বলল। 'কিছুক্ষণ আগেই ওরা সব ওখানে গেছিল।'

দামাসো দেখল তার জন্যই ছেলেরা আর বাচ্চাগুলো উঠোন থেকে আস্তে আস্তে সরে গেল। যে মেয়েগুলো ভিজে জামাকাপড় দড়িতে মেলতে মেলতে নিজেদের মধ্যে গুজ গুজ করছিল, কফিতে চুমুক দিতে দিতে সে তাদের কথাবার্তা নিঃশব্দে অনুসরণ করতে লাগল। শেষে একটা সিগারেট ধরিয়ে

দামাসো রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'তেরেসা',—দামাসো ডাকল।

ভেজা জামা পরা একটা মেয়ে ঘুরে তাকাল। 'সাবধান,'—আনা সতর্ক করে দিল। মেয়েটি এগিয়ে এল।

'কী হয়েছে রে?'—দামাসো প্রশ্ন করে।

'ক্লাব হল থেকে সব কিছু নিয়ে কেউ পালিয়েছে,'—মেয়েটি জবাব দেয়।

যেন সে সবকিছুই জানে এইভাবে সে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করল কীভাবে সব কিছুই আলাদাভাবে, মায় বিলিয়ার্ড টেবিলটাও নিয়ে কেউ পালিয়ে গেছে। সে এতটা জোর দিয়ে কথাগুলো বলছিল যে দামাসো বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে সব কথাই সত্যি নয়।

'ধুস্,'—দামাসো রান্নাঘরে ফিরে এল। আনা গুনগুনিয়ে গান শুরু করল। দামাসো এখন উঠোনের দেয়ালে চেয়ার ঠেকিয়ে বসে উদ্বেগ চাপা দিতে সচেষ্ট। তিনমাস আগে তার বয়স কুড়ি পেরিয়েছে, ঠোঁটের উপর হালকা গোঁফের রেখা তারই প্রমাণ। বেপরোয়া ভঙ্গির সঙ্গে এখনও একটা কোমলতা মিশে আছে। এবং সবমিলিয়ে তার বসন্তের দাগওয়ালা মুখটায় যে একটা ভারিক্কি ভাব এসেছে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তখন থেকেই মানে সেই মাস তিনেক আগে থেকেই তার হাবভাব প্রাপ্তবয়স্কসুলভ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজ এই সকালে যখন ভারাক্রান্ত মাথাটা গতরাতের দুঃসাহসিক ঘটনার স্মৃতিতে ছিঁড়ে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে দামাসো বুঝতে পারল না, বেঁচে থাকাটা কোথায় শুরু করতে হয়।

ইস্তিরি শেষ হলে দুটো জামাকাপড়ের পাঁজা গোছগাছ করে আনা বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে নিল। 'বেশিক্ষণের জন্য যেও না,'—দামাসোর নির্দেশসুলভ অনুরোধ।

'রোজকার মতোই।'

ঘর পর্যন্ত সে আনাকে অনুসরণ করল। 'তোমার গরম জামাটা ওখানে ফেলে এসেছি,'—আনা বলে। 'ডোরাকাটাটা এখন আর না পরাই ভালো।' সে তার স্বামীর কটা চোখের উপর চোখ রাখে।

'কেউ তোমায় দেখেছে কিনা, তা তো জানি না...।'

দামাসো ঘামে ভেজা হাতটা প্যান্টে মুছল। 'আমায় কেউ দেখেনি।'

'আমরা জানি না,'—আনা পুনরাবৃত্তি করল। দু-হাতে দুটো কাপড়ের বান্ডিল নিয়ে রওনা দিতে দিতে সে বলে,—'তাছাড়া তোমার বাইরে না যাওয়াটাই ভালো। অপেক্ষা করো না! আমি একবার বাইরেটা টহল দিয়ে আসি।'

শহরের লোকেরা অন্য কিছু নিয়েই কথাবার্তা বলছে না। আনা একই ঘটনার কথা বেশ কয়েক জায়গায় শুনল। অবশ্যই নানান কায়দায় এবং পরস্পরবিরোধী বর্ণনায়। সমস্ত কাপড়গুলো জমা দিয়ে সে অন্যান্য শনিবারের মতো বাজারে না গিয়ে সোজা চলে গেল প্লাজার ময়দানে।

যতটা ভেবেছিল তার থেকে অনেক কম লোককেই ক্লাব-হলের সামনে দেখতে পেল। ওর চোখে পড়ল,—কিছু লোক বাদাম গাছের ছায়ায় জটলা করে গুজ গুজ করছে। সিরিয় সম্প্রদায়ের মানুষদের পরনে মধ্যাহ্নভোজের ঝলমলে রঙিন পোশাক নেই। দোকানপাটগুলোও যেন চাঁদোয়ার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। হোটেলের লবিতে একটা লোক আরামকেদারায় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। সবকিছুই দুপুরের প্রখর তাপে থম মেরে আছে।

আনা ক্লাব-হলের চারপাশে পায়চারি শুরু করল। জেটির উলটো দিকের ফাঁকা জায়গাটা পেরোতে গিয়ে তার নজরে এল,—একরাশ জনতা। তখন তার মনে পড়ল দামাসো এক সময় তাকে বলেছিল,— সবাই অনেক কিছু জানতে পারে, কিন্তু এলাকার খদ্দেররাই সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে করতে পারে। ক্লাব হলের পিছনের দরজাটা ফাঁকা জায়গাটার ঠিক সামনে। পরক্ষণেই আনা হাতজোড়া পেটের উপর রেখে জনতার সঙ্গে মিশে গিয়ে দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল। ওটাকে এখন ভাঙার চেষ্টা চলছে। তালাটা অক্ষত রেখেই দাঁত তোলার মতো করে একটা কড়া খুলে ফেলা হল। ক্ষণেকের জন্যে আনার মনে

হল ক্ষতিটা ওই নিঃসঙ্গ আর অনুদ্ধত কাজের জন্যেই ঘটেছে। স্বামীর জন্য হঠাৎ আনার মনটা কেমন করে উঠল। 'লোকটা কে',—আনা হঠাৎ প্রশ্ন করে।

আশেপাশে তাকাতে তার সাহস হল না। তারা প্রত্যুত্তরে বলল,—'কেউ জানে না।' লোকে বলছে,—'এমন একজন যাকে কেউ চেনে না।'

'তাই হবে,'—পিছন থেকে একজন মহিলা বলে উঠলেন। 'এই শহরে কোনও চোর নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চেনে।' আনা তার মাথাটা ঘোরাল। 'নিশ্চয়ই,'—ও বলে ওঠে। হাসিতে ওর মুখটা ঝলমল করছে। ঘামে একেবারে ভিজে গেছে। কাঁধের চামড়াও কুঁচকিয়ে গেছে এমন এক বৃদ্ধ তার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে। 'সব কিছুই কি নিয়ে গেছে,'—আনা প্রশ্ন করে।

'দু'শো পেসো আর বিলিয়ার্ড বলগুলো,'—বৃদ্ধটি জবাব দেয়। আনার প্রতি এক অস্বাভাবিক আগ্রহ বৃদ্ধের চোখে-মুখে প্রতিফলিত। 'শিগ্‌গিরই আমরা নিজেদের চোখ খোলা রেখেই ঘুমোতে পারব,'—বৃদ্ধ আপনমনেই বলে ফেলল। আনা চোখ সরাল। 'নিশ্চয়ই,'—ও আবার বলল। আনা মাথার ওপর কাপড়টা তুলে দিল। এতটুকুও নড়ল না। কিন্তু অস্বস্তিকর অনুভূতি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। বুড়োটা এখনও ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। মিনিট পনেরোর মধ্যে সমস্ত ফাঁকা জায়গাটা জনতায় ভরে গেল! সকলের মধ্যেই এমন একটা সম্ভ্রমসূচক ভাব যেন মনে হচ্ছে ভাঙা দরজাটার ওপারে কোনও মৃতব্যক্তি শায়িত আছে। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই জনতা উত্তেজিত হয়ে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত ময়দানটা ভরে ফেলল।

শহরের মেয়র দু'জন পুলিশ নিয়ে ক্লাব-হলের সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্লাব-হলের মালিকও সেখানে উপস্থিত। পরনে হাফ প্যান্ট, ভুঁড়িটা কোনওরকমে আটকানো। চোখে আবার বাচ্চাদের মতো সস্তা চশমা। সমবেত জনতার সামনে নিজেকে গম্ভীর আর সম্মানীয় করে তোলার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। জনতা তাকে চারপাশ থেকে প্রায় জাপটিয়ে ঘিরে ধরল। জমাটভাবটা হালকা না হওয়া পর্যন্ত আনা দেয়ালে ঠেস দিয়ে মালিকের ভাষণ মন দিয়ে শুনল। তারপর গরমে ঘামতে ঘামতে প্রতিবেশীদের কানফাটানো চিৎকারের মধ্যে দিয়ে ঘরে ফিরে এল।

বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে দামাসো নিজেকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিল কী করে আনা একটাও সিগারেট না খেয়ে তার প্রতীক্ষায় সারাটা রাত কাটাল। সে আনাকে ঘরে ঢুকতে দেখল। হাসিতে আনার মুখ চকমক করছে। দামাসো আনার ঘামে ভেজা মাথার কাপড়টা খুলে ফেলল। মেঝেতে এতক্ষণে সিগারেটের একটা স্তূপ তৈরি হয়ে গেছে। দ্বিগুণ উদ্বেগে সে আনার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে,—'ভালো?'

আনা বিছানার ধারে হাঁটু গেড়ে বসল। 'ভালো। চোর ছাড়াও তুমি মিথ্যাবাদী,'—আনার গম্ভীর উত্তর।

'কেন?'

'কারণ তুমি বলেছিলে ড্রয়ারে কিছুই ছিল না।'

দামাসো কেঁপে উঠল। 'ওখানে কিছুই ছিল না।'

'ছিল, দুশো পেসো,'—আনা এখনও গম্ভীর।

'মিথ্যা কথা,'—দামাসো তক্ষুনি জবাব দেয়। তার গলার স্বর উচ্চগ্রামে পৌঁছে গেছে। বিছানায় বসে বসেই দামাসো আবার নিজের সুর খুঁজে পেয়েই বলে,—'ওখানে মাত্র পঁচিশটা সেন্ট ছিল।'

অবশেষে আনাকে বোঝাতে পারল,—'ও একটা বুড়ো ভাম।' কথাটা বলতে গিয়ে তার মুষ্টিবদ্ধ হাতটা উঁচিয়ে উঠল। 'নিজের মুখখানা গুঁড়োনোর জন্য ওর আমার কাছে আসা দরকার।' হেসে গড়িয়ে পড়ল আনা।

'বোকামি কোরো না।'

অবশেষে দামাসোও হাসতে লাগল। দাড়ি কামানোর সময়, তার বউ যে সব গল্প রাস্তায় শুনে এসেছে, বলতে শুরু করল। 'পুলিশ এখন আগন্তুককে খুঁজছে। ওরা বলছে সে নাকি গত বৃহস্পতিবার এখানে এসেছে আর গতরাতে তাকে জেটিতে দেখা গেছে।' আনা বলে চলে—'ওরা বলছে,—ওকে নাকি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।' যে আগন্তুককে দামাসো কোনওদিন চোখেও দেখেনি তার কথাই

সে ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ব্যাপারটা হজমও করে ফেলল। এবং সন্দেহ প্রকাশ শুরু করল।

'সম্ভবত সে চলে গেছে,'—আনা বলে।

অন্যদিনের মতো আজও নিজেকে সাজিয়ে তুলতে দামাসো ঘণ্টা তিনেক সময় নিল। প্রথমে সংক্ষিপ্ত পারিপাট্যে গোঁফটা সাজিয়ে নিয়ে উঠোনের কলের তলায় বসে তার স্নান। রাত থেকে যে আগ্রহ একবারও কমেনি, সেই আগ্রহ নিয়েই আনা তার দিকে চেয়ে দেখল কী ধারাবাহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে দামাসো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার চুলগুলোকে পরিপাটি করে সাজিয়ে নিচ্ছে। বাইরে বেরোনোর আগের মুহূর্তে দামাসো নিজেকে একবার ভালো করে আয়নায় দেখে নেওয়ার সময় আনার নিজেকে ভীষণ বুড়োটে আর পঙ্কিল মনে হচ্ছিল। পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধার মতো দামাসো আনার দিকে একটা ঘুষি বাগিয়ে ধরবার ভান করতেই ওর কবজিটা চেপে ধরল আনা।

'পকেটে কিছু আছে?'

'এখন আমি বড়লোক,'—দামাসো ফুরফুরে গলায় বলে উঠল,—'আমি তো দু'-দু'শো পেসোর মালিক।'

আনা দেওয়ালের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, বুকের মধ্যে থেকে একগাদা কাগজ বের করল। তার থেকে খুঁজে পেতে একটা পেসো স্বামীকে দিয়ে বলল,—'এটা রাখো ভালেন্তিনো।'

রাতের বেলায় দামাসো কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ময়দানে আড্ডা দিচ্ছিল। রবিবারের হাটে আসা লটারির টিকিট আর ফরাসি পোনা মাছের দোকানগুলো সমস্ত ময়দানটা চাঁদোয়া আর খুঁটিতে ঘিরে ফেলেছে। সমস্ত জায়গাটায় তাদের হই-হট্টগোল আর চিৎকারে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। ক্লাব-হলের চুরির গল্পে নিজেদের ব্যস্ত করার বদলে দামাসোর বন্ধুরা আজ রেডিওতে বাস্কেটবলের খবর শুনতে বেশি ব্যস্ত। কারণ, ক্লাব-হল বন্ধ থাকায় বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়ানশিপের ধারাবিবরণী শোনা সম্ভব হয়নি। গুলতানি মারতে মারতেই ওরা সিনেমা হলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তেমন কিছু ঠিকঠাক না করেই হলে ঢুকে পড়ল। এমনকি ভালো করে দেখলও না,—কোন সিনেমা চলছে।

ওরা ক্যান্টিন ফ্লাস্‌কে নিয়ে তৈরি একটা সিনেমা দেখছিল। দোতলার একেবারে সামনের সারিতে বসে দামাসো নির্লজ্জের মতো হাসতে লাগল। যেন সে তার ভেতরের সমস্ত দমবন্ধ করা আবেগ উপ্‌ড়ে দিচ্ছিল। জুন মাসের এ এক মনোরম রাত। আর যদি একবারের জন্যও কোনওক্রমে প্রোজেক্টারের আলোর ধোঁয়াশার মধ্যে দিয়ে (সিনেমা হলের ছাদ না থাকার সুবাদে) সরাসরি আকাশের দিকে তাকানো যায়। নিশ্চিতভাবে মনে হবে নক্ষত্রদের নৈঃশব্দ্য ভারী হয়ে ঝুলে আছে।

হঠাৎই পর্দার সম্পূর্ণ দৃশ্যপট ঝাপসা হয়ে যাওয়ায় অর্কেস্ট্রার ঝনঝন শব্দ চারদিক কাঁপিয়ে তুলল। আকস্মিক এই ঝনঝনানিতে দামাসোর মনে হল সে যেন ধরা পড়ে যাচ্ছে। সে যেন আশপাশের সকলের নীরব তিরস্কারের সম্মুখীন। সে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঠিক তক্ষুনি তার নজরে এল যে সমস্ত দর্শক নিথর হয়ে বসে আছে আর জনৈক পুলিশ একজন দর্শককে তামার শক্ত বেল্ট দিয়ে বেধড়ক পেটাচ্ছে। লোকটা একটা দানবাকৃতি নিগ্রো। মহিলারা এরমধ্যেই ভয়ে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। পুলিশটা এখন মহিলাদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল,—'চোর! এ ব্যাটা চোর!' পাঁজাকোলা করে তাকে তুলে না নেওয়া পর্যন্ত নিগ্রোটা মারের চোটে দুটো চেয়ারের মাঝখানের জায়গাটায় গড়াগড়ি খেতে লাগল। আরও দুটো পুলিশ ততক্ষণে তাকে রুলের গুঁতোয় অসাড় করে দিয়েছে। তারপর একজন তাকে দড়ি বেঁধে টানতে লাগল আর পিছন থেকে তিনজন তাকে দরজার দিকে ঠেলতে শুরু করে দিল। এত তাড়াতাড়ি সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল যে দামাসো রক্তাক্ত-কর্দমাক্ত-ঘর্মাক্ত মানুষটাকে তার পাশ দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারল। লোকটার গ্যাঁজলা ওঠা মুখ দিয়ে তখন একটা কথাই বেরোচ্ছে,—'খুনির দল! শালারা খুনি!' তারপর আবার প্রোজেক্টার চলতে শুরু করল এবং সিনেমা আরম্ভ হল।

দামাসো এরপর আর হাসেনি। অবিরাম সিগারেট টানতে টানতে সে কতগুলো বিচ্ছিন্ন ছবিকে

চোখের সামনে দেখতে পেল। এক সময় আলো জ্বলে উঠলে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল বাস্তবে ঘটনাটি কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে।

'ঠিকই হয়েছে'—পিছন থেকে কোনও এক দর্শক মন্তব্য ছুঁড়ল। দামাসো লোকটার দিকে তাকাল না।

'ক্যান্টিন ফ্লাস্ বেশ ভালো',—সে বলল। জনতার স্রোত তাকে দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল। বাক্স-প্যাঁটরা বন্ধ করে দোকানদাররা বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছে। এগারোটা বেজে গেছে। তবুও রাস্তায় বেশ কিছু মানুষের জটলা। নিগ্রোটার বিষয়ে জানবার জন্য তারা দামাসোর জন্যে অপেক্ষা করছে।

রাতে দামাসো এত সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল যে দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরানোর আগে তন্দ্রাচ্ছন্ন আনা বুঝতেই পারেনি যে তার স্বামী বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছে। 'খাবারটা স্টোভের উপরে রাখা আছে',—আনা বলে। দামাসো বলল,—'আমার খিদে নেই।'

আনা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'স্বপ্নে দেখছিলাম,—নোরা মাখন দিয়ে পুতুল তৈরি করছে',—ঘুম জড়ানো স্বরেই সে বলে উঠল। হঠাৎ সে বুঝতে পারল বিনা চেষ্টাতেই তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ধড়মড়িয়ে উঠে দামসোর দিকে আনা ঘুরে শুল। চোখ রগড়াতে রগড়াতেই বলে,—'বিদেশিটাকে ওরা ধরেছে।'

'কে বলল?'

'লোকটাকে সিনেমাহলের মধ্যেই পাকড়াও করেছে,'—বলে উঠল আনা। 'সবাই দেখেছে।' গ্রেফতার সংক্রান্ত একটা নতুন গল্প আনা শোনাতে লাগল। দামাসো সংশোধন করল না। 'বেচারা,'—আনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'বেচারা—কেন?' দামাসো উত্তপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়,—'আমাকেও তুমি একই দলে ফেলো?'

আনা তাকে এত বেশি করে চেনে যে উত্তর দেবার প্রয়োজনই বোধ করল না। সূর্যের প্রথম রশ্মিটি দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত দামাসো গড়গড় শব্দে নিঃশ্বাস নিতে নিতে সিগারেটের পর সিগারেট শেষ করতে লাগল। আনা অন্ধকারেই আন্দাজ করতে পারল যে দামাসো আর বিছানায় নেই—এবং বিষয়টা চোখে দেখার বদলে স্পর্শের উপরই বেশি নির্ভরশীল। আনা বুঝতে পারল বিছানার তলায় দামাসো কিছু একটা থাবড়াচ্ছে। মিনিট পনেরো ধরে চলল তার খননকার্য। তারপর অন্ধকারেই জামাকাপড় পালটাল। দামাসো চেষ্টা করছিল যাতে শব্দ-টব্দ না হয়, কিন্তু তার মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলল না যে আনা একবারের জন্যও তাকে বুঝতে দেয়নি যে সে ঘুমোয়নি। আনার আদিম প্রবৃত্তিতে কিছু একটা সাড়া জাগাচ্ছিল। আনার এতক্ষণে খেয়াল হল যে দামাসো সন্ধ্যাবেলায় সিনেমায় গিয়েছিল আর কেনই বা সে এক্ষুনি বিলিয়ার্ড বলগুলো বিছানার তলায় মেঝেতে পুঁতে রাখল।

সোমবার আবার খুলল ক্লাব-হল্। অত্যুৎসাহীদের ভিড়টা বড্ড বেশি। লালচে নীল রঙের কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া বিলিয়ার্ড টেবিলটা সমেত সমস্ত ঘরে একটা শ্মশানের পরিবেশ থমথম করছে। দেওয়ালের গায়ে একটা কাগজ সাঁটা,—'বল নেই, বিলিয়ার্ড হবে না।' জনগণ দলে দলে এসে লেখাটা পড়ে গেল যেন এটা একটা বিরাট খবর। কেউ কেউ ওটার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সাংঘাতিক মনোযোগ সহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথাটা বারবার পড়ল।

প্রথম দিককার দর্শকদের মধ্যেই ছিল দামাসো। ক্লাব-হলের দর্শকদের জন্য নির্ধারিত স্থানেই দামাসো অধিকাংশ সময় কাটিয়েছে। আজও দরজা খোলা ইস্তক দামাসো সেইখানটায় দাঁড়িয়ে রইল। কষ্টকর হলেও ঘটনাটা স্বতঃস্ফূর্ত। যেমনটা স্মৃতির আসর বা শোকসভার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কাউন্টারের ওপাশ থেকে সে মালিকের পিঠে একটা মৃদু চাপড় মেরে বলল,—'কী যে খারাপ লাগছে, রক'। মালিক একটা মনমরা হাসি মুখে বুলিয়ে মাথা নাড়িয়ে দমবন্ধ করা একটা শ্বাস ফেলল,—'হ্যাঁ তা তো বটেই।' কথাটা বলেই রক অন্যদের প্রতি মনোযোগী হল। আর দামাসো এর মধ্যে টুলের উপর বসে ঢাকনা দেওয়া বিলিয়ার্ড টেবিলটা হাতড়াচ্ছে। 'কী আশ্চর্যজনক ঘটনা',—সে বলল। 'ঠিক বলেছেন'—পাশের টুলে বসে থাকা লোকটি তাকে সমর্থন করে,—'মনে হচ্ছে আমরা যেন পবিত্র শোক সপ্তাহ পালন করছি।'

যখন অধিকাংশ খদ্দের দুপুরের খাবার খেতে চলে গেল দামাসো একটি সেন্ট জমা দিয়ে একটা মেক্সিকান গাথার রেকর্ড বেছে নিল। রেকর্ড নির্বাচকদের কাছে এটার একটা সম্মানীয় স্থান আছে। আর এ বিষয়টা সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। রক তখন হলের পেছন দিকে চেয়ারগুলো সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

'কী করছেন?'—দামাসো হঠাৎই প্রশ্নটা ছুঁড়ল। 'তাস খেলার জন্য এগুলো ঠিকঠাক করছি',—রক প্রত্যুত্তরে বলে। 'বলগুলো না আসা পর্যন্ত আমায় কিছু একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে।' দু-হাতে দুটো চেয়ার থরথর করে কাঁপছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে সদ্য বিপত্নীক হয়েছে।

'কবে ওগুলো আসবে?'—দামাসো প্রশ্ন করে।

'আশা করছি মাসখানেকের মধ্যেই।'

'ততদিনে পুরোনোগুলো ফিরেও আসতে পারে',—দামাসো বলল।

রক সন্তুষ্ট চিত্তে সদ্য সাজানো টেবিলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। 'ওগুলো আর দেখা যাবে না',—কপালের স্বেদবিন্দু জামার আস্তিনে মুছে নিয়ে সে বলে চলে,—'ওরা নিগ্রোটাকে সেই শনিবার থেকে কিছুই খেতে দেয়নি। আর ও ব্যাটাও কিছুতেই বলতে চাইছে না, বলগুলো কোথায় আছে।' ঘামে ঝাপসা চশমার ফাঁক দিয়ে সে একবার ভালো করে দামাসোকে মেপে নিল।

'আমি নিশ্চিত, নিগ্রোটা ওগুলো সব নদীতে ফেলে দিয়েছে।' দামাসো তার ঠোঁটটা আলগোছে কামড়ে ধরে প্রশ্ন ছোঁড়ে—'আর সেই দুশো পেসো?'

'সেগুলো অন্য কোথাও',—রক বলে চলে। 'ওর কাছ থেকে মাত্র তিরাশিটা উদ্ধার করা গেছে।'

দু'জনেই পরস্পরের চোখের উপর চোখ ফেলে ব্যাপারটা বুঝতে চাইল। রক আর তার মধ্যেকার সম্পর্কটা দৃষ্টি বিনিময়ের দরুন কেন যে জটিল হয়ে উঠছে, দামাসো সেটা কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারল না।

সেদিন বিকেলে আনা স্নানের ঘর থেকে দেখল দামাসো একজন মুষ্টিযোদ্ধার মতো নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরছে। সেও দামাসোর পিছনে পিছনে ঘরে এল।

'সব ঠিক হয়ে গেছে',—দামাসো বলল। 'বুড়োটা এতখানি হাল ছেড়ে দিয়েছে যে নতুন বল আনার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে ফেলেছে। এখন শুধুমাত্র প্রতীক্ষা, যদ্দিন ব্যাপারটা ভুলতে ওরা সময় নেয়।'

'আর ওই নিগ্রোটা?'

'ও কিছু না',—দামাসো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। 'বলগুলো না পেলে ওরা ওকে এমনই ছেড়ে দেবে।'

খাওয়া-দাওয়ার পর সিনেমার মাইকের তীক্ষ্ণ শব্দ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ওরা উঠোনে বসে পাড়া-পড়শির সঙ্গে গুলতানি করে চলল। বিছানায় এসেই দামাসো উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'একটা ভয়ংকর বিষয় আমার মাথায় এসেছে',—সে বলে উঠল।

আনা বুঝল সেই সন্ধে থেকেই এই বিষয়টা নিয়েই সে চিন্তার জাবর কাটছে।

'আমি শহর থেকে শহর চষে বেড়াব',—দামাসো বলে উঠল। 'এক শহর থেকে বিলিয়ার্ড বল চুরি করে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে বেচব। প্রত্যেক শহরেই একটা করে ক্লাব-হল্ আছে।'

'যত দিন না গুলি খেয়ে মরো!'

'গুলি, কী ধরনের গুলি',—দামাসো বলে ওঠে। 'ও সব সিনেমার জন্য।' ঘরের মাঝখানে মেঝেতে বসে সে তার পরিকল্পনার ছক কাটতে লাগল। আনা পোশাক পালটাতে শুরু করছে। আপাতদৃষ্টিতে সে উদাসীন কিন্তু আসলে সমব্যথীর মনোযোগ নিয়ে সে প্রতিটি শব্দই শুনছিল।

'এক সেট স্যুট তো কিনছিই',—দামাসো বলে চলে। তর্জনী দিয়ে দেওয়ালে সে তার কাল্পনিক আলনার ইঙ্গিত পর্যন্ত দিয়ে দেয়। 'এই এখান থেকে ওই পর্যন্ত। আর তার সঙ্গে পঞ্চাশ জোড়া জুতো।'

'ভগবান তো তাই-ই চাইছেন',—আনা বলল। এক গভীর চাউনিতে সে আনাকে দেখে। 'বিষয়টা তোমার পছন্দ হচ্ছে না',—দামাসোর করুণ আকুতি।

'সব কিছুই আমার থেকে লক্ষ যোজন মাইল দূরে',—আনার সান্ত্বনা। আলোটা নিভিয়ে সে দেওয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল এবং একটা বিশেষ তিক্ততায় যোগ করল,—'যখন তোমার তিরিশ বছর বয়স হবে,

আমার সাতচল্লিশ।'

'ছেলেমানুষী কোরো না',—দামাসো বলল। দেশলাইয়ের জন্য সে পকেট হাতড়াল। 'তোমাকে আর পকেট হাতড়াতে হবে না',—একটু হতবুদ্ধি হয়ে আপন মনেই বলে ওঠে আনা আগুন দিল। আগুনটা না নেভা পর্যন্ত জ্বলন্ত কাঠিটার দিকে আনা তাকিয়ে রইল। তারপর ফেলে দিল। বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে দামাসো আবার শুরু করে,—'তুমি জান বিলিয়ার্ড বলগুলো কী দিয়ে তৈরি?' আনা নিশ্চুপ।

'হাতির দাঁতের',—দামাসো বলেই চলে। 'এগুলো এতই দুর্লভ যে এক মাসেরও বেশি সময় লেগে যাবে নতুনগুলো আসতে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ।'

'ঘুমোও',—আনা বাধা দেয়। 'আমার আবার পাঁচটায় উঠতে হবে।' দামাসো তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেল। সারাটা সকাল সে সিগারেট টানতে টানতে বিছানায় শুয়ে বসে কাটাল। দুপুর গড়িয়ে যাবার পর সে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হল। যে কোনও পরিকল্পনাই ভুলে যাওয়ার এবং নতুন করে চাগিয়ে তোলার এক অদ্ভুত উৎসাহব্যঞ্জক ক্ষমতা তার আছে।

'তোমার কাছে নগদ কিছু আছে নাকি?'—শনিবার দামাসো স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল।

'এগারো পেসো,'—আনার শান্ত উত্তর। 'এটা বাড়ি ভাড়ার জন্য।'

'আমি তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চাই।'

'কী?'

'ওগুলো আমায় ধার দাও।'

'আমাদের ভাড়া দিতে হবে।'

'ওটা পরে দেওয়া যাবে।'

আনা মাথা নাড়ল। এইমাত্র যে টেবিলে বসে একসঙ্গে তারা প্রাতরাশ সারল, সেখান থেকে উঠে যাবার মুহূর্তে দামাসো আনার মণিবন্ধ চেপে ধরে।

'মাত্র ক'দিনের মামলা',—নম্রতা মিশিয়ে হতবুদ্ধি দামাসো আনার হাতে চাপ দিয়ে বলে,—'বলগুলো বিক্রি করা মাত্রই আমাদের হাতে যথেষ্ট পয়সা আসবে। সব কিছুর জন্যই...।'

আনা নরম হল না।

রাতে আনাকে নিয়ে দামাসো সিনেমায় গেল।

দামাসোর একটা হাত সবসময়ই আনার কাঁধের উপর সযত্নে রক্ষিত। এমনকি বিরতির সময় বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার সময়ও সে হাতের স্থান পরিবর্তন করল না। দু'জনে পাশাপাশি বসলেও একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে ছবিটা দেখল। ছবি শেষ হলে দামাসো অধীর হয়ে উঠল। 'তা হলে তো আমায় ডাকাতি করতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল আনা।

'প্রথম যাকে চোখে পড়বে তাকেই পেটাব',—দামাসো হল্ থেকে বেরিয়ে আসা জনস্রোতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে আনাকে বলল। 'তা হলে ওরা আমায় খুনের দায়ে জেলে পাঠাবে।'

মনে মনে হাসল আনা। কিন্তু সে শক্ত হয়েই রইল।

পরদিন সকালে, এক ঝোড়ো রাতের অবসানের পর দামাসো সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়ল। তার বেরোনোটা চোখে পড়ার মতো কেমন যেন অশুভ ঠেকল। স্ত্রীর কাছ ঘেঁষে যাবার সময় সে গরগর করছিল,—'আমি আর ফিরব না।'

আনা এতটুকুও উদ্বিগ্ন নয়। 'বেড়ানোটা যেন ভালো হয়',—আনা চেঁচিয়ে ওঠে।

সশব্দে দরজাটা টেনে বাইরে পা দিয়েই দামাসোকে একটা শূন্য এবং লক্ষ্যহীন রবিবারের সূচনা করতে হল। বাজারে সদ্য আসা বাসনকোসনগুলি চকচক করছে। ঝলমলে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে বাচ্চা-কাচ্চা কোলে-কাঁখে নিয়ে মহিলারা ময়দানে প্রভাতী প্রার্থনায় যোগ দেবার জন্য হাজির হচ্ছে। তাদের খুশিভরা মুখগুলো চোখে পড়ছে, কিন্তু বাতাস ইতিমধ্যেই গরমে চড়া হতে শুরু করেছে।

দামাসোর সারাটা দিন ক্লাব হলেই কাটল। একদল সময় কাটাল তাস খেলে। আর মধ্যাহ্নভোজের

আগে পর্যন্ত একটা ছোটখাটো ভিড় লেগেই থাকল। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে প্রতিষ্ঠানটির আকর্ষণ নষ্ট হয়ে গেছে। কেবলমাত্র সন্ধ্যায় বেস্‌বল খেলার সময় পুরোনো ঐতিহ্যর কিছুটা খুঁজে পাওয়া গেল।

হল্ বন্ধ হয়ে যাবার পর দামাসো তেমন কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থির করতে না পেরে উপস্থিত হল ময়দানে। প্রায় জনশূন্য ময়দান। জেটির সমান্তরাল রাস্তাটি লক্ষ করে সে এক সুখী দূরবর্তী সংগীতকে লক্ষ করে এগিয়ে চলল। রাস্তাটির শেষে এক বিরাট ফাঁকা নাচঘর। চারদিকে কাগজের শুকনো মালা ঝুলছে। হল্ ঘরটার পিছনে কাঠের পাটাতনের উপর বাজনা বাজছে। প্রসাধনের ভ্যাপসা গন্ধে ভিতরটা ম ম করছে।

দামাসো কাউন্টারে এসে বসল। একটা বাজনা শেষ হবার পর যে ছেলেটি তালে তালে করতাল বাজাচ্ছিল সেই নৃত্যরত খদ্দেরদের কাছ থেকে দর্শনী সংগ্রহ শুরু করল। একটি মেয়ে নাচের মেঝেতেই সঙ্গীকে ফেলে রেখে দামাসোর দিকে এগিয়ে এল।

'কী খবর ভালেন্তিনো?' দামাসো সরে গিয়ে তাকে বসার জায়গা করে দিল। নাচঘরের মালিকের মুখটা পাউডারে সাদা, কানে গোঁজা কারনেশন ফুল। কৃত্রিম বিনয় মুখে ফুটিয়ে তুলে নাচঘরের মালিক বলল,—'কী মশায়! কী খাবেন?'

মেয়েটা দামাসোর দিকে ফিরে তাকাল। 'আমরা এখন কী পান করছি?'

'কিচ্ছু না।'

'না না, আমিই খাওয়াচ্ছি।'

'তার জন্যে নয়',—দামাসো বলল। 'আমার ইচ্ছে করছে না। আর তাছাড়া আমার খিদে পেয়েছে।'

'বেচারি',—মালিক করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'চোখ দু'টোতেই তা বোঝা যাচ্ছে।'

হল্‌ঘরের পিছনের খাবার ঘরটায় গেল দু'জনে। মেয়েটি যথেষ্ট তন্বী হলেও পাউডার-রুজ ইত্যাদির প্রলেপে তার আসল বয়সটি যে কোথায় লুকিয়ে আছে, কে জানে! খাবার পর এক অন্ধকার উঠোন পেরিয়ে মেয়েটির ঘরের দিকে যখন দামাসো তার পিছন পিছন সন্তর্পণে এগোচ্ছিল দু'জনের কানেই তখন ঘুমন্ত জন্তুগুলোর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ধাক্কা মারছিল। রঙচঙে কম্বলে মোড়া একটা শিশু বিছানা দখল করেছিল। মেয়েটা একটা কাঠের বাক্সে কম্বলটা বিছাল। তারপর তার মধ্যে বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিল। সবশেষে বাক্সটা মাটিতে নামিয়ে রাখল।

'ইঁদুরেরা ওকে কুরে কুরে খাবে,'—দামাসো বলল।

'না, পারবে না',—ছোট্ট উত্তর দেয় মেয়েটি।

নাচের লাল পোশাকটা পালটিয়ে মেয়েটি পরে নিল অন্য একটা পোশাক। এটার গলা-ঘাড় নিচু করে কাটা, আবার একটা হলদে ফুল কায়দা করে বুকের উপর বসানো আছে।

'ওর বাবা কে',—দামাসো সহসা প্রশ্ন করে।

'আমার কোনও ধারণাই নেই',—মেয়েটি আবারও সংক্ষেপে উত্তর সারে। আব তারপর দবজার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে,—'আমি এক্ষুনি আসছি।'

দরজা বন্ধ করার শব্দ পাওয়া গেল। দামাসো বেশ কয়েকটা সিগারেট শেষ করে ওই পোশাকেই হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। ড্রামের আওয়াজ তখনও বন্ধ হয়নি। ড্রামের মন্দ্রস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বিছানার স্প্রিংগুলো যেন লাফাচ্ছে। কোন সময়ে যে সে সম্পূর্ণ নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল তা জানতেও পারল না দামাসো। ঘুম ভাঙার পর সংগীতের অনুপস্থিতিতে ঘরটাকে আরও বড় মনে হচ্ছে।

বিছানার একপাশে মেয়েটি তখন আবার পোশাক পরিবর্তনে ব্যস্ত।

'কটা বাজে?'

'প্রায় চারটে,'—জবাব দিয়েই মেয়েটি প্রশ্ন করে। 'বাচ্চাটা কেঁদেছিল?'

'বোধ হয়, না',—দামাসো উত্তর দেয়।

মেয়েটি তার কাছে ঘেঁষে এল। দামাসো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। জামার বোতাম খোলার সময় একটু

সরে গেল মেয়েটি। দামাসো বুঝল মেয়েটি এখন মদে চুর হয়ে আছে। দামাসো আলোটা নেভাবার চেষ্টা করল।

'ওটা জ্বালাই থাক না।' মেয়েটি বলে,—'তোমার চোখের তারা দেখতে আমি খু-উ-ব ভালোবাসি।'

ভোর থেকেই সমস্ত ঘরটা গ্রাম্য হট্টগোলে ভরপুর। বাচ্চাটা কাঁদছিল। মেয়েটি ওকে বিছানায় নিয়ে এসে পরিচর্যা শুরু করল। আর যতক্ষণ না সে ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ তিন লাইনের একটাই গান ও গুনগুন করে গেয়ে গেল। দামাসো লক্ষ্যও করল না যে সাতটা নাগাদ মেয়েটি উঠে পড়ে বাচ্চাটাকে কোলে করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং বাচ্চাটা ছাড়াই ফিরে এল।

'সবাই জেটির দিকে ছুটছে,'—মেয়েটি খবর দেয়।

এতক্ষণে দামাসোর মনে হল সারারাত সে ঘণ্টা খানেকের বেশি ঘুমোয়নি। তবুও সে জানতে চায়,—'কী জন্যে?'

'বল চোর নিগ্রোটাকে দেখার জন্য,'—মেয়েটি বলে চলে। 'ওরা ওকে আজই নিয়ে যাচ্ছে।'

দামাসো একটা সিগারেট ধরায়। 'বেচারা,'—মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'কেন? বেচারা কেন,'—দামাসোর সপ্রতিভ উত্তর।

'কেউ ওকে চোর বানায়নি।' মেয়েটি তার মাথাটা দামাসোর বুকে রেখে মুহূর্তখানেকের জন্য যেন কী চিন্তা করল। তারপর খুব নিচুস্বরে বলল,—'ও করেনি।'

'কে বলল?'

'আমি জানি,'—মেয়েটি বলেই চলে। 'যে রাতে ক্লাব-হলে চুরি হয় সেই রাতে নিগ্রোটা গ্লোরিয়ার সঙ্গে ছিল। পরের দিনটা পুরোটা মানে সেই সিনেমা হলে যাওয়া পর্যন্ত ও গ্লোরিয়ার সঙ্গেই ছিল। তারপর সবাই এসে খবর দিল ওকে ওরা সিনেমা হলে গ্রেপ্তার করেছে।'

'গ্লোরিয়া পুলিশকে বললেই পারে!'

'নিগ্রোটাই তো বলেছিল,'—মেয়েটি বলতে থাকে। 'মেয়র গ্লোরিয়ার ঘরে গেছিল। ঘরখানা একেবারে তছনছ করে দিয়ে তিনি অভিমত দিলেন—দুষ্কর্মের সহচরী হিসেবে গ্লোরিয়াকেও জেলে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে, সবকিছু কুড়ি পেসোর বিনিময়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল।'

দামাসো আটটার আগেই উঠে পড়ল। 'বস এখানে,'—মেয়েটি আদেশের ভঙ্গিতে অনুরোধ জানায়। 'আজ দুপুরের জন্যে একটা মুরগি কাটি।'

দামাসো চিরুনিটা পকেটে পোরার আগে একবার হাতের তালুতে বুলিয়ে নিল। 'পারলাম না',—মেয়েটির কবজি দু'টো ধরে সামনে আনতে আনতে দামাসো বলল। মেয়েটিও ইতিমধ্যেই মুখ ধুয়ে আসায় বোঝা যাচ্ছে সত্যিই সে ভীষণ ছেলেমানুষ। ভ্রমরকালো আয়ত চোখে তাকে বড়ই অসহায় দেখাচ্ছে। সে দামাসোর কোমর জড়িয়ে ধরে তাল সামলাল।

'এখানেই থাক না!'

'চিরদিনের জন্যে?'

মেয়েটা সামান্য ধাক্কা দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বলে উঠল,—'যাও! শুধু ঠাট্টা!'

সাত সকালেই হাঁপিয়ে উঠেছে আনা। কিন্তু শহরের উত্তেজনাটা রীতিমতো সংক্রামক। অন্যদিনের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি সে ওই সপ্তাহে কাচবার জন্য প্রয়োজনীয় জামাকাপড়গুলো সংগ্রহ করেই নিগ্রোটার চলে যাওয়া দেখতে জেটির দিকে ছুটল। ছাড়বে-ছাড়বে করছে এমন সব লঞ্চগুলোর সামনে অসহিষ্ণু জনতা অপেক্ষমাণ। দামাসোও ওখানে উপস্থিত।

আনা দামাসোর কোমরে একটা খোঁচা মেরে নিজের উপস্থিতির কথা জানান দিল।

'এখানে কী করছ,'—দামাসোর সচকিত প্রশ্ন।

'তোমায় বিদায় জানাতে এসেছি',—আনার সংক্ষিপ্ত জবাব।

আঙুল দিয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টে টোকা মারতে মারতে দামাসো বলল,—'জাহান্নামে যাও!'

দামাসো একটা সিগারেট ধরিয়ে নদীতে ফেলে দিল খালি প্যাকেটটা। আনা ফ্রকের পকেট থেকে একটা নতুন প্যাকেট বের করে দামাসোর জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিল। দামাসো প্রথমবারের জন্য হাসল। 'তুমি কোনওদিনই শিখবে না,'—দামাসোর বলিষ্ঠ মন্তব্য। আনা 'হাঃ হাঃ' করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ বাদে নিগ্রোটাকে লঞ্চে তোলা হল। সমস্ত ময়দানটা তাকে ঘোরোনো হয়েছে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। একটা পুলিশ তার ঘাড় ধরে রেখেছে। পাশে পাশে দুটো পুলিশ রাইফেল কাঁধে পা মিলিয়ে হাঁটছে। তার গায়ে কোনও জামা নেই। ঠোঁটজোড়ায় ঈষৎ ফাঁক। আর একটা চোখ একটু বোজা, ঠিক মুষ্টি যোদ্ধাদের মতো। নিস্পৃহ সম্ভ্রমে সে জনতার চাহনিকে এড়িয়ে যাচ্ছে। এই বিচিত্র তামাশার সবটুকু উপভোগের জন্য সেরা জায়গা হল ক্লাব-হলের দরজা। সেখানেই সবচেয়ে বেশি ভিড় করে উৎসুক জনতা গাদিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্লাব-হলের মালিকও ওখানে দাঁড়িয়ে নিগ্রোটার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে মাথা নাড়ছে। অন্য সবাই লোলুপদৃষ্টিতে তার চাহনিকে পর্যবেক্ষণ করছে।

লঞ্চটা তক্ষুনি ছেড়ে দিল। হাত বাঁধা অবস্থায় নিগ্রোটা একটা তেলের পিপের উপর দাঁড়িয়ে আছে। নদীর মাঝখানটায় গিয়ে বাঁশি বাজিয়ে লঞ্চটা পুরোপুরি ঘুরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিগ্রোটার পিঠটা চকচক করে উঠল।

'বেচারা,'—আনা ফিসফিসিয়ে উঠল।

'অবিবেচকের দল,'—পাশ থেকেই কেউ একজন বলে উঠল। 'একটা মানুষের বাচ্চা কখনও এত রোদ সইতে পারে না।'

দামাসো বুঝতে পারল এটা অস্বাভাবিক পৃথুলা এক মহিলার কণ্ঠস্বর। তারপর সে আস্তে আস্তে ময়দানের দিকে পা বাড়াল। 'তুমি বড্ড বেশি বকো,'—আনার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে দামাসো বলে। 'এখন তোমার শেষ কাজ হচ্ছে ঢাক পিটিয়ে গল্পটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া।'

আনা ক্লাব-হলের দরজা পর্যন্ত দামাসোকে সঙ্গ দিল। 'বাড়ি গিয়ে জামাকাপড়টা অন্তত ছাড়ো',—দামাসোকে ছেড়ে যাবার আগে আগে আনা বলল। 'পুরো ভিখিরির মতো দেখাচ্ছে।'

একদল লোক এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে ক্লাব-হলে এসে জড়ো হয়েছে। হলের মালিক রক সবাইকে একসঙ্গে পরিবেশন করতে গিয়ে সামাল দিতে পারছিল না। তার পাশ দিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দামাসো অপেক্ষা করল।

'আপনাকে কি একটু সাহায্য করব?'—আধ ডজন বিয়ারের বোতলের মুখে উলটিয়ে বসানো গেলাসসহ ট্রেটা রক তার সামনে রাখল।

'অনেক ধন্যবাদ!'

দামাসো বোতলগুলো টেবিলে টেবিলে নিয়ে গেল। বেশ কিছু অর্ডার নিল। পরিবেশন করল। সেই মধ্যাহ্নভোজের আগে অবধি খদ্দেরদের ভিড় না কমা পর্যন্ত দামাসো বোতল আনা-নেওয়া করে গেল। যখন সে ঘরে ফিরল আনা বুঝল,—দামাসো মদ গিলে এসেছে। সে দামাসোর হাতটা নিয়ে নিজের পেটের উপর রাখল।

'একটু দেখো,'—সে বলল। 'কিচ্ছু বুঝতে পারছ না?'

দামাসো কিন্তু কোনওরকম উৎসাহ বোধ করল না। 'ওটা এখন লাফাচ্ছে,'—আনা বলে চলে। 'সমস্ত রাত ধরে ওটা আমার পেটের ভিতর হাত-পা ছুঁড়েছে।'

দামাসোর মধ্যে কোনওরকম প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। নিজের মধ্যে ডুবে থেকে পরের দিন খুব সকালে বেরিয়ে মাঝরাতে বাড়ি ফিরল দামাসো। এইভাবেই কেটে গেল সারাটা সপ্তাহ। বাড়িতে সে খুবই অল্প সময় কাটায়। যতক্ষণ থাকে সিগারেটই তার একমাত্র সঙ্গী। কথাবার্তা একেবারেই এড়িয়ে যায়। আনাও নিজেকে সংযত রাখল। কোনও এক বিশেষ সময়, যখন তাদের যৌথ জীবন সবে শুরু হয়েছিল, দামাসো তখনও ঠিক এই রকম ব্যবহারই করত। তবে সেই সময় আনা ওকে খুব ভালো করে জানত না বলে বড় একটা পাত্তাও দিত না।

এবার সে প্রতীক্ষা করল! রাতে লণ্ঠনটার পাশে এক প্যাকেট সিগারেট রেখে দিল। কারণ, সে জানে

দামাসো ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করতে পারে না, এমনকি ধূমপানের প্রবৃত্তিকেও দমন করতে পারে না। অবশেষে জুলাইয়ের মাঝামাঝি কোনও একদিন দামাসো সন্ধে নাগাদ ঘরে ফিরে এল। আনার নিজেকে ভীষণ বিপর্যস্ত মনে হচ্ছিল। সে ভাবছিল যে দামাসো নিশ্চয়ই এই অসময়ে তার দিকে তাকিয়ে চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। নিঃশব্দে তারা খাবার খেল। কিন্তু বিছানায় যাবার আগে দামাসো শান্তভাবে কেমন যেন সিঁটিয়ে গিয়ে আমতা আমতা করতে করতে বলল,—'আমি চলে যেতে চাই।'

'কোথায়?'

'যে কোনও জায়গায়।' আনা ঘরের চারপাশে তাকাল। পত্রিকার প্রচ্ছদে ঢাকা দেওয়ালের সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের ছবিগুলো বিবর্ণ, অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ঘরের সমস্ত দেওয়াল এই সব ছবিতে ভরে না যাওয়া পর্যন্ত সে নিজেই পত্রিকা থেকে কেটে কেটে ওগুলো দেওয়ালে সেঁটেছিল। একসময়ে দেওয়ালের যে মানুষগুলোর মুখ বিছানা থেকেই নজর আসত যাদের সংখ্যার সীমা-পরিসীমা ছিল না, ধীরে ধীরে তাদের রংজৌলুস অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল।

'আমায় একঘেয়ে লাগছে',—আনা বলল।

'না না! তা নয়',—দামাসো জবাব দেয়। 'শহরটাই আর ভালো লাগছে না।'

'এটা তো যে কোনও অন্য শহরেরই মতো!'

'বলগুলো এখানে বিক্রি করতে পারব না।'

'বলগুলোর কথা ভুলে যাও,'—আনা বলে। 'যদ্দিন না ভগবান আমার কাপড় কাচার ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছেন, তোমার ঝুঁকি নিয়ে অন্যত্র যাবার দরকার নেই'। এবং একটু দম নিয়ে সে আবারও বলে,— 'জানি না তোমার দ্বারা কেমন করে ওসব সম্ভব হবে!'

কথা বলার আগেই দামাসো সিগারেটটা শেষ করল তারপর আস্তে ধীরে বলল,—'কিন্তু ব্যাপারটা এতই সোজা যে আমি ভাবছি কেন এটা এতদিন অন্য কারও মাথায় আসেনি।'

'দামের জন্য',—আনা সমর্থন করে। 'কিন্তু বলগুলো চুরি করার মতো বোকা আর কেউ-ই নয়।'

'কিছু না ভেবেই কাজটা করেছি',—দামাসো বলল। 'পালিয়ে আসার সময় কাউন্টারের ছোট্ট বাক্সটায় ওগুলো চোখে পড়ল। আর খালি হাতে আসার চেয়ে কিছু নিয়ে আসা অনেক ভালো—নিদেনপক্ষে মন্দের ভালো।'

'সেটাই তোমার ভুল',—আনা যুক্তি দেয়। দামাসো নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছিল।

'আর এর মধ্যে নতুনগুলোও এসে পৌঁছোয়নি',—সে বলেই চলে। 'খবর এসেছে—এখন বলের দাম অনেক বেড়ে গেছে। রক তাই অর্ডার বাতিল করে দিয়েছে।' সে আরও একটা সিগারেট ধরায়। এবং কথা বলার সময়েই সে বুঝতে পারছিল সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে হৃদয়ে জমে থাকা কিছু কালো ধোঁয়াও বেরিয়ে যাচ্ছে।

আনাকে দামাসো খবর দেয় যে ক্লাব-হলের মালিক এখন বিলিয়ার্ড টেবিলটাই বেচে দেবার কথা ঠিক করেছে। এমন কিছু দাম নয় ওটার। ঢাকনাটা নবীন খেলুড়েদের কেরামতিতে ছিঁড়ে যাওয়ায় এলোপাথাড়ি ভাবে আজেবাজে রঙের কিছু তাপ্পি লাগানো হয়েছে। সবমিলিয়ে ওটাকে পালটানো প্রয়োজন। এবং এর মধ্যেই যে লোকগুলো বিলিয়ার্ড খেলতে খেলতে চুল পাকিয়ে ফেলেছে তারা বেস্‌বলের ধারাবিবরণী শোনার জন্য রেডিওর সামনে বসে থাকা ছাড়া অন্য কোনও কাজই খুঁজে পাচ্ছে না।

সুতরাং, দামাসো এইভাবে শেষ করে,—'না চাইলেও আমরা সমস্ত শহরটাকেই আঘাত করেছি।'

'যতসব ফালতু কথা',—আনার সহজ সমাধান।

'সামনের সপ্তাহে বেস্‌বল চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলাও শেষ হয়ে যাবে',—দামাসো আরও ব্যাখ্যা দেয়।

'সেটাও সবচেয়ে খারাপ নয়',—আনা বলল। 'সবচেয়ে খারাপ নিগ্রোটাই...।'

পুরোনো দিনের মতো দামাসো কাঁধে ভর দিয়ে শুয়ে আছে। আনা জানে,—তার স্বামী এখন কী ভাবছে। সিগারেটটা শেষ হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল। তারপর শঙ্কিত স্বরে ড়করে উঠল,—

'দামাসো।'

'কী হয়েছে?'

'ফিরিয়ে দাও।'

দামাসো আবারও সিগারেট ধরায়। 'সেটাই তো ক'দিন ধরে ভাবছি,'—দামাসোর শান্ত নিবেদন। 'কিন্তু সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার হল আমি কিছুতে বুঝে উঠতে পারছি না কেন ফেরত দেব?'

সুতরাং বলগুলোকে কোনও প্রকাশ্য স্থানে ফেলে আসার কথা মনস্থ করা গেল। ঠিক তখনই আনার মনে হল, এই সিদ্ধান্তটা যেমন ক্লাব-হলের সমস্যাটা মেটাতে পারছে ঠিক তেমনি এটা নিগ্রোটার অমীমাংসিত প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজে দেবে। পুলিশ তাকে ছেড়ে না দিয়েও অন্য ভাবে মামলাটা সাজাতে পারত। আবার এমন একটা সম্ভাবনার কথাও সে উড়িয়ে দিল না বলগুলো হয়তো এমন কেউ পেয়ে গেল যে ফেরত দেবার কথা চিন্তা না করে বিক্রির কথাই চিন্তা কববে। 'যাক গে কাজটা যখন করতেই হচ্ছে',—আনা উপসংহার টানল। 'ভালোভাবেই এটা করা ভালো।'

মেঝে খুঁড়ে বলগুলো বের করল দু'জনে মিলে। ভালো করে খবরের কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে আনা বলগুলোকে এমনভাবে ট্রাংকে রাখল যেন বাইরে থেকে বোঝা না যায়।

'এইবার শুধু ঠিক মুহূর্তের অপেক্ষা',—আনা বলল।

সঠিক সময়ের জন্য ওদের অপেক্ষা করতে হল বেশ কয়েকটা সপ্তাহ। অগস্ট মাসের কুড়ি তারিখে চুরির দু'মাস বাদে, দামাসো দেখল ক্লাব-হলের মালিক রক কাউন্টারে বসে একটা হাতপাখা দিয়ে মশা তাড়াচ্ছে। রেডিওটাও বন্ধ। তার একাকিত্ব গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। 'আমি তোমায় বলেছিলাম,'— রকের মুখে ঈপ্সিত অনুমান বাস্তবায়িত হওয়ার আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। 'ব্যাবসাপত্তর সব গোল্লায় গেছে।'

গান শোনার জন্য দামাসো একটু খরচা করল। সংগীতের তীক্ষ্ণতা আর যন্ত্রেব রঙের খেলায় যেন তার বিবেকের যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটল। দামাসোর এই মুখভঙ্গি কিন্তু বকেব নজরে এল না। তারপর একটা টুল টেনে বসে সে সংশয়াচ্ছন্ন যুক্তির মাধ্যমে নিজেকে পরিষ্কার করার কঠিন চেষ্টা চালাতে লাগল। রক একইভাবে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বসে নিজের পতন দেখছে। পাখার উদ্দেশ্যহীন বিচরণ হয়তো তার সেই উদাসীনতারই প্রতিফলন। 'এ ব্যাপারে আর কিছুই করার নেই',—রক আপন মনেই বলে চলে। বেস্‌বল চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলা তো আর চিরকাল চলতে পারে না!'

'কিন্তু বলগুলো তো পাওয়া গেলেও যেতে পারে!'

'ওগুলো আর কোনওদিনই দেখা যাবে না।'

'নিগ্রোটা তো আর ওগুলো হজম করে ফেলতে পারে না!'

'পুলিশ সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজেছে'.—এক হাঁপ ছাড়া নিঃশ্বাস ফেলে, নিশ্চিন্ত হযে রক বলে উঠল। 'নিগ্রোটা ওগুলো নদীতে ফেলে দিয়েছে।'

'অলৌকিক কিছু তো ঘটেও যেতে পারে!'

'ওসব গালগল্প ভুলে যাও হে, ছোকরা',—রক জবাব দেয়। 'দুর্ভাগ্য শামুকের মতো। তুমি কি অলৌকিক-যাদু এসবে বিশ্বাস করো?'

'মাঝে মধ্যে, কখনও কখনও',—দামাসোর অনিশ্চিত উত্তর।

দামাসোর ক্লাব-হল পরিত্যাগের পরেও সিনেমা শেষ হয়নি। মাইকের প্রলম্বিত এবং কর্কশ ধ্বনি অন্ধকার শহরে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। একমাত্র সেই সব বাড়িই খোলা আছে যেগুলি সাময়িক কোনও কাজ-কর্মে ব্যস্ত। সিনেমা হলের দিকে পা বাড়িয়েও দামাসো নাচঘরের দিকেই রওনা দিল।

নাচঘরের বাজনাটা একজন মাত্র খদ্দেরের জন্য বেজেই চলেছে। আর খদ্দেরটা একাই দু'জন মেয়ের সঙ্গে নেচে চলেছে। অন্যেরা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বিচারকের ভঙ্গিতে উপবিষ্ট, যেন রেল, স্টেশনে মেল ট্রেনের জন্য অপেক্ষমাণ। দামাসো চেয়ারে বসেই বেয়ারাকে ইশারায় ডেকে এক বোতল বিয়ার আনাল। কয়েক ঢোকে বোতলটা শেষ করে ঝাপসা চোখে যেন চোখের সামনে একটা কাচ ঝুলছে

এইভাবে সেই লোকটাকে দেখতে লাগল, যে তখনও দু-বগলে মেয়ে দুটোকে জাপটে ধরে নেচেই চলেছে। অন্যদের থেকে লোকটাকে অনেক বেঁটে দেখাচ্ছে। মাঝরাতে যে মহিলারা এতক্ষণ সিনেমা হলে ছিল, কিছু সংখ্যক পুরুষের তত্ত্বাবধানে তাদের নাচঘরে পদার্পণ ঘটল। দামাসোর এক বান্ধবী, যে ওই দঙ্গলেই ছিল, ছিটকে এসে দামাসোর টেবিলে বসল।

দামাসো তার দিকে তাকাল না। এর মধ্যেই ওর তিন বোতল বিয়ার শেষ হয়ে গেছে। দামাসো লোলুপ দৃষ্টিতে ওই লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটা এখন তিনটে মেয়ের সঙ্গে নাচলেও মনোযোগটা কিন্তু ওদের দিকে নেই। নিজেরই বেসুরো তালে অন্যদিকে চালিত হচ্ছে। লোকটাকে সুখী দেখাচ্ছিল আর এটা নিশ্চিত যে হাত-পায়ের সঙ্গে একটা ল্যাজ থাকলে ওকে আরও সুখী দেখাত।

'ওই কাপ্তানটাকে আমার ভালো লাগছে না',—দামাসো নিজের অজান্তেই বলে উঠল। 'তা হলে ওদিকে তাকিও না',—মেয়েটি বলল।

মেয়েটি বেয়ারাকে একপাত্র পানীয় দিতে বলে। নাচঘরে ইতিমধ্যে বেশ কয়েক জোড়ার নাচ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু সেই লোকটি এখনও সেই তিনটি মেয়েকেই এমনভাবে বগলদাবা করে রেখেছে যেন সারা নাচঘরে সে একাই বিচরণ করছে। একবার একটা পাক খাওয়ার সময় ক্ষণেকের জন্য দামাসোর সঙ্গে লোকটির চোখাচোখি হল। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের নাচের প্রতি মনোযোগী হল আর খরগোশের মতো দাঁতের পাটি বের করে একবার হাসল। লোকটি গম্ভীর হয়ে পিছন ফেরা পর্যন্ত দামাসো তাকিয়েই রইল। ওর চোখের পাতা পড়ছে না।

'মক্কেল নিজেকে ভীষণ সুখী মনে করছে।'

'হ্যাঁ, ও ভীষণ সুখী',—মেয়েটি বলে। 'ও যখনই এ শহরে আসে বাজনার সমস্ত বিল মেটায় ঠিক অন্যান্য সেলস্ম্যানদের মতো।'

দামাসো এবার মেয়েটির দিকে দৃষ্টি ফেরায়। 'তাহলে আর কী! ওর সঙ্গেই যাও,'—দামাসো বিরক্তি লুকোতে চায় না। 'তিনজনের যখন জায়গা হয়েছে, চারজনেরও হবে।'

দামাসোর বান্ধবী জবাব না দিয়ে গম্ভীরভাবে নাচ দেখে যায়। ধীরে ধীরে গেলাসে চুমুক দেয়। পরনের মলিন হলদে পোশাক তার লজ্জা বাড়িয়ে তুলেছে।

পরের খেপে ওরাও নাচে। নাচের শেষে দামাসো রীতিমতো হাঁফাচ্ছে।

দামাসোকে কাউন্টারের দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে মেয়েটি বলল,—'খিদেয় মরে যাচ্ছি।' দামাসো কিছু বলার আগেই সে আবার বলে,—'তোমারও কিছু খাওয়া দরকার।' সুখী মানুষটি তিনজন মহিলা পরিবৃত হয়ে উলটোদিক থেকে আসছিল।

'শুনুন'—দামাসো লোকটিকে ডাকল। লোকটা এগোতে এগোতেই দামাসোর দিকে তাকিয়ে হাসছিল। দামাসো তার সঙ্গিনীর হাতটা ছাড়িয়ে লোকটার পথ আটকাল। 'আপনাব দাঁতগুলো আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

লোকটি একটু সিঁটিয়ে গেলেও, হাসিটা তার মুখে লেগেই রইল। 'আমারও লাগে না',—লোকটা বলল।

মেয়েটি থামাবার আগেই দামাসো লোকটার মুখে ঘুসি চালল। লোকটা মেঝের উপর ছিটকে পড়ে গেল। খদ্দেরদের কেউ নাক গলাল না। লোকটার সঙ্গিনী তিনজন দামাসোর কোমর জাপটে ধরে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। ইতিমধ্যে দামাসোর বান্ধবী তাকে ঠেলতে ঠেলতে নাচঘরের পিছনে নিয়ে গেল। লোকটা উঠে দাঁড়াল। রক্তে তার সমস্ত মুখ ভেসে যাচ্ছে। বাঁদরের মতো লাফিয়ে সে নাচঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল,—'বাজনা চলুক।'

রাত দুটো নাগাদ নাচঘর প্রায় ফাঁকা। খদ্দেরবিহীন মেয়েগুলো সবে খেতে বসেছে। খাবার এখনও গরম। দামাসোর বান্ধবী সয়াবিন মাখা ভাত আর মাংস টেবিলে নিয়ে চামচ দিয়ে সবটাই খেতে শুরু করল। বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে দামাসো তাকিয়ে রয়েছে। মেয়েটা এক চামচ ভাত দামাসোর দিকে এগিয়ে দিল। 'নাও, মুখটা খোলো।' দামাসো চিবুকটা বুকের কাছে নামিয়ে এনে মাথাটা নাড়ল। 'ওগুলো

মেয়েদের জন্য,'—সে বলল। 'আমরা পুরুষরা ওসব খাই না।'

টেবিলে দু-হাতে ভর দিয়ে সে দাঁড়াল। তাল সামলাবার পর মুহূর্তেই নাচঘরের মালিক তার সামনে এসে দাঁড়াল। হাত দুটো আড়াআড়িভাবে রেখে মালিকটি বলল,—'মাত্র ন'শো-আশি। পার্টিটা তো বাড়িতে হচ্ছে না, সুতরাং,...'

দামাসো তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। 'আমি সন্দেহজনক চরিত্র পছন্দ করি না',—দামাসোর শান্ত জবাব। মালিক দামাসোর জামার হাতাটা চেপে ধরল। কিন্তু মেয়েটির ইশারায় দামাসোকে ছেড়ে দিল। চলে যেতে যেতে দামাসোর কানে এল, অবশ্যই পুরুষ কণ্ঠে,—'জানো না তুমি কী হারাচ্ছ?'

দামাসো টলতে টলতে বাইরে বেরোল। জ্যোৎস্না রাতে নদীর রহস্যঘেরা উজ্জ্বলতা তার মস্তিকে স্বচ্ছলতার খাঁড়ি কেটে দিল। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই এই ঘোরটা কেটে গেল। শহরের অন্য প্রান্তে নিজের বাড়ির দরজাটা দেখতে পেয়ে দামাসো নিশ্চন্ত হল যে সে এতখানি পথ ঘুমের মধ্যেই হেঁটে এসেছে। দামাসো মাথা নাড়ল। এক বিপর্যস্ত ও বিপজ্জনক অবস্থায় তার বোধগম্য হল এই মুহূর্ত থেকে নিজের প্রতিটি আচরণের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। দরজার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দটা সাবধানে এড়িয়ে সে দরজায় আলগোছে ধাক্কা দিল।

আনা বুঝতে পারল যে দামাসো ট্রাংকটার দিকে তাকিয়ে আছে। লণ্ঠনের আলোর সামনে থেকে নিজেকে কিছুটা সরিয়ে নিতে আনা দেওয়ালের দিকে ঘুরে গেল। আর ঠিক তখনই বোধগম্য হল যে তার স্বামী জামাকাপড় পালটাচ্ছে না। গভীরতম অনুভূতির এক সুতীব্র ঝটকায় সে বিছানায় উঠে বসল। দামাসো ট্রাংকের পাশে দাঁড়িয়ে। তার এক হাতে বলের মোড়ক, অন্য হাতে টর্চ। ঠোঁটে তর্জনী রাখল দামাসো।

আনা এক ঝটকায় বিছানা থেকে উঠে পড়ল। 'তুমি ভীষণ ছেলেমানুষ',—দরজার দিকে তীব্র গতিতে এগোতে এগোতে সে বিড়বিড় করে। ঝটিতি দরজায় খিলটা তুলে দিল। দামাসো টর্চটা প্যান্টের পকেটে ঢোকায়। অন্য পকেটে রাখল একটা ছুরি আর কয়েকটা উখা জাতীয় জিনিস। মোড়কটা বগলদাবা করে দরজার দিকে এগিয়ে এল। দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল আনা।

'আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না',—শান্তভাবে, গম্ভীর স্বরে কেটে কেটে কথাগুলো বলে ফেলল আনা।

দামাসো তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। 'সরো'—সে বেশ জোর দিয়েই বলল।

আনা দরজার খিলটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে রাখল। নিষ্পলক চোখে ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। 'তুমি একেবারে বোকা',—আনা ফিসফিসিয়ে ওঠে। 'ভগবান তোমায় চোখে যা দিয়েছেন তা মাথায় কেন দিলেন না!' দামাসো আনার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দেয়, কবজিটা মুচড়ে দেয়, মাথাটা নিচে নামিয়ে দিয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল। 'তোমায় সরতে বলেছি?' আনা জোয়ালে বাঁধা বলদের মতো চোখের কোণ বরাবর দামাসোর দিকে তাকাল। ক্ষণিকের জন্য যন্ত্রণার কাছে সে নিজেকে অভেদ্য মনে করল। স্বামীর তুলনায় তার গায়ে জোর বেশি। কিন্তু তার চোখের পাতা না ভিজে যাওয়া পর্যন্ত দামাসো তার চুলের ঝুঁটি হাতের মুঠোয় ধরে রাখল।

'পেটের বাচ্চাটাকে খুন করতে যাচ্ছ',—আনা বলল।

দামাসো আনাকে প্রায় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে একেবারে চ্যাংদোলা করে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলল। ছাড়া পাওয়া মাত্রই আনা পিছন থেকে হাত-পা দিয়ে দামাসোর শরীরটা জড়িয়ে ধরল। দু'জনেই জড়াজড়ি করে বিছানায় পড়ে গেল। দু'জনেই হাঁফাচ্ছে।

'আমি কিন্তু চেঁচাব',—আনা ফিসফিসিয়ে ওঠে। 'তুমি ঘুরলেই আমি চেঁচাব।' রাগে দামাসো গর্জে ওঠে। বলের মোড়কটা দিয়ে হাঁটুতে সজোরে মারল। আনা ককিয়ে ওঠে। ওর পা-দুটো আলগা হয়ে এল। কিন্তু তার আগেই এক ঝটকায় দামাসোর কোমরটা জাপটে ধরে ওর দরজার দিকে এগোনো থামাল। তখন সে করুণ স্বরে বলতে থাকল,—'শপথ করছি, কাল সকালে আমি নিজেই ওগুলো দিয়ে আসব।' একই সুরে সে আরও বলে চলে,—'এমনভাবে ফিরিয়ে দেব যাতে কেউ এতটুকুও বুঝতে না

পারে।' যতই ওরা দরজার কাছাকাছি এগোয় হাতের মোড়কটা দিয়ে দামাসো ততই বেশি জোরে মারতে থাকে। যন্ত্রণায় আনা একবার ভাবল,—ওকে ছেড়ে দেওয়া যাক। কিন্তু তারপরেই আবার দামাসোকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে করুণস্বরে কাকুতিমিনতি করে যেতে থাকে। 'আমি বলব,—ওগুলো আমি চুরি করেছিলাম।' আনার কাকুতির বিরতি নেই,—'আমার এই অবস্থায় ওরা আমায় জেলে পাঠাতে পারবে না।'

দামাসো এক ঝটকায় ওকে সরিয়ে দেয়।

'সমস্ত শহর তোমায় দেখবে,'—আনা একটানা বলেই চলে। 'তুমি এতই অবুঝ যে বুঝতেই পারছ না সামনেই পূর্ণিমা।' দরজার খিলটা খোলার আগে পর্যন্ত আনা দামাসোর কোমরটা আঁকড়েই থাকল। তারপর চোখ বুজেই দামাসোর ঘাড়ে মুখে এলোপাথাড়ি কিল-চড় মারতে শুরু করল। আর একই সঙ্গে 'জানোয়ার' বলে সে তারস্বরে চেঁচাতে থাকে। অবিরাম প্রহার থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকে দামাসো। আনা ইতোমধ্যেই খিলটা ওর হাত থেকে তুলে নিয়েছে। দামাসোর মাথা টিপ করে খিলটা একবার ঘোরাল। কোনওক্রমে দামাসো আক্রমণ এড়ায়। কিন্তু খিলটা ওর কাঁধের হাড়ে আছড়ে পড়ল। দামাসোর মনে হয় যেন কাচের শার্সি ভেঙে পড়ল।

'কুত্তির বাচ্চা',—নিয়ন্ত্রণবিহীন দামাসোর মুখ থেকে আপনা থেকেই শব্দটা নিঃসৃত হয়।

এখন আর শব্দ না করার বিষয়ে দামাসোর নজর নেই। মুঠোবন্ধ হাতে আনার কানে এত জোরে মারল যে বেচারি আনা সমস্ত শরীরটা নিয়ে দেওয়ালে আছড়ে পড়ে। ফলে তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ বন্ধ না করেই সে চলে গেল।

মেঝের উপর আনা পড়ে আছে। যন্ত্রণায় সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে যাচ্ছে। তলপেটে একটা কিছু হবার অপেক্ষায় দমবন্ধ করে ও পড়ে রইল। দেওয়ালের ওপাশ থেকে কারা যেন ডাকছে। মনে হচ্ছে শব্দটা কবরের তলা থেকে আসছে। কান্নাকে কোনওমতে আটকাবার জন্য আনা ঠোঁট কামড়ায়। তারপব উঠে নিজের জামাকাপড় ঠিকঠাক করে। এই প্রথম যে এমনটা ঘটল তা নয়। তবুও দামাসো যে এখনও ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার জন্য গরগর করছে আর আনার বাইরে যাবার জন্য প্রতীক্ষা করছে এমন কথাটা আনার মাথাতেও এল না। এবং দ্বিতীয়বারের জন্য সে একই ভুল করল। স্বামীর অন্বেষণে না বেরিয়ে সে জুতো খুলে ফেলল। দরজা বন্ধ করল। তারপর বিছানায় বসে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল।

দরজা বন্ধ হবার পরেই দামাসো বুঝতে পারল যে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। কুকুরের ঘেউ-ঘেউ গলির শেষ সীমানা পর্যন্ত তাড়া করে চলল কিন্তু তারপর নেমে এল এক ভৌতিক নৈঃশব্দ্য। নিজের পদশব্দকে এড়াবার জন্য ও ফুটপাথটা এড়াল। পদশব্দ ঘুমন্ত শহরের বুকে তীব্র আর বিচ্ছিন্ন ঘা মারছে। ক্লাব-হলের খিড়কির দরজার ফাটা জায়গায় না আসা পর্যন্ত দামাসো তেমন একটা সাবধানী হল না।

এখনও সে টর্চ জ্বালায়নি। দরজার ভাঙা কবজায় একটু চাড় দিল। থান ইটের মাপের এক টুকরো কাঠ কবজা থেকে তুলে নিয়ে নতুন কাঠ বসিয়ে দরজায় একটা তাপ্পি দেওয়া হয়েছে আর ওই তালিটার ওপর পুরোনো কবজাটাই বসানো হয়েছে। বাকিটা আগের মতোই। দামাসো তালাটা বাঁ হাতে তুলে ধরল। একটা ছোট্ট উখা কবজার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কিছুটা ঢুকবার পর ওটা আর ঢুকল না। সুতরাং উখাটা তুলে নিয়ে একটা লিভার দিয়ে একটু চাড় দিল। শব্দ নেই। আস্তে চাপ দিতেই থাকে,—যতক্ষণ না মরচে ধরা কবজাটা ঝুরঝুর করে কাঠ খসিয়ে পুরোপুরি খসে যায়। দরজার ঠেলার আগে সে মেঝে থেকে পাল্লাটা একটু তুলে ধরল, যাতে মেঝের সঙ্গে পাল্লার ঘষটানিতে কোনও শব্দ না হয়। শুধুমাত্র আধখানা খুলল। সবশেষে জুতোটা খুলে বিলিয়ার্ড বলের মোড়কের সঙ্গে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। বাঁধভাঙা জ্যোৎস্না সরু হয়ে ঢুকে পড়ল হলের ভিতরে। আর তারই সঙ্গে ঢুকল দামাসো।

সামনেই গাদা করে রাখা আছে খালি বোতল আর বাক্স। তারপর একটু এগোতেই ছাদের জানালা দিয়ে আসা চন্দ্রালোকে বিলিয়ার্ড টেবিলটা চোখে পড়ল। তারপর ক্যাবিনেটের পিছনটা নজরে এল। এবং সবশেষে ছোট টেবিল-চেয়ারগুলো সদর দরজার মুখটায় জড়ো করে রাখা আছে। সবকিছুই ঠিক

একইরকম। শুধু একটু তফাৎ—বাঁধভাঙা জ্যোৎস্না আর নৈঃশব্দ্যর সতেজতা। দামাসো এতক্ষণ পর্যন্ত নিজের স্নায়ুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিল। এবার সে অদ্ভুতভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

এতক্ষণে সে আলগা ইটগুলো সম্পর্কে সচেতন ছিল না। দরজাটা জুতো দিয়ে আলতো করে ভেজিয়ে দিল। তারপর জ্যোৎস্নার বন্যা পেরিয়ে কাউন্টারের ভিতরে বল রাখার সেই ছোট্ট বাক্সটা খুঁজবার জন্য টর্চটা জ্বালাল। সতর্কতা ছাড়াই ও কাজ করে যাচ্ছিল। টর্চটা বাঁদিক থেকে ডানদিকে আনতেই ওর নজরে এল ধুলো ভরা কয়েকটা শিশি, এক জোড়া রেকাব যাতে কিছু কাঁটা পড়ে আছে, মোটর গাড়ির তেলে জ্যাবজেবে একটা দলা-মোচড়া জামা আর সবশেষে সেই ছোট্ট বাক্সটা। ওটা ঠিক একই জায়গায়ই আছে যেখানে সে ওটাকে ফেলে গেছিল। কাউন্টারটা ভালো করে না দেখা পর্যন্ত ও টর্চটা বন্ধ করল না। আর সেখানেই বিড়ালটা ছিল।

আলোর উলটোদিকে বসে জন্তুটি ওর দিকে এতটুকু সন্দেহ প্রকাশ না করেই তাকিয়ে আছে। দামাসো আলোটা জ্বেলেই রাখল। এরমধ্যেই এক বিচিত্র কাঁপুনি দিয়ে ওর স্মৃতির দরজাটা খুলে গেল। আগের দিন ও জন্তুটাকে ওখানে দেখেনি। আলোটা এগিয়ে নিয়ে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল,—'বিড়াল।' কিন্তু জন্তুটা এখনও নিষ্ক্রিয়। তারপর তার মস্তিকে এক নীরব বিস্ফোরণ ঘটল। আর বিড়ালের বিষয়টা তার মধ্যে থেকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হল। যখন ওর বোধগম্য হল কী ঘটে চলেছে ততক্ষণে টর্চটা হাত থেকে পড়ে গেছে। বলগুলো বুকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ানো আছে। ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

'বাঃ!' রকের কণ্ঠস্বরে দামাসো চিনতে পারল। ধীরে ধীরে ও দাঁড়িয়ে উঠল। কিডনিতে এক প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করল। ঘরের এক কোণা থেকে রক ওর দিকে এগিয়ে আসছে। রকের পরনে আন্ডারপ্যান্ট, হাতে একটা লোহার রড। আলো পড়ে রডটা চকচক করছে। শিশি আর ফাঁকা বাক্সগুলোর পিছনেই একটা খাটিয়া। দামাসোর পালিয়ে যাবার পথের একেবারে পাশে এটাও আগেরবারের থেকে আলাদা।

রক যখন মাত্র ফুট তিরিশেক দূরে তখন রকের তরফ থেকে একটা ক্ষীণ আশা পাওয়া গেল। কারণ রক এখন আত্মরক্ষায় নিবিষ্ট। দামাসো মোড়কসুদ্ধ হাতটা পিছনে লুকোল। রক নাক কুঁচকিয়ে মাথাটা সামনে এনে ওকে চেনবার চেষ্টা করতে লাগল। কারণ এখন চশমাটা তার চোখে নেই।

'তুমি!'—বিস্মিত কণ্ঠে রক বলে ওঠে।

দামাসো অনুভব করে যে, এক সীমাহীন অনন্ত বিষয় অবশেষে অন্তিম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। রক রডটা নামিয়ে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল। রকের মুখটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। বাঁধানো দাঁত আর চশমা ছাড়া তাকে একজন বৃদ্ধের মতো দেখাচ্ছে।

'তুমি এখানে কী করছ?'

'কিছু না',—দামাসোর সপ্রতিভ উত্তর। এক অদ্ভুত কায়দায় দেহটাকে একটু পাক মেরে দামাসো অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাল।

'এখানে তোমার কী দরকার',—রকের প্রশ্ন।

দামাসো পিছিয়ে এসে আবারও বলল,—'কিচ্ছু না।' রক কাঁপছিল এবং ক্রমশ লালচে হয়ে উঠেছিল।

'এখানে তোমার কী দরকার',—রক এবার চিৎকার করে ওঠে। রডটা তুলে এগিয়ে আসে। দামাসো তার হাতে মোড়কটা তুলে দেয়। রক বাঁ হাত বাড়িয়ে সাবধানে মোড়কটা নিল। সে এখনও সতর্ক। আঙুল বুলিয়ে আলগোছে মোড়কটা পরীক্ষা করে। এতক্ষণে তার বোধগম্য হয়েছে।

'না, এটা হতে পারে না',—রক অনুচ্চস্বরে বলে উঠল।

সে এত বোকা বনে গিয়েছিল যে রডটা কাউন্টারের উপর রেখে দিল। আর মোড়কটা খুলবার সময় সে সম্ভবত দামাসোর কথা ভুলেই গেছে। বলগুলো নিয়ে সে নিঃশব্দে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন।

'আমি এগুলো ফেরত দিতে এসেছি',—দামাসো বলল।

'নিশ্চয়ই',—রকের নিঃসংশয় মন্তব্য।

দামাসোর নিজেকে অথর্ব মনে হল। মোহাচ্ছন্ন অবস্থাটা এতক্ষণে ওকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে গেছে।

শুধুমাত্র জিভের উপর এক বিচিত্র আস্তরণ আর একাকিত্বর এক সংশয়াচ্ছন্ন অনুভূতি ওর মধ্যে পাক মারছে। 'সুতরাং এটাই সেই অলৌকিক',—মোড়কটা মুড়তে মুড়তেই রক বলে উঠল। 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না,—তুমি এত-তো বোকা'। যখন সে মাথাটা তুলল, তার ভঙ্গিমা পালটে গেছে। 'আর সেই দু'শো পেসো?

'ড্রয়ারে কিছুই ছিল না',—দামাসো জবাব দেয়। চিন্তাচ্ছন্ন মুখে রক ওর দিকে তাকায়। খালি মুখেই চোয়ালটা নাড়াচাড়া করে আর সবশেষে নিঃশব্দে হাসে 'ড্রয়ারে কিছুই ছিল না',—কয়েকবার সে কথাগুলো উচ্চারণ করে। 'সুতরাং ড্রয়ারে কিছুই ছিল না',—এবার সে রডটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে তুলে ধরে বলে,—'ঠিক আছে, আমরা গল্পটা এক্ষুনি মেয়রকে শোনাচ্ছি।' দামাসো তার হাতের ঘাম প্যান্টে মুছল। 'আপনি জানেন ড্রয়ারে কিছুই ছিল না।'

রক হাসছিল। 'ড্রয়ারে দু'শো পেসো ছিল',—রক বলে চলে। 'আর এখন ওরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমার পিছন থেকে ওগুলো বের করবে। চোর বলে নয়, তুমি এত বড় গাড়ল—সেই জন্যে।'

মূল শিরোনাম . En este pueblo no hay ladrones.

হারানো সময়ের সাগর

জানুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ সাগর ফুঁসে উঠতে শুরু করল। বিপুল আবর্জনা শহরে ডাঁই করা শুরু করে দিল সাগর। কয়েক সপ্তাহ বাদেই শহরের সব কিছুতেই সংক্রামিত হয়ে পড়ল সাগরের অসহনীয় মেজাজ। সেই সময় থেকেই পৃথিবী আর বাসযোগ্য রইল না, অন্তত পরের ডিসেম্বর পর্যন্ত তো বটেই; কাজেই রাত আটটার পর কেউ আর জেগে থাকে না। কিন্তু যে বছর মিস্টার হার্বার্ট এলেন সাগরের কোনও পরিবর্তন হল না। এমনকি ফেব্রুয়ারিতেও নয়। বরং সাগর আরও মসৃণ ও আলো ঝলমলে হয়ে উঠল। মার্চের প্রথম দিকের রাতগুলোয় সাগর গোলাপের সুবাস ছড়িয়ে দিল।

তোবিয়াস গন্ধটা পেল। তার রক্ত কাঁকড়াদের আকর্ষণ করে। বিছানা থেকে কাঁকড়া তাড়াতে তাড়াতেই তোবিয়াস অর্ধেক রাত পার করে দেয়। আবার হাওয়া বইতে শুরু করলে সে ঘুমোতে পারে। নিদ্রাহীন অবস্থায় শুয়ে থাকার দীর্ঘ সময় হাওয়ার বৈচিত্র্যগুলোকে আলাদাভাবে বুঝে নেবার বিষয়টা সে শিখে নিতে পেরেছে। গোলাপের গন্ধটা পাবার পর দরজা না খুলেই সে বুঝতে পারল সাগর থেকেই সুবাসটা আসছে।

সে দেরি করে ঘুম থেকে উঠল। ক্লোতিলদে তখন উঠোনে আগুন ধরানো শুরু করেছে। হাওয়াটা ঠান্ডা। তারাগুলো ঠিকঠাকই আছে। সাগরের আলোর জন্য দিগন্ত পর্যন্ত তারাগুলোকে গোনা যাচ্ছে না। কফি শেষ করার পর তোবিয়াস ভাবল সে যেন এখনও রাতটাকে উপভোগ করতে পারছে। তার মনে পড়ল, কাল রাতে এক ভারী আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে।

ক্লোতিলদে অবশ্যই গন্ধটা পায়নি। তার ঘুম এতই গভীর যে নিজের দেখা স্বপ্নগুলোও তার মনে পড়ছে না।

'গোলাপের গন্ধ'—তোবিয়াস বলল। 'আমি নিশ্চিত যে গন্ধটা সাগর থেকে এসেছিল।'

'গোলাপের গন্ধ কেমন তাই-ই আমি জানি না',—ক্লোতিলদে বলল।

ক্লোতিলদে হয়তো ঠিকই বলেছে। শহরটা ঊষর। কঠিন ও রুক্ষ মাটি সোরায় চিরে গেছে। কেবলমাত্র মৃতদেহকে সাগরে ভাসিয়ে দেবার সময় কদাচিৎ কেউ ফুলের তোড়া বাইরে থেকে নিয়ে এসে সাগরেই ছুঁড়ে ফেলে।

'গুয়াসামাইয়ালের জলে ডুবে মরা লোকটার গা থেকে বেরোনো গন্ধের মতো এই গন্ধটা'—তোবিয়াস বলল।

'তা',—ক্লোতিলদে বলল। 'গন্ধটা যদি ভালোই হয়, তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পার যে ওটা সাগর থেকে আসেনি।'

এখানকার সাগর সত্যিই নিষ্ঠুর। কোনও কোনও সময় জালগুলো ভাসমান আবর্জনা ছাড়া অন্য কিছুই যখন আনে না, তখন ভাঁটার টানে জল সরে গেলে শহরের রাস্তাগুলো মরা মাছে ভরে থাকে। ডিনামাইট শুধু পুরোনো আমলের ডোবা জাহাজের টুকরোগুলোকে জলের উপর নিয়ে আসে।

ক্লোতিলদের মতো সামান্য যে কয়েকজন মহিলা শহরে এখনও পড়ে আছে তারা শুধু তিক্ততায় ছটফট করছে। আর তারই মতো, ওই বুড়ো জ্যাকবের বউ, সেদিন সকালে প্রতিদিনের থেকে আগে ঘুম থেকে উঠে ঘরদোর গোছগাছের কাজ সেরে জলখাবার খেতে বসে বিরক্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

'আমার শেষ ইচ্ছে',—তিনি স্বামীকে বললেন। 'জীবন্ত অবস্থায় যেন কবরে যেতে পারি'।

কথাটা এমনভাবে বললেন যেন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। অথচ তিনি তখন খাবার ঘরের টেবিলে

জানালাগুলোর মুখোমুখি বসেছিলেন। মার্চ মাসের ঝলমলে আলো জানালাগুলো দিয়ে ঝরে পড়ে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। স্ত্রীর মুখোমুখি বসে বুড়ো জ্যাকব তার শান্ত ক্ষুধাকে তৃপ্ত করছিলেন। তিনি স্ত্রীকে এত ভালোবাসেন, এতদিন ধরে ভালোবাসেন যে এখন এমন কোনও দুঃখকষ্টের কথা কল্পনাও করতে পারেন না যেটা কোনও-না-কোনও ভাবে তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে শুরু হয়নি।

'আমি এই আশ্বাস নিয়েই মরতে চাই যে আমাকে সত্যিকারের মানুষের মতো মাটির তলায় শোয়ানো হবে'—তাঁর স্ত্রী বলেই চলেন। 'আর এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হবার একমাত্র উপায় হল—জনে জনে গিয়ে বলা যে আমায় যেন ভগবানের নাম করে তারা জ্যান্তই কবর দেয়।'

'কাউকে তোমায় বলতে হবে না',—বুড়ো জ্যাকব অত্যন্ত শান্তস্বরে বললেন। 'আমি নিজেই তোমায় কবর দেব।'

'তা হলে চলো, যাওয়া যাক',—জ্যাকব-গিন্নি বললেন। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি মরব।'

বুড়ো জ্যাকব গভীরভাবে তাঁকে নিরীক্ষণ করলেন। জ্যাকব-গিন্নির চোখদুটো এখনও প্রাণবন্ত। তাঁর হাড়গুলো সন্ধিস্থলে কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে আর তাঁকে চষা জমির মতো দেখাচ্ছে। দেখার কথা উঠলে বলতেই হয় যে তাঁকে সবসময়েই এমন দেখাত।

'তোমাকে এখন অনেক বেশি সুঠাম দেখাচ্ছে',—বুড়ো জ্যাকব স্ত্রীকে বললেন।

'কাল রাতে আমি গোলাপের গন্ধ পেয়েছি',—দীর্ঘ, ঘন ও গভীর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে জ্যাকব-গিন্নি আস্তে আস্তে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন।

'ওটা নিয়ে মাথা ঘামিও না',—স্ত্রীকে আশ্বস্ত করার জন্য বুড়ো জ্যাকব বললেন। 'আমাদের মতো গরিব মানুষদের জীবনে এই রকম ঘটনা সবসময়ই ঘটছে।'

'সে রকম নয়',—জ্যাকব-গিন্নি বললেন। 'চিরকাল আমি প্রার্থনা করেছি যেন আমি মরার সময়টা অনেক আগেই জানতে পারি, যাতে আমি সাগর থেকে অনেক দূরে গিয়ে মরতে পারি। এ শহরে গোলাপের গন্ধ পাওয়ার অর্থ ভগবানের বার্তা পাওয়া।'

বুড়ো জ্যাকব তখন শুধু ভাবতে পারলেন যে সব কিছু ঠিকঠাকভাবে গোছগাছ করে নেবার জন্য একটু সময় চেয়ে নেওয়া দরকার। যখন মরা উচিত, মানুষ তখন মরে না—বুড়ো জ্যাকব এটা শুনেছেন; বরং যখন তারা মরতে চায় না তখনই মরে যায়। তিনি স্ত্রীর আগাম আশঙ্কায় ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। যখন সময় হবে তখন সত্যি সত্যি স্ত্রীকে জীবন্তাবস্থায় কবর দিতে পারবেন কিনা—এমন কথাও ভাবলেন।

সকাল ন'টায় তাঁর সাবেককালের দোকান ঘরের ঝাঁপ খুললেন বুড়ো জ্যাকব। দরজার পাশে দুটো চেয়ার আর একটা ছোট টেবিল সাজিয়ে দাবার ছকটা বিছিয়ে বসলেন। যাকে সামনে পাওয়া গেল তাকেই ছকের অন্য প্রান্তে বসিয়ে সারাটা সকাল দাবা খেলেই কাটিয়ে দিলেন। নিজের বাড়ি থেকে শহরটার দিকে তাকালেন। ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরের ভাঙা টুকরোগুলোয় আগেকার বাহারি রঙের ঝাপসা ছোপ এখনও আছে। সূর্য আর রাস্তার শেষ প্রান্তে সাগরের অংশ শহরটাকে ঠুকরে খেয়েছে।

মধ্যাহ্নভোজের আগে, রোজকার মতো, দোন মাহিমো গোমেসের সঙ্গে খেললেন। দুটো গৃহযুদ্ধে টিকে যাওয়া এবং তৃতীয় গৃহযুদ্ধে এক চোখ খোয়ানো মানুষটার বদলে অন্য কোনও মানুষ প্রতিপক্ষকে বুড়ো জ্যাকব কল্পনাতেও ভাবতে পারেন না। ইচ্ছে করে প্রথম দানটা হারার পরে আরেক দান খেলার জন্য মাহিমোকে আটকালেন।

'আচ্ছা, দোন মাহিমো, আমায় একটা কথা বলুন তো',—তাকে জিজ্ঞেস করলেন। 'আপনি কি আপনার স্ত্রীকে জীবিতাবস্থায় কবর দিতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই',—দোন মাহিমো গোমেস্‌ জবাব দেয়। 'যদি বলি যে তাতে আমার হাত একটুও কাঁপবে না, সে কথা আপনি অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারেন।'

বুড়ো জ্যাকব হঠাৎ এক নৈঃশব্দ্যে নিমজ্জিত হলেন। তারপর নিজের সেরা ঘুঁটিগুলোর বারোটা বাজিয়ে এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন,—'হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, পেত্রা মরতে বসেছে।'

দোন মাহিমো গোমেসের মুখের অভিব্যক্তি পালটাল না। 'সে ক্ষেত্রে তো তাঁকে জ্যান্ত কবর দেবার প্রশ্নই ওঠে না।' দুটো ঘুঁটি গিলে নিয়ে তিনি একটা রাজা বানালেন। তারপর দুঃখের জলে সিক্ত চোখ দুটো প্রতিপক্ষের ওপর স্থির রাখলেন।

'ওনার কী হয়েছে?'

'কাল রাতে',—বুড়ো জ্যাকব ব্যাখ্যা করলেন। 'ও গোলাপের গন্ধ পেয়েছে।'

'তা হলে আদ্ধেকটা শহরই তো মরতে বসেছে,—দোন মাহিমো গোমেস্ বলল। 'সারা সকাল ধরে তো লোকে শুধু এই কথাই বলাবলি করছিল।'

তাকে আক্রমণ না করে আবার হারতে বুড়ো জ্যাকবের অস্বস্তি লাগল। টেবিল-চেয়ার ভিতরে নিয়ে এলেন। দোকানের ঝাঁপ ফেললেন। তারপর কে গন্ধটা পেয়েছে তা খুঁজবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। শেষকালে দেখা গেল যে শুধু তোবিয়াসই নিঃসংশয়। বুড়ো জ্যাকব তাকে অনুরোধ জানালেন সে যেন একবার তাঁর বাড়িতে আসে। যেন হঠাৎই এসে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে এসে সে যেন জ্যাকবের স্ত্রীকে সব কথা খুলে বলে।

যেমনটি বলা হয়েছিল, তোবিয়াস তাই করল। বেলা চারটে নাগাদ রবিবারের বিশেষ পোশাকে বুড়ো জ্যাকবের বাড়ির দরদালানে এসে সে হাজির। জ্যাকব-গিন্নি ওখানে বসে স্বামী বিপত্নীক হলে যে সব জামা-কাপড় পরবে সেগুলো রিফু করছিলেন এবং গোছগাছ করে রাখছিলেন।

তোবিয়াস এমন নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল যে বুড়ো জ্যাকবের স্ত্রী চমকে উঠলেন।

'রক্ষে করুন, আমি ভাবলাম প্রধান দেবদূত গাবরিয়েল।'

'আচ্ছা! দেখতেই তো পাচ্ছেন,—তা নয়',—তোবিয়াস বলল। 'এ শুধু আমিই, আর আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।'

বুড়ো জ্যাকবের স্ত্রী চশমাটা ঠিক করে পরে আবার তাঁর কাজে লেগে গেলেন।

তিনি বললেন,—'কথাটা কী, তা আমার জানা আছে।'

'বাজি ধরে বলতে পারি,—জানেন না',—তোবিয়াস বলল।

'কাল রাতে গোলাপের গন্ধ পেয়েছেন।'

'আপনি কি করে জানলেন?'—হার মেনে নিয়ে তোবিয়াস প্রশ্ন করল।

'এই বয়সে, চিন্তা-ভাবনার জন্য এত সময় থাকে যে ইচ্ছে করলেই কেউ পুরোপুরি ভবিষ্যৎবক্তা হয়ে যেতে পারে।'

বুড়ো জ্যাকব দোকানের ভেতরকার দেওয়ালে কান লাগিয়ে বসেছিলেন। এবার লজ্জায় উঠে দাঁড়ালেন।

দেওয়ালের ওপার থেকেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন,—'শোনো গিন্নি—তুমি যা ভাবছ ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই কিন্তু তা নয়।'

'এই ছেলেটা মিছে কথা বলছে,'—কাজ থেকে মাথা না তুলেই তিনি বললেন। 'ও কোনও গন্ধই পায়নি।'

'পেয়েছি, এগারোটা নাগাদ',—তোবিয়াস বলল। 'আমি তখন কাঁকড়া তাড়াচ্ছিলাম।'

বুড়ো জ্যাকবের স্ত্রী একটা জামার কলারে তালি লাগানো শেষ করলেন।

'মিছে কথা',—তিনি দাবড়িয়ে বললেন। 'সবাই জানে যে তুমি ধান্দাবাজ।' দাঁত দিয়ে সুতোটা কাটতে কাটতে তিনি চশমার ওপর দিয়ে তোবিয়াসের দিকে তাকালেন।

'আমায় অসম্মান করার জন্যই যদি এখানে এসে থাক,—আমি বুঝতে পারছি না, চুলেই বা অত তেল দিয়েছ কেন, আর জুতোগুলোকেই বা এত চকচকে করে পালিশ করেছ কেন?'

সেই সময় থেকেই তোবিয়াস সাগরের ওপর কড়া নজর রাখতে শুরু করল। উঠোনের পাশে দরদালানে দোলনা টাঙিয়ে সে সারারাত ধরে অপেক্ষা করে। রাতে, লোকের ঘুমোবার সময়, জগৎ জুড়ে যে সব কাণ্ড হয়, সেইসব দেখে আর সে অবাক হয়। অনেক রাতেই সে কাঁকড়াদের মরিয়া

হয়ে বুকে হাঁটার শব্দ শুনেছে। বিশেষ করে তারা যখন দাঁড়া দিয়ে খুঁটিগুলো আঁকড়ে ধরে বেয়ে বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করে—সেই শব্দও সে শুনেছে। অনেক রাত এইভাবে কেটে যাওয়ার পর কাঁকড়ারা ক্লান্ত হয়ে খুঁটি বেয়ে ওঠার চেষ্টা ছেড়ে দিল। ক্লোতিলদের ঘুমের ধরনটাও সে জানতে পারল। গরম বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লোতিলদের বাঁশির সুরের মতো নাসিকা গর্জন কী রকম উঁচু পর্দায় ওঠে, তারপর জুলাইয়ের ঝিম ধরা গরমে সেই নাসিকা ধ্বনি কেমন একটা অলস অথচ বিলম্বিত সুরে পরিণত হয়,—তোবিয়াস তা আবিষ্কার করল। সাগরকে যারা ভালোভাবে জানে তাদের মতো করে গোড়ার দিকে দিগন্তের একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর উপর তোবিয়াস দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। সে সাগরের রং-বাহার দেখল। ফেনায় ফেনায় ফুলে উঠে সাগর কীভাবে ঘোলাটে হয়ে ওঠে, ঝড়-তুফান পেটে মোচড় দিলে সাগর কীভাবে আবর্জনায় ভরা ঢেঁকুর তোলে,—আলো নিভিয়ে এসব দেখল তোবিয়াস। সাগর দেখার কাজে সাগরের দিকে না তাকিয়ে অথচ ঘুমের মধ্যেও সাগরের কথা ভুলে না গিয়ে কীভাবে সাগর দেখতে হয় তাও সে আস্তে আস্তে শিখে ফেলল।

অগস্ট মাসে মারা গেল বুড়ো জ্যাকবের স্ত্রী। ঘুমের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। আর সকলের মতো তাকেও ফুলবিহীন সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হল। তোবিয়াস প্রতীক্ষা করেই চলল। এতদিন ধরে সে অপেক্ষা করছে যে অপেক্ষা করাটাই তার জীবনযাপনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক রাতে সে দোলনায় দুলতে দুলতে টের পেল যে হাওয়ায় কিছু একটা পরিবর্তন ঘটেছে। পচা পেঁয়াজ ভর্তি একটা মালবাহী জাহাজ যে সময়ে বন্দরের মুখের কাছে একটা জাপানি জাহাজের ধাক্কা খেয়েছিল ঠিক তখনকার মতো একটা গন্ধের ঢেউ থমকে থমকে ভেসে আসছে। তারপর গন্ধটা ঘন হয়ে গেল আর ভোর হওয়া পর্যন্ত নিশ্চল হয়ে থাকল গন্ধটা। যখন সে বুঝতে পারল যে এটাকে এখন হাতে তুলে নিয়ে দেখানো যায়, তখনই তোবিয়াস দোলনা থেকে নেমে ক্লোতিলদের ঘরে হাজির হল। সে ক্লোতিলদেকে কয়েকবার ঝাঁকাল।

'এখানে এটা এসে গেছে',—সে তাকে বলল।

মাকড়সার জালের মতো গন্ধটাকে ঝেড়ে ফেলে ক্লোতিলদেকে উঠতে হল। তারপর তার হালকা চাদরটার উপর চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল।

'ভগবান ওকে অভিশাপ দিক,'—ক্লোতিলদে বলল।

তোবিয়াস দরজার দিকে লাফিয়ে গিয়ে মাঝ রাস্তা পর্যন্ত দৌড়াল। তারপর শুরু করল চিৎকার। সর্বশক্তি দিয়ে সে চিৎকার করল। গভীরভাবে একবার দম নিয়ে আবার চেঁচাল। তারপর শব্দহীন নীরবতায় সে আরও গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে বুঝল যে তখনও সাগরের ওপর গন্ধটা ভাসছে। তার চিৎকারে কেউ সাড়া দিল না। সে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। এমনকি যে সব বাড়িতে কেউ থাকে না সেখানেও ধাক্কা দিল। তারপর তার হল্লাটা কুকুরের ডাকের সঙ্গে জট পাকিয়ে যাওয়ার পর সে সবাইকে ঘুম থেকে তুলে ফেলল।

তাদের অনেকেই গন্ধটা পেল না। কিন্তু অন্যরা, বিশেষ করে বুড়োরা, গন্ধটা উপভোগ করার জন্য সাগর সৈকতে চলে গেল। একটা জমাট সৌরভ—আগেকার কোনও গন্ধের সঙ্গে তুলনা করার জন্য এতটুকু সুযোগ নেই। শুঁকতে শুঁকতে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে কেউ কেউ বাড়ি ফিরে গেল। বেশিরভাগ লোকই তাদের রাতের ঘুমটা সারবার জন্য থেকে গেল সাগর সৈকতে। ভোরের হাওয়ায় গন্ধটা এমনই বিশুদ্ধ হয়ে উঠল যে সেই গন্ধ-শ্বাস নিতে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

দিনের বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল তোবিয়াস। দিবানিদ্রার সময়ে তাকে পাকড়াও করল ক্লোতিলদে। বিকেলটা তারা বিছানায় হুল্লোড় করতে এতই ব্যস্ত ছিল যে উঠোনের দিকের দরজাটা বন্ধ করার কথাও খেয়াল ছিল না। প্রথমে কেঁচোদেব মতো. তারপর খরগোশদের মতো আর সব শেষে কচ্ছপদের মতো করে, পৃথিবী বিষণ্ণ অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত তারা প্রেম বিনিময় করল। হাওয়ায় এখনও গোলাপের গন্ধের রেশ। শোবার ঘরে মাঝে মাঝে গান-বাজনার ঢেউ এসে পৌঁছোচ্ছে।

'কাতারিনোর ওখান থেকে এটা আসছে',—ক্লোতিলদে বলল। 'শহরে নিশ্চয়ই কেউ এসেছে।'

তিনজন পুরুষ এবং একজন মহিলা এসেছিল। কাতারিনো ভেবেছিল পরে হয়তো আরও অনেকেই আসবে। সে গ্রামোফোনটা সারাতে চেষ্টা করেছিল। নিজে যন্ত্রটা সারাতে না পেরে সে পানচো আপারেসিদোকে ডাকল। একটা যন্ত্রপাতির বাক্স আর একজোড়া দক্ষ হাত ছাড়া কোনওকালেই কিছু ছিল না বলে পানচো সব কাজই করে।

কাতারিনোর ডেরাটা আসলে সাগরের দিকে মুখ ফেরানো একটা বিচ্ছিন্ন কাঠের বাড়ি। বেঞ্চি আর ছোট ছোট টেবিল দিয়ে সাজানো একটা বিশাল ঘর। পিছনের দিকে আরও কয়েকটা শোবার ঘর আছে। পানচো আপারেসিদোর কাজ দেখতে দেখতে পুরুষ তিনজন এবং মহিলাটি নিঃশব্দে পানশালায় বসে পান করে যাচ্ছিল এবং পালা করে হাই তুলছিল।

কয়েকবার চেষ্টার পর গ্রামোফোনটা ভালোই কাজ করল। সুদূরাগত কিন্তু স্পষ্ট গানের সুর শুনতে পাবার পর তারা কথাবার্তা বন্ধ করে পরস্পরের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ তারা বুঝতেই পারল না কিছু বলার আছে কিনা আর তখনই তারা টের পেল যে শেষবার গান শোনার পর তারা অনেকটা বুড়িয়ে গেছে।

তোবিয়াস দেখল রাত ন'টার পরও সবাই জেগে আছে। তারা দরজার কাছে বসে কাতারিনোর পুরোনো রেকর্ডগুলো শুনছে। লোকে যেভাবে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ দেখে তেমন একটা নিয়তিবাদের ভাবভঙ্গি তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। প্রতিটি রেকর্ড, তাদের কোনও মৃতের কথা, দীর্ঘ রোগভোগের পর খাবারের স্বাদ কিংবা অনেককাল আগে পরের দিন যা তাদের করার কথা ছিল অথচ ভুলে যাওয়ার জন্য যা করা হয়নি,—মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

এগারোটা নাগাদ গান থামল। সাগরের ওপর একটা কালো মেঘ ঝুলছে দেখে বৃষ্টি পড়বে বলে মনে করে অনেকে শুতে চলে গেল। কিন্তু মেঘ নিচে নেমে এসে জলের ওপরে কিছুক্ষণ ভেসে রইল তারপর টুপ করে সাগরের জলেই ডুবে গেল। শুধু তারারাই থেকে গেল উপরে। একটু পরে শহর থেকে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে গোলাপের গন্ধ নিয়ে ফিরে এল।

'আপনাকে আমি ঠিক যা বলেছিলাম, জ্যাকব',—দোন মাহিমো গোমেস্ বিস্মিত স্বরে বললেন। 'আবার ফিরে এসেছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এখন থেকে প্রতি রাতেই আমরা গন্ধটা পাব।'

'ভগবান না করুন',—বুড়ো জ্যাকব বললেন। 'ওই গন্ধটাই শুধু আমার জীবনে বড্ড বেশি দেরি করে এল।'

ফাঁকা দোকানঘরটায় বসে তাঁরা দাবা খেলছিলেন। রেকর্ডগুলোর দিকে তেমন একটা মন যায়নি। তাঁদের স্মৃতিগুলো এত বেশি পুরোনো যেখানে মনে সাড়া ফেলবার জন্য রেকর্ডগুলো যথেষ্ট প্রাচীন নয়।

'আমার দিক থেকে বলতে পারেন যে এ ব্যাপারে আমার খুব বেশি বিশ্বাস নেই,'—দোন মাহিমো গোমেস্ বললেন। 'এত বছর ধরে ধুলো খাবার পর, ফুলগাছ লাগাবার জন্য একটু জমি চেয়ে অসংখ্য মেয়ে মাথা খুঁড়বার পর কেউ একজন এ রকম গন্ধ পাবে আর গন্ধটাকে সত্যি বলে ধরে নেবে,—এটা মোটেই আশ্চর্য নয়।'

'কিন্তু আমাদের নিজেদের নাকেই তো গন্ধটা পাচ্ছি,'—বুড়ো জ্যাকব বললেন।

'তাতে কিছু আসে যায় না,'—দোন মাহিমো গোমেস্ বললেন। 'যুদ্ধের সময়, বিপ্লব যখন পরাস্ত, যখন একজন জেনারেলকে আমরা মনে প্রাণে চাইছিলাম তখন দেখলাম যে স্বয়ং ডিউক অফ্ মার্লবরো সশরীরে উপস্থিত। আমি নিজের চোখে তাকে দেখেছি, জ্যাকব।'

তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। একা হবার পর বুড়ো জ্যাকব দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে আলোটা নিয়ে শোবার ঘরে গেলেন। জানালা দিয়ে সাগরের আলোকপ্রভায় উজ্জ্বল সেই উত্তুঙ্গ পাহাড়চূড়া দেখতে পেলেন যেখান থেকে মৃতদেহদের জলে ছুঁড়ে ফেলা হয়।

'পেত্রা',—তিনি কোমল কণ্ঠে ডাকলেন।

পেত্রা শুনতে পেলেন না। সেই মুহূর্তে প্রায় জলের ওপর দিয়েই দুপুরের ঝকঝকে রোদ মাখতে মাখতে তিনি বঙ্গোপসাগরে ভেসে যাচ্ছিলেন। জলের মধ্যে থেকে তাকাবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে মাথা তুলছিলেন ; অবস্থাটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনও আলোকোজ্জ্বল শো-কেস্ মহাসাগর অভিযানকারী এক জাহাজের দিকে ছুটছে। কিন্তু তাঁর স্বামীকে তিনি দেখতে পাননি যিনি তখন পৃথিবীর অন্য প্রান্তে বসে কাতারিনোর গ্রামোফোন শুনতে শুরু করেছেন।

'শুধু ভেবে দেখো',—বুড়ো জ্যাকব বললেন। 'ছ' মাসও কাটেনি ওরা ভেবেছিল যে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অথচ যে গন্ধটা তোমার মরণ ডেকে আনল, তাকে ঘিরেই ওরা একটা উৎসব শুরু করে দিল।'

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তিনি খুব আস্তে আস্তে ফোঁপাচ্ছেন। বুড়োদের ফোঁপানোর মধ্যে যেমন একটা কাতর ভাব থাকে সেই ভাবটা বর্তমান। তবে একটু পরেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

'পারলে এই শহর ছেড়ে আমি চলে যেতাম',—ছটফট করতে করতে তিনি ফোঁপাতে থাকেন। 'মাত্র কুড়িটা পেসো জোগাড় করতে পারলেই সোজা নরকে অথবা অন্য কোথাও চলে যেতাম।' সেই রাত থেকে শুরু করে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ গন্ধটা সাগরেই থেকে গেল। বাড়িঘরের খাবার-দাবার, পানীয় জল সবকিছুর মধ্যেই গন্ধটা সেঁধিয়ে গেল। গন্ধটার হাত থেকে পালাবার কোনও উপায়ই রইল না। অনেকেই আঁতকে উঠে দেখল যে তাদের ত্যাগ করা মলের বাষ্প থেকেও গন্ধটা আসছে।

যে লোকগুলো আর মেয়েটি কাতারিনোর ডেরায় এসেছিল তারা এক শুক্রবারে চলে গেল। কিন্তু শনিবারেই একগাদা লোক সঙ্গে নিয়ে তারা আবার ফিরে এল। রবিবারে আরও লোকজন এসে হাজির হল। পিঁপড়ের পালের মতো একেক জায়গায় একবার ঢুকছে একবার বেরোচ্ছে। কোথাও খেতে চায়, কোথাও চায় মাথা গোঁজার আস্তানা, শেষটায় রাস্তা দিয়ে চলাফেরাই অসম্ভব হয়ে উঠল।

আরও অনেক লোক এল। শহরটা মরে যাবার সময় যে সব মেয়ে চলে গেছিল, তারাও কাতারিনোর আখড়ায় ফিরে এল। তারা এখন অনেক পৃথুলা ; সারা মুখে পুরু প্রসাধনের প্রলেপ লাগিয়েছে। একেবারে হাল আমলের অনেক গ্রামোফোন রেকর্ড তারা সঙ্গে করে এনেছে যেগুলো কাউকে কোনও কিছুর কথাই মনে পড়াতে পারল না। শহরের সাবেক বাসিন্দারাও ফিরে এল। তারা অন্ধকারের রাস্তায় বড়লোক হতে অন্য কোথাও গেছিল। নিজেদের সৌভাগ্য-সম্পদের কথা বলতে বলতে ফিরে এলেও তাদের পরনে সেই আগেকার পোশাকই ছিল। গান-বাজনার দল, বাজিকর, জুয়াড়ি, জ্যোতিষি, বন্দুকবাজ—সবাই এল। গলায় পোষা সাপ পেঁচিয়ে কেউ কেউ চিরযৌবনের সালসা বিক্রি করছিল। অনেক সপ্তাহ ধরেই তারা পর পর এল। এমনকি প্রথম বৃষ্টিপাতের পরে সাগর যখন ফুঁসে উঠল আর গন্ধটা উধাও হল,—তখনও তারা এল।

একেবারে শেষের দলে এল এক পাদ্রি। সব জায়গায় সে ঘুরঘুর করে। সে হালকা কফিতে চুবিয়ে রুটি খায়। তার আগে যারা এসেছিল তাদের সব কিছুর ওপর সে নিষেধাজ্ঞা জারি করল। জুয়া, নতুন গান, নতুন গানের তালে তাল নাচা, এমনকি সৈকতে ঘুমোবার সদ্য শুরু হওয়া অভ্যেসটাও তার নিষেধাজ্ঞার আওতায় এল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে মেলচোরের বাড়িতে বসে সাগরের সৌরভ নিয়ে কথামৃত শোনাল।

'স্নেহের শিশুরা, তোমরা স্বর্গকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো',—সে বলল। 'কারণ, ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের সৌরভ'।

তাকে কেউ একজন বাধা দিল।

'তা আপনি কেমন করে বলছেন, ফাদার? আপনি তো এখনও গন্ধটা শোঁকেননি।'

'ধর্মশাস্ত্র',—পাদ্রি বলল। 'এই সৌরভ বিষয়টা অতীব স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। আমরা একটা নির্বাসিত গ্রামে আছি।'

মেল্সায় তোবিয়াসের ঘোরা-ফেরা দেখে মনে হচ্ছে সে যেন ঘুমের ঘোরে ঘুরছে। অর্থ কাকে বলে

দেখাবার জন্য একদিন সে ক্লোতিলদেকে নিয়ে ওখানে গেল। রুলেটের চাকা অর্থাৎ জুয়ার চক্র ঘুরতে শুরু করার পর ওরা এমন একটা ভান করল যেন প্রচুর বাজি ধরেছে। জিতে যাওয়া সংখ্যাগুলোর ওপর ধরা সবগুলো বাজির অঙ্ককে ওরা যোগ করে নিল। এতে ওদের নিজেদের ভীষণ বড়লোক মনে হল। কিন্তু এক রাতে শুধু ওরা নয় সমবেত দর্শকরা একটা জুয়ার আড্ডায় এত অর্থ দেখল যে কেউ কল্পনাই করতে পারেনি অত পেসো কোথায় ছিল।

সেই রাতেই মিস্টার হার্বার্ট এসে পৌঁছোলেন। তিনি হাজির হলেন আচমকাই। রাস্তার মাঝখানে পাতলেন একটা টেবিল। টেবিলের ওপর রাখলেন দুটো বিশাল তোরঙ্গ। তোরঙ্গ দুটো থেকে রাশি রাশি ব্যাঙ্ক-নোট উপচে পড়ছিল। নোটের প্রাচুর্য প্রথমে কেউ খেয়ালই করেনি। এমনকি এটা যে হতে পারে তা-ই কেউ বিশ্বাস করেনি। কিন্তু মিস্টার হার্বার্ট ছোট্ট ঘণ্টাটা বাজানো শুরু করার পর লোকজনকে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই হল এবং সকলে তাঁর কথা শুনতে ছুটল।

'আমিই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী',—মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'আমার এত সম্পত্তি যে নোট রাখার মতো আর জায়গাই পাচ্ছি না। তা ছাড়া আমি দিলদরিয়া মানুষ। আমার সিন্দুকেও যখন এত নোট রাখার জায়গা নেই তখন আমি ঠিক করেছি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান করব।'

মিস্টার হার্বার্ট যথেষ্ট লম্বা আর তাঁর গায়ের রং লালচে। তিনি গাঁকগাঁক করে দাপিয়ে এক নাগাড়ে কথা বলেন। একই সঙ্গে তাঁর হাত দু'টো নড়ে। ঈষদুষ্ণ অথচ নির্জীব হাত জোড়া দেখে মনে হয় সদ্য হাতের লোম কামানো হয়েছে। একটানা মিনিট পনেরো কথা বলার পর তিনি থামলেন। তারপর ছোট্ট ঘণ্টাটা বাজিয়ে আবার বক্তৃতা শুরু করলেন। ভাষণের মাঝখানে ভিড়ের মধ্যে থেকে কোনও একজন নিজের টুপিটা নাড়িয়ে তাঁকে বাধা দিল।

'এই যে মশাই, অত কথা না বলে নোটগুলো চটপট ছড়াতে শুরু করুন তো।'

'অত তাড়াতাড়ি নয়',—মিস্টার হার্বার্ট জবাব দিলেন। 'কোনও যুক্তি-টুক্তির বালাই নেই নাকি? নোট ছড়ানো বেআইনি তো বটেই, তাছাড়া এর কোনও মানেই হয় না।'

যে লোকটা তাঁকে বাধা দিয়েছিল তার দিকে তাকিয়ে মিস্টার হার্বার্ট তাকে সামনে এগিয়ে আসার ইশারা করলেন। ভিড় সরে গিয়ে তাকে এগিয়ে আসার পথ করে দিল।

'বরং',—মিস্টার হার্বার্ট বলেই চলেন,—'আমাদের এই ধৈর্যহীন বন্ধু, সম্পদের সমবণ্টন কী করে সম্ভব সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর জন্য আমাদের নিশ্চয়ই একটা সুযোগ দেবেন।' একটা হাত বাড়িয়ে তাকে মঞ্চের উপরে উঠতে তিনি সাহায্য করলেন।

'কী নাম আপনার?'

'পাত্রিসিও।'

'আচ্ছা পাত্রিসিও',—মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'অন্য সবার মতো আপনারও নিশ্চয়ই এমন কোনও সমস্যা আছে যার কোনও সুরাহা এতদিনে আপনি করে উঠতে পারেননি।'

পাত্রিসিও তার টুপিটা খুলে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'সেটা কী?'

'আমার সমস্যা হল, আমার কোনও পুঁজি নেই।'

'আপনার কত চাই।'

'আটচল্লিশ পেসো।'

মিস্টার হার্বার্ট বিজয়ীর হাসি ছড়িয়ে দিলেন। 'আটচল্লিশ পেসো',—তিনি আবার উচ্চারণ করলেন। কথাটা বলতে বলতে তিনি হাততালি দিলেন। সমবেত জনতাও তাঁর সঙ্গে হাততালি দিল।

'খুব ভালো কথা, পাত্রিসিও',—মিস্টার হার্বার্ট বলে চললেন। 'এবার আমাদের একটা কথা বলুন তো আপনি কী করতে পারেন?'

'অনেক কিছু।'

'একটা কিছু স্থির করুন',--মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'এমন কিছু যা আপনি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারেন।'

'বেশ',—পাত্রিসিও বলল। 'আমি অনেক পাখির ডাক নকল করতে পারি।'

দ্বিতীয় দফা হাততালি দিয়ে মিস্টার হার্বার্ট ভিড়ের দিকে ফিরে তাকালেন।

'তা হলে এবার, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের বন্ধু পাত্রিসিও, যে পাখির ডাক নকল করার অদ্ভুত কাজ করতে পারে, এখন আটচল্লিশ রকম পাখির ডাক নকল করে শোনাবে। এইভাবেই সে জীবনের কঠিন সমস্যাটার সমাধান করবে।'

চমকিত ভিড়ের স্তব্ধতায় পাত্রিসিও তখন পাখির ডাক নকল করে শোনাতে লাগল। কখনও শিস দিয়ে, কখনও গলা থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বের করে সব চেনা পাখিদের ডাক নকল করে সে শোনাল। কেউ শনাক্ত করতে পারল না, এমন সব পাখির ডাকও নকল করে সে থামল। শেষ করার পর মিস্টার হার্বার্ট আরেক দফা হাততালির জন্য আহ্বান জানিয়ে পাত্রিসিওকে গুনে গুনে আটচল্লিশটা পেসো দিলেন।

'আর এখন,'—তিনি বললেন। 'এক একজন করে আসুন। আগামীকাল এই সময় পর্যন্ত আমি এখানে থেকে সব সমস্যার সমাধান করব।'

বাড়ির পাশ দিয়ে লোকজন এই ঘটনা সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে বলতে যাতায়াত করার সময় বুড়ো জ্যাকব এই আলোড়ন সম্পর্কে জানতে পারল। একেকটা খবর পায় আর তার বুকের ছাতি ফুলে ওঠে। শেষটায় এমন হল যে মনে হচ্ছিল যে তার বুকের ছাতিটাই বুঝি ফেটে যাবে।

'এই গ্রিঙ্গোটা *('গ্রিঙ্গো'-র বাংলা হয় না। ব্রাজিল ছাড়া লাতিন আমেরিকার যে কোনও দেশে আগত ইংরেজ বা আমেরিকান 'গ্রিঙ্গো' নামে অভিহিত হয়।)* সম্পর্কে আপনি কী ভাবছেন?'—তিনি দোন মাহিমো গোমেস্‌কে জিজ্ঞেস করলেন।

দোন মাহিমো গোমেস্ কাঁধ ঝাঁকালেন। 'নিশ্চয়ই কোনও দাতা-টাতা হবে।'

'আমি যদি কিছু একটা করতে পারতাম,'—বুড়ো জ্যাকব বললেন। 'আমার ছোট্ট সমস্যাটার তা হলে এক্ষুনি সুরাহা হত। খুব বেশি তো আর নয়—মাত্র কুড়ি পেসো।'

'আপনি তো চমৎকার দাবা খেলেন,'—দোন মাহিমো বললেন।

মনে হল বুড়ো জ্যাকব কথাটায় কান দেননি। কিন্তু একা হওয়া মাত্র তিনি দাবার ছকটা আর সাদা-কালো ঘুঁটির বাক্সটা একটা খবরকাগজে জড়িয়ে মিস্টার হার্বার্টকে খেলায় চ্যালেঞ্জ করবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর পালা আসার জন্য মাঝরাত অবধি অপেক্ষা করতে হল। শেষকালে মিস্টার হার্বার্ট সমবেত লোকেদের দিয়ে তাঁর বাক্স-প্যাঁটরা গোছগাছ করিয়ে নিয়ে পরদিন সকাল অবধি বিদায় জানালেন।

তিনি কিন্তু শুতে গেলেন না। যে লোকগুলো তাঁর বাক্স-প্যাঁটরাগুলো বইছিল আর যে লোকগুলো সারাটা রাস্তা তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে তাঁর পিছু ধাওয়া করেছিল তাদের সবাইকে নিয়ে তিনি কাতারিনোর আখড়ায় হাজিরা দিলেন। একটু একটু করে তিনি সমস্যার সমাধান করেই চললেন। শেষটায় ওখানে শুধু তারাই রইল যাদের সমস্যা আগেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর রইল কয়েকজন মেয়ে। ঘরের পেছনে অন্য একটি মেয়ে একা একা বসে একটা বিজ্ঞাপনের কার্ড দিয়ে নিজেকে হাওয়া করে যাচ্ছিল।

'তোমার ব্যাপারটা কী?'—মিস্টার হার্বার্ট মেয়েটির উদ্দেশে চেঁচালেন। 'তোমার সমস্যাটা কী?' মেয়েটি হাওয়া করা বন্ধ করল।

'তোমার তামাশার সঙ্গে আমায় জড়াবার চেষ্টা করো না, মিস্টার গ্রিঙ্গো।'—সেও ঘরের অন্য কোণ থেকে চেঁচাল। 'আমার কোনও সমস্যা নেই। আমি একজন বারবনিতা।'

মিস্টার হার্বার্ট কাঁধ ঝাঁকালেন। অন্য সব সমস্যার জন্য অপেক্ষা করতে করতে খোলা তোরঙ্গগুলোর পাশে বসে তিনি ঠান্ডা বিয়ার খেয়ে চললেন। একটু পরে পাশের টেবিলে বসা মেয়েদের দল থেকে

একজন উঠে এসে তাঁকে আস্তে আস্তে কী যেন বলল। তার একটা পাঁচশো পেসোর সমস্যা আছে।

'সেটাকে তুমি কীভাবে ভাগ করবে?'—মিস্টার হার্বার্ট তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'পাঁচ দিয়ে।'

'ভাবো একবার',—মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'একশো জন পুরুষ'।

'তাতে কিছু আসে যায় না',—সে বলল। 'যদি পুরো পাঁচশো পেসো তুলতে পারি, তবে এরাই হবে আমার জীবনের শেষ একশো পুরুষ।'

মিস্টার হার্বার্ট তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। মেয়েটি একেবারে কচি। হাড়গুলো পলকা কিন্তু তার চোখে রয়েছে একটা সরল সিদ্ধান্তের ছাপ।

'ঠিক আছে',—মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'তুমি তোমার ঘরে যাও। আমি একজন একজন করে পাঁচ পেসো দিয়ে তোমার ঘরে পাঠাব।'

রাস্তার দিকের দরজাটার কাছে গিয়ে তিনি তাঁর ছোট্ট ঘণ্টাটা বাজালেন। সকাল সাতটার সময় তোবিয়াস দেখল তখনও কাতারিনোর আখড়া খোলা আছে। সব আলো নেভানো। বিয়ারে ফুলে গিয়ে, আধো ঘুমের ঘোরে মিস্টার হার্বার্ট মেয়েটির ঘরে লোক ঢো[illegible] নিয়ন্ত্রণ করছেন।

তোবিয়াস ভিতরে গেল। মেয়েটি তাকে চিনতে পেরে এবং তোবিয়াসকে তার ঘরে দেখে রীতিমতো বিস্মিত।

'তুমিও?'

'ওরা আমায় ভিতরে আসতে বলল,'—তোবিয়াস বলে চলে। 'ওরা আমায় পাঁচটা পেসো ধরিয়ে দিয়ে বলল যেন বেশি সময় না নিই।'

মেয়েটি ভেজা চাদরটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে তোবিয়াসকে অন্য ধারটা ধরতে বলল। চাদরটা একেবারে ক্যানভাসের মতো ভারী হয়ে গেছে। ওরা চাদরটার দুটো কোণা ধরে সেটাকে পাকিয়ে, নিংড়ে অবশেষে সেটার স্বাভাবিক ওজন ফিরিয়ে নিয়ে এল। ওরা জাজিমটাকে উলটিয়ে দিল আর জাজিম ফুঁড়ে এ পাশটাতেও ঘাম বেরিয়ে এল। যতটা সম্ভব ভালোভাবেই তোবিয়াস কাজগুলো সারল। বেরিয়ে আসার সময় সে বিছানার পাশে স্তূপ করে রাখা নোটগুলোর উপর পেসো পাঁচটা রাখল।

'পারলে, সবাইকে পাঠিও',—মিস্টার হার্বার্ট তাকে অনুরোধ করলেন। 'দেখি, দুপুরের আগেই ব্যাপারটাকে চুকিয়ে ফেলা যায় কিনা।'

মেয়েটি দরজাটা এক চিলতে ফাঁক করে এক পাত্র ঠান্ডা বিয়ার চাইল। তখনও কয়েকজন অপেক্ষা করে আছে।

'আর কজন বাকি?'—মেয়েটি প্রশ্ন করে।

'তেষট্টি জন',—মিস্টার হার্বার্ট জবাব দেন।

বুড়ো জ্যাকব সারাটা দিন তাঁর দাবার ছক নিয়ে মিস্টার হার্বার্টকে অনুসরণ করে বেড়ালেন। রাত্রি নামার পর তাঁর পালা এল। সমস্যাটা খুলে বলার পর মিস্টার হার্বার্ট চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করলেন। রাস্তার মাঝখানে বড় টেবিলটার ওপর তাঁরা দুটো চেয়ার আর একটা ছোট টেবিল পাতলেন। বুড়ো জ্যাকব প্রথম চালটা দিলেন। শুরু থেকে নিজেব ছকে এটাই ছিল তাঁর শেষ খেলা। তিনি হারলেন।

'চল্লিশ পেসো',—মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'আপনাকে দুটো চাল বাড়তি দেব।'

মিস্টার হার্বার্ট আবারও জিতলেন। তাঁর হাত দুটো ঘুঁটিগুলোকে প্রায় ছোঁয়ই না। চোখ বেঁধে খেললেন। মনে মনে তিনি প্রতিপক্ষের সব চাল অনুমান করে নিলেন। আর তবুও তিনি জিতলেন। দেখতে দেখতে ভিড় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বুড়ো জ্যাকব যখন হাল ছেড়ে দিলেন তখন তিনি পাঁচ হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ পেসো তেইশ সেন্ট ধার করে ফেলেছেন।

বুড়ো জ্যাকবের মুখে কোনও ভাবান্তর হল না। পকেটে রাখা এক টুকরো কাগজে তিনি ধারের অঙ্কটা লিখে রাখলেন। তারপর তিনি দাবার ছক গুটিয়ে নিয়ে, ঘুঁটিগুলোকে বাক্সে রেখে সব কিছু খবরের কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে ফেললেন।

'আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে হয় তাই করুন,'—তিনি বললেন। 'তবে এই জিনিসগুলো আমায় রাখতে দিন। কথা দিচ্ছি ধারের পেসো জোগাড়ের ধান্দাতেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।'

মিস্টার হার্বার্ট ঘড়ি দেখলেন।

'আমি ভীষণ দুঃখিত,'—তিনি বললেন। 'কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আপনার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে।' প্রতিপক্ষ যে সমাধান খুঁজে পায়নি সেটা নিশ্চিতভাবে বোঝার জন্য মিস্টার হার্বার্ট অপেক্ষা করলেন। 'দেওয়ার মতো আপনার আর কিছুই নেই?'

'আমার সম্মান।'

'আমি বলতে চাইছি',—মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'আপনার এমন কিছু আছে কী যা একটা রং মাখানো তুলি বুলিয়ে পালটে দেওয়া যায়।'

'আমার বাড়ি।' বুড়ো জ্যাকব এমনভাবে বললেন যেন তিনি কোনও হেঁয়ালির জট ছাড়াচ্ছেন। 'খুব একটা দাম হবে না, তবে ওটা একটা বাড়ি।'

এভাবেই মিস্টার হার্বার্ট বুড়ো জ্যাকবের বাড়িটার দখল নিয়ে নিলেন। অন্য যারা ধার শোধ করতে পারেনি তাদের বাড়ি-ঘর-সম্পত্তির তিনি দখল নিয়ে নিলেন। তারপর এক সপ্তাহ ধরে নিজের উদ্যোগে গান-বাজনা, আতসবাজি, বাজিকরের খেলা সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে এক উৎসবের আয়োজন করলেন।

সে এক স্মরণীয় সপ্তাহ। মিস্টার হার্বার্ট শহরের অলৌকিক ভবিতব্যের কথা বললেন, এমনকি নকশা এঁকে বুঝিয়ে দিলেন ভবিষ্যতের শহরটা কেমন হবে। বিশাল বিশাল কাচের বাড়ির ওপর নাচ-মঞ্চ। সমবেত ভিড়কে তিনি তা দেখালেন। তারা হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল। মিস্টার হার্বার্টের রঙিন ছবিতে যে পথচারীদের দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে নিজেদের খুঁজে বের করতে তারা চেষ্টা করল। কিন্তু সেই পথচারীরা এমন সুন্দর পোশাক পরে আছে যে ছবির মধ্যে তারা নিজেদের শনাক্ত করতে পারল না। মিস্টার হার্বার্টকে এত কাজে লাগাতে তাদের কষ্টও হচ্ছিল। যে তাড়নায় অক্টোবরে আবার কাঁদতে হবে সেই তাড়নাটা নিয়েও তারা হাসাহাসি করল। এই আশার কুয়াশার মধ্যেই তারা টিকে ছিল। এমন সময় মিস্টার হার্বার্ট তাঁর ছোট্ট ঘণ্টাটা বাজিয়ে ঘোষণা করলেন যে আসর খতম। শুধু তখনই তিনি খানিকটা বিশ্রাম পেলেন।

'যেভাবে আপনি জীবন কাটাচ্ছেন তাতে এই জীবনই আপনার মরণ ঘটাবে,'—বুড়ো জ্যাকব বললেন।

'আমার এতই সম্পদ যে মরে যাবার কোনও কারণই নেই',—মিস্টার হার্বার্ট বললেন।

ধপ করে তিনি বিছানায় নেতিয়ে পড়লেন। এক নাগাড়ে দিনের পর দিন ঘুমিয়ে চললেন। সিংহের গর্জনের মতো নাসিকাধ্বনি। এইভাবে এত দিন কেটে গেল যে লোকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। খাবার জন্য তাদের মাটি খুঁড়ে কাঁকড়া বের করতে হল। কাতারিনোর নতুন রেকর্ডগুলোও এমন পুরোনো হয়ে গেল যে চোখের জল না ফেলে এখন আর সেগুলো কেউ শুনতে পারে না। ফলে কাতারিনো আখড়ার ঝাঁপ ফেলতে হল। মিস্টার হার্বার্ট ঘুমিয়ে পড়ার অনেক পরে পাদ্রি এসে বুড়ো জ্যাকবের দরজায় কড়া নাড়ল। বাড়ির দরজা ভেতর থেকে কুলুপ আঁটা। ঘুমন্ত মানুষটার শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য এত হাওয়া খরচ হয়ে যাচ্ছিল যে ঘরের সব জিনিসপত্র নিজেদের ওজন হারিয়ে ভেসে বেড়াতে শুরু করেছে।

'আমি তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই',—পাদ্রি বলল।

বুড়ো জ্যাকব জবাব দিলেন,—'আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'আমার বেশি সময় নেই।'

'বসুন। একটু সবুর করুন,'—বুড়ো জ্যাকব আবার বললেন। 'এর মধ্যে বরং আমার সঙ্গেই কথা বলুন। বহু দিন ধরে জগতে কী হচ্ছে না-হচ্ছে আমার জানা নেই।'

'লোকেরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে,'—পাদ্রি বলল। 'শহরটা আগের মতো হয়ে উঠতে আর বেশি দেরি নেই। এটাই একমাত্র নতুন খবর।'

বুড়ো জ্যাকব বললেন,—'সাগর যখন আবার গোলাপের গন্ধ ছড়াতে শুরু করবে তখন সবাই আবার ফিরে আসবে।'

'কিন্তু এর মধ্যে যারা থেকে গেছে তাদের মোহ জিইয়ে রাখার জন্য একটা কিছু করা দরকার,—পাদ্রি বলল। 'এখন গির্জাটা বানানো খুবই জরুরি।'

'সেই জন্যেই তো আপনি মিস্টার হার্বার্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন,'—বুড়ো জ্যাকব পাদ্রির কথার রেশ টানলেন।

'সত্যিই তাই',—পাদ্রি বলল। 'গ্রিঙ্গোরা খুব ভালো দাতা।'

'তা হলে আপনি একটু সবুর করুন',—বুড়ো জ্যাকব বললেন। 'উনি হয়তো এক্ষুনি জেগে উঠবেন।'

তাঁরা দাবা নিয়ে বসলেন। খেলাটা বেশ জটিল হয়ে জমে উঠল এবং গড়াতে গড়াতে কয়েকদিন ধরে চলল। তবুও মিস্টার হার্বার্টের ঘুম ভাঙার কোনও লক্ষণ নেই।

হতাশায় মরিয়া হয়ে পাদ্রির সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। সে একটা তামার রেকাবি হাতে করে সর্বত্র ঘুরে বেড়াল। গির্জা বানাবার চাঁদা। কিন্তু খুব একটা চাঁদা উঠল না। চাঁদা চাইতে চাইতে সে আরও হাড় জিরজিরে হয়ে গেল। তার হাড়গুলো ঠোকাঠুকি করতে শুরু করল। হালকা শরীরটা এক রবিবারে উঠে গেল মাটি থেকে দু' হাত ওপরে। কিন্তু কেউই সেটা খেয়াল করল না। তারপর সে একটা স্যুটকেসে কাপড়চোপড় আর আরেকটায় চাঁদা তুলে জমানো পেসোর নোট ভরে নিয়ে চিরকালের মতো এ শহরকে বিদায় জানাল।

যারা তার ফিরে যাওয়া আটকাতে চাইছিল তাদের পাদ্রি বলল,—'ওই গন্ধ আর ফিরে আসবে না।' পাদ্রি তাদের বোঝাল,—'বাস্তব পরিস্থিতি হল এই যে শহরটা চরম ঘেন্নায় জড়িয়ে পড়েছে।'

ঘুম ভাঙার পর মিস্টার হার্বার্ট দেখলেন শহরটা আগের চেহারা ফিরে পেয়েছে। অত মানুষের সমাবেশ রাস্তায় রাস্তায় যে আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিল, বৃষ্টিতে তা গেঁজিয়ে গেছে। মাটি আবার ইটের মতো ঊষর ও কঠিন হয়ে পড়েছে।

হাই তুলতে তুলতে মিস্টার হার্বার্ট বললেন,—'অনেকক্ষণ ঘুমোলাম।'

'কয়েক শতাব্দী',—বুড়ো জ্যাকব বললেন।

'ক্ষিধেয় মরে যাচ্ছি।'

'অন্যদেরও একই হাল',—বুড়ো জ্যাকব মন্তব্য করলেন। 'সাগবের ধারে গিয়ে বালি খুঁড়ে কাঁকড়া বের করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

তোবিয়াস দেখল তিনি দু'হাত দিয়ে বালি আঁচড়াচ্ছেন আর তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসছে। তোবিয়াস অবাক হয়ে আবিষ্কার করল যে বড়লোকেরাও ক্ষিধের মুহূর্তে গরিবদের মতো দেখতে হয়ে যায়। মিস্টার হার্বার্ট যথেষ্ট কাঁকড়া পেলেন না। রাতে সাগরের গহ্বরে খাবার খোঁজার জন্য তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য তিনি তোবিয়াসকে আমন্ত্রণ করলেন।

'শুনুন',—তোবিয়াস তাঁকে হুঁশিয়ারি দিল। 'সাগরের তলায় কী আছে না-আছে তা শুধু মৃত মানুষরাই জানে।'

'বৈজ্ঞানিকরাও জানে',—মিস্টার হার্বার্ট জুড়ে দিলেন। 'মরা মানুষের সাগরের তলায় থাকা কাছিমের মাংস চমৎকার। জামা-কাপড় ছাড়ো। ঝাঁপিয়ে পড়া যাক।'

দু'জনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমে নাক বরাবর সাঁতরে গেল। তারপর গভীর জলে ডুব দিল। সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছোয় না। সাগরের আলোও নেই। সব কিছুই সেখানে নিজের নিজের আলোয় দেখা যায়। তারা একটা জলে ডোবা গ্রাম পেরিয়ে গেল। সেখানে মানুষজন ঘোড়ার পিঠে চেপে গানের আসরের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চমৎকার দিন। অলিন্দে-অঙ্গনে ঝলমলে সব ফুল ফুটেছে।

'সকাল এগারোটা নাগাদ একটা রবিবার ডুবে গেছিল,'—মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'নিশ্চয়ই কোনও মহাপ্লাবন হয়েছিল।'

তোবিয়াস গ্রামটার দিকে রওনা দিচ্ছিল। কিন্তু মিস্টার হার্বার্ট তাকে ইশারায় আরও নিচে নেমে

যেতে বললেন।

'ওখানে গোলাপ আছে',—তোবিয়াস বলল। 'গোলাপ কাকে বলে ক্লোতিলদেকে জানাতে চাইছিলাম।'

'সময়-সুযোগ করে এখানে একদিন এস',—মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'এখন আমি ক্ষিধেয় মরে যাচ্ছি।'

তিনি অক্টোপাসের মতো নিচে নামলেন। মন্থর অথচ লাজুক ভঙ্গিতে তিনি হাত নেড়ে জল ঠেলছেন। তাঁকে চোখে চোখে রাখতে, দৃষ্টির গোচরে রাখতে তোবিয়াস খুবই চেষ্টা করছিল। তোবিয়াস ভাবছিল বড়লোকেরা নিশ্চয়ই এভাবেই সাঁতরায়। আস্তে আস্তে তারা সাধারণ এবং সর্বনাশা সাগর পেরিয়ে মৃতদের সমুদ্রে প্রবেশ করল।

সেখানে এত মৃতদেহ যে তোবিয়াস ভাবল সে পৃথিবীতে কখনও এত মানুষ দেখেনি। তারা জলের বিভিন্ন স্তরে চিৎ হয়ে নিশ্চলভাবে ভাসছে। তাদের দৃষ্টিতে হারিয়ে যাওয়া আত্মারা দেখা দিল।

'এগুলো খুবই পুরোনো মড়া',—মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'এমন শান্ত-সমাহিত অবস্থায় পৌঁছোতে এদের অনেক শতাব্দী লেগে গেছে।'

জলের আরও গভীরে সদ্য মৃতদের স্তরে এসে মিস্টার হার্বার্ট থামলেন। তোবিয়াস তাঁর নাগাল ধরে ফেলা মাত্র একটি অল্পবয়সি মেয়ে ভেসে চলে গেল। সে একপাশে ফিরে চোখ খুলে ভাসছে। তার পিছনে একটা ফুলের স্রোত ভেসে আসছে।

যতক্ষণ না শেষ ফুলটা ভেসে গেল মিস্টার হার্বার্ট ঠোঁটে আঙুল চেপে রাখলেন। তারপর শান্তস্বরে বললেন,—'আমার দেখা জীবনের সেরা সুন্দরী।'

'ও তো বুড়ো জ্যাকবের বউ',—তোবিয়াস বলল। 'যদিও ও পঞ্চাশ বছরের ছোট, তবুও আমি নিশ্চিত ও-ই বুড়ো জ্যাকবের বউ।'

'ও অনেক বেড়িয়েছে',—মিস্টার হার্বার্ট মন্তব্য করলেন। 'দুনিয়ার সব সাগরের ফুল ও জড়ো করে এনেছে।'

তারা একেবারে তলদেশে এসে পৌঁছোল। ঝকঝকে মসৃণ স্লেটের মতো মাটিতে মিস্টার হার্বার্ট বারকয়েক ডিগবাজি খেয়ে নিলেন। তোবিয়াস তাঁকে অনুসরণ করল। তলদেশের আলো আঁধারিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পর সে আবিষ্কার করল কাছিমরা ওখানেই আছে। হাজার হাজার কাছিম এই গভীরতায় চ্যাপটা হয়ে এমন নিশ্চলভাবে পড়ে আছে যেন মনে হচ্ছে ওগুলো পাথরের মতো স্তব্ধ।

'ওগুলো জ্যান্ত',—মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'তবে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঘুমোচ্ছে।'

তিনি একটা কাছিমকে উলটিয়ে চিৎ করে দিলেন। কাছিমটাকে ওপরের দিকে একটা হালকা ধাক্কা দিলেন। ঘুমন্ত প্রাণীটা তাঁর হাত থেকে খসে গিয়ে ওপরের দিকে ভেসে উঠতে লাগল। তোবিয়াস ওটাকে যেতে দিল। তারপর সে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল পুরো সাগরটাই যেন ডিগবাজি খেয়ে উলটে পড়ে আছে।

'স্বপ্নের মতো লাগছে',—সে বলল।

'নিজের ভালোর জন্য, কাউকে এ কথা বলবে না। লোকজন এই সব জেনে গেলে, ভেবে দেখো, দুনিয়া জুড়ে কীরকম একটা হুলুস্থূল পড়ে যাবে।'

প্রায় মাঝরাতে ওরা গ্রামে ফিরে গেল। ক্লোতিলদেকে ঘুম থেকে তুলে একটু জল গরম করতে বলল। মিস্টার হার্বার্ট কাছিমটাকে কসাইয়ের মতো করে কাটলেন। কিন্তু কাছিমের হৃৎপিণ্ডটা ছিটকে উঠোনে গিয়ে পড়ল। হৃৎপিণ্ডটাকে তাড়া করে দ্বিতীয়বার মারবার জন্য ওরা তিনজনেই হুটোপাটি শুরু করে দিল। তারপর দমবন্ধ হয়ে আসা পর্যন্ত ওবা খেয়ে গেল।

'আচ্ছা, তোবিয়াস',—মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'আমরা তো বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আর বাস্তব বলে',—মিস্টার হার্বার্ট বলেই চললেন। 'গন্ধটা আর ফিরে আসবে না।'

'গন্ধটা ফিরে আসবে।'

'এটা ফিরবে না',–ক্লোতিলদে বলল। 'কারণ, অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও বাস্তব যে, গন্ধটা আসেনি। তুমিই শুধু সবাইকে তাতিয়ে দিয়েছিলে।'

'তুমি নিজেও তো গন্ধটা পেয়েছ',–তোবিয়াস বলল।

'সে রাতে আমি অর্ধেক ঘোরের মধ্যে ছিলাম',–ক্লোতিলদে জবাব দেয়। 'এখন আমি ঠিক বলতে পারব না যে তার সঙ্গে সাগরের কোনও যোগাযোগ ছিল কিনা।'

'তা হলে আমি আমার পথ দেখি',–মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'আব',–দুজনকেই লক্ষ্য করে তিনি আরও জুড়ে দিলেন,–'তোমরাও চলে যাও। এ শহরে না খেতে পেয়ে মরার বদলে পৃথিবীতে করার মতো অনেক কাজ আছে।'

তিনি চলে গেলেন। তোবিয়াস উঠোনেই থেকে গেল। দিগন্ত বিস্তৃত আকাশের তারাগুলো এক এক করে গুনে আবিষ্কার করল যে গত ডিসেম্বরের চেয়ে তিনটে তারা বেশি। ক্লোতিলদে শোবার ঘর থেকে তাকে ডাকল। কিন্তু তোবিয়াস পাত্তাই দিল না।

'এখানে এস, গাড়ল কোথাকার',–ক্লোতিলদে জোর করল। 'খরগোশের মতো করে প্রেম করি না, সে যে কত বছর হয়ে গেল।'

তোবিয়াস অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। শেষকালে যখন সে ঘরে গেল ক্লোতিলদে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সে তাকে অর্ধেক জাগাল। কিন্তু ক্লোতিলদে এতই ক্লান্ত যে দুজনেই সব কিছু কেমন যেন জট পাকিয়ে ফেলল। শেষটায় ওরা শুধু কেঁচোদের মতো জড়াজড়ি করে পড়ে রইল

ঠোঁট ফুলিয়ে ক্লোতিলদে বলল–'বোকার মতো করছ, অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করো।'

'আমি অন্য কিছুর কথাই ভাবছি।'

সেই অন্য কিছুটা কী ক্লোতিলদে জানতে চাইল। বিষয়টা আর উচ্চারণ করবে না এই শর্তে তোবিয়াস তাকে বলতে রাজি হল। ক্লোতিলদে কথা দিল।

'সাগরের তলায় একটা গ্রাম আছে',–তোবিয়াস বলে চলে। 'সাদা সাদা, ছোট ছোট বাড়ি। বাড়িগুলোর বারান্দা আর উঠোনে লক্ষ লক্ষ ফুল।'

ক্লোতিলদে দু'হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরল।

'ওহ্, তোবিয়াস',–সে আর্তনাদ করে উঠল। 'ওহ্, তোবিয়াস, ভগবানের দোহাই, আবার ওই গণ্ডগোল পাকাতে যেও না।'

তোবিয়াস কিছুই বলল না। বিছানার এক পাশে গড়িয়ে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করল। ভোর হওয়ার আগে সে ঘুমোতে পারল না। ভোরবেলায় হাওয়া দিক পালটালে কাঁকড়ারা তাকে শান্তিতে ঘুমোতে দিল।

মূল শিরোনাম El mar del tiempo perdido

কর্নেলকে একজনও লেখে না

কফির কৌটোর ঢাকনাটা খুলে কর্নেল দেখলেন মাত্র এক ছোট চামচের মতো কফি রয়েছে। কেটলিটা উনুন থেকে তুলে নিয়ে অর্ধেকটা জল মাটির মেঝের ওপর ফেলে দেওয়ার পর একটা ছুরির ডগা দিয়ে চেঁছে চেঁছে কফির শেষ গুঁড়োটাও কেটলিতে ঢেলে দিলেন। কৌটোর তলার একটু মরচেও সেই সঙ্গে মিশে গেল। কফি মেশানো জলটা ফুটে ওঠার অপেক্ষায় পাথরের উনুনের পাশে কর্নেল বসে পড়লেন। তাঁর বসার ভঙ্গিতে আস্থার সঙ্গে বেশ একটা সরল প্রত্যাশাও মিশে আছে। কেমন যেন মনে হল—নাড়ি-ভুঁড়ির মধ্যে শ্যাওলা আর বিষাক্ত লিলিরা শিকড় গজিয়ে বসছে। এটা অক্টোবর মাস। সকালটা কাটিয়ে ওঠা, এমনকী তাঁর মতো লোকের পক্ষেও বেশ কঠিন। এরকম কত সকালই তো এর আগে তিনি টিকে গিয়েছেন। শেষ গৃহযুদ্ধটা খতম হবার পর প্রায় ষাট বছর হতে চলল। তারপর থেকে কর্নেল শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর কিছুই করেননি। যে কটা জিনিস শেষ অবধি তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে, তার মধ্যে একটা হল—অক্টোবর।

কফি নিয়ে তাঁকে শোবার ঘরে ঢুকতে দেখে কর্নেলের স্ত্রী মশারিটা এক পাশে তুললেন। গত রাত্রে তাঁর ওপর হাঁপানির একটা দমকা হামলা হয়ে গেছে। এখনও তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন। তবু তিনি কফির কাপটা নেবার জন্য উঠে বসলেন।

'আর তোমার'—স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি আগেই খেয়ে নিয়েছি'—কর্নেল মিথ্যে কথা আওড়ালেন। 'বড় চামচের এক চামচ তখনও ছিল।'

সেই মুহূর্তেই ঘণ্টার আওয়াজ শুরু হল। অন্ত্যেষ্টির কথাটা কর্নেল ভুলেই গিয়েছিলেন। স্ত্রী কফির পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার সময় তিনি একপাশের আংটা থেকে মশারির দড়ির গিঁটটা খুলে ফেললেন। তারপর মশারিটা ভাঁজ করে দরজার আড়ালে গড়িয়ে দিলেন। কর্নেল-গিন্নি ভাবতে লাগলেন মৃতের কথা।

'ও জন্মেছিল ১৯২২-এ।' তিনি বললেন—'আমাদের ছেলের জন্মের ঠিক এক বছর পর। সাতই এপ্রিল।'

ঘরঘর আওয়াজ করে তিনি দম নিচ্ছেন আর তারই ফাঁকে ফাঁকে চুমুক দিচ্ছেন কফির কাপে। তাঁর শরীরটা এখন বড় জোর একটা পাকা বাঁকা শিরদাঁড়ার ওপর পাতলা সাদা চামড়ার পলেস্তারা মাত্র। হাঁপানির টানের জন্যে প্রশ্নগুলো তাঁকে সরাসরি সোজাভাবে বলে দিতে হয়। কফি যখন শেষ হল তখনও তিনি ওই মৃতের কথাই ভাবছেন।

'অক্টোবরে কবরে যাওয়া নিশ্চয়ই ভয়ংকর',—বললেন কর্নেল-গিন্নি। কিন্তু তাঁর স্বামী সে কথায় কোনও কানই দিলেন না। তিনি জানালা খুলে দিলেন। বাইরের বারান্দাতেও অক্টোবর উপস্থিত। লতাপাতাগুলোয় ফেটে পড়ছে গাঢ় সবুজ রঙ। কেন্নোরা মাটির ওপর খুদেখুদে মাটির ঢিবি বানিয়ে তুলেছে আর সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আবার একেবারে অন্তরের অন্তঃস্থলে তিনি এই ভয়ানক মাসটাকে অনুভব করলেন। 'আমার হাড়ের ভেতরেও কেমন যেন ভেজা-ভেজা ভাব',—কর্নেল বললেন।

'শীত পড়েছে',—গিন্নির মন্তব্য। 'বৃষ্টি-বাদল শুরু হবার পর থেকেই তোমাকে পই পই করে মোজা পরে শুতে বলেছি।'

'মোজা পরেই তো শুচ্ছি—এক সপ্তাহ হয়ে গেল।'

বৃষ্টি পড়ছে, হালকা কিন্তু বিরামহীন। একটা গরম চাদর গায়ে জড়িয়ে দোলনায় আবার গড়িয়ে নিতে পারলে কর্নেলের ভালো লাগত। কিন্তু ভাঙা ঘণ্টাগুলোর নাছোড়বান্দা একটানা গোঙানি তাঁকে অন্ত্যেষ্টির কথাটা মনে করিয়ে দিল। 'অক্টোবর এসে গেছে',—ফিসফিস করে আওড়াতে আওড়াতে কর্নেল ঘরের মাঝখানটায় হেঁটে এলেন। আর তখনই মনে পড়ল খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধা মোরগটার কথা। এটা লড়িয়ে মোরগ।

কফির কাপটাকে রান্নাঘরে রেখে বসার ঘরে ফিরে এসে কারুকার্য করা কাঠের কুলুঙ্গিতে রাখা পেন্ডুলাম দোলানো ঘড়িটায় দম দিলেন। শোবার ঘরটা ছোট। হাঁপানির রোগীদের পক্ষে ভালো নয়। বসার হল্‌ঘরটা কিন্তু তেমন নয়, বরং বিশাল। একটা ছোট্ট টেবিলের চারপাশে শক্তপোক্ত চারটে আরাম কেদারা। টেবিল-ক্লথ দিয়ে ঢাকা টেবিলের ওপর একটা প্লাস্টারে তৈরি বিড়াল। ঘড়িটার উলটো দিকের দেওয়ালে পাতলা জালিকাটা রেশমি কাপড় পরা এক মেয়েকে ঘিরে একটা গোলাপে বোঝাই নৌকোর উপর ছোট ছোট কিউপিডের মূর্তি আঁকা একটা ছবি টাঙানো আছে।

ঘড়িটায় দম দেওয়া যখন শেষ হল, তখন সাড়ে সাতটা বাজে। তারপর তিনি মোরগটাকে নিয়ে রান্নাঘরে গেলেন। ওটাকে বেঁধে দিলেন উনুনের একটা পায়ায়। রেকাবিটার জল বদলে দিয়ে পাশে রাখলেন একমুঠো গমের দানা। বেড়ার ফোকরটার মধ্যে দিয়ে একদল বাচ্চা এসে হাজির। তারা মোরগটাকে ঘিরে বসল। চুপ করে বসে ওরা এখন মোরগটাকে দেখবে।

'ওটার দিকে তাকাস না',—কর্নেল বললেন। 'নজর লাগলে মোরগরা শুকিয়ে যায়।'

বাচ্চারা নড়লই না। একজন বরং তার মাউথ অর্গানে একটা জনপ্রিয় গানের একটু সুর তুলল। 'আজ গান বাজাস না',—কর্নেল তাকে বললেন। 'শহরে একজন মারা গেছে।' বাচ্চাটা তার মাউথ অর্গানটা ঢুকিয়ে রাখল ট্রাউজার্সের পকেটে। কর্নেল চলে গেলেন শোবার ঘরে। অন্ত্যেষ্টিতে যাবার জন্য পোশাক পরে নিতে হবে।

স্ত্রীর হাঁপানি বলে সাদা স্যুটটা ইস্ত্রি করা হয়নি। ফলে তাঁকে সেই পুরোনো কালো স্যুটটাই পরতে হল। বিয়ের পর থেকে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এটাকেই তিনি পরে এসেছেন। তোরঙ্গটার একেবারে তলা থেকে স্যুটটা খুঁজে বের করতে বেশ খানিকটা পরিশ্রম করতে হল। খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া, পোকায় যাতে না কাটে সেই জন্য ছোট ছোট ন্যাপথলিনের গুলি চারপাশে ছড়ানো। বিছানায় পা ছড়িয়ে শুয়ে তাঁর স্ত্রী তখনও মৃতের কথাই ভেবে চলেছেন।

'এর মধ্যেই হয়তো আগুস্তিনের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেছে',—স্ত্রী বললেন। 'আগুস্তিনের মৃত্যুর পর থেকে আমরা কী দশায় পড়ে আছি, সে কথা হয়তো ও বলবে না।'

'এ মুহূর্তে ওরা হয়তো মোরগগুলোর কথাই বলছে',—বললেন কর্নেল।

তোরঙ্গ ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা পুরোনো ছাতা আবিষ্কার করে বসলেন তিনি। দলের জন্য টাকা তোলবার জন্য যে লটারি খেলার আয়োজন করা হয়েছিল তাতে কর্নেলের স্ত্রী জিতেছিলেন এই ছাতাটা। ছাতাটা যেদিন জিতলেন সেই রাত্তিরেই তাঁরা বাইরে একটা মেলায় যেতে পেরেছিলেন। বৃষ্টির জন্য যাওয়াটা বাতিল করতে হয়নি। কর্নেল, তাঁর স্ত্রী আর তাঁদের ছেলে আগুস্তিন, ওর বয়স তখন আট, এই বিশাল ছাতাটার তলায় বসে শেষ অবধি মেলার খেলাগুলো দেখেছিলেন। এখন আগুস্তিন আর বেঁচে নেই আর ছাতার ঝলমলে সাটিনের কাপড়টা পোকায় ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

'দেখ, আমাদের সার্কাসের ছাতাটার কী দশা হয়েছে',—কর্নেল তাঁর আগেকার দিনের একটা কথা আওড়ালেন। ছোট ছোট ধাতুর শিক দিয়ে তৈরি এক রহস্যময় যান্ত্রিক ব্যবস্থা তাঁর মাথার ওপর খুলে গেল। 'এখন আকাশের তারা গোনবার পক্ষেই এটাকে দারুণ মানাবে।'

কর্নেল মৃদু হাসলেন। কিন্তু কর্নেল-গিন্নি ছাতাটার দিকে একবারও তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করেননি। 'সবকিছুরই তো ওই দশা',—তাঁর স্ত্রী ফিসফিস করে বললেন। 'আমরা জ্যান্ত পচে মরছি।' এই বলে কর্নেল-গিন্নি চোখ বুজলেন, যাতে মৃত লোকটার কথাই মন দিয়ে ভাবা যায়।

হাত বুলিয়েই কর্নেল দাড়ি কামিয়ে নিলেন। কারণ, অনেকদিন ধরে বাড়িতে আয়না নেই। তারপর নিঃশব্দে পোশাক পরতে লাগলেন। ট্রাউজার্সটা পায়ে আঁটো হল, যেন লম্বা পাজামার মতো অন্তর্বাস। ট্রাউজার্সের গোড়ালির কাছটা ফিতে দিয়ে বাঁধতে হয় আর কোমরের কাছে একই রকম কাপড়ের দুটো ফিতে। কিডনির কাছাকাছি দুটো সোনালি বক্‌লসের মধ্য দিয়ে গলিয়ে নিতে হয় ফিতেগুলোকে। কর্নেল কোনও বেল্ট পরেন না। তাঁর শার্টটার রঙ পুরোনো ম্যানিলা কাগজের মতো আর সেটায় তেমনি কড়া মাড় দেওয়া। তামার কোণা উঁচোনো বোতাম দিয়ে ঘাড়ের আলগা কলারটাকে আটকাতে হয়। কিন্তু কলারটা ছেঁড়া। কাজেই কর্নেলকে গলায় কলার বাঁধবার ইচ্ছেটা বাদ দিতে হল।

প্রত্যেকটা কাজ তিনি এমনভাবে করলেন যেন তাঁর মধ্যে এক উত্তরণ ঘটবে। তাঁর হাতের হাড়গুলো টান টান খসখসে চামড়া দিয়ে ঢাকা। ঘাড়ের কাছের হালকা ছোপের মতো হাতেও হালকা দাগ আছে। পেটেন্ট চামড়ার জুতো জোড়া পরে নেবার আগে জুতোর সেলাইয়ের ওপর জমে থাকা শুকনো মাটির ডেলাগুলো চেঁছে সাফ করে নিলেন। ঠিক তখনই স্ত্রী তাকালেন তাঁর দিকে। তাঁর মনে হল স্বামী যেন ঠিক তাঁদের বিয়ের দিনের মতো সাজগোজ করেছেন। আর ঠিক তখনই প্রথম তাঁর খেয়াল হল কতটা বুড়িয়ে গেছেন কর্নেল।

'দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনও বিশেষ উৎসবের জন্য সেজেছ',—কর্নেল গিন্নির মন্তব্য।

'এই সৎকারটা তো একটা বিশেষ ঘটনাই',—কর্নেল বললেন। 'অনেক, অনেক বছর পর এই প্রথম আমাদের এখানে স্বাভাবিক কারণে কারও মৃত্যু হল।'

ন'টার পর আবহাওয়া পরিষ্কার হল। বাইরে যাবেন বলে কর্নেল তৈরি। এমন সময় স্ত্রী চেপে ধরলেন তাঁর কোটের হাতাটা। 'চুলটা আঁচড়ে নাও',—তিনি বললেন।

কর্নেল তাঁর ইস্পাত-রঙা খোঁচা খোঁচা চুলগুলোকে একটা হাড়ের চিরুনি দিয়ে শায়েস্তা করবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু পুরো চেষ্টাটাই অর্থহীন।

'আমাকে নিশ্চয়ই একটা টিয়া পাখির মতো দেখাচ্ছে',—কর্নেল বললেন। তাঁকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করার পর তাঁর স্ত্রীর মনে হল মোটেই ওরকম দেখাচ্ছে না। কর্নেলকে মোটেই টিয়া পাখির মতো দেখাচ্ছে না। তাঁর শুকনো শরীরে নিরেট হাড়গুলো নাটবল্টুর মতো চাগিয়ে আছে। চোখের সজীবতার জন্যই যেন তাঁকে আরক মাখিয়ে জিইয়ে রাখা মানুষ বলে মনে হয় না।

'ওভাবেই তোমায় সুন্দর দেখায়',—স্ত্রী স্বীকার করলেন। তাঁর স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে তিনিও আরও জুড়ে দিলেন,—'আর ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করবে তো, এ বাড়িতে ওর গায়ে আমরা কি ফুটন্ত জল ঢেলে দিয়েছিলাম যে সে এ পথে হাঁটাই বন্ধ করে দিয়েছে।

শহরের শেষ সীমানায় তালপাতায় ছাওয়া, দেওয়াল থেকে চুনকামের পলেস্তারা খসে পড়া এক বাড়িতে তাঁদের বসবাস। যদিও বৃষ্টি থেমে গিয়েছে গুমোট ভ্যাপসা ভাবটা তেমনি আছে। দু'পাশে ঠাসাঠাসি করা বাড়ি-ঘরের মধ্যেকার একটা ছোট গলি দিয়ে হেঁটে প্লাজায় পৌঁছোলেন কর্নেল। বড় রাস্তায় এসে ঠান্ডায় তিনি একটু কেঁপে উঠলেন। যদ্দূর চোখ যায়, শহরটায় যেন ফুলের একটা গালচে পাতা হয়েছে। কালো পোশাক পরা মেয়েরা দরজার কাছে বসে অন্ত্যেষ্টিযাত্রার জন্য অপেক্ষা করছে।

প্লাজায় আসার পরে আবার ইলশেগুঁড়ি শুরু হল। বিলিয়ার্ড খেলার আখড়ার মালিক তার দরজা থেকেই কর্নেলকে দেখতে পেল। দু'হাত বাড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বলল,—'কর্নেল, একটু দাঁড়ান! আমি আপনাকে একটা ছাতা দিচ্ছি।' ফিরে না তাকিয়েই কর্নেল তাকে উত্তর দিলেন,—'ধন্যবাদ। বেশ আছি।'

এখনও গির্জা থেকে অন্ত্যেষ্টি মিছিল বেরোয়নি। পুরুষরা গায়ে সাদা পোশাক, গলায় কালো টাই পরে নিচু দরজাটার সামনে যে যার ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তাদের একজন দেখতে পেল কর্নেল লাফিয়ে লাফিয়ে প্লাজার জলেভরা গর্তগুলো পেরোচ্ছেন। সে চেঁচিয়ে বলল,—'আরে দোস্ত, ছাতার তলায় এসো, এখানে।' সে সরে দাঁড়িয়ে তার ছাতার তলায় কর্নেলকে জায়গা করে দিল।

'ধন্যবাদ',—কর্নেলের সংক্ষিপ্ত উত্তর। আমন্ত্রণটা তিনি মোটেই গ্রহণ করেননি। মৃতের মাকে শোক

আর সান্ত্বনা জানাতে ঢুকে পড়লেন বাড়িটার মধ্যে। প্রথমেই নানা ধরনের প্রচুর ফুলের গন্ধ টের পেলেন তিনি। তারপরেই গরমটা তেড়েফুঁড়ে বেড়ে গেল। শোবার ঘরে গাদাগাদি ভিড়। কর্নেল তারই মধ্যে দিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কে যেন তাঁর পিঠে একটা হাত রাখল। হতভম্ব লোকজনদের জমায়েতের মধ্যে দিয়ে তাঁকে ঠেলে নিয়ে এল ঘরের পেছনে; মৃতের নাসারন্ধ্র দুটো এখান থেকে গভীর আর খোলামেলাভাবে দেখা গেল। মৃতের মাও ছিলেন। একটা ঝালর লাগানো তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করে তিনি কফিন থেকে মাছি তাড়াচ্ছিলেন। যেমনভাবে লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে নদীর স্রোত দেখে ঠিক যেন সেইভাবে কালো পোশাক পরা অন্য সব মেয়েরা মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে আছে। তক্ষুনি ঘরের পেছনে কার যেন গলার ঘরঘরানি শুরু হল। কর্নেল একজন মেয়েকে একটু সরিয়ে দিয়ে এক পাশ থেকে মৃতের মার কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন। 'আমি খুবই দুঃখিত',—তিনি বললেন।

মহিলা তাঁর মুখ ফেরালেন না। শুধু মুখটা হাঁ করলেন আর ডুকরে উঠলেন। আঁতকে উঠলেন কর্নেল। মনে হল এক অবয়বহীন ভিড় যেন তাঁকে মৃতদেহটার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আর সুর করে টেনে টেনে ডুকরে উঠছে। হাত দুটোর জন্য তিনি একটা শক্ত অবলম্বন খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু নাগালে পেলেন না দেওয়ালটাকে। তার জায়গায় অন্য সব শরীর। কে যেন তাঁর কানে কানে, আস্তে খুব কোমল স্বরে বলল,—'একটু সামলে কর্নেল।' তিনি মুখটা ঘোরালেন আর অমনি মৃতের একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলেন। কিন্তু তাকে তিনি চিনতেই পারলেন না। কারণ, শরীরটা কেমন যেন আড়ষ্ট আর সজীব। তাঁরই মতো মৃতদেহটাও যেন হতচকিত। শিঙাটা তার হাতে। সারা দেহ সাদা কাপড়ে মোড়া। একটু হাওয়ার খোঁজে কর্নেল চিৎকারের মধ্যে থেকে মাথা তুলতেই, দেখতে পেলেন বন্ধ বাক্সটা ফুলের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে দরজার দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে। দু'পাশে রাশি রাশি ফুল ছিটকে যাচ্ছে দেওয়ালের গায়ে। একেবারে ঘেমে উঠেছেন কর্নেল। তাঁর হাড়ের জোড়গুলো ব্যথা করছে। মুহূর্ত পরেই টের পেলেন তিনি রাস্তায় এসে পড়েছেন। কারণ ইলশেগুঁড়ির ফোঁটা তাঁর চোখের পাতায় কেমন যেন জ্বালা ধরাচ্ছে। আর কে একজন যেন তাঁর জামাটা আঁকড়ে ধরে বলছে,—'জলদি কর, দোস্ত আমি তোমারই জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

সে সাবাস্। তাঁর মৃত ছেলের ধর্মবাপ। তাঁর দলের একমাত্র নেতা, যে রাজনৈতিক নির্যাতন এড়াতে পেরে সব সময় শহরের মধ্যেই থাকতে পেরেছে। 'ধন্যবাদ, দোস্ত',—বলে কর্নেল ছাতার তলায় নীরবে হাঁটতে লাগলেন। বাজনাদারেরা অন্ত্যেষ্টি মিছিলের সুর বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। কর্নেল বাজনার সুরে শিঙার অনুপস্থিতিটা খেয়াল করলেন। মৃতলোকটা যে সত্যি মরে গিয়েছে, এটা যেন এই প্রথম তিনি নিশ্চিত করে বুঝতে পারলেন। 'বেচারা',—মৃদুস্বরে তিনি বিড়বিড় করলেন।

গলা ঝাড়ল সাবাস্। ছাতাটা তার বাঁ হাতে ধরা রয়েছে। হাতলটা ঠিক তার মাথার সমান উঁচু। কারণ, সে কর্নেলের চেয়ে বেঁটে। কফিন নিয়ে মিছিলটা প্লাজা থেকে বেরোবার পরে তাঁরা কথাবার্তা শুরু করলেন। সাবাস্ তার কাতরভাব ভরা মুখটা কর্নেলের দিকে ফিরিয়ে বলল,—'দোস্ত, মোরগের হাল-হকিকত কী?'

'এখনও আছে আর কী?'—কর্নেল উত্তর দিলেন।

ঠিক তক্ষুনি একজনের চিৎকার শোনা গেল,—'ওরা মৃতদেহটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?'

চোখ তুলে তাকালেন কর্নেল। দেখলেন ব্যারাকের অলিন্দে বেশ একটা অতিনাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়র। তার পরনে ফ্লানেলের অন্তর্বাস। তার দাড়ি না কামানো গাল দুটো ফোলা ফোলা। বাজনাদারেরা সুরটা থামিয়ে দিল। এক মুহূর্ত পরেই ফাদার আনখেলের গলাটা চিনতে পারলেন কর্নেল। মেয়রকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে কী যেন বলছেন তিনি। ছাতার ওপর বৃষ্টির একটানা ঝমঝম শব্দের মধ্যেই কর্নেল শুনতে পেলেন তাদের আলোচনা।

'অর্থাৎ?',—সাবাস্ জিজ্ঞাসা করল।

'অর্থাৎ কিছুই না'—কর্নেল উত্তর দিলেন। 'অন্ত্যেষ্টি মিছিল পুলিশ ব্যারাকের সামনে দিয়ে যেতে পারবে না।'

'ও হো, ভুলেই গিয়েছিলাম,'—সাবাস্ বলল। 'আমরা যে সামরিক শাসনে জরুরি অবস্থায় আছি এ কথাটা আমি কেবলই ভুলে যাই।'

'কিন্তু এ তো আর কোনও বিদ্রোহ নয়,'—বললেন কর্নেল। 'এ তো নেহাতই এক মৃত বাজনাদার।'

দিক পালটাল অন্ত্যেষ্টি মিছিল। গরিব পাড়ার মেয়েরা নীরবে তাকিয়ে তাকিয়ে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে কফিন নিয়ে তাদের যাওয়া দেখল। কিন্তু তার পরেই তারা রাস্তার মাঝে নেমে এসে প্রশংসা-কৃতজ্ঞতা-বিদায় জানিয়ে হাউ হাউ করে উঠল যেন তাদের ধারণা মরা লোকটা কফিনের মধ্যে শুয়ে তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে। কবরস্থানে কর্নেলের নিজেকে কেমন যেন অসুস্থ লাগল। কফিনবাহকদের যাওয়ার রাস্তা করে দিয়ে সাবাস্ তাঁকে যখন ঠেলে সরিয়ে এনে দেওয়ালের পাশে দাঁড় করাল, সে তার হাসিমুখটা তাঁর দিকে ফিরিয়ে দেখতে পেল কঠোর এক মুখের ছবি।

'ব্যাপার কী, দোস্ত?'—সাবাস্ জিজ্ঞেস করল।

কর্নেল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন,—'এ যে অক্টোবর।'

একই রাস্তা ধরে তারা ফিরে এল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। গভীর, ঘন নীল আকাশ। এখন আর বৃষ্টি পড়বে না,—কর্নেল ভাবলেন আর ভাবতে ভাবতেই একটু স্বস্তি বোধ করলেন। তবে এখনও তাঁর মনটা খারাপ হয়ে আছে। সাবাস্ তাঁর চিন্তায় বাধা দিল।

'ডাক্তার দেখাও।'

'আমি অসুস্থ নই'—কর্নেল বললেন। 'মুশকিল এটাই যে অক্টোবর এলেই আমার মনে হয় পেটের মধ্যে যেন কতগুলো জানোয়ার আছে।'

সাবাস্ বলল,—'আহ!' বাড়ির কাছে এসে সে বিদায় জানাল। বাড়িটা নতুন, দোতলা সমান উঁচু। জানালা-দরজার ফ্রেমগুলো পেটা-লোহায় তৈরি। কর্নেল বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। এই পোশাকি সাজটা খুলে ফেলতে পারলে তিনি যেন বেঁচে যান। এক মুহূর্ত পরেই কিন্তু আবার বেরিয়ে পড়লেন। মোড়ের দোকানটা থেকে এক কৌটো কফি আর মোরগটার জন্য আধ পাউন্ড গম কিনতে হবে। বৃহস্পতিবারটা দোলনায় শুয়ে কাটাতে পারলেই তাঁর ভালো লাগত। তবু কর্নেল মোরগটার যত্নআত্তি করলেন। কয়েকদিন ধরেই আকাশ পরিষ্কার হয়নি। এ সপ্তাহে তাঁর পেটের উদ্ভিদরা মঞ্জুরিত হয়ে উঠল। স্ত্রীর হাঁপানির টানের শব্দ শুনে কষ্ট পেতে পেতে ঘুম ছাড়াই কেটে গেল পর পর কয়েকটা রাত্রি। কিন্তু শুক্রবার বিকেলে অক্টোবর ঘোষণা করল সাময়িক যুদ্ধ বিরতি। আগুস্তিনের মতো দর্জির দোকানে কাজ করা ওর সহকর্মীরা যারা মোরগের লড়াইয়ে ভীষণভাবে মেতে থাকে, এই যুদ্ধবিরতির সুযোগে মোরগটাকে দেখতে এল। বেশ বাহাদুর মোরগ।

একা হবার পর কর্নেল শোবার ঘরে স্ত্রীর কাছে ফিরে এলেন। তিনি সেরে উঠেছেন। 'কী বলল ওরা?'—স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

'উৎসাহে ফুটছে',—কর্নেল জানালেন তাঁকে। 'আমাদেরটাকে নিয়ে বাজি ধরবে বলে সব্বাই তাদের খরচ বাঁচাচ্ছে।'

'অমন হতকুচ্ছিত একটা মোরগের মধ্যে ওরা যে কী দেখে জানি না',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। 'এটাকে দেখলেই মনে হয় উদ্ভট, আজব কিছু। পাগুলোর তুলনায় মাথাটা একেবারেই বেঢপ—ছোট্ট।'

'ওরা তো বলে সারা জেলার মধ্যেই ও-ই সবার সেরা',—কর্নেল মন্তব্য করলেন। 'অন্তত পঞ্চাশ পেসো ওর দাম হবে।'

ন' মাস আগে এক মোরগের লড়াইয়ের আসরে গোপন ইস্তাহার বিলি করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরেছে তাঁর ছেলে। এই মোরগটা তারই উত্তরাধিকার। এই যুক্তিতেই মোরগটাকে কাছে রাখবার জন্য তাঁরই জেদটাকে যে মানানো যাবে, এ বিষয়ে কর্নেল সুনিশ্চিত। 'এটা খুবই খরুচে'—কর্নেল গিন্নি বললেন। 'গমের দানা ফুরিয়ে যাবার পর নিজেদের মেটে খাইয়েই ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে'।

কাপড়চোপড় রাখার দেওয়াল আলমারিতে তাঁর সাদা এবং মোটা কাপড়ের ট্রাউজার্সটা খুঁজতে যাবার জন্যে কর্নেল অনেকক্ষণ সময় নিলেন।

'কয়েকটা মাসের তো মামলা',—তিনি বললেন। 'এটা তো আমরা জেনে গিয়েছি যে জানুয়ারিতেই মোরগের লড়াই হবে। তারপর এটাকে আরও চড়া দামে বেচে দেওয়া যাবে।'

ট্রাউজার্সগুলো ইস্ত্রি করা দরকার। কর্নেলের স্ত্রী উনুনের পাশে টান টান করে সেগুলোকে বিছিয়ে দিলেন। উনুনে দুটো ইস্ত্রি গরম হচ্ছে। 'বেরোবার অত তাড়া কেন?'—স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন।

'ডাক আসবে।'

'ও-হো! আজ যে শুক্কুরবার, সে কথাটা তো ভুলেই গিয়েছিলাম',—শোবার ঘরে ফিরে যেতে যেতে তাঁর শ্লেষাত্মক মন্তব্য। কর্নেল জামা পরছেন, ট্রাউজার্সটা এখনও পরেননি। তিনি জুতো জোড়ার দিকে তাকালেন।

'এই জুতোগুলো ফেলে দিলেই হয়',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। 'তোমার ওই পেটেন্ট চামড়ার জুতো জোড়া পরলেই তো পারো।

কর্নেলের খুব মন খারাপ লাগল। 'ওগুলোকে যেন অনাথ ভিখিরিদের জুতোর মতো দেখায়',—প্রতিবাদ করে বললেন তিনি। 'যখনই ওই জুতোজোড়া পায়ে দিই, মনে হয় যেন কোনও অনাথ আশ্রম থেকে পালিয়ে এসেছি।'

'আমরা তো আমাদের ছেলেরই অনাথ',—কর্নেল-গিন্নি বললেন।

এবারও স্ত্রী তাঁকে শেষটায় মত পালটাতে বাধ্য করলেন। লঞ্চের ভোঁ বেজে ওঠবার আগেই লঞ্চঘাটের জেটিতে পৌঁছোলেন কর্নেল। পেটেন্ট চামড়ার জুতো, বেল্ট ছাড়া সাদা ট্রাউজার্স, গলার কাছে তামার উঁচু বোতাম আটকানো কলার ছাড়া আলগা শার্ট। সিরিয়ার মোজেসের দোকানে দাঁড়িয়ে তিনি লঞ্চগুলোকে জেটিতে এসে ভিড়তে দেখলেন। নেমে পড়ল যাত্রীরা। এক টানা আটঘণ্টা ধরে বসে থেকে একেকজনের শরীরে আড় ধরে গেছে। সব সময়ই একই যাত্রীর দল, ফিরিওয়ালা, আর বড় শহরে যারা আগের সপ্তাহে কাজ করতে গিয়েছিল, এখন যথারীতি তারা ফিরে এসেছে।

ডাকের লঞ্চটা সবার শেষে। কাতর উৎকণ্ঠার সঙ্গে কর্নেল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। সেটা জেটিতে এসে ভিড়ল। ছাতের ওপর একটা বড় খুঁটির গায়ে বাঁধা আর একটা অয়েলক্লথ বিছিয়ে বাঁচানো চিঠিপত্রে ভরা ডাকের বস্তাটাও নজরে এল। পনেরো বছরের অপেক্ষা তাঁর সত্তাকে শাণিত করে তুলেছে। আর মোরগটা বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর উৎকণ্ঠা। যে মুহূর্তে পোস্টমাস্টার লঞ্চের ওপর গিয়ে ডাকের বস্তাটা খুলে নিয়ে কাঁধের ওপর ঝোলাল তখন থেকেই কর্নেল তাকে চোখে চোখে রাখলেন।

লঞ্চঘাটের সমান্তরাল রাস্তাটা দিয়েই কর্নেল তাকে অনুসরণ করলেন। রাস্তাটা একটা গোলকধাঁধার মতো। কতগুলো দোকান আর ঝুপড়ি রঙিন বেসাতি সাজিয়ে বসে আছে। যখনই তিনি এভাবে পোস্টমাস্টারের পেছনে ধাওয়া করেন তখনই কর্নেলকে অন্য এক ধরনের উৎকণ্ঠা এসে চেপে ধরে। অন্যরকম কিন্তু তেমনি বুকচাপা ভয় নয়, অন্য কিছু। ডাকঘরে খবরের কাগজের জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাক্তার।

'আমার স্ত্রী তোমায় জিজ্ঞেস করতে বলেছেন, আমাদের বাড়িতে তোমার মাথার ওপরে কি গরম জল ঢেলে দেওয়া হয়েছিল?'—কর্নেল প্রশ্ন করলেন।

ডাক্তার বয়সে তরুণ, মাথাটা চকচকে কালো চুলে ঢাকা। তার দাঁতের পাটি এতই নিখুঁত আর সুঠাম, যেন অবিশ্বাস্য কিছু বলে মনে হয়। হাঁপানি রোগীনীর শরীর কেমন আছে—সে জানতে চাইল। কর্নেল তাঁকে সব খুঁটিনাটি সমেত বিশদ একটা বিবরণ দিলেন বটে, কিন্তু সারাক্ষণ একবারও পোস্টমাস্টারের ওপর থেকে নজর সরাননি। পোস্টমাস্টার চিঠিগুলো বেছে বেছে ছোট ছোট খোপে রাখছে। তার দীর্ঘায়ত ও প্রলম্বিত নড়াচড়ার ভঙ্গি কর্নেলকে বেজায় অধৈর্য করে তুলল।

ডাক্তার তার খবরের কাগজের মোড়ক সমেত সব কাগজপত্র পেয়ে গেল। ওষুধের বিজ্ঞাপন আর বিবরণগুলো সে একপাশে সরিয়ে রাখল। তারপর তার ব্যক্তিগত চিঠিগুলোর ওপর একনজর চোখ বুলিয়ে নিল। এরই মধ্যে অন্য যারা এসেছিল তাদের ডাকও পোস্টমাস্টার বিলি করে দিয়েছে। বর্ণমালার যে অক্ষর দিয়ে তাঁর নাম শুরু, সেটা যে খোপটার গায়ে লেখা, তার ওপর কর্নেল নজর রেখেছিলেন।

নীল বর্ডার দেওয়া একটা হাওয়াই ডাকের চিঠি তাঁর স্নায়বিক অস্বস্তিটা আরও বাড়িয়ে তুলল।

খবরের কাগজের মোড়কেব মোহরটা ছিঁড়ে ফেলল ডাক্তার। প্রধান শিরোনামগুলোর ওপর সে যখন চোখ বোলাচ্ছে, কর্নেল ওই ছোট্ট খুপড়িটায় তাঁর নজর আটকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন পোস্টমাস্টার তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সে এদিকে এলই না। ডাক্তার খবরের কাগজ পড়া থামিয়ে একবার তাকাল কর্নেলের দিকে। তারপর টেলিগ্রাফের যন্ত্রটার কাছে বসে থাকা পোস্টমাস্টারের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর আবার কর্নেলের দিকে। 'আমরা যাচ্ছি',—বলে সে রওনা দেওয়ার উদ্যোগ নিল।

কাজ থেকে মাথা না তুলেই পোস্টমাস্টার জানিয়ে দেয়,—'কর্নেলের জন্য কিছু নেই'।

'আমি অবশ্য কিছুরই প্রত্যাশা করিনি',—মিথ্যের মোড়কে লজ্জা ঢেকে কর্নেল বললেন। একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো করে ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন,—'আমাকে একজনও লেখে না।'

নিঃশব্দেই তাঁরা ফিরে চললেন। ডাক্তার খবরের কাগজগুলোতেই মন বসিয়ে রেখেছে। আর কর্নেল তাঁর অভ্যেসমতো এমনভাবে হাঁটছেন যা দেখে মনে হয় কেউ বুঝি তার পকেটের খুচরোগুলো হারিয়ে ফেলে সন্তর্পণে চারপাশ দেখতে দেখতে ফিরছে। বিকেলটা ঝকঝকে উজ্জ্বল। প্লাজার বাদাম গাছগুলো তাদের শেষ পচা পাতাগুলো ঝরাচ্ছে। ডাক্তারখানার দরজায় এসে যখন তাঁরা পৌঁছোলেন তখন অন্ধকার ঘনাতে শুরু করেছে।

'কাগজে কী খবর আছে?'—কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন। ডাক্তার তাঁকে কয়েকটা খবরের কাগজ দিয়ে দিলেন।

'কেউ জানে না',—ডাক্তার বলল। 'সেন্সর যে-সব কথা লিখতে দেয় তার আড়ালে আসলে কী লেখা আছে, সেটা বোঝা একেবারেই দুঃসাধ্য।'

কর্নেল বড় বড় শিরোনামগুলো পড়লেন। সব আন্তর্জাতিক খবর। ওপরের দিকে রয়েছে চার কলাম জুড়ে সুয়েজ খাল সম্বন্ধে একটা প্রতিবেদন। সামনের পাতার প্রায় পুরোটাই অন্ত্যেষ্টির বিজ্ঞাপনে ভর্তি।

'নির্বাচনের কোনও আশাই নেই,'—কর্নেল বললেন।

'অত সরল সাজবেন না কর্নেল',—ডাক্তার বলল। 'কোনও অবতার এসে আমাদের বাঁচিয়ে দেবেন, একথা ভাবার মতো বয়স আর আমাদের নেই।'

কর্নেল খবরের কাগজগুলো ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ডাক্তার সে সব ফিরিয়ে নিতে নারাজ। 'ওগুলো আপনি বাড়ি নিয়ে যান',—ডাক্তার বলল। 'আজ রাতে পড়ে নেবেন, আমাকে কাল ফিরিয়ে দিলেই হবে।'

সাতটার একটু পরে মিনারের ঘণ্টার ধ্বনি বুঝিয়ে দিল আজকের সিনেমাটাকে সেন্সর কোন শ্রেণীতে ফেলেছে। ফাদার আনখেল এই ঘণ্টা বাজিয়েই সিনেমার নৈতিক চরিত্রটা বুঝিয়ে দেন। প্রতি মাসে ডাকে তাঁর কাছে সেন্সরের খতিয়ান আসে। কর্নেলের স্ত্রী বারোটা ঢং ঢং ধ্বনি শুনলেন।

'কারুরই দেখার যোগ্য নয়',—তিনি বললেন। 'প্রায় এক বছর হতে চলল, কোনও ছবিই আর কারও দেখার যোগ্য হচ্ছে না।'

মশারিটা ফেলে দিয়ে মৃদুস্বরে তিনি বললেন,—'জগৎটাই বদ।' কিন্তু কর্নেল কোনওরকম হুঁ-হাঁ করলেন না। শুয়ে পড়ার আগে মোরগটাকে নিয়ে এসে তিনি বেঁধে দিলেন খাটিয়ার পায়ার সঙ্গে। বাড়িটার দরজা জানালায় কুলুপ এঁটে দিয়ে শোবার ঘরে এসে তিনি যন্ত্র দিয়ে খানিকটা পোকামারা ওষুধ ছেটালেন। তারপর বাতিটা মেঝেয় রেখে টাঙিয়ে নিলেন তাঁর দোলনাটা। শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়া এবার শুরু হল।

কাগজগুলো দিন অনুযায়ী পর পর সাজিয়ে প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা অবধি বিজ্ঞাপনগুলো সমেত সব কিছুই পড়া হয়ে গেল। এগারোটায় সময় তুরির শব্দ হল। কারফিউ। কর্নেল আরও আধ ঘণ্টা পরে তাঁর পড়া শেষ করলেন। দুর্ভেদ্য আঁধার ভরা রাতে পেছনের বারান্দার দরজা খুলে দেওয়ালের গায়ে একবার পেচ্ছাপ করলেন। পেচ্ছাপ করার সময় মশারা তাঁকে হামলা করল। শোবার

ঘরে যখন তিনি ফিরলেন তখন তাঁর স্ত্রী জেগে উঠেছেন।

'প্রাক্তন সৈন্যদের কথা কিছু নেই?'—তিনি জিজ্ঞেস করলেন। 'না',—বললেন কর্নেল। দোলনাটায় উঠে পড়ার আগে তিনি বাতিটা নিভিয়ে দিলেন। 'আগে অন্তত ওবা নতুন কারা কারা পেনশন পেল, তাদের নাম ছাপত। কিন্তু পাঁচ বছর হয়ে গেল ওরা কোনও টুঁ শব্দ করছে না।'

মাঝরাতের পর বৃষ্টি নামল। কর্নেল কোনও মতে ঘুমিয়ে পড়তে পেরেছিলেন। কিন্তু পেটের নাড়িভুঁড়ির বিপদ সংকেতে পরক্ষণেই জেগে উঠে আবিষ্কার করলেন,—ছাতের কোনও একটা জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। কান অবধি একটা পশমের চাদর মুড়ি দিয়ে অন্ধকারেই তিনি ফুটোটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন। হিমজমাট ঘামের একটা ফোঁটা তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে গেল নিচের দিকে। তাঁর জ্বর এসে গেছে। মনে হল একটা সমকেন্দ্রিক জেলির পুকুরের মধ্যে তিনি পাক খেতে খেতে ভাসছেন। কে যেন কথা বলছে। কর্নেল তাঁর ছোট্ট বিপ্লবী দোলনা থেকে উত্তর দিলেন। 'কার সঙ্গে কথা বলছ?'—স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন। 'কর্নেল আউরোলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার শিবিরে যে ইংরেজটি বাঘের ছদ্মবেশ ধরে এসেছিল',—কর্নেল উত্তর দিলেন। জ্বরে পুড়তে পুড়তে তিনি দোলনায় পাশ ফিরলেন। 'সে ছিল,—মার্লবরোর ডিউক।'

ভোরবেলায় আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মাস্ অনুষ্ঠানের সূচনা নির্দেশক গির্জার ঘণ্টা দ্বিতীয়বার বাজতেই কর্নেল দোলনা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে নিজেকে এক জট পাকানো বাস্তবতায় দাঁড় করালেন যেটা মোরগের কোঁকর কো ডাকে কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর মাথাটা এখনও একইভাবে ঘুরছে। শরীরে বমি বমি ভাব। বাইরে বারান্দায় গিয়ে শীতকালের অস্ফুট সব ফিসফিসানি শুনতে শুনতে আর দুর্গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সোজা তিনি পায়খানার দিকে ছুটলেন। দস্তার ছাদ বসানো ছোট্ট কাঠের কামরাটার ভেতরে পায়খানার অ্যামোনিয়ার গন্ধে বদ্ধ হাওয়া ঝিম মেরে আছে। ঢাকাটা তুলতেই গর্তের মধ্যে থেকে মশা-মাছির একটা তিন কোণা মেঘ ছুটে বেরিয়ে এল।

মিথ্যেই ভয় করেছিলেন। পালিশ না-করা কাঠের পাটাতনের ওপর উবু হয়ে বসে একটা বেগ আর মোচড় ঠিকমতো কাজ না করার অস্বস্তি অনুভব করলেন কর্নেল। তাঁর পরিপাক প্রণালীতে বাহ্যের চাপের বদলে কেমন একটা ভোঁতা ব্যথা চাগিয়ে উঠল এখন। 'আর সন্দেহ নেই',—আস্তে আস্তে বিড়বিড় করলেন কর্নেল। 'প্রতিবারই অক্টোবর মাসে এইরকম হয়।' আবার তিনি আস্থা আর সরল প্রত্যাশার ভঙ্গিতে উবু হয়ে বসলেন যতক্ষণ না তাঁর নাড়িভুঁড়ির মধ্যে গজানো ব্যাঙের ছাতাগুলো শান্ত হয়। তারপর তিনি মোরগটার জন্য শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন।

'কাল রাতে তুমি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিলে',—স্ত্রী বললেন। সপ্তাহজোড়া হাঁপানির টান থেকে অব্যাহতি পেয়ে তিনি এর মধ্যেই ঘরের ভেতরটা গোছাতে লেগে গিয়েছেন। কর্নেল মনে করে দেখবার চেষ্টা করলেন।

'ঠিক জ্বর নয়',—কর্নেল মিথ্যে কথা বললেন। 'ওই মাকড়সার জালের স্বপ্নটাই আবার হানা দিচ্ছিল।'

সব সময়েই যেমন হয়, তাঁর স্ত্রী হাঁপানির টান থেকে বিস্তর স্নায়বিক শক্তি নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। সকাল শেষ হওয়ার আগেই পুরো বাড়িটা তিনি প্রায় ওলটপালট করে ফেললেন। সবকিছু সরিয়ে নিয়ে নতুনভাবে সাজালেন ঘরদোর। শুধু ঘড়িটা আর সেই তরুণীর ছবিটা রইল একই জায়গায়। কর্নেল-গিন্নি এতই রোগা আর চেহারাটা এমনই দড়কচা মারা যে কাপড়ের চপ্পল পায়ে গায়ের কালো পোশাকটার সবগুলো বোতাম এঁটে তাঁর হেঁটে বেড়ানো দেখে মনে হচ্ছে দেওয়ালের মধ্য দিয়েও যেন তিনি হাঁটতে পারেন। কিন্তু বেলা বারোটার আগেই তিনি যেন ফিরে পেলেন শরীরের খানিকটা সত্যিকার ওজন। বিছানায় তিনি যেন একটা ফাঁকা জমি হয়ে ছিলেন। এখন ফার্ন আর বেগনিয়ার ফুলের টবগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর সময় তাঁর উপস্থিতি যেন সারা বাড়িটায় উপচে পড়ছে। 'আগুস্তিনের শোকের বছরটা যদি শেষ হয়ে যেত আমি তা হলে গান ধরতাম',—ডেকচিটায় খুন্তি নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন। উষ্ণমণ্ডলের দেশের মাটিতে ফলে এমন সব তরিতরকারি শাকসবজি কুচি কুচি করে কেটে

ডেকচিতে সেদ্ধ হচ্ছে।

'তোমার যদি গান গাইতে ইচ্ছে করে,—বেশ তো, গাও না'—কর্নেল বললেন। 'প্লিহার পক্ষে গান বেশ ভালো।'

দুপুরের খাওয়ার পর ডাক্তার এল। কর্নেল আর তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরে বসে যখন কফি খাচ্ছেন তখন ডাক্তার রাস্তার দরজাটা ঠেলে চ্যাঁচাল,—'কই, সবাই মরে গিয়েছে না কি?'

তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য উঠে পড়লেন কর্নেল। 'তাই তো মনে হচ্ছে, ডাক্তার',—বসার ঘরে গিয়ে তিনি বললেন। 'আমি চিরকাল বলেছি তোমার ঘড়ি একেবারে চিল-শকুনের সঙ্গে সময় মিলিয়ে চলে।'

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে কর্নেলের স্ত্রী শোবার ঘরে চলে গেলেন। ডাক্তার কর্নেলের সঙ্গে বসার ঘরেই থেকে গেল। গরম সত্ত্বেও তার নিভাঁজ সুতির স্যুট থেকে টাটকা একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। গোছগাছ শেষ করে কর্নেল-গিন্নি ডাক্তারকে জানাবার পর ডাক্তার তিনটে কাগজ একটা খামের মধ্যে ভরে কর্নেলের হাতে তুলে দিল। শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে বলল—'খবরের কাগজগুলো কাল যা ছাপেনি, তা এই কাগজগুলোয় আছে।'

কর্নেলও সেটাই অনুমান করেছিলেন। দেশে কী ঘটছে না ঘটছে, এ তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। গোপনে বিলি করার জন্য মিমিওগ্রাফে ছাপা। দেশের অভ্যন্তরের সশস্ত্র প্রতিরোধের খবর তাতে উদঘাটিত। কর্নেলের নিজেকে কেমন যেন হেরে যাওয়া ঠেকল। দশ বছরের এই গোপন খবর এখনও তাঁকে শেখায়নি যে কোনও খবরই আগের মাসের খবরের চেয়ে চমকপ্রদ নয়। ডাক্তার আবার বসার ঘরে ফিরে এলে তাঁর পড়া শেষ হল।

'রোগিনীর তো আমার থেকেও ভালো স্বাস্থ্য',—ডাক্তার বলল। 'ও রকম হাঁপানির টান নিয়ে আমি একশো বছর বাঁচতে পারি।' কর্নেল তার দিকে কটমট করে তাকালেন। একটা কথাও না বলে তিনি তার হাতে ফিরিয়ে দিলেন খামটা। কিন্তু ডাক্তার সেটা কিছুতেই ফিরিয়ে নেবে না। 'অন্য কারও কাছে চালান করে দেবেন',—ফিসফিস করে সে বলল।

কর্নেল খামটা ট্রাউজার্সের পকেটে রেখে দিলেন। 'ডাক্তার, শিগগিরই একদিন আমি উঠব আর মরব, আর তোমাকেও আমার সঙ্গে নরকে নিয়ে যাব',—বলতে বলতে কর্নেল-গিন্নি শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ডাক্তার তার দাঁতের পরিচিত এনামেলটা ছিরকুটিয়ে সাড়া দিল নিঃশব্দে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সে ছোট্ট টেবিলটার কাছে বসল আর তার ব্যাগ থেকে নমুনা হিসেবে পাওয়া ওষুধের শিশিগুলো বের করল। কর্নেলের স্ত্রী রান্নাঘরে চলে গেলেন। 'বসুন, আমি কফিটা গরম করে আনি।'

'না, ধন্যবাদ',—ডাক্তার বলল। প্রেসক্রিপশনের প্যাড খুলে সে ওষুধের ঠিকঠাক ডোজগুলো লিখে দিল। 'আমাকে বিষ খাইয়ে মারার কোনও সুযোগ আপনাকে কিছুতেই দেব না।' কর্নেলের স্ত্রী রান্নাঘর থেকেই হেসে উঠলেন। লেখা শেষ করে ডাক্তার ব্যবস্থাপত্রটা জোরে জোরে পড়ে শোনাল। কারণ এটা সে ভালোই জানে যে তার হাতের লেখার পাঠোদ্ধার করার সাধ্যি কারও নেই। কর্নেল মন বসাবার চেষ্টা করলেন। রান্নাঘর থেকে ফিরে কর্নেলের স্ত্রী স্বামীর মুখে গত রাতের ক্লান্তির ছাপ আবিষ্কার করলেন।

'আজ সকালের দিকে ওর জ্বর হয়েছিল',—স্বামীর দিকে দেখিয়ে তিনি বললেন। 'গৃহযুদ্ধ নিয়ে পাক্কা দু'ঘণ্টা ধরে যতসব আবোল তাবোল বকছিল।'

কর্নেল চমকে উঠলেন। 'জ্বর? মোটেই নয়,'—সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি জোর দিয়ে বললেন,—'তা ছাড়া,—যেদিন বুঝব আমার অসুখ করেছে সেদিন আমি নিজেই নিজেকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলব।' খবরের কাগজগুলো আনতে তিনি চলে গেলেন শোবার ঘরে।

'প্রশংসাটার জন্য ধন্যবাদ',—ডাক্তারের মন্তব্য।

দুজনে প্লাজার দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। বাতাস শুকনো। গরমে রাস্তার পিচ গলতে শুরু করে দিয়েছে। ডাক্তার যখন বিদায় জানাল কর্নেল নিচু স্বরে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করলেন,—'ডাক্তার তোমার

কাছে আমার কত ধার?'

'আপাতত কিছুই নয়',—কর্নেলের কাঁধে আলতো করে একটা চাপড় মেরে ডাক্তার বলল। 'মোরগটা জিতুক, আমি আপনাকে মোটা বিল পাঠিয়ে দেব।'

আগুস্তিনের সহকর্মীদের ওই গোপন চিঠিটা দেবেন বলে কর্নেল দর্জির দোকানে ঢুকলেন। তাঁর সহযোদ্ধারা সবাই নিহত বা শহর থেকে বহিষ্কৃত হবার পর এটাই তাঁর একমাত্র আশ্রয়। এখন এমন এক চরিত্রে তাঁর রূপান্তর হয়েছে, শুক্রবারের ডাকঘরের বস্তার জন্য অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া যার আর কোনও কাজ নেই।

বিকেলবেলার গরম কর্নেলের স্ত্রীর স্নায়বিক শক্তিকে তাতিয়ে দিয়েছিল। একটা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোয় ভরা বাক্সের পাশে বারান্দার বেগনিয়া ফুলের ঝাড়ের মধ্যে তিনি বসেছিলেন। একেবারে শূন্য থেকে নতুন পোশাক বানিয়ে তোলার চিরন্তন অলৌকিকের সাধনায় তিনি আবার মেতে উঠেছেন। হাতার কাপড় কেটে জামার কলার, পিঠের কাপড় বা চৌকো ফালি থেকে হাতার কাফ্,—সব একেবারে নিখুঁত। তবে কাপড়ের ফালিগুলো নানা রঙের। একটা ঝিঁঝি পোকা বারান্দায় বসাল তার শিসের মৌরসি পাট্টা। সূর্য আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। বেগনিয়ার ঝাড়ের ওপর থেকে রোদ আস্তে আস্তে ঢলে পড়ল। বিষয়টা তিনি দেখতেই পেলেন না। সন্ধের সময় কর্নেল বাড়ি ফিরে আসার পরই তিনি মাথা তুললেন। তারপর দু'হাত দিয়ে ঘাড়টা চেপে ধরলেন, হাতের আঙুল ফাটালেন আর বললেন,—'মাথাটা একেবারে তক্তার মতো নিরেট হয়ে গিয়েছে।'

'ওটা তো চিরকালই ওই রকম',—কর্নেল বললেন। তারপরেই তাঁর চোখে পড়ল স্ত্রীর সারাটা শরীর নানা রঙের কাপড়ের টুকরোয় ঢাকা পড়ে গেছে। 'তোমাকে একটা ম্যাগপাই পাখির মতো দেখাচ্ছে।'

'তোমাকে সাজাতে গেলে কাউকে অন্তত আর্ধেক ম্যাগপাই তো হতেই হবে',—কর্নেল-গিন্নির সকৌতুক জবাব। কলার আর কাফ্ ছাড়া শার্টের বাকিটুকু একই রঙের। তিনটে ভিন্ন ভিন্ন রঙের কাপড়ে তৈরি করা একটা শার্ট তিনি কর্নেলকে খুলে দেখালেন। 'মেলার মধ্যে কেবল গায়ের কোটটা খুলে নিলেই চলবে।'

সন্ধে ছ'টার ঘণ্টা তার কথায় বাধা দিল। 'প্রভুর দেবদূত এসে মারিয়াকে জানাচ্ছেন',—সশব্দেই কর্নেল-গিন্নি প্রার্থনা শুরু করে দিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন। স্কুল ফেরত পাড়ার বাচ্চারা মোরগটাকে দেখতে এসেছিল। কর্নেল তাদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বললেন। তারপর তাঁর মনে পড়ে গেল পরের দিনের জন্য একদানাও গম নেই। গম কেনার জন্য স্ত্রীর কাছে হাত পাততে তিনি শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন।

'বড়জোর পঞ্চাশ',—স্ত্রী বললেন। পেসোগুলো একটা রুমালে গিঁট দিয়ে বেঁধে জাজিমের তলায় রাখা ছিল। আগুস্তিনের সেলাইকলটা বিক্রি করে যা পাওয়া গিয়েছিল, এ তারই অবশিষ্ট। ন' মাস ধরে প্রতিটি পেসো গুনে গেঁথে হিসেব করে তাঁরা খরচ করেছেন। তাঁদের নিজেদের চাহিদা আর মোরগের প্রয়োজন—এই দুইয়ের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে,—এখন শুধু কুড়ি পেসোর দুটো নোট আর একটা দশ সেন্টের মুদ্রা পড়ে আছে।

'এক পাউন্ড গম কিনে নিয়ো',—স্ত্রী বললেন। 'বাদ বাকি দিয়ে কালকের কফি আর চার আউন্স পনির।'

'আর দরজায় ঝোলাবার জন্য একটা সোনার হাতি',—জুড়ে দিলেন কর্নেল। 'শুধু গমের জন্যই বিয়াল্লিশ সেন্ট লাগবে।'

দুজনে এক ঝলক ভাবলেন। 'ওটা একটা জীব, অতএব মোরগটা অপেক্ষা করতে পারে',—কর্নেল-গিন্নি প্রথমে বললেন। কিন্তু তাঁর স্বামীর মুখের ভাব দেখে তাঁকে আরও ভাবতে হল। কর্নেল বিছানায় বসে আছেন কনুই দুটি হাঁটুর ওপর রেখে সেন্টগুলো নিয়ে ঠুনঠুন করে বাজাচ্ছেন। 'আমার জন্যে নয়',—একটু পরে তিনি বললেন। 'আমার ওপর যদি নির্ভর করত, তবে মোরগটাকে কেটেকুটে আজই সন্ধেয় স্ট্যু বানাতাম। পঞ্চাশ পেসো খরচ করে তৈরি করা বদহজম খুবই ভালো লাগত।' ঘাড়ের ওপর একটা

মশাকে চাপড় মেরে থেতলে দেবার জন্য তিনি একটু থামলেন। তারপর তাঁর চোখ দুটো ঘরের মধ্যে স্ত্রীর চলাফেরা অনুসরণ করল। 'বেচোবা বাচ্চাগুলোর অর্থ সঞ্চয় আমার মধ্যে সব সময় খচখচ করে',—কর্নেল বললেন।

তখন কর্নেল-গিন্নিও ভাবতে শুরু করলেন। তারপর পোকামারা ওষুধটা হাতে নিয়ে তিনি পুরো ঘুরে গেলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে কর্নেলের সবটাই কেমন অবাস্তব বলে মনে হল। যেন পরামর্শ চাইবার জন্য তাঁর স্ত্রী বাড়ির সব আত্মাগুলোকে ডাক পাঠাচ্ছেন। অবশেষে ওষুধের পুরিয়াটা তিনি ধর্ম-কর্মর নিয়মকানুনের ছবিওলা ছোট্ট বইটার ওপর রাখলেন। তারপর নিজের সিরাপ-রঙা চোখ কর্নেলের সিরাপ-রঙা চোখে রাখলেন।

'গমই কিনো',—তিনি বললেন 'আমাদের কেমন করে চলবে, তা ভগবানই জানেন'।

'এ হল—বহু প্রসবিনী রুটির অলৌকিক কাণ্ড',—পরের সপ্তাহে প্রতিবারই খাবার টেবিলে বসে কর্নেল এ কথাটা বলতে থাকলেন। রিফু, সেলাই, জোড়াতালি—এইসব বিস্ময়কর প্রতিভার বলেই তাঁর স্ত্রী যেন কোনও অর্থ ছাড়াই সংসার চালাবার চাবিকাঠিটা খুঁজে পেয়েছেন।

অক্টোবর তার সমঝোতাকে প্রলম্বিত করে তুলল। গুমোট ভাব চলে গিয়ে এখন ঝিমুনির আবহাওয়া শুরু হয়েছে। আমাটে সূর্যের তাপে তৃপ্ত হয়ে, নিজের চুলের জটিল পরিচর্যায় কর্নেলের স্ত্রী পর পর তিনটে বিকেল কাটালেন। একদিন বিকেলে একটা দাঁতপড়া চিরুনি দিয়ে কর্নেল-গিন্নি তাঁর লম্বা নীল বিনুনি থেকে জট ছাড়াতে ছাড়াতে কর্নেলকে জানালেন,—'মাস্ শুরু হয়ে গেছে।' পরদিন বিকেলে কোলে একটা সাদা কাপড় নিয়ে বারান্দায় বসে তাঁর স্ত্রী আরও একটা মিহি দাঁতের চিরুনি দিয়ে উকুন বাছলেন। হাঁপানির টান যখন বেড়েছিল তখন উকুনরাও মনের সুখে বংশবৃদ্ধি করেছে। সবশেষে ল্যাভেন্ডারের জলে তিনি চুল ধুলেন। তারপর চুল শুকোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। সবশেষে একটা জাল দিয়ে ঘাড়ের ওপর বিনুনি দুটোকে খোঁপার মতো গুটিয়ে রাখলেন। কর্নেল অপেক্ষাই করে চলেছেন। রাত্তিরে নিজের দোলনায় নিদ্রাহীন অবস্থায় শুয়ে কর্নেল মোরগটার ভবিতব্যের কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ভাবলেন। বুধবারে তাঁরা মোরগের ওজন নিলেন। ঠিকঠাকই আছে। সেইদিন বিকেলে আগুস্তিনের সহকর্মীরা মোরগের বিজয়ের ফলে উপার্জিত কাল্পনিক লাভের বখরা শুনতে শুনতে বিদায় নেবার পর কর্নেলেরও নিজেকে বেশ হালকা লাগল। স্ত্রী কর্নেলের চুল ছেঁটে দিলেন। 'একেবারে কুড়ি বছর বয়স কমিয়ে দিয়েছ',—হাত বুলিয়ে মাথাটার অবস্থা অনুভব করে কর্নেল বললেন। তাঁর স্ত্রীর মনে হল কর্নেল সত্যি কথাই বলছেন। 'শরীর ভালো থাকলে আমি মরা মানুষকেও বাঁচিয়ে তুলতে পারি',—কর্নেল-গিন্নি বললেন।

তবে তাঁর এই আস্থার মেয়াদ মাত্র কয়েকঘণ্টা। বাড়িতে আর বিক্রি করার মতো কিছুই নেই। শুধু ওই ঘড়িটা আর একটা ছবি বাকি আছে। বৃহস্পতিবার রাত্তিরে যখন সব উদ্ভাবনী বিদ্যের শেষ সীমায় এসে দুজনে পৌঁছেছেন, কর্নেল-গিন্নি তখন পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিজের শঙ্কাটা উচ্চারণ করলেন। 'কিছু ভেবো না',—কর্নেল তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। 'কাল ডাক আসবে।'

পরদিন ডাক্তারখানার সামনে দাঁড়িয়ে লঞ্চগুলো কখন আসে তার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। 'উড়োজাহাজ সত্যিই চমৎকার',—কর্নেল বললেন। তাঁর দৃষ্টি ডাকের ঝোলার উপর আটকানো। 'ওরা বলে,—এক রাত্তিরেই কেউ ইউরোপে চলে যেতে পারে।'

'তা ঠিক',—একটা সচিত্র সাময়িকপত্র দিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে করতে ডাক্তার বলল। কর্নেল দেখলেন লঞ্চগুলো ঘাটে ভেড়বার জন্য যারা অপেক্ষা করছে, তাদের মধ্যে পোস্টমাস্টারও দাঁড়িয়ে আছে। জেটিতে ভিড়লেই লঞ্চটায় সে লাফিয়ে উঠবে। পোস্টমাস্টারই সবার আগে লাফিয়ে লঞ্চে উঠল। কাপ্তেনের কাছ থেকে গালা দিয়ে সিলমোহর করা একটা খাম পেল। তারপর সে ছাতে উঠে গেল। দুটো তেলের ড্রামের মধ্যে ডাকের ঝোলাটা বাঁধা।

'তবে তার অবশ্য বিপদও আছে অনেক',—কর্নেল বললেন। পোস্টমাস্টারকে তিনি দৃষ্টি থেকে

হারিয়ে ফেলেছেন। তবে পরক্ষণেই ফিরিওয়ালাদের গাড়ির রঙিন শিশি বোতলগুলোর মধ্যে আবার তাকে খুঁজে পেলেন। 'মানব সমাজ কোনও দাম না দিয়ে এগোতে পারে না।'

'এমনকি এ অবস্থাতেও হাওয়াই জাহাজগুলো একটা লঞ্চের চেয়ে বেশি নিরাপদ',—ডাক্তার বলল। 'কুড়ি হাজার ফিট ওপরে ভাসার সময় আপনি তো আবহাওয়াকেও ডিঙিয়ে চলছেন।'

'কুড়ি হাজার ফিট',—কর্নেল কেমন হকচকিয়ে গিয়ে কথাটা ফিরে আওড়ালেন। ওই সংখ্যাটার মানে যে ঠিক কী, তা তার আন্দাজে আসেনি।

ডাক্তার বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। স্থির না হওয়া পর্যন্ত দু' হাত দিয়ে পত্রিকাটা সে বিছিয়ে ধরে বলে,— 'একেই বলে নিখুঁত স্থিরতা'।

কিন্তু কর্নেল তখন পোস্টমাস্টারের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিতে নজর বুলিয়ে চলেছেন। কর্নেল দেখলেন, একটা ফেনা ওঠা গোলাপি পানীয় ভর্তি গেলাস পোস্টমাস্টারের বাঁ হাতে ধরা রয়েছে আর ডান হাতে সে ধরে আছে ডাকের বস্তা। 'তা ছাড়া, সমুদ্রে কিছু জাহাজ নোঙর ফেলে রাতের বিমানের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখে',—ডাক্তার বলে চলল। 'অত সতর্কতার জন্যেই লঞ্চের চেয়ে হাওয়াই জাহাজ অনেক নিরাপদ।'

কর্নেল তার দিকে তাকালেন। 'স্বভাবতই',—তিনি বললেন 'নিশ্চয়ই একটা গালচের মতো।'

পোস্টমাস্টার সোজা তাদের দিকেই এগিয়ে এল। কর্নেল এক পা পেছিয়ে দাঁড়ালেন। কোনও এক অপ্রতিরোধ্য উৎকণ্ঠা নিয়ে সিলমোহর করা খামের গায়ে কার নাম লেখা আছে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন। পোস্টমাস্টার তার ঝোলা খুলল। ডাক্তারকে তার খবরের কাগজের মোড়কটা দিয়ে দিল। তারপর সে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের বড় খামটা ছিঁড়ে খুলল। সংখ্যা ঠিক আছে কিনা গুনে দেখল। চিঠির নাম-ঠিকানাগুলো পড়ল। ডাক্তার তার খবরের কাগজ খুলল। 'সুয়েজ নিয়ে ঝামেলাটা এখনও চলেছে',—প্রধান শিরোনামটা পড়তে পড়তে সে বলল। 'পশ্চিম এবার পিছু হটছে।'

কর্নেল শিরোনামগুলো পড়েননি। তিনি পেটের মোচড়টা সামলাতে চেষ্টা করছেন। 'যেদিন থেকে সেন্সরশিপ শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই কাগজগুলো কেবল ইউরোপের কথাই শোনাচ্ছে',—তিনি বললেন। 'খুব ভালো হয় যদি ইউরোপের লোকেরা এখানে চলে আসে আর আমরা সবাই চলে যাই ইউরোপে। তাতে সকলেই জানতে পারে তাদের নিজের দেশে কী হচ্ছে না হচ্ছে।'

'ইউরোপের লোকের কাছে দক্ষিণ আমেরিকা এমন একটা লোক যার গোঁফ, গিটার আর বন্দুক সব আছে',—খবরের কাগজের আড়াল থেকে হেসে ডাক্তার বলল। 'আসলে ওরা সমস্যাটাই বোঝে না।'

পোস্টমাস্টার তার ডাক বিলি করে দিল। তারপর বাদবাকি সবকিছু ঝোলায় ঢুকিয়ে আবার বন্ধ করে দিল ঝোলার মুখ। ডাক্তার দুটো ব্যক্তিগত চিঠিতে চোখ বোলাবার উদ্যোগ নিল। কিন্তু খামের মুখ ছেঁড়বার আগে সে একবার কর্নেলের দিকে তাকাল। তারপর পোস্টমাস্টারের দিকে তাকাল। 'কর্নেলের জন্য কিছু নেই?'

কর্নেল আতঙ্কে স্তম্ভিত। পোস্টমাস্টার তার কাঁধে ঝোলাটা চাপিয়ে পাটাতন থেকে নেমে ঘাড় না ফিরিয়েই বলল,—'কর্নেলকে একজনও লেখে না।'

অভ্যেস মতো কর্নেল সরাসরি বাড়ি ফিরলেন না। দর্জির দোকানে আগুস্তিনের সহকর্মীরা খবরের কাগজগুলোর পাতা ওলটাল। তিনি বসে বসে ততক্ষণ এক পেয়ালা কফি খেলেন। নিজেকে কী রকম প্রবঞ্চিত লাগছে। পরের শুক্রবার অবধি এখানেই থেকে যেতে পারলে ভালো হয়। তাহলে আর খালি হাতে আজ রাতে স্ত্রীর মুখোমুখি হতে হয় না। কিন্তু দর্জির দোকান বন্ধ হয়ে গেলে তাঁকে বাস্তবের মুখোমুখি হতেই হল।

বাড়িতে স্ত্রী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। 'কিছু নেই?'—তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'না',—কর্নেল সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।

পরের শুক্রবার আবার তিনি গেলেন লঞ্চঘাটায়। আর, প্রতিটি শুক্রবারের মতোই বাড়ি ফিরে এলেন কাঙ্ক্ষিত-প্রার্থিত চিঠিটা ছাড়াই। 'অনেক অপেক্ষা করেছি আমরা,'—সেই রাতে স্ত্রী তাঁকে বললেন।

'পনেরো বছর ধরে একটা চিঠির জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে থাকতে হলে ষাঁড়ের মতো ধৈর্য লাগে,—তোমার যেমন আছে।' কর্নেল খববের কাগজগুলো পড়ার জন্য দোলনায় শুয়ে পড়লেন। 'আমাদের পালা আসা অবধি তো সবুর করতে হবে',—তিনি বললেন। 'আমাদের নম্বর ১৮৩৩। আমরা যেদিন থেকে অপেক্ষা করছি তদ্দিনেও নম্বরটা দু-দুবার লটারিতে এসে গিয়েছে',—তাঁর স্ত্রী উত্তর দিলেন।

কর্নেল যথারীতি প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা অবধি বিজ্ঞাপনসমেত পুরো কাগজটা পড়লেন। কিন্তু একবারও তিনি মন বসাতে পারলেন না। পড়তে পড়তে তিনি পেনশনের কথা ভাবলেন। উনিশ বছর আগে আইনসভায় আইনটা পাশ হওয়ার পর নিজের দাবিটা প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর আট বছর লেগেছিল। তারপর যুদ্ধ ফেরত সৈন্যদের খাতায় তাঁর নামটা ওঠাতে আরও ছ' বছর লেগে যায়। কর্নেলকে লেখা সেটাই শেষ চিঠি।

কারফিউর তুরি বাজলে তিনি পড়া শেষ করলেন। বাতি নিভিয়ে দিয়ে টের পেলেন তাঁর স্ত্রী তখনও জেগে। 'তোমার কাছে সেই কাগজ থেকে কাটা খবরটাও এখনও আছে তো?' কর্নেল-গিন্নি একটু ভাবলেন। 'হ্যাঁ। সেটা নিশ্চয়ই অন্য সব কাগজের মধ্যেই আছে।'

কর্নেল-গিন্নি মশারি থেকে বেরিয়ে এসে কাপড় রাখারে খুপড়ি থেকে একটা কাঠেব বাক্স টেনে নিয়ে তার থেকে একটা রবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা পর পর তারিখ অনুযায়ী সাজানো এক তাড়া চিঠি বের করলেন। বিজ্ঞাপনটা খুঁজে পাওয়া গেল। আইনজীবীদের এক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন। যুদ্ধ ফেরত সৈন্যদের পেনশন তাড়াতাড়ি জুটিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া একটি বিজ্ঞাপন।

'তোমাকে উকিল পাল্টাবার কথা বলে যত সময় নষ্ট করেছি, ওই সময়টা অন্য কাজে খরচ করলে ভালো করতাম',—খবরের কাগজ থেকে কাটা বিজ্ঞাপনটা স্বামীর হাতে তুলে দিতে দিতে তিনি বললেন। '(রেড়্) ইন্ডিয়ানরে যেমন করে ওরা তাকে তুলে রাখে, তেমনিভাবে আমাদেরও একপাশে ঠেলে রেখেছে। এতে আমাদের কোনো লাভ হচ্ছে না।'

দু'বছর আগেকার তারিখ দেওয়া বিজ্ঞাপনটা কর্নেল পড়লেন। দরজার পেছনে টাঙানো তাঁর জ্যাকেটের পকেটে সেটাকে ঢুকিয়ে রাখলেন তিনি। 'সমস্যা হ'ল উকিল পাল্টানো মানেই খরচ।'

'মোটেই না',—তাঁর স্ত্রী মনস্থির করে ফেলেন। 'তুমি ওদের লিখে দাও যে পেনশনটা পাবার পর তারা যেন তাদের দালালি কেটে নেয়। শুধু তাহলেই ওরা মামলাটা হাতে নেবার গরজ দেখাবে।'

সুতরাং শনিবার বিকেলে কর্নেল বেরোলেন তাঁর উকিলের সঙ্গে দেখা করতে। উকিল একটা দোলনায় অলসভাবে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। সে এক বিশাল দেহ নিগ্রো। তার ওপরের পাটিতে এখন শুধু দু'টো শ্বদন্ত আছে। উকিল একজোড়া কাঠের খড়ম পায়ে গলিয়ে নিল। তারপর খুলে দিল তার দপ্তরের জানালা। একটা ধুলি ধূসর পিয়ানো জানালার তলায় পড়ে আছে। তার খোপে খোপে ঠাসা যত রাজ্যের কাগজের তাড়া। সরকারি গেজেটের কাটা টুকরো পুরনো হিসেবের খাতায় আঠা দিয়ে লাগানো। আর হিসেবপত্রের একরাশ কানুননামা। রীডবিহীন পিয়ানোটা তার ডেস্ক হিসেবেও আরেক দফা খাটে। উকিল একটা আরামকেদারায় বসল। দেখা করার কারণটা প্রকাশ করার আগে কর্নেল তাঁর অস্বস্তি প্রকাশ করলেন।

'আগেই তো আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম,—এ নেহাত কয়েকদিনের মামলা নয়,'—কর্নেল থামলে উকিল মন্তব্য করে। সে গরমে হাঁসফাঁস করছিল। চেয়ারটা পেছনে হেলিয়ে একটা বিজ্ঞাপনের প্যাম্ফলেট দিয়ে সে নিজেকে হাওয়া করতে লাগল।

'আমার শাগরেদেরা প্রায়ই চিঠি লেখে, অধৈর্য হতে বারণ করে। পনেরো বছর ধরেই তো এই অবস্থা চলেছে',—কর্নেল উত্তর দিলেন। 'এ যে দেখছি একটা মোরগকে খাসি করার গল্প।' উকিল সরকারি দপ্তরের কাজকর্মের একটা নিখুঁত বিবরণ দিল। তার ভারি নিতম্বের পক্ষে চেয়ারটা বড্ড ছোট। 'পনেরো বছর আগে ব্যাপারটা সহজ ছিল। শহরের প্রবীণদের সংগঠন ছিল। তাতে ছিল দু'দলেরই লোক।' তাঁর ফুসফুস গুমোট হাওয়ায় ভরে গিয়েছে। এমনভাবে সে কথাটা বলল যেন এটা তারই উদ্ভাবন,—'জানেন তো, সংখ্যাতেই শক্তি।'

'এক্ষেত্রে তা ছিল না,'—কর্নেল এই প্রথম তাঁর নিঃসঙ্গতাকে অনুভব করতে পারলেন। 'আমার সব কমরেডই চিঠির জন্য অপেক্ষা করতে করতে মারা গেছে।'

উকিলের মুখের অভিব্যক্তি তাতে পাল্টাল না। 'আইনটাই পাশ হল দেরি করে',—সে বলল। 'সকলের তো আর আপনার মতো কুড়ি বছর বয়সে কর্নেল হবার সৌভাগ্য হয় না। তা ছাড়া কোনো বিশেষ অনুদানের কথা আইনে না থাকায় সরকারকে বাজেটে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়েছে।'

চিরকালই সেই এক পুরোনো কাশুন্দি। প্রতিবারই তার কথা শুনতে শুনতে কর্নেল একটা চাপা বিরক্তি অনুভব করছেন। 'এ তো আর কোনো দান নয়,'—তিনি বললেন। 'আমাদের কোনো দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাতে আমি বলছি না। প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য আমরা ভেঙেছি আমাদের শিরদাঁড়া।'

উকিল দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ল। 'এটাই তো জগতের রীতি',—সে বলল। 'মানুষের অকৃতজ্ঞতার কোনো সীমা নেই।'

কর্নেল নিজেও এ গল্পটা জানেন। নিরলান্দিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পরদিন থেকেই, যখন সরকার দু'শোজন বিপ্লবী অফিসারকে রাহা খরচ আর আনুষঙ্গিক ভাতা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তখন থেকেই এই গল্পটা তিনি শুনতে শুরু করেছিলেন। নিরলান্দিয়ার বিশাল রেশম-কার্পাস গাছের তলায় বিপ্লবীদের একটা বাহিনী, যার বেশিরভাগই ছিল সদ্য হাইস্কুল পাশ করা তরুণ, ছাউনি ফেলেছিল। তিন মাস ধরে তারা অপেক্ষা করেছিল। তারপর তারা সবাই যে যার নিজের মতো বাড়ি ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। প্রায় ষাট বছর হয়ে গেল। কর্নেল কিন্তু এখনও অপেক্ষাই করে আছেন।

এসব স্মৃতিচারণে খানিকটা উত্তেজিত হয়ে তিনি এক ধরনের তূরীয় ভাব বোধ করলেন। উরুর ওপর, যে উরু কেবল স্নায়ু দিয়ে সেলাই করা হাড়গোড় ছাড়া আর কিছু নয়, ডান হাত রেখে তিনি মৃদুস্বরে বললেন,—'হুম! আমি একটা কাজ করব বলে ঠিক করেছি।'

উকিল অপেক্ষা করতে লাগল। 'যেমন?'

শান্তস্বরে কর্নেল বললেন,—'উকিল পালটাব।'

তিনটে ছানা পিছনে নিয়ে একটা হাঁস দপ্তরে ঢুকল। তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে উঠে বসল উকিল। হাঁসগুলোকে তাড়িয়ে দিতে দিতে সে বলল,—'সে আপনি যা ভালো বুঝবেন, তাই করবেন। আমি যদি অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা করতে পারতাম, তাহলে আমাকে আর এই খোঁয়াড়টায় পচে মরতে হত না।' বারান্দার দরজায় একটা কাঠের বেড়া বসিয়ে দিয়ে সে চেয়ারে ফিরে এল।

'আমার ছেলেটা সারাজীবন খেটেই গেল',—কর্নেল বললেন। 'আমার বাড়িটা বাঁধা দেওয়া আছে। ওই পেনশনের আইনটা উকিলদেরই সারাজীবনের পেনশন হয়ে উঠেছে।'

'আমার জন্যে নয়',—উকিল প্রতিবাদ জানাল।

'শেষ কপর্দকটা অবধি মামলার খরচ মেটাতে ফুরিয়ে গেছে।' যেন তিনি কোনও অন্যায্য কথা বলেছেন ভেবে কর্নেল দুঃখ পেলেন। 'আমি তো সে কথাই বলতে চাই',—নিজেকে শোধরালেন কর্নেল। জামার হাতা দিয়ে তিনি কপালের ঘাম মুছলেন। 'এই গরমে মাথার সব স্ক্রুতেই জং ধরে যায়।'

পরক্ষণেই উকিল ওকালতনামাটার খোঁজে তছনছ করে ফেলল সমস্ত দপ্তরটা। খুদে ঘরটার ঠিক মাঝখানে সূর্যের আলো এসে পড়ল। পালিশ না-করা কতগুলো তক্তা দিয়ে ঘরটা বানানো। সব জায়গায় সব কোণায় ব্যর্থভাবে খোঁজবার পর উকিল হামাগুড়ি দিতে লাগল। সে ততক্ষণে হাঁসফাঁস করছে। তারপর পিয়ানোটার তলা থেকে এক বান্ডিল কাগজ তুলে নিল। 'এই যে পেয়েছি।' একটা মোহর লাগানো কাগজ সে তুলে দিল কর্নেলের হাতে। 'আমার মুহুরিদের লিখে দিতে হবে যাতে বাকি অনুলিপিগুলোও তারা নষ্ট করে ফেলে,'—সে শেষ কথা জানাল। কর্নেল ধুলো ঝেড়ে কাগজটা শার্টের পকেটে রেখে দিলেন। 'আপনি নিজের হাতেই ওটা ছিঁড়ে ফেলুন',—উকিল বলল।

'না',—কর্নেল উত্তর দিলেন। 'এ হল কুড়ি বছরের স্মৃতি।' উকিল যাতে আরও খোঁজে তার জন্য তিনি অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে তা করল না। গায়ের ঘাম মুছে ফেলতে সে দোলনায় চলে গেল।

তপ্ত হাওয়ার ভেতর দিয়ে সেখান থেকে সে কর্নেলের দিকে তাকাল।

'আমার তো দলিলগুলোও চাই',--কর্নেল বললেন। 'আবেদনটার প্রমাণ পত্র।' উকিল দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ল।

'কিন্তু এখন যে তা অসম্ভব, কর্নেল।'

আতঙ্কে-শঙ্কায় ডুবে গেলেন কর্নেল। মাকোন্দো জেলার বিপ্লবী তহবিলের খাজাঞ্চি হিসেবে তিনি গৃহযুদ্ধের সব আর্থিক সম্পদ দুটো তোরঙ্গে ভর্তি করে একটা খচ্চরের পিঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে ছ'দিন মেয়াদি এক কঠিন যাত্রায় বেরিয়েছিলেন। নিরলান্দিয়ার ছাউনিতে খচ্চরটাকে টানতে টানতে সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার আধঘণ্টা আগে পৌঁছেছিলেন তিনি। খিদেয় খচ্চরটা মরেই গিয়েছিল। আটলান্টিক উপকূলের বিপ্লবী বাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তহবিলের জন্য রসিদ দিয়েছিলেন। তারপর বিপ্লবীদের যাবতীয় বস্তুর তালিকায় ওই তোরঙ্গ দুটোকেও ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। 'ওই দলিলগুলোর মূল্য যে অকল্পনীয়',—বললেন কর্নেল। 'তাতে কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার নিজের হাতে লেখা একটা রশিদ ছিল।'

'তা মানি',—উকিল বলল। 'কিন্তু ও সব দলিল তো অ্যাদ্দিনে লক্ষ-লক্ষ হাত ঘুরে, হাজার-হাজার দপ্তরে বেড়িয়ে ভগবান জানেন, এখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কোন দপ্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।'

'ওরকম দলিল কোনও কর্মচারীর নজর এড়াতে পারে না',—কর্নেল বললেন।

'কিন্তু গত পনেরো বছরে আমলারাই তো কতবার বদল হল',—উকিল বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে। 'একবার ভেবে দেখুন, মাঝখানে এসেছেন-গেছেন সাত-সাতজন রাষ্ট্রপতি। আর প্রত্যেক মন্ত্রী অন্তত একশোবার করে কর্মচারীদের পালটিয়েছেন।'

'কিন্তু দলিলগুলো তো আর কেউ বাড়ি নিয়ে যায়নি',—কর্নেল বললেন। 'প্রত্যেক নতুন আমলা নিশ্চয়ই নথিপত্রের মধ্যে সেগুলো পেয়েছে।'

উকিল এবার ধৈর্য হারাল। 'তা ছাড়া, ওসব কাগজ যদি এখন একবার মন্ত্রক থেকে বের করে আনা যায়, তাতে আবার একটা নতুন ক্রমিক নম্বর বসানো হবে।'

'তাতে কিছুই এসে যায় না',—কর্নেল বললেন।

'তা হলে সে তো অনেক শতাব্দী লেগে যাবে',—উকিল বলল।

'তাতে কিছু এসে যায় না। বড় কিছুর জন্য যদি কেউ অপেক্ষা করতে পারে তবে ছোটখাটো জিনিসের জন্যেও অপেক্ষা করা যায়।'

রুলটানা কাগজের একটা প্যাড, দোয়াত আর ব্লটিং কাগজ নিয়ে তিনি বসার ঘরের ছোট্ট টেবিলটায় চলে এলেন। শোবার ঘরের দরজাটা তিনি খোলাই রেখেছেন যদি স্ত্রীকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হয়। তাঁর স্ত্রী তখন জপের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে জপ করছিলেন।

'আজ কত তারিখ?'

'সাতাশে অক্টোবর।'

খুব ধরে ধরে, গোটা গোটা হরফে তিনি লিখলেন। কলম ধরা হাতটা ব্লটিং কাগজের ওপর বসানো। শিরদাঁড়া সোজা যাতে প্রশ্বাসের সুবিধে হয়,—ঠিক যেমনটা তাঁকে স্কুলে শেখানো হয়েছিল। বসার ঘরটা বদ্ধ হাওয়ায় অসহ্য গুমোট হয়ে উঠেছে। এক ফোঁটা ঘাম চিঠির ওপর পড়ল। কর্নেল ব্লটিং কাগজটা দিয়ে সেটা শুষে নিলেন। তারপর তিনি যেসব হরফ ঝাপসা হয়ে গেছে সেগুলো মুছবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মাঝখান থেকে সেগুলো কাগজে লেপ্টে গেল। তিনি মোটেই ধৈর্য হারালেন না। পাশে একটা তারা এঁকে মার্জিনে লিখলেন,—'অর্জিত অধিকার'। তারপর তিনি পুরো অনুচ্ছেদটাই পড়লেন।

'তালিকায় কবে আমার নাম উঠেছিল?'

তাঁর স্ত্রী ভেবে দেখার জন্য জপ থামালেন না। 'বারোই অগস্ট, ১৯৪৯।'

পরক্ষণেই বৃষ্টি শুরু হল। কর্নেল একটা গোটা পাতা আঁকিবুঁকি কেটে ভর্তি করলেন, ঠিক যে সব

আঁকিবুঁকি মানাউরের পাবলিক স্কুলে তিনি লিখেছিলেন। তারপরে তিনি দ্বিতীয় একটা পাতার একেবারে মাঝখান অবধি লিখে নিজের নাম সই করলেন। স্ত্রীকে চিঠিটা পড়ে শোনালেন। তাঁর স্ত্রী ঘাড় নেড়ে প্রতিটি বাক্যই মঞ্জুর করলেন। পড়া শেষ করে কর্নেল খামটা সিলমোহর করে বাতিটা নিভিয়ে দিলেন।

'কাউকে এটা টাইপ করে দিতে বলতে পার।'

'না',—কর্নেল উত্তর দিলেন। 'লোকের কাছে ঘুরে ঘুরে, সুবিধে নিতে নিতে একেবারে হন্যে হয়ে গিয়েছি।'

তালপাতার ছাউনির ওপর বৃষ্টি পড়ছে। আধঘণ্টা ধরে তিনি সে শব্দ শুনলেন। শহরটা প্লাবনে ডুবে গেল। কারফিউয়ের তোপ যখন বাজল বাড়ির কোথাও তখন একটা ফুটো দিয়ে শুরু হল জল পড়া।

'অনেকদিন আগেই এ কাজটা করা উচিত ছিল',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। 'নিজের কাজ নিজে করাই সব সময় ভালো।'

'এখনও বেশি দেরি হয়নি',—ফুটোটার দিকে মনোযোগ দিতে দিতে বললেন কর্নেল। 'হয়তো বাড়িটার কিস্তি বাকি পড়লেই ব্যাপারটা চুকে যাবে।'

'সে তো দু'বছর',—কর্নেল-গিন্নি বললেন।

বসার ঘরে কোথায় ফুটো হয়েছে দেখার জন্যে বাতিটা জ্বালালেন কর্নেল। মোরগের জলের পাত্রটা রাখলেন ফুটোটার তলায়। তারপর শোবার ঘরে ফিরে এলেন আর তাঁর পেছন পেছন ফাঁকা পাত্রটার ভেতর জল পড়ার ধাতব আওয়াজ ধাওয়া করে এল। 'সুদটা বাঁচাবার জন্যে ওরা হয়তো জানুয়ারির আগেই সব চুকিয়ে বুকিয়ে দিতে চাইবে,'—তিনি বললেন আর বলে নিজেকে আশ্বস্ত করলেন—'তত দিনে আগুস্তিনের মৃত্যুরও এক বছর হয়ে যাবে আর আমরাও আবার সিনেমা দেখতে যেতে পারব।'

তাঁর স্ত্রী দম নেবার ফাঁকে হেসে উঠলেন। 'আমার আর কার্টুনগুলোর কথা মনেও পড়ে না',—তিনি বললেন। কর্নেল মশারির ফাঁক দিয়ে তাঁর দিকে তাকাবার চেষ্টা করলেন।

'শেষ কবে তুমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে?'

'১৯৩১-এ',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। 'ওরা *মৃত মানুষের অন্তিম অভিপ্রায়* বলে একটা সিনেমা দেখাচ্ছিল।'

'মারামারি ছিল তাতে?'

'সে আমরা জানতেও পারিনি। ভূত এসে যেই নায়িকার গলার হার ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে ঠিক তখনই ঝড় নেমে এল।' বৃষ্টির শব্দ তাঁদের ঘুম পাড়িয়ে দিল। কর্নেল তাঁর নাড়িভুঁড়ির মধ্যে সামান্য অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে ভয় নেই। আরও একটা অক্টোবর, প্রায় টিকে গিয়েছেন। একটা পশমি চাদর গায়ে জড়িয়ে এক ঝলক শুধু তাঁর স্ত্রীর ঘরঘর করে নিঃশ্বাস নেবার শব্দ শুনলেন, যেন অনেক দূর থেকে সেই শব্দটা আসছে, তারপর আরেকটা স্বপ্নের মধ্যে ভেসে গেলেন। তারপরে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে তিনি কথা বললেন।

কর্নেল-গিন্নি জেগে উঠলেন। 'কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি?'

'কারও সঙ্গে নয়,'—কর্নেল বললেন। 'ভাবছিলাম যে মাকোন্দোর সেই সভায় কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে আত্মসমর্পণ করতে বারণ করে আমরা ঠিক কথাই বলেছিলাম। সেই থেকেই সব ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।'

সারা সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি পড়ল। দোসরা নভেম্বর কর্নেলের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী আগুস্তিনের কবরে ফুল নিয়ে গেলেন। কবরস্থান থেকে ফিরেই তাঁর আরেকবার হাঁপানির টান উঠল। একটা কঠিন সপ্তাহ গেল। অক্টোবরের চারটে সপ্তাহের চেয়েও কঠিন আর তখনই কর্নেল ভেবেছিলেন এ যাত্রায় আর রেহাই নেই। ডাক্তার রোগিনীকে দেখতে এসে ঘর থেকে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বেরিয়ে এল,—'ওরকম হাঁপানি নিয়ে আমি সারা শহরটাকেই গোর দিয়ে দিতে পারতাম!' কিন্তু সে কর্নেলের সঙ্গে আড়ালে একা কথা বলে আর একটা বিশেষ পথ্য ব্যবস্থাপত্রে লিখে দিল।

কর্নেলের শরীরও তেড়েফুঁড়ে আবার খারাপ করল। তিনি অনেক ঘণ্টা পায়খানায় কাটালেন। বেগ

আছে। সারা শরীর হিমজমাট ঘামে ভরে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন পচে যাচ্ছেন আর তাঁর অন্ত্রের মধ্যে লতাপাতাগুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে। 'শীতকালে',—অসীম ধৈর্যের সঙ্গে কথাটা তিনি বার বার আওড়ালেন। 'বৃষ্টি একবার থামলেই সবকিছু বদলে যাবে।' আর তিনি কথাটা সত্যি সত্যি বিশ্বাসও করলেন। নিশ্চিত বুঝলেন চিঠিটা যখন এসে পৌঁছবে তখনও তিনি বেঁচে থাকবেন।

এবার তাঁকেই সংসারের অর্থনীতিকে জোড়াতালি লাগাতে হল। পাড়ার দোকানে ধার চাইবার আগে কতবার তাঁকে দাঁতে দাঁত চাপতে হল। 'শুধু আসছে সপ্তাহ অবধি',—তিনি বলতেন। কথাটা সত্যি কিনা সে সম্বন্ধে নিজেরই বিশ্বাস থাকত না। 'গত শুক্রবারেই অল্প কিছু আসার কথা ছিল।' হাঁপানির টান কমে গেলে স্ত্রী তাঁর দিকে তাকিয়ে যেন বিভীষিকা দেখলেন। 'তুমি তো চামড়া আর হাড় সর্বস্ব',—কর্নেল-গিন্নি বললেন।

'নিজেকে বেচতে পারার জন্যে শরীরের খুবই যত্ন নিচ্ছি',—কর্নেল বললেন। 'একটা ক্ল্যারিওনেট কারখানা এর মধ্যেই আমায় চাকরি দিয়েছে।'

তবে, বাস্তবে চিঠির আশাটি যেন তাঁকে আর বাঁচাতে পারছে না। অবসন্ন শরীর। তাঁর হাড়গোড় অনিদ্রায় ব্যথা করছে। তিনি একই সঙ্গে মোরগটার আর নিজের দেখাশোনা করতে সক্ষম নন। নভেম্বরের দ্বিতীয় ভাগে তাঁর মনে হল পর পর দু'দিন গমের দানা না পেয়ে প্রাণীটা বুঝি মরেই যাবে। তারপর তাঁর মনে পড়ল জুলাই মাসে তিনি একমুঠো বিন চিমনিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। খোসা ছাড়িয়ে শুকনো শুঁটিগুলো তিনি মোরগের সামনে রেকাবিতে ছড়িয়ে দিলেন। 'এদিকে একটু এসো তো',—স্ত্রী তাঁকে ডাকলেন।

'এক মিনিট',—মোরগের প্রতিক্রিয়া দেখতে দেখতে কর্নেল জবাব দিলেন। এদিকে তাঁর স্ত্রী ততক্ষণে বিছানায় উঠে বসবার চেষ্টা করছেন। তাঁর দলা পাকানো লজ্‌ঝড়ে শরীরটা থেকে ওষুধের তীব্র গন্ধ বেরোচ্ছে। কর্নেল-গিন্নি মনের কথাটা বললেন। একটা একটা করে, মাপজোক করে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন। 'এক্ষুনি এই মোরগটাকে বিদেয় করো।'

এ মুহূর্তটাকে কর্নেল আগেই দেখতে পেয়েছিলেন। যেদিন বিকেলে তাঁর ছেলেকে গুলিতে মারা হল সেই থেকেই তিনি এ মুহূর্তটার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আর ঠিক করেছিলেন মোরগটাকে তিনি নিজের কাছে রাখবেন। বিষয়টা ভেবে দেখবার জন্যে অনেক সময় তিনি পেয়েছেন।

'এখন আর বিক্রি করে কোনও লাভ নেই',—তিনি বললেন। 'আর দু'মাসের মধ্যেই লড়াইটা হবে। তারপর এটাকে ভালো দামে বেচা যাবে।'

'বেচার কথা হচ্ছে না',—স্ত্রী বললেন। 'ছেলেরা এলে এটাকে নিয়ে যেতে বলবে। এটাকে নিয়ে ওরা যা খুশি করুক।'

'এটা তো আগুস্তিনের জন্যই',—আগেভাগে তৈরি করা যুক্তিটাকে পেশ করলেন কর্নেল। 'ওর মুখটা ভাব—বাড়ি ফিরে যখন ও বলত আমাদের মোরগটা জিতেছে।' কর্নেল-গিন্নিও সত্যি সত্যিই ছেলের কথা ভাবছিলেন।

'হতচ্ছাড়া মোরগগুলোই ওর সর্বনাশ করেছে',—তিনি চেঁচিয়ে বললেন। 'ও যদি তেসরা জানুয়ারি বাড়িতে বসে থাকত তবে ওই অলক্ষুণে সময়টা আসত না।' শুকনো তর্জনীটা বাড়িয়ে দরজাটা দেখিয়ে তিনি বলে উঠলেন,—'এখনও যেন আমি ওকে দেখতে পাই। মোরগটাকে বগলদাবা করে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে আগুস্তিন। আমি ওকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছিলাম মোরগের লড়াই-এ গিয়ে যেন কোনও ঝামেলা না পাকায়। ও আমাকে হেসে বলেছিল,—'চুপ কর তো—আজ বিকেলে আমরা নোটের ওপর গড়াগড়ি খাব।'

স্ত্রী অবসন্ন হয়ে নেতিয়ে পড়লেন। কর্নেল তাঁকে আস্তে আস্তে আলতো করে বালিশের ওপর শুইয়ে দিলেন। ঠিক তাঁর নিজের চোখের মতো এই অন্য চোখ জোড়াকে অপলক দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে দেখলেন। 'নড়াচড়া না করার চেষ্টা কর।' নিজের ফুসফুসে তিনি স্ত্রীর হাঁপানির টান অনুভব করলেন। স্ত্রী সাময়িকভাবে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। তিনি চোখের পাতা বুজে ফেললেন। আবার তিনি

চোখের পাতা যখন খুললেন তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস তখন অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে।

'কী অবস্থায় আছি দ্যাখো তো—সেইজন্যেই তো বলছি',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। 'আমাদের মুখের খুদকুঁড়ো কেড়ে নিয়ে মোরগটাকে দিলে পাপ হবে।'

চাদর দিয়ে কর্নেল স্ত্রীর কপালটা মুছিয়ে দিলেন। 'দু'-তিন মাসে কেউ মারা যায় না।'

'আর এই দু'-তিন মাস আমরা খাব কী?'—কর্নেল-গিন্নি এবার প্রশ্ন করলেন।

'জানি না',—কর্নেল বললেন। 'শুধু খিদেতেই যদি আমরা মরব, তবে এর মধ্যেই আমাদের মরণ হত।'

ফাঁকা রেকাবিটার পাশে মোরগটা দিব্যি বেঁচে বর্তে ছিল। কর্নেলকে দেখেই সে প্রায় মানুষের মতো গাঁকগাঁক করে একতরফা কত কী বলে ঘাড় হেলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন সব কিছু বুঝেছেন এমন একটা ভাব করে কর্নেল তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

'বেঁচে থাকাটা বড় কঠিন রে।'

কর্নেল রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সারা শহর যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন, তখন তিনি লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালেন। কোনও কিছুর কথাই তিনি আর ভাবছেন না। সমস্যাটার যে কোনও সমাধানই আর নেই এ কথাটাও নিজেকে মোটেই বোঝাতে চাইছেন না। যতক্ষণ না ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে এল, ভুলে যাওয়া সব অলিগলি দিয়ে তিনি হেঁটে চললেন। তারপর তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়িতে ঢোকার শব্দ শুনতে পেয়ে কর্নেল-গিন্নি শোবার ঘরে ডেকে পাঠালেন কর্নেলকে।

তাঁর দিকে না তাকিয়েই স্ত্রী তাঁকে বললেন,—'আমরা তো ঘড়িটা বেচে দিতে পারি।'

এ কথাটা কর্নেলও আগে ভেবেছিলেন। 'আমি ঠিক জানি' আলভারো ঘড়িটা হাতে পেলেই চল্লিশ পেসো দিয়ে দেবে',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। 'ভেবে দ্যাখো কেমন তড়িঘড়ি করে ও সেলাইকলটা কিনে নিয়েছিল।'

'সকালেই ওর সঙ্গে কথা বলে দেখা যায়',—কর্নেল সায় দিলেন।

'আর সকাল-টকালে কথা বলা-টলা নয়'—কর্নেল-গিন্নি গোঁ ধরে বললেন। 'ঘড়িটা এক্ষুনি ওর কাছে নিয়ে যাও। সোজা গিয়ে ঘড়িটা কাউন্টারে রেখে ওকে বলো,—আলভারো, তুমি কিনবে বলে ঘড়িটা আমি নিয়ে এসেছি। ও তক্ষুনি ব্যাপারটা বুঝে যাবে।'

কর্নেল মরমে মরে গেলেন। 'এ তো প্রায় গির্জার বেদিটা নিয়ে গিয়ে বেচে দেওয়া',—প্রতিবাদ করলেন তিনি। 'ওরকম একটা দর্শনীয় জিনিস হাতে যদি আমায় কেউ দ্যাখে তো রাফায়েল এস্কালোনা অমনি আমাকে নিয়ে একটা গান বেঁধে ফেলবে।'

কিন্তু এবারও স্ত্রী-ই তাঁকে বোঝাতে পারলেন। কর্নেল-গিন্নি নিজেই ঘড়িটা নামিয়ে আনলেন। সেটাকে মুড়ে দিলেন খবরের কাগজে। তারপর তুলে দিলেন কর্নেলের হাতে। 'চল্লিশ পেসো না নিয়ে বাড়ি ফিরো না কিন্তু',—তিনি বললেন। মোড়কটা বগলদাবা করে দর্জির দোকানের দিকে কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন আগুস্তিনের সহকর্মীরা দোকানের চৌকাঠের কাছে বসে আছে।

তাদের একজন তাঁকে একটা বসার জায়গা করে দিল। 'ধন্যবাদ',—তিনি বলেন। 'আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।' দোকানের ভেতর থেকে আলভারো বেরিয়ে এল। হলঘরের মধ্যে দুটো আংটার সঙ্গে তার দিয়ে শক্ত কাপড়ের একটা ভিজে প্যান্ট ঝোলানো। আলভারো অল্পবয়সি ছোকরা। শরীরটা পেটা, বাঁকানো চোখের চাউনিটা কেমন যেন বন্য। সেও তাঁকে বসবার জন্যে আমন্ত্রণ করলে কর্নেল বেশ স্বস্তি বোধ করলেন। দরজার গায়ে টুলটা টেনে নিয়ে তিনি বসে পড়লেন আর তারই অপেক্ষায় তিনি বসে রইলেন। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন অভিব্যক্তিহীন কতকগুলো মুখ তাঁকে ঘিরে আছে।

'আমি কোনও অসুবিধা করছি না তো?'—তিনি আস্তে আস্তে বললেন। তারা বলল,—'না, না, মোটেই না।' একজন তাঁর দিকে ঝুঁকে এল। প্রায় অস্ফুট-অশ্রুত স্বরে একজন বলল,—'আগুস্তিন লিখে পাঠিয়েছে।' কর্নেল পরিত্যক্ত রাস্তাটার দিকে তাকালেন।

'কী লিখেছে?'

'সেই একই কথা।'

তারা তাঁর হাতে চোরাই কাগজটা তুলে দিল। কর্নেল সেটা তাঁর প্যান্টের পকেটে রেখে দিলেন। আঙুল দিয়ে মোড়কটার ওপর টোকা দিতে দিতে তিনি চুপ করে গেলেন। কারণ, হঠাৎ তাঁর নজরে এল কেউ একজন তাঁকে লক্ষ্য করছে।

'আপনার হাতে ওটা কী, কর্নেল?' এরনানের লক্ষ্যভেদী সবুজ চোখ দুটিকে এড়িয়ে গেলেন কর্নেল।

'কিছু না',—তিনি মিথ্যে কথা বললেন। 'ওই জার্মানটার কাছে ঘড়ি সারাই করতে নিয়ে যাচ্ছি।'

'নির্বোধের মতো কথা বলবেন না, কর্নেল',—এরনান মোড়কটা তাঁর হাত থেকে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল,—'দাঁড়ান আমি একবার চোখ বুলিয়ে নিই।'

কর্নেল মোড়কটা আঁকড়ে ধরলেন। টুঁ শব্দটাও করলেন না কিন্তু তার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। অন্যেরা ঝোলাঝুলি করতে লাগল। 'ওকে দেখতে দিন না কর্নেল। যন্ত্রটন্ত্র তো ও বেশ ভালোই বোঝে।'

'আমি খামোখা ওকে ঝামেলায় ফেলতে চাই না।'

'ঝামেলা? মোটেই ঝামেলা নয়',—এরনান তর্ক জুড়ে দিয়ে ঘড়িটা টেনে নিল। 'জার্মানটা আপনার কাছ থেকে দশ দশটা পেসো কান মুচড়ে বের করে নেবে অথচ ঘড়িটা যেমনকার তেমনিই থেকে যাবে।'

ঘড়িটা নিয়ে এরনান দর্জির দোকানের ভেতরে চলে গেল। আলভারো একটা কলে কী যেন সেলাই করছে। পেছনে, দেয়াল থেকে ঝোলানো একটা গিটারের তলায় একটা মেয়ে বসে বসে জামায় বোতাম লাগাচ্ছে। গিটারের ওপরে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা একটা বিজ্ঞপ্তি আটকানো :

রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনা নিষিদ্ধ।

কর্নেলের মনে হল তাঁর শরীরটার কোনও মানে নেই—একটা ফালতু জিনিস। পা দুটো তিনি টুলটার আড়কাঠে চাপিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

'ভগবানের দোহাই, কর্নেল।' আঁতকে উঠলেন কর্নেল,—'দিব্যি দেওয়ার কী হল?' আলফানসো নাকের ডগায় চশমাটা ঠিক করে সেঁটে নিয়ে কর্নেলের পায়ের জুতোজোড়া নিরীক্ষণ করল। 'আপনার জুতোটা, কর্নেল',—সে বলল। 'আপনি দেখছি চকচকে একজোড়া নতুন জুতো পরেছেন।'

'কিন্তু দিব্যি না দিয়েও তো কথাটা বলা যেত',—কর্নেল বললেন। তারপর তিনি পেটেন্ট চামড়ার জুতোর তলাটা দেখালেন তাঁকে। 'এই পিশাচ জোড়া চল্লিশ বছরের পুরোনো অথচ এই প্রথম ওরা শুনল যে কেউ ওদের নিয়ে ভগবানের নামে দিব্যি দিচ্ছে।'

'সব ঠিক করে দিয়েছি',—ভেতর থেকে চেঁচিয়ে এরনান বলল। অমনি ঘড়ির ঘণ্টাগুলো বেজে উঠল। পাশের বাড়ি থেকে একজন মহিলা দেওয়াল ঠুকে চেঁচিয়ে বলল,—'গিটার বাজিও না! আগুস্তিন চলে যাবার পর এখনও একটা বছর কাটেনি।' কে যেন হো হো করে হেসে উঠল। 'ওটা ঘড়ির শব্দ।' এরনান মোড়কটা হাতে করে বেরিয়ে এল। 'কোনও গণ্ডগোল নেই',—এরনানের মন্তব্য। 'আপনি যদি চান তো আমি আপনার সঙ্গে বাড়ি গিয়ে ঘড়িটা টাঙিয়ে দেব।'

কর্নেল প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিলেন। 'কত লাগবে?'

'আরে দূর, কর্নেল',—দলের মধ্যে বসে এরনান জবাব দিল,—'জানুয়ারি মাসে মোরগটাই সব পাওনা মিটিয়ে দেবে।'

যে সুযোগটা খুঁজছিলেন, এতক্ষণে সেটা কর্নেলের হাতে এল। 'তোমাদের সঙ্গে আমি একটা রফা করতে পারি',—তিনি প্রস্তাবের অবতারণা করলেন।

'কী?'

'আমি তোমাদের মোরগটা দিয়ে দেব।' কর্নেল চারপাশের মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন,—'মোরগটা আমি তোমাদের সব্বাইকে দিয়ে দেব।'

এরনান ফ্যালফ্যাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

'ও সবের পক্ষে আমার বয়স বড্ড বেশি,'—কর্নেল বলেই চললেন। তাঁর গলার স্বরে তিনি

বিশ্বাসযোগ্য গাম্ভীর্য আনবার চেষ্টা করলেন। 'আমার পক্ষে ওটা একটা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছে মোরগটা বুঝি মরতে বসেছে।'

'ও নিয়ে ভাববেন না, কর্নেল',—বলল আলফানসো।

'মুশকিলটা হল, মোরগ এখন পালক ঝরাচ্ছে। তার ডানায় জ্বর হয়েছে।'

'ও আসছে মাসেই সেরে যাবে',—এরনান সমাধান করে।

'সে যাই হোক, আমি আর ওকে চাই না',—কর্নেল বললেন।

এরনানের চোখ দুটি যেন তাঁকে ফুঁড়ে ফেলছে। সে জোর দিয়ে বলল,—'অবস্থাটা একবার বোঝবার চেষ্টা করুন, কর্নেল। আগুস্তিনের মোরগটাকে রিঙের মধ্যে আপনাকেই আনতে হবে। সেটাই সবচেয়ে বড় কাজ।

কর্নেল ভেবে দেখলেন কথাটা। 'সে আমি বুঝি।' তিনি বললেন,—'সেই জন্যেই অ্যাদ্দিন ওটাকে নিজের কাছে রেখেছি।' তিনি দাঁতে দাঁত চাপলেন, অনুভব করলেন বাকি কথাটাও এবার বলতে পারেন। 'মুশকিল হল যে এখনও দু'টো মাস বাকি।'

দলের মধ্যে শুধু এরনান একাই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। 'শুধু সেটাই যদি কারণ হয়, তবে কোনও সমস্যা হবে না',—সে বলল। সে ধারণাটা বুঝিয়ে বলল। অন্যরাও তা মেনে নিল। সন্ধেবেলায় তিনি যখন মোড়কটা বগলে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন, তাঁর স্ত্রী নেতিয়ে পড়লেন হতাশায়।

'কিছু হল না, না?—কর্নেল-গিন্নি প্রশ্ন করলেন।

'না',—কর্নেল উত্তর দিলেন। 'তবে এখন আর তাতে কিছু আসে যায় না। ছেলেরাই ওটাকে খাওয়াবার দায়িত্ব নিয়েছে।'

'একটু দাঁড়াও দোস্ত, তোমাকে একটা ছাতা দিচ্ছি।'

দপ্তরের দেওয়ালে লাগানো একটা দেরাজ খুলল সাবাস্। দেরাজের পাল্লা খুলতেই দেখা গেল ভেতরটা এলোমেলো নানান জিনিসে ভর্তি। ঘোড়সওয়ারের জুতোর স্তূপ, লাগাম আর জিন, অ্যালুমিনিয়ামের গামলা আর ঘোড়সওয়ারের জুতোর নালে দেরাজটা উপচে পড়ছে। ওপর দিক থেকে ঝুলছে আধ ডজন ছাতা। মেয়েদের বাহারি ছাতাও রয়েছে। কর্নেলের মনে হল যেন কোনও ধ্বংসস্তূপ থেকে কুড়িয়ে আনা সব আবর্জনা।

'ধন্যবাদ, দোস্ত',—জানালার গায়ে হেলান দিয়ে কর্নেল বললেন। 'আমি বরং বৃষ্টি ধরে আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করি।' সাবাস্ দেরাজটা বন্ধ করেনি। সে একটা বিজলি পাখার চৌহদ্দির মধ্যে চেয়ার টেনে এনে ডেস্কে বসে পড়ল। তারপর সে ডেস্কের ড্রয়ার থেকে তুলোয় জড়ানো একটা ছোট্ট ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ বের করে আনল। বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কর্নেল ধূসর বাদাম গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটা ধু ধু বিকেল।

'জানালার কাচের এপাশ থেকে বৃষ্টিকে অন্য রকম লাগে',—তিনি বললেন : 'যেন বৃষ্টিটা অন্য কোনও শহরে পড়ছে।'

'যেদিক থেকেই তাকাও না কেন, বৃষ্টি বৃষ্টি-ই,'—সাবাস্ উত্তর দেয়। গরম জলে সিরিঞ্জটা ফোটানোর জন্য জল গরম করতে করতে সে বলল। 'এ শহরটা পচা, গা থেকে গন্ধ বেরোয়।'

কর্নেল কাঁধ ঝাঁকালেন। তিনি এসে দাঁড়ালেন দপ্তরের ঠিক মাঝখানটায়। একটা সবুজ টালির ঘর। আসবাবগুলো ঝলমলে সব ঢাকনা দিয়ে সাজানো। পেছনে এলোমেলোভাবে স্তূপ হয়ে আছে নুনের বস্তা, মৌচাক আর ঘোড়ার জিন ও লাগাম। সাবাস্ সম্পূর্ণ উদাস দৃষ্টিতে তাঁকে অনুসরণ করল।

'আমার যদি তোমার মতো অবস্থা হত, তা হলে আমি ওরকম ভাবতাম না'—কর্নেল বললেন।

তিনি বসে পড়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিলেন। তাঁর শান্ত দৃষ্টি ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়া লোকটাকে লক্ষ্য করছে। বেঁটে খাটো একটা লোক, গোলগাল, কিন্তু মুখের চামড়া ফোলা ফোলা, ঝুলে পড়া তাঁর চোখে যেন ব্যাঙের মতো বিষণ্ণ দৃষ্টি।

'ডাক্তার দেখাও, দোস্ত',—সাবাস্ বলল। 'অন্ত্যেষ্টির দিন থেকেই তোমাকে কেমন দুঃখী দুঃখী দেখাচ্ছে।' মাথা তুলে তাকালেন কর্নেল। 'আমি খুব ভালো আছি',—তিনি বললেন।

সাবাস্ জলটা ফুটবার জন্য অপেক্ষা করছিল। 'আমিও হয়তো কথাটা বলতে পারতাম',—সে ঘ্যানঘ্যান করল। 'তুমি তো ভাগ্যবান, তোমার পেটটা একেবারে ঢালাই লোহায় গড়া।' সে নিজের রোমশ হাতের পেছনটাকে নিরীক্ষণ করল। তাতে কালো কালো, ফুট ফুট সব দাগ। বিয়ের আংটির পাশের আঙুলে কালো পাথর বসানো একটা আংটি।

'তা ঠিক',—কর্নেল সায় দিলেন।

দপ্তর থেকে মুখ বাড়িয়ে বাড়ির অন্য অংশের দিকে তাকিয়ে সাবাস্ তার বউকে ডাকল। তারপর সে তার পথ্যের একটা করুণ তালিকা দিল। শার্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট শিশি বার করে কড়াইশুঁটির আকারের একটা সাদা বড়ি ডেস্কের ওপর রাখল। 'সব জায়গায় এসব নিয়ে যাওয়া একটা যন্ত্রণা',—সে বলল। ' এ যেন পকেটে করে মরণকে বয়ে বেড়ানো।'

ডেস্কের কাছে এগিয়ে এলেন কর্নেল। তাঁর হাতের চেটোয় বড়িটাকে নিয়ে তিনি খুঁটিয়ে দেখলেন। শেষটায় সাবাস্ তাঁকে বড়িটা চেখে দেখবার জন্য প্রস্তাব দিল।

'এ শুধু কফি মিষ্টি করার জন্য',—সে ব্যাখ্যা করল। 'চিনিই—তবে এতে শর্করা নেই।'

'নিশ্চয়ই',—তাঁর মুখের লালা এক করুণ স্বাদে ভরে গেল। 'এ যেন কোনও ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ শুধু ঘণ্টাটাই কোথাও নেই।'

বউ এসে তাকে ইঞ্জেকশনটা দিয়ে যাবার পর সাবাস্ দু' হাতের মধ্যে মুখটা ধরে কনুই দু'টো ডেস্কের ওপর রাখল। কর্নেল ভেবেই পেলেন না তাঁর শরীরটাকে নিয়ে তিনি কী করবেন। সাবাসের বউ বিজলি পাখাটার তার প্লাগ থেকে খুলে দিল। সিন্দুকের ওপর রাখল পাখাটা। তারপর দেরাজটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'ছাতার সঙ্গে মৃত্যুর কিছু একটা সম্পর্ক আছে',—সাবাসের বউ বলল। কর্নেল তাব কথায় কোনও পাত্তা দিলেন না। তিনি বাড়ি থেকে বেলা চারটের ডাক দেখার জন্য বেরিয়েছেন। কিন্তু বৃষ্টির জন্য বাধ্য হয়ে তাঁকে সাবাসের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। লঞ্চগুলোর ভোঁ যখন শোনা গেল, তখনও বৃষ্টি পড়ছে।

'সবাই বলে মরণ হল কোনও মেয়েমানুষ',—সাবাসের বউ বলেই চলে। মোটা থলথলে মহিলা স্বামীর চেয়ে মাথায় লম্বা। আর ওপরের ঠোঁটের কাছে একটা রোমশ তিল আছে। কথা বলার ধরন যেন বিজলি পাখার গুঞ্জন। 'কিন্তু আমার তাকে কোনও মেয়েমানুষ বলে মনে হয় না',—বলতে বলতে সে দেরাজের পাল্লা দুটি বন্ধ করে আবার কর্নেলের চোখের দিকে তাকাল। 'আমার ধারণা সে কোনও জানোয়ার,—থাবা আছে নখ আছে।'

'তা সম্ভব',—কর্নেল সায় দিলেন। 'সময় সময় কত তাজ্জব ঘটনাই যে ঘটে।' তিনি ভাবছিলেন, পোস্টমাস্টার নিশ্চয়ই এতক্ষণে গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে লাফিয়ে লঞ্চে উঠেছে। উকিল পালটাবার পর একমাস কেটে গিয়েছে। এখন তিনি কোনও সদুত্তর প্রত্যাশা করতে পারেন। কর্নেলের আনমনা ভাবটা চোখে পড়া অবধি সাবাসের বউ মৃত্যু নিয়ে আলোচনাটা চালিয়েই গেল।

'দোস্ত',—সাবাসের বউ বলল 'আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

ধড়মড় করে বসলেন কর্নেল। 'তা সত্যি',—কর্নেল মিথ্যে করে বললেন। 'আমি ভাবছি এরই মধ্যে পাঁচটা বেজে গেছে, অথচ মোরগটাকে এখনও ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়নি।'

সাবাসের বউ কেমন বিমূঢ় বোধ করল। 'মোরগকে ইঞ্জেকশন! যেন সে একটা মানুষ!'—সে চেঁচিয়ে উঠল। 'এ-ত বাড়াবাড়ি!'

সাবাস্ আর সহ্য করতে পারল না। সে তার আরক্ত মুখটা তুলল। 'মুখটা একটু বন্ধ করবে?' বউকে সে একরকম হুকুমই দিল। আর সত্যিই সাবাসের বউ নিজের মুখে হাত চাপা দিল। 'বোকার মতো বকবক করে আমার বন্ধুকে গত আধঘণ্টা ধরে বিরক্ত করে চলেছ।'

'না, না, মোটেই না',—কর্নেল প্রতিবাদ করলেন।

সাবাসের বউ সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। ল্যাভেন্ডারে ভেজানো একটা রুমাল দিয়ে সাবাস্ তার ঘাড় মুছল। কর্নেল জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেই একইভাবে একটানা বৃষ্টি পড়ে চলেছে। একটা লম্বা ঠ্যাং-এর মুরগি পরিত্যক্ত প্লাজাটা পেরিয়ে গেল। 'সত্যিই কি মোরগটাকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে?'

'সত্যি',—বললেন কর্নেল,—আগামী সপ্তাহ থেকে কায়দাকানুন শেখানো শুরু হবে।'

'এ তো পাগলের কাণ্ড',—সাবাস্ বলল। 'এসব কম্ম তোমার নয়।'

'তা মানি',—বললেন কর্নেল। 'তা বলে তার ঘাড় মটকাবারও কোনও কারণ নেই।'

'গবেটের গোঁ',—জানালার দিকে ফিরে সাবাস্ বলল।

কর্নেল শুনলেন সে হাঁপরের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। বন্ধুর চোখের চাউনি তাঁর মধ্যে কেমন একটা করুণার ভাব এনে দিল। 'কোনও কিছুই যে কোনও সময় শুরু করা যায়',—কর্নেল বললেন।

'কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলো না',—সাবাস্ আবারও নিজের কথায় জোর দিল। 'এ এক দু' দিকে শান দেওয়া করাত। একদিকে তোমার মাথাব্যাথাটা কমবে, অন্যদিকে তুমি ন'শো পেসো পকেটস্থ করবে।'

'ন' শো পেসো!'—কর্নেল বিস্মিত।

'নয় শো পেসো।'

কর্নেল সংখ্যাটাকে চেখে দেখার চেষ্টা করলেন। 'ওই মোরগটার জন্য ওরা অত দেবে ভাবছ তুমি?'

'আমি ভাবছি না',—সাবাস্ উত্তর দিল। 'আমি নিশ্চিত করে জানি।'

বিপ্লবীদের তহবিল ফিরিয়ে দেবার পর এই অঙ্কটা সবচেয়ে বড় সংখ্যা—কর্নেল মাথার মধ্যে অনুভব করলেন। সাবাসের দপ্তর থেকে বিদায় নেবার সময় পেটের মধ্যে কেমন একটা প্রচণ্ড মোচড় অনুভব করলেন তিনি। তবে এই মোচড়টা এবার আর আবহাওয়ার প্রকোপে নয়। ডাকঘরে গিয়ে তিনি সোজা পোস্টমাস্টারের কাছে চলে গেলেন। 'একটা জরুরি চিঠি আসার কথা আছে',—তিনি বললেন। 'হাওয়াই ডাক।'

পোস্টমাস্টার খোপগুলোর দিকে তাকাল। ঠিকানা পড়া শেষ হলে সে চিঠিগুলোকে আবার ঠিকঠাক খোপে সাজিয়ে রাখল। তবে মুখে কিছুই বলল না। হাত ঝেড়ে সে কর্নেলের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকাল।

আজকে চিঠিটা নিশ্চিতভাবে আসার কথা ছিল',—কর্নেল বললেন।

পোস্টমাস্টার কাঁধ ঝাঁকাল। 'কর্নেল, একমাত্র মরণই নিশ্চিতভাবে আসে।'

সেদ্ধ, দলা পাকানো একথালা ভুট্টা দিয়ে কর্নেলকে অভ্যর্থনা করলেন তাঁর স্ত্রী। চুপচাপ বসে খেলেন কর্নেল। একেক চামচ খাবার মুখে তোলার ফাঁকে ফাঁকে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন ভাবছেন। তাঁর মুখোমুখি বসে কর্নেল-গিন্নি দেখলেন কী একটা যেন তাঁর স্বামীর মুখে বদলে গিয়েছে। 'কী হয়েছে?'—তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি ভাবছি সেই লোকটার কথা যে পেনশনের ওপর নির্ভর করে থাকে,'—মিথ্যে করে বললেন কর্নেল। 'পঞ্চাশ বছর পরে আমরা তো শান্তিতে ছ' ফুট মাটির তলায় থাকব অথচ বেচারি তখনও প্রতি শুক্কুরবারে নিজেকে তিল তিল করে তাঁর পেনশনের অপেক্ষায় মারতেই থাকবে।'

'এটা খারাপ লক্ষণ',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। 'তার মানে তুমি এর মধ্যেই হাল ছেড়ে দিতে চাইছ।' কর্নেল-গিন্নি দলা পাকানো খাবারই খেয়ে চললেন। কিন্তু পরক্ষণেই টের পেলেন সামনে বসে থাকলেও তাঁর স্বামী এখন রয়েছেন অনেক দূরে। 'এখন কিন্তু খাবারটা তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে নেওয়া উচিত।'

'খাবারটা খুবই ভালো',—কর্নেল বললেন। 'কোত্থেকে এল'।

'মোরগের কাছ থেকে',—স্ত্রী উত্তর দিলেন। 'ছেলেগুলো ওর জন্য এত ভুট্টা নিয়ে এসেছিল যে মোরগটা আমাদেরও তার ভাগ দিতে চাইল। জীবন এই রকমই।'

'তা ঠিক',—কর্নেল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'যা কিছু উদ্ভাবন করা হয়েছে, তার মধ্যে জীবনই সর্বশ্রেষ্ঠ।'

উনুনের গায়ে বাঁধা মোরগটার দিকে তিনি তাকালেন। আর এবার ওটাকে কেমন যেন অন্যরকম একটা প্রাণী বলে মনে হল। তাঁর স্ত্রীও তাকিয়ে আছেন ওটার দিকে।

'আজ বিকেলে ছেলেপুলেগুলোকে লাঠি তুলে তাড়া করতে হল',—স্ত্রীর মন্তব্য। 'আমাদেরটার বাচ্চা বানাবে বলে ওরা একটা বুড়ি মুরগি নিয়ে এসেছিল।'

'এবারই প্রথম নয়',—কর্নেল বললেন। 'ওই সব শহর-গঞ্জে ঠিক এ জিনিসই ওরা কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে দিয়ে করেছিল। তাঁর ঔরসে ছেলেপুলে বানাবার জন্য ওরা তখন বাচ্চা-বাচ্চা মেয়েদেরও আনত।'

রসিকতাটায় কর্নেল-গিন্নি তো হেসেই কুটিপাটি। মোরগটাও একটা কঁক্ করে আওয়াজ করল। হল্ ঘরটায় প্রতিধ্বনিত হয়ে সেটাকে মানুষের কথার মতোই শোনাল। 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় এ জীবটা বুঝি কথা বলবে',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। মোরগটার দিকে আবার তাকালেন।

'ওর ওজন তো সোনার দামে',—তিনি বললেন। এক চামচ ভুট্টার দলা মুখে দিয়ে মনে মনে কী সব হিসেব করলেন তিনি। 'ও আমাদের তিন বছর খাওয়াবে।'

'তুমি তো আর আশা-আকাঙ্ক্ষা চিবিয়ে খেতে পারো না',—কর্নেল-গিন্নি বললেন।

'তুমিও আশা চিবিয়ে খেতে পারো না বটে, তবে আশা তোমাকে জিইয়ে রাখে',—উত্তর দিলেন কর্নেল। 'এ প্রায় আমার দোস্ত সাবাসের অঘটন ঘটানো বড়িগুলোর মতো।'

রাতে ভালো ঘুম হল না তাঁর। মন থেকে কতগুলো সংখ্যা তিনি মুছে ফেলতে চাইছিলেন। পরদিন দুপুরে খাবার সময় স্ত্রী দু' থালা সেদ্ধ ভুট্টা পরিবেশন করলেন আর থালার ওপর ঝুঁকে পড়ে, চুপচাপ, একটাও কথা না বলে নিজেরটা খেতে লাগলেন। কর্নেলের মনে হল স্ত্রীর মন খারাপ করার প্রভাব বুঝি তার উপরও পড়েছে। 'কী হয়েছে?'

'কিচ্ছু না',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। কর্নেলের মনে হল,—এবার বুঝি তাঁর স্ত্রীর মিথ্যে কথা বলার পালা। তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্ত্রীর মেজাজটা একইরকম থেকে গেল।

'এটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়',—স্ত্রী বললেন। 'আমি ভাবছিলাম, লোকটা মারা গেছে দু-মাস হয়ে গেল, অথচ আমি কিনা এখনও ওর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে দেখা করতেই যাইনি।'

সে রাতেই তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মৃতের বাড়ি অবধি স্ত্রীকে এগিয়ে দিলেন কর্নেল। তারপর নিজে এগোলেন সিনেমা হলের দিকে। লাউড স্পিকারের গানগুলো তাকে কেমন টানছিল। বারোটা হুঁশিয়ারি ঘণ্টা দেওয়া সত্ত্বেও হলে কে কে ঢুকল নজরে রাখতে নিজের দপ্তরের দরজার কাছে বসে পাদ্রির আন্‌খেল সিনেমার সদরের দিকে তাকিয়েছিলেন। আলোর বন্যা, প্রাণ মাতানো গান, আর ছেলেমেয়েদের হইচই গোটা জায়গাটায় যেন একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। একটি বাচ্চা একটা কাঠের বন্দুক তাক করে ভয় দেখাল কর্নেলকে।

'আপনার মোরগের কি খবর? নতুন কিছু আছে নাকি, কর্নেল?'—বেজায় ভারিক্কি চালে বলল বাচ্চাটি।

কর্নেল দু'হাত শূন্যে তুললেন। 'এই আছে আর কী, এখনও।'

একটা চার রঙা পোস্টার সিনেমা হলের পুরো সামনের জায়গাটা জুড়ে রয়েছে : *'মধ্যরাতের কুমারী'*। সেই কুমারী হল,—সান্ধ্য পোশাক পরিহিতা এক নারী যার একটা পা উরু পর্যন্ত উন্মোচিত। কর্নেল উদ্দেশ্যহীনভাবে পাড়াটায় ঘোরাফেরা করলেন। তারপর পাওয়া গেল অশনিসংকেত আর বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল। তখন তিনি ফিরে গেলেন স্ত্রীর খোঁজে।

কর্নেল-গিন্নি কিন্তু মৃতের বাড়িতে নেই। নিজের বাড়িতেও নয়। কর্নেল হিসেব করে দেখলেন, কারফিউ নামার আর বেশি দেরি নেই। কিন্তু ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। শহর লক্ষ্য করে ছুটে আসা ঝড়টাকে অনুভব করলেন। তিনি আবার বাইরে বেরোবেন বলে তৈরি হওয়ার মুহূর্তে বাড়ি ফিরে এলেন তাঁর স্ত্রী।

মোরগটাকে শোবার ঘরে নিয়ে এলেন কর্নেল। পোশাক পালটিয়ে স্ত্রী বসার ঘরে জল খেতে গেলেন। কর্নেল তখন ঘড়িটায় দম দেওয়া সবে শেষ করে কারফিউ জারির ভেরির আওয়াজ শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন। কারণ, ঘড়ির সময়টা মিলিয়ে রাখতে হবে। 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'—কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন।

'এই কাছে পিঠেই',—উত্তর দিলেন কর্নেল-গিন্নি। স্বামীর দিকে না তাকিয়েই গেলাসটা তিনি বেসিনে নামিয়ে রাখলেন। তারপর ফিরে গেলেন শোবার ঘরে। 'এত শিগগিরই যে বৃষ্টি নামবে, এটা কেউ আশা করেনি।'

কর্নেল কোনও মন্তব্য করলেন না। যখন কারফিউর ভেরি বাজল তিনি ঘড়িটার কাঁটা এগারোটায় বসিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দিলেন। চেয়ারটা ঠেলে রেখে দিলেন ঠিক জায়গায়। তিনি দেখলেন স্ত্রীর হাতে জপমালা।

'তুমি কিন্তু আমার কথার উত্তর দাওনি',—কর্নেল বললেন।

'কী?'

'ছিলে কোথায়?'

'ওখানেই ছিলাম, কথা বলছিলাম',—স্ত্রী বললেন। 'বাড়ি থেকে যে কদ্দিন বাদে আজ বেরিয়েছি!'

কর্নেল তাঁর দোলনা টাঙিয়ে নিলেন। দরজা-জানালা বন্ধ করে কীটনাশক ছিটোলেন। তারপর বাতিটাকে মেঝেয় নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়লেন।

'বুঝতে পারছি',—বিষণ্ণ স্বরে কর্নেল বললেন। 'খারাপ অবস্থা আরও খারাপ হয় যখন তা আমাদের দিয়ে মিথ্যে কথা বলায়।'

স্ত্রী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। 'পাদ্রি আনখেলের কাছে গিয়েছিলাম',—তিনি বললেন। 'আমাদের বিয়ের আংটিগুলো বন্ধক রেখে কিছু টাকা ধার করতে চাইছিলাম।'

'আর উনি তোমাকে কি বললেন?'

'পবিত্র জিনিস বেচা-কেনা মহাপাপ।'

মশারির তলা থেকে তিনি কথা বলেই চললেন। 'দিন দুই আগে আমি ঘড়িটা বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলাম। কারও কোনও ইচ্ছে নেই। ওরা কিস্তিতে হালফ্যাশনের সব ঘড়ি বিক্রি করছে অন্ধকারে সেগুলোর কাঁটা জ্বলজ্বল করে। অন্ধকারেও তুমি সময় দেখতে পাবে।' কর্নেল মনে মনে স্বীকার করলেন চল্লিশ বছর একসঙ্গে জীবন কাটানো, একসঙ্গে ক্ষুধা ভাগ করে নেওয়া, একসঙ্গে দুঃখ কষ্ট ভাগ করা কিছুই যথেষ্ট নয়। এখনও তিনি তাঁর স্ত্রীকে পুরোপুরি জানতে পারেননি।

তাঁর মনে হল তাঁদের প্রেমের আরও কী একটা যেন পুরোনো হয়ে গেছে। 'ছবিটাও ওরা চায় না',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। 'প্রায় সবার কাছেই ওই একই ছবি আছে। আমি এমনকী তুর্কিটার দোকানেও গেছিলাম।'

বিষয়টা খুব তেতো লাগল কর্নেলের। 'এখন তাহলে সবাই জানে যে আমরা না খেয়ে মরছি।'

'আমি ক্লান্ত',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। 'পুরুষ মানুষ কখনও সংসারের ঝামেলাগুলো বোঝে না। কতবার আমি পাথর কুড়িয়ে এনে সেদ্ধ করেছি যাতে পড়শিরা বুঝতে না পারে যে আমাদের বাড়িতে অনেক দিনই হাঁড়ি চড়ানো হয় না।'

কর্নেল আহত বোধ করলেন। 'সে একেবারেই দীন দশা',—তিনি বললেন।

স্ত্রী মশারির ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলেন দোলনার কাছে। 'আমি এ বাড়ির বড়মানুষী বোলচাল ছেড়ে দিতে পারি',—তিনি বললেন। তাঁর স্বর ক্ষোভে গাঢ়, ঘন হয়ে উঠল। 'ওই মর্যাদাবোধ আর হাল ছাড়া হাবভাবে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।' কর্নেল একটা পেশিও নাড়ালেন না।

'প্রত্যেকবার ভোটের পরে ওরা তোমায় কথা দেয় ছোট ছোট রঙিন পাখিগুলো দেবে। এইভাবে কুড়ি বছর ধরে চলছে—অপেক্ষা আর অপেক্ষা। আর এ সবের মধ্যে থেকে আমরা কী পেলাম? একটা মরা ছেলে',—স্ত্রী বলে চললেন। 'একটা মরা ছেলে ছাড়া আর কিছুই নয়।'

এ ধরনের নালিশে কর্নেল অভ্যস্ত। 'আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি।'

'আর ওরা ওদের কর্তব্য করেছে। কুড়ি বছর ধরে সেনেটে ভাষণ দিয়ে, হাজার পেসো করে মাসে রোজগার করে,'—কর্নেল-গিন্নি বলেই চলেন। 'এই দ্যাখো না আমাদের দোস্ত সাবাস্‌কে, দোতলা একটা বাড়িতেও সব সম্পদ আঁটাতে পারছে না। অথচ, গলায় একটা সাপ জড়িয়ে এ শহরে ও জড়িবুটি আর টোটকা বেচতে এসেছিল।'

'বেচারি এখন ডায়বেটিসে মরতে বসেছে',—কর্নেল বললেন।

'আর তুমি মরতে বসেছ অনাহারে',—স্ত্রী বললেন। 'এটা তোমার বোঝা উচিত যে মর্যাদা ধুয়ে খেয়ে কারও পেট ভরে না।'

বাজ আর বিদ্যুৎ তাঁর কথায় বাধা দিল। রাস্তায় একটা বাজ ফেটে পড়ল। শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল বাজের দাপট। আর খাটের তলা দিয়ে একরাশ পাথরের মতো তা গড়িয়ে গেল। জপের মালার জন্য কর্নেল-গিন্নি লাফিয়ে মশারির কাছে চলে এলেন।

কর্নেল একটু হাসলেন। 'জিভকে বাগ না মানালে ওরকমই হয়',—তিনি বললেন। 'আমি তো চিরকালই বলে এসেছি ভগবান আমার পক্ষে আছেন।' বাস্তবে কিন্তু কর্নেল তিক্ততাই অনুভব করছিলেন। পরক্ষণে বাতি নিভিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকানোর পরের গভীর এক অন্ধকারে তিনি তলিয়ে গেলেন ভাবনায়। মনে পড়ে গেল মাকোন্দোর কথা। নিরলান্দিয়ার প্রতিশ্রুতি পালন করা হবে ভাবতে ভাবতে ততদিনে দশ বছর অপেক্ষা করা হয়ে গেছে। আধো তন্দ্রার ঘোরে তিনি দেখলেন একটা হলদে ধূলিধূসর ট্রেন এসে দাঁড়াল। নারীপুরুষ, জীবজন্তু সবাই গরমে হাঁসফাঁস করছে এমনকি ট্রেনের ছাদেও গাদাগাদি ভিড়। সে ছিল কলার মরশুমের হুজুগ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তারা শহরটাকে আগাপাশতালা বদলে ফেলেছিল। 'আমি কেটে পড়ছি',—কর্নেল তখন বলেছিলেন। 'কলার গন্ধ আমার ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে।' আর ফিরতি ট্রেনেই তিনি মাকোন্দো ছেড়ে এসেছিলেন,—বুধবার সাতাশে জুন, ১৯০৬, বিকেল চারটা আঠারোয়। এটা বুঝতে তার প্রায় অর্ধ-শতাব্দী লেগেছিল। নিরলান্দিয়ার আত্মসমর্পণের পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাননি তিনি।

কর্নেল চোখ খুললেন। 'তাহলে আর এ নিয়ে ভাবার কিছু নেই',—তিনি বললেন।

'কী?'

'মোরগের সমস্যাটা',—কর্নেল বললেন। 'কালই আমি ওকে দোস্ত সাবাসের কাছে ন'শো পেসোয় বেচে দেব।'

খাসিগুলোর কলরব আর তার সঙ্গে মিশে যাওয়া সাবাসের চিৎকার দপ্তরের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। দু' ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর কর্নেল নিজেকে কথা দিয়েছিলেন সাবাস্ আর দশ মিনিটের মধ্যে না এলে তিনি চলে যাবেন।

চলে যাওয়ার জন্য পা যখন বাড়ালেন তিনি, একদল কর্মচারীর সঙ্গে সাবাস্ তার দপ্তরে এসে ঢুকল। কর্নেলের দিকে না তাকিয়েই তাঁর সামনে সে পায়চারি করতে লাগল। 'আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে নাকি, দোস্ত?'

'হ্যাঁ, দোস্ত',—বললেন কর্নেল। 'তবে তুমি যদি এখন ব্যস্ত থাক আমি না হয় পরে আবার আসব।'

দরজার অন্য পাশ থেকে সাবাস্ তাঁর কথা শুনতেই পেল না। 'আমি এক্ষুনি আসছি',—সে বলল।

দমবন্ধ করা একটা দুপুর। রাস্তার স্বচ্ছ গরমের হলকায় দপ্তরটা ঝাঁঝিয়ে উঠেছে। গুমোটে কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গিয়ে কর্নেল চোখ বুজলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। পা টিপে টিপে ঘরে এসে ঢুকল সাবাসের বউ।

'না, না, ঘুম থেকে উঠবেন না, দোস্ত',—সে বলল। 'আমি শুধু খড়খড়িটা নামিয়ে দিতে এসেছি। ঘরটা একেবারে অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে। কর্নেল শূন্য দৃষ্টিতে তাকে অনুসরণ করলেন। জানালা বন্ধ করে দিয়ে ছায়া থেকে সে কথা বলল। 'আপনি প্রায়ই স্বপ্ন দ্যাখেন না কি?'

'মাঝে মাঝে',—উত্তর দিলেন কর্নেল। ঘুমিয়ে পড়ার জন্য তাঁর ভারী লজ্জা করছিল। 'প্রায় সবসময়,—স্বপ্নে দেখি আমি একটা মাকড়শার জালে জড়িয়ে পড়েছি।'

'আমি রোজ রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি',—সাবাসের বউ বলল। 'এখন আমার মাথায় ঢুকেছে স্বপ্নে দেখা সেই সব অচেনা লোকেদের পরিচয় খুঁজে বের করা দরকার।'

সাবাসের বউ পাখাটা লাগিয়ে দিল প্লাগে। 'গত সপ্তাহে আমার শিয়রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে।' সে বলেই চলে,—'আমি কোনওমতে জিজ্ঞেস করেছিলাম কে সে? আর সে বলেছিল,—'এই ঘরে বারো বছর আগে আমি মারা যাই।'

'কিন্তু বাড়িটা তো দু' বছর আগেও তৈরি হয়নি',—মন্তব্য করলেন কর্নেল।

'তা ঠিক,'—সাবাসের বউ বলল। 'তার মানে ভূতপেতনিরাও ভুল করে।'

পাখার ফরফরানি ছায়াটাকে গাঢ় করে তুলছে। কর্নেল কেমন অধৈর্য হয়ে পড়লেন। ঘুম আর এই বউটার বকবকানি দুই-ই তাঁকে ভীষণ জ্বালাচ্ছে। সাবাসের বউ ততক্ষণে মৃত্যু থেকে পুনর্জন্মে গিয়ে পৌঁছেছে। কথা থামলেই তাকে বিদায় জানাবার জন্যে কর্নেল অপেক্ষা করছেন। এমন সময় সাবাস্ তার ফোরম্যানকে নিয়ে দপ্তরে ঢুকল।

'আমি চার চারবার তোমার স্যুপ গরম করেছি',—সাবাসের বউ বলল।

'ইচ্ছে হলে দশবারও গরম করতে পার',—সাবাস্ বলল। 'কিন্তু এখন আমায় জ্বালিয়ো না।'

সিন্দুক খুলে সে ফোরম্যানের হাতে এক তাড়া বিল বের করে দিয়ে এক গাদা নির্দেশ দিল। গুনবার জন্য খড়খড়িটা খুলল ফোরম্যান। সাবাস্ দেখল কর্নেল আপিসের পেছনে বসে আছেন। কিন্তু তাতে সাবাসের কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। ফোরম্যানের সঙ্গেই সে কথা বলে চলল। দুজনে যখন আবার দপ্তর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছে সোজা হয়ে বসলেন কর্নেল। দরজা খোলার আগে থমকে দাঁড়াল সাবাস্।

'তোমার জন্য কী করতে পারি, দোস্ত?'

কর্নেল দেখলেন ফোরম্যান তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। 'না, কিছু না, দোস্ত',—তিনি বললেন। 'আমি শুধু তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছিলাম।'

'কী বলবে, চটপট বল,'—সাবাস্ বলল। 'আমার এক মিনিটও ফুরসত নেই।' দরজার হাতলে হাত রেখে একটু ইতস্তত করে সাবাস্।

কর্নেল অনুভব করলেন জীবনের সব চেয়ে দীর্ঘ পাঁচ সেকেন্ড কাটছে। দাঁতে দাঁত চাপলেন তিনি। 'না, এমন কিছু নয়। ওই মোরগটার ব্যাপার',—তিনি মৃদুস্বরে বললেন।

তখন সাবাস্ দরজাটা টেনে খুলল। 'মোরগটার ব্যাপার',—সে হাসতে হাসতে আওড়াল আর ফোরম্যানকে ঠেলে বের করে দিল হল্ঘরে। 'লোকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ছে আর আমার দোস্ত এখন মোরগ নিয়ে ব্যস্ত!' আর তারপর কর্নেলের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল,—'ঠিক হ্যায়' দোস্ত। আমি এক্ষুনি আসছি।'

কর্নেল স্থানুর মতো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। হল্ঘর থেকে দুজনের পায়ের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। তারপর তিনি শহরের চারপাশে ঘুরতে বেরিয়ে গেলেন। রবিবার দুপুরের তন্দ্রায় পুরো শহরটাই যেন ঝিম মেরে আছে। দর্জির দোকানে কেউ নেই। ডাক্তারখানা বন্ধ। সিরিয়ার লোকটার দোকানের পসরার ওপর কেউ নজর রাখছে না। নদী যেন একটা ইস্পাতের পাত। নদীর পাড়ে একটা লোক চারটে তেলের পিপে পর পর সাজিয়ে তার ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। রোদ থেকে বাঁচবার জন্য টুপি দিয়ে মুখটা ঢেকে রয়েছে সে। কর্নেল বাড়ি ফিরে গেলেন। এ শহরে তিনিই যে একমাত্র সচল বস্তু তাতে তাঁর কোনও সন্দেহ নেই।

একটা সম্পূর্ণ মধ্যাহ্ন ভোজ সাজিয়ে কর্নেল-গিন্নি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

'আমি সব ধারে কিনে এনেছি। কথা দিয়েছি কাল ভোরেই সব ধার শোধ করে দেব,'—তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন।

খেতে খেতে কর্নেল গত তিন ঘণ্টায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর বিবরণ স্ত্রীকে দিলেন। অধীরভাবে আগ্রহ ভরে সব শুনলেন তাঁর স্ত্রী।

'সমস্যা হল তোমার কোনও চরিত্রের বালাই নেই।',—সবটুকু শুনে কর্নেল-গিন্নি মন্তব্য করলেন। 'তুমি এমনভাবে গিয়ে দাঁড়াও যেন তুমি ভিক্ষে চাইছ। মাথা উঁচু করে সোজা আমাদের দোস্তের কাছে গিয়ে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলা উচিত,—'দোস্ত, আমি তোমার কাছে মোরগটাকে বিক্রি করে দেব বলে ঠিক করেছি'।'

'তুমি এমনভাবে কথা বলো যেন জীবন এক ঝলক দখিনা বাতাস',—কর্নেল বললেন।

তাঁর স্ত্রী যথেষ্ট উৎসাহিত। সকালে তিনি ঘরদোর সাফ করলেন। ভারী অদ্ভুতভাবে সেজেছেন তিনি। পায়ে স্বামীর পুরোনো জুতো, গায়ে অয়েল ক্লথের অ্যাপ্রন, আর কানের পাশে দুটো গিঁট দিয়ে মাথায় একটা কাপড় বাঁধা। 'এতটুকুও ব্যবসাবুদ্ধি নেই',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। 'কিছু যখন বেচতে গেছ তখন এমন মুখ করা উচিত যেন তুমি কিনতে গেছ।'

স্ত্রীর সাজপোশাকে যেন ভারী মজার জিনিস খুঁজে পেয়েছেন কর্নেল। 'যেমন আছ, তেমনি থাক।'—স্ত্রীকে বাধা দিয়ে হেসে বললেন তিনি। 'তোমাকে ঠিক কোয়াকার কোম্পানির ওটের প্যাকেটের ওপর ছাপানো ছবির লোকটার মতো দেখাচ্ছে।' তাঁর স্ত্রী মাথা থেকে কাপড়টা খুলে নিলেন।

'আমি গুরুতর বিষয়ে কথা বলছি',—তিনি বললেন। 'এক্ষুনি আমি আমাদের দোস্তের কাছে মোরগটাকে নিয়ে যাচ্ছি আর বাজি ধরে বলতে পারি আধঘণ্টার মধ্যেই আমি ন'শো পেসো নিয়ে ফিরে আসব।'

'তোমার মাথায় গোবর ভর্তি',—কর্নেল বললেন। 'তুমি আগেভাগেই মোরগের দর দাম নিয়ে বাজি ধরছ।'

কর্নেলকে অনেক কসরত করতে হল স্ত্রীর জেদ ভাঙাতে। শুক্রবারের যন্ত্রণা ছাড়াই আগামী তিন বছর কী করে সংসার চালাবেন, তা নিয়ে কর্নেল-গিন্নি খুঁটিনাটি পর্যন্ত হিসেব করে বসেছিলেন। যে সব জিনিস একেবারেই না হলে নয় তার একটা ফর্দ তৈরি করেছিলেন তিনি। এমনকি কর্নেলের জন্য একজোড়া নতুন জুতোর কথাও তিনি ভোলেননি। শোবার ঘরে আয়না বসাবার জন্য একটা জায়গা ঠিক করে রেখেছেন। সব পরিকল্পনায় এই রকম আচমকা বাধা পড়ায় তিনি অনুভব করলেন লজ্জা আর রাগের একটা মিশ্র অনুভূতি।

কর্নেল-গিন্নি ছোট্ট একটা ঘুম লাগালেন। ঘুম ভাঙার পর কর্নেল-গিন্নি দেখলেন, কর্নেল বারান্দায় বসে আছেন। 'এখন কী করছ?'—কর্নেল-গিন্নি প্রশ্ন করলেন।

'আমি ভাবছি',—কর্নেল বললেন।

'তাহলেই তো সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে আমরা নোট গুনতে পারব।'

বাস্তবিক কিন্তু বিকেলেই মোরগটাকে বেচে দেবেন বলে কর্নেল ঠিক করে ফেলেছেন। সাবাসের কথাও ভেবেছেন তিনি। যখন সে তার দপ্তরে একা থাকবে, বিজলি পাখাটার সামনে বসে সে যখন রোজকার ইঞ্জেকশন নেবে তখনই তিনি প্রসঙ্গটা তুলবেন। তিনি প্রস্তাবটা তৈরি করেই রেখেছেন।

'মোরগটাকে সঙ্গে নিয়ে যাও',—বেরোবার সময় গিন্নি তাঁকে পরামর্শ দিলেন। 'ওটাকে সামনা-সামনি দেখলে ভোজবাজির মতো কাজ হবে।' কর্নেল আপত্তি করলেন। প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে মরিয়াভাবে কর্নেল-গিন্নি তাঁর সঙ্গে সদর পর্যন্ত এলেন। 'ওর ওখানে যদি আস্ত সেনাবাহিনী বসে থাকে, তাতেও কিছুই এসে যায় না',—গিন্নি তাঁকে বললেন। 'তুমি ওর হাত পাকড়ে ধরবে। নশো পেসো হাতে না দেওয়া পর্যন্ত একবারও ছেড়ো না।'

'ওরা ভাববে আমরা বুঝি কোনও ডাকাতির মতলব আঁটছি।'

কর্নেল-গিন্নি এ কথায় পাত্তাই দিলেন না। 'মনে রেখো, মোরগের মালিক তুমি',—কর্নেল-গিন্নি আবারও বোঝালেন। 'মনে রেখো, ও নয়,—তুমিই ওকে অনুগ্রহ দেখাচ্ছ।'

'ঠিক আছে।'

সাবাস্ শোওয়ার ঘরে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছে। 'এই-ই আপনার সুযোগ, দোস্ত',—সাবাসের বউ কর্নেলকে বলল। 'ডাক্তার ওকে খামারে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। বিষ্যুৎবারের আগে ও ফিরবেই না।' কর্নেল দুই পরস্পরবিরোধী টানের সঙ্গে যুঝছিলেন। মোরগটাকে বিক্রি করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে ভাবছিলেন এক ঘণ্টা পরে এলেই হত। তা হলে আর সাবাসের সঙ্গে দেখা হত না।

'আমি না হয় অপেক্ষা করি',—কর্নেল বললেন। কিন্তু সাবাসের বউ জোর করল। সে তাঁকে সটান নিয়ে এল শোবার ঘরে। শোবার ঘরে সিংহাসনের মতো পালঙ্কটায় সাবাস্ আন্ডারওয়্যার পরে বসে আছে। তার মরা মরা চোখ দুটো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তার রোগীর পেচ্ছাপের শিশিটা গরম করা অবধি কর্নেল অপেক্ষা করলেন। তারপর ডাক্তার গরম পেচ্ছাপের গন্ধটা শুঁকে সাবাসের দিকে তাকিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যেন সব ঠিক আছে। 'ওকে গুলি করে না মারলে মরবে না',—কর্নেলের দিকে ফিরে ডাক্তার বলল। 'বড়লোকদের খতম করার পক্ষে বহুমূত্র একেবারে ঢিলেঢালা অসুখ।'

'তোমার ওই হতচ্ছাড়া ইনসুলিন ইঞ্জেকশনগুলো দিয়ে অনেক তো দেখলে',—নিটোল নিতম্বটা নাচাতে নাচাতে সাবাস্ বলল। 'কিন্তু আমি বাপু শক্ত আছি, সহজে ভাঙি না।' আর তারপর কর্নেলকে বলল,—'আরে এসো এসো, দোস্ত। বিকেলবেলায় তোমার খোঁজে গিয়ে টুপির ডগাটা পর্যন্ত দেখতে পাইনি।'

কর্নেল জবাব দিলেন—'আমি তো কখনওই টুপি পড়ি না, তাই কাউকে দেখে সেটা খুলতেও হয় না।'

সাবাস্ ধরাচুড়ো পরতে শুরু করল। রক্তের নমুনা ভরা একটা কাচের টিউব ডাক্তার কোটের পকেটে রাখল। তারপর ব্যাগের জিনিসগুলো ঠিক করে সাজাল। কর্নেল ভাবলেন ডাক্তার বুঝি চলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

'আমি যদি তুমি হতাম ডাক্তার, তবে দোস্তের কাছে হাজার পেসোর বিল পাঠাতাম',—কর্নেল বললেন। 'তা হলে ও ভেবে মরত না।'

'সে পরামর্শ আগেই দিয়েছি, আর তার জন্য অনেক লম্বা বিলও ধরিয়েছি',—ডাক্তার জবাব দেয়। 'বহুমূত্রের সেরা ওষুধ হল দারিদ্র্য।'

'এমন প্রেসক্রিপশনের জন্য ধন্যবাদ',—তার বিশাল ভুঁড়িটাকে একটা প্যান্টের মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করতে করতে সাবাস্ মন্তব্য করে।

'কিন্তু ও পরামর্শ আমি নেব না। তারপর বড়লোক হয়ে তোমার সর্বনাশ হোক আর কি!'—ডাক্তার দেখল তার নিজের দাঁতের প্রতিফলন তার ব্যাগের চকচকে তালাটায় দেখা যাচ্ছে। কোনওরকম অস্থিরতা না দেখিয়ে সে ঘড়ি দেখল। বুটজোড়া পরে নিয়ে সাবাস্ হঠাৎ ফিরল কর্নেলের দিকে। 'তারপর দোস্ত,—মোরগটার এখন কী হাল?'

কর্নেল বুঝতে পারলেন ডাক্তারও তাঁর জবাব শোনবার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তিনি দাঁতে দাঁত চাপলেন। 'তেমন কিছু নয়, দোস্ত',—মৃদু স্বরে কর্নেল বললেন। ওটা তোমার কাছে বেচতে এসেছি।'

'বেশ ভালো কথা, দোস্ত',—কোনও আবেগ না দেখিয়ে সে বলল। 'তোমার পক্ষে এটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।'

'ওসব ঝামেলার পক্ষে আমি বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছি',—ডাক্তারের অভেদ্য অভিব্যক্তির সামনে কর্নেল নিজের সিদ্ধান্তের যথার্থতা পেশ করার চেষ্টা করলেন। 'আমার বয়স যদি কুড়ি বছর কম হত, তা হলে আলাদা কথা ছিল।'

'আপনার বয়স চিরকালই কুড়ি বছর কম থেকে যাবে',—ডাক্তার বলল। '

হাঁফ ছাড়লেন কর্নেল। তিনি ভেবেছিলেন সাবাস্ কিছু বলবে। কিন্তু সাবাস্ কিছুই বলল না। সাবাস্ একটা চেন লাগানো চামড়ার জ্যাকেট গায়ে চাপাল। শোবার ঘর ছেড়ে বেরোবার জন্যে সে তৈরি।

'পুরোপুরি তোমার ইচ্ছে হলে আসছে হপ্তায় না হয় এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে, দোস্ত',—কর্নেল বললেন।

'আমিও ঠিক ও কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম',—সাবাস্ বলল। 'আমার হাতে এক মক্কেল আছে—সে হয়তো তোমাকে শ' চারেক পেসো দেবে। কিন্তু সেজন্যে বিষ্যুৎবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'কত দেবে?'—ডাক্তার জিজ্ঞেস করল।

'চার শো পেসো।'

'কে যেন বলছিল ওটার দাম আরও অনেক বেশি',—ডাক্তার বলল।

'তুমি নিজেই ন'শো পেসোর কথা বলছিলে',—কর্নেল বললেন। ডাক্তারের হতভম্ব ভাব দেখে তিনি যেন একটু বল পেয়েছেন। 'সারা তল্লাটে ও হল সবচেয়ে সেরা লড়িয়ে মোরগ।'

ডাক্তারের কথার উত্তর দিল সাবাস্। 'অন্য সময় হলে যে কেউ হেসে খেলে হাজার পেসো দিত। কিন্তু এখন, কেউই কোনও বাহাদুর মোরগকে নিয়ে ভয় পায়। সবসময়েই ভয় আছে যে রিং থেকে বেরিয়ে এলেই গুলি খেয়ে মরবে।' কর্নেলের দিকে সে হতাশ ভঙ্গিতে তাকাল। 'এই কথাটাই তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে চাইছিলাম, দোস্ত।'

কর্নেল ঘাড় নেড়ে বললেন—'বেশ।'

সাবাস্কে অনুসরণ করে তিনি হল্ঘরে এলেন। বসার ঘরে সাবাসের বউ ডাক্তারকে আটকেছে। সে একটা ওষুধ চাইছে। 'ওই যারা হঠাৎ এসে চড়াও হয় অথচ জানা নেই তারা আসলে কী,—তাদের জন্য একটা মোক্ষম দাওয়াই।'

কর্নেল দপ্তরে সাবাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সাবাস্ সিন্দুক খুলে সবগুলো পকেটে তাড়া তাড়া নোট ঠেসে কর্নেলের দিকে চারটে নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলল—'এই রইল ষাট পেসো।'

কর্নেল ডাক্তারের সঙ্গে নদীর ধারের ফিরিওয়ালাদের ঝুপড়িগুলো পেরিয়ে এলেন। বিকেলের ঠান্ডায় আবার সবকিছু জেগে উঠছে। সুতোর মতো সরু নদীর স্রোতে আখ বোঝাই একটা বজরা ভেসে চলেছে। কর্নেলের মনে হল ডাক্তার যেন অদ্ভুত-অভেদ্য হয়ে রয়েছে। 'আর তুমি,—তুমি কেমন আছ, ডাক্তার?'

ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকাল। 'যথাপপূর্বম্, মনে হয় ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'এই শীতকালটা',—কর্নেল বললেন। 'আমার ভেতরটা কামড়ে খায়।' ডাক্তার এমনভাবে তাকে তাকিয়ে দেখল যার মধ্যে পেশাদারী কৌতূহলের লেশমাত্র নেই। ঝুপড়িগুলোর সামনে বসা সব সিরিয়ানদের সঙ্গে সে একে একে করমর্দন করল। ডাক্তারখানার দরজায় দাঁড়িয়ে কর্নেল মোরগটা বেচার বিষয়ে নিজের মতটা বললেন।

'আর কিছুই আমার করার ছিল না',—তিনি বোঝালেন। 'হতভাগা মানুষের মাংস খেয়ে বাঁচে।'

'মানুষের মাংস খেয়ে যে বাঁচে সে হল, সাবাস্',—ডাক্তার বলল। 'আমি ঠিক জানি মোরগটাকে ও ন'শো পেসোয় বেচবে।'

'তোমার তা-ই মনে হয়?'

'মনে হয় না, আমি জানি',—ডাক্তার বলল। 'মেয়রের সঙ্গে ওর বিখ্যাত দেশপ্রেমিক চুক্তির মতোই এ ব্যাপারটা।' কর্নেল বিশ্বাস করতে অসম্মত হলেন।

'আমার দোস্ত শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাতেই চুক্তিটা করেছিল',—তিনি বললেন।

'শুধু এটা করেই ও শহরে থাকতে পেরেছে।'

'এইভাবেই ও অর্ধেক দামে নিজের দলের সহযোদ্ধাদের সব সম্পত্তির দখল নিতে পেরেছে যাদের মেয়র লাথি মেরে তাড়িয়েছিল',—ডাক্তার উত্তর দেয়। পকেট হাতড়ে চাবি না পেয়ে সে ডাক্তারখানার দরজার কড়া নাড়ল। তারপরে কর্নেলের অবিশ্বাসের মুখোমুখি হল ডাক্তার। 'অতটা সরল হবেন না',—সে পরামর্শ দেয়। 'নিজের প্রাণের চেয়েও সাবাস্ পেসোর নোটকে বেশি ভালোবাসে।'

রাতে কেনাকাটায় বেরোলেন কর্নেলের স্ত্রী। কর্নেল তাঁর সঙ্গে সিরিয়ানদের ঝুপড়িগুলো পর্যন্ত

গেলেন। ডাক্তারের কথাগুলো তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। 'এখুনি ছোঁড়াগুলোকে ডেকে বলো যে মোরগটা বেচে দিয়েছ,'—কর্নেল-গিন্নি তাঁকে বললেন। 'ওদের মিথ্যে আশায় রাখা ঠিক হবে না।'

'সাবাস্ ফিরে না আসা পর্যন্ত মোরগটা বিক্রি হবে না'—কর্নেল উত্তর দিলেন।

বিলিয়ার্ডের আখড়ায় গিয়ে কর্নেল দেখলেন আলভারো রুলেটের চাকা নিয়ে জুয়া খেলছে। রবিবার রাতে আড্ডাটা গমগম করে। এখানে ভীষণ গুমোট লাগে, বিশেষ করে পুরোদমে রেডিওটা যখন গাঁকগাঁক করতে থাকে। একটা মস্ত কালো অয়েল ক্লথের ওপর জ্বলজ্বলে রঙে সংখ্যা লেখা আর টেবিলের মাঝখানটায় একটা বাক্সের ওপর একটা হ্যাজাক জ্বলছে। কর্নেলের মজা লাগল। আলভারো তেইশ নম্বরে বাজি ধরে হারবে বলে পণ করে বসে আছে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে খেলাটা দেখতে দেখতে কর্নেল লক্ষ করলেন ন'-টা চক্করের মধ্যে চার চারবার এগারো নম্বর জিতেছে। 'এগারো নম্বরে বাজি ধরো',—আলভারোর কানে কানে তিনি ফিসফিস করলেন। 'ওই নম্বরটাই বেশি উঠছে।'

আলভারো টেবিলটাকে নিরীক্ষণ করল। পরের চক্করে সে কোনও বাজি ধরল না। সে পকেট থেকে কিছু নোট বার করল সঙ্গে একটা কাগজ। টেবিলের তলা দিয়ে কাগজটা সে কর্নেলের হাতে চালান করে দিল। 'আগুস্তিনের কাছ থেকে এসেছে,'—সে বলল। কর্নেল গোপন চিরকুটটা পকেটে পুরলেন। আলভারো এগারো নম্বরে বিরাট বাজি ধরল।

'অল্প দিয়ে শুরু করো',—কর্নেল বললেন। 'এবার হয়তো কেল্লা মেরে দেব',—আলভারো জবাব দিল। পাশের অনেক খেলোয়াড়ও অন্য নম্বরের বদলে এগারোতেই বাজি ধরল। ততক্ষণে বিশাল চাকাটা ঘুরতে শুরু করেছে। কর্নেলের কেমন দম আটকে এল। জীবনে এই প্রথমবার তিনি জুয়া খেলার মোহ, উত্তেজনা আর তিক্ততা অনুভব করলেন। জিতল পাঁচ নম্বর।

'আমি দুঃখিত',—লজ্জায় মাথাটা নামিয়ে নিয়ে কর্নেল আস্তে আস্তে বললেন। কাঠের হাতাটা আলভারোর সব কটা পেসো ছিনিয়ে নিয়ে গেল। একটা বীভৎস গ্লানিবোধ হচ্ছে। 'অজানা বিষয়ে নাক গলিয়েই আমার এরকম হয়।'

আলভারো তাঁর দিকে না তাকিয়েই মৃদু হাসল। 'মিথ্যে ভাববেন না, কর্নেল। ভালোবাসার উপর আস্থা রাখুন।'

যে শিঙাগুলো একটা ম্যাম্বোর সুর বাজাচ্ছিল সেগুলো হঠাৎ থেমে গেল। জুয়াড়িরা মাথার উপর হাত তুলে যে যেদিকে পারে ছিটকে গেল। কর্নেল একটা শুকনো তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনলেন। মুখর, ঠান্ডা, তীক্ষ্ণ আওয়াজ। তাঁর পিঠে কে যেন রাইফেলের নল ঠেকাল। বুঝতে পাবলেন যে তিনি পুলিশের হামলায় এসে পড়েছেন। পকেটে ওই গোপন চিরকুট। হাত না তুলেই তিনি অর্ধেক ঘুরলেন। আর তারপর তিনি তাকে এই প্রথমবার দেখলেন যে তাঁর ছেলেকে গুলি করেছিল। লোকটা ঠিক তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। রাইফেলের নলটা কর্নেলের পেটে ঠেকানো। বেঁটেখাটো লোকটাকে, (রেড) ইন্ডিয়ানদের মতো দেখতে। রোদে-জলে পাকা চামড়া আর একটা শিশুর মতো তার নিঃশ্বাস। কর্নেল দাঁতে দাঁত চেপে, আস্তে করে রাইফেলের নলটা আঙুলের ডগা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। 'আমায় ক্ষমা করবেন,'—কর্নেল ধরে ধরে শান্তস্বরে বললেন।

দুটো গোল কুৎকুতে বাদুড়ের মতো চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। এক ঝলকের মধ্যে মনে হল চোখ দুটো তাঁকে খেয়ে ফেলছে, চিবিয়ে হজম করে ফেলছে আর পরক্ষণেই আবার উগরে দিচ্ছে। 'আপনি যেতে পারেন, কর্নেল।'

মাসটা যে ডিসেম্বর তা বুঝবার জন্য জানালা খোলার দরকার হয় না। রান্নাঘরে মোরগের সকালের খাবারের জন্য ফল কাটতে কাটতে হাড়ে-মজ্জায় বিষয়টা টের পেলেন কর্নেল। তারপর দরজা খুললেন। বারান্দার দৃশ্যটা তাঁর অনুভূতিকে সমর্থন করল। বারান্দাটা চমৎকার দেখাচ্ছে। ঘাস, গাছপালা, আর ছোট্ট পায়খানাটা যেন স্বচ্ছ হাওয়ায় মাটি থেকে এক মিলিমিটার ওপরে উঠে গিয়ে শূন্যে ভাসছে।

কর্নেল-গিন্নি বেলা ন'টা পর্যন্ত বিছানাতেই শুয়ে রইলেন। যখন তিনি অবশেষে রান্নাঘরে হাজিরা

দিলেন কর্নেল ততক্ষণে ঘরদোর সাফ করে মোরগের চারপাশে ঘিরে বসা বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলছেন। উনুনের কাছে যাবার জন্য কর্নেল-গিন্নিকে একটু ঘুরে যেতে হল।

'চোখের সামনে থেকে দূর হ',—কর্নেল-গিন্নি চ্যাঁচালেন। জ্বলন্ত চোখে তিনি তাকালেন মোরগটার দিকে। 'অলক্ষুণে পাখিটাকে যে কবে বিক্রি করতে পারব,—জানি না।'

মোরগের ওপর দেখানো স্ত্রীর বদমেজাজকে কর্নেল কোনও আমলই দিলেন না। মোরগকে নিয়ে রাগ করার কিছু নেই। সে এখন লড়াইয়ের কায়দা শেখার জন্য তৈরি। গলা, পালক বসানো লালচে উরু, করাতের মতো ঝুঁটি,—সব মিলিয়ে দীঘল চেহারার পাখিটাকে কেমন যেন অসহায় লাগছে।

'মোরগটার কথা ভুলে গিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দ্যাখো',—বাচ্চারা চলে গেলে কর্নেল বললেন। 'এ রকম একটা সকালবেলার ছবি তুলতে ইচ্ছে করে'।

কর্নেল-গিন্নি জানালা দিয়ে ঝুঁকে তাকালেন বটে, কিন্তু মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। 'গোলাপ গাছ লাগালে হয়,'—উনুনের কাছে ফিরে যেতে যেতে তিনি বললেন। কর্নেল দাড়ি কামাবার জন্যে আয়নাটা টাঙালেন।

'ইচ্ছে করলে গোলাপ গাছ লাগাও,'—তিনি বললেন। আয়নাটার দুলুনির সঙ্গে কর্নেল তাল রাখার চেষ্টা করলেন।

'শুয়োরগুলো গোলাপ খেয়ে ফ্যালে',—কর্নেল-গিন্নি বললেন।

'সে তো আরও ভালো',—কর্নেল বললেন। 'গোলাপফুল খেয়ে মোটা হওয়া শুয়োর খেতে নিশ্চয়ই ভীষণ ভালো।'

আয়নার মধ্যে তাকিয়ে কর্নেল স্ত্রীকে খুঁজলেন। এখনও মুখে সেই বদহজমটা লেগে আছে। উনুনের আঁচে তাঁর মুখটাকে আগুনের মতোই গনগনে দেখাচ্ছে। অজান্তেই কর্নেলের চোখ আয়নার মধ্যে দিয়ে স্ত্রীর মুখে আটকে গেল। এত বছর যেমনভাবে কামিয়ে এসেছেন ঠিক তেমনি ভাবেই কর্নেল হাত বুলিয়ে দাড়ি কামালেন।

তাঁর স্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে কী যেন ভাবছেন। 'কিন্তু আমি গোলাপ গাছ লাগাতে চাই না',—কর্নেল-গিন্নি বললেন।

'বেশ',—কর্নেল বললেন। 'তবে লাগিও না।'

তাঁর ভালো লাগছে। ডিসেম্বর তাঁর পেটের ভেতরের গাছগাছড়াগুলোকে শুকিয়ে কুঁচকে দিয়েছে। নতুন জুতোজোড়া পায়ে গলাতে গিয়ে তাঁর আশাভঙ্গ হল। কয়েকবার চেষ্টার পর তিনি বুঝতে পারলেন,—বৃথা চেষ্টা। পেটেন্ট চামড়ার জুতোজোড়াই তিনি পরলেন। বদলটা লক্ষ্য করলেন তাঁর স্ত্রী।

'নতুন জুতোটা যদি কখনও না-ই পরো, তবে আঁট ভাবটা কাটবে কী করে?'—কর্নেল-গিন্নি বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

'ওটা তো খোঁড়াদের জুতো',—কর্নেল প্রতিবাদ জানালেন। 'একমাস পরার পর ঢিলে করা জুতোই ওদের বিক্রি করা উচিত।'

আজ কেন যেন তাঁর মনে হচ্ছে বিকেলবেলায় চিঠিটা আসবে—আলোয় ভরা এমন একটা ভাবনা নিয়েই তিনি রাস্তায় বেরোলেন। এখনও লঞ্চ আসার সময় হয়নি। সাবাসের দপ্তরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু সাবাসের লোকেরা তাঁকে জানাল সোমবারের আগে সে ফিরবে না। এই অবস্থাটা তিনি আশা করেননি। কিন্তু তাই বলে তিনি সব আশাকে বিসর্জন দিলেন না। 'আগে হোক, পরে হোক, আসতে তো তাকে হবেই',—নিজেকে তিনি বোঝালেন। তারপর নদীর ঘাটের দিকে চললেন। মুহূর্তটা চমৎকার। এখনও নিষ্কলুষ প্রাঞ্জলতায় পরিপূর্ণ এক মুহূর্ত।

'সারা বছরটাই ডিসেম্বর হওয়া উচিত',—সিরিয়া থেকে আসা মোজেসের দোকানে বসে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন তিনি। 'নিজেকে যেন কাচে তৈরি বলে মনে হয়।'

মোজেস্ প্রায় ভুলে যাওয়া আরবিতে নিজের ভাবনাকে তর্জমা করবার একটা চেষ্টা করল। সে এক গোবেচারা আরব। কান অবধি মসৃণ ছিমছাম চামড়ায় মোড়া। তার নড়াচড়ার ভঙ্গি সবসময় কেমন

যেন একটা ডুবন্ত মানুষের মতো। সত্যি বলতে কী, তাকে দেখেই মনে হয়, এই বুঝি তাকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

'আগে তো তাই ছিল',—সে বলল। 'এখনও যদি আগের মতো হত, তো আমার বয়স হত আটশো সাতানব্বই বছর। আর আপনার?'

'পঁচাত্তর',—কর্নেল বললেন। তাঁর চোখ পোস্টমাস্টারের পিছু নিয়েছে। আর তখনই তিনি সার্কাসটা আবিষ্কার করলেন। একগাদা রঙিন জিনিসের মাঝখানে ডাক লঞ্চের ছাতের ওপর তালি লাগানো তাঁবুটা চিনতে পারলেন তিনি। এক ঝলকের জন্য তিনি চোখ থেকে হারালেন পোস্টমাস্টারকে। অন্যান্য লঞ্চের ওপর বড় বড় খাঁচায় জানোয়ারগুলোকে তাঁর চোখ খুঁজে বেড়াল। তাদের তিনি খুঁজে পেলেন না।

'সার্কাস',—তিনি বললেন। 'দশ বছরে এই প্রথম একটা সার্কাস এল।' মোজেস্ তাঁর খবরটা যাচাই করে দেখল। ভাঙা ভাঙা আরবি আর স্প্যানিশ মিশিয়ে সে তাঁর বউকে কী যেন বলল। বউটা দোকানেব পেছন থেকে উত্তর দিল। সে নিজের মনেই কী যেন একটা মন্তব্য করল। তারপর কর্নেলকে তাঁর উদ্বেগটা তর্জমা করে বোঝাল।

'আপনার বিড়ালটা লুকিয়ে রাখুন কর্নেল। ছেলেরা নয়তো সেটাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে সার্কাসওয়ালার কাছে বেচে দেবে।' কর্নেল পোস্টমাস্টারের পিছু নেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। 'এ কোনও বুনো জানোয়ারের খেলা নয়',—তিনি বললেন।

'তাতে কিছু এসে যায় না',—সিরিয়ার মোজেস্ বলল। 'যাবা দড়ির ওপর হাঁটে, পড়ে গিয়ে হাড়গোড় যাতে না-ভাঙে, সে'জন্যে তারা বিড়াল খায়।'

পোস্টমাস্টারকে অনুসরণ করে ঘাটের ঝুপড়িগুলো পেরিয়ে তিনি প্লাজায় এসে পড়লেন। সেখানে মোরগের লড়াইয়ের বিকট চ্যাঁচামেচি তাঁকে তাজ্জব করে দিল। কে একজন পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাঁর মোরগটা সম্বন্ধে কী একটা মন্তব্য করল। শুধু তখনই মনে পড়ল আজই মহড়ার দিন।

ডাকঘর পেরিয়ে এলেন তিনি। পরক্ষণেই তিনি রিঙের ক্ষ্যাপা আবহাওয়ার মধ্যে পুরোপুরি ডুবে গেলেন। তিনি দেখলেন রিঙের মাঝখানে তাঁর আদরের মোরগ দাঁড়িয়ে আছে। একা অসহায়। ছেঁড়া কাপড়ে বাঁধা তার পায়ের কাতান আর তার পা যেভাবে কাঁপছে তাতে ভয়ের মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। একটা বিষণ্ণ ছাইরঙা মোরগ তার প্রতিদ্বন্দ্বী। কর্নেলের কোনও অনুভূতিই হল না। পর পর অনেকগুলো আক্রমণ হল। একই ভঙ্গিতে, একই রকম। এক সোৎসাহ জয়ধ্বনির মধ্যে ঝলকের জন্য পালক, পা আর ঘাড়ে মাখামাখি। পাটাতনের বেড়ায় ঘা খেয়ে একটা ডিগবাজি দিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বী লড়াইতে ফিরে এল। কর্নেলের মোরগ তাকে আক্রমণ করল না। সে শুধু সব হামলাকে ঠেকাল। প্রতিদ্বন্দ্বী ঠিক একই জায়গায় পড়ে গেল। এখন আর কর্নেলের মোরগের পা কাঁপছে না।

এরনান বেড়াটা টপকে রিঙে নেমে পড়ল। দু'হাতে তাকে তুলে ধরে চারপাশের ভিড়কে দেখাল। হাততালি আর জয়ধ্বনির সে কী তুলকালাম বিস্ফোরণ। লড়াইয়ের তীব্রতা আর জয়ধ্বনির উৎসাহের মধ্যেকার ফারাকটা কর্নেল লক্ষ্য করে দেখলেন। পুরো ব্যাপারটাকে তাঁর একটা প্রহসন বলে মনে হল। স্বতঃস্ফূর্ত ও সচেতনভাবে মোরগরাও যেন নিজেদের বাঁধা দিয়ে দিয়েছে।

একটু নাক সিঁটকানো কৌতূহলের খোঁচায় তিনি গোল রিংটাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। উত্তেজিত একটা ভিড় রিংয়ের দিকে নেমে আসছে। তপ্ত, উৎকণ্ঠিত, ভীষণ সজীব মুখগুলোকে কর্নেল খুঁটিয়ে দেখলেন। এরা নতুন লোক। শহরে নবাগত। অলক্ষুণে আশঙ্কার সঙ্গে তাঁর স্মৃতির কিনারা থেকে মুছে যাওয়া একটা মুহূর্ত যেন আবার তাঁর মধ্যে সজীব হয়ে উঠেছে। তারপর তিনি বেড়া টপকে, ভিড় ঠেলে এগিয়ে রিঙের দিকে গেলেন। আর এর...নের শান্ত চোখ দুটির সঙ্গে তাঁর চোখাচুখি হল। চোখের পাতা না ফেলে তাঁরা পরস্পরকে তাকিয়ে দেখলেন।

'স্বাগতম, কর্নেল।' তার হাত থেকে মোরগকে নিয়ে কর্নেল মৃদুস্বরে বললেন—'ধন্যবাদ'। এবং আর কিছুই তিনি বললেন না কারণ প্রাণীটার উষ্ণ গভীর বুকের শব্দ তাঁর মধ্যে শিহরন তুলে দিয়েছে। তাঁর মনে হল আগে কখনও এমন কোনও জীবন্ত জিনিস তিনি হাতে করে নেননি। এরনান একটু ভ্যাবাচ্যাকা

খেয়ে বলল,—'আপনি বাড়ি ছিলেন না।'

এক নতুন জয়ধ্বনি তাঁকে থমকে দিল। কর্নেলের কেমন ভয় করল। আবার তিনি ভিড় ঠেলে কারও দিকে না তাকিয়েই এগোলেন। হাততালি আর জয়ধ্বনি তাঁকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। তারপর মোরগটাকে কোলে নিয়ে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।

সারা শহর ভেঙে যত গরিবগুর্বো লোক তাঁকে দেখতে বেরিয়ে এল। রাস্তা দিয়ে কর্নেল চলেছেন। পেছনে বাচ্চাদের পাল। এক অতিকায় নিগ্রো একটা টেবিলের ওপর দাঁড়িয়েছিল। গলায় একটা সাপ জড়িয়ে কোনও লাইসেন্স ছাড়াই সে প্লাজায় দাঁড়িয়ে জড়িবুটি বিক্রি করছে। ঘাট থেকে ফেরা এক মস্ত জটলা দাঁড়িয়ে তার বাকতাল্লা শুনছে। কিন্তু কর্নেল যখন মোরগকে কোলে নিয়ে চলে গেলেন লোকের মনোযোগ পড়ল তাঁর ওপর। বাড়ি ফেরার রাস্তাটা আগে কোনওদিনই এমন লম্বা ঠেকেনি।

তাঁর কোনও খেদ নেই। দীর্ঘদিন ধরে শহরটা যেন ঝিম মেরে পড়েছিল। দশ বছরের ইতিহাস শহরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছিল। সেই বিকেলে, চিঠিবিহীন আরও একটা শুক্রবারে, নিঝুমপুরীতে সব লোক যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে। অন্য এক যুগের কথা কর্নেলের মনে পড়ে গেল। নিজেকে তিনি একটা ছাতার তলায় দেখতে পেলেন। বৃষ্টি সত্ত্বেও ছেলেকে নিয়ে সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে একটা খেলা দেখছেন। তাঁর মনে পড়ে গেল দলের নেতাদের কথা। নিখুঁত সাজপোশাক পরে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাজনার তালে তালে পাখা দিয়ে তাঁরা নিজেদের হাওয়া করে যাচ্ছেন। তাঁর পেটের নাড়িভুঁড়ির মধ্যে পেতলের ঢাকের শব্দটা আবার যেন কাতরভাবে তিনি অনুভব করলেন।

ঘাটের সমান্তরাল রাস্তাটা ধরে তিনি হাঁটছেন। আর সেখানেও কতকাল আগেকার ভোটের দিনের মতো উত্তেজিত মানুষজন দেখতে পেলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সার্কাস দলের নামা দেখছে সকলে। একটা তাঁবুর মধ্যে থেকে কে একটা মেয়ে তাঁর মোরগ সম্বন্ধে চেঁচিয়ে কী যেন বলল। তিনি বাড়ির দিকে হেঁটে চললেন। আত্মমগ্ন। ছেঁড়া ছেঁড়া ছড়ানো কথা এখনও কানে আসছে যেন রিঙের মধ্যেকার জয়ধ্বনির রেশ এখনও তাড়া করে আসছে তাঁকে।

বাড়ির দরজায় এসে বাচ্চাদের তিনি বললেন,—'তোরা সব বাড়ি যা। যে ভেতরে আসবে তাকে আচ্ছা করে ঠ্যাঙানি দেব।'

তিনি দরজার খিল লাগিয়ে সোজা রান্নাঘরে চলে গেলেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কর্নেল-গিন্নি বললেন,—'কতবার বললাম—আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, কেউ মোরগকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না'।

কর্নেল উনুনের পায়ার সঙ্গে মোরগকে বাঁধলেন। জল পালটিয়ে দিলেন বাটিটায়। স্ত্রীর কাতর কণ্ঠস্বর তাঁকে তাড়া করে ফিরছে। 'ওরা বলল আমার মৃতদেহ মাড়িয়েই নিয়ে যাবে',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। 'ওরা বলল এই মোরগটা নাকি আমাদের নয়, সারা শহরের।'

যখন মোরগের সেবা-যত্ন শেষ হল শুধু তখনই কর্নেল স্ত্রীর মুখোমুখি হলেন। অবাক না হয়েই তিনি আবিষ্কার করলেন, যে তাঁর মধ্যে অনুতাপ বা অনুকম্পা কিছুরই কোনও অনুভূতি নেই।

'ওরা ঠিকই করেছিল',—শান্তস্বরে তিনি বললেন। আর তারপর নিজের পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে তল খুঁজে পাওয়া যায় না এমন এক মধুর সুরে বললেন,—'ওকে বিক্রি করা হবে না।'

কর্নেল-গিন্নি তাঁকে অনুসরণ করে শোবার ঘরে এলেন। স্বামীকে তাঁর পুরোপুরি একটা মানুষ বলে মনে হল। কিন্তু যেন ধরা ছোঁয়া যায় না এমন এক মানুষ, যেন সিনেমার পর্দায় তাঁকে দেখেছেন তিনি। কর্নেল জামা রাখার খুপরিটা থেকে এক তাড়া নোট বের করে নিলেন। তার সঙ্গে নিজের পকেটে যা কিছু ছিল যোগ করে পুরোটা গুনলেন। তারপর সব আবার খুপরিটায় রেখে দিলেন।

'সাবাস্‌কে ফিরিয়ে দেবার জন্য উনত্রিশ পেসো রয়েছে',—তিনি বললেন।

'পেনশন যখন আসবে, বাকিটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

'আর যদি তা না আসে?'—কর্নেল-গিন্নির প্রশ্ন।

'আসবেই।'

'কিন্তু যদি না আসে?'

'তা হলে বাকিটা ও পাবে না।'

নতুন জুতোজোড়াকে খাটের তলায় খুঁজে পাওয়া গেল। জুতোর বাক্সটা বের করে আনলেন খুপরিটা থেকে। জুতোর তলাটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছলেন। তারপর জুতোজোড়া বাক্সে ভরে দিলেন,—ঠিক যেরকমভাবে রবিবার রাতে তাঁর স্ত্রী জুতোজোড়া কিনেছিলেন। কর্নেল-গিন্নি একবারও নড়লেন না।

'জুতোজোড়াও ফিরে যাবে'—কর্নেল বললেন। 'দোস্তের জন্য আরও পনেরো পেসোর ব্যবস্থা হল।'

'ওরা আর ফিরিয়ে নেবে না',—কর্নেল-গিন্নি বললেন।

'নিতেই হবে',—কর্নেল উত্তর দিলেন। 'আমি শুধু দুবার পায়ে দিয়েছি।'

'তুর্কিদের মগজে ওসব কথা ঢোকে না।'

'ঢোকাতেই হবে।'

'আর যদি না ঢোকে?'

'তবে ঢুকবে না।'

না খেয়েই দুজনে শুয়ে পড়লেন। স্ত্রীর জপ শেষ হওয়া পর্যন্ত কর্নেল অপেক্ষা করলেন। তারপর বাতি নিভিয়ে দিলেন। কিন্তু ঘুম এল না। সিনেমার শো শেষ এবং শুরুর ঘণ্টার শব্দ কানে এল আর সঙ্গে সঙ্গে যেন তিন ঘণ্টার পরের কারফিউয়ের ভেরি বাজল। রাতের হিমেল হাওয়াতে স্ত্রীর বুকের ঘরঘরানি কেমন যন্ত্রণাময় শোনাল। কর্নেলের দু' চোখ খোলা। কর্নেল-গিন্নি শান্তস্বরে, সান্ত্বনার সুরে প্রশ্ন করলেন,—'তুমি জেগে আছ?'

'হ্যাঁ।'

'একটু যুক্তি দিয়ে বুঝে দেখার চেষ্টা কর',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। 'কালকেই সাবাসের সঙ্গে কথা বল।'

'ও সোমবারের আগে ফিরবে না।'

'আরও ভালো, তাহলে তো ওকে কী বলবে তা ভাববার জন্যে তুমি তিন তিনটে দিন পেয়ে যাচ্ছ।'

'কিছুই ভাবার নেই,'—কর্নেল বললেন।

অক্টোবরের বীভৎস গুমোটের বদলে হাওয়ায় লেগে আছে বেশ একটা মধুর হিমেল আমেজ। পরিযায়ী পাখিদের উপস্থিতির মধ্যে কর্নেল আবার ডিসেম্বরকে চিনতে পারলেন। রাত দু'টো বাজল। এখনও তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারেননি। কিন্তু তিনি এটাও জানেন যে তাঁর স্ত্রীও জেগে আছেন। তিনি দোলনায় পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করলেন।

'তুমি ঘুমোতে পারছ না',—স্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

'না।'

তাঁর স্ত্রী এক ঝলক ভাবলেন। 'অমন করার মতো অবস্থা আমাদের নয়',—স্ত্রী বললেন। 'শুধু একবার ভাবো, এক সঙ্গে চার-চারশো পেসো।'

'পেনশন আসতে আর দেরি নেই',—কর্নেল বললেন।

'পনেরো বছর ধরে এই একই কথা বলে চলেছ।'

'সেই জন্যেই',—কর্নেল বললেন। 'আর বেশি দেরি হবে না।'

স্ত্রী চুপ করে গেলেন। কিন্তু আবার যখন তিনি কথা বললেন, কর্নেলের মনে হল কথার ফাঁকে সময় যেন এক মুহূর্তও এগোয়নি। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ওটা কখনও আসবে না',—কর্নেল-গিন্নি শান্ত স্বরে বললেন।

'আসবে।'

'আর যদি না আসে?'

উত্তর দেবার জন্য কথা খুঁজে পেলেন না কর্নেল। মোরগের প্রথম ডাকে বাস্তব তাঁকে আঘাত করল।

কিন্তু তিনি আবার একটা ঘন, নিরাপদ, অনুতাপহীন ঘুমে তলিয়ে গেলেন। যখন তাঁর ঘুম ভাঙল সূর্য ততক্ষণে আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে। তাঁর স্ত্রী তখনও ঘুমোচ্ছেন। কর্নেল নিয়মমাফিক সকালবেলার কাজগুলো সব এক এক করে সারলেন। অবশ্য সব কাজই দু' ঘণ্টা পেছিয়ে আছে। আর অপেক্ষা করতে লাগলেন স্ত্রী কখন জাগবেন। জেগে উঠে কর্নেল-গিন্নি আদৌ কোনও কথা বলতে চাইলেন না। তাঁরা 'সুপ্রভাত' উচ্চারণ করেই শান্তভাবে খেতে বসে গেলেন।

কর্নেল এক পেয়ালা কালো কফিতে চুমুক দিচ্ছেন। এক টুকরো পনির আর মিষ্টি রোলও খেয়েছেন। সকালের বাদবাকি সময়টুকু তিনি দর্জির দোকানে কাটিয়ে দিলেন। একটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখেন বেগনিয়ার ঝাড়ের মধ্যে বসে স্ত্রী জামাকাপড় রিফু করছেন।

'খাবার সময় হল',—কর্নেল বললেন।

'কোনও খাবার নেই।'

কর্নেল কাঁধ ঝাঁকালেন। বারান্দার দেওয়ালের ফোকরগুলো তিনি বুজিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন যাতে বাচ্চারা রান্নাঘরে ঢুকতে না পারে। হলঘরে ফিরে দেখলেন টেবিলে খাবার অপেক্ষা করছে।

খেতে খেতে কর্নেল বুঝতে পারলেন তাঁর স্ত্রী কান্নায় ভেঙে না পড়ার জন্যে ভীষণ চেষ্টা করছেন। সেটা অবশ্যই তাঁকে আতঙ্কিত করে তুলল। তিনি তাঁর স্ত্রীর ধাত জানেন। স্বভাবতই তা কঠিন। আর চল্লিশ বছরের তিক্ততায় স্বভাবটা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। ছেলের মৃত্যুও তাঁর মধ্যে থেকে একফোঁটা চোখের জল নিংড়ে বার করতে পারেনি।

তিনি সোজাসুজি তিরস্কারের দৃষ্টিতে স্ত্রীর চোখের দিকে তাকালেন। কর্নেল-গিন্নি ঠোঁট কামড়ে জামার হাতায় চোখের জল মুছলেন। তারপর খেতে লাগলেন। 'তোমার কোনও বিবেচনা নেই',—কর্নেল-গিন্নি মন্তব্য ছুঁড়লেন। কর্নেল কোনও কথা বললেন না।

'তুমি স্বেচ্ছাচারী, জেদি, অবিবেচক',—কর্নেল-গিন্নি আবার বললেন। রেকাবির ওপর ছুরি আর কাঁটা আড়াআড়ি করে রাখলেন তিনি। কিন্তু পরক্ষণেই কুসংস্কারবশত সেগুলো আলাদা করে রেখে ভুলটা শোধরালেন। 'সারাজীবন ধরে নোংরা খেয়ে শেষে দেখলাম, একটা মোরগের চেয়েও আমার কথা কেউ কম ভাবে।'

'এটা আলাদা বিষয়',—কর্নেল বললেন।

'একই কথা',—কর্নেল-গিন্নি জবাব দিলেন। 'তোমার বোঝা উচিত যে আমি মরতে বসেছি। এই যে অসুখটা, আসলে কোনও অসুখই নয়, তিলে তিলে মৃত্যু।'

কর্নেল খাওয়া শেষ না করে আর একটা কথাও বললেন না। 'ডাক্তার যদি গ্যারান্টি দিতে পারে যে মোরগটা বিক্রি করলেই তোমার হাঁপানি সেরে যাবে, আমি তবে এক্ষুনি ওটাকে বিক্রি করে দেব',—কর্নেল বললেন। 'কিন্তু তা যদি না হয়,—হবে না।'

সেদিন বিকেলে মোরগটাকে তিনি রিঙের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন স্ত্রীর আবার হাঁপানির টান উঠছে। হলের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত কর্নেল-গিন্নি পায়চারি করছেন। একরাশ খোলা চুল পিঠে এলিয়ে আছে। হাত দুটো দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ফুসফুসের অন্তস্থল থেকে দম ফেলার চেষ্টা করছেন। সন্ধে হওয়া অবধি স্ত্রী ওখানেই রইলেন। তারপর স্বামীর সঙ্গে একটা কথাও না বলে তিনি শুতে চলে গেলেন।

কারফিউ নামার একটু পর পর্যন্ত চলল তাঁর জপ। তারপর কর্নেল বাতি নেভাবার চেষ্টা করতেই তিনি বাধা দিলেন। 'আমি অন্ধকারে মরতে চাই না',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। কর্নেল বাতিটা মেঝেতে নামিয়ে রাখলেন। তাঁর কী রকম যেন অবসন্ন লাগতে শুরু করেছে। যদি সবকিছু একবার ভুলে যেতে পারতেন, যদি একটানা চুয়াল্লিশ দিন ঘুমিয়ে কাটাতে পারতেন, আর বিশে জানুয়ারি বেলা তিনটেয় জেগে উঠতে পারতেন ঠিক যখন রিঙের মধ্যে মোরগটাকে লেলিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু স্ত্রীর অনিদ্রা তাঁর মনে আশঙ্কা সৃষ্টি করল।

'সব সময়েই সেই একই কাশুন্দি',—কর্নেল-গিন্নি পরক্ষণেই শুরু করলেন। 'আমরা না খেয়ে থাকব,

যাতে অন্যেরা খেতে পারে। চল্লিশ বছর ধরে ওই একই গল্প।'

কর্নেল চুপ করে রইলেন। শেষটায় তিনি জেগে আছেন কিনা স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন। মসৃণ ঝরঝরে নিখুঁত স্বরে স্ত্রী বলে চললেন। 'মোরগ নিয়ে বাজি ধরে কেবল আমরা ছাড়া সবাই জিতবে। শুধু আমাদেরই বাজি ধরার মতো কিচ্ছু নেই।'

'মোরগের মালিক শতকরা কুড়ি ভাগ পাবে।'

'যখন তুমি ওদের জন্য ভোটের সময় পিঠটা ভেঙেছিলে তখনও তোমার একটা চাকরি পাবার কথা ছিল',—স্ত্রী উত্তর দিলেন। 'গৃহযুদ্ধের সময় যখন গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলে তখনও কথা ছিল যে যুদ্ধের পর তুমি একটা ভাতা পাবে। এখন সবাই যে যার আখের গুছিয়ে নিয়েছে, আর তুমি অনাহারে তিলে তিলে একা মরতে বসেছ।'

'আমি তো একা নই',—কর্নেল বললেন।

তিনি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলেন কিন্তু ঘুম তাঁকে দখল করে বসল। স্ত্রী একটানা কথা বলতে বলতে এক সময় টের পেলেন ঘুমিয়ে পড়েছেন কর্নেল। তখন একা মশারির তলা থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকারেই হল্‌ঘরে পায়চারি শুরু করলেন। সেখানেও তিনি একটানা কথা বলে চললেন। ভোরবেলায় কর্নেল তাঁকে ডাকলেন।

ভূতের মতো দরজায় এসে দাঁড়ালেন কর্নেল-গিন্নি। নিভু নিভু বাতির আলোয় খাটের তলার দিকটা দেখা যায়। মশারির ভেতর ঢোকবার আগে তিনি বাতি নিভিয়ে দিলেন। কিন্তু কথা তার থামল না। কর্নেল বাধা দিলেন। 'আমরা একটা কাজ করতে যাচ্ছি।'

'একমাত্র যা আমরা করতে পারি তা হল ওই নচ্ছার মোরগটাকে বেচে দেওয়া,'—কর্নেল-গিন্নি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

'আমরা ঘড়িটাও বিক্রি করে দিতে পারি।'

'ওরা ও ঘড়ি কিনবে না।'

'কালকেই আমি দেখব আলভারো চল্লিশটা পেসো দেবে কিনা।'

'দেবে না।'

'তাহলে আমরা ছবিটা বেচে দেব।'

তখন মশারির বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি আবার কথা বললেন। কর্নেল তাঁর ওষুধের গন্ধে ভরা নিঃশ্বাসের গন্ধ পেলেন।

'ওরা ও ছবি কিনবে?'—স্ত্রীর প্রশ্ন।

'দেখাই যাক!'—নরম সুরে কর্নেল বললেন। কণ্ঠস্বরে একফোঁটা পরিবর্তন নেই। 'এবার, ঘুমোতে যাও। কাল যদি কিছু বিক্রি করতে না পারি তো অন্য উপায় ভাবা যাবে।'

তিনি চোখ খুলে রাখবেন বলেই চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ঘুম তাঁর সংকল্পকে হারিয়ে দিল। তিনি যেন একটা কিছুর তলায় তলিয়ে গেলেন, কালের বাইরে একটা কিছু, যেখানে স্ত্রীর কথাগুলোর তাৎপর্য ভিন্ন রকম। কিন্তু পরক্ষণেই টের পেলেন তাঁর কাঁধ ধরে কেউ ঝাঁকাচ্ছে।

'কথা বল। জবাব দাও আমাকে।' কর্নেল ঠিক বুঝতে পারলেন না এ কথা তিনি কখন শুনলেন—স্বপনে না জাগরণে। ভোর হবে হবে করছে। রবিবারের সবুজ প্রাঞ্জলতায় জানালাটা দেখা যাচ্ছে। তাঁর মনে হল, জ্বর হয়েছে। তাঁর চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে এল। মাথার ভিতরটা সাফ করবার জন্য তাঁকে প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হচ্ছে।

'কিছু যদি বিক্রি করতে না পারি, কী করব আমরা?'—কর্নেল-গিন্নি আবার প্রশ্ন করলেন।

'ততদিনে বিশে জানুয়ারি এসে যাবে',—পুরোপুরি সজাগ অবস্থায় কর্নেল বললেন। 'সেদিন বিকেলেই ওরা শতকরা কুড়ি ভাগ বখরা দেবে।'

'যদি আমাদেরটা জেতে',—কর্নেল-গিন্নি বললেন। 'কিন্তু যদি ও হেরে যায়? ও যে হারতেও পারে, এটা তোমার মাথায় ঢোকেনি।'

'এ হচ্ছে এমন এক মোরগ যে কখনও হারে না।'

'কিন্তু ধর, ও হারল।'

'সে বিষয়ে ভাবার জন্য এখনও চুয়াল্লিশটা দিন আছে',—কর্নেল বললেন।

অবশেষে কর্নেল-গিন্নি ধৈর্য হারালেন। 'আর তদ্দিন আমরা কী খাব?'—তিনি জিজ্ঞেস করলেন। চেপে ধরলেন কর্নেলের ফ্লানেলের জামার কলার। জোরে ঝাঁকুনি দিলেন।

পলের পর পল—এই মুহূর্তটায় পৌঁছোতে কর্নেলের পঁচাত্তর বছর লাগল—তার জীবনের পঁচাত্তরটা বছর। তাঁর নিজেকে শুদ্ধ লাগল। প্রাঞ্জল লাগল। অপরাজেয় মনে হল। তখন তিনি জবাব দিলেন : 'গু।'

মূল শিরোনাম · El coronel no tiene quie le escriba.

মাকোন্দোতে বৃষ্টি দেখতে দেখতে ইসাবেলার একান্ত সংলাপ

রবিবার সকালে লোকজন গির্জা থেকে ফিরে আসার সময় শীত পড়ে গেল। শনিবার রাতেও ছিল দম বন্ধ করা গুমোট গরম। রবিবার ভোরেও বৃষ্টি হওয়ার কথা কেউ ভাবেনি। প্রার্থনা শেষে মেয়েরা ছাতা খোলার আগেই ভারী আর কালো হাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। ঘূর্ণি ঝড়টা এক ঝাপটায় মে মাসের যাবতীয় ধুলো, ময়লা, খড়কুটো ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিল। পাশ থেকে কেউ আমাকে বলল,—'জোলো হাওয়া'। এটা অবিশ্যি আমি আগেই জানতাম। গির্জা থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখার সময়ই পেটের ভেতর একটা চটচটে অনুভূতিতে আমি শিউড়ে উঠেছিলাম। এক হাতে টুপি আঁকড়ে আরেক হাতে রুমালটা নাকে-মুখে গুঁজে ধুলো-বালি আর হাওয়া আটকাতে আটকাতে পুরুষেরা আশপাশের বাড়িগুলোয় আশ্রয় নেওয়ার জন্যে ছুটছিল। তখন বৃষ্টি নামল। ধূসর আকাশে একটা থলথলে জিনিস আমাদের মাথার ঠিক ওপরে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল।

সকালের বাকি সময়টা সৎ-মায়ের সঙ্গে বারান্দায় রেলিঙের ধারে বসে মনের সুখে বৃষ্টি দেখলাম। একটানা সাত মাসের তীব্র গরমের জ্বালা ধরানো ধুলোর দাপট থেকে বাঁচবার জন্যে তৃষ্ণার্ত 'রোজ্‌মেরি' আর 'নার্ড' গাছগুলো প্রাণ ভরে বৃষ্টিতে ভিজছিল। দুপুর নাগাদ চারদিকের মাটিতে ছড়িয়ে পড়া বৃষ্টির প্রতিধ্বনি থেমে গেল আর সোঁদা মাটির গন্ধের সঙ্গে নবজন্ম পাওয়া ঘাসপাতা এবং রোজ্‌মেরি ফুলের সুগন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। দুপুরের খাওয়ার সময় বাবা বললেন,—'মে মাসের বৃষ্টি ভালো জোয়ারের ইঙ্গিত বয়ে আনে।' নতুন মরশুমের জেল্লা হাসিতে মিশিয়ে দিয়ে সৎ-মা বললেন,—'প্রার্থনার সময় আমি এটাই শুনেছিলাম।' বাবা এবার হাসলেন। দুপুরের খাওয়া-দাওয়াটা ভালোই হল। ভালোভাবে হজম হওয়ার জন্যে বারান্দার রেলিঙের ধারে গা এলিয়ে দিয়ে বাবা নিঃশব্দে ঝিমোতে লাগলেন। ঘুম নয়, যেন জেগে থেকেই স্বপ্ন দেখছেন।

সারাটা বিকেল একটানা বৃষ্টি হল। শান্ত ধারায় এবং একই মাত্রা ও ছন্দ বজায় রেখে হয়ে যাওয়া বৃষ্টির শব্দ শুনে মনে হয় রেলগাড়িতে চড়ে কোথাও যাওয়ার সময় পাশে যেন একটা ঝরনা বয়ে চলেছে। আমাদের নজর এড়িয়েই বৃষ্টি কিন্তু আমাদের বোধ-বুদ্ধির গভীরে প্রবেশ করল। উঠোন থেকে আসা হাড় কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়ার দাপট আটকাতে সোমবার ভোরবেলায় দরজা বন্ধ করার সময়ই টের পাওয়া গেল যে আমাদের চিন্তা-ভাবনা পুরোপুরি বৃষ্টিতে টইটম্বুর। আর সোমবার সকালে তা উপচে উঠল। সৎ-মায়ের সঙ্গে বাগানের হাল দেখতে গেলাম। এক রাতের বৃষ্টিতেই মে মাসের কঠিন-ধূসর মাটি সস্তার সাবানের মতো একটা ঘন-আঠালো পদার্থে পরিণত হয়েছে। ফুলের টবগুলো থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল উপচে পড়ছে। সৎ-মা বললেন,—'আমার মনে হয়, কাল রাতে টবগুলো প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি জল পেয়ে গেছে।' তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল আর সেটা আমার নজর এড়াল না। এক রাতেই আগের দিনের আনন্দ পরিণত হয়েছে এক ক্লান্তিকর শিথিলতায়। আমি বললাম,—'ঠিক বলেছ। বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত স্থানীয় জনজাতির কয়েকজন রেড ইন্ডিয়ানকে বারান্দায় রেখে দিলে বেশ ভালো হয়।' ওরা তাই করল। ততক্ষণে বৃষ্টি অন্য গাছগুলোর তুলনায় অনেক বড় একটা গাছের আকার ধারণ করেছে। রবিবার দুপুরের জায়গাটাই বাবা দখল করলেন, তবে তিনি বৃষ্টি নিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। বরং তিনি বললেন,—'পিঠের ব্যথায় কাল রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারিনি।' তিনি ওখানেই রেলিঙের ধারে বসে রইলেন ; পা দুটো একটা চেয়ারের ওপর তুলে দিয়ে মাথাটা এলিয়ে দিলেন শূন্য বাগানের দিকে। মধ্যাহ্নভোজন করলেন না। অবশেষে সন্ধে নাগাদ বললেন,—'মনে হচ্ছে, আকাশ আর পরিষ্কার হবে না।' আর আমার মনে পড়ে গেল গরমের দিনের কথা। অগস্ট মাসের সেই

একটানা আর বিরক্তিকর দিবানিদ্রায় যখন সময়ের ভারে আমাদের প্রায় ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থা, ঘামে জ্যাবজেবে জামাকাপড়গুলো শরীরের সঙ্গে লেপটে গেছে আর বাইরে থেকে কানে আসছে সময় না কাটার দৃঢ় অথচ নিস্তেজ গুঞ্জন। নজরে এল জলে ধোয়া দেওয়ালগুলো, বাড়ির কড়ি-বর্গার জোড়গুলো জল খেয়ে ফুলে উঠেছে। ছোট্ট বাগানটা এই প্রথম একেবারে খালি হয়ে গেছে। আমার মায়ের স্মৃতি, সেই জুঁইফুলের ঝোপটাও নজরে এল। শিরদাঁড়ার যে জোড়টা যন্ত্রণায় টনটন করছে তার নিচে একটা বালিশ রেখে বাবা আরামকেদারায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছেন। বৃষ্টির গোলকধাঁধায় তাঁর কাতর চাহনিটাই হারিয়ে গেছে। অগস্ট মাসের রাত্রিগুলোর সেই বিস্ময়কর নীরবতার কথা মনে পড়ে গেল যখন নিজের অক্ষের উপর পৃথিবীর পাক মারার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যেত না। আসলে পৃথিবীর মরচে পড়া অক্ষদণ্ডে ঠিকমতো তেল না দেওয়াতেই অমন শব্দ হত। হঠাৎ মনে হল এক অদম্য দুঃখ আমায় পুরোপুরি গিলে ফেলেছে।

রবিবারের মতো সোমবারও সারাটা দিন ধরে বৃষ্টি হল। এবার কিন্তু মনে হল, বৃষ্টির ধরন পালটিয়েছে। কারণ, আমার মনে অন্য রকমের একটা তেতো স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। গোধূলিবেলায় কে যেন আমার কানের পাশে বলে উঠল,—'বৃষ্টিটা বিচ্ছিরি রকমের বিরক্তিকর।' ঘাড় না ঘুরিয়েই বুঝতে পারলাম ওটা মার্টিনের কণ্ঠস্বর। আমি জানতাম ও পাশের চেয়ারে বসে কথা বলছে। সেই একই রকমের ঠান্ডা ও বিরক্তিকর কণ্ঠস্বর। গত ডিসেম্বরের সেই বিষণ্ণ সকালে আমার স্বামী হওয়ার পরেও যে এতটুকু পালটাল না। তারপর মাস পাঁচেক কেটে গেছে। আমি এখন বাচ্চার জন্ম দিতে চলেছি। আর আমার পাশে বসে মার্টিন বলছে যে বৃষ্টিটা ওকে ভীষণ বিরক্ত করছে। আমি বললাম,—'বিরক্তিকর নয়।' বাগানটা খাঁ খাঁ করছে দেখে আমার ভীষণ মন খারাপ। ওর দিকে ঘুরে তাকিয়ে দেখি মার্টিন ওখানে নেই। শুধু একটি কণ্ঠস্বর আমায় বলছে,—'মনে হচ্ছে আর কোনও দিন আকাশ পরিষ্কার হবে না।' কণ্ঠস্বরটার দিকে তাকিয়ে দেখি শুধু শূন্য চেয়ারটাই পড়ে আছে।

বৃহস্পতিবার সকালে বাগানে একটা গোরু দেখা গেল। গোরুটার কঠিন ও অবাধ্য রকমের নিশ্চলতা দেখে মনে হল সমুদ্রের মধ্যে মাথা তুলে থাকা একটা অন্তরীপ। ওর খুরগুলো কাদায় ডুবে আছে আর মুখটা মাটির দিকে নোয়ানো। সকালবেলায় রেড ইন্ডিয়ানরা গোরুটাকে ইট ছুঁড়ে, লাঠি মেরে তাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু গোরুটা ওখানেই থেকে গেল। গোরুটার অচঞ্চল চেহারার কাঠিন্য দেখে মনে হল ওকে অপবিত্র করা যায় না। তখনও গোরুটার খুরগুলো কাদায় ডুবে আছে আর বিরাট মাথাটা বৃষ্টিতে এলিয়ে পড়েছে। ধৈর্য ধরে বাবা গোরুটাকে রক্ষা করতে এগিয়ে না আসা পর্যন্ত রেড ইন্ডিয়ানরা ওকে বিরক্ত করেই যাচ্ছিল। বাবা বললেন,—'ওটাকে ছেড়ে দাও। যে রাস্তায় এসেছে সেই পথেই ও ফিরে যাবে।'

মঙ্গলবার সূর্যাস্তের পর জমে থাকা জল অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় মনের উপর যেন একটা পর্দার আস্তরণ পড়ে গেল। বৃষ্টির পর প্রথম দিন সকালে ছড়িয়ে পড়া ঠান্ডা ভাবটা ক্রমশ চ্যাটচেটে গরমে পরিণত হয়েছে। তাপমাত্রা খুব একটা নেমে যায়নি আবার গরমও নেই ; এটা যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরের শীতলতা। জুতোর মধ্যে ঘামে পা ভিজে যাচ্ছে। খালি গা নাকি ত্বকের সঙ্গে জামাকাপড়ের ছোঁয়া,—কোনটা বেশি অসহনীয়, বলা শক্ত। বাড়ির সব কাজকর্ম বন্ধ। বারান্দায় বসলেও প্রথম দিনের মতো বৃষ্টি দেখছি না। বৃষ্টি পড়ছে বলে আমাদের আর মনে হচ্ছে না। কুয়াশার জন্যে গাছপালার একটা হালকা আভাস ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। সূর্যাস্তের বিষণ্ণতা ও নিঃসঙ্গতা মন ছুঁয়ে যাওয়ার সময় যে স্বাদ ঠোঁটে লেগে থাকে, স্বপ্নে কোনও আগন্তুককে দেখার পর আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে সেই একই স্বাদ পাওয়া যায়। মঙ্গলবার বলে আমার মনে পড়ে গেল,—'সেন্ট হেরোমে'-র গির্জার অন্ধ যমজ বোনেরা, যারা প্রতি সপ্তাহের এই দিনটায় চেরা গলায় বিস্ময়কর সব দুঃখজনক গান শোনাতে আসে, আজ আসবে। আমার মনে হল ওরা যেন আমাদের বাড়িতেই এলোমেলোভাবে গাদাগাদি করে রয়েছে এবং বৃষ্টি থামার জন্যে অপেক্ষা করছে। বৃষ্টি না কমায় ওরা গান গাইবার জন্যে বাইরে যেতে পারছে না। সত্যি সত্যি কিন্তু ওরা আসেনি। আমি ভাবলাম তা হলে

সেই মেয়েটা যে প্রত্যেক মঙ্গলবার লেবুর গন্ধ মাখা সুগন্ধি গাছের ডাল চাইতে আসে, সে নিশ্চয়ই দিবানিদ্রার পরে বারান্দায় এসে বসে আছে।

সেদিন সবার ক্ষিদে-তেষ্টা উধাও হয়ে গেল। দুপুরবেলায় সৎ-মা খানিকটা করে বিস্বাদ স্যুপ আর বাসি রুটি পরিবেশন করলেন। আসলে সোমবার সূর্যাস্তের পর থেকে, বরং বলা ভালো চিন্তা-ভাবনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই আমাদের পেটে কিছুই পড়েনি। আমরা অথর্ব হয়ে পড়েছিলাম। পর্যুদস্ত হয়ে প্রকৃতি শান্তিপূর্ণভাবে সব কিছু ছেড়েছুড়ে দেওয়ার অবস্থায় যখন পৌঁছোল, আমরা তখন বৃষ্টিতে মাদকাসক্ত। বিকেলবেলায় শুধু গোরুটা চড়ে বেড়াল। হঠাৎ গোরুটার ভেতরে কোনও একটা শব্দ আলোড়ন তোলায় ওর খুরগুলো আরও গভীরভাবে কাদায় গেঁথে গেল। তারপর প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে গোরুটাকে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে হল ও মরে গেছে। নেহাতই বেঁচে থাকার অভ্যাসে গোরুটা যেন বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। আরও মনে হল যে অভ্যাসের তুলনায় শরীরটা দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত গোরুটা ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে। সামনের পা দুটোকে অনেকটা বাড়িয়ে দিয়ে কাদা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে গোরুটার মুখ থেকে খানিকটা লালা গড়িয়ে পড়ল। আর শেষ পর্যন্ত নিজের শরীরের ভারে নিঃশব্দে আস্তে আস্তে সম্মানের সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। আমার পেছন থেকে কে যেন বলল,—'গোরুটা অনেক দূর পর্যন্ত গেছে।' চট করে মাথাটা ঘুরিয়ে দেখি সেই ভিখিরি মেয়েটা যে শুধু প্রত্যেক মঙ্গলবারে লেবুর গন্ধ মেশানো সুগন্ধি গাছের ডাল নিতে আসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অমন ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও ওর হাজিরায় কামাই নেই।

বসার ঘরের দেওয়ালের দিকে সরে যাওয়া টেবিলটার ওপর যাবতীয় আসবাবপত্র স্তূপীকৃত অবস্থায় না দেখলে অথবা রাত্রিবেলায় তাড়াহুড়ো করে তৈরি করা একটা অস্থায়ী ইটের গাঁথনির উপর বাড়ির সমস্ত ট্রাংক-বাক্স-বাসনপত্র না দেখলে বুধবার নাগাদ অত্যধিক বৃষ্টির ফলে গড়ে ওঠা এই অপ্রতিরোধ্য আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে হয়তো খাপ খাইয়ে নিতে পারতাম। দৃশ্যটা আমার ভেতরে এক অদ্ভুত শূন্যতা সৃষ্টি করল। কাল রাতে কিছু একটা ঘটেছে। সারাটা বাড়িই এলোমেলো আর অগোছালো। খালি গা, খালি পা, হাঁটু পর্যন্ত গোটানো ট্রাউজার্স,—এমন অবস্থায় গুয়াহিরো রেড ইন্ডিয়ানরা বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্রগুলো রান্নাঘরে জড়ো করছে। ওদের মুখ-চোখে অধ্যবসায়ের ছাপ সুস্পষ্ট। শুধু পেটের দায়ে এই বৃষ্টির মধ্যেও মাথা নিচু করে কাজ করতে হচ্ছে বলে একটা হতাশাজনক বিদ্রোহের ক্রূরতা ওদের মধ্যে ফুটে উঠেছে। কিছুই ইচ্ছে করছিল না বলে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে খানিকক্ষণ বাড়ির মধ্যেই পায়চারি করলাম। সবুজ ঘাসে ঢাকা ফাঁকা মাঠটায় একটা পরিবর্তন চোখে পড়ল। ঘাস ছাড়াও ওখানে নানান রকমের শ্যাওলা, ফুল ফোটে এমন জাতের শ্যাওলা, নরম-চ্যাটচেটে ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় সারাদিন ছায়া পাওয়ার জন্যেই চারাগুলো ওখানে অমন তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছে। বসার ঘরের একটা চেয়ারে বসে এক জায়গায় স্তূপীকৃত বাড়ির সব আসবাবপত্রর কথা নিজের মনে ভাবছিলাম। এমন সময় ঠাকুমার সাবধানবাণী কানে এল,—আমার নাকি নিমোনিয়া হতে পারে। ঠিক তক্ষুনি আমি অনুভব করলাম জল আমার গোড়ালি ছুঁয়েছে। বন্যার জল সারাটা বাড়িতে থই থই করছে। আর পুরো বাড়িটাকেই ছেয়ে ফেলেছে বদ্ধ জলের একটা চ্যাটচেটে আঠালো আস্তরণ।

বুধবার দুপুরেও ভালো করে সূর্যের মুখ দেখা গেল না। আর বেলা তিনটের আগেই ঘনিয়ে এল রাত্রির অন্ধকার। তখনও কিন্তু একঘেঁয়ে বিরক্তিকর ছন্দে টিপটিপ করে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। গুয়াহিরো রেড ইন্ডিয়ানদের নীরবতায় জন্ম নেওয়া অসময়ের অন্ধকারটা কেমন যেন নরম আর বিষণ্ণ। প্রকৃতির দাপটের কাছে হেরে গিয়ে ওরা যেন অক্ষম অবস্থায় দেওয়ালের ধারে রাখা চেয়ারগুলোয় গুটিসুটি মেরে বসে আছে। ঠিক তখনই বাইরে থেকে খবর আসা শুরু হল। খবরটা অবিশ্যি বাড়ির কেউ নিয়ে আসেনি। খবরটা এমনভাবে এল যেন বহুদূরের কোনও বিপর্যয় থেকে জঞ্জাল, জন্তু-জানোয়ারের মৃতদেহ জড়ো করে নিয়ে তরল কাদা বা পাঁক রাস্তা দিয়ে বয়ে চলেছে আর ঘরবাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্রে টান মারছে। রবিবারে যখন বৃষ্টিকে সৌভাগ্যের মরশুম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল তখন ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর খবর আমাদের বাড়িতে পৌঁছোতে দু' দিন লেগে গেল। এবং বুধবারে বিষয়টা

এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যেন ঝড়ের ভেতরকার সঞ্চিত গতিশক্তির দাপটেই এমনটা ঘটেছে। জানা গেল গির্জার ভেতর বন্যার জল থই থই করছে আর যে কোনও মুহূর্তে গির্জাটা ধসে যেতে পারে। ব্যাপারটা আদপেই জানার কথা নয় এমন একজন বলল,—'সোমবার থেকেই নাকি ট্রেনটা নদী পেরিয়ে এগোতে পারেনি। মনে হচ্ছে সেতুসুদ্ধ পুরো রেললাইনটাই নদীর তোড়ে ভেসে গেছে।' আর জানা গেল যে এক অসুস্থ ভদ্রমহিলা বিছানা থেকেই উধাও হয়েছেন আর সেদিন বিকেলে নিজের বাড়ির উঠোনে তাঁকে ভেসে বেড়াতে দেখা গেছে।

মহাপ্লাবন আর আতঙ্কে শঙ্কিত হয়ে পড়ায় পা দুটোকে জড়ো করে জবুথবু হয়ে আরামকেদারায় বসলাম। অনিশ্চিত পূর্বাভাসে ছেয়ে থাকা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারের দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। হাতে একটা বাতি নিয়ে মাথা উঁচু করে দরজায় সৎ-মা উপস্থিত। ওঁকে একটা ঘরোয়া ভূতের মতো দেখালেও আমি ভয় পাইনি। কারণ, আমিও তাঁর অতিপ্রাকৃত অবস্থার শরিক। উনি আমার কাছে এলেন। তখনও উনি রীতিমতো মাথা উঁচু করে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতের বাতিটা হাওয়ায় কাঁপছে। উনি বারান্দায় জমে থাকা জল পা দিয়ে ছিটিয়ে বললেন,—'এখন আমাদের প্রার্থনা করতে হবে।' বলিরেখায় কোঁচকানো ওঁর শুকনো মুখটা দেখে মনে হল এক্ষুনি যেন কবর থেকে উঠে এসেছেন অথবা মানবসুলভ নয় এমন কোনও পদার্থ দিয়ে ওঁর শরীরটা তৈরি। জপমালা হাতে করে আমার উলটো দিকে দাঁড়িয়ে তিনি বলতে থাকলেন,—'এখন আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। সমাধিগুলো সব জলে ভেসে গেল। সমাধিক্ষেত্রের সমস্ত মৃতদেহই ভেসে বেড়াচ্ছে।'

পচা-গলা মৃতদেহের তীব্র টক গন্ধ নাকে আসায় সেই রাতে ঘুমোনোর খানিকক্ষণ পরেই জেগে গেলাম। নাক ডাকিয়ে আমার পাশে শুয়ে ঘুমোতে থাকা মার্টিনকে জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—'ব্যাপারটা বুঝতে পারছ?' ওর পালটা প্রশ্ন,—'কী?' আমি আবার বললাম,—'গন্ধটা। নিশ্চয়ই রাস্তায় মৃত মানুষের দেহ ভাসছে।' বিষয়টা আমায় আতঙ্কগ্রস্ত করে তুললেও মার্টিন দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে ঘুম চোখেই অস্পষ্ট স্বরে বলল,—'ওটা মনগড়া ব্যাপার। অন্তঃস্বত্বা মহিলারা সবসময়ই কিছু না কিছু কল্পনা করতেই থাকে।'

বৃহস্পতিবার সকালে কিন্তু গন্ধটার আর কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। দু'দিন আগে থেকে অস্বস্তি তৈরি করা সময় এবং দূরত্বের ধারণাটাও বিদায় নিল। তারপর আর বৃহস্পতিবার রইল না। বাস্তবে কিন্তু শুক্রবারের দিকে নজর রাখার জন্যে জেলির মতো থলথলে চেহারার বৃহস্পতিবারটাকে হাত দিয়ে টুকরো টুকরো করা যেত। ওখানে আর কোনও পুরুষ বা নারী, কেউই রইল না। মোটাসোটা চেহারার আমার বাবা, সৎ-মা এবং রেড ইন্ডিয়ানরা ছাড়া আরও যে সব দেহকে টেনে আনা যায়,—শীতকালের জমা জলে তারা সবাই তলিয়ে গেল। বাবা শুধু বললেন,—'কী করতে হবে না বলা পর্যন্ত এখান থেকে একদম নড়বে না।' তিনি যেন অনেক দূর থেকে এমন জড়িয়ে-পেঁচিয়ে বলছিলেন যা কানে শোনা যায় না কিন্তু ছোঁয়া যায়। আর একমাত্র সেই অনুভূতিটাই তখনও কাজ করছিল।

বাবা আর ফিরলেন না। মানুষটা যেন হাওয়া অথবা আবহাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। সৎ মাকে রাতে আমার পাশে শুয়ে ঘুমোনোর কথা বললাম। শান্তভাবে সারারাত ধরে নিশ্চিন্ত শান্তিতে ঘুমোলাম। পরের দিনের আবহাওয়াও একই রকম,—ধূসর-বর্ণহীন গন্ধবিহীন এবং নিরুত্তাপ। চেতনার একটা অংশ তখনও জেগে ওঠেনি বলে মনে হওয়ায় ঘুম ভেঙে যেতেই তাড়াহুড়ো করে একটা চেয়ার টেনে এনে একদম চুপচাপ বসে রইলাম। তখন, ঠিক তখনই রেলগাড়ির বাঁশির আওয়াজটা কানে এল। দীর্ঘস্থায়ী অথচ বিষণ্ণ সেই শব্দটা ঝড়ে ভেসে যাচ্ছিল। আমি ভাবলাম,—ট্রেনটা তা হলে ছাড়া পেল। সেই মুহূর্তেই আমার মনে হল কেউ যেন আমার চিন্তাটা শুনে প্রশ্ন করছে,—'কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম,—'কে ওখানে?' সৎ-মা নিজের শীর্ণ হাত দুটো জড়ো করে দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলেন,—'আমি।' ওঁকে প্রশ্ন করি,—'তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' শুনতে পাচ্ছেন বলে তিনি জানালেন যে হয়তো রেললাইনটা সারিয়ে ফেলায় ট্রেনটাকে স্টেশনে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এবার উনি একেবারে হাতে গরম প্রাতঃরাশ আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। রসুন আর গলানো মাখনের গন্ধ

ছড়ানো এক বাটি গরম স্যুপ। বিরক্তি নিয়ে ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম,—'ক'টা বাজে?' শান্তভাবে অথচ অসহায় সুরে তিনি বললেন,—'নিশ্চয়ই আড়াইটের কাছাকাছি। এত কিছুর পরে তো আর ট্রেনটা দেরি করতে পারে না।' রীতিমতো উত্তেজিত স্বরে আমি মন্তব্য করি,'—'আড়াইটে! এতক্ষণ ধরে কী করে আমি ঘুমোচ্ছি?' উনি কিন্তু একই সুরে বলে চললেন,—'তেমন লম্বা কিছু নয়। তিনটের বেশি এখন বাজতেই পারে না।' আমার হাত কাঁপছে। স্যুপের পাত্রটা হাত থেকে পড়ে যেতে পারে। 'শুক্রবার আড়াইটে',—আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। উনি সেই একঘেয়ে শান্ততা বজায় রেখে বললেন,—'বৃহস্পতিবার আড়াইটে, এখনও বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটে।'

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যারা চলাফেরা করে বেড়ায় তাদের অনুভূতিগুলো যেমন মূল্যহীন হয়ে পড়ে সেই রকম একটা ঘোরের মধ্যে আমি কতক্ষণ যে ডুবেছিলাম,—জানি না। আমি শুধু জানি যে অনেক, অ-নে-ক ঘণ্টা পরে পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম,—'এবার বিছানাটা এ পাশে বিছাতে পার।' ক্লান্ত স্বর তবে অসুস্থ নয়, বরং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা কোনও মানুষ। তারপর কানে এল জলের মধ্যে ইট ছোড়ার শব্দ। নিজের টানটান অবস্থাটা বুঝে ওঠা পর্যন্ত আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম। এবার এক বিশাল শূন্যতা আমায় গ্রাস করল। ভয়াবহ রকমের এক অস্থির শান্ততা সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে। করুণ এক স্থবিরতা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। হঠাৎই মনে হল আমার হৃৎপিণ্ডটা জমে পাথর হয়ে গেছে। নিজেকে মৃত বলে মনে হল। হে ভগবান আমি মরে গেছি। একলাফে বিছানায় চলে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম,—'আদা! আদা!' পাশ থেকে খরখরে গলায় মার্টিন বলল,—'ওরা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। এতক্ষণে সবাই বাড়ির বাইরে চলে গেছে।' কেবল তখনই আমি বুঝতে পারলাম বৃষ্টিতে সব ধুয়ে গেছে। আমাদের চারদিকে শূন্যতা ছড়িয়ে পড়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে ভীষণ মিল আছে এমন এক পরম সুখের অলৌকিক বিষণ্ণতায় আমরা নিমগ্ন। বারান্দা থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল। প্রাণের ছোঁয়া মাখা পরিষ্কার এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া দরজায় ধাক্কা মারায় পাল্লাটা ক্যাঁচ করে উঠল আর পাকা ফলের মতো একটা জরাজীর্ণ-থুত্থুরে দেহ উঠোনের চৌবাচ্চাটায় ঝুপ করে পড়ল। হাওয়াটা এমনভাবে পাক মারল যেন কোনও এক অদৃশ্য মানুষ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাসছে। হে ভগবান, আমি যে সময়ের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছি। এখন যদি ওরা আমায় গত শনিবারের প্রার্থনায় যাওয়ার জন্যে ডাকতে আসে আমি একটুও আশ্চর্য হব না।

মূল শিরোনাম · Mónologo de Isabel viendo llover en Macondo

কারলিউসের রাত

টেবিলটাকে ঘিরে বসেছিলাম আমরা তিনজন। মেশিনে কেউ পয়সা ফেলল। রাতভোর চালানো রেকর্ডটা আরও একবার চালাল উরলিৎসার। আমরা কোথায় আছি, কেন আছি এইসব ভেবে ওঠার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা। আমাদের মধ্যে একজন কাউন্টারের উপর দিয়ে তার হাতটা বাড়াল। হাতটা দেখা গেল না, তবে পাওয়া গেল হাত বাড়ানোর শব্দটা। হাতড়াতে হাতড়াতে হাতটা ধাক্কা খেল একটা গেলাসে। তারপরই হাতড়ানো স্তব্ধ হয়ে দুই হাত দিয়ে গেলাসটাকে জাপটে ধরা হল। অন্ধকারের মধ্যেই আমরা নিজেদের খুঁজলাম এবং টেবিলের উপর রাখা তিরিশটা আঙুলের ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে খুঁজেও পেলাম। একজন বলল,—'চল, যাওয়া যাক।' আমরা উঠে পড়লাম। যেন কিছুই হয়নি। আসলে তখনও পর্যন্ত বিব্রত হবার সময়টুকুও পাওয়া যায়নি। হলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে কাছাকাছি কোথাও বাজতে থাকা গান শোনা গেল। অপেক্ষারত বিষণ্ন নারীদের গন্ধ পেলাম আমরা। দরজার দিকে এগোবার সময় আমরা অনুভব করলাম হলটার অসীম শূন্যতা। দরজার কাছে পৌঁছে, পাশে বসে থাকা মেয়েটার গায়ের টক টক গন্ধ নাকে লাগল। বললাম,—'আমরা চলে যাচ্ছি।'

মেয়েটা কোনও উত্তর দিল না। একটা রিভলভিং চেয়ারকে সোজা করার শব্দ শোনা গেল। মেয়েটা উঠে পড়ল। আলগা কাঠের উপর পায়ের শব্দ। মেয়েটা ফেরার সময় আবার শব্দ হল। কাঠের পাটাতনে আমাদের পিছনেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। একটু এগোনো মাত্রই প্রাক্-উষা লগ্নের তীব্র, ঠান্ডা হাড় কাঁপানো এক রাশ হাওয়ার মুখোমুখি হলাম। একটা কণ্ঠস্বর কানে এল,—'রাস্তা থেকে সরে যাও। আমি এটা নিয়ে আসছি।' আমরা পিছু হটলাম। আবার গলাটা খেয়াল করলাম। 'তোমরা এখনও দরজায় লেপটেই দাঁড়িয়ে আছ?' চারপাশে সরে দাঁড়ানোর পরও সব দিক থেকে কণ্ঠস্বরটা শোনবার পর আমরা সমস্বরে বললাম,—'আমরা এখান থেকে বেরোতে পারছি না। কারলিউস আমাদের চোখ খুবলে নিয়েছে।'

তখন আমরা অনেকগুলো দরজা খোলার শব্দ পেলাম। আমাদের একজন হাত ছেড়ে দিল। চারদিকের অন্ধকারে যে সব জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে দিয়ে পাশ কাটিয়ে, হোঁচট খেতে খেতে তার এগিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আলো-আঁধারির আবছায়ায় কোনও এক জায়গা থেকে সে বলল—'কাছাকাছি আছি। চারদিকে স্তূপীকৃত ট্রাংকের গন্ধ পাচ্ছি।' আমরা আবার তার ছোঁয়া পেলাম। দেওয়ালে হেলান দিলাম আমরা। ঠিক তখনই আরেকটা গলা শোনা গেল। আমাদেরই একজন বলে উঠল,—'ওগুলো কফিনও হতে পারে।'

আমাদের মধ্যে যে অন্ধকার হাতড়িয়ে ঘুরে এসেছে সে বলল,—'ওগুলো ট্রাংক। ছোটবেলা থেকেই ট্রাংকে গোছানো কাপড়চোপড়ের গন্ধের সঙ্গে আমি পরিচিত।'

এরপর নরম, মোলায়েম, সুন্দর মাটির ওপর দিয়ে আমরা এগোলোম সেদিকে। এর উপর দিয়ে আমাদের আগেও কেউ হেঁটে গেছে। একটা হাত এগিয়ে দিল কেউ একজন। জীবন্ত ত্বকের ছোঁয়া পেলাম। কিন্তু উলটোদিকের দেওয়ালটার আর হদিশ পাওয়া গেল না। 'একজন ভদ্রমহিলা',—আমরা বললাম। আমাদের মধ্যে যে ট্রাংকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল, সে বলল,—'মনে হয় তিনি ঘুমোচ্ছেন।'

আমরা অনুভব করলাম শরীরটা নড়ল, কেঁপে উঠল এবং সরে গেল। মনে হল, শরীরটার অস্তিত্ব যেন হাওয়ায় বিলীন হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আমরা অনড়-অচল হয়ে একে অপরের কাঁধে মাথা এলিয়ে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠিক সেই সময় ভদ্রমহিলার প্রশ্ন শোনা গেল,—'কে ওখানে?' আমরা সেই অবস্থাতেই জবাব দিলাম,—'আমরা।' কানে এল বিছানায় নড়াচড়ার শব্দ। ইতস্তত্তভাবে কারও পা

চটি খুঁজছিল। তারও আওয়াজ পাওয়া গেল। মনে মনে আমরা ভদ্রমহিলাকে শনাক্ত করার চেষ্টা করলাম। মনে হল তিনি ঘুম জড়ানো দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। 'তোমরা এখানে কী করছ?'—তিনি প্রশ্ন করলেন। আমরা জবাব দিই,—'কিছু না। কারলিউস আমাদের চোখ ঠুকরে দিয়েছে।'

তিনি বললেন খবরের কাগজে নাকি কারলিউস নিয়ে কী একটা খবর ছেপেছে। তিন জন লোক নাকি একটা উঠোনে বসে মদ্যপান করছিল। সেখানে ছিল পাঁচ-ছ'টা কারলিউস—বোধহয় সাতটাই হবে। কারলিউসগুলোকে বিরক্ত করে গান গাইতে শুরু করেছিল একজন লোক। 'ঠিক তখনই সারস জাতীয় কারলিউস পাখিগুলো টেবিলের উপর উঠে তাদের চোখ খুবলে নিল',—ভদ্রমহিলা বললেন। আমরা বললাম,—'ওখানে গেলে লোকে কারলিউসগুলোকে দেখতে পেত।' তিনি বললেন,—'অনেকে গেছিল। পরের দিন উঠোনটা ভরে যায়। কিন্তু সেই মেয়েটা ততক্ষণে কারলিউস পাখিগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছে।' আমরা ফিরে দাঁড়াতেই তিনি চুপ করে গেলেন। আবার সেই দেওয়াল। ঘুরে দাঁড়ালেই আমরা দেওয়াল পাচ্ছি। সব সময় একটা দেওয়াল আমাদের চারদিকে ঘরে আছে। আমাদের একজন হাত ছেড়ে দিল। আমরা শুনতে পেলাম সে হাতড়ে হাতড়ে মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছে। সে বলল—'ট্রাংকগুলো এখন কোথায় আছে, জানি না। মনে হচ্ছে, আমরা এখন অন্য কোথাও আছি।'

আমরা বললাম,—'এখানে এস। আমাদের কাছাকাছি কেউ আছে।' আমাদের দিকে তার এগিয়ে আসার আওয়াজ পেলাম। আমরা বুঝলাম সে আমাদের পাশে এসে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার গরম নিঃশ্বাস আমাদের মুখে এসে পড়ল। 'ওই দিকে হাত বাড়াও',—আমরা তাকে বললাম। 'আমাদের পরিচিত কেউ ওই দিকেই আছে।' নিশ্চয়ই সে হাত বাড়িয়েছিল। সে নিশ্চয়ই আমাদের নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছেছিল। কারণ, কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে সে বলে,—'মনে হচ্ছে ওটা একটা ছেলে।' আমরা বললাম,—'খুব ভালো। ওকে জিজ্ঞেস করো,—ও আমাদের চেনে কিনা?' সে জিজ্ঞেস করল। ছেলেটা সাদামাটাভাবে বলল,—'আমি তোমাদের চিনি। তোমরা সেই তিনজন, যাদের কারলিউস ঠুকরে দিয়েছে।' ঠিক তখনই পাওয়া গেল জনৈক বয়স্কা মহিলার গলা। মনে হল তিনি বন্ধ দরজার পিছন থেকে বলছেন,—'তুমি আবার নিজের সঙ্গে কথা বলছ?' ছেলেটি নির্লিপ্তস্বরে জবাব দিল,—'না। কারলিউস যাদের চোখ ঠুকরে দিয়েছিল, তারা আবার এসেছে।' আলগা কাঠের নড়াচড়ার শব্দ হল। আরও কাছাকাছি জায়গা থেকে মহিলার নির্দেশ শোনা গেল,—'ওদের বাড়ি নিয়ে যাও।' ছেলেটা বলল,—'ওরা কোথায় থাকে আমি জানি না।' মহিলাটি ধমক দিলেন,—'বাজে কথা বল না। যে রাতে কারলিউস ওদের চোখ ঠুকরে দিয়েছে সেই রাত থেকে সবাই ওদের বাড়ি চেনে।' এর পরই তাঁর স্বর বদলে গেল। তিনি যেন আমাদের লক্ষ্য করেই বললেন,—'কেউই তো বিষয়টা বিশ্বাস করতে চাইছে না। লোকে বলছে যে কাগজগুলো বিক্রি বাড়ানোর জন্য গল্পটা বানিয়েছে। কারলিউসদের কেউ দেখেনি।' ছেলেটা বলল,—'রাস্তা দিয়ে ওদের নিয়ে গেলে কেউই আমাকে বিশ্বাস করবে না।' আমরা দেওয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ মহিলার কথা শুনছিলাম। মহিলা বললেন,—'ও যদি তোমাদের নিয়ে যেতে না চায়, সেটা অন্য কথা। তার উপর, একটা বাচ্চা ছেলের কথায় কেউই পাত্তা দেবে না।' ছেলেটা বলল,—'ওদের নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যদি বলি যে এরাই হচ্ছে সেই তিনজন যাদেব চোখ কারলিউস ঠুকরে দিয়েছিল, তা হলে ছেলেরা আমায় ঢিল ছুঁড়বে। পথে-ঘাটে সবাই বলাবলি করছে এমন ব্যাপার নাকি হতেই পারে না।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তারপর বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। ছেলেটা বলল,—'তার ওপর আমি এখন *টেরি অ্যান্ড দ্যা পাইরেট্স* পড়ছি।'

সেই মুহূর্তে কেউ যেন আমাদের কানে কানে বলল,—'আমি ওকে রাজি করানোর চেষ্টা করছি।' সে গেল ছেলেটার কাছে। বলল,—'আমারও ভীষণ ভালো লাগে। এ সপ্তাহে যেন টেরির কী হয়েছিল!' আমরা ভাবলাম সে ছেলেটির আস্থাভাজন হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ছেলেটা বলল,—'সে সব আমার ভালো লাগে না। আমি শুধু ছবিগুলো দেখি।' আমরা বললাম,—'টেরি তো এখন ঘাবড়ে গেছে।' ছেলেটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে, শীতল স্বরে বলল,—'সে তো শুক্রবার। আজ রবিবার। আর আমার

ছবিগুলো দেখতেই বেশি ভালো লাগে।'

যখন অন্যজন ফিরে এল, আমরা বললাম,—'আমরা তিন-দিন ধরে হারিয়ে গেছি। এখনও পর্যন্ত আমরা এক মুহূর্তও বিশ্রাম পাইনি।'

একজন বলল, 'ঠিক আছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া যাক। কিন্তু কেউ কারও হাত ছাড়ব না।'

আমরা বসলাম। অদৃশ্য সূর্য আমাদের পিঠের উপর এসে পড়ল। কিন্তু সূর্যের অস্তিত্ব আমাদের মনে এতটুকুও রেখাপাত করল না। আমাদের মনে হল,—সূর্যটা যেন সব জায়গাতেই আছে। দূরত্ব, সময়, দিক—সব কিছুর মাপজোক, সব কিছুর অস্তিত্ব আমাদের মন থেকে হারিয়ে গেল। আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল অনেকগুলো কণ্ঠস্বর। আমরা বললাম,—'কারলিউস আমাদের চোখ ঠুকরে দিয়েছে।' একটা স্বর শোনা গেল,—'এরা কাগজের গুজবগুলোকে বিশ্বাস করেছে।'

কণ্ঠস্বরগুলো মিলিয়ে গেল। আমরা বসে রইলাম। একই রকমভাবে কাঁধে কাঁধে ঠেকিয়ে,—অনেক কণ্ঠস্বর, অনেক ছায়ার মধ্যে, আমাদের পরিচিত কোনও মানুষের স্বর বা গন্ধ খুঁজে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা শুরু করে দিলাম। সূর্য ততক্ষণে মাথার ওপর পৌঁছে গেছে। তখন কেউ একজন বলল,—'চল, আবার দেওয়ালটার দিকে যাঁওয়া যাক।' অন্যরা নিশ্চুপ। অচল অবস্থায় নিজেদের মাথা সেই অদৃশ্য আলোর দিকে তুলে তারা বলল,—'এখনও সময় হয়নি। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক, যতক্ষণ না সূর্য আমাদের মুখ জ্বালিয়ে দেয়।'

মূল শিরোনাম . La noche de los alcaravanes.

নাবো

(সেই কালো মানুষটি, যে দেবদূতদের প্রতীক্ষায় রেখেছিল)

শুকনো ঘাসের মুখটা ডুবিয়ে শুয়ে আছে নাবো। ও টের পেল, ওর সারাটা শরীরে আস্তাবলের পেচ্ছাপের গন্ধ। চকমকে বাদামি ত্বকে হেরে যাওয়া ঘোড়াগুলোর জ্বলন্ত নিঃশ্বাসকে অনুভব করতে পারলেও ত্বকের অস্তিত্ব ও অনুভব করতে পারেনি। ঘটনাটা এমনই যে ও যেন ঘোড়ার চাট খেয়ে ঘুমিয়ে গেছে আর শুধুমাত্র সেটাই ওর অনুভূতিকে সক্রিয় রেখেছে। ও চোখ মেলল। আবার বন্ধ করল। এক শান্ত বিস্তৃত কিন্তু একগুঁয়ে অস্তিত্বের শূন্যতায় ও ডুবে গেল। মনে হচ্ছে ও নয়, কেবলমাত্র সময়টাই বাড়ছে। আর এটাই ওর সারাটা বিকেলের একমাত্র অভিজ্ঞতা। পিছন থেকে কেউ এসে ওকে ডাকল,—'নাবো! ওঠো! অনেক ঘুমিয়েছ।' ও ফিরে তাকাল, কিন্তু ঘোড়াগুলোকে দেখতে পেল না। দরজাটা বন্ধ। সত্যি সত্যিই ও ঘোড়াদের অস্থির পদচারণা শুনতে পায়নি। তবুও ও কল্পনা করে নিল, ওগুলো আশেপাশেই কোথাও না কোথাও আছে। ও আরও ভাবল, যে মানুষটা ওর সঙ্গে কথা বলছে সে-ই রয়েছে আস্তাবলের বাইরে। কারণ দরজাটা ভিতর থেকে খিল আঁটা। পিছন থেকে আসা সেই কণ্ঠস্বরটা আবার সরব হল। 'সত্যি নাবো অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ। তিনদিন ধরে তুমি ঘুমোচ্ছ।' তক্ষুনি নাবো দু-চোখ মেলে দেখে, আর ওর মনে পড়ে,—'আমি এখানে—কারণ, একটা ঘোড়া আমায় লাথি মেরেছে।'

ক'টা বাজে, ও জানে না। দিনগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। স্যাঁতস্যাঁতে স্পঞ্জের মতো দিন, সুদূর অতীতে ফেলে আসা সেইসব শনিবার শহরের কেন্দ্রীয় চত্বরে অর্থাৎ টাউন স্কোয়ারে হাজিরা দেওয়ার অভ্যাস,—সব কেটে যাচ্ছে। এ সবই ও বুঝতে পারছে। সাদা জামাটার কথা ও ভুলেই গেছিল। ওর যে একটা সবুজ টুপি আর একটা গাঢ় রঙের ট্রাউজার্স ছিল,—সে কথা ওর মনেই নেই। ও ভুলে গেছিল সে সময় ওর কোনও জুতো ছিল না। প্রতি শনিবার রাতে নাবো টাউন স্কোয়ারে যেত। একটা কোণে চুপটি করে বসে থাকত। না, না, বাজনা শোনার জন্য নয়, কালো মানুষটাকে নজরে রাখার জন্য। প্রতি শনিবার ও লোকটাকে দেখত। চোখে লাগানা মোষের শিঙের ফ্রেমের চশমাটা কানে একেবারে সেঁটে থাকত। গান-বাজনার দল, অর্থাৎ কয়্যারে সেই কালো মানুষটা স্যাক্সোফোন বাজাত। নাবো তাকে দেখত। কিন্তু কালো মানুষটা নাবোকে দেখত না। নাবোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত কেউ যদি জানত, যদি বুঝতে পারত নাবো কালো মানুষটাকে দেখার তাগিদেই প্রতি শনিবার বাজনা শুনতে যায় অথবা কেউ যদি ওকে জিজ্ঞেস করত, সে ওর দিকে একবারের জন্যও চোখ তুলে চেয়েছে কিনা তাহলে নাবো নিশ্চয়ই বলত,—'না'। ঘোড়াগুলোকে দলাইমলাই করার পর ওর একটাই কাজ ছিল—কালো মানুষটাকে নজরে রাখা।

এক শনিবারে কালো মানুষটা তার নির্দিষ্ট জায়গায় ছিল না। প্রথমটায় ওর মনে হয়েছিল, কয়্যার থাকলেও লোকটি হয়তো আজ আসবে না। তবু ওর আবার ধারণা হয়েছিল, কালো মানুষটি হয়তো পরের শনিবার ফিরে আসবে। কিন্তু পরের শনিবারেও সে ফিরে এল না। আর কয়্যার দলটিও সেখানে রইল না।

একপাশে গড়িয়ে গিয়ে নাবো মানুষটাকে দেখতে পেল। আস্তবলের ঘনায়মান অন্ধকারে প্রথমে ও তাকে চিনতে পারল না। সে ঢালু তক্তাটায় বসেছিল। কথা বলছিল আর মাঝে মাঝে হাঁটুতে চাপড় মারছিল। 'একটা ঘোড়া আমায় লাথিয়েছে',—লোকটাকে চেনার চেষ্টা করতে করতে নাবো আবার বলল। 'খুবই সত্যি কথা',—লোকটি বলে চলে। 'এখন আর ঘোড়াগুলো নেই। আমরা তোমার জন্য কয়্যারে অপেক্ষা করছি।' নাবো মাথা নাড়ল। এখনও ভাবতে শুরু করেনি। তবুও ওর মনে হল লোকটিকে আগে যেন কোথায় দেখেছে। কোনওকিছুই ওর বোধগম্য হচ্ছে না। আবার ব্যাপারটা এমন

কিছু আশ্চর্যও নয় যে কারও পক্ষে এ প্রসঙ্গে কোনও কথা বলা অসম্ভব। কারণ, প্রতিদিন পরিচর্যার সময় ঘোড়াদের অন্যমনস্ক রাখার জন্য নাবো গান গায়। হয়তো তারপরেই শোবার ঘরের বোবা মেয়েটাকে অন্যমনস্ক রাখার জন্য নাবো গান গাইবে। গাইবার সময় যদি কেউ এসে ওকে কয়্যারে গান করার প্রস্তাব দেয় তাহলে ও মোটেই চমকাবে না। ফলে ও একটু কমই বিস্মিত। কারণ ও কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। নাবো এখন ক্লান্ত-নিস্তেজ কিন্তু কঠিন। 'আমি তো তোমায় বলেইছি যে ওগুলো এখানে নেই। একটা সুন্দর গলা আমাদের একমাত্র কাম্য, ঠিক তোমারই মতো।' হয়তো ঘাসে মুখ ডুবিয়ে নাবো শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু কপালে ঘোড়ার লাথির যন্ত্রণাটাকে অন্যান্য অনুভূতির ভিড় থেকে সত্যি সত্যি ও আলাদা করতে পারেনি। ঘাসে মুখ ডুবিয়ে ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

কয়্যার দলে কালো মানুষটি না থাকলেও তারপর থেকে গান-বাজনার আসরে নাবো দু-তিন সপ্তাহ অন্তর যেতে থাকে। কালো মানুষটার কী হয়েছে,—নাবো এরকম প্রশ্ন করলে হয়তো কেউ-না-কেউ জবাব দিত। কিন্তু ও কাউকেই শুধোয়নি। আর যতদিন না অন্য কেউ এসে স্যাক্সোফোনটা ঘাড়ে নিয়ে কালো মানুষটির জায়গা দখল করল ততদিন ও যাতায়াত বজায় রাখে। তখনই নাবোর বিশ্বাস হল, কালো মানুষটি আর ফিরবে না এবং ও ঠিক করে নেয় আর টাউন স্কোয়ারে যাবে না। ঘুম ভাঙতেই ওর মনে হল, খুবই কম ঘুমোনো হয়েছে। শুকনো ঘাসের গন্ধে ওর নাক জ্বলছে। ওর চোখের সামনে, চারপাশে চাপা অন্ধকার। আর মানুষটা সেই কোণেই বসে আছে। তখনও সে হাঁটুতে চাপড় মেরে যাচ্ছে। তার কঠিন অথচ শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল,—'নাবো, তোমার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি। দু' বছর ধরে তো তুমি ঘুমোলে আর এখনও পাঁয়তারা কষছ।' নাবো আবার চোখ বন্ধ করল। চোখ মেলেই ও আবার তাকাল ঘুপচিটার দিকে। বিচলিত-বিমূঢ় অবস্থায় ও মানুষটাকে আবার দেখল। আর সেই মুহূর্তেই ও চিনে ফেলতে পারল তাকে।

বাড়ির লোকেরা যদি জানত নাবো ফি-শনিবার রাতে টাউন স্কোয়ারে যায়, তাহলে যাওয়া বন্ধ করার কারণ হিসেবে একটা কিছু বলা যেত। আর সেটা হল যে নাবো এখন বাড়িতেই গান বাজনার ব্যবস্থা করেছে। সেটা সেই সময়কার ঘটনা, যখন আমরা মেয়েটাকে আনন্দ দেবার জন্য একটা গ্রামোফোন নিয়ে এলাম। যন্ত্রটা চালানোর জন্য কারও প্রত্যক্ষ উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে স্বাভাবিক কারণেই এ ব্যাপারে নাবোর কথাই ভাবা হল। ঘোড়াগুলোর পরিচর্যা হয়ে গেলেই সে এই কাজটা করত। মেয়েটা নিশ্চুপ হয়ে বসে রেকর্ড শুনত। কখনও-সখনও গান চলাকালীন অবস্থায় মেয়েটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াত। দেয়ালের দিকে চোখ রেখেই নিজেকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে বারান্দায় নিয়ে আসত। নাবো হয়তো গ্রামোফোনের পিনটা তুলে দিয়ে নিজেই গাইতে শুরু করত। প্রথম প্রথম, আমাদের বাড়িতে আসার সময়,—কী কী করতে পার,—এই প্রশ্নের উত্তরে নাবো বলেছিল,—গানটা ওর আসে। কিন্তু কেউই ওকে উৎসাহ দেয়নি। ঘোড়াগুলোর দেখাশোনা করার জন্যই আমাদের একটা ছোট ছেলে দরকার। নাবো থেকে গেল। গানই গাইত ও। যেন আমরা ওকে গান গাইবার জন্যেই রেখেছি। আর গাইবার একঘেয়েমি কাটাবার জন্য, গান গাওয়াটা আরও সহজ করার জন্যই যেন মাঝে মধ্যে ও ঘোড়াগুলোর পরিচর্যা করে। ব্যাপারটা প্রায় বছরখানেক চলল। যদ্দিন না আমরা কেউ কেউ বুঝতে পারলাম,—মেয়েটা জীবনেও হাঁটতে পারবে না, কাউকেই চিনতে পারবে না, সেই একই রকম চলৎশক্তিহীন রয়ে যাবে, গ্রামোফোন শুনতে শুনতে দেওয়ালের দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকবে, আর কেউ সাহায্য না করলে ওঠা-বসাও করতে পারবে না—তখন আমরা মেয়েটি সম্পর্কে নির্বিকার হয়ে গেলাম। কিন্তু নাবো তখনও বিশ্বস্ত, নিয়মনিষ্ঠ। গ্রামোফোনটা তখনও সে নিয়মিত বাজিয়ে যায়। এটা সেই সময়কার ঘটনা যখন নাবো নিয়মমাফিক প্রতি শনিবার রাতে টাউন স্কোয়ারে যাচ্ছে। একদিন যখন ও আস্তাবলে, কেউ গ্রামোফোনের পাশ থেকে বলে উঠল,—'নাবো!' আমরা বারান্দাতেই ছিলাম। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও এ বিষয়টায় নজর করিনি। কিন্তু যখন দ্বিতীয়বার 'নাবো' ডাক শুনতে পেলাম, তখনই আমরা মাথা উঁচিয়ে বলাবলি শুরু করলাম,—'মেয়েটির কাছে কে রয়েছে?' কেউ একজন বলল,—'কাউকে তো ভেতরে আসতে দেখিনি।' অন্যজন বলল,—'আমি নিশ্চয়ই কাউকে 'নাবো' বলে ডাকতে শুনলাম।' কিন্তু

আমরা ব্যাপারটা দেখতে ভিতরে গিয়ে দেখি, মেয়েটি দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে।

তাড়াতাড়ি ফিরে নাবো শুতে গেল। কালো মানুষটির পরিবর্তে নতুন লোকটা কাজ শুরু করার পরের শনিবারের ঘটনা এটা। এবং তিন সপ্তাহ পরে এক সোমবার গ্রামোফোনটি বাজতে শুরু করল। নাবো তখন আস্তাবলে। প্রথমটায় কেউই বিচলিত হয়নি। পরে যখন আমরা দেখলাম কালো ছেলেটা গান গাইতে গাইতে আসছে আর তখনও ওর সর্বাঙ্গে ঘোড়া-ধোয়া-মোছার চিহ্ন। আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম,—'কি করে তুই বাইরে গেলি?' জবাবে ও বলল,—'কেন দরজা দিয়ে। আমি তো দুপুর থেকেই আস্তাবলে ছিলাম।' 'গ্রামোফোনটা বাজছে শুনতে পাচ্ছিস?' আমাদের প্রশ্নে ও নির্বিকারভাবে বলে,—'বাজছে বটে।' আমরা জানতে চাইলাম,—'কে চালাল ওটা?' নাবো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে,—'দিদিমণি। উনি তো অনেক দিন ধরেই ওটা চালাতে জানেন।'

এইভাবেই তদ্দিন পর্যন্ত সবকিছু চলছিল, যদ্দিন না ওকে বন্ধ আস্তাবলের ভিতরে ঘাসে মুখ গোঁজা অবস্থায় পাওয়া গেল। ওর কপালে ঘোড়ার সামনের পায়ের খুরের ছাপটা গেঁথে রয়েছে। কাঁধ ধরে ওকে তুলে ধরবার পর নাবো বলল,—'আমি এখানে। একটা ঘোড়া আমায় লাথিয়েছে।' কিন্তু ও কী বলতে পারছে সে বিষয়ে আমরা কেউই উৎসাহী নই। আমরা কেবল ওর ঠান্ডা-মৃত চোখ আর মুখভর্তি সবুজ ফেনা দেখতেই ব্যস্ত। সারাটা রাত ধরে ও কেঁদেই চলল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। আস্তাবলের ঘাসের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া চিরুনিটার শোকে ও বিস্তর প্রলাপ বকে গেল। সেটা ছিল প্রথম দিন।

পরের দিন সে চোখ মেলল আর বলল,—'তেষ্টা পেয়েছে।' আমরা জল নিয়ে এলাম। ও এক চুমুকে সবটুকু জল খেয়ে নিয়েই আবার চাইল। কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করায় ও বলল,—'মনে হচ্ছে যেন একটা ঘোড়া আমায় লাথিয়েছে।' তারপরেও অষ্টপ্রহর প্রলাপ বকে গেল। এবং অবশেষে ও বিছানায় উঠে বসল। মুষ্ঠিবদ্ধ তর্জনী উঁচিয়ে বলতে লাগল,—সারারাত ঘোড়ার পায়ের শব্দ ওকে জাগিয়ে রেখেছে। তবে আগের রাত পর্যন্ত জ্বর ছিল না। হয়তো প্রলাপ বকেনি, কিন্তু মুখে রুমাল গুঁজে না দেওয়া পর্যন্ত বকবক করেই গেল। তারপর নাবো রুমাল মুখেই গান গাইতে শুরু করল ; যার বিষয়বস্তু,—বন্ধ দরজার ওপাশে ঘোড়াগুলো কী রকম গরম নিশ্বাস ফেলছে, আর তা সে পুরোপুরি শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু খাবার জন্য মুখ থেকে রুমালটা বের করতেই ও দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ল। আর আমরা ভাবলাম ও ঘুমোল, মানে কিছুক্ষণের জন্যও ঘুমোতে পারল। কিন্তু যখন জাগল তখন ও আর বিছানায় নেই। ঘরেরই কড়ি-বরগায় শক্ত করে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে। আর ওই অবস্থাতেই ও গান গাইতে শুরু করল।

মানুষটাকে চিনতে পেরেই নাবো বলল,—'আমি তোমায় আগে দেখেছি।' উত্তরে সেই মানুষটি বলল,—'প্রতি শনিবার তুমি টাউন স্কোয়ারে আমার উপর নজর রাখতে।' আর নাবো বলল,—'হ্যাঁ! কিন্তু আমি ভাবতাম, আমিই তোমায় দেখছি। তুমি নও।' লোকটা জবাব দেয়,—'আমি তোমায় দেখিনি। কিন্তু যাওয়া বন্ধ করতেই বুঝলাম, শনিবার কেউ আর আমার উপর নজরদারি করছে না।'

নাবো বলে,—'তুমি আর ফিরে এলে না। কিন্তু আমি তারপরও তিন-চার সপ্তাহ গেছি।' লোকটা নিথর হয়ে বসে মাঝে মাঝে হাঁটু চাপড়াতে থাকে। 'টাউন স্কোয়ারে আর যেতে পারিনি, যদিও অনেক কিছুর চেয়েই জায়গাটা যথেষ্ট মূল্যবান।' লোকটা থামতেই নাবো উঠে বসার চেষ্টা করল, মাথাটা রগড়াল ঘাসে, আর ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ওর কানে লেগে রইল সেই ঠান্ডা, একগুঁয়ে কণ্ঠস্বর। সবসময়, ঘোড়ার লাথি খাবার পর থেকেই, এটা ঘটে। আর সব সময়েই শোনে সেই কণ্ঠস্বর,—'আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি নাবো ; তোমার ঘুমের সময় মাপবার কোনও উপায়ই নেই।'

কালো মানুষটির টাউন স্কোয়ারে আসা বন্ধ হওয়ার চার সপ্তাহ বাদে নাবো একদিন ঘোড়ার লেজ আঁচড়াচ্ছিল। কোনওদিনই ও এই কাজটা করেনি। ও শুধু ঘোড়ার পরিচর্যা করত আর ফাঁকতালে গান গাইত। কিন্তু বুধবার বাজারে গিয়ে একটা চিরুনি দেখে ও মনে মনে বিড়বিড় করে বলে,—'এই চিরুনিটা ঘোড়ার লেজ আঁচড়ানোর জন্য।' এটা দশ-পনেরো বছর আগেকার ঘটনা। তখন একটা ঘোড়া ওকে লাথি মেরে এক জটিল প্যাঁকে ফেলে দিয়েছিল। বাড়িতে কেউ কেউ বলেছিল,—'সেদিনই মরে গেলে

ভালো হত ; তাহলে অন্তত আজ আর এইরকম বোকা বোকা কথা বলে জীবন কাটাতে হত না।' ঘরে বন্ধ করে রাখবার পর কেউ আর ওকে দেখেনি। আমরা শুধু জানতাম ও ঘরের ভিতরেই বন্ধ অবস্থায় আছে। আর মেয়েটিও সেইদিন থেকে গ্রামোফোনটা আর কোনওদিন বাজায়নি। বাড়িতে এ বিষয়ে খুবই কম কৌতূহল। আমরা ওকে এমনভাবে বন্ধ করে রেখেছিলাম যেন ও একটা চারপেয়ে জীব, আর এই চারপেয়েটার বোকামির জন্যই যেন কালচে ঘোড়াটা অলস পদচারণার সময় ওর কপালে খুরের ছাপ এঁকে দিয়েছে। আর এই সবকিছুই হল নেহাৎ পশুত্ব। চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে ওকে আটকে রেখে আমরা পালিয়েছিলাম, যেন ও কয়েদি ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠান্ডা মাথায় ওকে জাহান্নমে পাঠানোর জন্যে এর চেয়ে কোনও সহজ উপায় আমাদের জানা ছিল না। চোদ্দোটা বছর এভাবেই কেটে গেল, যদ্দিন না সেই শিশুদের একজন বড় হয়ে বলল, সে নাবোকে দেখতে চায়। এবং সে দরজা খুলল।

নাবো আবার লোকটাকে দেখতে পেল। 'একটা ঘোড়া আমায় লাথিয়েছে'—ও জানায়। লোকটা বলে,—'কত শতাব্দী ধরে তোমার মুখে এই একই কথা। এদিকে আমরা কয়্যারে তোমার অপেক্ষায় দিন গুনছি।' নাবো আবার মাথা নাড়ল। মাথাটা আরও একবার ঘাসের স্তূপে ডুবিয়ে দিল। আর ভাবতে থাকল। হঠাৎই ওর মনে পড়ে গেল কীভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল। 'সেই-ই প্রথম আমি একটা ঘোড়ার লেজ আঁচড়িয়েছিলাম'—নাবো বলল। আর লোকটা বলে,—'আমরা চাইছিলাম ওইভাবেই তুমি আমাদের কয়্যারের দলে এসে গান গাও।' কিন্তু নাবো বলে,—'চিরুনিটা কেনা আমার উচিত হয়নি।' আর লোকটা বলল,—'যে করেই হোক ওটা তোমার কপালে ছিল। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে তুমি চিরুনিটা পাবে আর ঘোড়াটার লেজ আঁচড়াবে।' আর নাবো বলল,—'অথচ এর আগে আমি কোনওদিন ঘোড়ার পেছনে দাঁড়াইনি।' আর লোকটা এখনও শান্ত, এখনও তার চোখেমুখে অধৈর্য হবার কোনও লক্ষণই নেই। 'কিন্তু তুমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলে আর ঘোড়াটা তোমায় লাথি মেরেছিল। কয়্যারে আসার পক্ষে তোমার এটাই একমাত্র পথ।' আর সেই কথোপকথন অশান্তভাবে প্রতিদিনই চলতে থাকল, যতদিন না বাড়ির কেউ একজন বলল,—'পনেরো বছর হল কেউ দরজাটা খোলেনি।' মেয়েটি আর বেড়ে ওঠেনি। তার এখন তিরিশ বছর বয়স আর চোখের কোলে অনিবার্য কালি। চুপচাপ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সে বসে আছে। যখন দরজাটা খোলা হল সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে ফোঁপাতে শুরু করল। এবং দরজাটা বন্ধ করে বলা হল,—'নাবো শান্তিতে থাক। ভিতরে কিছু সচল নয়। এরকমভাবেই একদিন ও মরে যাবে। সেই গন্ধ ছাড়া আমরা কিছুই বলতে পারব না।' অন্য একজন বলল,—'খাবার সম্পর্কে বলা যায়, ও কখনই খাওয়া থামায়নি। বন্দি হিসেবে ও চমৎকার। ওকে বিরক্ত করার জন্য ওখানে কেউ নেই। ঘরের পিছন দিকের এক কোনা থেকে ও যথেষ্ট আলো পায়।' আর সবকিছু এমনভাবে সাজানো যে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া মেয়েটি ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের ধুলোয় একটু যেন হাঁটছিল। ভোর হওয়া পর্যন্ত সে একইভাবে সেখানে বসেছিল। তারপর আমরা ধাতব শব্দটি শুনতে পেলাম, পনেরো বছর আগে নাবো যখন গ্রামোফোন বাজাত, ঠিক সেইরকম। উঠে দাঁড়ালাম। বাতি জ্বালালাম। কানে এল সেই প্রায় ভুলে যাওয়া গানের প্রথম কলি। এতদিন ধরে রেকর্ডের ঝাঁপিতে বন্দি হয়ে থাকা বিষণ্ণ সেই গান। ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে যাওয়া সুরেলা শব্দটা পাওয়া যাচ্ছিল। এরপর শোবার ঘরে ঢুকতেই কানে এল খটখটে শুকনো একটা শব্দ। রেকর্ডটা বাজছিল। আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। কেবল মেয়েটা গ্রামোফোনের এক কোণে বসে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রেকর্ডটার মাথায় পিনটা তুলছে। আমরা কথা বলছিলাম না কিন্তু প্রত্যেকেই এটা মনে করতে করতে ঘরে ফিরে এলাম, যেন কেউ আমাদের বলেছিল,—মেয়েটা গ্রামোফোন চালাতে জানে। এমনভাবেই ভাবতে ভাবতে উৎকণ্ঠায় সময় কাটাতে কাটাতে আমরা শুনছিলাম, বিধ্বস্ত বসন্তের ফেলে আসা দিনগুলির আর্তধ্বনি কর্কশ সুরে রেকর্ডে বেজে যাচ্ছে।

আগের দিন দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে পূতিগন্ধময় শবের দূষিত একঝলক বাতাস নাকে এসেছিল। যে দরজাটা খুলেছিল সে চেঁচিয়ে উঠল,—'নাবো, নাবো!' কিন্তু ভিতর থেকে কোনও সাড়া এল না।

শূন্য থালাটা চোখে পড়ল। দিনের মধ্যে তিনবার থালাটা খাবার ভর্তি হয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আর তিনবার খালি হয়ে ফিরে আসে।

এভাবেই আমরা জানতে পারতাম নাবো বেঁচে আছে। এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। ভিতরে কোনওরকম স্পন্দন নেই। ছিল না কোনও গানের রেশ। আর দরজাটা বন্ধ করে দেবার পর নাবো নিশ্চয়ই লোকটাকে বলেছিল,—'আমি কয়্যারে যেতে পারব না।' আর লোকটা জিজ্ঞেস করল,—'কেন?' নাবো জবাব দেয়,—'আমার জুতো নেই।' লোকটা তখন পাটা উঁচিয়ে বলে,—'কেন?' নাবো জবাব দেয়,—'আমার জুতো নেই। এখানে কেউ জুতো পরে না।' নাবোর চোখের সামনে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষটার শক্ত পায়ের তলার চামড়া। 'এক পুরুষ ধরে আমি তোমার জন্য বসে আছি।' নাবো শান্তভাবে বলে,—'ঘোড়াটা আমায় খানিক আগেও লাথিয়েছে। এখন আমি মুখেচোখে জল দিয়েই ওদের নিয়ে হাঁটতে বেরোব।' লোকটা আবারও বলে,—'ঘোড়াগুলোর তোমাকে আর দরকার নেই। তা ছাড়া এখানে কোনও ঘোড়াও নেই। আমাদের একজন হিসেবেই তোমার এবার আসা উচিত।' একটু উঠে নাবো যখন ঘাসে হাত ডুবোল তখন লোকটা বলল,—'পনেরো বছর ধরে ওদের ঘোড়া দেখাশোনার কোনও লোক ছিল না।' ঘাসের তলায় মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে নাবো জবাব দেয়,—'চিরুনিটা এখনও এখানেই আছে।' লোকটা বলল,—'পনেরো বছর আগে ওরা আস্তাবল বন্ধ করে দিয়েছে। এখন ওটা জঞ্জালে ঠাসা।' তখন নাবো বলল,—'এক বিকেলে কখনও এত জঞ্জাল ডাঁই করা যায় না। চিরুনিটা না পাওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না।'

পরদিন, আবার দরজাটা বন্ধ করার সময় একটা দুর্বোধ্য চলাফেরার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। শেষ পর্যন্ত কেউই নড়েনি। প্রথম কড়কড় শব্দ শোনা পর্যন্ত কেউ একটাও কথা বলেনি। আর তারপরেই বোঝা গেল দরজার ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ছে। ভিতরে এক বদ্ধ জানোয়ারের পদচারণার শব্দ পাওয়া গেল। ওটা হাঁপাচ্ছে। শেষমেশ দরজাটা অর্গলমুক্ত করার পর উত্তেজিত কর্কশ-ঘরঘর ধ্বনি শোনা গেল,—'চিরুনি না পাওয়া পর্যন্ত আমি কয়্যারে যাব না।' ও বলেই চলে,—'এখানেই কোথাও রেখেছি ওটা।' উবু হয়ে ঘাসগুলো মুষ্টিবদ্ধ করায় কিছু ঘাস ছিঁড়ল, অবিশ্রান্তভাবে মাটিটা আঁচড়াল। লোকটা তখন বলে উঠল,—'ঠিক আছে নাবো। যদি কয়্যারে আসার আগে তোমার চিরুনি খোঁজাটাই জরুরি হয় তাহলে খুঁজেই যাও।' উবু হয়ে ও এগিয়ে গেল। মুমূর্ষু রোগীর প্রবল তড়াসে ওর মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছে। বেড়ার গায়ে হাতটা রেখে ও নিজে নিজেই বলল,—'এগিয়ে যাও নাবো। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তোমায় কেউ থামাতে পারবে না।'

আর তারপরেই দরজাটা খুলে গেল। দৈত্যাকৃতি বিশালদেহী কালো মানুষটি পনেরো বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষতবিক্ষত কপাল নিয়ে হোঁচট খেতে খেতে আসবাবের ডাঁই ঘেঁটে বেরিয়ে এল। ওর মুষ্টিবদ্ধ, ভীতিপ্রদ হাত আকাশপানে উঁচিয়ে আছে।

পনেরো বছর আগের দড়িটা হাতে লটকানো। যখন ও ছোট ছিল ঘোড়া দেখাশোনাই ছিল ওর কাজ; উঠোনে পৌঁছোনোর আগেই ও মেয়েটিকে পেরিয়ে গেল। সে তখন নিশ্চুপ হয়ে বসে রয়েছে। গ্রামোফোনের চোঙটা তার হাতে। কৃষ্ণবর্ণের এই ভয়ংকর শক্তিধরকে দেখে তার হয়তো মনে পড়ল, আগেও কেবল তার কাছে একটা শব্দের আধার ছিল। এদিকে ও আস্তাবলের দিকে না তাকিয়েই উঠোনে পৌঁছোল। কাঁধের ঝাঁকানিতে শোবার ঘরের আয়নাটা চৌচির হয়ে গেল। এসব কিন্তু মেয়েটার নজরে আসেনি। গ্রামোফোন বা আয়নার দিকে না তাকিয়ে সূর্যের দিকে মুখ উঁচিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ বন্ধ। এদিকে অন্ধভাবে, উদ্দেশ্যহীন গতিতে ও তখন চোখবাঁধা ঘোড়ার মতো প্রবৃত্তির তাড়নায় ছুটে চলেছে। পনেরো বছরের বন্দিজীবন স্মৃতি থেকে মুছে গেলেও প্রবৃত্তি ওকে সরিয়ে নিতে পারেনি। সেই সুদূর অতীতে ও ঘোড়ার লেজ বিন্যাস করত আর তারপর তো সারা জীবনই ও বিভ্রান্ত। পিছনে ফেলে চলেছে প্রলয়-ধ্বংস। হাজার চিরাগের অত্যুজ্জ্বল কুঠুরিতে চোখবাঁধা ষাঁড়ের মতো ও পিছনের উঠোনে গিয়ে হাজির হল। আস্তাবলটা এখনও ওর নজরে পড়েনি। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাগে ও মাটি আঁচড়াতে

শুরু করল। যে রাগে ও একটু আগেই আয়নাটা ভেঙে ফেলেছে। তেমনভাবে হয়তো মাটি আঁচড়িয়েই ও আবার ঘোড়ার পেচ্ছাপের গন্ধে দশ দিক ভরিয়ে দেবে। আস্তাবলের দরজায় পৌঁছিয়েই ধাক্কা দিতে শুরু করা না করা পর্যন্ত, হয়তো মৃত্যুভয়ে ভারাক্রান্ত হয়েই, ও ছিল উন্মাদ জান্তবতায় বিভ্রান্ত। আধ সেকেন্ড আগেও মেয়েটির শোনার ইচ্ছা মিলিয়ে গিয়েছিল। গ্রামোফোনের চোঙটা উপরে তুলেই সে শুনতে পেল। তাকে পাশ কাটাতে গিয়ে ওর মনে পড়ল,—গড়িয়ে গড়িয়ে লালা ঝরছে, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে এতটুকুও নড়ছে না, মুখখানা না হেলিয়েই গ্রামোফোনের চোঙটা বনবন করে এদিকে ওদিকে ঘোরাচ্ছে। তার মনে পড়ল সেই একটি মাত্র কথা যা সে সারা জীবনে বলতে শিখেছে ; এবং সে শোবার ঘর থেকেই চেঁচিয়ে উঠল,—'নাবো, নাবো।'

মূল শিরোনাম : Nabo, el negro que Ilegaba a las seis

গোলাপগুচ্ছকে কেউ এলোমেলো করেছিল

দিনটা রবিবার বলে আর বৃষ্টিটা ধরে যাওয়ার জন্যে সেই সমাধিক্ষেত্রে আজ একগুচ্ছ গোলাপ রাখার কথা মনে হল। সেই লাল-সাদা গোলাপ। সমাধি সাজাবার জন্যেই ও এই গোলাপের চাষ করেছে। একটানা শীতের দাপটে আজকের সকালটা বিষণ্ণ হয়ে আছে। এখনই সেই গোলাকার টিলাটা আমার স্মৃতিতে ভেসে এল যেখানে শহরের মানুষ তাদের প্রিয়জনকে ছেড়ে চলে আসে। রুক্ষ-উষর জায়গাটায় হাওয়া সারাদিন মাতামাতি করে। এখন বৃষ্টি থামার পর দুপুরের রোদে পিছল ও ঢালু রাস্তাটা শুকনো হয়েছে। আমি নিশ্চয়ই সেই সমাধিক্ষেত্রে পৌঁছাতে পারব যেখানে আমাদের বাছাকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল, যেখানে শামুক বা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মিলে-মিশে তার শরীরটা একাকার হয়ে গেছে।

চিন্তায় বিভোর হয়ে ও ঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ঘরের ভেতরে আমার নড়াচড়া বন্ধ হতেই ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। কাজেই তরতাজা আর সুন্দর গোলাপের বেদিতে যাওয়ার আমার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। হয়তো, আজ কাজটা করতাম। তবে কুপিটার মৃদু শিখা টিমটিম করে জ্বলার পরে মনে হল,—ওর ঘোর কাটছে। মুখ তুলে ও কোণের চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে থাকল। ও মনে মনে ভাবল,—আবার হাওয়ার দাপট। আসলে বেদির জায়গাটা কয়েক মুহূর্তের জন্য নড়ে উঠল। ওর মনের ভেতর আটকে থাকা স্মৃতির টুকরোগুলোও যেন জেগে উঠল। তখনই বুঝতে পারলাম যে,—গোলাপগুলো নেওয়ার জন্যে অন্য কোনো সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, ও চেয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার হাত নাড়ার আওয়াজ ও টের পেয়ে গেছে। পাশের ঘরে ওর রবিবারের দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামে যাওয়া পর্যন্ত আমায় অপেক্ষা করতেই হবে। ও এ ঘরে ফিরে চেয়ারের দিকে নজর দেবার আগেই, আমি গোলাপগুলো রেখে ফিরে আসতে পারি।

গত রবিবারে আমার পক্ষে কাজটা আরও কঠিন ছিল। ওর ঘোর আসার আগেই আমায় প্রায় ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সেদিন ও কেমন যেন অস্থির আর বিহ্বল হয়ে পড়ে। এই বাড়ির নির্জনতা ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কায় ও কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। গোলাপের তোড়া হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে কয়েকবার অস্থির পায়চারি করে ও বেদির কাছে ফিরে এল। তারপর হল্‌ঘর পেরিয়ে চলে গেল পাশে। আমি জানি ও তখন কুপিটার খোঁজ করছিল। একটু পরে দরজার পাশ দিয়ে ওর যাবার সময় ঘরের আলোয় ওর গাঢ় রঙের খাটো জ্যাকেট আর গোলাপি মোজার দিকে আমার নজর গেল। মনে হল, ও চল্লিশ বছর আগেকার সেই বালিকা যে এই ঘরেই আমার বিছানায় ঝুঁকে থাকত আর আমাকে বলত...

ও একেবারে একইরকম আছে। মনে হচ্ছে, সেই অগস্ট মাসের পর সময় আর কাটেনি—যেদিন এক মহিলা ওকে ঘরে ঢুকিয়ে মৃতদেহটা দেখিয়ে বলেছিলেন,—'এবার কাঁদো, ও তোমার ভাইয়ের মতো ছিল।' ও দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে, বৃষ্টি ভেজা জামাটা গায়ে লেপটে বাধ্য মেয়ের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ল। গত তিন-চার রবিবার ধরেই আমি দেখা করে যাচ্ছি। কীভাবে গোলাপগুলো পাওয়া যায়, চেষ্টা করছি। কিন্তু বেদির সামনে অতন্দ্র প্রহরীর মতো করে এমন সন্ত্রস্তভাবে ও নজর রাখছিল যেন এই কুড়ি বছর ধরে এ বাড়িতে থাকার বিষয়টাকে আমি জানতে না পারি। গত রবিবার কুপিটা আনতে ও ভেতরে গেলে তাজা ফুলগুলো সাজিয়ে রাখার সুযোগ এল। আমি একটুও সময় নষ্ট করলাম না। তবে চেয়ারে আবার ফিরে আসার সময় বারান্দায় ওর পায়ের আওয়াজ পেলাম। বেদির ফুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে দেখি কুপির শিখাটা বাড়িয়ে ও দরজার বাইরে আসছে।

সেদিন ও গাঢ় রঙের খাটো জ্যাকেট আর গোলাপি মোজা পরেছিল। তবে ওর মুখটা আলোয় ঝলমল করছিল। সেই মুহূর্তে ওকে সেই মহিলা বলে মনে হচ্ছিল না যিনি গত চল্লিশ বছর ধরে বাগানে গোলাপ ফুটিয়ে চলেছেন। ওকে বিকেলবেলায় পোশাক পালটাবার জন্যে নিয়ে আসা হয়েছিল। আজ চল্লিশ বছর পরে তাকে কুপি হাতে পৃথুলা আকারে দেখলাম। শরীরে বয়সের ছাপ পড়েছে। আমার জুতো জোড়ায় বিকেলের লেগে থাকা সেই কাদাটা শুকনো হয়ে আটকে আছে। নিভন্ত উনুনের পাশে সেই জুতো জোড়া চল্লিশ বছর ধরে শুকোচ্ছে। একবার জুতো জোড়া আনতে গিয়েছিলাম। ওদের বাড়ির দরজা তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সদবে ঢোকার মুখের গাছপালাগুলোও কেটেকুটে সাফ করা হয়েছে। একমাত্র কোনের চেয়ারটা, যেটা সবসময় আমারই বসার জায়গা, ছাড়া যাবতীয় আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমি জানি জুতো জোড়া শুকোতে দিয়ে বাড়ি খালি করার সময় সেগুলোকে নিয়ে যেতে সকলেই ভুলে গেছিল। আর সে জন্যেই আমি ওগুলোর হদিশ পেয়েছিলাম।

অনেক বছর পরে বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম। এর মধ্যে এত সময় পেরিয়ে গেছে যে চেনা সুগন্ধ মুছে গিয়ে ধুলো আর পোকামাকড়ের গন্ধ ঘরটায় বাজত্ব করছিল। একেবারে একা হয়ে আমি ঘরের কোনায় বসে অপেক্ষা কবছিলাম। কানে এল কাঠ ক্ষয়ে যাওয়ার শব্দ। শোবার ঘরের বন্ধ দরজায় হাওয়ার ঝাপটার শব্দ কান পচিয়ে দিল। এমন সময় ও ফিরে এল। হাতে একটা বাক্স নিয়ে ও দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওর মাথায় সবুজ টুপি। পরনে কাপড়ের ছোট্ট জ্যাকেট। তখন ও একেবারে বালিকা। তখনও এমন মোটা হতে শুরু করেনি। পায়ের গোছ এত ভারী হয়নি। আমি তখন ধুলোর আস্তরণ আব মাকড়সার জালে প্রায় জড়িয়ে গেছি। এমন সময় ও দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। দরজা খোলার শব্দে কুড়ি বছর ধরে একটানা ডেকে চলা ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। মাকড়সার জাল আর ধুলোর পরতে জড়িয়ে থাকা ঝিঁঝি পোকার ডাক থমকে যাওয়ায় মনে হল সূচনা হল এক নতুন যুগের। আমি ওর মধ্যে সেই বালিকাকে আবিষ্কার করলাম যে অগস্ট মাসের ঝড়ের বিকেলে একটু নিরিবিলি আশ্রয় খুঁজতে চলে গেছিল আমার সঙ্গে আস্তাবলে। মাথায় সবুজ টুপি পরে আর বাক্স হাতে নিয়ে ও এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াল যেন এক্ষুনি চিৎকার করে সেই একই কথা বলবে যে কথা আস্তাবলের খড় বিছানো মেঝের মধ্যে আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে সেই বালিকাটি বলেছিল। ও দরজাটা হট করে খুলে ফেলায় কবজাগুলো ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ করে উঠল। ঘরের সিলিং থেকে জমাট ঝুল এমনভাবে ঝরে পড়ল যেন হঠাৎ কেউ বাড়ির ছাদ পেটাতে শুরু করেছে। ঘরের মাঝখান পর্যন্ত এসে ও আবার চৌকাঠের দিকে ফিরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে একেবারে পরিচিত গলায় ঘুমন্ত মানুষকে ডাকবার ভঙ্গিতে বলে উঠল,—'খোকা, খোকা।' আমি হতবাক হয়ে চেয়ারে বসে আছি। ছড়ানো পা দুটো যেন পাথর হয়ে গেছে।

ভেবেছিলাম, ও শুধু ঘরটাই দেখতে এসেছে। কিন্তু ও এখানে থাকতে শুরু করল। ঘরের বন্ধ হাওয়া তাড়িয়ে দিয়ে ও যেন বাক্সেব ভেতর থেকে ঘরেব সুগন্ধ ফিরিয়ে আনল। আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছু ওরা বাক্সে ভরে নিয়ে গেছে। ও শুধু ঘরের নিজস্ব গন্ধটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, যা আবার ফিরিয়ে এনেছে কুড়ি বছর বাদে। সময়েব অবশ্যম্ভাবী ক্ষয় আটকাবার জন্যে আগের মতো ফুলের ছোট বেদিটা সাজাতে শুরু করেছে। শুধু ও-র উপস্থিতিই যথেষ্ট। তারপর থেকেই ও এই ঘরে বা পাশের ঘরটায় থাকত, খেত, ঘুমোত। তবে ওর দিনের বেলাটা অশরীবী পবিত্র মানুষটির সঙ্গে নিঃশব্দ কথোপকথনে কাটত। বিকেল হলে দরজার পাশে দোলনাটায় বসে ও পুরোনো কাপড় সেলাই করত। আর যখনই ফুলের তোড়া কিনতে কেউ আসত কোমরে বাঁধা রুমালের মধ্যে ফুলের দাম রাখতে রাখতে ও বলত,—'ডানদিকের গোছাগুলো থেকে একটা তুলে নিন। সেই পবিত্র মানুষটির জন্য বাঁদিকেরটি রাখা আছে।'

একইভাবে দোলনায় বসে পুরোনো কাপড়ে তালি লাগিয়ে বা চেয়ারের দিকে তাকিয়ে ওর জীবনের কুড়িটা বছর কেটে গেল। এখন যেন ওর আর সেই ছোট্ট ছেলেটির দিকে নজর নেই যার সঙ্গে ওর ছেলেবেলার অনেক বিকেল কেটেছে। এখন ও মাথাটা নিচু করলেই আমি গোলাপগুলোর কাছে পৌঁছে

যেতে পারি। ফুল আনতে পারলে আমি ওই টিলাটার কাছে যাব, ওই সমাধির ওপর গোলাপগুচ্ছ রাখব। তারপর আবার চেয়ারে ফিরে এসে পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করব। সেদিন ও আর ফিরে আসবে না। ঘর আবার নিঝুম-নিস্তব্ধ হয়ে যাবে। সেদিন সবকিছুই বদলে যাবে। কারণ, আমাকেও সেদিন ঘর ছাড়তে হবে।

মূল শিরোনাম Alguien desordena estas rosas

একটা নীল কুকুরের চোখ

তারপর ও আমার দিকে তাকাল। আমি ভাবলাম,—এই প্রথম বোধ হয় ও আমাকে দেখছে। কিন্তু তারপর যখন ও বাতিটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল তখন আমি অনুভব করলাম ও নির্লিপ্ত ভাবে এক দৃষ্টিতে আমাকেই দেখছে। আমি আরও অনুভব করলাম এই প্রথমবারের মতো আমিই ওর দিকে তাকিয়ে আছি। একটা সিগারেট ধরালাম। চেয়ারটাকে টেনে এনে এমন ভাবে বসলাম যেন শুধু মাত্র পেছনের পায়া দু'টোর উপর ভর করে দোলা যায়। খুব জোরে সিগারেটে একটা টান দিলাম। তারপর আবারও দেখলাম ওকে। বাতিটার পাশে দাঁড়িয়ে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে যেন প্রতি রাতেই ও এভাবে আমায় দেখে। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। আমরা একজন আরেকজনকে দেখছিলাম। চেয়ারের পেছনের পায়ায় ভর দিয়ে দোল খেতে খেতে আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। বাতির উপর লম্বাটে ধরনের শান্ত হাতটা ছড়িয়ে দিয়ে ও আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি দেখলাম ওর আঁখিপল্লব প্রতি রাতের মতো ঝকমক করছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই রোজকার মতো আমার মনে পড়ল,—'একটা নীল কুকুরের চোখ।' বাতির উপর থেকে হাতটা না সরিয়েই ও বলল,—'হ্যাঁ, ওটা আমরা জীবনে ভুলব না।' আলোর বৃত্ত থেকে একটু সরে গিয়ে ও ফিসফিস করে উঠল,—'একটা নীল কুকুরের চোখ। সব জায়গাতেই আমি এটা লিখে চলেছি।'

ওকে ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগোতে দেখলাম। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা গোলাকার। আয়নার সামনে বসে আমার দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী ও সামনে-পিছনে চারদিক থেকেই দেখতে পাচ্ছিল আমাকে। জ্বলন্ত কয়লার মতো গনগনে দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে ও তখনও তাকিয়ে রয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থায় ও সেই ছোট্ট বাক্সটা খুলল যার ঢাকনায় গোলাপি মুক্তো বসানো। ও নাকে পাউডার লাগাল। প্রসাধন শেষ করে বাক্সটা বন্ধ করল। উঠে দাঁড়িয়ে আবার বাতিটার দিকে এগোতে এগোতে বলল,—'আমার ভীষণ ভয় করছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন এই ঘরটাকে স্বপ্নে দেখতে পাচ্ছে আর আমার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দিচ্ছে।' আয়নার সামনে বসার আগে যেভাবে ও নিজের লম্বাটে ধরনের কাঁপা কাঁপা হাত দিয়ে বাতি-শিখাকে ঘিরে রেখেছিল, আবারও সেইভাবেই হাত গরম করতে করতে বলল,—'হ্যাঁ গো, তোমার ঠান্ডা লাগে না!' আমি বললাম,—'কখনও কখনও লাগে।' এবার ও বলে ওঠে,—'তোমার এখন ঠান্ডা লাগা উচিত।' এবং আমি বুঝতে পারলাম কেন একা একা আমার পক্ষে আর বসে থাকা সম্ভব নয়। ঠান্ডার জন্যেই আমার একাকিত্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। আমি বললাম,—'এখন আমাব বেশ ঠান্ডা লাগছে।' রাত্রির নীরবতার জন্যেই হয়তো এমন আশ্চর্য লাগছে। হয়তো চাদরটা সরে গেছে। ও উত্তর দিল না। ও আবার এগিয়ে গেল আয়নাটার দিকে। আমিও ওর দিকে পিছন ফিরে চেয়ারটায় বসলাম। ওকে না দেখেও বুঝতে পারছিলাম ও কী করছে। আমি জানি আয়নায় আমার পিঠের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে নিজের দৃষ্টিতেই ও ডুবে রয়েছে। তার পর নিজের ওষ্ঠাধর রাঙাল ক্রিমসন রঙে। আমার সামনের দেওয়ালটা এক অনুজ্জ্বল আয়নার মতো। এই দেওয়ালে ওর প্রতিবিম্ব আমি দেখতে না পেলেও একটা আয়না টাঙানো থাকলে যেমন দেখতে পেতাম সেই রকম আন্দাজে বুঝতে পারলাম ও আমার পিছনে বসে কী করছে। আমি ওকে বললাম,—'আমি তোমায় দেখছি।' আর দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম আয়নায় ফুটে ওঠা আমার প্রতিবিম্বটা, যেখানে পেছন ফিরে বসা অবস্থায় আমায় দেখা যাচ্ছে আর ও একমনে সেই দিকে তাকিয়ে আছে। এবার ও দৃষ্টি নামিয়ে নিজের বক্ষবন্ধনীর দিকে তাকাল। মুখ কিন্তু বন্ধ। আমি আবারও বললাম,—'আমি কিন্তু তোমায় দেখছি।' ও শান্তভাবে নিজের বক্ষবন্ধনীর দিকে তাকিয়েই বলল,—'অসম্ভব।' কারণ

জিজ্ঞেস করায় ও বলল,—'তোমার মুখ তো দেওয়ালের দিকে।' চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে সরাসরি আয়নার দিকে তাকালাম। শক্ত করে চেপে ধরলাম ঠোঁটে ঝুলতে থাকা সিগারেটটা। ও ততক্ষণে আবার বাতিটার কাছে পৌঁছে গিয়ে মুরগির ডানার মতো দুটো হাত দিয়ে বাতি-শিখাটাকে আগলিয়ে রেখেছে। আঙুলের ছায়ায় ওর মুখ ঢাকা। 'মনে হচ্ছে, ঠান্ডা লেগে যাবে',—ও বলল। আরও বলল,—'এটা নিশ্চয়ই একটা বরফের শহর।' ও নিজের দিকে মুখ ঘোরাল আর ওর ত্বক তামাটে থেকে লাল হয়ে হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল। 'এটা নিয়ে কিছু একটা কর',—বলতে বলতেই ও একের পর এক জামাকাপড় খুলতে শুরু করল। সবার আগে বক্ষবন্ধনীটা ছেড়ে ফেলল। 'দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছি',—আমি বললাম। জবাবে ওর কথা,—'না। মুখ ঘুরিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তুমিই আমায় দেখবে।' কথা শেষ হওয়ার আগেই ওর পোশাক ছাড়া হয়ে গেছে আর বাতি-শিখাটা যেন ওর তামাটে ত্বককে চাটতে শুরু করেছে। 'আমি তোমায় এভাবেই দেখতে চাই। তোমার পেটের খাঁজগুলো যেন কেউ পিটিয়ে তৈরি করেছে।' ওর উলঙ্গ শরীর দেখে আমার কথা জড়িয়ে আসার বিষয়টা বুঝে ওঠার আগেই ও নিজেকে গতিহীন করে ফেলে বাতি-শিখার উপর হাত রেখে তাপ পোহাতে লাগল। 'জান তো, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় এই শরীরটা কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি।' তারপর ও আবার নীরব। বাতি-শিখার উপর রাখা হাত দুটোকে নিজের খেয়ালেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। 'কখনও কখনও স্বপ্নে আমার মনে হয় তুমি যেন কোনও এক মিউজিয়ামের কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখা একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি। হয়তো সেই জন্যেই তুমি শীতল।' আমার কথায় সায় দিয়ে ও বলে,—'অনেক সময় উপুড় হয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে মনে হয় শরীরটা যেন ফাঁপা হয়ে গেছে। আমার চামড়াটা ঠিক যেন একটা পাতার মতো পাতলা ফিনফিনে হয়ে যাচ্ছে। তারপর রক্তপ্রবাহ বুঝিয়ে দেয় কেউ যেন আমায় ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকছে। আর আমিও বিছানায় শুয়ে হঠাৎই শরীরের মধ্যে শুনতে পাই অদ্ভুত একটা তামা পেটানো শব্দ। এটা অনেকটা যেন কোনও এক ধাতব পলেস্তারার মতো।' ও বাতিটার আরও কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি বললাম,—'আমি তোমার কথা আরও শুনতে চাই।' ও জবাব দেয়,—'যদি আমরা নিজেদের কখনও জানতে চাই, তবে আমি যখন বাঁ দিকে পাশ ফিরে ঘুমোব তখন আমার পাঁজরায় কান পেতে দেখ,—প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে। আমার মনে হয় সবসময় যদি তুমি এমনটাই করতে।' কথা বলার সময় ওর গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। ও আরও বলল যে বছরের পর বছর ধরেই এমন হয়ে চলেছে। বাস্তব জীবনে আমাকে নিয়ে আসাই নাকি ওর জীবনের একমাত্র ব্রত। একটা নীল কুকুরের চোখ,—এই পুরোনো প্রবাদটাকেই ও যেন সার্থক করতে চায়। এই কথাটা চিৎকার করে বলতে বলতে ও রাস্তায় হাঁটতে শুরু করল। অন্তত এমন একজনকে যেন ও বিষয়টা জানাতে চায় যে ওকে বুঝেছে।

আমিই একমাত্র মানুষ যে প্রতি রাতে তোমায় স্বপ্নে শোনায়,—'একটা নীল কুকুরের চোখ।' শুনে ও বলল রেস্তোরাঁয় খাবারের অর্ডার দেওয়ার আগে ওয়েটারকে বলেছিল,—'একটা নীল কুকুরের চোখ।' ওয়েটাররা রীতিমতো কুর্নিশ করে ওর কথা শোনে। কিন্তু ওয়েটাররা মনে করতে পারে না এমন কোনও কথা এর আগে কখনও ওরা স্বপ্নে শুনেছে কিনা। তারপরে ও হাত মোছার নরম টিস্যু কাগজে লেখে,—'একটা নীল কুকুরের চোখ।' ও ছুরি দিয়ে টেবিলের ওপরও লেখে—'একটা নীল কুকুরের চোখ।' হোটেল বা স্টেশন কিংবা কোনও সরকারি বাড়ির জানালার কাচের উপর জমে থাকা জলকণিকার আস্তরণের ওপর ও তর্জনি বুলিয়ে লেখে,—'একটা নীল কুকুরের চোখ।' একবার ও বলেছিল স্বপ্নে একবার আমায় দেখার সময় তেমন একটা গন্ধ পেয়েছিল যা কোনও ওষুধের দোকানে ঢুকলেই নাকি ওর নাকে ভেসে আসে। ওষুধের দোকানের ঝকঝকে পরিষ্কার নতুন মেঝেটা দেখে ও ভেবেছিল,—স্বপ্নের সেই লোকটা কাছাকাছি কোথাও আছে। তখন সে দোকানের কর্মচারীটিকে বলেছিল,—'জানেন তো, আমি সবসময় এমন একজন মানুষকে কল্পনায় দেখতে পাই যে আমায় বলছে,—একটা নীল কুকুরের চোখ।' কর্মচারীটি ওর চোখে চোখ রেখে বলেছিল,—'আসল ব্যাপারটা কী জানেন, আপনার চোখদুটো ঠিক সেইরকম কটা।' তা শুনে ও বলে,—'আমাকে সেই লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে যে আমায় স্বপ্নের মধ্যেও এই কথাটাই

বলেছিল।' কথাটা শুনেই কর্মচারীটি হাসতে হাসতে চলে যায় দোকানের আরেক প্রান্তে। ঝকঝকে-তকতকে মেঝের দিকে তাকিয়ে ও সুগন্ধ শুঁকতে থাকে। হঠাৎ মেঝেতে বসে পড়ে কাঁধের ব্যাগ থেকে ক্রিমসন রঙের লিপস্টিকটা বের করে ও মেঝের উপর লিখে ফেলল,—'একটা নীল কুকুরের চোখ।' কর্মচারীটি ছুটে এসে বলে,—'আপনি মেঝেটা নোংরা করছেন।' কর্মচারীটি ওর হাতে এক টুকরো ভেজা কাপড় ধরিয়ে দিয়ে নির্দেশ দেয়,—'মেঝেটা পরিষ্কার করে ফেলুন।' বাতিটার পাশে দাঁড়িয়ে একইভাবে ও বলে চলেছিল,—'একটা নীল কুকুরের চোখ।' ততক্ষণে দোকানের দরজায় ভিড় জমে গেছে আর লোকেরা ওকে পাগল বলে হাসাহাসি করতে থাকে।

ওর কথা বলা শেষ। আমি ঘরের কোনায় চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে বললাম,—'প্রতিদিন আমি সেই কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করি যার জন্যে তোমাকে খুঁজি। আমার মনে হয় কাল আর কথাগুলো ভুলব না। অবিশ্যি সবসময়ই আমি এমনটাই বলি আর ঘুম থেকে উঠেই ভুলে যাই কী জন্য তোমায় খুঁজছি।' জবাবে ও বলে,—'প্রথমদিনেই তুমি খুঁজে পেয়েছিলে।' ওর কথা শুনে তখন আমি বলতে শুরু করি,—'ছাই রঙের চোখদুটোর জন্যেই তোমার উপর আমার নজর পড়ে। তবে পরের দিন সকালেই আমি আর সে কথাটা মনে করতে পারিনি।' মুঠিবদ্ধ হাতজোড়া বাতিদানটার পাশে ঝুলিয়ে দিয়ে ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলে,—'অন্তত এখন যদি তুমি মনে করতে পারতে যে আমি কোন কোন শহরে সেই কথাগুলো লিখেছি।'

বাতি-শিখার ভিতর দিয়ে ওর দাঁতে দাঁত চাপা মুখটা দেখা গেল। আমি বললাম,—'তোমাকে একটু ছুঁতে ইচ্ছে করছে।' আলোর দিকে তাকিয়ে থাকা চোখদুটোকে একটু অন্য দিকে ও সরিয়ে নিল। চাহনিটা ওর মতো, ওর হাতের মতো জ্বলছে, পুড়ছে। আমি ঘরের কোনায় চেয়ারে দোল খেতে খেতে বুঝতে পারলাম ও আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। ও বলে,—'এটা আগে কখনও বলনি।' জবাব দিলাম,—'এখন বলছি, আর এটাই সত্যি।' বাতিদানের অন্য পাশ থেকে ও আমার হাতের সিগারেটটা চাইল। সিগারেটটা আমার দু' আঙুলের মধ্যেই জ্বলতে জ্বলতে নিভে গিয়েছিল। ভুলেই গেছিলাম যে আমি সিগারেট খাচ্ছিলাম। ও বলে,—'তা জানি না। কেন যেন মনে করতে পারছি না যে এটা কোথায় লিখেছিলাম।' আমি তখন বলি,—'ঠিক একই কারণে কাল আমি কথাগুলো মনে করতে পারব না।' ও বিরস স্বরে জবাব দেয়,—'না। মাঝে মাঝেই আমার মনে হয় যে এমনটা আমি স্বপ্নে দেখেছি।' উঠে দাঁড়িয়ে বাতিটার দিকে এগোতে থাকি। একটু দূরে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে আমি হাঁটতেই থাকি। ঠিক তখনই আমার মনে হল বাতিটার ওপাশে সেগুলো পৌঁছিয়ে দেওয়া যাবে না। হাত বাড়িয়ে ওকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিই। সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে ধরে বাতি-শিখার উপর ও ঝুঁকে পড়ে। দেশলাইটা এগিয়ে দেওয়ার আগেই বাতির আগুনে ও সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলে। আমি বলি,—'পৃথিবীর অনেক শহরের সব দেওয়ালে সেই কথাগুলো লেখা হবে,—একটা নীল কুকুরের চোখ। আমি যদি মনে করতে পারতাম তবে কাল তোমাকে খুঁজে পেতাম।' ও মাথাটা একটু ওঠাল। জ্বলন্ত কয়লার আগুন যেন এখন ওর ঠোঁটে। ও ফিসফিস করে,—'একটা নীল কুকুরের চোখ।' সিগারেটটা ওর মুখ থেকে প্রায় খসে পড়ছে। ওর একটা চোখ প্রায় বুজে গেছে। একটা টান দিয়ে সিগারেটটা দু' আঙুলের মধ্যে চেপে ধরে ও বলে,—'এটা একটু অন্যরকম। আমার গরম লাগছে।' ওর কণ্ঠস্বরে যেন একটু উষ্ণতা ফুটে উঠছে। মনে হল, কথা না বলে একটা কাগজে কথাটা লিখে সেটাকে বাতি-শিখার উপর ও ধরে রাখায় স্পষ্টভাবে পড়া যাচ্ছে,—'আমাব গরম লাগছে।' ও যেন বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে কাগজটাকে বাতি-শিখার উপর ধরেই রেখেছে আর কাগজটা আস্তে আস্তে পুড়েই চলেছে যতক্ষণ না ওটা জ্বলে ছাই হয়ে যায়। আমি বললাম,—'সেই ভালো। তোমাকে এইভাবে একটা বাতির পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপতে দেখে কখনও কখনও আমার ভীষণ ভয় করে।'

বেশ কয়েক বছর ধরেই আমরা একে অন্যকে দেখে আসছি। অনেক সময়ই এমন হয়,—আমরা হয়তো একসঙ্গে আছি আর তখন কেউ একটা চামচ দরজার বাইরে ফেলে দেওয়ায় আমাদের সম্বিৎ ফিরে আসে। আস্তে ধীরে অনেক পরে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের বন্ধুত্বটা বিভিন্ন বিষয় বা

ঘটনার উপর নির্ভরশীল। খুব সকালে একটা চামচের আওয়াজে আমাদের মিলন সমাপ্ত হয়।

এখন বাতিটার পাশে দাঁড়িয়ে ও আমায় দেখছে। বেশ মনে আছে আগেও এইভাবে ও আমাকে দেখেছে। স্বপ্নেও আমি দেখেছি যে চেয়ারে দোল খেতে খেতে আমি ছাই রঙের চোখের এক নারীর দিকে তাকিয়ে আছি। স্বপ্নে আমিই ওকে প্রথম প্রশ্ন করি,—'তুমি কে?' আর ও বলে,—'ঠিক মনে করতে পারছি না।' আমি ওকে বলেছিলাম,—'আমাব মনে হয় এর আগেই আমাদের পরিচয় হয়েছে।' ও অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে উত্তর দেয়,—'স্বপ্নে বোধ হয় একবার এই ঘরেই তোমাকে দেখেছি।' আমি জানাই,—'ঠিক তাই। আমিও এখন মনে করতে পারছি।' ও বলে,—'কী আশ্চর্য! নিজের নিজের স্বপ্নে আমরা একজন আরেকজনকে দেখেছি।'

ও সিগারেটে দু'টো টান দেয়। তখনও আমি বাতিটার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ওকে দেখে চলেছি। ওকে আগাপাস্তালা নিরীক্ষণ করে বুঝলাম ও এখনও তামাই রয়ে গেছে। কঠিন অথবা কোমল ধাতু নয়, হলুদ-নরম-নমনীয় তামা। আমি আবার বললাম,—'তোমায় ছুঁতে ইচ্ছে করছে।' আর ও বলল,—'তুমি সব কিছু শেষ করে দেবে।' আমার প্রস্তাব,—'এটা কোনও বিষয়ই নয়। আরেকবার মিলিত হওয়ার জন্যে এখন শুধু বালিশটা উলটে নিলেই চলবে।' আমি বাতিটার উপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিলাম। ও সরাল না। ওকে ছোঁয়ার আগেই ও আবারও বলল,—'তুমি সব কিছু শেষ করে দেবে। বাতিটা ডিঙিয়ে আসার সময় ওটা উলটে পড়ে যেতে পারে। তার পরে পৃথিবীর কোন প্রান্তে কী হবে কে জানে।' আমি তবুও জোর করলাম,—'এটা কোনও বিষয়ই নয়।' আর ও বলল,—'বালিশটা উলটিয়ে নিয়ে আরেকবার নিশ্চয়ই মিলিত হওয়া যায়, কিন্তু ঘুম ভাঙলেই তুমি আবার সব কিছু ভুলে যাবে।' আমি ঘরের কোনাটার দিকে এগোতে থাকলাম। ও বাতিদানের পিছনে দাঁড়িয়ে হাত সেঁকতে লাগল। চেয়াবেব কাছে পৌঁছোনোর আগেই শুনতে পেলাম ওর গলার আওয়াজ,—'মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর বিছানায় পাশ ফিরতে গিয়ে দেখব বালিশের কোনাটা আমার হাঁটুর উপর জ্বলছে আর ভোর হওয়া পর্যন্ত আমি আউড়ে যাব,—একটা নীল কুকুরের চোখ।'

তারপর আমি দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওর দিকে না তাকিয়েই বললাম,—'ভোব হয়ে আসছে। অনেক আগে মাঝ রাতে তা প্রায় দু'টো নাগাদ আমার ঘুম ভেঙে গেছিল'। আমি দরজার কাছে গেছিলাম। দরজাটা খোলার জন্যে ছিটকিনিতে হাত দিতেই শুনতে পেলাম, ও বলছে,—'দরজাটা খুলো না। বারান্দাটা বাজে স্বপ্নে ভর্তি।' আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম,—'তুমি কী করে জানলে?' ও উত্তর দেয়,—'খানিকক্ষণ আগে আমি ওখানে গেছিলাম। কিন্তু উপুড় হয়ে শুয়ে থাকার জন্যে আমায় ফিরে আসতে হল।' দরজাটা আলগোছে ভেজানো আছে। হাতের আলতো ছোঁয়াতেই দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে এল এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া। সেই হাওয়ায় জড়িয়ে আছে সবুজ মাঠের সোঁদা গন্ধ। ও আবার মুখ খুলল। আমি দরজাটা আরেকটু ফাঁক করে ওকে বললাম,—'মনে হয় না বাইরে কোনও বারান্দা আছে। আমি তো মাটির গন্ধ পাচ্ছি।' ও যেন অনেক দূর থেকে বলল,—'ওখানে বসে একজন মহিলা তাঁর গ্রামের স্বপ্ন দেখছেন।' ও বাতি-শিখার উপর নিজের হাতদুটোকে আড়াআড়িভাবে রেখে বলেই চলে,—'মহিলাটি সবসময় নিজের গ্রামের স্বপ্ন দেখলেও কখনও শহর ছেড়ে চলে যেতে পারেন না।' মনে পড়ে গেল যে এই মহিলাকে আগে কয়েকবার স্বপ্নে দেখেছি। সামান্য খোলা দরজাটার দিকে তাকাতেই মনে পড়ে গেল আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাতরাশ তৈরি করার জন্যে আমায় নিচে যেতে হবে। তাই আমি বললাম,—'যাই হোক, জেগে ওঠার জন্যে আমায় চলে যেতে হবে।'

বাইরে এক ঝলক হাওয়া বয়ে গেল। তারপর সব শান্ত। কানে ভেসে এল ঘরের ভেতরকার ঘুমন্ত মানুষটির পাশ ফিরে শোবার শব্দ। মাঠ থেকে ভেসে আসা হাওয়ার গতি এখন স্তব্ধ। ফলে আর কোনও গন্ধও নাকে আসছে না। আমি বললাম,—'কাল আমি তোমায় ঠিক চিনতে পারব। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এখানে ওখানে দেওয়ালের উপর যে মহিলা লিখে বেড়াবে—একটা নীল কুকুরের চোখ।' ওর মুখটা এক বিষণ্ণ হাসিতে ভরে উঠল। এই সেই হাসি যা এরমধ্যেই অসম্ভবের কাছে ও সমর্পণ করেছে। এই হাসির কাছে কখনও পৌঁছোনো যায় না। সেই বিষাদময় হাসিটুকু ঠোঁটে ছুঁইয়ে রেখেই ও বলল,—

'সারাটা দিন তুমি কিছুই মনে করতে পারবে না।' হাতদুটো আবার বাতিটার উপর ও রাখল। মনে হল,—একটা বিরক্তিকর মেঘ যেন ওকে ছেয়ে রেখেছে। আর সেই অবস্থাতেই ও বলে চলে,—'তুমিই একমাত্র মানুষ যে স্বপ্নে যা দেখে ঘুম ভাঙার পর আর তা মনে করতে পারে না।'

মূল শিরোনাম : Ojos de un perro azul.

ছ'টার সময় যে মহিলা এসেছিলেন

দরজাটা খুলে গেল। এই মুহূর্তে হোসের রেস্তোরাঁয় কেউ নেই। এখন ঠিক ছ'টা। এবং লোকটি জানে, সাড়ে ছ'টার আগে রোজকার খদ্দেরদের কেউই আসবে না। তার খদ্দেররা এত নিয়মমাফিক চলে যে ছ'টার ঘণ্টাটা থামতে না থামতেই মহিলাটি ঢুকলেন। যেমন রোজ আসেন, ঠিক তেমনিভাবে একটাও কথা না বলে টুলটায় গিয়ে বসলেন। ঠোঁটে একটা সিগারেট শক্তভাবে ঝুলছে। সেটা এখনও ধরানো হয়নি।

'তারপর, রানি,'—তাঁকে বসতে দেখে হোসে বলে উঠল। তারপর কাউন্টারের ওপাশটায় গিয়ে সে একটা শুকনো ন্যাতা দিয়ে কাউন্টারের উপরটা মুছতে লাগল। রেস্তোরাঁয় কেউ এলেই হোসে এরকম করে। এমনকি এই মহিলার সঙ্গেও, যাঁর সঙ্গে হোসের একটু বেশি রকমের ঘনিষ্ঠতা, তিনিও এর ব্যতিক্রম নন। রেস্তোরাঁর মোটাসোটা লালচে মালিকের রোজকার রসিকতাগুলোর অধিকাংশই কঠিন শ্রমে অভ্যস্ত মানুষদের মতো। সে কাউন্টারের ওপাশ থেকে বলে বসল,—'আজকের চাহিদা কী কী?'

'সবার আগে তোমায় বুঝিয়ে দিতে চাই, কি করে ভদ্রলোক হতে হয়',—মহিলা বললেন। তাঁর কনুইজোড়া কাউন্টারের উপরে রাখা আছে। ঠোঁটে শক্তভাবে ধরা সিগারেট ঝুলছে। আর বসে আছেন টুলের একেবারে ধারে। কথা বলার সময় তিনি মুখটাকে এমন শক্ত করে তুললেন যাতে তখনও পর্যন্ত না ধরানো সিগারেটের দিকে হোসের নজর পড়ে।

'আমি ঠিক খেয়াল করিনি',—সে বলল।

'তুমি এখনও কোনওকিছুই খেয়াল করতে শেখোনি।'

লোকটি কাউন্টার থেকে ন্যাতাটা নিয়ে কাবার্ডের দিকে গেল। কাবার্ড থেকে সোঁদা গন্ধ বেরোচ্ছে। এবং পরক্ষণেই সে একটা দেশলাই নিয়ে ফিরে এল। লোকটির কর্মঠ ও লোমশ হাতে ধরানো দেশলাই কাঠি থেকে মহিলা আগুন নেবার জন্য ঝুঁকলেন। হোসে দেখল মহিলার সস্তা ভেসলিন মাখা চুলের ঢল। তাঁর উন্মুক্ত কাঁধজোড়া ব্রেসিয়ারের ওপর দিয়ে উঁচিয়ে রয়েছে। মহিলা যখন মাথা তুললেন, তার চোখে পড়ল, স্তনযুগলের অস্পষ্ট আভাস আর ঠোঁটে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট।

'আজ তোমায় সুন্দর লাগছে, রানি',—হোসে বলল।

'বোকার মতো কথা বলা থামাও দেখি',—মহিলা বললেন। 'ভেব না এগুলো তোমায় আমার দাম মেটাবে।'

'আমি কিন্তু ঠিক তা বলতে চাইনি, রানি',—হোসে বলল। 'আমি বাজি রাখছি, আজ তোমার খাবার মনপসন্দ হবে না।'

মহিলা এই প্রথম কড়া ধোঁয়া গিললেন। কোনাকুনি করে হাতদুটো রাখা। কনুইজোড়া এখনও কাউন্টারের উপর। রেস্তোরাঁর বড় জানালা দিয়ে তিনি তাকিয়ে আছেন রাস্তার দিকে। তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া। একঘেঁয়ে বিশ্রী বিষাদ।

'তোমায় দারুণ একটা কাবাব দেব',—হোসে বলল।

'আমার হাত এখনও খালি',—মহিলা বললেন।

'গত তিন মাস ধরেই তোমার হাত ফাঁকা আর আমি তোমায় সবসময়ই কিছু না কিছু ভালো জিনিস দিয়ে এসেছি।'

মহিলা খুব বিষণ্ণভাবে বললেন,—'আজকের দিনটা আলাদা।' এখনও তিনি পথের দিকে তাকিয়ে আছেন।

'প্রত্যেকটা দিনই একরকম',—হোসে বলল। 'প্রতিদিনই যখন ঘড়িটা বলে, এখন ছ'টা বাজে, তুমি একটা ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো হাজির হও আর আমি কিছু একটা ভালো জিনিসের ব্যবস্থা করি। শুধু একমাত্র তফাত হল তুমি আজ ঢুকেই বলনি যে, তুমি কুকুরের মতো ক্ষুধার্ত। আর এই একটা ব্যাপারেই তুমি আজ অন্যরকম।'

'হ্যাঁ, এটা ঠিক',—মহিলা বললেন। কাউন্টারের ওধারে রেফ্রিজারেটর পরীক্ষারত লোকটিকে দেখবার জন্য তিনি ঘুরে গেলেন। মাত্র দু'তিন সেকেন্ড, তার মধ্যেই তিনি মানুষটিকে মেপে নিলেন। তারপর তাঁর চোখ গেল কাবার্ডের উপর রাখা ঘড়িটার দিকে। এখন ছ'টা বেজে তিন মিনিট।

'সত্যিই, হোসে আজকের দিনটা আলাদা',—তিনি বললেন। ধোঁয়া ছাড়লেন। ভাঙা ভাঙা গলায় কিছু আবেগবর্জিত কথা বলতে লাগলেন। 'আমি আজ ছ'টায় আসিনি। সেই কারণেই আজকের দিনটি আলাদা, হোসে।'

হোসে ঘড়ির দিকে তাকাল।

'ঘড়িটা এক মিনিটও স্লো থাকলে আমার হাতটাই কেটে ফেলব',—হোসে বলল।

'তা নয়, হোসে। আমি আজ ছ'টায় আসিনি',—মহিলা বললেন।

'তখন ছ'টার ঘণ্টা বাজছিল, রানি',—হোসে বলল। 'তুমি যেই ঢুকলে অমনি ওটা বন্ধ হল।'

'আমি এখানে মিনিট পনেরো আছি',—মহিলা বললেন।

হোসে মহিলার কাছে গেল। সে মহিলার সামনে তার হুমদো মুখটাকে তুলে ধরে চোখের পাতাটাকে টেনে ধরল।

'আমার এখানে ফুঁ দাও',—সে বলল।

মহিলা তাঁর মাথা পিছিয়ে নিলেন। তাঁর চিন্তামগ্ন মুখে বিরক্তি ও কোমলতা জাতীয় অভিব্যক্তির দুঃখজনক এবং ক্লান্তিকর প্রতিফলন প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে।

'তোমার বোকামো থামাও তো, হোসে। তুমি তো জানো গত ছ'মাসে এতটুকুও মাল টানিনি।'

'এটা তুমি অন্য কাউকে বল, আমাকে নয়। আমি বাজি রাখতে পারি তুমি এখনই অন্তত দু'তিন পাঁইট টেনে এসেছ।'

'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে একটুখানি টেনেছি',—তিনি বললেন।

'আঃ হাঃ, এখন আমি বুঝতে পারছি',—হোসে বলল।

'এটা কোনও বোঝাবুঝির ব্যাপার নয়',—মহিলা বললেন,—'আমি এখানে পনেরো মিনিট ধরে রয়েছি।'

হোসে শুধু কাঁধ ঝাঁকাল।

'ঠিক আছে, যদি তুমি এটাই চাও যে তুমি এখানে পনেরো মিনিট আছ',—সে বলল। 'আর তাছাড়া কি এসে যায় দশ মিনিট এ পথে আর দশ মিনিট ও পথে থাকলে।'

'এটা নির্দিষ্টভাবে আলাদা',—মহিলা বললেন।

তারপর তিনি কাঁধ ছাপানো কাউন্টারে তাঁর হাত দু'খানা ছড়িয়ে দিলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন,—'আর এটা নয় যে আমি ওভাবেই ব্যাপারটা চাই। আমি শুধু বলতে চাই, আমি এখানে পনেরো মিনিট আছি।' একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সংশোধন করে নিয়ে তিনি বললেন,—'মানে আমি বলতে চাইছি যে আমি মিনিট কুড়ি এখানে আছি।'

'ঠিক আছে রানি',—হোসে বলল। 'আমি তোমায় খুশি দেখার জন্য একটা পুরো দিন এবং রাত্রি দিতে পারি।'

এইসব কথাবার্তার সময় সে কাউন্টারের পিছনে ঘোরাফেরা করছিল, জিনিসপত্র গোছগাছ করছিল; এককথায় সে যথাযথভাবে নিজের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিল।

'আমি তোমায় খুশি দেখতে চাই',—সে পুনরাবৃত্তি করল। হঠাৎ সে দাঁড়াল, ঘুরে এল মহিলার কাছে,—'তুমি কি জান যে আমি তোমায় কত ভালোবাসি।'

মহিলা খুব ঠান্ডাভাবে তার দিকে তাকালেন,—'স-স-ত্যি? কী বীভৎস আবিষ্কার, হোসে। তুমি কি করে ভাবলে যে তোমার সঙ্গে, এমনকি দশ লক্ষ পেসোর জন্যও আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি?'

'আমি তা বলতে চাইনি, রানি,'—হোসে বলল। 'আমি আবার বলছি, খাবারটা তোমার মনের মতো হবে না।'

'ওই কারণে কথাটা বলিনি,'—মহিলা বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বর যথেষ্ট উত্তেজিত,—'কোনও মেয়েই তোমার মতো অত ওজন সইতে পারবে না। এমন কী দশ লক্ষ পেসোব বদলেও নয়।' হোসে লজ্জা পেল। মহিলার কাছ থেকে সরে এসে, ঘুরে দাঁড়িয়ে সে শেল্‌ফে রাখা বোতলগুলো পরিষ্কার করতে লাগল। মাথা না ঘুবিয়েই সে বলে যেতে লাগল,-'আজ তুমি বেসামাল. বানি। আমার মনে হয়, যদি তুমি মাংসটা খেয়ে বিছানায় যাও তো খুব ভালো হয়।

'আমার ক্ষিধে নেই,'—মহিলা বললেন। তিনি আবার রাস্তার দিকে চেয়ে থাকলেন। দেখতে লাগলেন শহরের ধূলি-মলিন পথচাবীদের। কিছুক্ষণের জন্য রেস্তোরাঁয় একটা কালো নিস্তব্ধতা নেমে এল। একটা ঝিমধরা নিস্তব্ধতা, যা শুধু মাঝে মাঝে হোসের বোতল নাড়াচাড়ায় বিঘ্নিত হচ্ছে। হঠাৎ মহিলা বাইরে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ভিতরের দিকে তাকালেন এবং মোলায়েম, আদুরে, একেবাবে অন্য রকম ভঙ্গিতে বলে বসলেন,—'সত্যিই তুমি আমায় ভালোবাসো, পে-পি-লো?'

'হ্যাঁ, আমি',—শুকনো গলায়, তাঁর দিকে না তাকিয়েই হোসে বলে ফেলল।

'আমি এত কিছু বলাব পরেও,'—মহিলা প্রশ্ন করলেন।

'তুমি কি বলতে চাও,'—হোসের সপ্রশ্ন উক্তি। তার স্বরে কোনও ওঠা-নামা নেই। এবং এখনও সে তাঁর দিকে চোখ ফেরায়নি। 'ওই দশ লাখ পেসোব বিষয়টা,'—মহিলা বললেন।

'তা তো এর মধ্যেই ভুলে গেছি,'—হোসে বলল।

'তাহলে, তুমি আমায় ভালোবাসো,'—মহিলা বললেন।

'হ্যাঁ,'—হোসের ছোট্ট মন্তব্য।

অদ্ভুত এক নীরবতা। হোসে ক্যাবিনেটের দিকে ফিবল। এখনও ওর মুখ মহিলার দিকে নয়। মহিলা আবার একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। তাঁর শরীরটা কোমর অবধি কাউন্টারে ঠেকানো। তাবপর খুব সন্তর্পণে, এমন ধূর্তভাবে জিভ কামড়ালেন যেন জিভটা ছোবল দিয়ে উঠল। 'এমনকি আমায় বিছানায় না নিয়ে গেলেও',—হোসে তাঁর দিকে ফিরে তাকাল। 'আমি তোমায় এতই ভালোবাসি যে, তোমায় বিছানায় না নিয়ে গেলেও চলবে,'—সে বলল। এবাব সে মহিলার দিকে এগিয়ে এল। সে তাঁর মুখের উপর চোখ রাখল। তার সবল হাত দুটো মহিলার সামনে কাউন্টারের উপব ছড়িয়ে আছে, আর চোখদুটো মহিলার চোখে। সে বলল,—'আমি তোমায় এত ভালোবাসি যে তোমার রাতের খদ্দেরদের খুন করতেও পারি।'

এই প্রথম মহিলাকে বিমূঢ় দেখাল। তারপর তিনি খুঁটিয়ে সহানুভূতি আর উপহাস মিশিয়ে হোসেকে দেখতে লাগলেন। একটা ছোট নীরবতার সেতু পেরিয়ে এসে, অবশেষে তিনি প্রবল হাসিতে ফেটে পড়লেন। 'তুমি হিংসুটে হোসে। যদিও ব্যাপাবটা খুবই আদিম, কিন্তু তুমি খুব হিংসুটে।'

হোসে আবারও লজ্জা পেল। এতটা বাঙা হয়ে উঠল যে মনে হল কোনও শিশুর নিভৃত গোপনীয়তাটুকু মুহূর্তের জন্য প্রকাশ পেয়েছে। সে বলল,—'আজ সন্ধ্যায় তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না, রানি,'—একটা কাপড় দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে বলল। 'এই নোংরা জীবনটাই তোমায় পশু করে তুলেছে।'

কিন্তু মহিলা এখন তাঁর অভিব্যক্তি পালটালেন। তারপর হোসের চোখে চোখ রাখলেন। দৃষ্টিতে অদ্ভুত আচ্ছন্নতা, সংশয় ও কৌতূহল। তিান বললেন,—'তাছাড়া তুমি তো হিংসুটে নও।'

'কোনও একদিক থেকে তো বটেই,'—হোসে বলল। 'কিন্তু তুমি যেমনটি ভাবছ, তা নয়।'

তিনি তাঁর জামার কলারটা আলগা করে গলার কাছটা মুছলেন।

'তা হলে,'—মহিলা বললেন।

'আসল ঘটনাটা হল, আমি তোমায় এত বেশি ভালোবাসি যে তোমার এই সব কাজকর্ম আমার

মোটেও পছন্দ নয়',—হোসে বলল।

'কোন কাজকর্ম?'—মহিলা পালটা জিজ্ঞেস করলেন।

'এই যে,—রোজ রোজ আলাদা লোক নিয়ে ব্যবসা',—হোসে বলল।

'আমার সঙ্গে যাবার জন্য তুমি কি সত্যিই তাকে মেরে ফেলবে',—মহিলা বললেন।

'না। তোমার সঙ্গে যাবার জন্য নয়',—হোসে বলল। 'আমি তাকে মারব। কারণ সে তোমার সঙ্গে গেছিল।'

'এ তো একই ব্যাপার',—মহিলা বললেন।

কথাবার্তা আস্তে আস্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করল। মহিলা খুব নরমভাবে, শান্তস্বরে হেঁয়ালি ভরা কথা বলছেন। তাঁর মুখ লোকটার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শান্ত মুখের তলায় মোটামুটি ঢাকা পড়ে গেছে। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার দরুন মনে হচ্ছে, হোসে যেন কথার বাষ্পের চাপে সেদ্ধ হচ্ছে।

'এটা সত্যি কথা',—হোসে বলল।

'তাই',—মহিলা তাঁর হাত দিয়ে হোসের কর্কশ হাত জড়িয়ে ধরে বললেন,—'আর তাই তুমি একজন লোককে মারবে!'

'যে জন্য আমি তোমায় হ্যাঁ বলেছি',—হোসে বলল। তার কণ্ঠস্বরের নাটকীয়তা পরিষ্কার।

মহিলা এবার হাসিতে ফেটে পড়লেন। হাসির মধ্যে অবশ্যই ঠাট্টার ছিটে মেশানো।

'কী বীভৎস, হোসে, কী সাংঘাতিক,'—তিনি এখনও হাসছেন। 'হোসে একজনকে খুন করেছে। যে হোসে সবার কাছে 'চর্বির পাহাড়', যে আমায় কোনদিনই বিল মেটাতে দেয় না, অথচ রোজই মাংস খাওয়ায় এবং যতক্ষণ না খদ্দের আসছে ততক্ষণ আমার সঙ্গে রঙ্গতামাশা করে সেই হোসে খুনি। কী বীভৎস, হোসে! তুমি আমায় কলঙ্কিত করলে।'

হোসে এখন বিভ্রান্ত। হতে পারে সে একটু খেপে গেছে। এদিকে মহিলা হাসতে শুরু করে নিজেকে আর সামলাতে পারছেন না।

'তুমি বেসামাল হয়ে পড়েছ, সোনা',—হোসে বলল। 'যাও। ঘুমিয়ে পড়। এমন কী খাওয়াটাও এখন উপভোগ করতে পারবে না।'

কিন্তু ইতিমধ্যে মহিলা হাসি বন্ধ করেছেন। এবং আবারও গম্ভীর ও চিন্তামগ্ন হয়ে কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি দেখলেন, হোসে রেফ্রিজারেটারটা খুলে কিছু বের না করেই বন্ধ করল। তারপর তিনি দেখলেন,—সে কাউন্টারের অন্যদিকে গিয়ে কাচের শার্সিগুলো সাফ করছে। এটা তিনি গোড়াতেই দেখেছিলেন।

মহিলা আবার কথা বললেন। তাঁর গলার স্বর আবার মোলায়েম, মিষ্টি হয়ে গেছে। 'সত্যি তুমি আমায় ভালোবাসো, পেপিলো?'

'হোসে',—তিনি ডাকলেন।

হোসে তাঁর দিকে তাকাল না।

'হোসে।'

'বাড়ি গিয়ে ঘুমোও।'

'আমি মাতাল নই!'

'তা হলে তোমায় বোকা হতে হবে',—হোসে বলল।

'এদিকে এস। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই',—মহিলা বললেন।

আনন্দে অবিশ্বাসে হোঁচট খেতে খেতে সে সামনে এল।

'কাছে এস।'

সে আবার মহিলার সামনে দাঁড়াল। মহিলা সামনে ঝুঁকলেন। হোসের চুল ধরে টেনে আদর করতে গিয়ে তার সঙ্গে সেঁটে গেলেন।

'আমায় আবার বলো, যা তুমি প্রথমে বলেছিলে',—মহিলা বললেন।

'তুমি কী বলতে চাও',—হোসে প্রশ্ন করল। সে চুল ছাড়িয়ে, মুখ ঘুরিয়ে মহিলাকে দেখার চেষ্টা করল।

'আমার সঙ্গে বিছানায় গেছে এমন লোককে তুমি খুন করতে চাও?'—মহিলা শান্ত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন।

'রানি, তোমার সঙ্গে যে লোক শুয়েছে তাকে আমি খুন করব',—হোসে ফের বলল। 'এটাই আমার শেষ কথা।'

মহিলা তাকে ছেড়ে দিলেন।

হোসের শুয়োরের মতন মাথাটি জাপটিয়ে ধরে আদর করতে করতে তিনি খুব প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন,—'যদি আমি ওই লোকটিকে খুন করি, তুমি আমায় সমর্থন করবে তো?' কোনও উত্তর নেই। হোসে শুধু হাসল।

'আমার কথার উত্তর দাও, হোসে',—মহিলা বললেন। 'তুমি কি আমায় সমর্থন করবে,—যদি আমিই খুন করি?'

'সেটা নির্ভর করছে',—হোসে বলল। 'তুমি জান, এটা বলা যত সহজ কাজে ততটা নয়।'

'পুলিশ তোমার চেয়ে বেশি অন্য কাউকে বিশ্বাস করবে না',—মহিলা বললেন।

হোসে হাসল। সন্তুষ্টির হাসি। মহিলা কাউন্টারে পিঠ দিয়ে আবার তার দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

'সত্যি হেসে! আমি বাজি রেখে বলতে পারি—তুমি জীবনে একটাও মিথ্যে কথা বলনি',—মহিলা বললেন।

'এভাবে জীবন কাটিয়ে যেতে পারবে না',—হোসে বলল।

'ঠিক এইরকম',—মহিলা বললেন। 'পুলিশ তোমায় ভালোরকম চেনে। আর ওরা তোমায় দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা না করেই বিশ্বাস করবে।'

হোসে মহিলার উলটোদিকের কাউন্টারে নিজেকে খোঁয়ারবন্দির মতো করে তুলছে। কী বলছে আর না বলছে, না বুঝেই সে এই কাজটুকু করে যাচ্ছে। মহিলা আবার রাস্তার দিকে তাকালেন। তারপর ঘড়ির দিকে। তাঁর গলার আওয়াজ যথেষ্ট পরিমার্জিত। রেস্তোরাঁয় প্রথম খদ্দেরটি এসে পড়বার আগেই যেন তাঁদের কথাবার্তা শেষ হয়ে যায় এ বিষয়ে বোধ হয় তিনি যথেষ্ট তৎপর।

'আমার জন্য একটা মিথ্যে কথা বলবে, হোসে?'—তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

এবং তখন হোসে আবার তাঁর দিকে তাকাল। তীক্ষ্ণ, গভীর দৃষ্টি। যেন একটি ভয়ানক চিন্তায় তার মাথাটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাচ্ছে। একটা চিন্তা এক কান দিয়ে ঢুকছে। অলীক-সংশয়ী সেই চিন্তা এক মুহূর্তের জন্য যেন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। তারপর আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ফেলে যাচ্ছে শুধু গরম পায়ের ছাপ।

'তুমি ভিতরে কী নিয়ে যাবে, রানি',—হোসে জিজ্ঞাসা করল। হাত দুটোকে সে কাউন্টারে ছড়িয়ে দিয়ে সামনে ঝুঁকল। তীব্র অ্যামোনিয়ার গন্ধে গা গোলানো হোসের প্রশ্বাস মহিলা মুখ বুজে হজম করলেন। যদিও ব্যাপারটা কষ্টকর, কিন্তু কিছুই করার নেই। কারণ, কাউন্টারের চাপে হোসের পাকস্থলীতে খোঁচা লাগছিল।

'ব্যাপারটা কি খুবই সাংঘাতিক, রানি?'—সে প্রশ্ন করল। 'ভিতরে নিয়ে যাবার মতো তোমার কী আছে?'

'কিছু না',—তিনি বললেন। 'আমি শুধু নিজেকে আনন্দ দেবার জন্যই কথাগুলো বলছিলাম।'

তারপর মহিলা হোসের দিকে তাকালে ।

'তুমি কী জান, তুমি কাউকে মারতে পার না?'

'আমি কাউকে মারার কথা চিন্তাও করিনি',—হতাশ কণ্ঠে হোসে বলল।

'না, কেউ না',—মহিলা বললেন। 'মানে আমি বলতে চাইছি, কেউ আমার সঙ্গে বিছানায় যায় না!'

'ওঃ হোঃ',—হোসে বলল। 'এখন তুমি স্পষ্ট কথা বলছ। আমি সব সময়ই ভাবতাম—তোমার এভাবে

ঘুরে বেড়ানোর কোনও প্রয়োজন নেই। আমি বাজি রেখে বলতে পারি যদি তুমি এসব ছাড়তে পার তবে প্রতিদিন মাংসের কাবাবের সবচেয়ে বড় টুকরোটা তোমায় এমনিই দেব।'

'ধন্যবাদ, হোসে',—মহিলা বললেন। 'কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। আমি আর কখনও কারও সঙ্গেই বিছানায় যেতে পারব না।'

'তুমি আবার সবকিছু গোলমাল করে দিচ্ছ ;'—হোসে বলল। সে আস্তে আস্তে অধৈর্য হয়ে উঠছে।

'আমি কিছুই গোলমাল করছি না,'—মহিলা বললেন। তিনি একটা কুশনে গা এলিয়ে বসলেন।

'আগামীকাল আমি চলে যাব। এবং আমি শপথ করছি,—আর কখনও তোমায় বিরক্ত করতে আসব না : আমি শপথ কবছি,—আব কারও সঙ্গেই বিছানায় যাব না।'

'এসব উদ্ভট চিন্তা কখন তোমার মাথায় এল?'—হোসে জিজ্ঞাসা করল।

'এটা আমি এই মিনিটখানেক আগেই ঠিক করেছি',—মহিলা বললেন। 'এক মিনিট আগে আমি বুঝতে পারলাম এটা একটা নোংরা ব্যবসা।'

হোসে কাপড়টা হাতে তুলে নিল। এবং তাঁর সামনের কাচটা পরিষ্কার করতে লাগল। সে তাঁর দিকে না তাকিয়েই বলে যাচ্ছিল। 'যেভাবে তুমি কাজটা কর তা অবশ্যই নোংরা। আর তা তুমি অনেক আগে থেকেই জানতে।'

'আমি অনেক আগে থেকেই ব্যাপারটা জানতাম',—মহিলা বললেন। 'কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে বুঝতে পারলাম,—মানুষ আমায় ঘৃণা করে।'

হোসে মৃদু হাসল। তাঁকে দেখবার জন্য হোসে মাথা তুলল। তখনও হাসতে হাসতে সে দেখল যে তিনি একনিবিষ্ট, কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত। কাঁধদুটো একটু উঁচিয়ে টুলের উপর অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে তিনি বসে আছেন। তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডলে শরৎকালের অকালপক্ক শস্যের অস্বস্তি লেপটে আছে।

'তুমি মনেও এনো না—তারা একজন খুনি মেয়েছেলেকে এই কারণে ছেড়ে দেবে যে মেয়েলোকটা তার সঙ্গে ছিল এবং থাকতে বিরক্তি বোধ করছিল আর সে কিনা সকলেব সঙ্গেই থাকার জন্য পা বাড়িয়ে আছে।'

'এতদূর এগিয়ে কোনও প্রয়োজনই নেই',—কথাটা বলেই হোসে ফিরে তাকাল। তার গলায় করুণার আভাস।

'একটা লোক তার সঙ্গে সারাটা বিকেল কাটাল জামাকাপড় পরার ব্যস্ততায় অথচ সেই মেয়েমানুষটার গন্ধ গা থেকে দূর করতে ভাবছে বুঝি কোনও সাবানই যথেষ্ট নয়—এমন একটা লোকের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগলে মেয়েটার কী দোষ?'

'এ ব্যাপারগুলো মিটে গেছে, রানি',—হোসে কাউন্টার মুছতে মুছতে বলল। এখন সে নির্বিকার। 'লোকটিকে মারার কোনও কারণই নেই। শুধু তাকে যেতে দিলেই হল।'

কিন্তু মহিলা একইভাবে, সমান গতিতে আবেগময় গলায় বলে যাচ্ছিলেন,—'কিন্তু যদি এমনটা হয় যে, মেয়েছেলেটা ঘেন্না করা সত্ত্বেও লোকটা আবার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, চুমু খায়, এটা কী...?'

'কোনও ভদ্রলোক এমন করবে না',—হোসে বলল।

'যদি করে',—মহিলা শঙ্কিত, উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্নটি ছুঁড়লেন। 'যদি সেই লোকটা ভদ্রলোক না হয় এবং ব্যাপারটা ঘটে যায় তখন যদি মেয়েটা মনে করে, লোকটা তাকে এতটাই ঘেন্না করে যে তার মৃত্যু ছাড়া পথ নেই এবং ঠিক তখনই কেবলমাত্র লোকটার তলপেটে একটা ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যাপারটার ইতি ঘটানো যায়?'

'বীভৎস',—হোসে বলল। 'ভাগ্যিস সেরকম কেউ নেই।'

'ঠিক'—বিধ্বস্ত কণ্ঠে মহিলা বললেন। 'যদি সে করে? আচ্ছা, মনে কর,—করেছে।'

'সে যাক ব্যাপারটা ততটা খারাপ নয়',—হোসে বলল। এক জায়গায় দাঁড়িয়েই সে কাউন্টার পরিষ্কার করে যেতে লাগল। তার কথাবার্তায় এখন গা-ছাড়া ভাব।

মহিলা তাঁর আঙুল দিয়ে কাউন্টার চেপে ধরলেন। তিনি এখন সাদামাটা ভাষায় বললেন,—'তুমি

একটা জংলি, হোসে। ব্যাপারটা তুমি আদৌ বোঝোনি।' তিনি তার হাতটা চেপে ধরলেন। 'শোন আমায় বল লোকটাকে মেয়েছেলেটার মারা উচিত কিনা।'

'ঠিক আছে',—হোসে একটু যেন মাথাটা উঠিয়ে বলে বসল। 'তুমি যা বলেছ সেই ভাবেও ব্যাপারটা হতে পারে।'

'এটা কি গা বাঁচানো কথা হল না'? হোসের জামার হাতা এখনও তাঁর মুঠোয়।

হোসে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর চোখে চোখ রাখল।

'অবশ্যই',—হোসে বলল। সবিনয়ে জটিলতাকে এড়িয়ে যাবার দৃষ্টি নিয়ে হোসে চোখ টিপল। কিন্তু মহিলা যথেষ্ট গম্ভীর। ওকে পাত্তাই দিলেন না।

'এ রকম কাজ করেছে এমন একটা মেয়েমানুষকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলতে পারবে?— মহিলা প্রশ্ন করলেন।

'সেটা নির্ভর করে?'

'কীসের ওপর?'

'নির্ভর করছে মেয়েমানুষটার ওপর।'

'মনে কর সে এমন একটা মেয়ে যাকে তুমি ভীষণ ভালোবাস,'—মহিলা বললেন। 'তার সঙ্গেই আছ তা নয়, কিন্তু বলতে পার যে তাকে তুমি ভীষণ—ভী-ষ-ণ ভালোবাস।'

হোসে আবার দূরে সরে গেল। ঘড়ির দিকে তাকাল। বড় কাঁটাটা সাড়ে ছ'টার দিকে এগিয়ে চলেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রেস্তোরাঁটা লোকে ভরে যাবে। এবং মনে হয় এই জন্যই সে খোলা জানালা দিয়ে রাস্তা দেখতে দেখতে তাড়াতাড়ি করে মোছামুছির কাজ শুরু করে দিল। মহিলা বিষণ্ণ চিত্তে টুলের উপর বসে নীরবে, মনোযোগ সহকারে মানুষটার কাজকর্ম লক্ষ করতে লাগলেন। যেন প্রদীপ নিভে যাবার আগের মুহূর্তের আলোটা দেখছেন এইভাবে তিনি হোসেকে দেখছেন। একটুও নড়াচড়া না করে তোয়াজ করার কায়দায় তিনি কথা শুরু করলেন।

'হোসে।'

লোকটা গভীর করুণার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল। একটা ষাঁড় যেন চোখে মাতৃত্ব ভরা চাউনি নিয়ে তাকিয়ে আছে। তাঁর কথা শুনবার জন্য সে তাকায়নি, শুধুমাত্র তাকানোর জন্যই, তাকানো। তিনি যে ওখানে আছেন তা বুঝবার জন্য, একজন নিরাপত্তাহীনার কাছ থেকে দৃষ্টিভিক্ষার জন্য যেন একটা খেলনার দিকে সে তাকাল।

'তোমায় তো বলেছি—কাল চলে যাব। তুমি কিন্তু আর কিছুই বলতে পারবে না',—মহিলা বললেন।

'হ্যাঁ, কোথায় যাবে তা কিন্তু বলনি।'

'সেখানে',—মহিলা বলতে শুরু করলেন। 'যেখানে কোনও পুরুষ কোনও মেয়ের সঙ্গে শুতে চায় না।'

হোসে আবার হাসল।

'আজই চলে যাবে?'—সে জিজ্ঞেস করল। যেন জীবন সম্পর্কে একটু বেশি চিন্তিত। হোসে চট করে মুখের ভাবখানা পালটে ফেলল।

'সেটা নির্ভর করছে তোমার ওপর। আজ এখানে কতক্ষণ থাকতে দেবে তা যদি বল, তাহলে আমি কাল যেতে পারি। এমন সৃষ্টিছাড়া কাজ আর করব না। সেটা কি তোমার পছন্দ হবে?'

হোসে হাসতে হাসতে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। মহিলা তার দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

'যদি কোনওদিন এখানে ফিরে আসি তাহলেই নিশ্চয়ই সেই মেয়েটাকে হিংসে করব যে তোমার সঙ্গে এই টুলটায় বসে গল্প করবে।'

'ফিরে এলে আমার জন্যে কিছু নিয়ে আসবে তো?'

'প্রতিজ্ঞা করছি,—সবখানেতেই পোষা ভালুকটার খোঁজ করব। আর অবশ্যই তা তোমার জন্য নিয়ে আসব',—মহিলা বললেন।

হোসে হেসে উঠল ; এমনভাবে কাপড়টা ঝাড়ল যেন সে একটা অদৃশ্য কাচ পরিষ্কার করছে। মহিলাও হাসলেন। এখন তাঁর মুখে বিনয়মিশ্রিত প্রশ্রয়ের আভাস। হোসে কাচ পরিষ্কার করার জন্য কাউন্টারের ওপারে গেল। 'তারপর',—হোসে তাঁর দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করল।

'তুমি কি সত্যিই কাউকে বলে বসবে যে, আমি এখানে পৌনে ছ'টা থেকে রয়েছি?'—মহিলা প্রশ্ন করলেন।

'কী জন্য?'—এখনও তার দিকে না তাকিয়ে যেন খুব কষ্ট করে তাঁর কথা শুনতে হচ্ছে এমনভাবে হোসে কথাটা বলল।

'ওতে কিছু যাবে আসবে না',—মহিলা বললেন। 'মোদ্দা কথা—তুমি কাজটা করবে?'

হোসে দেখল দরজা ঠেলে প্রথম খদ্দেরটি ঢুকল এবং কোনের দিকের একটা টেবিলে চলে গেল। হোসে ঘড়ির দিকে তাকাল। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টা। 'আচ্ছা, রানি',—দ্বিধা করে হোসে মহিলাকে ডাকল। 'তুমি যা ইচ্ছে বলতে পার, তুমি যা চাও আমি তাই করব।'

'ঠিক আছে',—মহিলা বললেন। 'আগে আমার জন্য মাংসটা তো রান্না কর।'

হোসে রেফ্রিজারেটরের দিকে এগোল। প্লেটে এক টুকরো মাংস নিল। তারপব টেবিলের দিকে এল এবং স্টোভটা ধরাল।

'তোমার জন্য একটা ভালো ফেয়ারওয়েল ডিনার করছি রানি',—হোসে বলল।

'ধন্যবাদ, পেপিলো।'

তিনি চিন্তায় ডুবে গেলেন।—যেন তাঁকে হঠাৎ অজানা অন্যজগতের কর্দমলিপ্ত, অচেনা আদবকায়দার মানুষের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কাউন্টারের ওপর রাখা কাঁচা মাংসটা তেলে ছাড়া হল। তিনি শুনতে পেলেন না। তিনি শুনতে পেলেন না মাংসভাজার ছ্যাঁকছেঁকে আওয়াজ, যা কিনা হোসের রন্ধন-ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। সারা রেস্তোরাঁয় ছড়িয়ে পড়া কষামাংসের গন্ধ তাঁর নাকে এল না। তিনি ওইভাবেই বসে রইলেন। মনোযোগী, আরও মনোযোগী। অবশেষে তিনি মাথা তুললেন। এইমাত্র যেন মৃত্যুর অলিন্দ পেরিয়ে এলেন, এমনই তাঁর দৃষ্টি। স্টোভের পাশে বসা মানুষটা তাঁর চোখে পড়ল, যে খুশিমতো স্টোভের আঁচ বাড়াচ্ছে, কমাচ্ছে।

'পেপিলো।'

'কি?'

'কি ভাবছ',—মহিলা জিজ্ঞেস করলেন।

'তুমি শেষ পর্যন্ত সেই ক্ষুদে ভালুক সোনা খুঁজে পাবে,—আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি',—স্টোভ থেকে মাথা তুলে হোসে তাঁর দিকে তাকাল।

'অবশ্যই আমি পাব',—মহিলা বললেন। 'কিন্তু যাওয়ার সময় তোমার কাছে যা খুশি চাইব।'

স্টোভ থেকে চোখ সরিয়ে হোসে তাঁর দিকে তাকাল।

'কতবার তোমায় এই কথাটা বলব?' হোসে বলল,—'তুমি কি সবচেয়ে ভাল কাবাবের মাংস ছাড়াও আর কিছু চাও?'

'হ্যাঁ।'

'কি?'

'আমি আরও পনেরো মিনিট সময় চাই',—মহিলা বললেন।

হোসে পিছন ফিরে ঘড়িটা দেখল, তারপর খদ্দেরটির দিকে—যে এখনও পর্যন্ত কথা না বলে কোনার টেবিলে অপেক্ষা করছে এবং সবশেষে ভাজা মাংসটার দিকে চোখ ফিরিয়ে নেবার পর হোসে কথা বলল ; 'সত্যিই আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না, রানি'।

'বোকামি করো না, হোসে',—মহিলা বললেন, 'মনে রেখ, আমি সাড়ে পাঁচটা থেকে এখানে আছি।'

মূল শিরোনাম · La mujer que llegaba a las seis

আয়নার সঙ্গে আলাপ

ঘুম ভাঙতে সেদিন বেশ বেলা হয়ে গেল। সকালের দিকে বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমোনোর ফলে ভোরের চিন্তা-ভাবনা-অশান্তির কথা মানুষটি ভুলতেই বসেছিল। না—বেশ বেলা হয়েছে। শহরের প্রাত্যহিক হই-হট্টগোলের আওয়াজ এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আধখোলা দরজা দিয়ে সেই সব শব্দ ঘরে ঢুকে পড়ছে। এই মুহূর্তে, মৃত্যুর ঘটনাই তাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলছিল। অন্য কোনও চিন্তা নয়। এটাই এখন তার একমাত্র চিন্তা। পৃথিবী সম্পর্কে একটা ভীতি তাকে প্রতি মুহূর্তে তাড়িয়ে বেড়ায়। তাকেও একদিন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে হবে। মাটি ছাড়া আর কী? সে তার ভাইয়ের কথাই সবসময় ভাবছিল। কিন্তু আনন্দোজ্জ্বল সূর্য গোটা বাগানকে নিমেষের মধ্যে ঝলমল করে তুলে তাকে অন্য একটি জীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ জীবন নিতান্তই সাধারণ, অতীব সাধারণ একান্তই পার্থিব এবং সম্ভবত ভয়ানক অন্তর্নিহিত কোনও অস্তিত্ব থেকে এই জীবন কম সত্য। একান্ত সাধারণ মানুষ হিসাবে তার জীবন পশুর সমান। বুর্জোয়াদের মতো অবাধ্য-অসম্ভব ঘুম তাকে ভাবিয়ে তোলে। নিজের বুদ্ধিমত্তার ওপর তার আর কোনও আস্থা নেই। অস্থির যকৃতের ওপরও নেই কোনও আস্থা। দপ্তরের আর্থিক সংকটের কথা, সে ভাবছিল। আর নিশ্চয়ই, জিহ্বাকে মোচড় দেবার জন্য বা আসল ঘটনাকে বিকৃত করার জন্য বুর্জোয়া অঙ্কশাস্ত্রকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিল।

ঘড়িতে আটটা বেজে বারো মিনিট। আজ নিশ্চয়ই আমার দেরি হবে। আঙুলের ডগাটা সে গালের ওপর বোলালো। কর্কশ চামড়া, যেন কাঁটা গাছের গোড়া গালে পোঁতা হয়েছে। আঙুলের এরিয়ালে কড়া দাড়ির অনুভূতি ধরা পড়ে। তারপর, আধখোলা হাতের তালুতে সে তার নিজের উন্মত্ত মুখের পরিচয় অনুভব করে। শল্য চিকিৎসকের মতো তার মুখে যেন এক স্নিগ্ধ প্রশান্তির ছাপ রয়েছে। কেননা, টিউমারের কেন্দ্রবিন্দুটা কোথায়, তা তার ভালোভাবেই জানা। ওপরের স্নিগ্ধ অংশ থেকে ভেতর পর্যন্ত সত্যের সারবস্তু বেরিয়ে এসেছে। রাগ-আক্রোশ তাকে এক মুহূর্তে সাদা ফ্যাকাসে করে তুলল। বিস্মৃতির অতল গহ্বরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তার সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাংসল অংশটা আঙুল দিয়ে চেপে কিছুটা উপড়ে তোলার অর্থ—কম কষ্ট পাওয়া। তুলনামূলকভাবে কম কষ্টকর। হাড়ের প্রাকৃতিক এবং চূড়ান্ত অবস্থান থেকে অনেক বেশি সহনীয়।

হ্যাঁ, বালিশের তলায়, নরম তুলোর ভেতরের দিকে তার মাথা ডুবে আছে। গোটা দেহটা বিশ্রাম পাচ্ছে। জীবনের এক সমান্তরাল স্বাদ আছে। নিজের কাছে এ যেন এক ধরনের আপস। চোখ বন্ধ করার সামান্যতম চেষ্টা, সে জানে, দীর্ঘ ক্লান্তিকর যে কাজ তার অপেক্ষায় আছে তা অসাধারণ এক পথের হদিশ পাবে। ক্রমশই সেই পথ সহজ-সরল হচ্ছে। জটিলতা মুক্ত হচ্ছে। সময় বা স্থানের সঙ্গে কখনওই আপস নয়। প্রয়োজন ছাড়াই যখন সে রাসায়নিক রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য পৌঁছোল তখন সামান্যতম কষ্ট পাবার জন্য তার দেহ প্রস্তুত। অন্যদিকে এইভাবেই চোখ বন্ধ অবস্থায়, মূল রসদের অর্থনীতি, যান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতির সুনিশ্চিত অনুপস্থিতি, তার চিন্তায় ভেসে বেড়ায়। স্বপ্নের এক সমুদ্রে তার সমস্ত শরীর ডুবে যায়। শরীর চলতে পারে, পারে বাঁচতে। অস্তিত্বের ভিন্ন কাঠামো বিন্যাসে তার জীবন বিকশিত হতে পারে, যেখানে তার প্রকৃত জীবন অভিন্ন গতির ঘনত্ব পেতে পারে। এমনকি তার থেকেও বেশি, যার মধ্যে দিয়ে শরীরের তৃপ্তির পূর্ণ বিকাশের কোনও ক্ষতি না করেই তাকে বাঁচাবার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়ে দেবে। জীবন বেশ সহজতর হবে; পার্থিব সম্পদ, অভিনয়—সব কিছু নিয়েই বাঁচা। তবুও, বাস্তব বিশ্বে যেমনভাবে বাঁচা যায়, ঠিক তেমনটি। সকালে দাড়ি কামানো, বাস ধরা, অফিসে হিসাব মেলানো, তার স্বপ্নে সব কিছুই সহজ এবং জটিলতামুক্ত। অবশেষে, তার ভিতরে এক ধরনের

একটা তৃপ্তি গড়ে উঠবে।

হ্যাঁ, কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করাই ভালো। যেহেতু, এভাবেই সে করেছিল। আলো ঝলমলে ঘরে আয়নার দিকে তাকিয়ে, এইভাবেই সে করে যেতে পারত, যদি না সেই মুহূর্তে একটা ভারী যন্ত্র নির্দয় এবং অসম্ভব ঈষদুষ্ণ পদার্থকে ভেঙে না ফেলত। এবারে গতানুগতিক জগতে ফিরে আসা যাক। সমস্যা নিশ্চয়ই একটা ভাবগম্ভীর বৈশিষ্ট্যের দিকে ধাবমান। এ এত অদ্ভুত এক তত্ত্ব, যা তাকে সেই মুহূর্তে হালকা হতে সাহায্য করেছিল। এমনকি একটা আপসের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও, তার অন্তর্নিহিত মানবিক সত্ত্বা থেকে সে অনুভব করেছিল যে তার মুখটা জায়গা বদল করে এক পাশে সরে গেছে। একটা অভিব্যক্তির প্রকাশ। আর অভিব্যক্তিটা হাসি ছাড়া আর কিছু নয়। তবে সেই হাসি নিশ্চয়ই অনিচ্ছাকৃত হাসি। 'দাড়ি কাটার পর বইয়ের মধ্যে কুড়ি মিনিট ডুবে থাকতে হবে। স্নানের জন্যে আট মিনিট তবে তাড়াতাড়ি থাকলে পাঁচ মিনিট। আর রয়েছে, সকালের খাওয়া। তার জন্যে, সাত মিনিট। বিরক্তিকর পুরোনো মাংসের কাবাব। মেবেলের দোকান; খাদ্যদ্রব্য, লোহার জিনিস, ওষুধ, মদ—এটা যেন কারও একটা বাক্স। নামটা ভুলে গেছি। (মঙ্গলবার পথে বাস বিকল হবার ফলে সাত মিনিট দেরি।) পেন্দোরা। না ; পেলদোরা। তাও নয়। সব মিলিয়ে আধ ঘণ্টা হবে। কোনও সময়ই নয়। নামটা ভুলে গেছি। একটা শব্দ,—আর তার মধ্যেই সব। পেদোরা। 'প' অক্ষরটা দিয়েই শুরু।'

তার দেহে স্নানের পোশাক। এখন সে হাত ধোয়ার বেসিনের সামনে আধো ঘুমে আচ্ছন্ন। মাথার চুল এলোমেলো। দাড়িও কাটা হয়নি। আয়নায় সে নিজের ক্লান্ত চাউনি দেখতে পেল। আয়নায় নিজের মৃত ভাইয়ের প্রতিবিম্ব আবিষ্কার করে সে শিউরে উঠল। আয়নায় সবে প্রতিবিম্বটা আবির্ভূত হয়েছে। অত্যন্ত দ্রুততায় এই শিহরন তাকে একটা ঠান্ডা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। সেই একই ক্লান্ত মুখাবয়ব, সেই একই দৃষ্টি যা এখনও সম্পূর্ণভাবে জাগেনি।

নতুন করে জায়গা পালটানোর ফলে আয়নায় প্রচুর আলো এসে পড়ল। এক ঝলক মনোরম আনন্দের প্রকাশ ঘটল। আলো আবার তার কাছে ফিরে এল। হাসি পেয়ে যাবার মতো মুখের ভঙ্গি তার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে দিল। জল। গরম জলের ধারা যেন প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাসেরই প্রকাশ। সাদা জলের ঢেউ, ঘন গরম জলের ভাপ—আয়নার কাচের মধ্যে তার কাছে এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবেই প্রতিবন্ধকতার সুযোগ নিয়ে দ্রুতগতিতে জায়গা বদল করে সে নিজের সময়ের সঙ্গে এবং আয়নার ভেতরের পারদের সঙ্গে তাল রেখে নতুনভাবে আলো সম্পর্কে একটা সঠিক সূত্র বের করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। তারই উলটোদিকে একটা মুখ আছে। রয়েছে নাড়ির স্পন্দন। ধুকপুকুনির মধ্যেই তার উপস্থিতি। একই সঙ্গে যা হাসি এবং ভাবগম্ভীর বিদ্রূপের অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত। ভিজে কাচের ওপর দিয়ে তা দেখা যাচ্ছে, বাষ্প জমে যাকে আরও পরিষ্কার করেছে।

সে হেসেছিল। প্রতিবিম্বটিও হেসেছিল। নিজেকে তার নিজের জিভটি সে দেখিয়েছিল। প্রতিবিম্বটিও প্রকৃত মানুষটিকে তার জিভ দেখিয়েছিল। আয়নার প্রতিবিম্বতে আছে আঠালো হলুদ জিভ: 'আপনার পেট খারাপ',—হাসতে হাসতে সে রোগ নির্ণয় করেছিল। শব্দহীন অভিব্যক্তি। সে আবার হেসেছিল। প্রতিবিম্বটিও আবার হেসেছিল। কিন্তু সে এখন তার দিকে ফিরে আসা হাসিতে অনেকটা বোকামি খানিকটা কৃত্রিমতা এবং কিছুটা ছলনার ছাপ দেখতে পায়। সে ডান হাত দিয়ে তার চুল ঠিক করে নেয়। প্রতিবিম্বটিও বাঁ হাত দিয়ে তার চুল ঠিক করে নেয়। তক্ষুনি এক লাজুক হাসি ফিরে আসে আবার মিলিয়ে যায়। সে তার নিজের চালচলনে বিস্মিত। তবুও সে ভাবছিল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সকলেই এরকম আচরণ করে। নিশ্চিতভাবেই গোটা ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে বোকামি। তবে তার ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ ছিল অনেক বেশি। কেবলমাত্র অশ্লীল রীতিনীতিকে সে মান্য করছে। আটটা বেজে সতেরো। সে জানত, আফিসের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে গালাগাল খেতে না হলে তাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। এই দপ্তর থেকেই বেশ কিছুদিন ধরে তার দৈনন্দিন কাজ শুরু হচ্ছে। রোজকার শবযাত্রার মিছিলে অংশগ্রহণ করার কাজ এই দপ্তর থেকেই তাকে শুরু করতে হয়।

দাড়ি কামানোর সাবানের ওপর ব্রাশ বোলানোর ফলে একটা নীলাভ সাদা রঙে মুখটা ভরে গেছে।

ফলে দুশ্চিন্তা অনেকটা দূরীভূত। সেই মুহূর্তেই তার দেহ থেকে, যেন ধমনীর জালের ভেতর দিয়ে সাবান জলের ফেনা বেরিয়ে এসে দেহের বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতির কাজকে সহজতর করে তুলল। এইভাবে সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। সাবান মাখা মুখমণ্ডল। অনেকটা আরাম বোধ করছে। সেই শব্দটা এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে যার সঙ্গে সে মেবেলের দোকানের তুলনা করতে চায়। পেলদোরা। মেবেলের পুরোনো জিনিসের দোকান। প্যালদোরা। খাদ্যদ্রব্য অথবা ওষুধ। অথবা একই সঙ্গে সব কিছু—পেনদোরা। মগে রয়েছে প্রচুর সাবানের ফেনা। তবুও উত্তেজিত হয়ে সে ব্রাশ ঘষতে লাগল। বুদবুদের শিশুসুলভ দৃশ্য তাকে নির্ভেজাল আনন্দ দিচ্ছে। অলক্ষ্যে যেন সস্তা দরের মদের মতো, ভারী ও কঠিন কিছু একটা তার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। অক্ষর খোঁজার জন্যে তার নতুন প্রচেষ্টা শব্দ বেরোনো থেকেও পরিণত ও বর্বর হতে পারত ; ঘন অস্পষ্ট জলের উপর তার স্মৃতি দোলাচলে ভেসে যাচ্ছে ; অন্যান্য ঘটনার মতো ছড়িয়ে পড়া বিচ্ছিন্ন অংশগুলো পরিপূর্ণভাবে কিছু গড়ে তোলার জন্য সঠিকভাবে নিজেদেরকে মেলাতে পারছে না। এবং চিরদিনের মতো ওই 'শব্দ'-টাকে পরিত্যাগ করতে সে প্রস্তুত : পেন্দোরা !

এবং এখন, অনর্থক অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকার সময়। কারণ, তারা দুজনেই চোখ মেলে, নিজের নিজের যমজ ভাইকে দেখে। নীলাভ সাদা ঠান্ডা ফেনাময় ব্রাশ দিয়ে সে তার চিবুক ঢাকতে শুরু করেছে। তার বাঁ হাত চলছে। আর ডান হাত নম্রতা এবং যথার্থতার সঙ্গে তাকে অনুসরণ করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ছবি আঁকা এলাকাটা ঢাকা পড়ে ততক্ষণ সে বক্রভাবে তাকিয়ে থাকে। হাতের ওপরকার ঘড়ির জ্যামিতি দেখানোর জন্যই সে এমনভাবে তাকিয়ে আছে। ক্রোধের নতুন উপপাদ্যের সমাধান করতে সে বদ্ধপরিকর। ঘড়িতে এখন আটটা বেজে আঠারো। এতক্ষণ সে ধীরেই চলছিল। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য সে এখন ক্ষুর ধরল। শিঙের তৈরি ক্ষুরের হাতলটা তার আঙুলের গতি মেনে চলেছে।

হিসেব করে দেখল তিন মিনিটেই সুনির্দিষ্ট কাজ শেষ হবে। এই হিসেব মতো সে তার ডান হাত (প্রতিবিম্বর বাঁ হাত) ডান কান (প্রতিবিম্বর বাঁ কান) পর্যন্ত তুলেছিল। এইভাবেই সে লক্ষ্য করে যে দাড়ি কাটার থেকে অন্য কোনও কাজই এতটা কঠিন নয়। যেমনটি আয়নার প্রতিবিম্ব করছিল। তার থেকেই সে এক অত্যন্ত জটিল হিসেবের নিয়মাবলি বের করে নিয়েছে। আলোর গতির যথার্থতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই এই সূত্রটা সে ভেবেছিল। কিন্তু তার সৌন্দর্যজ্ঞান গণিতজ্ঞ মনটাকে জয় করেছে। শিল্পীসত্তা আর গণিতবেত্তা অর্থাৎ মনের মধ্যেকার দুই অবস্থার মধ্যে একটা সংগ্রামের পর সে দেখে থাকতে পারে যে,—গতিবেগের বর্গমূল প্রায় সময়ের কাছাকাছি। এবং শিল্পী মনের ভাবনা ক্ষুরের চলার গতির সঙ্গে সমতালে চলে। বিভিন্ন ধরনের আলোর স্পর্শে তা সবুজ, নীল এবং সাদা হয়ে ওঠে। এবং গণিতজ্ঞ ও সৌন্দর্য পূজারি এখন উভয়েই বড় শান্তিতে রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি ডান দিকের (প্রতিবিম্বের বাঁ দিকের) গালের পাশ দিয়ে সরাসরি ঠোঁটের মাঝখান পর্যন্ত ক্ষুরটা নামিয়ে আনে। পরিতৃপ্তির সঙ্গে লক্ষ করে যে প্রতিবিম্বের বাঁ দিকের গালের সাবানের ফেনার শেষাংশ ঝকঝকে পরিষ্কার।

রান্নাঘর থেকে ঝলসানো মাংসের গন্ধে ভরা ঝাঁঝালো ধোঁয়া ভেসে আসছে। সে তখনও ব্লেড পরিষ্কার করার জন্য ঝাঁকুনি দেয়নি। গন্ধ তার জিভের নিচে একটা কাঁপুনি অনুভব করায়। সাদামাটা পাতলা একটা লালার স্রোত বয়ে গিয়ে গরম মাংসের তৃপ্তিদায়ী স্বাদে তার মুখ ভরিয়ে দেয়। কিডনি ভাজা। মেবেলের দোকানের বদনাম সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত একটা পরিবর্তন দেখা গেল। পেনদোরা। তাও নয়। চাটনির মাঝামাঝি স্বাদগ্রন্থির আওয়াজ তার কানে বেজে ওঠে। আর বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজ তাকে এক স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে এর স্মৃতিই তাকে খুব ভোর থেকে আঘাত করে যাচ্ছে। সেইজন্যই সে তার বর্ষার জুতো আর বর্ষাতিটার কথা ভুলতে পারে না। মাংসের ঝোলে মাখো মাখো কিডনি। এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। জ্ঞানত সে গন্ধকে অবিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে সেই ভোজ তার দেহের স্বাদগ্রন্থির আশা-সঞ্চারক ছাড়া আর কিছুই নয়। যত শীঘ্র সম্ভব খাওয়া শেষ করাই হল সেই মুহূর্তে পঞ্চেন্দ্রিয়ের জরুরি কাজ। সঠিক এবং দক্ষতার

সঙ্গে গণিতজ্ঞ এবং শিল্পী নিজেদের দাঁত দেখিয়েছিল—সে ক্ষুর পিছনের দিকে নিয়ে গেছিল (সামনের দিকে) এবং সামনের দিকে (পিছনের দিকে) ডান দিকের (বাঁ দিকের) মুখের কোণে, যখন তার বাঁ হাত (ডান হাত) দিয়ে টেনে সে তার চামড়া নরম করে। ক্ষুরের ধারালো দিকের চলার পথটা সহজ করার জন্যই তার এই চেষ্টা। সামনে (পেছন) থেকে পেছনে (সামনে) এবং ওপর থেকে নিচে। শেষ না হওয়া পর্যন্ত দু'জনেই কাজ শেষ করার আকাঙ্ক্ষায় পাশাপাশি কাজ করে চলে।

তবে শেষ করার সময় সঠিকভাবে সে তার নিজের কনুই আয়নায় দেখতে পায়। তখনই সে তার ডান হাত দিয়ে বাঁ গালের শেষ কাজটুকু করে। সে দেখেছিল একটা বড় অদ্ভুত, অপরিচিত চোখ, এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছিল যে কনুইয়ের ওপর রাখা অন্য চোখ দুটোও একই রকম বড় এবং অপরিচিত। চোখ দুটো ক্ষুরের গতিপথ দারুণভাবে অনুসরণ করছে। একটা শক্তিশালী হাত তার ভাইকে ফাঁসি দেবার চেষ্টা করছে। রক্ত! তাড়াতাড়ির সময় সর্বক্ষণ এই একই জিনিস ঘটে।

তার মুখের ওপর একই রকম জায়গা সে খুঁজছিল ; কিন্তু তার আঙুল ছিল পরিষ্কার। তবে তার হাতের ছোঁয়া ধারাবাহিকতায় কোনও সমাধান আনেনি। সে যখন শুরু করেছিল তার চামড়ায় কোনও রকমের ক্ষতের চিহ্ন ছিল না। আয়নায় অন্যজনের সামান্য রক্ত ঝরছিল। গত রাতের বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি হবে এবং তার অন্তঃস্থ বিরক্তি বা চেতনার প্রকাশ পুনরায় সত্য বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু থুঁতনি? (গোল অভিন্ন মুখ) আঁচিলের ওপরকার চুলের জন্য ক্ষুরের মাথাটা প্রয়োজন। সে নিজেকে ভেবেছিল যেন কোনও এক মেঘের ক্লান্ত কুজ্ঝটিকা। নিজের প্রতিবিম্বের দ্রুত অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে সে নিজেকেই পর্যবেক্ষণ করছে। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কি এই কারণে দাড়ি কাটছিল যে সমস্ত রকমের স্থান পরিবর্তনকে লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে আলোর ঘনত্ব-দূরত্বকে আবৃত করে রাখতে সে অক্ষম? গণিতজ্ঞ অবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সে নিয়ে নিয়েছে। তাড়াতাড়িতে সে কি আয়নার প্রতিবিম্বের আগে যেতে পারত এবং এক মুহূর্ত আগে সে কাজটা সমাধা করে ফেলত? অথবা এটা কি সম্ভব হত যে সংক্ষিপ্ত সংগ্রামের পর শিল্পী গণিতজ্ঞকে স্থানচ্যুত করতে সক্ষম হবে এবং স্থির করে ফেলে ধীরে ধীরে বাইরের বিষয়কে শেষ করে দিয়ে নির্ভেজাল সময়ে বেঁচে থাকতে!

অন্যমনস্কভাবে দেখতে দেখতে সে গরম জলের নল খুলে দিয়েছিল এবং ঘন গরম জলের তাপ অনুভব করছিল। পরিষ্কার জলের ঝাপটা লেগে তার কানে তালা লেগে যায়। দোকানে কাচানো পরিষ্কার তোয়ালের আরামদায়ক রুক্ষতা তার ত্বকে এনে দেয় গভীর পরিতৃপ্তি। যেন, একজন স্বাস্থ্যবান প্রাণীকে পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করেছে। প্যানদোরা। সেই শব্দটা : প্যানদোরা। তোয়ালের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে সে চোখ বন্ধ করে। আয়নার সামনে থাকার সময় তার মুখ অপ্রতিভ, ম্লান হয়ে ওঠে। বোকা বোকা চোখে সে নিজেকে অনুধাবন করে মুখটা গাঢ় লাল রঙের দড়ি দিয়ে প্যাঁচানো রয়েছে। সে তার চোখ খুলে হেসেছিল। (প্রতিবিম্বটিও হেসেছিল।) তার কাছে আর কোনও কিছুরই গুরুত্ব নেই। মেবেলের দোকানে প্যানদোরার বাক্স। মাংসের ঝোলে ডোবানো কিডনির গরম গন্ধ তার নাসারন্ধ্রের সম্মান জরুরি ভিত্তিতে দারুণভাবে বাড়িয়ে দেয়। এবং সে পরম তৃপ্তি পায়—ইতিবাচক তৃপ্তি এই ভেবে যে একটা বিরাট চেহারার কুকুর তার আত্মার ভেতর লেজ নাড়তে শুরু করেছে।

মূল শিরোনাম Diálogo del espejo

তিন স্বপ্নচারীর তিক্ততা

তারপর আমরা বাড়ির এক কোনায় পরিত্যক্ত অবস্থায় তাঁকে পেয়ে গেলাম। তাঁর জিনিসপত্র,—মানে সদ্য কাটা কাঁচা কাঠের গন্ধ জড়ানো জামাকাপড় আর কাদায় হাঁটার জন্যে প্রায় ওজনহীন জুতোজোড়া নিয়ে আসার আগে কে যেন আমাদের বলেছিল অমন মন্থর জীবনের সঙ্গে তিনি মানিয়ে নিতে পারবেন না ; তাঁর না আছে সুস্থ রুচি, কিংবা না আছে কোনও আকর্ষণ ; থাকার মধ্যে আছে কেবল জট পাকানো এক কঠোর নিঃসঙ্গতা যা তাঁকে সবসময় তাড়া করে ফেরে। আরেকজন বলেছিল,—তাঁর একটা শৈশব ছিল। তখন হয়তো আমরা এটা বিশ্বাস করিনি। তবে এ কথাটা আমরা অনেক দিন পরে মনে করতে পেরেছিলাম। ভীতিবিহ্বল চোখে, ঠোঁটের উপর আঙুল চেপে এক কোনায় তাঁকে বসে থাকতে দেখার পর আমরা হয়তো এখন মেনে নিয়েছি যে তাঁর একটা শৈশব ছিল। এক সময় তিনি এমনই স্পর্শকাতর ছিলেন যে আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারতেন বৃষ্টির পরে কেমন ঠান্ডা পড়বে। আর নিজের শরীরের মধ্যে তিনি এক অপ্রত্যাশিত ছায়ার নকশা বয়ে বেড়াতেন।

এ সব কিছু তো বটেই, বরং আরও অনেক বেশিই আমরা সেই বিকেলে বিশ্বাস করেছিলাম। আমাদের ধারণা হয়েছিল যে আতঙ্কগ্রস্ত অন্তর্জগতের বাইরে তিনি আসলে একজন পুরোদস্তুর মানবী। হঠাৎ আমরা দেখলাম যেন নিজের ভিতরে একটা কাচের গেলাস খান খান হয়ে ভেঙে যাওয়ায় তাঁর মানসিক যন্ত্রণা চিৎকার হয়ে বেরিয়ে আসছে। তিনি আমাদের প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকছেন। তাঁর পাশে না বসা পর্যন্ত তিনি অশ্রুসজল নয়নে বকবক করেই চললেন। আমরা গান গাইতে শুরু করলাম। হাততালি দিলাম। আমাদের চিৎকারে ছড়ানো ছেটানো কাচের টুকরোগুলো যেন জোড়া লেগে গেল। ঠিক তখনই আমরা বিশ্বাস করতে পারলাম তাঁর একটা শৈশব ছিল। আর্তনাদ করে তিনি যেন কোনও কিছু প্রকাশ করতে চাইছিলেন। যেন তাঁর স্মৃতিপটে ভেসে উঠল বহু গাছ এবং গভীর নদী। উঠবার সময় তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেন। মুখটাকে নিজের অ্যাপ্রন দিয়ে না ঢেকে, নাক না ঝেড়ে এবং অবশ্যই অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি আমাদের বললেন,—'আমি আর কখনও হাসব না।'

আমরা উঠোনে চলে গেলাম এবং আমাদের তিনজনের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ। হয়তো আমরা একই চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলাম। সম্ভবত আমরা ভেবেছিলাম যে বাড়ির আলোগুলো না জ্বালানোই হবে সবচেয়ে সঙ্গত কাজ। তিনি একা থাকতে চাইছিলেন। সম্ভবত আঁধার কোণে বসে চুলের বিনুনি পাকাতে পাকাতে তাঁর মনে হয়েছিল জানোয়ারে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ায় একমাত্র এই বেণীবন্ধনীটাই টিকে থাকবে।

বাইরের উঠোনে পোকামাকড়ের ঘন গন্ধে ডুবে গিয়ে আমরা তাঁকে নিয়ে চিন্তা শুরু করলাম। কাজটা আগেও আমরা বহুবার করেছি। আমরা যেন বলতে পারতাম,—জীবনের প্রতিটি দিনেই এই কাজটা করছি।

তবুও সেই রাতটা ছিল একেবারে আলাদা। তিনি বলেছিলেন যে আর কোনওদিন হাসবেন না। আমরা যারা তাঁকে ভালোভাবে জানি, এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলাম যে দুঃস্বপ্নটা সত্যে পরিণত হয়েছে। আমরা তিনজন এমনভাবে বসেছিলাম যেন একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছিল। ত্রিভুজটার কেন্দ্রে তিনি আছেন ধরে নিয়ে আমরা যত সব অবাস্ত অক্ষম-অন্তর্দেশ নিয়ে ভাবছিলাম। অন্তঃস্থলের যে ঘড়িগুলো তাঁর ধুলিতে রূপান্তরিত হওয়ার ছন্দের খুঁটিনাটি হিসেব রাখছিল আমরা তার আওয়াজ শুনতে পাইনি। একই সুরে আমরা ভাবছিলাম,—সাহস থাকলে আমরা তাঁর মৃত্যু কামনা করতাম। কিন্তু আমরা তাঁকে কুৎসিত, হিমশীতল এমন এক চেহারায় চাইছিলাম যা আমাদের লুকোনো খুঁতগুলো নিয়েই গড়ে উঠেছে।

অনেকদিন আগে থেকেই আমরা প্রাপ্তবয়স্ক। ঘটনাচক্রে এ বাড়িতে তিনিই বয়সে সবচেয়ে বড়। সেই রাতে তিনি আমাদের সঙ্গে ওখানে বসতে পারতেন। স্বাস্থ্যবান ছেলেরা তাঁকে ঘিরে রাখতে পারত। এবং আকাশের তারাদের হিসেবমাফিক মিটিমিটি জ্বলা-নেভা তিনি অনুভব করতে পারতেন। কোনও জবরদস্ত মানুষের স্ত্রী বা কেতাদুরস্ত কোনও পুরুষের রক্ষিতা হলে তিনি হয়ে যেতেন 'শ্রদ্ধেয়া নারী'। কেবলমাত্র সরলরেখার মতো একমাত্রিক হয়ে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যেই সম্ভবত তাঁর দোষ বা গুণাবলী দেখতে পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা আমরা বহুদিন ধরেই জানতাম। একদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তাঁকে উঠোনের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে পরমানন্দে মাটি কামড়াতে দেখে আমরা বিস্মিত হইনি। আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি মৃদু হাসলেন। দোতলার জানালা থেকে উঠোনের শক্ত মাটির ওপর পড়ে যাওয়ার পরে তিনি সেই কঠিন-দৃঢ় ভূমিতেই মুখটাকে ভেজা কাদার দিকে পাশ ফিরিয়ে পড়ে রইলেন। তবে পরে আমরা জানতে পারি যে দূরত্ব সম্পর্কে বা শূন্যতার মুখোমুখি হওয়া নিয়ে ভয় বরাবরের মতো স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যে বজায় ছিল। কাঁধ ধরে আমরা তাঁকে ভিতরে নিয়ে যাই। প্রথমে যেমন ভেবেছিলাম, তাঁর শরীর ততখানি শক্ত নয়। বরং শিথিল হাত-পা নিজের অভিলাষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁকে মৃতদেহের মতো এমন এক অবয়বে পরিণত করেছিল যা তখনও শক্ত হয়ে ওঠেনি।

তাঁর চোখ দুটো খোলা। মাটি মাখামাখি হয়ে যাওয়ায় মুখটা এমন ময়লা যেন এর মধ্যেই সমাধির ভেতরকার স্বাদ পাওয়া হয়ে গেছে। মুখটাকে রোদের দিকে ফেরানোর পরে মনে হল যেন তাঁকে একটা আয়নার সামনে আমরা রেখেছি। তিনি নিস্তেজ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন। আমার হাতের ওপর শোয়ানো তাঁর দেহের যৌনতাবিহীন অভিব্যক্তি আমাদের মধ্যে এবং এ বাড়িতে তাঁর অনুপস্থিতি বুঝিয়ে দিল। কোনও একজন তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করল। কিন্তু তারপরেও তাঁর মুখে সেই হাসিটাই লেগে থাকল, সেই শান্ত-শীতল হাসি যা রাতের বেলায় বাড়িটাকে জাগিয়ে রাখার জন্যে তাঁর মুখে ছড়িয়ে থাকত। কী করে যে উঠোনে পড়ে গেছিলেন তা তাঁর জানা নেই বলে তিনি বলেছিলেন। তবে তিনি জানিয়েছিলেন যে তাঁর ভীষণ গরম লাগছিল। একটা ঝিঁঝিপোকার ডাক এমন তীক্ষ্ণভাবে কানে সেঁধোচ্ছিল যে তাঁর মনে হচ্ছিল যেন ঘরের দেওয়ালটা পড়ে যাবে। এবং তখনই তিনি সিমেন্টের মেঝেয় গাল ঠেকিয়ে রবিবারের প্রার্থনার উপদেশাবলী স্মরণ করতে শুরু করেন।

আমরা অবিশ্যি নিশ্চিতভাবেই জানতাম যে কোনও প্রার্থনাই তাঁর পক্ষে মনে করা সম্ভব নয়। কারণ, আমরা জানতে পেরেছিলাম বাইরে থেকে ঝিঁঝিপোকার ধাক্কায় পড়ে যেতে পারে এমন এক ধারণায় দেওয়ালটাকে তিনি ঘরের ভিতর থেকেই শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ায় হারিয়ে যায় তাঁর সময়জ্ঞান। আর তখন নাকি কেউ দেওয়ালটাকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর কাঁধ ধরে বাইরে তুলে এনে তাঁকে সূর্যের দিকে মুখ করে শুইয়ে দেয়।

সেই রাতে উঠোনে বসেই আমরা বুঝতে পারি যে তিনি আর কখনও হাসবেন না। তাঁর অভিব্যক্তির গাম্ভীর্য দেখে আমাদের হয়তো মন খারাপ হয়েছিল। ঘরের কোনায় অস্ফুট গাম্ভীর্য নিয়ে তাঁর স্বেচ্ছা উপস্থিতি আমাদের মনে যন্ত্রণা সৃষ্টি করছিল। তেমনই গভীরভাবে আমরা সেদিন ব্যথিত হই যেমন হয়েছিলাম ঘরের সেই কোনাটায় তাঁকে বসে থাকতে দেখে, যেখানে এখন তিনি বসে আছেন। এবং আমরা তাঁকে বলতে শুনেছিলাম যে এই বাড়িতে তিনি আর ঘুরে বেড়াবেন না। প্রথমে আমাদের বিশ্বাস হয়নি। কয়েক মাস ধরে আমরা দেখছি যে কাঁধ ঝুঁকে পড়া সত্ত্বেও মাথা উঁচু করে তিনি বাড়িটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়ান। যখন তখন আমাদের ঘরে আসেন। এবং কখনও তাঁকে ক্লান্ত দেখিনি। বাড়ির দু'টো আঁধার কোনার মধ্যে তাঁর ভারী শরীরের নড়াচড়ার শব্দ রাতের বেলায় পাওয়া যেত। বিছানায় শুয়ে আমরা বাড়ির সর্বত্র তাঁর গোপন পদচারণা শুনতে পেতাম এবং কান দিয়েই তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখতাম। একবার আমাদের তিনি বলেছিলেন যে ঝিঁঝিপোকাটাকে তিনি আয়নার কাচের মধ্যে, কঠিন স্বচ্ছতায় নিমজ্জিত থাকতে দেখেছেন আর পোকাটা নাকি ওঁকে ছোঁয়ার জন্যে কাচটাকে পেরিয়ে চলে এসেছিল। সত্যিই আমরা জানতাম না তিনি ঠিক কী বলার চেষ্টা করেছিলেন। তবে তাঁকে সিক্ত জামাকাপড়ে দেখে মনে হয়েছিল তিনি যেন তক্ষুনি

চৌবাচ্চা থেকে উঠে এসেছেন। ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে আমরা ঠিক করি যে পোকাটাকে বাড়ির থেকে তাড়াতে হবে। এবং দূর করতে হবে সেই সমস্তকে যা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

আমরা সব ক'টা দেওয়াল পরিষ্কার করলাম। উঠোনের গাছগাছালি কাটানোর বন্দোবস্ত হল, যেন আমরা রাতের নৈঃশব্দ্য দূর করার জন্যেই আবর্জনা সাফাই করলাম। কিন্তু তাঁকে আর হাঁটতে শোনা যেত না। অথবা ঝিঁঝিপোকা নিয়ে তাঁকে আর কথা বলতেও দেখা যেত না। সেদিন পর্যন্ত এমনটাই ঘটে, যেদিন খাওয়াদাওয়ার শেষে তিনি সিমেন্টের মেঝের উপর বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করেছিলেন,—'আমি এখানেই, এই মেঝেতেই বসে থাকব।' আর আমরা কেঁপে কেঁপে উঠেছিলাম। কারণ আমাদের চোখে তাঁকে সেই রকমই দেখাতে শুরু করেছিল যেন এরমধ্যেই তিনি মারা গেছেন।

এটা অনেকদিন আগের ঘটনা। এইভাবে এখানে বসে সবসময়ই অর্ধেক বোনা বিনুনিতে তাঁকে দেখতে দেখতেই আমরা বেড়ে উঠেছি। তাঁকে দেখে মনে হত যেন তিনি নিঃসঙ্গতার মধ্যে ডুব দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেছেন। সেই জন্যেই আমরা জানি যে তিনি আর কখনও হাসবেন না। নিশ্চিতভাবে এবং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তিনি আমাদের এ কথাটা বলেছিলেন। এবং তার সঙ্গে আরও বলেছিলেন তিনি আর চলাফেরা করবেন না। আমরা তখনই নিশ্চিত হয়ে যাই যে এভাবেই তিনি একদিন বলবেন,—'আমি আর কোনওদিন দেখব না', বা 'আমি আর কোনওদিন শুনব না'। আমরা জানতাম যে যথার্থ অর্থেই তিনি এমন একজন মানবী যিনি স্বেচ্ছায় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কাজকর্ম পরিহার করতে পারেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে শেষ করার দিকে নিয়ে যেতে পারেন। একের পর এক বোধ-বুদ্ধি হারিয়ে তিনি সেই দিন পর্যন্ত যেতে পারেন যে দিন আমরা দেখব দেওয়ালে তাঁর মাথা ঠেকে গেছে, আর মনে হবে যেন জীবনে এই প্রথমবার তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। হয়তো এ সব কিছু ঘটার জন্যে তখনও অনেক সময় বাকি ছিল। কিন্তু উঠোনে বসে আমরা তিনজন তাঁর তীক্ষ্ণ কান্না, চুরমার হয়ে যাওয়া কাচের শব্দে রাতের নিঃশব্দতা ভেঙে যাওয়ার মতো কান্না শুনতে চাইছিলাম। অন্তত পক্ষে আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি জন্ম নেওয়ার জন্যেও আমরা শুনতে চাইছিলাম,—এ বাড়িতে একটা শিশু, একটা মেয়ে জন্ম নিয়েছে, যেন বিশ্বাস করা যায় তাঁর নবজন্ম হয়েছে।

মূল শিরোনাম · Amargura Para tres sonámbulos

মরণের অপর পারে

ঘুম ভাঙার কারণটা না জেনেই সে আচমকা জেগে উঠল। ভায়োলেট ফুল এবং ফরম্যালডিহাইডের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ পাশের ঘর থেকে অবাধে ভেসে আসছে। বাগান থেকে ভেসে আসা ভোরের সদ্য ফোটা ফুলের সুগন্ধের সঙ্গে এই কড়া ঝাঁঝটা মিশে গেছে। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ বিগড়ে যাওয়া মেজাজটাকে সে শান্ত করার চেষ্টা করল। এর মধ্যে নিশ্চয়ই সকাল হয়ে গেছে। কারণ, বাইরের বাগানে জল ছেটানোর স্প্রিঙ্কলার যন্ত্রটা গুনগুনিয়ে গান শুরু করে দিয়েছে। অর্থাৎ, শাকসবজিতে জল দেওয়া হচ্ছে। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশ। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুম ভাঙার কারণ অনুসন্ধানে, আলো-আঁধারির আবছায়া ছেয়ে থাকা ঘরটার চারধারে সে চোখ বুলিয়ে নিল। তার ধারণা এবং বাস্তবিকই সে নিশ্চিত যে ঘুমিয়ে থাকার সময় কেউ না কেউ ঘরে ঢুকেছিল। অথচ এটাও বাস্তব যে ঘরে সে নিজে ছাড়া অন্য কেউ নেই। দরজাটাও ভেতর থেকে আটকানো। জোর করে দরজাটা খোলার চেষ্টা হয়েছে,—এমন কোনও প্রমাণও নেই। জানালার বাইরে খোলা আকাশে জ্বলজ্বল করছে শুকতারা। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে শান্ত থাকল। ঘুমের ঘোরে নিজেকে ঠেলে দেওয়ার জন্য স্নায়ুতন্ত্রে যে টান ধরেছে, এ যেন তাকে আলগা করার প্রয়াস। চোখ বুজে, মুখটাকে উপরের দিকে তুলে স্বচ্ছ চিন্তার ছিন্নসূত্রকে সে আবার জোড়া লাগাতে শুরু করল। গলার কাছে জমে থাকা একদলা রক্ত ছলাৎ করে ছিটকে উঠে বুকের ভেতর গড়িয়ে পড়ল। তার হৃৎপিণ্ডটা হাপরের মতো ওঠানামা করতে থাকে। এ যেন এক দুরন্ত হঠকারির একগুঁয়ে অথচ ছন্দোবদ্ধ ওঠা-নামার পরিক্রমা। আগের কয়েকটা মুহূর্তকে সে মনে মনে পর্যালোচনা করল। হয়তো সে একটা আজব স্বপ্ন দেখছিল। দুঃস্বপ্নও হতে পারে। না। বিশেষ কিছুই নয়। ওটাকে নিয়ে বিশেষ কিছু শুরু করার কারণ নেই।

তারা একটা ট্রেনে করে যাচ্ছিল। এখন মনে পড়ছে, ট্রেনটা একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। এই স্বপ্নটা মাঝে মধ্যেই ফিরে আসত। স্থির চিত্রের মতো, ক্ষুর, কাঁচি আর অন্যান্য নানারকম জিনিস ফলে থাকা কতগুলো নকল গাছ। এখন মনে পড়ছে, চুলটা কাটাতে হবে। নরসুন্দরের দোকানের সব যন্ত্রপাতি স্বপ্নে ভেসে এসেছিল। এই স্বপ্নটা সে বহুবার দেখেছে কিন্তু কোনওদিনই এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারেনি। একটা গাছের আড়ালে তার ভাই, যমজ ভাই দাঁড়িয়ে আছে। বাস্তবে কোনও এক সময়ে, কোনও এক জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছিল। ট্রেনটাকে থামবার জন্য সে ইশারা করছে। ইশারা ব্যর্থ হচ্ছে দেখে হোঁচট খেয়ে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে দৌড়োতে থাকল। সে হাঁপাচ্ছে, মুখভর্তি ফেনা। অবশ্যই স্বপ্নটা অবাস্তব এবং অযৌক্তিক। আর এর জন্য হঠাৎ ভয় পেয়ে জেগে ওঠার কোনও যুক্তি নেই। আবার চোখ বন্ধ করল সে। কপালের দু'পাশের রগের ভেতর রক্তের তীব্র স্রোত যেন মুঠি পাকিয়ে উপরের দিকে তেড়ে আসছে। ঊষর, বন্ধ্যা আর অস্বস্তিকর এক ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ছুটছে ট্রেনটা। বাঁ পায়ে একটা যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় তাকে প্রকৃতি দর্শন বন্ধ করতে হল। মধ্যমার দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারে, আঁটসাট জুতো আর পরা চলবে না ; একটা কড়া পড়েছে। পকেট থেকে একটা স্ক্রুড্রাইভার বের করে কড়াটার ওপরের শক্ত চামড়াটা এমনভাবে কেটে তুলল যেন এ কাজে সে রীতিমতো অভ্যস্ত। একটা ছোট্ট নীল বাক্সে সেটাকে তুলে রাখল। তুমি কি স্বপ্নে রঙ চিনতে পার? তারপর কড়ার খুবলানো চামড়ার তলার তেলতেলে হলদে আঁশগুলো দেখতে লাগল। যেন ওগুলোকেই আশা করছিল এমন একটা ভাব নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই নিপুণ দক্ষতায় সে আঁশগুলোয় টান লাগাল। কোনও যন্ত্রণা ছাড়াই একটা লম্বা ফিতে, বিশাল লম্বা একটা ফিতে বেরিয়ে এল। এক মুহূর্ত পরে সে চোখ তুলে দেখল: ট্রেনের কামরাটা একেবারে জনশূন্য। অন্য একটা কামরায়

একজন মাত্র যাত্রী আছে। তার ভাই, মেয়েদের মতো পোশাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটা কাঁচি দিয়ে নিজের বাঁ চোখটাকে খুবলে আনার চেষ্টা করছে।

আসলে স্বপ্নটা তাকে অসন্তুষ্ট করেছে। তবে সে ব্যাখ্যা করতে পারছে না যে কেন এটা তার রক্তের চাপ পালটে দিল। এর আগে রোমহর্ষক দুঃস্বপ্ন দেখেও সে নিজেকে শান্ত রাখতে পেরেছে। হাত ঠান্ডা হয়ে গেছে। ভায়োলেট ফুল আর ফরম্যালডিহাইডের গন্ধ অসহ্য স্তরে পৌঁছে আগ্রাসী হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। চোখ বন্ধ করে দ্রুত লয়ে চলতে থাকা শ্বাস-প্রশ্বাসকে সে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল। কয়েক মুহূর্ত আগের ভেঙে যাওয়া স্বপ্নটায় আবার বিভোর হয়ে যাওয়ার বাসনায় সে যে কোনও একটা ছোটখাটো ঘটনায় মন বসানোর চেষ্টা করে। ধরা যাক সে ভাবতে পারে, খরচাপাতি জোগাড়ের জন্য ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে অন্ত্যেষ্টি আয়োজকদের দপ্তরে যেতে হবে। ঘরের এক কোণে একটা ঝিঁঝি পোকা ঘুমোতে না পেরে একটানা চড়া সুরে কর্কশ শব্দ উজাড় করে ঘরটা ভরিয়ে তুলেছে। আস্তে আস্তে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই তার মানসিক উত্তেজনার চাপ কমে আসছে। সে আরও একবার অনুভব করল যে তার পেশীগুলো শিথিল হয়ে আসছে। বুঝতে পারল সে একটা নরম অথচ পুরু বিছানায় ডুবে আছে। তবে তার ভারহীন হালকা দেহটা অকল্পনীয় সুখের প্রশান্তিতে নিমজ্জিত। ভারী পার্থিব পদার্থে তৈরি তার শরীরের মজবুত কাঠামোটা যেন চেতনা হারিয়ে ফেলছে। প্রাণীবিজ্ঞানের দাঁড়িপাল্লায় নির্ভুল ও সুনির্দিষ্ট জায়গায় রয়েছে তার দেহ। জ্যামিতির নিয়মে ব্যাখ্যা করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে একটা যৌগিক ব্যবস্থার মধ্যে এনে সে তাদের বিচার-বিবেচনাসম্পন্ন প্রাণীর স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্বের পর্যায়ে তুলে ধরল। চোখের পাতা দু'টো যেন স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে দু'চোখের মণি দু'টোকে সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঢাকা দিয়ে দিল, যে পদ্ধতিতে তার হাত-পা ক্রমশ স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে দেহের সমস্ত অঙ্গের সমাবেশে নিজেদের মিলিয়ে দিচ্ছে। তারা যেন নিজস্ব সত্তা হারিয়ে একটি—মাত্র একটি, বিশাল অঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে। এবং সে অর্থাৎ ওই মানুষটি তার মরণশীল শিকড়ের অস্তিত্বকে বর্জন করছে। আরও গভীর এবং শক্তিশালী শিকড়ে, সুনির্দিষ্ট এবং স্বপ্নের চিরন্তন শিকড়ে নিজেকে প্রোথিত করার জন্যই যেন তার এই আত্মবিসর্জন। বাইরে, বিশ্বের অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে আসা ঝিঁঝি পোকার গান মৃদু থেকে মৃদুতর হতে হতে এক সময় তার চেতনা থেকে লোপ পেয়ে গেল। এই চেতনা এখন অন্তর্মুখীন। তার চেতনায় পার্থিব জগৎ মুছে যায়। দেশ ও কালের এক নতুন ও স্বচ্ছ উপলব্ধিতে সে নিমজ্জিত হয়। এই উপলব্ধি প্রকৃতপক্ষে বেদনাদায়ক, অসংখ্য কীটদুষ্ট ভায়োলেট ফুল আর ফরম্যালডিহাইডের তীব্র, কড়া গন্ধে পরিপূর্ণ।

কাঙ্ক্ষিত আরামের উষ্ণ পরতে পরতে নিজেকে মুড়তে মুড়তে সে রোজকার মরণের লঘুত্ব অনুভব করে। সে ডুবে যায় ভালোবাসার এক ভূগোলে। সহজ-সরল অপূর্ব এক জগতে সে ভেসে যায়। এ যেন সমীকরণবিহীন এক বীজগণিত—সম্ভাষণহীন সাদর বিদায়—মাধ্যাকর্ষণের শক্তিরহিত কচি শিশুর হাতে আঁকা এক জগৎ।

কতক্ষণ সে এভাবে অপূর্ব স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানে ছিল তা তার জানা নেই। তার মনে হল, হঠাৎই মনে হল ছুরির একটা টানে নিজের গলাটাকে চিরে ফেললে যেমন হতে পারত সেভাবে সে বিছানায় শুয়ে আছে। আরও মনে হল তার ভাই, তার যমজ ভাই, তার মৃত ভাই, বিছানার এক ধারে বসে আছে।

আবার, আগের মতোই আবার, হৃৎপিণ্ড থেকে এক ঝলক রক্ত মুখের ভিতর ছলকে পড়ে ঠোঁটের ওপর চাপ দিল। ভোরের আলো, হারমোনিয়ামের বেসুরো শব্দ তোলা ঝিঁঝি পোকার অবিরাম নৈঃশব্দ্য ভঙ্গকারী ক্রন্দন, বাগানের মাটি থেকে ভেসে আসা ঠান্ডা বাতাস—এই সবকিছু মিলেমিশে তাকে আরও একবার কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল যে কোনও ঘটনা তাকে সচকিত করেছিল। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি তন্দ্রাচ্ছন্ন মুহূর্তে—হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে—সারারাত ধরে সে ভাবছিল যে তাকে ঘুমোতে হবে—অনাবিল শান্তিতে ঘুমোতে হবে—চিন্তাশূন্য হয়ে, অচঞ্চল সুনির্দিষ্ট একটি ছবির দিকে স্মৃতিকে নিবদ্ধ করে তাকে ঘুমোতে হবে। চেতনার নিজস্ব প্রতিরোধ ও প্রত্যয় সত্ত্বেও এক স্বয়ম্ভু ছবি তার চিন্তার ওপর চেপে বসল। উপলব্ধিতে আসার আগেই ওই 'চিন্তা'টা তাকে শক্তিহীন

করে তুলল ; 'চিন্তা'টা তাকে জড়িয়ে ফেলে পুরোপুরি কব্জা করে ফেলল। সমস্ত চিন্তা জট ধরে থাকা মঞ্চের পেছনে টাঙানো এক স্থির পর্দায় তাকে রূপান্তরিত করে তার দিবারাত্রির কল্পিত নাটকটিকে মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধির মতো বহন করল। তার মনের কেন্দ্রবিন্দুতে যমজ ভাইয়ের মৃতদেহের ছবিটি গেঁথে আছে। এবং এখন তারা তাকে এক টুকরো জমিতে সেখানে শুইয়ে দিয়েছে। বৃষ্টির বিন্দু তার চোখের পাতা কাঁপাচ্ছে। এখন সে তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে।

ঘুসির জোর যে এত প্রবল হতে পারে তা তার চিন্তার বাইরে ছিল। আধখোলা জানালার ফাঁক দিয়ে আবার গন্ধটা ভেসে এল। এখন যেন একটু অন্য রকম, ভিজে মাটির বাসের সঙ্গে মাটিতে পোঁতা হাড়ের দুর্গন্ধ মিশে গন্ধটা ভেসে এল। তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে এক জান্তব এবং তীব্র সুখানুভূতিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বেশ কয়েক ঘণ্টা আগের সেই 'মুহূর্ত'টিকে সে এক খণ্ড ত্রিপলের নিচে দোমড়ানো, মোচড়ানো, বেঁকে-চুরে যাওয়া, আর্তনাদ-করা এক আহত কুকুরের মতো দেখেছিল। সেই মানসিক অবস্থাটা এখন কেটে গেছে। টুঁটি কামড়ে ধরা চূড়ান্ত আর্তনাদে কুকুরটার গলায় একতাল নোনতা লালা উঠে এসেছে। শিরদাঁড়া বেয়ে পেশীর শিকড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া অসহ্য যন্ত্রণাটাকে চাপা দিতে নখের ঘায়ে কুকুরটা নিজেই নিজেকে বিদ্ধ করেছে। একটা মরণোন্মুখ জন্তুর মতো বাস্তব সত্যের বিরুদ্ধে তার বিক্ষুব্ধ ওলট-পালট খাওয়াকে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। এই বাস্তব সত্যটাই তার সামনে দৃঢ়তার সঙ্গে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল—যেন মৃত্যুর মতোই নিশ্চয়তার সঙ্গে তার দেহটাকে শক্ত করে মুচড়ে ধরেছিল। মৃত্যু যন্ত্রণার শেষ প্রহরে সে তাকে দেখতে পেয়েছিল। আর তখন আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে যাওয়া জীবনের শেষ অধ্যায়ে আঁকড়ে ধরা দেওয়ালে আঁচড় কাটতে কাটতে তার নখ ভেঙে যাচ্ছিল। সে রক্তাক্ত হচ্ছিল। অপ্রতিরোধ্য নারীর মতো বিষাক্ত ক্ষতটা এক পাশ দিয়ে তার ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছিল। তারপর হাল ছেড়ে দেওয়া অবসাদে, ঘেমে নেয়ে এলোমেলোভাবে বিছানার ওপর তার এলিয়ে পড়াটা সে নিজেই দেখতে পেল। গাঁজলায় ঢেকে যাওয়া দাঁতগুলো তার অন্তর থেকে টেনে আনল দুনিয়াকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া এক ভয়াবহ জান্তব হাসি। একটা ছাইয়ের নদীর মতো তার অস্থি বেয়ে মৃত্যু গড়িয়ে যেতে শুরু করল।

তার পাকস্থলীতে জাঁকিয়ে বসা টিউমারের যন্ত্রণাটা থেমে যাবার পর ওটার কথা ভাববার সেই অবসরে এই ব্যাপারগুলো ঘটে গেল। আমার ভাবনায় ওটা গোলাকার। এখন তার মধ্যেও এই একই অনুভূতি দেখা দিয়েছে। ক্রমশ স্ফীত হওয়া সূর্যের অভ্যন্তরের মতো, অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক, যেন একটা হলদে পোকা বিষাক্ত দাঁড়া দিয়ে কুরে কুরে তার অন্ত্রের গভীরতম এলাকায় এগিয়ে যাচ্ছে। তার মনে হল,—শারীরবৃত্তের আসন্ন প্রয়োজনে তার নাড়িভুঁড়ি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। একদিন হয়তো আমার পাকস্থলীতেও এই রকম একটা টিউমার বাসা বাঁধবে। শুরুতে মটর-দানার মতো ছোট্ট থাকবে। তারপর তার কলেবর বাড়বে। একটা ভ্রূণের মতো সেটা আমার পাকযন্ত্রে বেড়ে উঠবে। যখন সেটা নড়াচড়া শুরু করবে, আমার অন্ত্রের আরও গভীরে পৌঁছে যাবে, স্বপ্নচারী শিশুর মতো ক্রোধোন্মত্ত হবে,—হয়তো তখন আমি ওটার উপস্থিতি টের পাব। অসহনীয় যন্ত্রণাটাকে চেপে ধরতে পাকস্থলীর ওপর সে হাত রাখল। ব্যাকুল হাত টিউমারটার ছায়ার দিকে একটি উষ্ণ গর্ভ খুঁজতে থাকে, একটি অতিথিবৎসল জরায়ু, যার কোনওদিনই সন্ধান পাওয়া যাবে না। অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর এক জন্তুর মতো এর শতপদ নিজেদেরই জড়াতে জড়াতে মাতৃজঠর ও শিশুর নাভি সংযোগকারী দীর্ঘ হলুদ এক বন্ধনীতে রূপান্তরিত হবে। হ্যাঁ, এই পাকস্থলীতে—সদ্য মৃত ভাইয়ের মতো—সম্ভবত তার অন্ত্রেও একটা টিউমার বাসা বেঁধেছে। বাগান থেকে পাঠানো গন্ধটা তীব্র, বিরক্তিকর, বমনোদ্রেকারী দুর্গন্ধ হয়ে আবার বাগানেই ফিরে যাচ্ছে। ভোরের কিনারায় এসে সময়টা যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। শুকতারাটা জানালার শার্সিতে আটকে গেছে। পাশের ঘর, যেখানে আগের রাত থেকে মৃতদেহটা শায়িত আছে, লাগাতার ভাসিয়ে চলেছে ফরম্যালডিহাইডের বার্তা। বাগানের গন্ধ থেকে এই মৃতদেহের ঘরের গন্ধ একেবারে ভিন্ন। বাগানের অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন ফুলের মিলিত সৌরভ নয়, নির্দিষ্ট ধরনের এই গন্ধটা নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক। এই গন্ধটার সঙ্গে একবার পরিচিত হওয়ার পরে ফরম্যালডিহাইডের গন্ধ নাকে এলেই মনে পড়বে

মৃতদেহের কথা। এটা তার কাছে ছেড়ে যাওয়া অ্যাম্ফিথিয়েটারের ফরমিক অ্যাল্‌ডিহাইডের মতো বর্ণহীন, ঝাঁঝালো গন্ধ। সে ল্যাবরেটরির কথা ভাবল। বিশুদ্ধ অ্যালকোহলে সংরক্ষিত ভিসেরার কথা, ব্যবচ্ছেদ করা মরা পাখির কথাও সে ভাবল। ফরম্যালডিহাইডে ডুবিয়ে ক্রমশ কঠিন করে তোলা, ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়া, বশ মানানো, নমনীয়তা হারানো, চিরস্থায়ী আর অনন্তকালের জন্য সংরক্ষিত এক খরগোশ তার মনে ভেসে উঠল। ফরম্যালডিহাউড। গন্ধটা কোত্থেকে আসছে? পচন রোখার উপায়? আমাদের শিরার ভেতর যদি ফরম্যালডিহাইড ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তা হলে আমাদেরও বিশুদ্ধ অ্যালকোহলে ডোবানো একেকটি শরীরী নমুনার মতো দেখতে হবে।

আধ খোলা জানালার শার্সিতে জলের ফোঁটার একঘেঁয়ে হাতুড়ি পেটার শব্দ তার কানে আসছে। ঘরে ঢুকল এক ঝলক তাজা বাতাস। তার হাত দু'টো আরও ঠান্ডা হয়ে এল। মনে হয়, তার শরীরের প্রতিটি শিরায় ফরম্যালডিহাইড সেঁধিয়ে গেছে। উঠোনের ভিজে হাওয়া তার হাড়ে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। আর্দ্রতা। ওখানে প্রচুর আর্দ্রতা। ঘাসের ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির জলে ভেজা রাতগুলোর কথা মনে পড়ায় তার মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। এই স্যাঁতসেঁতে হাওয়াটা এসে তার ভাইয়ের পাশে আশ্রয় নেবে, জমাট বাঁধা স্রোতের মতো তার শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে যাবে। তার ধারণা,—মৃত ব্যক্তিদের অন্য রকমের সংবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। এটা এমন এক ব্যবস্থা যা চিকিৎসার অযোগ্য মানুষকে চূড়ান্ত মৃত্যুর দিকে নিক্ষেপ করে। এই মুহূর্তে সে চায় না আরও বৃষ্টি হোক। এখন সে চায় একটা চিরন্তন ও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া একটা সর্বাত্মক গ্রীষ্ম। ঘাসের ডগা বেয়ে ওঠা একটা খসখসানি শব্দ তার চিন্তায় ছেদ ঘটাতে চায়। শব্দটা বিরক্তিকর। কবরস্থানের শুকনো, সবসময়ই শুকনো মাটিই সে চায়। মাত্র দু' সপ্তাহের মধ্যে এই আর্দ্রতা তার মজ্জা বেয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর কবরের নিচে তার মতো, অবিকল তার মতো অন্য কোনও মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই চিন্তাটাই তার কাছে অসহ্য।

হ্যাঁ। তারা দুই ভাই, যমজ ভাই। শারীরিক দিক থেকে অবিকল একরকম। প্রথম দর্শনে তাদের আলাদা করে চেনা অসম্ভব। আগে যখন তারা আলাদা থাকত, তখন তারা ছিল নিতান্তই দুই যমজ ভাই। বৈশিষ্ট্যহীন দুই ভিন্ন মানুষ। মানসিক দিক থেকে তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। কিন্তু এখন, কঠোর বাস্তব একটা মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো তার শিরদাঁড়া বেয়ে ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে, তার অখণ্ড পরিমণ্ডলে কী যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছে, শূন্যতার মতো কী যেন ধ্বনিত হচ্ছে, একটা খাড়াই পাহাড়ের চূড়া যেন একদিক থেকে উন্মুক্ত হচ্ছে অথবা কেউ যেন কুডুল দিয়ে তার দেহটাকে দ্বিখণ্ডিত করছে; না, ঠিক দু' টুকরো নয়, জ্যামিতিক অর্থে নির্ভুলভাবে তার দেহটাকে ব্যবচ্ছেদ করছে। এটা যেন তার ভয় পাওয়া পার্থিব দেহ নয়, অন্য একটা শরীর, তার ধরা ছোঁওয়ার বাইরের জগৎ থেকে আসা একটা দেহ, যে দেহটা মাতৃগর্ভের তরল অন্ধকারে তাকে নিয়ে ডুবে গেছিল, এখন তাকে নিয়ে কুলুজি বেয়ে উঠে আসছে। এই দেহটা পিতৃ-মাতৃকুলের রক্তের ভেতর থেকে, বিশ্বের শুরু থেকে, তার গুরুত্ব বজায় রেখে, বোধাতীত উপস্থিতি নিয়ে, সমস্ত বিশ্ব চরাচরের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রেখে আবার ফিরে এসেছে। এমনও হতে পারে যে সে আইজ্যাক আর রেবেকার মধ্যে ছিল। আর যমজ ভাই জন্মেছিল শৃঙ্খলিত চরণে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শৃঙ্খলিত চরণে, রাত্রির শেষে আরেক রাত্রিতে. চুম্বন থেকে চুম্বনে, প্রেম থেকে প্রেমে, শিরা বেয়ে নামতে নামতে জননকোষের ভেতর দিয়ে সর্বশেষ নৈশ পরিক্রমায় মাতৃগর্ভে সে এসে পৌঁছোয়। পূর্বপুরুষের এই খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত বেদনাদায়ক সত্য হিসেবে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারসাম্য এখন ভেঙে গেছে। সমীকরণের নিশ্চিত সমাধান হয়েছে। সে জানে অনায়াস মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যে, আনুষ্ঠানিক এবং দৈনন্দিন পূর্ণতায় কীসের যেন অভাব ঘটেছে। শৃঙ্খলিত চরণ থেকে জ্যাকব চূড়ান্ত মুক্তি পেয়েছে।

যমজ ভাইয়ের অসুস্থতার সময়ে এই অনুভূমিতে সে আচ্ছন্ন হয়নি। জ্বর ও যন্ত্রণায় পালটে যাওয়া দাড়িভরা গালের রুগ্‌ণ মুখটার সঙ্গে তার নিজের মুখের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই।

তারপর এক সময় তার রুগ্‌ণ যমজ ভাইয়ের দেহটা স্থির হয়ে গেল। বিছানার ওপর পুরোপুরি মৃত্যুতে ঢলে পড়া মৃতদেহের 'বন্দোবস্ত' করার প্রস্তুতি নিতে নাপিত ডাকা হল। দেওয়ালের সঙ্গে

লেপ্টে দাঁড়িয়ে সে পরবর্তী দৃশ্যগুলি প্রত্যক্ষ করছিল। ঝকঝকে ক্ষুর-কাঁচি নিয়ে সাদা পোশাক পরিহিত লোকটি এল। পেশাগত দক্ষতার সঙ্গে সে মৃতদেহের গালে দাড়ি কামানোর সাবান ঘষল। গ্যাঁজলা ওঠা এই মুখটাই তার মৃত্যুর আগে আমার নজরে আসে। ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে, যেন কোনও গুপ্ত ঘটনা ফাঁস করতে যাচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে নাপিত খুব সাবধানে ক্ষৌরকর্ম শুরু করল। আর ঠিক তখনই 'সেই' ভয়াবহ 'ভাব'-টায় সে আচ্ছন্ন হল। ক্ষুরের আঁচড়ে তার যমজ ভাইয়ের ফ্যাকাশে নশ্বর মুখটা সাবানের ফেনার আড়াল থেকে যতই ফুটে বেরোতে লাগল ততই তার মনের ভেতর একটা চিন্তা দানা বাঁধতে শুরু করল,—'এই বিষয়টা' তো অপরিচিত নয়। একই মাল-মশলায় গড়ে ওঠা তার নিজেরই বিকল্প। এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে সে ভাবতে শুরু করল, এ যেন তার ভাই নয়, এ যেন আয়না থেকে বেরিয়ে আসা তার নিজেরই প্রতিচ্ছবি। দাড়ি কামানোর সময় প্রতিদিনই আয়নায় এই প্রতিচ্ছবিটাই সে দেখে। সেই প্রতিচ্ছবিটা, যেটা প্রতিদিন তার প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন করে এসেছে, হঠাৎই যেন সেটা ভিন্ন সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। প্রতিদিন সকালে দাড়ি কামানোর সময় এই প্রতিচ্ছবিটাকেই তো সে নিরীক্ষণ করে। কিন্তু এখন তার নিজের বাস্তব উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে আয়না থেকে বেরিয়ে আসা তার অনুরূপ প্রতিরূপের নাটকীয় ক্ষৌরকর্ম সে প্রত্যক্ষ করল। সে এখন নিশ্চিত, দৃঢ় নিশ্চিত যে ঠিক এই মুহূর্তে আয়নার সামনে দাঁড়ালে সে একটি প্রতিবিম্ববিহীন কাচ দেখতে পাবে। এই অনন্য সাধারণ ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে বিজ্ঞান ব্যর্থ হবে। এ হল দ্বিখণ্ডিত হবার উপলব্ধি। মৃতদেহটা এক খণ্ড। সে মরিয়া হয়ে ওঠে। একটা কিছু করার প্রবল তাড়নায় নিজের মধ্যে গড়ে ওঠা শক্ত দেওয়ালটাকে সে ছুঁতে চাইল। সেই দেওয়ালটাকে স্পর্শ করার মুহূর্তে নিরাপত্তার একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ তার সর্ব শরীরে একটা ঝিলিক মেরে গেল। এতক্ষণে নাপিতের কাজ শেষ হয়েছে। কাঁচির ডগা দিয়ে সে মৃতদেহের চোখের পাতা বুজিয়ে দিল। শব তুলে আনায় অপূরণীয় স্তব্ধতা এখন পুরোপুরি প্রস্তুত। আর রাত্রি তার মধ্যে কাঁপুনি সৃষ্টি করল। ঠিক এই রকমই তারা দু'জন। দুই অভিন্নরূপ যমজ ভাই, একই ছাঁচে গড়া ভয়াবহ দ্বৈতরূপ।

দু'টি ভিন্ন চরিত্রের এমন একান্ত সাযুজ্য প্রত্যক্ষ করার সময় তার মনে হল, একটা কিছু অচিন্তনীয়, একটা কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে চলেছে। সে ভাবল, মহাশূন্যে এইমাত্র দুটি অভিন্ন দেহের বিভাজন সম্পন্ন হয়েছে। বিভাজন সত্ত্বেও তাদের দু'জনের মধ্যে একটি মাত্র একটি অখণ্ড সম্পর্ক বিরাজ করছে। এমনও হতে পারে, যখন মৃতজনের দেহে পচনক্রিয়া শুরু হয়, তখন তার অর্থাৎ জীবিতজনের আপন চৌহদ্দির মধ্যে ক্ষয় হতে থাকে।

জানালার শার্সির ওপর বৃষ্টির জোরালো ঝাপটার শব্দ তার কানে আসে। ঝিঁঝি পোকাটার ডাক হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। তার হাত দু'টো এখন হিমশীতল। ফরম্যালডিহাইডের তীব্র গন্ধ আরও উগ্রতা ছড়িয়ে মাটির নিচের হিমায়িত গর্ত থেকে তার যমজ ভাইয়ের পচনক্রিয়ার সম্ভাবনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অসম্ভব। ঠিক বিপরীত ঘটনাও হতে পারে। প্রাণবন্ত, শক্তিমান, চনমনে কেউ এটা ঘটাতে পারে। হয়তো এই পর্যায়ে সে এবং তার ভাই অস্পৃষ্ট থেকে পচনক্রিয়া ঠেকানোর জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করবে। কিন্তু ব্যাপারটা এমনই যে স্থির নিশ্চিত হয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসা কি সঙ্গত হবে? এটা কি একেবারেই অসম্ভব যে তার ভাই ঠিক আগের শরীর নিয়ে কবরে সমাহিত থাকবে আর পচনের নীল অক্টোপাস জীবন্তজনকে জড়িয়ে ধরবে?

শেষের ধারণাটার সম্ভাবনা বেশি ধরে নিয়ে সে আত্মসমর্পণ করল। তারপর সে ভয়াবহ মুহূর্তটির আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। তার দেহের ভেতরে রক্ত-মাংস ক্রমশ মেদ-সর্বস্ব ও কোমল হতে শুরু করল। তার মনে হল সেই নীল বস্তুটা তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। সে নিজের শরীরের গন্ধ শুঁকল। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা ফরম্যালডিহাইডের গন্ধ তার নাসিকা ঝিল্লিকে হিমশীতল করে অবশ করে দিল। এখন সে দুশ্চিন্তামুক্ত। ঘরের কোণের কোথাও ঝিঁঝি পোকাটা আবার তার লোকগীতি শুরু করেছে। এক ফোঁটা ঘন জল সিলিং চুঁইয়ে বেয়ে এসে ঘরের একেবারে মাঝখানে ঝুলতে লাগল। মেঝের ওপর জলের ফোঁটাটা পড়ার শব্দ শোনা গেল। এটা অবাক হওয়ার মতো কোনও বিষয় নয়। সে জানে সিলিং-এর কাঠে ওইখানটায় ঘুণ ধরেছে। কিন্তু সে কল্পনা করল শীতল, উৎকৃষ্ট ও সহৃদয়

ওই জলের ফোঁটাটা আকাশ থেকে, যে জীবন আরও ব্যাপক, প্রেম বা নমনীয়তা কিংবা যমজ সম্পর্কের মূর্খতায় পরিপূর্ণ নয় এমন একটা সূক্ষ্ম জীবন থেকে এক একটি মাত্র বারিবিন্দু হয়ে নেমে এল। এমনও হতে পারে যে ঘরটা ভাসিয়ে দিতে এই জলবিন্দুটার এই হাজার বছর সময় দরকার। এই সময়ের মধ্যে সেই মরণশীল বর্ণটিকে, ধমনীর এই পদার্থটিকে ফোঁটায় ফোঁটায় জমা জলরাশি গলিয়ে ফেলবে। হয়তো,—নয় কেন? অল্প সময়ের মধ্যে ধমনীর ওই পদার্থটা, ছানাকাটা জল আর অ্যালবুমিনের একটা চটচটে মিশ্রণে পরিণত হবে। এখন তার কাছে সবাই সমান। তার এবং তার ভাইয়ের জন্য খোঁড়া কবরের মাঝখানে যেন তার নিজেরই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে। অসহায়ের মতো সে জলের ঘন, ভারী এবং নিখুঁত ফোঁটার শব্দ শুনতে থাকে। যেন অন্য কোনও বিশ্বে, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীর ভ্রমাত্মক এবং অবাস্তব বিশ্বে ফোঁটা ফোঁটা করে বিন্দু বিন্দু জল ঝরেই চলেছে।

মূল শিরোনাম La otra costilla de la muerte

ইভা রয়েছে নিজের বিড়ালের ভেতরে

হঠাৎই তার নজরে এল,—নিজের শরীর থেকে সৌন্দর্য পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। টিউমার বা ক্যানসার হলে যেমন যন্ত্রণা অনুভূত হয় সেইরকম একটা ব্যথা সে অনুভব করল। এখনও বেশ মনে পড়ে বয়ঃসন্ধিকালে শরীরী সৌন্দর্যের জন্যে সে কী গুরুত্ব পেত। এখন অবিশ্যি সে সব কে জানে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। ত্যাগের ক্লান্তি আর দৈহিক ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই বিলীয়মান। এই দুঃসহ ভার বয়ে চলা প্রায় অসম্ভব। মূল্যহীন ব্যক্তিত্বের যাবতীয় গুণ এবার অন্য কোথাও, হয়তো ঘরের কোণে অথবা বাইরে অন্য কোনওখানে, ছুঁড়ে ফেলতে হবে। অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনও রেস্তোরাঁর কোট টাঙানোর র‍্যাকের পিছনে ফেলে রাখা পুরোনো কোটের মতোই ঝেড়ে ফেলতে হবে সবকিছু। সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বা মানুষের নজরবন্দী হয়ে থাকতে থাকতে সে এখন ক্লান্ত ও বিরক্ত। নিদ্রাহীন রাতের যন্ত্রণা যখন তার চোখে ছুঁচ ফোটাতে শুরু করে তখন সে আর বিশেষ আকর্ষণীয় না হয়ে একজন সাধারণ নারী হয়েই বাঁচতে চায়। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেকার সব কিছুকেই তখন মনে হয় চরম শত্রু। হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে সে অনুভব করে এই নিদ্রাহীনতা ত্বকের তলায়, মস্তিষ্কের ভেতরে জ্বরের মতো ঊর্ধ্বগামী হয়ে চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মনে হয় শিরা-উপশিরাগুলো ভরে গেছে অসংখ্য ছোট ছোট পোকামাকড়ে যেগুলো প্রতিদিন ঊষালগ্নে জেগে উঠে গুটিগুটি পায়ে ত্বকের তলায় অভিযান চালিয়ে ছুটতে থাকে মাটির তৈরি ফলের দিকে যেখানে তার শারীরিক সৌন্দর্যের অবস্থান। ওই বীভৎস জীবগুলোকে তাড়িয়ে দেবার বৃথা চেষ্টায় সে মেতে ওঠে। এবং সে ব্যর্থ হয়। সেগুলি তার দেহাবয়বের মধ্যেই অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। ওখানেই জীবিতাবস্থায় ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকে সেই সব কীটপতঙ্গের দল। তার দৈহিক অস্তিত্বের অনেক আগে থেকেই যেন ওদের সেখানে অবস্থান। পিতার হৃদয় থেকে ওই পোকামাকড়েরা এসেছে তার কাছে। তার পিতা নৈরাশ্যব্যঞ্জক একাকিত্ব অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লালনপালন করেছেন। অথবা মায়ের সঙ্গে জন্মবন্ধনের সূত্র ধরে পৃথিবীর আদি অনন্তকাল থেকে ওগুলো তার ধমনীতে নিষিক্ত হয়েছে। ওই কীটপতঙ্গেরা নিশ্চয়ই তার দেহের ভিতরে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে জন্মগ্রহণ করেনি। সে জানে ওগুলো উত্তরাধিকারসূত্রেই এসেছে। যারাই তার পদবি ধারণ করবে তাদেরও ওগুলোকে বহন করতে হবে, ভোগ করতে হবে একই রোগ, বয়ে বেড়াতে হবে সেই দুর্জয় নিদ্রাহীনতা যা প্রতিদিন প্রদোষকাল পর্যন্ত তার সঙ্গী। এই কীটপতঙ্গেরাই তার আগের প্রজন্মের মুখে ছকে দিয়েছিল বিপদের প্রতিচ্ছায়া। পূর্বসূরীদের প্রাচীন প্রতিকৃতির মধ্যে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার নির্বাপিত সত্তাকে সে প্রত্যক্ষ করেছে। অশান্তিতে ছাওয়া মুখ এবং অবনত দেহ নিয়ে ওই পোকামাকড়দের কাছে এক মুহূর্তের বিশ্রাম, ক্ষণিকের শান্তির জন্যে তার বৃদ্ধা প্রপিতামহীর প্রার্থনার কথা এখনও সে মনে করতে পারে। সেগুলো তাঁর রক্তের ভিতরে প্রবেশ করে সৃষ্টি করেছিল বিক্ষত সৌন্দর্যের শহিদ। না, ওই পোকামাকড়েরা তার নিজের নয়। বংশপরম্পরার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ক্ষুদ্র দেহ, বিশিষ্ট বর্ণ এবং নিজস্ব প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এক দুঃখজনক সত্তার সারণিভুক্ত হয়ে রয়েছে। ওই জীবাণুগুলি প্রথমে জন্ম নেয় জনৈক মহিলার গর্ভে যার মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু ওই জীবাণুগুলির বংশবৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করা ছিল অত্যন্ত জরুরি। সেই কৃত্রিম সৌন্দর্যের সঞ্চালন প্রক্রিয়া প্রতিহত করা প্রয়োজন ছিল। কোনও মহিলার পক্ষেই তাদের জন্মদান করে নিজেদের প্রশংসা করা উচিত হয়নি। কারণ ওই কীটগুলিই তাদের প্রতিচ্ছায়া থেকে উৎপন্ন হয়ে রাত্রিবেলায় নিঃশব্দে

যুগ যুগ ধরে চালিয়ে গেছে তাদের বিরামহীন শ্রমসাধ্য ক্রিয়াকর্মাদি। এটা আর তখন কোনও সৌন্দর্য নয়, একটা অসুস্থতা যাকে থামিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, একটা দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে যাকে ছিন্ন করে ফেলা ছিল একান্ত প্রয়োজন।

নিষ্কর্মার মতো বিছানায় অনন্তকাল যাপনের কথা এখনও সে বেশ মনে করতে পারে। একা একা কাটানো সেই রাত্রিগুলোয় তার একমাত্র চেষ্টা ছিল দ্রুত কালহরণ ; কারণ দিনের আলোয় ওইসব ভয়ংকর জীবেদের আক্রমণ বন্ধ থাকে। অমন সৌন্দর্যের অর্থ কি? রাতের পর রাত হতাশায় মগ্ন হয়ে থাকার চেয়ে একজন সাধারণ মহিলা অথবা একজন মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভালো। কিন্তু সেই অপ্রয়োজনীয় গুণগুলি তাকে ত্যাগ করেছে। দূরাগত সেই জীবাণুর সূত্র তার অনিবার্য মৃত্যুর উপস্থিতিকে ত্বরান্বিত করেছে। হয়তো ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে তার চেকোশ্লোভাকিয়ান বন্ধুর মতো, একটা কুকুরের নামে যার নাম, কুৎসিত হয়েও সে অন্য কোনও খ্রিস্টানের মতোই শান্তিতে ঘুমোতে পারত।

এই নিদ্রাহীনতার জন্যে পূর্বসূরীদের দায়ী করে তাদের সে অভিসম্পাত করল। তারা সেই প্রকৃত এবং অনিবার্য সৌন্দর্যকেই যেন মায়েদের মৃত্যুর পরে মস্তিষ্ক থেকে নব কলেবরে গঠিত করে কন্যাদের দেহের শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে দিয়েছে। এ যেন সেই একই মস্তিষ্ক যা ক্রমাগত সমস্ত নারীর ভেতরে সঞ্চালিত হচ্ছে; সেই কান, ঠিক তেমন নাক, অবিকল একই রকমের মুখশ্রী এবং সেই একই বুদ্ধিমত্তা। অথচ এই বেদনাদায়ক সৌন্দর্যের প্রতিকারের কোনও উপায় নেই। যে শাশ্বত রোগজীবাণু বংশপরম্পরায় বাহিত হয়ে চলেছে তা মস্তিষ্কের স্থানকে গ্রাস করে এক অদৃশ্য অস্তিত্বে, অনারোগ্য দুর্বলতায় জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সেটাকে আর সহ্য করা যায় না এবং তা তিক্ত ও বেদনাদায়ক...যেন একটা টিউমার বা ক্যানসার।

এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে তার জাগ্রত সত্তায়। সে এখনও মনে করতে পারে ওগুলি তার সূক্ষ্ম বোধশক্তিতে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই আবেগপ্রবণ বিশ্ব নির্মাণের জন্যে যে সব উপাদানের প্রয়োজন, তার মনে হয় সেই হতাশার রোগজীবাণুগুলিকে যেন এক রাসায়নিক গবেষণাগারে সযত্নে লালনপালন করা হয়েছে। সেইসব রাতে দীর্ঘ এবং উজ্জ্বল অথচ ভীত চোখ দুটি খুলে রেখে কপালের পাশে যে অন্ধকারকে সে অনুভব করত, তা যেন গলানো সিসা। চারপাশে সবাই ঘুমোচ্ছে। আর সে তখন ঘুম আনার জন্যে নিজের কুঠরিতে, বিছানায় গড়াগড়ি খেতে খেতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা চালাত শৈশবের স্মৃতিগুলিতে।

তবে সেইসব স্মৃতিচারণা সবসময়েই এক অজানা আতঙ্কের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। বাড়ির সমস্ত অন্ধকার কোনায় বিচরণ করার পরে সবসময়েই তার চিন্তাভাবনা ভয়ের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। তারপরেই শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ। তিন তিনটি স্থাবর শত্রুর বিরুদ্ধে সত্যিকারের যুদ্ধ। না, কখনও সে মাথা থেকে ভয়গুলিকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। যেন কণ্ঠরোধ করে রয়েছে এমন এক অনুভূতির মধ্যে সে পৌঁছে যায়। এবং সেই প্রাচীন ইমারতের একটি কোনায় সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে একাকী ঘুমিয়ে পড়ে।

স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে মাকড়সার ঝুলে ঢাকা পড়ে যাওয়া বারান্দার প্রতিকৃতিগুলোকে তার চিন্তাভাবনা সবসময়েই ছুঁয়ে যায়। পূর্বপুরুষদের অস্থিগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-বিচ্ছিন্নভাবে যেখানে পড়ে আছে সেখান থেকে ঝরে পড়ে বিরক্তিকর এবং ভীতিপ্রদ ধুলো। অনিবার্যভাবে সে মনে করতে পারল সেই 'বালক'টিকে। এই জায়গাটায় বালকটির উপস্থিতি সে কল্পনা করতে পারল। মুখের ভিতরে একমুঠো মাটি নিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় সেই বালক কমলালেবু গাছের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে উঠোনের ঘাসের নিচে। তার মনে হল নখ এবং দাঁত দিয়ে কাদা খুঁড়ে খুঁড়ে ছেলেটি ওপরে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছে। ছেলেটির পিঠের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে এক শীতল অনুভূতি। শামুকদের সঙ্গে যেখানে ছেলেটিকে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে সুড়ঙ্গের মতো সরু একটা প্রবেশপথ দিয়ে বেচারি উঠোনের উপর উঠে আসার চেষ্টা করছে। শীতের দিনে ছেলেটির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ সে শুনতে পেত।

তার কল্পনায় ছেলেটি তখনও কর্দমাক্ত এবং বৃষ্টিসিক্ত, ঠিক পাঁচ বছর আগের মতোই যখন একটা জল ভরা গর্তে ওকে ফেলা হয়েছিল। ওর দেহটার পচা-গলা অবস্থার কথা সে একবারও ভাবতে পারেনি। বরং তার মনে হয়েছিল সম্ভবত ও-ই একমাত্র সুপুরুষ যে ওই জলের ভেতর থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনও আশা ছাড়াই চালিয়ে যাচ্ছে জলযাত্রা। অথবা সে ওকে জীবন্ত অবস্থায় নির্জনে একাকী থাকার জন্যে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখেছিল। কারণ, মলিন ক্লেদযুক্ত এক গর্তে ওকে সমাধিস্থ করা হয়। বাড়ির এত কাছে কমলালেবু গাছের নিচে ছেলেটিকে ফেলে রাখা তার মোটেও পছন্দ হয়নি। ওকে অমন অবস্থায় দেখে সে ভয় পাচ্ছিল। সে জানে রাত্রিবেলায় নিদ্রাহীনতার আক্রমণ ছেলেটি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। প্রশস্ত অলিন্দ পরিক্রমার পরে ও তার সঙ্গে থাকার প্রস্তাব দেবে। ওইসব কীটগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে তাকে আহ্বান জানাবে ও। কারণ, ওগুলোই ওর ভেতরকার সংকোচপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করেছে। জীবিতাবস্থায় যেমন করত ঠিক তেমনিভাবে ও এসে তার পাশে শুয়ে ঘুমোবার জন্যে তাকে অনুরোধ জানাবে। মৃত্যুর দেওয়াল পেরিয়ে যাওয়ার পর ওর পাশে তার অবস্থান সম্পর্কে সে এখন রীতিমতো ভীত। যে হাত দুটো সবসময় গরম রাখার জন্যে বালকটি ঢাকা দিয়ে রাখত, সেগুলি হারিয়ে যাওয়ায় সে এবার ভয়ার্ত হয়ে পড়ল। তার অভিলাষ, ভীতির কর্দমতা সিমেন্টের মতো মজবুত হয়ে উঠুক। তার আরও ইচ্ছা, ওকে নিয়ে যাওয়া হোক অনেক দূরে, যাতে রাত্রিবেলায় ওকে আর মনে না পড়ে। তবুও ওকে সেখানেই ফেলে রাখা হল যেখানে ও অচঞ্চল-বিধ্বস্ত অবস্থায় কেঁচোর মাটির সঙ্গে নিজের রক্ত পানে মগ্ন। নিজের ছায়া থেকে ওর ফিরে আসার দৃশ্যটি দেখতে সে একেবারেই নারাজ। কারণ, অনিবার্যভাবে ঘুম ভেঙে গেলে ওই বালকটির কথাই মনে পড়বে আর তখন ও অবাস্তব মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এক টুকরো গহ্বরের ভেতর থেকে তাকে জানাবে আকুল আকুতি।

কিন্তু নীরব-অবয়বহীন নতুন পার্থিব জীবনে সে এখন অনেক শান্ত। সে জানে তার নির্দিষ্ট পৃথিবীর বাইরে সবকিছুই পুরোনো ছন্দ অনুসরণ করে চলেছে। তার ঘর ডুবে আছে ভোরের অন্ধকারে এবং তার সমস্ত জিনিস, আসবাবপত্র, প্রিয়তম তেরোটি বই ঠিক জায়গাতেই পড়ে আছে। এবং যে দেহ সৌরভ নারীকে সম্পূর্ণতা প্রদান করে তা-ও ক্রমশ বিলীয়মান হতে চলেছে তার অব্যবহৃত বিছানা থেকে। কিন্তু এটা কি করে ঘটে! কেমন করে সুন্দরী রমণী হওয়া সত্ত্বেও তার রক্ত হয়ে যায় জীবাণুতে পরিপূর্ণ, সমস্ত রাত্রি জুড়ে এক ভীতিপূর্ণ বিকট স্বপ্ন তাকে নিয়ে যায় এক অন্য জগতে যেখানে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সব বিলুপ্ত হয়ে যায়? সে স্মৃতিচারণ করে। সেই রাত্রি,—তার বাড়িতে সেই রাত্রি ছিল স্বাভাবিক শৈত্যের চেয়েও শীতল। এবং সেখানে সে একাই নিদ্রাহীনতায় আক্রান্ত হয়ে রাত কাটাচ্ছিল। কেউ নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করেনি এবং বাগান থেকে যে গন্ধ ভেসে আসছিল তা যেন ভয়ে পরিপূর্ণ। তার শরীর এমনভাবে ঘামে ভিজে যাচ্ছিল যেন দেহের শিরা-উপশিরার রক্তে এক জাহাজ কীটপতঙ্গ ভেসে বেড়াচ্ছে। তখন তার ইচ্ছে হচ্ছিল রাস্তা দিয়ে কেউ যেন হাঁটাচলা করে আর কেউ যেন চিৎকার করে সেই অবাঞ্ছিত আবহাওয়াকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রকৃতির ভিতরে যেন কিছু প্রবাহমানতা আসে। সূর্যকে আরেকবার প্রদক্ষিণ করুক পৃথিবী। কিন্তু না, কিছুই হয়নি।

কানের নিচে বালিশ চেপে ধরে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন যেসব মানুষগুলো ঘুমোচ্ছিল তাদেরও জেগে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই। সে নিজেও গতিহীন। দেওয়ালগুলো থেকে ভেসে আসছে উগ্র রঙের তীব্র গন্ধ। সেই গন্ধ নাক দিয়ে অনুভব করা যায় না, উপলব্ধি করতে পারে পাকস্থলী। এবং টেবিলের উপর রাখা ঘড়িটা যান্ত্রিক সত্তা বিজ্ঞাপিত করছে। মৃত্যুকে স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সে উচ্চারণ করে, সময়...ওহ্ সময়। উঠোনের কমলালেবু গাছের তলায় বালকটি তখন অন্য জগত থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

নিজের বিশ্বাসের কাছেই সে আশ্রয় নেয়। তখনই কেন সেই ভোর এল না অথবা সে কেন তক্ষুনি কেন চিরকালের জন্যে মৃত্যু বরণ করল না? সৌন্দর্যের জন্যে যে এভাবে আত্মত্যাগ করতে হবে তা কখনও তার মাথাতেই আসেনি। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়ে সবকিছু ছাপিয়ে ভয় তাকে গ্রাস করে

নিল। এবং তার ভয়ের কোটরে অবদমিত কীটগুলো তখনও তাকে শহিদ করবার জন্যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল। মৃত্যু তাকে জীবন থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যেন একটা মাকড়শা রাগের চোটে কামড়িয়ে চলেছে! কিন্তু তখনও অন্তিম মুহূর্ত আসেনি। তার হাত দুটো যা স্পষ্টতই জড়বুদ্ধি সম্পন্ন পশুশক্তি দ্বারা নিষ্পেষিত, ভয়ে অসার এবং স্থবির হয়ে পড়ছে। উদ্দেশ্যবিহীন সেই ভয় জেনে গিয়েছিল যে সেই প্রাচীন বাড়িটায় সে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে! প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেও সে সফল হল না। ভয় তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলে এবং সেখানেই তাকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রাখে। যেন কোনও অদৃশ্য ব্যক্তি মন স্থির করে ফেলেছে যে সে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে না এবং সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক বিষয় হল,—সেই ভয়ের কোনও যুক্তি নেই। যেন এক অভূতপূর্ব ভয় যার কোনও কারণ নেই, কেবলমাত্র ভয়ের জন্যেই ভয়।

জিহ্বার লালা ঘন হয়ে উঠল। ওই শক্ত আঠালো লালা তালুর সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় দাঁতের ভেতর তা ধরে রাখা ভীষণ বিরক্তিকর। ঠিক তেষ্টা নয় তবে অনেকটা সেইরকম একটা ইচ্ছা জন্ম নিল। একটু উন্নততর ইচ্ছে যা জীবনে প্রথমবার সে অনুভব করল। এক মুহূর্তের জন্যে সে ভুলে গেল তার সৌন্দর্যের কথা, অনিদ্রার কথা এমনকি অযৌক্তিক ভয়ের কথা। তখন সে নিজেকেই চিনতে পারল না। মনে হল দেহ থেকে জীবাণুগুলি বিদায় নিয়েছে। মনে হল লালার সঙ্গে ওগুলোও বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা বেশ মজারই হল। তার শরীরে ওই কীটগুলো আর নেই,—এটা বেশ আনন্দের কথা। এবং সে এখন ঘুমোতেও পারবে। তবে ওই শক্ত লালা জাতীয় পদার্থটাকে যা তাব জিহ্বাকে নিস্তেজ করে রেখেছে, দ্রবীভূত করার একটা উপায় বের করতে হবে। যদি একটা ঘর ভাড়ার খবর পাওয়া যায়...কিন্তু তার মাথায় কোন চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে? মনের ভিতর সঞ্চারিত হচ্ছে বিস্ময়ের অনুভূতি। অম্লরসের প্রয়োজনীয়তা তাকে দুর্বল করে তুলেছে। বালকটিকে সমাধিস্থ করার পর থেকে গত কয়েক বছর ধরে সে অকারণে অনুগতভাবে শৃঙ্খলা অনুসরণ করে এসেছে। নেহাতই বোকামি, তবুও কমলালেবু খাওয়ার ব্যাপারে তার অনুভূতিতে এসেছে এক আকস্মিক পরিবর্তন। সে জানত কমলালেবুর কুঁড়িতে ওই বালকটির অবস্থান এবং আসন্ন শরতের ফল পরিপুষ্ট হবে ওর রক্ত-মাংসে আর ওর মৃত্যুর শীতলতায় তা শীতল হবে। না, তার পক্ষে ওই কমলালেবু খাওয়া সম্ভব নয়। সে জানে পৃথিবীর সমস্ত কমলালেবু গাছের নিচেই সমাধিস্থ রয়েছে একটি বালক। কমলালেবুগুলো তাদের অস্থি-মজ্জার রসে সুমিষ্ট হয়ে ওঠে। না, কমলালেবু সে খেতে পারবে না। এটাই একমাত্র খাদ্যবস্তু যা তার মাড়ির পক্ষে অস্বস্তিকর। কমলালেবুর মধ্যে বালকটির অস্তিত্বের কথা চিন্তা কবাও মূর্খামি। বরং সেই মুহূর্তগুলোর জন্যে সে প্রতীক্ষায় কাল গুনবে যখন সৌন্দর্য তাকে ভাঁড়ারঘরে ফিরে যাওয়ার জন্যে তাগাদা দেবে না। কিন্তু সেটা কি অদ্ভুত নয়? জীবনে এই প্রথম তার কমলালেবু খাওয়ার ইচ্ছে হল। সে খুশি, ভীষণ খুশি। আহ্ কী তৃপ্তি! মাত্র একটা কমলালেবু খাওয়াতেই এত আনন্দ। তবে তার জানা নেই কেন এমন হয়। আবার এমন অনিবার্য আগ্রহ কিন্তু আগে কখনও হয়নি। সে আবার উঠে দাঁড়াবে, আবার স্বাভাবিক নারীতে রূপান্তরিত হওয়ার আনন্দ উপভোগ করবে, যতক্ষণ না ভাঁড়ারঘরে পৌঁছোতে পারবে ততক্ষণ সেই নবজাতকের মতো আনন্দে গান গেয়ে যাবে। সে নেমে আসবে তার উঠোনে এবং...

সহসা উধাও হয়ে গেল তার স্মৃতিশক্তি। তার মনে পড়ছিল,—সে উঠবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তখন সে আর বিছানায় নেই, তার দেহ যেন শূন্যে বিলীয়মান হয়ে গেছে। তার প্রিয় তেরোটি বইও সেখানে নেই আর সে যেন তখন দেহহীন হয়ে নিঃসীম শূন্যতার উপর ভাসছে। সে যেন পরিণত হয়েছে এক অবয়বহীন ছোট্ট বিন্দুতে। খুঁজে পাচ্ছে না কোনও দিশা ; ঠিক কী যে হয়ে গেল তা-ও সে নির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না। সে বিহ্বল হয়ে পড়ল। শুধু এইটুকু অনুভূতি ছিল যা দিয়ে সে বুঝতে পারে কেউ যেন কোনও এক উঁচু চূড়া থেকে শূন্যতার মধ্যে তাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। মনে হল সে যেন এক বিমূর্ত কাল্পনিক বাস্তবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তার উপলব্ধি,—অশরীরী নারীমজ্জায় পরিণত হয়ে সে বিচরণ করছে মহাশূন্যের এক অজানা অথচ পবিত্র আত্মার জগতে।

তার ভিতরে আবার ফিরে এল সেই ভয়। এই অনুভূতিটা ঠিক সেইরকম ভয়ের মতো নয়, তবে

একটা অন্যরকম ভয়। আবার এটা সেই বালক-এর কান্নার ভয়ও নয়। এ এক আশ্চর্যজনক ভীতি যা তার নতুন জগতে অজানা এবং রহস্যময়। আর অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এইসব ঘটে গেল। সে ভাবছিল বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরে মায়ের প্রশ্নের উত্তরে কি বলবে। প্রতিবেশীরা তার ঘরের দরজা খুলে শূন্য বিছানা দেখে কিভাবে চমকে উঠবে, তাই নিয়ে সে ভাবছিল। ঘরের তালা কেউ ছোঁয়নি। বসবাসের জন্যে কেউ ভেতরে প্রবেশও করেনি। কিন্তু সে সেখানে নেই। সে কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছিল মা কিরকম ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চতুর্দিকে তাকে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে বলছেন,—মেয়েটার কি হল বল তো। প্রতিবেশীরা এসে ততক্ষণে নানানরকমের মন্তব্য করতে শুরু করে দিয়েছে। কেউ কেউ আবার তার অন্তর্ধানে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়েছে। সকলেই নিজের মতো করে চিন্তাভাবনা করছে। প্রত্যেকেই নিজের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে সচেষ্ট, যেন সেটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। আর তার মা তখন সেই বিরাট বাড়ির বারান্দায় মেয়ের নাম ধরে ডেকে ডেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন মেয়েকে।

এবং সেখানেই তার থাকার কথা। সেই মুহূর্তগুলো সে নিখুঁতভাবে মনে করতে পারে। ঘরের প্রতিটি কোনা, ছাদ, দেওয়ালের ফাটল সবই অদৃশ্যতার আবরণে ঢাকা অবস্থাতেই সে দেখতে পায়। এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে গেলেই সে বিরক্ত হয়ে পড়ছিল। এবার সে নিজের ভুল বুঝতে পারল। তবে এই ব্যাপারে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা বা সান্ত্বনা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনও সজীব সত্তার কাছেই পৌঁছোনো যাবে না তার এই পরিবর্তনের বার্তা। এখন, হয়তো কেবলমাত্র এই সময়েই সে তাদের প্রয়োজন মনে করছে, যারা বুঝতে পারছে মুখ-বাহু না থাকলেও তার অস্তিত্ব এখানে বর্তমান। সে রয়েছে ত্রিমাত্রিক পৃথিবীর সেই কোনাটিতে যা সেতু দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এমন এক দূরত্বেই তার অবস্থান। তার এই নতুন জীবনে সে সম্পূর্ণভাবেই নিঃসঙ্গ। কোনওরকম আবেগ উচ্ছ্বাসও সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই একটা কল্পনা তার ভেতরে সক্রিয়। একটা আলোড়নে তার অন্তর্দেশ পরিপূর্ণ এবং তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তার নিজস্ব জগতের বাইরেও একটা প্রাকৃতিক পৃথিবী রয়েছে। সে শুনতেও পাচ্ছে না। দেখতেও পাচ্ছে না। কিন্তু শব্দ ও দৃশ্যের কথা তার জানা। সেখানে সে নিজের উন্নত জগতে বাস করেও এক যন্ত্রণার উপলব্ধিতে আক্রান্ত।

অস্থায়ী পৃথিবীর হিসেব অনুসারে একটু আগে তার নিজস্ব জগতের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যগুলো সে বুঝতে পারল। ঘন অন্ধকার ছেয়ে আছে তার চারপাশে। কতক্ষণ স্থায়ী হবে এই অন্ধকার? এমন আঁধারের সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যেই কি তাকে শাশ্বতকাল অপেক্ষা করতে হবে? এই একনিবিষ্ট চিন্তা থেকে বাড়তে শুরু করল তার মানসিক যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে, যেন এক অভেদ্য কুয়াশার গভীরে সে ডুবে যাচ্ছে। সে কি নরকের দ্বারে পৌঁছে যাচ্ছে? সে শিউরে উঠল। নরক সম্পর্কে যা কিছু শুনেছে সেইসব কথা ভেসে এল তার স্মৃতিতে। যদি সেখানেই সে সত্যি সত্যি থাকত তাহলে তার চারপাশে ঘুরে বেড়াত পুণ্য আত্মারা আর সেইসব শিশুদের আত্মা যারা আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আগেই মারা গেছে এবং হাজার বছর ধরে ভোগ করে চলেছে মৃত্যুযন্ত্রণা। সেই অন্ধকারের ভেতরে সে এমন কাউকে খুঁজতে থাকল যে তার থেকেও পবিত্রতর ও সরল প্রকৃতির। বাস্তব জগৎ থেকে সে এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ঘুমন্ত অবস্থায় হেঁটে-চলে বেড়িয়ে এক শাশ্বত জীবনে সে এখন পরিত্যক্ত। হয়তো বা সেই বালকও সেখানে ছিল যে নিজের দেহে প্রত্যাগমন করবার জন্যে পথ খুঁজতে ব্যস্ত।

তবে তা নয়। সে কেন নরকে যাবে? মৃত্যু হলে না হয় একটা কথা ছিল। না, এটা তো একটা অবস্থার সাধারণ পরিবর্তন মাত্র। বাস্তব পৃথিবী থেকে এক সহজ-সরল জটিলতাবিহীন জগতে সাধারণ যাত্রা, যেখানে বিলীন হয়ে গেছে সমস্ত মাত্রা।

এখন তাকে আর সেই অসহ্য কীটগুলির অত্যাচার সহ্য করতে হবে না। তার সৌন্দর্য শরীরে এসে ধাক্কা খেয়েছে। এখন সেই সূচনাপর্বের পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে পারলে সে সুখী হতে পারে। না, সম্পূর্ণ সুখী নয়; কারণ এখন তার একটা কমলালেবু খেতে ইচ্ছে করছে অথচ যা প্রায় অসম্ভব। এটাই একমাত্র বস্তু যা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে প্রথম জীবনে। এই সফরের শেষে অম্লতা চেখে নিয়ে সে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারে। ভাঁড়ারঘরে ফিরে যাওয়ার জন্যে নিজেকে সে তৈরি করার চেষ্টা করতে

লাগল। এবং আর কিছু নয় সেই শীতল ও অম্লমধুর কমলালেবু চেখে দেখার জন্যে সে এখন উন্মুখ। ঠিক তখনই সে আবিষ্কার করল তার নিজের পৃথিবীর এক নতুন চরিত্র, যে জগতে সে ছড়িয়ে রয়েছে ঘরে, ছাদে, উঠোনে এমনকি বালকটির কমলালেবু গাছে। আবার সে হতাশায় ভেঙে পড়ল। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেল। এখন সে এক উন্নত চিন্তার অধীন একজন অপদার্থ, অবাস্তব, কোনও কম্মের নয়। কেন? কোনও কারণ না জেনেই সে এখন বিষাদগ্রস্ত। নিজের সৌন্দর্যের জন্যে সে এক মন খারাপ করা বেদনা অনুভব করল। সেই সৌন্দর্য যা তাকে মূর্খের মতো ধ্বংস করেছে।

কিন্তু একটি দারুণ চিন্তা মাথায় খেলে যাওয়ায় সে নিজেকে পুনর্জীবিত বলে মনে করতে পারল। সে কি শোনেনি,—পবিত্র আত্মারা ইচ্ছেমাফিক যে কোনও শরীরে সেঁধিয়ে যেতে পারে? এমন একটা চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? সে মনে করার চেষ্টা করছে এই ব্যাপারে বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে কাকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করানো যায়। উদ্দেশ্য সফল হলে সে সন্তুষ্ট হতে পারত। কমলালেবু খেতে পারত। সে স্মৃতিচারণ করল। এই সময়টায় সেখানে সাধারণত কোনও গৃহভৃত্য উপস্থিত থাকে না। মা-ও এসে পৌঁছোননি। কিন্তু কমলালেবু খাওয়ার জন্যে সে নিজেকে এমন এক চেহারায় কল্পনা করল যা তার নিজের চেহারা থেকে একেবারে ভিন্ন। অথচ সেই কাল্পনিক মানুষ তাকে কমলালেবু খাওয়ায় উৎসাহ দিচ্ছে। কিন্তু সেখানে এমন কেউ ছিল না যাকে সে নিজের প্রতিমূর্তি বলে কল্পনা করতে পারে। নিঃসঙ্গ তাই এর কারণ। বাড়িতে আর কেউ নেই। শাশ্বতকাল অবধি বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার পরিধিবিহীন জগতে ওই বাড়িতে থাকতে হবে তাকে যেখানে সে একটাও কমলালেবু খেতে পারবে না। একটা বোকামির জন্যেই এমন হবে। বরং অনর্থকভাবে একটি পরাজিত পশুর মতো আরও কয়েক বছর ধরে সেই প্রতিকূল সৌন্দর্যকে দেহে ধারণ করে রাখত এবং চিরকালের মতো মুছে ফেলত না। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

পৃথিবীর এক প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাস করে হতাশাগ্রস্ত হয়ে সে তার সমস্ত পার্থিব বাসস্থানকে ভুলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ এমন কিছু ঘটে যায় যা তাকে পিছনে ফিরতে বাধ্য করে। তার সেই অজানা জগতে ছড়িয়ে পড়ল এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশার আলো। হ্যাঁ, সেই বাড়িতে এমন কেউ ছিল যার ভিতরে সে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হল। একটা বিড়াল! এবার সে একটু ইতস্তত করল। একটা বিড়ালের ভেতরে নিজেকে সমর্পণ করা বেশ কষ্টকর। তার প্রয়োজন নরম সাদা রোম আর শক্তিশালী মাংসপেশীর অধর-ওষ্ঠ। অন্ধকারে তার চোখ দুটো যেন সবুজ কয়লার মতো জ্বলজ্বল করে। এবং বিড়ালের মতো হৃদয় নিয়ে সাদা-ধারালো দাঁত বের করে মায়ের দিকে তাকিয়ে পশুসুলভ হাসি যেন সে হাসতে পারে। কিন্তু না, তা হল না। বারান্দা দিয়ে ছুটতে থাকা একটা বিড়ালের ভেতরে নিজেকে দ্রুত সংস্থাপনের কথা চিন্তা করল সে। চারটে অস্বস্তিকর পা সামলে নিয়ে ছন্দবিহীন লেজ দুলছে নিজের খেয়ালে। ওই উজ্জ্বল নীল চোখের আলোয় জীবনকে কেমন দেখাবে? রাত্রিবেলায় আকাশের দিকে মুখ রেখে বিড়ালের মতো ডাকবে যাতে ওই বালক-এর মুখের ওপরে আলো এসে না পড়ে। আর বালক তখন তার পিঠে বসে শিশিরের মধ্যে পান করবে। হয়তো বিড়ালের চেহারায় নিজেকে দেখে সে-ও খানিকটা ভয় পেয়ে যাবে। এবং মাংস খেতে অভ্যস্ত তার জিহ্বা তথা মুখগহ্বর হয়তো কমলালেবুর স্বাদ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবে। তখনই দক্ষিণ দিক থেকে ভেসে এল একটা শীতলতা। ঠিক যেন তীরের মতো এসে তার স্মৃতিতে বিঁধে গেল। না, বিড়ালের সঙ্গে নিজের অস্তিত্বকে মিলিয়ে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিড়ালের শরীরে কোনও একদিন একটা চতুষ্পদী ইঁদুরকে গলাধঃকরণ করার অদম্য ইচ্ছেকে প্রশ্রয় দিতে হতে পারে ভেবেই সে ভীত হয়ে পড়ল। একটা বিড়ালের দেহের ভিতর তার আত্মা বসবাস করতে শুরু করার সময় থেকেই হয়তো তার কমলালেবু খাওয়ার বাসনা অন্তর্হিত হয়। বরং তখন সে একটা ইঁদুর খাওয়ার জরুরি তাগিদ অনুভব করে। তার মনে হল তাড়া করার পর ইঁদুরটাকে দাঁতের পাটিতে আটকিয়ে নেওয়া গেছে। সে অনুভব করল, ইঁদুরটা যেন কোনওরকমে ছাড়া পেয়েই আবার গর্তে সেঁধিয়ে যাওয়ার বাসনায় প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিছুই নয়, তবুও সেখানে, রহস্য ঘেরা

পবিত্র সত্ত্বার সেই দূরবর্তী পৃথিবীতে অনন্তকাল ধরে বসবাস করাই বরং শ্রেয়।

কিন্তু নিজেকে চিরকালের মতো ভুলে থাকা বড় কষ্টকর। কেন একটা ইঁদুর খাওয়ার ইচ্ছে হল! একজন মহিলা এবং একটা ইঁদুরের সংশ্লেষ হলে আধিপত্য করবে কে! আদিম পাশবিক প্রবৃত্তিই শাসন করবে নাকি নারীর পবিত্র ইচ্ছা? উত্তরটা কাচের মতো স্বচ্ছ। ভয় পাওয়ার মতো কোনও কারণ নেই। বিড়ালের দেহ ধারণ করেও ঈপ্সিত কমলালেবু খাবে সে। তাছাড়া সে হবে এক অদ্ভুত সত্ত্বা,—বিড়াল, কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তা হবে সুন্দরী নারীর মতো। সে হবে সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এই প্রথম সে অনুভব করল শেষ পর্যন্ত তার গুণসমূহের মধ্যে রয়েছে সৃজন ও প্রজ্ঞা সংক্রান্ত দর্শনের অধিকারী হওয়ার যথার্থ অহঙ্কার।

কীটপতঙ্গ যেমন সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনে নিজেদের শুঁড়গুলোকে খাড়া করে রাখে সেইরকমভাবে সে-ও সারা বাড়ি জুড়ে ওই বিড়ালটাকে খুঁজে বের করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করল। বিড়ালটা হয়তো তখন স্টোভের উপর উঠে বসে দাঁতের ফাঁকে সূর্যমুখী রঙের আভা নিয়ে জেগে ওঠার স্বপ্ন দেখছে। তবে বিড়ালটা ওখানে নেই। সে আবার বিড়ালটাকে খোঁজার চেষ্টা করল। কিন্তু বাড়ির কোনাগুলো তার কাছে অপরিচিত ঠেকল। কালো কালো মাকড়সার জালগুলো অনুপস্থিত। বিড়ালটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। ছাদে, গাছের ওপরে, নর্দমায়, বিছানার তলায়, ভাঁড়ারঘরে সর্বত্র সে খুঁজে দেখল। সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতিগুলো যেখানে ছিল সেখানে দেখল এক বোতল আর্সেনিক রাখা রয়েছে। তারপর নজরে এল সারা বাড়িতেই আর্সেনিক ছড়িয়ে রয়েছে অথচ বিড়ালটা উধাও হয়ে গেছে। বাড়িটাও আর আগের মতো নেই। তার জিনিসপত্রগুলো গেল কোথায়? প্রিয়তম তেরোটি বইও কেন আর্সেনিকের প্রলেপে ঢাকা রয়েছে? মনে পড়ল উঠোনের কমলালেবু গাছটার কথা। সেই দিকে তাকিয়ে জল ভর্তি গর্তটার ভেতরে সে খুঁজতে চাইল বালকটিকে। কিন্তু কমলালেবু গাছটি আর আগের জায়গায় নেই। বালকটিও খানিকটা আর্সেনিক মেশানো ছাই হয়ে শক্ত বেদির তলায় চাপা পড়ে গেছে। এখন সে সত্যি সত্যিই ঘুমোতে যাবে। সবকিছুই অন্যরকম। সারাটা বাড়ি আর্সেনিকের গন্ধে ম' ম' করছে। এমন একটা গন্ধ তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করছে যা শুঁকে তার মনে হল যেন গন্ধটা ভেসে আসছে ওষুধের দোকান থেকে।

ঠিক তখনই সে বুঝতে পারল কমলালেবুটি খাওয়ার জন্যে যেদিন প্রথম ভীষণ ইচ্ছা করেছিল তারপর তিন হাজার বছর পার হয়ে গেছে।

মূল শিরোনাম · Eva está dentro de su gato

তৃতীয় ত্যাগ

আবার শুরু হল সেই শব্দটা। সেই ঠান্ডা হিমেল, কর্ণভেদী ছুঁচোলো শব্দটা, যা এখন সে ভালোভাবেই জানে। কিন্তু এখন যেটা তার কানে আসছে,—তা বড়ই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাদায়ক, রাতারাতি যেন সে এই শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

ফাঁপা মস্তিষ্কে এটা ঘুরতে ঘুরতে ঢুকছে। একঘেয়ে কামড় বসানো শব্দ তার খুলির চার দেওয়ালের মধ্যে যেন একটা ভ্রমরগুঞ্জন। প্রত্যেকটি পাকের সঙ্গে সঙ্গে এটা বেড়েই চলেছে। আস্তে আস্তে ভেতরে ধাক্কা মারছে। শরীরের স্বাভাবিক সুন্দর ছন্দ ছাড়িয়ে মেরুদণ্ডের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে দিচ্ছে একটা বেহিসেবি কাঁপন। কিছু একটা তাঁর মানুষী কাঠামোর মধ্যে অপরিচিত ঠেকছে। কিছু একটা যা 'অন্য সময়' স্বাভাবিকভাবেই কাজ করতে অভ্যস্ত, কিন্তু এখন হাতুড়ির মতন তাঁর মস্তিষ্ককে খটখটে হাড়ের হাত দিয়ে পিটছে; তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে জীবনের সমস্ত তিক্ত অনুভূতি। জান্তব তাড়নায় সে তার মুঠো বন্ধ করত, রগগুলো উঠত দপদপিয়ে আর তার বেপরোয়া যন্ত্রণার চাপে সেগুলো নীলচে আকার ধারণ করত। সময়কে ছিঁড়ে ফেলা ছুঁচোলো শব্দটাকে সে হাতের তালুতে বন্দি করার চেষ্টায় ছিল। তার যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়া, জ্বরে ভারাক্রান্ত মাথায় একটা পোষা বিড়াল যেন এ কোণ থেকে ও কোণে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এখন সে এটাকে ধরতে পারে। কিন্তু না। শব্দটা পিছলে যাওয়া পশমের মতন, একেবারেই অস্পৃষ্ট। কিন্তু সে সমস্ত জানা কৌশল দিয়ে ওটাকে ধরতে প্রস্তুত এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে বেপরোয়াভাবে অনেকক্ষণ ধরে শক্তভাবে সে ওটাকে ধরতে রাজি। তার মুখ দিয়ে ওটা আবার বেরিয়ে আসতে পারে বলে ওটাকে কানের মধ্যে ঢোকাতে সে মোটেই রাজি নয়। অথবা যে কোনও রকম ফাক-ফোঁকর দিয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে সেটা ঘুরবে এবং তাকে অন্ধ করে দেবে, যাতে শব্দটা নিশ্চিন্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে যা ইচ্ছে তাই করে ঘোরাঘুরি করতে পারে। সে অবশ্যই তার খুলির ভেতরের দেওয়ালের শীতল চাদরটা ভেঙে দিতে রাজি নয়। এবং শব্দটা এরকমই। যেন চিরন্তন, নাছোড়বান্দা, কামড়ে ধরা বাচ্চার মতন। প্রকৃতির যে কোনওরকম নিশ্চিত বিষয়ের বিপক্ষে এটা একটা সুদৃঢ় প্রত্যাখ্যান। কিন্তু যখনই সে ওটাকে গণ্ডিবদ্ধ করতে চায়, আলাদা করতে চায় তক্ষুনি ওটা আরও চেপে বসে। তাকে নিজের চঞ্চল ছায়া থেকে ছেঁটে ফেলে। সেঁটে ধরে। নিংড়াও। হ্যাঁ, এখন চিরকালের মতো সমস্ত শক্তি দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দাও, হিংস্রভাবে মাড়াও যতক্ষণ না সে বলতে পারে,—অবশেষে সেই কুরে খাওয়া শব্দটাকে সে মারতে পেরেছে, যা তাকে পাগলা করে দিচ্ছিল এবং এখন সেটা যে কোনও সাধারণ জিনিসের মতন অক্ষত। ওটা এখন ক্লীবত্বে পর্যবসিত হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু রগদুটোকে চেপে ধরা তার পক্ষে,—এককথায় অসম্ভব। তার পক্ষে হাত দুটো ছোট এবং একজন প্রকৃত বেঁটে লোকের অঙ্গের মতো ছোট ; গোলগাল, থলথলে। সে তার মাথা নাড়াতে চেষ্টা করল। নাড়াল। শব্দটা আরও তীব্র গতিতে তার খুলিতে ঢুকল এখন আরও শক্ত। তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছে। আরও বেশি মাধ্যাকর্ষণের ভারে ভারাক্রান্ত। শব্দটা ভারী এবং শক্ত। এতটাই ভারী এবং শক্ত যে একবার যদি সে ওটাকে ধরে এবং শেষ করে, তার মনে হবে সে একটা সিসের ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ল।

একইরকম জোরে সে 'অন্য কোনও সময়' শব্দটা শুনেছিল। সে শুনেছিল,—উদাহরণ, যেদিন সে প্রথম মারা গেছিল, সেই সময়, যখন সে একটা মৃত্যু দেখেছিল, অনুভব করেছিল, এটা তারই মৃতদেহ। সে তাকিয়েছিল এবং স্পর্শ করেছিল। নিজেকে তার মনে হয়েছিল, অধরা খোলসহীন, অস্পৃষ্ট। সত্যিই সে একটি মৃতদেহ এবং সে এর মধ্যেই অনুভব করছিল এটা তার দেহের, রোগে ভুগে ভুগে যে শরীরটার আর কিছু নেই, মৃত্যু পথ পরিক্রমা। সারা বাড়ি জুড়েই আবহাওয়াটা ভারী, যেন তা সিমেন্টের তৈরি

এবং তার মাঝখানে ফাঁপা হাওয়াভর্তি জায়গাটায় তাকে কফিনের মধ্যে রাখা হয়েছে। স্বচ্ছ কিন্তু শক্ত সিমেন্টের তৈরি। সেই সময়ও তার মাথায় সেই শব্দ। কত দূরে! কি ঠান্ডা তার পায়ের তলা। কফিনের অপর প্রান্তে মাথাটা বালিশের সঙ্গে ঠেকে আছে। কারণ, কফিনটা তার তুলনায় বেশ বড়ই এবং সেই কারণেই এখন গোঁজ দেওয়া, মৃত শরীরটাকে নতুন এক শেষ পরিচ্ছেদের সঙ্গে পরিচিত করে তোলার ব্যবস্থা। সাদা কাপড় দিয়ে তাকে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। এবং চিবুকটা রুমাল দিয়ে বাঁধা। সবমিলিয়ে মর্মান্তিক হলেও ছিমছাম।

সে তার কফিনে, সমাধিস্থ হতে প্রস্তুত। যদিও সে জানে, এর পরেও সে মরেনি। যদি সে উঠতে চেষ্টা করে, তাহলে খুব সহজেই সে তা পারবে। নিদেনপক্ষে আত্মিকভাবে। কিন্তু সত্যিই এত ঝামেলা পোষাবে না। নিজেকে তার চেয়ে মৃতাবস্থায় এখানে ফেলে রাখা অনেক ভালো—'মৃত্যুর' মৃত্যু, তার অসুস্থতা।

ডাক্তার তার মাকে খুব শুকনোভাবে বলেছিলেন,—'আপনার ছেলেটা বড় দুঃখী। অসুখটা বড়ই করুণ। সে মারা গেছে। তাহলেও'—তিনি বলে চললেন। 'মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু সম্ভব আমরা তা করে দেখেছি। অটোনিউট্রেশনের এক জটিল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তার দৈহিক ক্রিয়াকলাপকে সচল রাখতেও সমর্থ হয়েছিলাম। কেবল তার যান্ত্রিক ক্রিয়াটাই অন্যরকম। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আলাদাভাবে বেড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে তার জীবনীশক্তিকে আমরা লক্ষ্য করছিলাম, যা স্বাভাবিকভাবে চলত। এটা পরিষ্কার একটা জীবন্মৃত্যুর ঘটনা। একটা বাস্তব এবং সত্যিকারের মৃত্যু...।'

সে শব্দটা মনে করল, তবে এক বিচিত্র-বিভ্রান্ত পথে। হয়তো শব্দগুলো আদপে শোনেইনি, হয়তো তারই মস্তিষ্ক প্রসূত। কারণ, সেই টাইফয়েডের সময় থেকেই তার শরীরের তাপমাত্রা বাড়ছিল।

যখন সে তার মগজের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল তখন সে ছবিওয়ালা ফারাওদের কাহিনি পড়তে পারত আর জ্বর বাড়তেই সে নিজেকে একজন প্রোটাগেনিষ্ট বা এই জীবন-নাট্যের কর্ণধার হিসেবে মনে করতে শুরু করল। তার মধ্যে বাসা বাঁধল এক ধরণের শূন্যতা। তখন থেকে সে স্মৃতিকে আলাদা করতে পারত না। কোনটা খুলির অংশ আর কোনটা তার সত্যিকারের জীবনের—এই কারণ অনুসন্ধানেই সে এখনও সংশয়াচ্ছন্ন। হয়তো ডাক্তার সেই জীবন্মৃতুর কথা উচ্চারণই করেননি। এটা সবমিলিয়ে হেঁয়ালিভরা এবং অযৌক্তিক। সোজা কথায় গোলমেলে এবং এটাই তাকে সন্দেহ করায় যে সে সত্যিই মারা গেছে। যা সে গত আঠারো বছর ধরেই ভেবে আসছে।

তখন তার মৃত্যুর সময়, যখন তার বয়স সাত মাস, তার মা তার জন্য একটা ছোট সবুজ কাঠের কফিন আনালেন। একটা বাচ্চার কফিন, কিন্তু ডাক্তার আরও বড় কফিন আনতে নির্দেশ দিলেন। একজন পূর্ণবয়স্কের আন্দাজে। কারণ, সেখানে তার বৃদ্ধি হবে একজন মৃত ব্যক্তি হিসেবে অথবা অস্বাভাবিক মৃত হিসেবে। অথবা বৃদ্ধির ধারণাটা তাকে মনে করিয়ে দেবে, সে ভালো হচ্ছে। ওই সতর্কবাণী শুনেই মনে হয় তার মা আরও বড় কফিন আনালেন, পূর্ণবয়স্ক একটি মৃতদেহের মাপে এবং তার মধ্যে তিনটে বালিশ গুঁজে দিলেন যাতে ব্যাপারটা মানানসই হয়।

সে বাক্সের মধ্যে তাড়াতাড়ি বড় হতে লাগল। সে, এমনভাবে বাড়তে লাগল যে প্রতি বছরই বাক্সের জায়গা বাড়ানোর জন্য শেষের বালিশগুলো থেকে তুলো বের করে নিতে হত। এইভাবে সে জীবনের অর্ধেকটা কাটিয়েছে। আঠারো বছর ধরে সে তার স্বাভাবিক নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছেছে। ছুতোর এবং ডাক্তার দু'জনেই গণনায় ভুল করেছিল এবং কফিনটিকে আরও দু' ফুট বাড়াতে হল। তারা ভেবেছিল যে সে বাবার আদল পাবে যিনি অনেকাংশে বুনো দৈত্যের মতো ছিলেন। কিন্তু সেরকমটা শেষ পর্যন্ত হয়নি। একমাত্র ঘন দাড়িটাই সে পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। ঘন, নীল দাড়ি যা তার মা প্রায়শই আঁচড়িয়ে দেন যাতে কফিনে তার কোনও অসুবিধা না হয়। গরমের দিনে দাড়িগুলো তাকে ভীষণ জ্বালায়।

কিন্তু সেই শব্দটা ছাড়াও আরও অনেক কিছু তাকে বিব্রত করে। ইঁদুরেরা, এমনকি শিশু হিসেবে ইঁদুরেরা ছাড়া আর কিছুই তাকে এতটা সন্ত্রস্ত করতে পারেনি। সংক্ষিপ্তভাবে এরা হচ্ছে সেই সমস্ত

অস্বস্তিকর জন্তু যারা তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা মোমের গন্ধে আকৃষ্ট। এর মধ্যেই ইঁদুরগুলো তার জামাকাপড় কাটতে শুরু করে দিয়েছে এবং সে ভালোভাবেই জানে এর পরের লক্ষ্য হচ্ছে তার এই দেহ। একদিন অনেক চেষ্টার পর সে তাদের দেখতে পেল। পাঁচটা চকচকে মসৃণ ইঁদুর টেবিলের পায়া ধরে বাক্সের ওপর ওঠার চেষ্টায় ব্যস্ত। ঠিক তখনি তার মা লক্ষ্য করলেন সেখানে তার ঠান্ডা শক্ত হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। সে জানে না ইঁদুররা তাকে খেয়ে ফেলবে এই চিন্তায়ই তাকে বেশি আচ্ছন্ন করে তুলেছিল কিনা। মোটের ওপর সে তার কঙ্কালটুকু নিয়েই বেঁচে আছে। সেই সমস্ত ছোট জন্তুগুলো সম্পর্কে এক অজানা ভয়ই তাকে কুরে কুরে খায়। এই পশমি জন্তুগুলো তার গায়ের উপর ঘুরবে, তার প্রত্যেকটি চামড়ার ভাঁজে ঢুকবে, তাদের শীতল থাবা নিয়ে তার ঠোঁটের উপর ঘুরবে, এই সব চিন্তাতেই তার মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ তার চোখের পাতায় উঠেছে, কেউ এর মধ্যেই মনটাকে ঠোকরাতে চেষ্টা করেছে। সে দেখতে পেল,—তার চোখের কন্দরে একটা বিশাল দৈত্যাকার ইঁদুরের ঢোকার বেপরোয়া প্রচেষ্টা। সে ভাবে এটা তার নতুন মৃত্যু। সম্পূর্ণভাবে সে আত্মসমর্পণ করল।

তার স্মরণে এল, সে বড় হয়েছে। তার বয়স এখন পঁচিশ বছর, মানে সে আর বড় হবে না। তার চেহারা কঠিন-গম্ভীর। কিন্তু স্বাস্থ্যবান থাকার সময়ও তার বাল্যাবস্থা সম্পর্কে সে কিছুই বলতে পারে না।

তার তখন কিছুই ছিল না। সে সেই সময়টা মৃতাবস্থায় কাটিয়েছিল। শৈশব থেকে যৌবনকালের মধ্যে তার মা ভীষণ নজর দিয়েছিলেন। কফিনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, গোটা ঘরটার স্বাস্থ্য সম্পর্কেই তিনি যথেষ্ট সচেতন। মাঝেমধ্যে তিনি ফুল পালটিয়ে দেন এবং রোজই জানালা খুলে দেন, যাতে টাটকা হাওয়া ঘরে ঢুকতে পারে। প্রায় প্রতি দিনই তিনি ফিতে দিয়ে তাকে মাপতেন এবং তাকে প্রতিদিন সামান্য কয়েক সেন্টিমিটার বাড়তে দেখে যথেষ্ট সুখী হতেন। তাকে জীবিত দেখে তাঁর মাতৃসত্তা পরিপূর্ণ হত। তাহলেও তিনি বাড়িতে আসা অপরিচিতদের সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। আসলে পাড়ায় একটি মৃতদেহ সবসময়ের জন্য রাখা যথেষ্ট রহস্যজনক আর অপছন্দের কারণ ছিল। তিনি ছিলেন অস্বীকারের প্রতিমূর্তি। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই তার আশা ভাঙতে শুরু করেছিল। বিগত বছরগুলিতে সে তার মাকে দুঃখের সঙ্গে ফিতের দিকে তাকাতে দেখত। তাঁর সোনা আর বড় হচ্ছে না। গত কয়েকমাস ধরে এক মিলিমিটারও বৃদ্ধি হয়নি। তার মার পক্ষে এটা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে তাঁর আদরের মৃতদেহটিতে প্রাণ আছে। তাঁর ভয় হত কোনও এক সকালে 'সত্যি' সে মৃত হবে। হয়তো এই কারণেই সেদিন সে দেখতে পাবে তিনি তার দেহ শুঁকতে এগিয়ে আসছেন। নিরাশার এক ভয়ংকর সংকটে পড়ে গেছেন তিনি। সম্প্রতি তিনি অমনোযোগী। মাপবার জন্য ফিতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার মতন ধৈর্য তাঁর আর নেই। তিনি জেনে গেছেন সে আর বাড়বে না এবং সে জানে সে সত্যিই মারা গেছে। সে ভালোভাবেই জানে কারণ তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গের শান্ত নরমভাব উবে যাচ্ছে। সবকিছুই ঋতু বহির্ভূতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। অনিবার্যভাবে তার নাড়ির দপদপানি আস্তে আস্তে মিইয়ে যাচ্ছে। সে এখন নিজেকে ভাবী, এই পুরোনো ব্যবহৃত পৃথিবীর একটি নাছোড়বান্দা সত্তা হিসেবে অনুভব করে। মাধ্যাকর্ষণ দেহকে এক অপরিবর্তনীয় শক্তিতে টানছে। সে ভারী, একটি সদর্থক অনস্বীকার্য মৃতদেহ। কিন্তু ওই দিক থেকে ব্যাপারটা আরও শান্তির। মৃত্যুকে বাঁচিয়ে রাখতে সে এমনকি নিশ্বাস নিতেও রাজি নয়।

কল্পনার এক পথ দিয়ে, নিজেকে স্পর্শ না করেই সে তার শরীরের বিভিন্ন সদস্যদের পেরিয়ে যাচ্ছে। চিমসে বালিশে তার মাথাটা বাঁদিকে কাত হয়ে রয়েছে। কল্পনাতেই সে বুঝতে পারল তার মুখটা ঘোলাটে, কারণ ঠান্ডা হাওয়ার একটা ফিতে তার কণ্ঠনালীকে ভরিয়ে দিচ্ছে। মাত্র পঁচিশটি বসন্ত পেরিয়ে আসা তরুণ বৃক্ষের মতনই সে হঠাৎ ভেঙে পড়েছে। হয়তো সে তার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছিল। চোয়ালে আটকে থাকা রুমালটি কখন যেন খসে পড়েছে। নিজেকে যথাযথভাবে রাখতে, নিজেকে সুস্থির রাখতে এমনকি একটি লাশ হিসেবে একটু ভদ্রস্থ রাখতেও পেশীগুলো, তার শরীরের সদস্যরা আর আগের মতন স্নায়ুতন্ত্রের হুকুম মেনে সাড়া দিচ্ছে না। আঠারো বছর আগের একটি স্বাভাবিক বাচ্চা যে

কিনা নিজের ইচ্ছানুসারে চলাফেরা করতে পারত সে আর নেই। সে এলিয়ে পড়ছে, চিরকালের জন্য এলিয়ে পড়ছে। এটা সে অনুভব করতে পারছে। কফিনের কুশনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকা নিজের হাত দুটোকে সে অনুভব করতে পারছে। তার পাকস্থলী ওয়ালনাট গাছের ছালের মতন শক্ত। তার পা দু'টো কিন্তু সম্পূর্ণ নিখুঁত। তার প্রাপ্তবয়স্ক আদলটা এবারেই পরিষ্কার। ভারী অথচ নিশ্চিন্তভাবে তার দেহ বিশ্রাম নিচ্ছে। কোথাও কোনও অস্বস্তি নেই। যেন পৃথিবী হঠাৎ করেই থেমে গিয়েছে আর কেউই সেই নিস্তব্ধতা খানখান করছে না। যেন পৃথিবীর সমস্ত ফুসফুসই বাতাসের নীরবতা বজায় রাখতে দম বন্ধ করে আছে। বিকেলের আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘের পানে ধ্যানমগ্নভাবে সে তাকিয়ে থাকে। ঠান্ডা, ভারী ঘাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে শিশুর মতন সুখী। সে সুখী, এমনকী মৃত জেনেও সে সুখী। চিরকালের জন্য কৃত্রিম রেশমের আচ্ছাদনে বাক্সের মধ্যে বিশ্রাম নেবে জেনেও, সে সুখী। সবমিলিয়ে সে ভীষণ প্রসন্ন। এটি ঠিক আগের মতন নয়। তার প্রথম মৃত্যুর পর যখন সবকিছুই ছিল একঘেয়ে বিরক্তিকর, ছন্নছাড়া, তারা তার চারধারে চারটে মোমবাতি রেখেছিল। তিনমাস বাদে বাদে সেগুলোর স্থান পরিবর্তন করা হত এবং যখন তার আর কোনও উপায় থাকত না তখন সেগুলো পালটাতে হত। সেই সকালে তার মা যে স্যাঁতসেঁতে টাটকা ফুলগুলো নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো সে অনুভব করেছিল। লিলি, গোলাপের মধ্যেও সে একই জিনিস অনুভব করেছিল। কিন্তু কখনও সেই ভয়ংকর বাস্তব তাকে উদ্বিগ্ন করত না। বরং আসলে সে তখন নিজের নিঃসঙ্গ খোপে খুশি ছিল। পরে কি সে ভয় পেয়েছিল?

কে বলতে পারে? সেই মুহূর্তটিকে চিন্তা করাও খুব কঠিন ব্যাপার, যখন সবুজ গাছকে হাতুড়ি আঁচড় কাটতে পারে এবং কফিনের আবার গাছে পরিণত হবার সুদূর চিন্তাও ভেঙে যেতে পারে। তার দেহ, এখন আরও বেশি বেগে পৃথিবীর দ্বারা নির্দেশিত হচ্ছে। দেহটা যেন স্যাঁতসেঁতে, কাদাটে, নরম গভীরতায় ডুবে আছে। আর ওপরে, চার গজ ওপরে, কবরখুঁড়িয়ের শেষ আঘাতগুলো বিলীনপ্রায়। না। সেখানে সে ভীত নয়। এটা তার মৃত্যুর দীর্ঘসূত্রতা, তার এই নতুন অবস্থার সবচেয়ে স্বাভাবিক দীর্ঘসূত্রতা হতে পারে।

তার শরীরে এমনকি এক ডিগ্রিও তাপমাত্রা নেই। চিরকালের জন্য তার মজ্জা বরফের মতন শব্দহীন আর হাড়ের যত গভীরে যাওয়া যেতে পারে তত গভীরে গিয়ে যেন বরফের বুদবুদগুলো ঢুকছে। মৃত মানুষ হিসেবে কী সুন্দর তাঁর নতুন জীবনের বৃদ্ধি! একদিন অবশ্য সে তার জমে যাওয়া হাতগুলোকে দু'পাশে ঘোরাতে পারবে আর যখন সে তার শরীরের উলটোপালটা হয়ে যাওয়া প্রত্যেকটি সদস্যকে নাম দিতে যাবে, কিছুতেই তাদের আর খুঁজে পাবে না। সে বুঝতে পারবে তার কোনও নির্দিষ্ট ঠিকঠাক আদল নেই এবং ত্যাগের অনুভূতি নিয়ে সে বুঝতে পারবে তার পঁচিশ বছর বয়সি কাঠামোটাকে হারিয়ে ফেলেছে, যা এখন হাতে ধরার মতন আকৃতিহীন ধুলোয়, কোনওরকম জ্যামিতিক মাত্রাহীনতায় পরিবর্তিত হয়েছে।

মৃত্যুর ধর্মীয় ধুলোয় হয়তো তখন সে একটু পুরোনো স্মৃতি অনুভব করবে। একটি লৌকিক কাঠামোযুক্ত শব না হওয়ার বিপক্ষে একটি কাল্পনিক, বিমূর্তি শব,—যা তার ধূসর স্মৃতিতে জড়ো হয়েছে। তখন সে জানতে পারবে যে কোনও এক শরতের সকালে কোনও এক বালকের ক্ষুধার্ত কামড়ে জেগে উঠে সে আপেল গাছের কাণ্ডের ভেতরকার কৈশিক নল বেয়ে উঠবে। সে জানে তার শরীরের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যেকার বন্ধনযোগ্যতা হারিয়ে গেছে আর এটা জানতে পারায় সে ভারাক্রান্ত হয়,— কোনওভাবেই সে যে একজন সাধারণ মৃত নয়—একটি সাধারণ লাশ নয়।

সেই আগের রাতটুকু সে নিজের নিঃসঙ্গ শবের সাহচর্যে কাটিয়েছে। কিন্তু এই নতুন দিনে, খোলা জানালা দিয়ে কদুষ্ণ সূর্যের প্রথম রশ্মির আগমনে তার নরম ত্বককে সে অনুভব করল। মুহূর্তের জন্য সে তা লক্ষ্য করে। শান্ত, দৃঢ়, বাতাসকে সে বয়ে যেতে দিল তার শরীরের উপর দিয়ে। এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহই ছিল না। গন্ধটা সেখানে ছিলই। রাত্রেই শবটা পচতে আরম্ভ করে। এবং তার প্রভাবে ভাঙতে শুরু করে আদলটা। সমস্ত মৃত মানুষদের মতনই গন্ধটা নিঃসন্দেহে-নির্ভুলভাবে একটা কাটা

শুয়োরের গন্ধ। মিলিয়ে যাচ্ছে আবার হাজির হচ্ছে। আরও বেশি তীব্র-তীক্ষ্ণ। গত রাতের গরমেই তার দেহ পচতে শুরু করে দিয়েছে। হ্যাঁ, সে পচছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার মা ফুল পালটাতে এসে যাবেন। আর আসা মাত্রই পচে যাওয়া মাংসের দুর্গন্ধ তাঁর সমস্ত সত্তাকে আক্রমণ করবে। তারপর তাঁরা তার দ্বিতীয় মৃত্যুকে অন্যান্যদের সঙ্গে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন।

হঠাৎ একটা ভয় তার পেছনে ছোরার মতন ঘা মারল। ভয়। কী গভীর তার অর্থ! কী প্রচণ্ড! তখন সে সত্যিই ভীত, সত্যিকারের দৈহিক ভয়ে সন্ত্রস্ত। এর কারণ কী? নিখুঁতভাবে সে তা জানে এবং জানার পর তার মাংস কুঁকড়িয়ে উঠছে, খুব সম্ভবত সে মৃত নয়। তারা তাকে সেখানে রেখেছে। সেই বাক্সে তখন তাকে মনে হচ্ছে, কী নরম, কী রকম পশমকোমল কতই না আরামদায়ক! আর তখনই বাস্তবের জানালা খুলে তার কাছে এগিয়ে এল ভয়ের ছায়া। তাঁরা তাকে জীবিত অবস্থাতেই কবর দিতে যাচ্ছে।

সে মরতে পারে না। কারণ, সবকিছু সম্পর্কেই তার ঠিকঠাক সজাগ অনুভূতি আছে। জীবন সম্পর্কে তার যা অনুভূতি, যা তার উপরই ঘুরছে, বিড়বিড় করছে। সূর্যকিরণের উষ্ণ গন্ধ খোলা জানালা দিয়ে প্রবেশ করে মিশে যাচ্ছে অন্য গন্ধের সঙ্গে। ট্যাংকের মধ্যে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়া জলের টপ টপ শব্দ সম্পর্কে সে সজাগ। ঝিঁঝি পোকা সম্পর্কে, বোধ হয় ভোর হয়নি ভেবে যেগুলো এখনও কোনাঘুপচিতে বসে ডেকে যাচ্ছে, সে সচেতন।

সবকিছুই তার মৃত্যুকে অস্বীকার করছে। সবকিছুই। 'গন্ধটা' ছাড়া। কিন্তু কি করে সে জানতে পারল যে গন্ধটা তারই? হতেই পারে তার মা ফুলদানির জল পালটাতে গতকাল ভুলে গেছেন আর ডাঁটিগুলো পচছে। অথবা ইঁদুরটা যেটাকে বিড়ালটা তার ঘরে মেরেছিল এবং সেটিই হয়তো গরমে পচতে শুরু করেছে। না, গন্ধটা তার দেহ থেকে আসতে পারে না।

কয়েক মুহূর্ত আগে সে তার মৃত্যু নিয়ে সুখী ছিল কারণ, সে ভেবে নিয়েছিল যে সে মৃত। কারণ, একজন মৃত মানুষ তার অপ্রতিবিধেয় অবস্থা নিয়ে সুখী হতেই পারে। কিন্তু একজন জীবিত মানুষ কিছুতেই জীবিতাবস্থায় নিজেকে কবরে পাঠাতে পাবে না। এমনকি তার শরীরের সদস্যরা তার ডাকে সাড়া না দিলেও সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনি এবং সেটাই ভয়ের কারণ। তার জীবনেব ভয়ংকরতম ভয় এবং তার মৃত্যু সম্পর্কেও সে ভীত-সন্ত্রস্ত। তারা তাকে জীবিতাবস্থায়ই কবরে নিয়ে যাচ্ছে। সে হয়তো অনুভব করতে পারছে। সেই মুহূর্তটাকে বুঝতে পেরে তাঁরা বাক্সে আঁচড় কাটলেন। মিছিলের প্রতিটি ধাপ এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। সাথিদের কাঁধে প্রায় শূন্য দেহ নিয়ে সে বুঝতে পারল সে নিজেকে তুলে ধরার বার্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সমস্ত দুর্বল শক্তিগুলোকে একত্র করে সংকীর্ণ কফিনের মধ্যে থেকে সে জানাতে চেষ্টা করল সে এখনও বেঁচে আছে। জানাতে চাইল তাকে বেঁচে থাকা অবস্থাতেই কবরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণভাবেই অপ্রয়োজনীয়। এমনকী তার দেহের সদস্যরাও তার স্নায়ুতন্ত্রের ডাকে সাড়া দিল না।

সে পাশের ঘরে থালা-বাসনের শব্দ শুনতে পেল। সে কি ঘুমিয়ে পড়তে পেরেছিল? একজন মৃত মানুষের সারা জীবনই কি দুঃস্বপ্ন হতে পারে? কিন্তু থালার শব্দে আর কিছুই শুনতে পাওয়া গেল না। সে ভেঙে পড়ল এবং হতে পারে এই কারণেই সে বিরক্ত হল। আসলে সে চাইছিল সমস্ত পৃথিবীর সব বাসনপত্র যেন একটা ধাক্কায় একসঙ্গে বাইরের কোনও কারণে ভেঙে যায়। কারণ, তার নিজেব ব্যর্থতা।

কিন্তু না। এটা যেন স্বপ্ন হয়। এটা স্বপ্ন হলে সে নিশ্চিন্ত হত। তার বাস্তবে ফেরার শেষ সংকল্প আর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে না। সে আর জাগবে না। কফিনের তুলতুলে ভাবটা সে অনুভব করতে পারছে এবং গন্ধটা এবারে আরও বেশি তীব্রতা নিয়ে ফিরে এসেছে। এত বেশি তীব্র যে সে এর মধ্যেই ভাবতে শুরু করে দিয়েছে এটা তার নিজেরই গন্ধ। চলে যাবার আগে তার ভীষণভাবে আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হল। এবং গলিত মাংসের দৃশ্যটা তাঁদেরকে বেশ ভালোভাবেই নাড়াল। প্রতিবেশীরা কফিনের সামনে থেকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে দৌড়ে পালাল। তারা থুথু ফেলতে পারতেন। না, ঠিক তা নয়। এটা অনেক ভালো হবে, যদি তারা খুব তাড়াতাড়ি তাব দাফনের বন্দোবস্ত

করেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে দূরে সরিয়ে ফেলাই ভালো। এমনকি সে এখন নিজের মৃতদেহ নিয়ে নিজেই পালাতে চায়। এখন সে ভালোভাবেই জানে সে সত্যি সত্যিই মৃত অথবা অন্তত পক্ষে অনুৎসাহজনকভাবে জীবিত। কতটা বা পার্থক্য? গন্ধটা যে করে হোক রয়েই গেছে।

উৎসর্গীকৃত শেষ প্রার্থনাগুলি সে শুনতে পারত। গির্জার পাদ্রির লাতিনে উচ্চারিত দুর্বোধ্য ক্রন্দন এবং সেই সুরে পাদ্রির সহকারীদের অক্ষমভাবে সুর মেলানোর তান, গোরস্থানের কাঁটা দেওয়া ঠান্ডা ধুলো আর হাড়ে ভর্তি চেহারা, যা তার হাড়েও কাঁপন ধরায়। সেই গন্ধটা আরও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে যায়। হয়তো,—হয়তো কে জানে কোনও এক বিশেষ মুহূর্তে ঘাড়ের কাছে এসে পড়া তার সমস্ত অবসাদকে ছুঁড়ে ফেলে সে অনুভব করতে পারে,—সে ঘামের সমুদ্রে সাঁতার কাটবে। ঘন, তীব্র তরলে, যেমন সে সাঁতার কেটেছিল কোনও এক সুদূর অতীতে তার মায়ের জরায়ুতে, যখন সে জন্মায়নি। হয়তো তখন সে জীবিতই ছিল।

কিন্তু খুব সম্ভবত সে মরবার জন্য ত্যাগপত্র এখন দাখিল করল যাতে ত্যাগের মধ্যে ভালোভাবে মরতে পারে।

মূল শিরোনাম · La tercera resignación.